ISSN : 2582-3841 (O)
2348-487X (P)

এবং প্রান্তিক

Ebong Prantik

বর্ষ ৯, সংখ্যা ২১, সেপ্টেম্বর, ২০২২

এবং প্রান্তিক

A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal
SJIF Approved Impact Factor : 7.309
Vol. 9th Issue 21th, Sept., 2022

প্রথম খণ্ড

সম্পাদক
সৌরভ বর্মন

এবং প্রান্তিক
চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০১০২

Ebong Prantik
A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal
SJIF Approved Impact Factor : 7.309
[ISSN : 2582-3841(O), 2348-487X(P)],
Published & Edited by Dr. Ashis Roy, Chandiberiya,
Saradapalli, Kestopur, Kolkata - 700102, and
Printed by Ananya, Burobattala, Sonarpur, Kolkata - 150,
Vol. 9th Issue 21th, 26th Sept., 2022, Rs. 700/-
E-mail : ebongprantik@gmail.com
Website : www.ebongprantik.in

প্রকাশ
৯ ম বর্ষ ও ২১ তম সংখ্যা
২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২২

ISSN : 2582-3841 (Online)
2348-487X (Print)

কপিরাইট
সম্পাদক, এবং প্রান্তিক

প্রকাশক
এবং প্রান্তিক
আশিস রায়
রেজিষ্টার্ড অফিস
চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০ ১০২
ফোন - ৯৮০৪৯২৩১৮২
সার্বিক সহয়তা - সৌরভ বর্মন
ফোন - ৮২৫০৫৯৫৬৪৭

মুদ্রণ
অনন্যা
বুড়ো বটতলা, সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০ ১৫০
ফোন - ৯১৬৩৯৩১৪৬৫

মূল্য : ৭০০ টাকা

এবং প্রান্তিক

উপদেষ্টামণ্ডলী

ড. মানস মজুমদার, ড. ব্রততী চক্রবর্তী, স্বামী তত্ত্বসারানন্দ, স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ,
ড. অমলেন্দু চক্রবর্তী, ড. মোনালিসা দাস, ড. সেলিম বক্স মণ্ডল,
ড. মনোজ মণ্ডল, সুজয় সরকার

বিশেষজ্ঞমণ্ডলী

ড. মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায় (বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সৌমিত্র শেখর (উপাচার্য, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সুমন গুণ (তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সুব্রত জ্যোতি নেওগ (অসমীয়া বিভাগ, তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অচিন্ত কুমার ব্যানার্জী (বাংলা বিভাগ, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অজন্তা বিশ্বাস (ইতিহাস বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. হোসনে আরা জলী (বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. সুমিতা চ্যাটার্জি (বাংলা বিভাগ, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. দীপঙ্কর মল্লিক (বাংলা বিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির)
ড. বিনায়ক রায় (ইংরাজি বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অজিত মণ্ডল (শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. অনির্বাণ সাহু (বাংলা বিভাগ, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. মাখন চন্দ্র রায় (বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. মৃণ্ময় প্রামাণিক (তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)
ড. ইনতাজ আলী (ইংরেজি বিভাগ, নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়)

সম্পাদকমণ্ডলী

রচনা রায় (বাংলা বিভাগ, আমডাঙ্গা যুগল কিশোর মহাবিদ্যালয়)
ড. অজয় কুমার দাস (বাংলা বিভাগ, বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়)
শর্মিষ্ঠা সিন্‌হা (বাংলা বিভাগ, ক্ষুদিরাম বোস সেন্ট্রাল কলেজ)
ড. অজয় ঘোষ (শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ)
ড. আশীষ কুমার সাউ (আর্য মহিলা পি. জি. কলেজ, বারাণসী)
ড. শান্তনু দলাই (এগরা সারদা শশিভূষণ কলেজ)

কার্যকরী সম্পাদক - সৌরভ বর্মন

সহ-সম্পাদক - ড. টুম্পা রায়

প্রধান সম্পাদক - ড. আশিস রায়

লেখা পাঠানোর বিষয়ে কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়

১. সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ পাঠাতে হবে। অনধিক ৪০০০ শব্দ সংখ্যা এবং সঙ্গে ৪০০/৫০০ শব্দের সারাৎসার পাঠাতে হবে।

২. পেজমেকার/ওয়ার্ড ফাইলে লেখা পাঠানো যাবে। ১৪ ফন্টে লেখা পাঠাতে হবে এবং সঙ্গে পি ডিএফ ও সফট কপি (লেখা নির্বাচিত হলে) পাঠাতে হবে। হাতে লেখা হলে মার্জিনসহ পরিচ্ছন্ন লেখা পাঠাবেন।

৩. অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো হবে না। লেখার কপি রেখে লেখা পাঠাবেন।

৪. পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা প্রকাশ করা হয় না।

৫. কোনো লেখা ছাপার জন্যে নির্বাচিত হয়েছে কিনা তা জানতে ৩/৪ মাস সময় লাগতে পারে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

প্রধান কার্যালয়

চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০১০২

ফোন : ৯৮০৪৯২৩১৮২

Registered Address

Ebong Prantik, Chandiberiya, Saradapalli,
Kestopur, Kolkata - 700102
Ph. No. : 9804923182
E-mail : ebongprantik@gmail.com

ব্রাঞ্চ অফিস

ভগবানপুর, বি. এইচ. ইউ, বারাণসী - ২২১০০৫ / বুড়ো বটতলা, সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০১৫০

পত্রিকার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ১৫০০ টাকা এবং
ডাকযোগে পত্রিকা পাঠাতে হলে ডাক খরচ গ্রাহককে বহন করতে হবে

প্রাপ্তিস্থান

দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা / পাতিরাম বুকস্টল, কলেজ স্ট্রিট / ধ্যানবিন্দু, কলকাতা / এবং পত্রিকা দপ্তর

বিস্তারিত জানতে দেখুন
Website : www.ebongprantik.in

সূচিপত্র

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে কবি জীবনানন্দ : একটি সমীক্ষা

শর্মিষ্ঠা সিন্‌হা ১৫

জীবন ও জীবিকার বহুমাত্রিক রূপ: প্রসঙ্গ তারাশঙ্করের ‘কবি’

চৈতালী দাস ২৩

উৎপল দত্তের নাটকে ইতিহাস বীক্ষা

কমলেশ মণ্ডল ৩৫

বর্তমান ভারতীয় সমাজ ও বাল্মীকিরামায়ণ

হরিপদ মহাপাত্র ৪৭

হাসান আজিজুল হকের ছোটগল্পে দেশভাগ ও বিপন্ন মানুষ

আশিস কুমার সাহু ৫২

পশ্চিমবঙ্গের সাঁওতালদের উৎসব ও আধুনিকীকরণ-একটি সুসংগঠিত সংস্কৃতি

বাপি কুমার মন্ডল ৬০

প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোট গল্পে নারী

সুপর্ণা কুণ্ডু চ্যাটার্জী ৬৭

কারাগার : উপনিবেশিক ভারতবর্ষে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রনের মাধ্যম

অরোজিৎ হালদার ৭৫

কিয়ের্কেগার্ডের দৃষ্টিতে মানব অস্তিত্বের স্তর

সৌভিক ঘোষ ৮৮

কৃত্তিবাসের ‘শ্রীরামপাঁচালি’ কাব্যে লোকায়ত ভাবনা

মনোতোষ মাজি ৯৫

পৃথিবীর আলো থেকে কন্যাভ্রুণের প্রান্তিকীকরণ

মুনমুন দত্ত ১০১

জ্যোতির্ময়ীদেবীর নারীভাবনা ও ‘মর্ত্যের অপ্সরা’

রেণুকা অধিকারী ১১১

টিনের তলোয়ার: গতানুগতিকতার প্রতি বিদ্রোহের একটি হাতিয়ার

ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য্য ১২২

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে সামন্ততন্ত্র ও
ধনতন্ত্রের প্রভাব: পর্যালোচনা
রাকিবুল হাসান বিশ্বাস ১৩০
দিগিন্দ্রচন্দ্রের দীপশিখা : মন্বন্তরের আলোকবর্তিকা
মল্লিকা ষন্নিগ্রহী ১৩৫
ধাঁধা ও গাছপালা
মনোজ মণ্ডল ১৪১
দুর্গাপুর বাঁধ, আঞ্চলিক অর্থনীতি ও পরিবেশ: একটি পর্যালোচনা
জয়দীপ ঘোষ ১৪৮
বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের ধারা
গার্গী চট্টোপাধ্যায় ১৫৪
বিবেকী কণ্ঠস্বরে জনশিক্ষা ও বর্তমান ভারতবর্ষ
প্রণব ঘোষ ১৬০
মার্কিন বহুসংস্কৃতিবাদ : অজানা জগতের চেনা ‘কলচর’
বিমান সাহা ১৭১
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে পারিলাহাট ও
সংলগ্ন এলাকার ভূমিকা
সানাই সরকার ১৮০
ভাষার আত্মিকরণ : " বর্ণমালা আমার দুঃখিনী বর্ণমালা"
কবিতার আলোকে
সুমন্ত মন্ডল ১৮৭
ভেজা বারুদ : এক বিপন্ন সময়ের চিত্র; সিন্ডিকেট রাজ
রাকেশ জানা ১৯৪
হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের স্বাধীনতা ও জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন
শিল্পী পাঁজা ২০৬
‘মালঞ্চ’ কি ট্র্যাজিক উপন্যাস!
আশীষ কুমার সাউ ২১৮
কেতকী কুশারী ডাইসনের ‘মেয়েলী’ : যাপিত জীবনের শাপিত ভুবন
অভীক প্রধান ২২৫

মধ্য-যুগের লিঙ্গ বিভাজিত সমাজ চিত্র : প্রসঙ্গ বিজয় গুপ্তের
মনসামঙ্গল কাব্য
চন্দ্রাণী মুখার্জী ২৩০
রবীন্দ্রনাথের ঔপনিষদিক চেতনা,ধর্ম ও জীবনদর্শন
দোলা রায় ২৪১
ইতিহাস, মিথ ও বাস্তবতার সংলাপ : কয়েকটি আখ্যানের
তুলনামূলক পাঠ
প্রবুদ্ধ ঘোষ ২৪৭
শান্তিনিকেতনের স্থাপত্যশিল্প: পরিবেশভাবনা ও শিল্পকলার সমন্বয়
রাজদীপ দত্ত ২৫৮
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "বৈকুণ্ঠের উইল" উপন্যাসে পারিবারিক
সম্পর্কের চালচিত্র
ফিরোজ আলি মণ্ডল ২৬৮
সুভাষচন্দ্র ও জাতীয়তাবাদ
মহঃ আমিরুল ইসলাম ২৭৪
আধুনিক বাংলা কবিতায় মরিচঝাঁপি প্রসঙ্গ
ইন্দ্রজিৎ ঘোষ ২৮০
নিবেদন রসপর্যায় অথচ বৈষ্ণব পদাবলী ও রসশাস্ত্রে উপেক্ষিত
সুনীলকুমার রায় ২৯০
বাংলা ছোটোগল্পে বেহুলার নবনির্মাণ : নারীর অবস্থান ও
সমাজবদলের পদচিহ্ন
শ্রেয়া রায় ৩০৩
'শেষের কবিতা' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের প্রেমভাবনা
রিমি বাছাড় ৩১৯
পণপ্রথা : একটি সমীক্ষা
সমীর মণ্ডল ৩২৫
সুন্দরবনের ধারণার বিবর্তন
(ঔপনিবেশিক যুগ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত)
উজ্জ্বল বিশ্বাস ৩৩২

বাণী বসুর ছোটগল্পে নারীর প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর
রীণা মজুমদার ৩৪২
বৌদ্ধ দুঃখ মুক্তিমার্গ : একটি দার্শনিক বিশ্লেষণ
উজ্জ্বল হালদার ৩৪৮
চৈতন্যোত্তর গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের অনুসারী বৈষ্ণব ধর্মসম্প্রদায়: শান্তিপুর গোষ্ঠী
অসীম বিশ্বাস ৩৫৬
সোহারাব-সাহিত্য : গ্রামীণ সংখ্যালঘু মুসলমান সমাজ
দীপঙ্কর আরশ ৩৭০
'গাছটা বলেছিল' : ছোটগল্পে যাদু-বাস্তবতার প্রয়োগ
নকুলচন্দ্র বাইন ৩৭৯
শ্রীমদ্ভগবদগীতার প্রেক্ষাপটে আত্মার স্বরূপ
সৌমিক পাল ৩৮৬
গীতাঞ্জলি : 'না' শব্দের ভাষা সমীক্ষণ ও সদর্থক অভিব্যক্তি
সুজিতকুমার পাল ৩৯৬
উভচর উপন্যাসে নিম্নবর্গীয় জীবন
প্রিয়াংকা মণ্ডল ৪০৫
নৈতিক শূন্যবাদ না মূল্যবোধের পুনর্মূল্যায়ন : একটি পর্যালোচনা নীট্‌শীয় দৃষ্টিকোণ থেকে
সুস্মিতা ভট্টাচার্য ৪১০
হরিশংকর জলদাসের জলপুত্রদের কথা
সারমিন রহমান ৪২৮
গিরিশচন্দ্রের *জনা*
সৈকত মিস্ত্রী ৪৩৫
আধুনিক বাংলা কবিতায় লোক-উপাদান: মার্কসীয় দর্শনের বীক্ষায়
খোকন বর্মন ৪৪৩
নাট্যরূপান্তরে শরৎচন্দ্রের দেনাপাওনা – পল্লীসমাজ
অমলচন্দ্র সরকার ৪৫২
ঐতিহ্যের পরিবর্তন: "বনপলাশীর পদাবলী"
রানু বিশ্বাস ৪৬১

বাংলার কৃষক ও স্যার আজিজুল হক
মৃত্যুঞ্জয় পাল ৪৬৬
জীবন সংগ্রামের 'কালীদহ'
অঙ্কিতা মুখার্জী ৪৭৪
প্রতিস্পর্দ্ধী শিশুদের সামাজিক একীভবনে রবীন্দ্র ভাবনা
সৌরভী আটা
অমল কুমার দাস ৪৮১
মনোবৈকল্য ও মনোবিশ্লেষণের নিপুণ বিশ্লেষক ছোটগল্পকার
সুমথনাথ ঘোষ
রিম্পা হাটি
তাপস রায় ৪৮৮
স্বামী বিবেকানন্দের সর্বধর্মসমন্বয় ও সার্বজনীন সম্প্রীতি ভাবনা:
একটি বিশ্লেষণ প্রয়াস
রুদ্র প্রসাদ রায় ৪৯৬
সভ্যতার রঙ্গমঞ্চে মানুষ
বিপ্লব মণ্ডল ৫০৪
ঐতিহাসিক মূল্যায়নের নিরিখে চর্যাপদে আদিবাসী এবং নিম্নবর্গীয়
সমাজজীবন চিত্র
সাগরিকা সাহা ৫১১
নিম্নগাঙ্গেয় অঞ্চলের ইতিহাসচর্চিত সেকাল-একালের গ্রন্থপঞ্জী
দীপঙ্কর নস্কর ৫১৬
গুরুপূর্ণিমা তথা ভারতীয় গুরুপরম্পরা
রুবেল পাল ৫২৫
ফুলিয়ার তাঁত শিল্পের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি
পর্যালোচনা (১৯৪৭খ্রীঃ – ১৯৭৭খ্রীঃ)
সুলজ বালা ৫৩৯
নজরুলের 'হাওয়া বদল' ও 'স্বাস্থ্য উদ্ধার' : প্রসঙ্গ দেওঘর ও মধুপুর ভ্রমণ
সুমন মুখার্জী ৫৪৮

সুন্দরবনের জীবনচিত্র : প্রসঙ্গ ছোটগল্প
রিয়া চৌধুরী ৫৫৯
সুভাষচন্দ্রের রাজনীতি: চিন্তা ও কর্মের অনন্যতা
স্বরাজ বক্সী
শর্মিলা রায় ৫৬৭
মোহাম্মদ রফিকের কবিতা: কাদামাখা মানুষের দুরন্ত স্বদেশ
প্রতাপ ব্যাপারী ৫৭৬
পরমপুরুষার্থলাভে যোগসাধনায়া উপযোগিত্বং- যোগদর্শন- শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-
ভগবদ্ভক্তিরসায়নানুসারং সমীক্ষণম্
ঋতব্রতা সাউ ৫৯২
Mosque Architecture of Murshidabad During 18th Century
Emili Rumi ৬০০
Attitude of High School Teachers Towards
Inclusive Education
Md Siddique Hossain ৬০৭
Partition of Bengal and Communal Reaction:
A Historical Review (1905-1911)
Dip Sankar Naiya ৬১৫
Gendered and Hierarchical Power Relations in the
Handloom Industry: A Case Study of Nadia, West Bengal
Sayana Basu ৬২২
Managing Stress during Covid-19
Dola Sarkar ৬৩২
COVID -19 : IMPACT ON TOURISM INDUSTRY
Irani Sahu ৬৩৮
COMPARATIVE STUDY OF FORMATIVE AND
SUMMATIVE TESTING ON STUDENT’S ACHIEVEMENT IN
SECONDARY SCHOOL
Nabanita Majhi ৬৪৭

A comparison of adjustment ability of adolescents before and after COVID-19
Sarthak Paul ৬৫৫
EFFECTS OF ENDURANCE TRAINING PROGRAMME ON SELECTED ANTHROPOMETRIC PARAMETERS AMONG SCHOOL BOYS
Kunal Sardar ৬৬৬

সম্পাদকীয়

ভুলভুলাইয়ার মধ্যে নয়। বরং ভাবনায় থাকুন। ইচ্ছারাও বাসা বাধে অনিচ্ছার ঘরে। টুকরো টুকরো স্মৃতিগুলো জুড়েই সাত পাঁচের ভাবনাগুলো তৈরি। আমি এবং আপনি চাই ভাবতে এবং ভাবাতে। নিজের ইচ্ছার বিষয় অন্যকে চাপিয়ে নয়। যুক্তির হাত ধরে সমৃদ্ধির বাগানে পৌঁছাতে। অনুসন্ধানের পথ দেখানোই যার উদ্দেশ্য। অপরিচিত পথকে অন্যদের সামনে শুধু পরিচিত করাই নয়। বরং মুগ্ধতা থাকুক। ডাক আসবে নতুনের। সন্ধান হবে ফলস্বরূপ ।

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে কবি জীবনানন্দ : একটি সমীক্ষা

শর্মিষ্ঠা সিন্‌হা
বাংলা বিভাগ, ক্ষুদিরাম বোস সেন্ট্রাল কলেজ

সারসংক্ষেপ : চাকা ও আগুন আবিষ্কার মানুষের জীবনে গতি আনে। মানুষ পৃথিবীকে পরিণত করে ভোগ্য পণ্যের বাজারে। তৈরি হয় ধনবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ। মহাযুদ্ধের পরবর্তী বিশ্ব পরিণত হয় সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের জঙ্গলে। ধ্বংস হয় প্রেম, মনুষ্যত্ব ও মূল্যবোধ। নির্জনতম কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতায় আছে প্রেম, আছে প্রকৃতি, আছে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিত। তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, প্রেমের পথে আছে সংশয় আছে মৃত্যুর তাড়না, অথচ এই পথে তিনি মুক্তির প্রত্যাশা করেন। জাগাতে চান মানুষের শুভ বুদ্ধিকে।

সূচক শব্দ : ধনবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, প্রেম, মনুষ্যত্ব , মূল্যবোধ, গ্রীক, মিশর।

"মানুষের পৃথিবী চিরকালই বিভিন্ন গ্রামে, নগরে, প্রদেশে, রাষ্ট্রে, মহাদেশে বিভক্ত। নিজস্ব একটি গোষ্ঠী, একটি দল, একটি সম্প্রদায় গড়ে তোলা মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা। পৃথিবীর ভূ-প্রাকৃতিক এবং নৃ-তাত্ত্বিক বিভিন্নতার ফলে সেই সম্প্রদায়গত ভিন্নতাকে চিহ্নিত করা খুবই সহজ ছিল চিরকাল। শ্বেত, পীত, কৃষ্ণ, বাদামি মানুষেরা কোনোদিনও এক হয়ে যেতে পারেনি। তার পরেও আছে ধর্মের ভেদ, রাষ্ট্রের ভেদ। রাষ্ট্রীয় শক্তির ক্ষমতা বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা পৃথিবীতে বিশ্বযুদ্ধ ঘটিয়েছে।" "বিভেদ সত্ত্বেও বিশ্বের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের মনে এমন স্বপণ জেগেছে যেখানে মানুষ মানুষের শত্রু না হয়ে হবে---বন্ধু। বিশ্বত্রাস ধ্বংসশক্তির বিরুদ্ধে গড়ে তুলবে সমবায়ী প্রতিরোধ---যেখানে শুভবোধকে সামনে রেখে, মিলিত হবে পৃথিবীর শান্তিকামী দেশসমূহ। অর্থাৎ দেশে দেশে ভিন্নতা থাকলেও গড়ে উঠবে পৃথিবী ব্যাপ্ত সর্বদেশীয়, অন্তঃরাষ্ট্রীয় মিলনের মঞ্চ। এই মনোভাবকে বলা হয়েছিল আন্তর্জাতিকতা। আন্তর্জাতিকতাবোধের জন্ম বিংশ শতাব্দীতেই---প্রধানত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে। বিশ্বে ফ্যাসিবাদের উত্থান শুরু হয় ১৯২০-২২ খ্রিস্টাব্দ থেকেই কিন্তু তার ভয়ঙ্কর স্বরূপ বিশ্ববাসীর সামনে উদঘাটিত হয়েছিল ১৯৩৩---এরপর হিটলার-এর অত্যাচার প্রত্যক্ষ করে। তখন থেকেই অনুষ্ঠিত হতে থাকে আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলনগুলি। পৃথিবীর মানুষ একত্র হয় মানববিরোধী বৈনাশিক শক্তির বিরুদ্ধে। এই আন্তর্জাতিকতার স্বরপ কিন্তু বিশ্ববাসীর মঙ্গলবোধের আদর্শকে সামনে রেখেই উদ্ভাসিত হয়েছিল।১"

"আন্তর্জাতিক" শব্দটিতে বিশ্বমানের সম্প্রীতিসূচক যে আদর্শের ব্যঞ্জনা আছে তা বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বহুল প্রচলিত হয়ে ওঠা 'বিশ্বায়ন' শব্দটির সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। কিন্তু সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয় অর্থেরও। আজ "বিশ্বায়ন" শব্দটির যাবতীয়

সম্পর্ক পুঁজির কেন্দ্রীভবন, বিত্তের বিস্তার এবং সেই বিত্ত বিস্তারের একতম পদ্ধতিরূপে বণিক বৃত্তের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংলগ্ন।

ড. সুমিতা চক্রবর্তী তাঁর 'জীবনানন্দ সমাজ ও সমকাল' গ্রন্থে দেখিয়েছেন--- 'জীবনানন্দের কবিতায় ব্যবসায়িকতা, বাণিজ্যিকতা, উৎপাদন ও বিপণনের বিভিন্ন স্তর, পণ্য বিনিময় প্রক্রিয়ার মধ্যস্বত্বভোগী মিডল্‌ম্যানদের অবস্থান, পণ্যলুব্ধ মানসিকতার বিস্তার, উপনিবেশের সাম্রাজ্যবাদী নীতিতে নিষ্ঠুর পীড়ন এবং সর্বতোশোষণ ছিল পদ্ধতি। ভারতে নীলকরদের অত্যাচার, অনেক ক্ষেত্রে তাঁতিদের উৎখাত করে দেওয়া ইত্যাদি ঘটনায় এই প্রক্রিয়ায় প্রয়োগ লক্ষ করা যায় এবং প্রভৃতি পরিস্থিতির বিচিত্র প্রকাশ লক্ষ করা যায়।'২

নিসর্গলগ্ন, সরল, আদিম পৃথিবীকে ভোগ্য পণ্যের বাজারে পরিণত করবার এই বিশ্বব্যাপ্ত অভিযানের বিবরণ চিত্র হয়ে উঠেছে জীবনানন্দের কবিতায়---

"বাণিজ্য বায়ুর গল্পে একদিন শতাব্দীর শেষে---
অভ্যুত্থান শুরু হল এইখানে নীল সমুদ্রের কটিদেশে;
বাণিজ্যবায়ুর হর্ষে কোনো একদিন,
চারিদিকে পামগাছ---ঘোলা মদ---বেশ্যালয়---
সেঁকো কেরোসিন
সমুদ্রের নীল মরুভূমি দেখে রোখে সারাদিন।"

---(নিরঙ্কুশ, সাতটি তারার তিমির।)

সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলগুলিতেই বাণিজ্য জাহাজ এসে ভিড়েছিল। তৈরি হয়ে উঠেছিল উৎপাদন কেন্দ্র ও বাজার। সেই শ্রমিক ও ব্যাপার বসতির আন্তর্জাতিক চেহারাই হল 'ঘোলা মদ' আর 'বেশ্যালয়'---বিষাক্ত ছদ্ম নাগরিকতা। সমুদ্রের জলের বাতাসে একদিন কবি জীবনানন্দ হৃদয়ের সুস্থতা অনুভব করেছিলেন (পাখিরা, ধূসর পাণ্ডুলিপি) ---সেই জীবনানন্দের চোখে এখানে সমুদ্র কেবল 'নীল মরুভূমি'। জীবনানন্দের ইতিহাসবোধে ছিল অতীব স্বচ্ছ। বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত হয় রবীন্দ্রনাথ তা কবিতায় উচ্চারণ করেছেন; জীবনানন্দ এই কবিতায় দেখিয়েছেন তারও পূর্বজ পদক্ষেপ।

দেখা যায় ১৯৩৮-১৯৩৯ সাল থেকে জীবনানন্দের কবিতা ধারায় বার বার বাণিজ্য, ব্যবসায়, বাণিজ্য বিস্তারের বিষয়টি একটি নির্দিষ্ট অনুভব অবলম্বনে পরিণত হয়েছে। বার বার কবিতায় 'নাবিক' আর বণিক অর্থে 'সার্থবহ' শব্দ দুটি ব্যবহৃত হচ্ছে। নাবিকের সেই পৃথিবী পরিক্রমা বিশ্বায়নেরই প্রথম পর্যায়---

"বেবিলন, নিনেভে, মিশর, চীন উরের আরসী থেকে ফেঁসে
অন্য এক সমুদ্রের দিকে তুমি চলে যাও---দুপুরবেলায়;
বৈশালীর থেকে বায়ু-গেৎসিমানি---আলেকজান্দ্রিয়ায়
মোমের আলোকগুলো রয়েছে পিছনে পড়ে অমায়িক সংকেতের মতো;
তারাও সৈকত। তবু তৃপ্তি নেই। আরো দূর চক্রবাল হৃদয়ে পাবার
প্রয়োজন রয়ে গেছে..."৩

---(নাবিক, সাতটি তারার তিমির।)

বিশিষ্ট কবিতাতাত্ত্বিক সমালোচক, প্রাবন্ধিক---ড. হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘আমার জীবনানন্দ’ গ্রন্থে জীবনানন্দের ‘রাত্রি’ কবিতায় দেখেছেন---মহাযুদ্ধ উত্তর পৃথিবীর তথাকথিত আধুনিক নগরীর তথাকথিত ‘মহৎ’ রাত্রিকে, অতএব কারও ‘লিবিয়ার জঙ্গলের মতো’ মনে হলে আশ্চর্যের কিছু নেই। ভৌগোলিক অর্থে লিবিয়ায় জঙ্গল নেই। আফ্রিকার উত্তর খণ্ডের অধিকাংশ দেশের মতো এখানেও আছে আদিগন্ত মরুভূমি। আসলে যে অর্থে-বেরটল্ট ব্রেখট তাঁর কাব্যনাট্যের নাম দিয়েছিলেন ‘ইন দ্য জঙ্গল অব সিটিজ’, সেই অর্থেই এক কলোনির কবি যেন আর এক অন্ধকার কলোনির কথা স্মরণ করেছেন এখানে। সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের জঙ্গল এখন মানুষর মনে মনে, মানুষই বহন করছে আরণ্যক হিংস্রতা। আধুনিক মানুষ প্রকৃত পরিচয়ে পশু হয়ে গেছে, যদিও :

“জন্তুগুলো।
আনুপূব---অতিবৈতনিক
বস্তুত কাপড় পরে লজ্জাবশত।”৪ (রাত্রি, সাতটি তারার তিমির)

এলিয়টের কবিতার ভাষায় :

“History has many cunning passages, contrived corridors and issuess,
deceives with whispering ambitions, guides us by vanities.”৫

এই পৃথিবীর, এই আধুনিক সভ্যতার রণরক্তে কেনা নানা সফলতার ধরন মানুষ যুগে যুগে দেখেছে। দেখেছে, হাজার বছর ধরে সময়ের বিপরীতে পথ হেঁটে যদি আবার মানবসভ্যতার উৎসে ফেরা যায়, দেখা যাবে, মানুষের সভ্যতা আর তার যুদ্ধ বিগ্রহের ইতিহাস প্রায় সমবয়সি।

শেষ বিচারে এই বিচিত্র প্রগতিকে মেনে তার পথ হাঁটা পৃথিবীর পথে, নিজেকে হঠাৎ অভিমানে প্রত্যাহার করে নয়।

“পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন
মানুষ তবুও ঋণী পৃথিবীরই কাছে।”৬

---(এই জেনে, একথা বিশ্বাস করে।)

সমালোচক অধ্যাপক ড. বিমল কুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর অগ্রন্থিত কবি জীবনানন্দে প্রেমের অণুবিশ্ব ও মহাবিশ্ব প্রবন্ধে জানিয়েছেন---“ধনবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের প্রথম শিকার যে প্রেম সেই প্রেমের করুণ চিত্রমালা শতকের প্রথম পাদেই এলিয়ট তুলে ধরেছিলেন তাঁর‘The Waste Land’-এ; যদিও শেষ পর্যন্ত এলিয়ট স্বপ্ণ ও সত্যের প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাস করতেন। “শহর বাজার ছাড়িয়ে” কবিতায় জীবনানন্দ লিখেছেন : ‘চারিদিকে প্রেম ও প্রাণের আততায়ী দীক্ষা অপশিক্ষা আগুন উত্তেজনার ঢেউ / ভাঙছে আমার শতাব্দীকে।’ তবু তো বেঁচে আছি আমরা, বাঁচতে চাই আমরা; কারণ ঈশ্বর যা পারে না, প্রেমই পারে সেই কাজ। নীৎসের জরাথুষ্ট্র(“The Spake Zarathustra”, 1883) বলেছিল,“For the old Gods came to an end long ago. And verily it was a good and joyful end of Gods.” জাঁ পল সার্ত-এর গোয়েৎস(“Lucifer and the Lord নাটকে)-এর মুখে শুনেছি“If God exists, man is nothing; if man exists” তাহলে“God does not

exist"। নীৎসে বা সার্ত-এর দর্শনে জীবনানন্দ যদি দীক্ষিত নাও হন, তবু "প্রেম", 'হৃদয়'-কে অনন্ত সত্যরূপে জানতে গিয়ে জীবনানন্দ লেখেন অনেকটা তাঁদের মতো ক'রে : "মানুষের পৃথিবীতে সে অনেক শতাব্দীর আগে / ঈশ্বর স্খলিত হয়ে গেছে" (এখন এ পৃথিবীতে), তবু মানুষ প্রেম চায়---ন্যায় চায়---জ্ঞান চায়। যে ভালোবাসা ব্যক্তি মানব-মানবীতে, সেই ভালোবাসা ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে ধীরে ছড়িয়ে যায় সমগ্র পৃথিবীতে তখন 'প্রেম' শব্দটাও যেন সার্থকতা পায়। যে প্রেম শরীরের নয়, যে প্রেম ইতিহাস গড়ে, সভ্যতা বিধ্বংসী শক্তিকে পরাভূত করে, জীবনানন্দ "আলোপৃথিবী"-তে সেই প্রেম প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশী।

"উত্তরাধিকারে ইতিহাসের হৃদয়ে
বেশি পাপ ক্রমেই ঘনালো।
সে গরল মানুষ ও মানুষীরা এসে
হয়তো বা একদিন করে দেবে ক্ষয়;
আজ তবু কণ্ঠে বিষ রেখে মানবতার হৃদয়
স্পষ্ট হতে পারে পরস্পরকে ভালোবেসে।"৭

যে জীবনানন্দের প্রেমের কবিতায় আমরা পাঠকেরা শুধুই দেখেছি সংশয়, মৃত্যুর তাড়না, প্রতারণার যাতনা সেই জীবনানন্দের মধ্যে খুঁজে পেয়েছি কখনো কীটস্ কখনো রসেটি (ডি. জি. রসেটি-রLovesight) দ্রষ্টব্য। শান্তির বিশল্যকরণী একদিন বিশ্বের এ প্রান্ত থেকে নিয়ে যেতে হয়েছিল এলিয়টকে। আর মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ---এই মহামন্ত্র তো রবীন্দ্রনাথের। ব্যক্তিপ্রেমের অবিনশ্বরতার কথা বরাবর জানিয়ে অবশেষে রাবীন্দ্রিক পদ্ধতিতে আতত মানব প্রেমে উদ্বুদ্ধ কবি জীবনানন্দ উচ্চারণ করলেন :

"হে আকাশ---হে প্রতিভা, হে বিচিত্র উচ্ছ্রিত সূর্যের উজ্জ্বল
আমাদের রোগ, পাপ, বয়সের রূঢ় মরুভূমি
শেষ করে সৃজনের অনাদি দীপ্তিকে আদিম
চুম্বনে বিজ্ঞান, প্রেম প্রেমাগ্নি উড্ডীন করো তুমি।
এ যেন প্রেমের অণুবিশ্ব থেকে মহাবিশ্বে কবিচিত্তের
উদ্বোধনের বার্তা।"৮

মানব সভ্যতার জয়যাত্রার পথ যে 'পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থ্য' জীবনানন্দ তা জানতেন। ফরাসী বিপ্লবের আলোচনা করতে গিয়ে কার্লাইল বিস্মিত হয়ে ভেবেছেন, একদা যা ছিল সুস্থিত, শঙ্খলায় বিন্যস্ত সমাজ তা কি করে ভয়াবহ সংঘর্ষে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। কার্লাইল জেনেছিলেন এই ধ্বংসের অনিবার্যতা :"Inevitable : it is the breaking up of the world solecism, worn out at last."৯ এই রক্তাক্ত কাজের আহ্বান, মারণপ্রবণতা আর অসাড় স্বর্ণলিপ্সার গ্লানি বুদ্ধ কনফুশিয়সের মতো সাধকদের প্রাণ হয়তো বিমূঢ় করে দিয়েছে বারবার---তবু এই সংঘর্ষ, মৃত্যু আর অন্তহীন অন্বেষার পথেই আছে মুক্তি :---

এই পথে আলো জ্বেলে---এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে,
সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ;

এ বাতাস কি পরম সূর্য করোজ্জ্বল;
প্রায় ততদূর ভালো মানব সমাজ
আমাদের মতো ক্লান্ত ক্লান্তিহীন নাবিকের হাতে
গড়ে দেব, আজ নয়, ঢের দূর অন্তিম প্রভাতে।

মানব-চৈতন্যের বিস্তারে মনীষীদের যে অবদান, তার জন্যেই সভ্যতার ইতিহাসে তাঁদের ভূমিকা তাৎপর্যমণ্ডিত। হেগেলের সেই অনবদ্য সদুক্তিটি উদ্ধৃত করার প্রলোভন রোধ করা গেল না :

"The great man of the age is the one who can put into words the will of his age. Tell his age what its will is and accomplish it. What he does is the heart and essence of the age actualizes his age." সুচেতনা কবিতায় জীবনানন্দ যখন সিদ্ধান্ত নেন :

দেখেছি যা হল হবে মানুষের যা হবার নয়
শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলই অনন্ত সূর্যোদয়।

তখন ইতিহাসের চক্রাবর্ত তত্ত্বটিই বড় হয়ে ওঠে সে ভাষণে।১০

ড. বিপ্লব চক্রবর্তী তাঁর "জীবনানন্দের তিলোত্তমা সম্ভব : সৃষ্টিতত্ত্ব" প্রবন্ধে বলেছেন---"মানুষের গতির জয়গান শোনা যায় জীবনানন্দের রচনায়। কবি যাকে বলেছেন 'রণরক্ত সফলতা' তা আসলে মানুষের চেতনার দিন---যে দিন মানুষ মৃত্যুশব্দ আর ভীতিশব্দকে জয় করে। আর কবি তাই গতির জয়গান করেন। ইতিহাসের ভুবনে নচিকেতা, জরথুস্ত্র এবং আরও কত স্মরণীয় মানুষ গতির পথ রচনা করেছেন। লেনিনের মনের পৃথিবীও গতিহীন নয়। নিত্য দ্বন্দ্বের পথে সে গতি মুক্তি পায়। কবির জয়গান---অলখ, অরুণোদয়, জয়! এই গান তো আসলে তিলোত্তমাসম্ভবের। যান্ত্রিকতা, কোলাহল, ব্যস্ততা, ভিড়, কুশ্রীতা আর অন্ধকারের মধ্যেও মানুষ চেতনাই দিক নির্ণয় করে প্যারিস, রোম, নিউইয়র্ক, ক্রেমলিন, লন্ডন, দিল্লি, করাচি অথবা পৃথিবীর যে কোনো শহরের মতো কলকাতাতেও সে দিক নির্ণয়ের কাজ চলে---যুগে যুগে বৃন্দ অন্ধকার ভেদ করে এগিয়ে চলে মানুষের অনবতুল আমির মতো শুভবুদ্ধি। বেলগাছিয়া, যাদবপুর, বটতলা, মুচিপাড়া, তালতলা, জোড়াসাঁকো, নিমতলা, চিৎপুর, খালের এপার ওপার, রাজাবাজার---এমনি বহু বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা শহর কলকাতার রৈখিক রূপকে কবি জীবনানন্দ মানুষের শুভবুদ্ধির আলোয় উজ্জ্বল হতে দেখেছেন। সেখানে মুক্ত পরিচ্ছন্ন বাতাসের সন্ধান চলে। ফুটপাত আর ট্রামের লাইন মাড়িয়ে মাড়িয়ে মানুষ আকাশের সন্ধান করে। শুভ রাষ্ট্রের সন্ধান চলতেই থাকে জীবনানন্দের কলকাতায়।

পটভূমিকা সময়ের। সেখানে বিজ্ঞানের আকাশে অক্লান্ত নক্ষত্রেরা নেভে না। কবি জানেন মহাইতিহাস রচনার পথে জাগে মহাজিজ্ঞাসা। মানুষ চলে সেই আলোকের মহাজিজ্ঞাসার পথে---

"ইতিহাস অবিরল শূন্যের গ্রাস---
যদি না মানব এসে তিনফুট জাগতিক কাহিনীতে

হৃদয়ের নীলাভ আকাশ / বিছিয়ে অসীম করে
রেখে দিয়ে যায় / অপ্রেমের থেকে প্রেমে
গ্লানি থেকে আলোকের মহাজিজ্ঞাসায়।”১১

“কিন্তু এমন মহাইতিহাসের পূর্বাহ্নে কালচিহ্নিত একটা ইতিহাস পরম্পরাও---সঞ্চয় নির্দেশিত বনলতা সেনের আগে থেকে, প্রথমাবধিই আছে তাঁর কাব্যে। তার মধ্যে সাগর-বলাকা বা আশ্চর্য সোনার সন্ধানী নাবিকীর যে ধ্রুবা ফিরে ফিরে এসেছে তাঁর কবিতায়, খ্যাপা সিন্ধাবাদ বলে প্রথম নাম দেওয়া থাকলেও, সে চিত্রমালা ওদিস্যুস জেসন বা ঈনিয়াসের সমুদ্রভিযানেরই দৃষ্টান্তে যেন গড়া। শেষদিকে বলছেন, তাঁর “মনে হয় প্রাণ এক দূর স্বচ্ছ সাগরের কূলে জন্ম নিয়েছিল কবে”, আগে স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন সে দূর সাগরের কূলটিকে :

“সবিতা, মানুষজন্ম আমরা পেয়েছি
মনে হয় কোনো এক বসন্তের রাতে
ভূমধ্যসাগর ঘিরে সেই সব জাতি,
তাহাদের সাথে
সিন্ধুর আঁধার পথে করেছি গুঞ্জন...।”

অর্থাৎ ভূমধ্যসাগরীয় গ্রীকো রোমানের ইতিহাসই তাঁর ইতিহাস। এর সঙ্গে গ্রন্থি বাঁধা যে ইসরায়ে লাইট-বলয় সেও তাঁর আগাগোড়া ঐতিহ্যগত---অগ্রন্থিত ‘আজ’ কবিতা থেকে পরিশেষের “মহীয়সী আর তার শিশু”র দিশারা পর্যন্ত। নগরীর সিঁড়ি যেখানে প্রায় নীলিমার গায়ে লেগে আছে সেখানকার সেই “আশ্চর্য নির্জন দিগন্তরে” আজও তাঁরা আছেন। ইসরায়েলী বলয়ের সূত্রেই এসেছে মিশর। জেনেসিসের পরেই যে যাত্রাপুস্তক বা এক্সোডাস তার অনেকখানি ঘটনাই মিশরের। মোজেসকে ফারাও আখেনাতেনের সঙ্গে এক করে দেখিয়েছিলেন স্বয়ং সিগমুন্ড ফ্রয়েড, তাঁরMoses and Monotheism বইয়ে। স্বাভাবিকভাবে প্রথম থেকেই জীবনানন্দের কবিতায় তারপর অন্বিত হয়ে এসেছে অদূর প্রাচ্যের আরো ব্যাপক ইতিহাস। ‘দূর উর বেবিলন মিশর আসিরীয়া’---মিশরের সাহারা আর পিরামিড, ঈসিসের মন্দির, মেম্নানের গানের মূর্ছনা পার হয়ে অসিরীয় সম্রাটের বেশ পরে কবি পরিক্রমা করছেন আপন ইতিহাস, স্মৃতি পুনরুদ্‌যাপনের আগ্রহে।

চোখে পড়ে ‘ঝরা পালকে’র ঈষৎ চকিত বাংলার কৃষ্ণকথা বাদ দিলে, প্রাচ্য ভারতের ইতিহাস পুরাণ ঐতিহ্য বা স্মৃতি তাঁকে আয়ত্ত করে তুলতে হয়েছে ধীরে ধীরে---সঙ্গতি সাধনারই দৃষ্টান্তে। দু’খানি কাব্য পার হয়ে ‘বনলতা সেন’-এ এসে প্রথম পেলাম বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগৎ। তার নায়িকার চুল বিদিশার রাত্রির মতো কালো, মুখ শ্রাবস্তীর ভাস্কর্যের মতো অপরূপা। এশিরিয়া মিশরের পর এখন বিদিশার মৃতা রূপসীকেও উঠে দাঁড়াতে দেখছেন পুনঃপ্রাণিত হাজার বছর আগের মৃত নক্ষত্রদের সঙ্গে। অবিরল ভূমধ্যসাগরের পর ভারত সমুদ্রের অবধানও এখানেই প্রথম, এবং দূরপ্রাচ্যগত দ্বীপ বিশ্বের। তবু দেখতে পাই কবির আবহমান পরিক্রমার পরিণামে বড়ো হয়ে উঠেছে : “বেবিলনে একা একা এমনই হেঁটেছি আমি রাতের ভিতর...।” ‘সাতটি তারার তিমির’ এ বলয় আরো

বড়ো হয়ে উঠেছে। ‘‘বেবিলন নিনেভে মিশর চীন উরের আরসী থেকে ফেঁসে / অন্য এক সমুদ্রের দিকে।’’ তবু এখানেই এসে ফের দেখা গেল ‘‘দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের সাথে পথ ধরে / ফিরে এসে বাংলার পথে দাঁড়াতে’’ কবিকে। ‘‘সে অনেক রাজনীতি রুগ্ণনীতি মারী / মন্বন্তর যুদ্ধ ঋণ সময়ের থেকে উঠে এসে / এই পৃথিবীর পথে আড়াই হাজার / বছরে বয়সী আমি’’ বুদ্ধের মহানির্বাণ থেকে বাংলা তেরোশো চুয়ান্ন সাল পর্যন্ত পরিক্রমা সদ্য এসে দাঁড়িয়েছেন এই মুহূর্তে। যাত্রার পরিণাম হয়নি, ক্ষান্তিও না।১২

জীবনানন্দ দেখলেন, কেমন করে মানুষের হাতে মানুষ শোষিত হয়। ক্ষমতালোভী রাষ্ট্রনায়ক তার সেনাবাহিনী আর অস্ত্র নিয়ে সাধারণ মানুষের একমুঠো শান্তিপ্রত্যাশী জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনে। ঔপনিবেশিকতার প্রক্রিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি অধীন দেশকে শোষণ করে। পুঁজিবাদী শক্তি সারা পৃথিবীতে বাণিজ্য বিস্তার করে, কিন্তু সাধারণ মানুষ হয়ে যায় সর্বহারা। তাঁর কবিতায় হিটলার, মুসোলিনি, চার্চিল-এর নাম আছে---যুদ্ধ ঘটিয়ে তোলার জন্য দায়ী এই রাষ্ট্রনায়কেরা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে এমন কবিতা বেশ কিছু লিখেছিলেন তিনি। ‘সোনালি সিংহের গল্প’ (সাতটি তারার তিমির) কবিতায় ব্রিটিশ সিংহের ভারত শোষণের বাস্তবতা উদ্‌ঘাটিত---‘‘আমাদের শস্য তবু অবিকল পরের জিনিস।’’১৩

বিশ্বায়নের এই প্রতাপ এবং বিশ্বব্যাপ্তিকে আর যাই হোক---সভা সমিতি আলোচনা চক্র আর বুদ্ধিজীবি পত্র-পত্রিকা দিয়ে ঠেকানো যাবে না। পদ্ধতিটিকে স্তব্ধ করে দেওয়া বা বিপরীত মুখে ঘুরিয়ে দেওয়াও সম্ভব নয় আর। এই বাণিজ্য শোষণ প্রতিহত করতে গেলে প্রতিটি দেশকেই নিজেদের অর্থনীতি, নিজেদের উৎপাদন ও বিপণনকে দৃঢ়তর ও ব্যাপ্ততর করবার চেষ্টা করতে হবে। যে সব দেশের প্রশাসন সে বিষয়ে উদাসীন সেসব দেশের মানুষেরা জীবনানন্দের কবিতায় কিভাবে বর্ণিত হয়েছিল তা উদ্ধার করেই আমাদের কথা শেষ হবে। এই পরিস্থিতি এই দেশে অপরিবর্তিত---

পৃথিবীর এই ক্লান্ত এ অশান্ত কিনারের দেশে
এখানে আশ্চর্য সব মানুষ রয়েছে।
তাদের সম্রাট নেই, সেনাপতি নেই;
তাদের হৃদয়ে কোনো সভাপতি নেই;
শরীর বিবশ হলে অবশেষে ট্রেড ইউনিয়নের
কংগ্রেসের মতো কোনো আশা-হতাশার
কোলাহল নেই।
জানে না কোথায় গেলে মানুষের সামাজিক পরিশ্রমিকের
মতন নির্দিষ্ট কোনো শ্রমের বিধান পাওয়া যাবে;
জানে না কোথায় গেলে জল তেল খাদ্য পাওয়া যাবে;
অথবা কোথায় মুক্ত পরিচ্ছন্ন বাতাসের সিন্ধু তীর আছে।১৪

পরিশেষে বলা যায়,

‘আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে কবি জীবনানন্দ’---এই সমীক্ষায় আমি যে ক’জন আমার পরম শ্রদ্ধেয় কবিতাতাত্ত্বিক উল্লেখযোগ্য সমালোচকদের দৃষ্টিভঙ্গীকে উপস্থাপন করেছি তাঁরা

প্রত্যেকেই স্বমহিমায় ভাস্বর। ড. সুমিতা চক্রবর্তী, ড. হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. বিমল কুমার মুখোপাধ্যায়, ড. বিপ্লব চক্রবর্তী, ড. দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, এই পাঁচজন বিদগ্দ পণ্ডিতপ্রবর তাঁদের নিজেদের ধারণা ও অবস্থানকে স্পষ্ট করেছেন। তাঁদের আলোচনার গুণে আমরা সমৃদ্ধ ও ঋদ্ধ। সেই সঙ্গে আমার কথা কবি জীবনানন্দ যে শুধু 'বাংলার মুখ নন', সারা বিশ্বের মুখ হয়ে তাঁর নিজের কাব্যগ্রন্থের মধ্যে থেকে যাবেন অনন্তকাল। যে কাল অবিনশ্বর। শরীর বিনাশী মানবদেহের মৃত্যুতে যবনিকাপাত ঘটলেও প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বহন করে চলে যে সৃষ্টির অমরত্ব---তাই তো"Identity" শব্দটির সার্থক অর্থ। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে কবি জীবনানন্দের অবস্থান তাই যে কোনো ভৌগোলিক গণ্ডী পার করে হয়ে ওঠে বিশ্বআয়তনিক।

সাধারণ সূত্র নির্দেশ:

১. ড. সুমিতা চক্রবর্তী, 'জীবনানন্দ সমাজ ও সমকাল' সাহিত্যলোক, ৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন। কলকাতা ৭০০০০৬। পৃ. ১৩৭।
২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৮।
৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪০।
৪. ড. হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, 'আমার জীবনানন্দ', প্রথম প্রতিভাস প্রকাশ এপ্রিল ২০২২। ১৮এ, গোবিন্দ মণ্ডল রোড, কলকাতা-৭০০০০২, পৃ. ১১২।
৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১।
৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০।
৭. ড. বিমল কুমার মুখোপাধ্যায়, প্রবন্ধ-অগ্রন্থিত কবি জীবনানন্দে প্রেমের অনুবিশ্ব ও মহাবিশ্ব ১৩৯ পৃ. থেকে গৃহীত। জীবনানন্দ : সম্পাদনা পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।
৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪০।
৯. প্রদ্যুম্ন মিত্র, জীবনানন্দের চেতনাজগৎ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পৃ. ৯৬।
১০. ঐ, পৃ. ৯৭-৯৮।
১১. ড. বিপ্লব চক্রবর্তী, তুলনামূলক ভারতীয় সাহিত্য সমালোচনা তত্ত্ব, নির্মাণ ও সৃষ্টি। (১-৯ খণ্ড), দিয়া পাবলিকেশন, ৪৪/১এ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯, পৃ. ১৮০-১৮১-১৮২।
১২. দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'জীবনানন্দ দাশ বিকাশ প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত'। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পৃ. ৪৪১।
১৩. ড. সুমিতা চক্রবর্তী, আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম পর্যায়। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, রাজবাটী, বর্ধমান-৭১৩১০৪। ফেব্রুয়ারি ১১, ২০০৮। পৃ. ৫৬।
১৪. ড. সুমিতা চক্রবর্তী, 'জীবনানন্দ : সমাজ ও সমকাল' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ 'বিশ্বায়নের প্রেক্ষিত ও জীবনানন্দের কবিতা' থেকে নেওয়া। পৃ. ১৪৫-১৪৬, সাহিত্যলোক, ৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন। কলকাতা-৬।

জীবন ও জীবিকার বহুমাত্রিক রূপ: প্রসঙ্গ তারাশঙ্করের ‘কবি’

চৈতালী দাস
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঘোষপুকুর কলেজ, দার্জিলিং

সারসংক্ষেপ: ‘জীবন’ ও ‘জীবিকা’ দুটি পৃথক শব্দ হলেও একে অপরের পরিপূরক। আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের প্রয়োজনেই চলে প্রতিনিয়ত জীবিকার লড়াই। সমাজের প্রত্যেকটি মানুষই কোনো না কোনোভাবে সেই লড়াইয়ে সামিল। আমাদের আলোচ্য তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কবি’ উপন্যাসেও উঠে এসেছে রাঢ় বাংলার তথাকথিত অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের জীবন ও জীবনসংগ্রামের কথা। এই উপন্যাসের মূল কাহিনিতেই রয়েছে ডোমবংশের সন্তান নিতাইয়ের পারিবারিক দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করে কবিয়াল হয়ে ওঠার স্বপ্ন ও স্বপ্নপূরণের ইতিহাস। আর নিতাইয়ের স্বপ্নপূরণে সহায়ক হয়ে উঠেছে যারা তাদের মধ্যে প্রথমেই বলতে হয় তার বন্ধু রাজা বায়েন বা রাজনের কথা। জাতিতে সে মুচি, পেশায় রেলওয়ের পয়েন্টস্‌ম্যান। যার নিঃস্বার্থ বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা গৃহত্যাগী-জীবিকাহীন নিতাইয়ের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের সংস্থান করে দেওয়া থেকে তার জীবনের স্বপ্নপূরণের অন্যতম পাথেয় হয়ে উঠেছিল। রাজা ছাড়াও নিতাইয়ের জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল দুই নারী ঠাকুরঝি ও বসন্ত। রাজার সূত্রেই এই দুজনের সাথে নিতাইয়ের পরিচয়। একজন গৃহবধূ ও দুধবিক্রেতা এবং অন্যজন ঝুমুর দলের নর্তকী, দেহোপজীবিনী নারী। এই রকম একটি ঝুমুর দলের হাত ধরেই কবি হয়ে ওঠার স্বপ্নপূরণ হয় নিতাইয়ের। গ্রামের বিভিন্ন যাত্রাদল বা কবিগানের আসরে সামান্য দোয়ারকি করা থেকে শুরু করে কঠোর পরিশ্রম আর প্রচেষ্টায় দুর্ধর্ষ ডাকাত বংশের ছেলে নিতাইয়ের কবি হয়ে ওঠার আখ্যান এই উপন্যাস। নিতাই ও নিতাইকে ঘিরে বিভিন্ন মানুষের জীবন ও জীবকার বহুমাত্রিক রূপের প্রতিচ্ছবিকে আমরা তুলে ধরতে চেয়েছি আমাদের আলোচনায়।

সূচক শব্দ: পারিবারিক দস্যুবৃত্তি, জীবিকার পরিবর্তন, স্বপ্ন, গৃহত্যাগ, জীবনসংগ্রাম, রেল, বন্ধুত্ব, কবিগান, কবিয়াল, ঝুমুর, মৃত্যু।

“জীবন এত ছোট কেনে?”– ‘কবি’ উপন্যাসে নিতাই কবিয়ালের এই গানে ধরা পড়েছে অতৃপ্ত জীবন জিজ্ঞাসার এক গভীর সত্য। জীবনের প্রতি ভালোবাসা, জীবনের অন্তিম লগ্নে দাঁড়িয়ে এক জীবনে সব সাধ, সব আশা পূরণ না হওয়ার অতৃপ্তি শুধুমাত্র বসন কিংবা নিতাইয়ের নয়, এই অতৃপ্তি আমাদের সকলের। আর এই অতৃপ্তি নিয়েই এ জীবন, এ জগৎ ছেড়ে একদিন সকলকেই পাড়ি দিতে হয় না ফেরার দেশে। মধুসূদন

দত্ত তাঁর 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতায় দেশমাতৃকার প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা থেকে বলেছেন-

জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে,
চিরস্থির কবে নীর, হায় রে, জীবন-নদে?[১]

আবার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সোনার তরী' কাব্যের 'যেতে নাহি দিব' কবিতাতেও সেই চিরন্তন জীবন সত্যকে তুলে ধরেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন যে, সকলেই বলে-

এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত ছেয়ে
সব চেয়ে পুরাতন কথা, সব চেয়ে
গভীর ক্রন্দন- 'যেতে নাহি দিব'। হায়
তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়!
চলিতেছে এমনই অনাদিকাল হতে।[২]

এই বিপুল পৃথিবীতে আমাদের জীবন অতি সীমিত এবং সংক্ষিপ্ত। আর সেই জীবনের পথও কুসুমাস্তীর্ণ নয়, বলতে হয় সেই পথ অজস্র প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতার। আমাদের প্রত্যেককেই সেই প্রতিকূলতার মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। কখনও নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে, আবার কখনও আত্মপ্রতিষ্ঠার তাগিদে।

তারাশঙ্করের উপন্যাসে মূলত ধরা পড়েছে রাঢ় বাংলার জীবনচিত্র। যে জীবনকে তিনি খুব কাছের থেকে দেখেছেন, অনুভব করেছেন সেই রাঢ় বাংলার তথাকথিত অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের জীবনের ছোট ছোট সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনাকে। *তারাশঙ্কর: দেশ কাল সাহিত্য* গ্রন্থে লেখক ঔপন্যাসিক সম্পর্কে বলেছেন-

নিজে জমিদার বংশের সন্তান হয়েও মিশেছেন আউল-বাউল, বৈষ্ণব, তান্ত্রিক, বেদে- এই সকল মানুষের সঙ্গে; মিশেছেন সমাজের নিচু স্তরের কাহার, বাগ্‌দী, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে। অসাধারণ তাঁর জীবন-অভিজ্ঞতা। তাঁকে রাঢ় অঞ্চলের রূপকার বললেই সব কথা বলা হয় না। এই অঞ্চলের সঙ্গে তাঁর নাড়ীর টান, এখানকার মানুষের সঙ্গে তাঁর নাড়ীর যোগ।[৩]

আর মানুষের সঙ্গে এই একাত্মতার কারণেই বোধহয় তাঁর রচনায় খুব বেশি বাস্তবসম্মতভাবে উঠে এসেছে মানুষের জীবনকথা। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'চৈতালী ঘূর্ণি' থেকে শুরু করে 'কালিন্দী', 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'কবি', 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা', 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' কোথায় না উঠে এসেছে রাঢ়ের নিম্নবর্গ মানুষের জীবন ও জীবিকার কথা, তাদের কঠোর জীবনসংগ্রামের কথা, তাদের সংগ্রামময় জীবনেও নিজেদের জন্য দেখা স্বপ্ন, আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রেম অর্থাৎ বর্হিজীবনের পাশাপাশি ধরা পড়েছে মানুষের অন্তর্জীবনের কথাও। তারাশঙ্করের 'কবি' উপন্যাসও তার ব্যতিক্রম নয়। 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে এই উপন্যাস সম্পর্কে লেখক বলেছেন-

কবি(মার্চ, ১৯৪২)তারাশঙ্করের আর একটি মনোরম সৃষ্টি। বাংলার শিক্ষা, সংস্কৃতি, রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণের প্রভাব কেমন করিয়া সমাজের নিম্নতম স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া, আপামর জনসাধারণের মনে সৌন্দর্যবোধ ও সরলতার সঞ্চার করিয়াছে, বাংলার কবিয়াল-সম্প্রদায়ই তাহার চমৎকার প্রমাণ।[৪]

'কবি' উপন্যাসে মূলত উঠে এসেছে নিতাই কবিয়ালের জীবনকথা। নিতাইয়ের পরিচয় দিতে গিয়ে লেখক বলেছেন তার বংশের প্রাচীন ইতিহাস-

যে বংশে নিতাইচরণের জন্ম, সে বংশটি হিন্দু সমাজের প্রায় পতিততম স্তরের অন্তর্গত ডোমবংশ। তবে শহর অঞ্চলে ডোম বলিতে যে স্তরকে বুঝায় ইহারা সে স্তরের নয়। ডোমেরা বাংলার বিখ্যাত লাঠিয়াল-প্রাচীনকাল হইতে বাহুবলের জন্য ইহারা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। ইহাদের উপাধি হইল বীরবংশী। নবাবী পল্টনে নাকি একদা বীরবংশীরা বীরত্বে বিখ্যাত ছিল। কোম্পানীর আমলে নবাবী আশ্রয়চ্যুত হইয়া দুর্ধর্ষ যুদ্ধব্যবসায়ীর দল পরিণত হয় ডাকাতে। পুলিশের ইতিহাস ডোমবংশের কীর্তিকলাপে পরিপূর্ণ। এই গ্রামের ডোম পরিবারগুলির প্রত্যেকের রক্তে রক্তে এখনও সেই ধারা প্রভাবিত। ...এই নিতাইচরণ সেই বংশের ছেলে। খুনীর দৌহিত্র, ডাকাতের ভাগিনেয়, ঠ্যাঙাড়ের পৌত্র, সিঁদেল চোরের পুত্র...[৫]

এইরকম এক দুর্ধর্ষ ডাকাত বংশের ছেলে নিতাই কীভাবে তার বংশপরম্পরাগত দস্যুবৃত্তির জীবন পরিত্যাগ করে নিজের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কবি হয়ে উঠলো তার সেই কঠোর জীবনসংগ্রামের কাহিনিই উঠে এসেছে এই উপন্যাসে। ছেলেবেলা থেকেই এক সুস্থ স্বাভাবিক জীবনের প্রতি ঝোঁক ছিল নিতাইয়ের। তাই আত্মীয়পরিজনের ব্যঙ্গ-কটূক্তি সহ্য করেও লেখাপড়া শিখে শিক্ষিত ভদ্র সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন দেখেছে নিতাই। লেখাপড়া শেখার তীব্র বাসনায় নিতাই রোজ সন্ধ্যায় ছুটে গেছে গ্রামের স্থানীয় জমিদারদের প্রতিষ্ঠিত নৈশ বিদ্যালয়ে -

রোজ সন্ধ্যায় নিতাইচরণ বইয়ের দপ্তর বগলে করিয়া কালি-পড়া লণ্ঠন হাতে নাইট ইস্কুলে চলিয়াছে। স্থানীয় জমিদারের মায়ের স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত নৈশ বিদ্যালয়ে নিতাই পড়াশুনা করিতেছিল। সেখানে ডোমপাড়ার অনেকগুলি ছেলেই পড়িত। ছাত্রসংগ্রহের উদ্দেশ্যে জমিদার একখানা করিয়া কাপড় দিবার ঘোষণার ফলেই বীরবংশীর দল ছেলেদের পাঠশালায় আনিয়া ভর্তি করিয়া দিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে নিতাইও আসিয়াছিল। বৎসরের শেষে কাপড় লইয়া দ্বিতীয় ভাগের চোর বেণীর গল্প পড়িবার পূর্বে ডোমেদের ছেলেগুলি পাঠশালা হইতে সরিয়া পড়িল, কেবল নিতাই থাকিয়া গেল।[৬]

নিতাইয়ের এই থেকে যাওয়ার পিছনে ডোমপাড়ার অন্য ছেলেদের মতো শুধুমাত্র বাইরের তাগিদ ছিল না, ছিল অন্তরের তাগিদ। পরীক্ষায় প্রথম হওয়া, পুরস্কার পাওয়া নিতাইকে যেন আরও বেশি উদ্বুদ্ধ করেছিল, 'বংশধারা-বিরোধী একটি অভিনব গৌরবের আস্বাদও বোধ করি নিতাই পাইয়াছিল।'[৭] কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় নিতাই ছাড়া পাঠশালায় আর দ্বিতীয় কোনও ছাত্র না থাকায় পাঠশালাটি বন্ধ হয়ে যায়। পাঠশালা বন্ধ

হওয়ায় নিতাইয়ের মামাতো-মাসতুতো ভাইয়েরা তাকে তাদের রাত্রি অভিযানের সঙ্গী করে তুলতে চাইলো। কিন্তু যে জীবন ও জীবিকাকে নিতাই ঘৃনা করে সেই জীবনকে সে কিছুতেই গ্রহণ করতে পারলো না। ফলে সে গৃহত্যাগী হলো। পারিবারিক গণ্ডি ছেড়ে, বংশগত বৃত্তি ছেড়ে সম্পূর্ণ বিপরীত পথে পা বাড়াল নিতাই। সে হয়ে উঠলো ‘দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ’। দস্যুবৃত্তির জীবন থেকে বেরিয়ে এক সভ্য শিক্ষিত সমাজে নিজেকে কবিয়াল রূপে প্রতিষ্ঠিত করার অদম্য আকাঙ্ক্ষা, কঠোর জীবনসংগ্রাম, আর উন্নত মানসিকতা যেভাবে নিতাইকে তার লক্ষ্যে পৌঁছে দিয়েছিল তারই কাহিনি এই উপন্যাস।

আমরা প্রথমেই আলোকপাত করবো নিতাইয়ের জীবন ও জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত জীবিকা প্রসঙ্গে। ‘জীবন’ ও ‘জীবিকা’ দুটি পৃথক শব্দ হলেও একে অপরের পরিপূরক। আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের প্রয়োজনেই চলে প্রতিনিয়ত জীবিকার লড়াই। সমাজের প্রত্যেকটি মানুষই কোনো না কোনোভাবে এই লড়াইয়ে সামিল। আমাদের আলোচ্য তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘কবি’ উপন্যাসেও উঠে এসেছে রাঢ় বাংলার তথাকথিত অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের জীবন ও জীবনসংগ্রামের কথা। নিতাই তার পারিবারিক দস্যুবৃত্তিকে গ্রহণ করতে চাইনি বলেই অনায়াসে গৃহত্যাগ করেছে। তবে গৃহত্যাগের পর নিতাই কীভাবে তার জীবনকে চালিত করেছে, কীভাবে একের পর এক জীবিকার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এই সমস্ত কিছু উপন্যাসের নিবিড় পাঠ থেকেই আমরা অবগত হয়। কখনও সে ঘনশ্যাম গোঁসাইয়ের বাড়িতে মাহিন্দরীর কাজ শুরু করেছে, কখনও বা স্টেশনে কুলির কাজ করেছে, কখনও বিড়ির দোকান দিয়েছে, আবার কখনও কবিগানের আসরে দোয়ারকি করা থেকে শুরু করে ঝুমুরদলের মূল কবি হয়ে উঠেছে।

অবশ্য নিতাইয়ের এই কবিয়াল হয়ে ওঠার পথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তার জীবনকে প্রভাবিত করেছে যে সমস্ত মানুষ তাদের কথাও অনিবার্যভাবে উঠে আসে এই আলোচনার প্রেক্ষিতে। প্রথমেই বলতে হয় যে মানুষটির কথা তার নাম রাজা বায়েন। জাতিতে সে মুচি, পেশায় রেলওয়ের পয়েন্টস্‌ম্যান। রাজালাল সম্পর্কে বলতে গিয়ে লেখক বলেছেন-

রাজালাল একটু অদ্ভুত ধরণের লোক। বিগত মহাযুদ্ধের সময় তাহার ছিল তরুণ বয়স, সে ঘটনাচক্রে কুলি হিসাবে গিয়া পড়িয়াছিল মেসোপটেমিয়ায়। ফিরিয়া আসিয়া কাজ করিতেছে এই লাইট রেলওয়েতে। প্রাণখোলা দিলদরিয়া লোক, অনর্গল ভুল হিন্দি বলে, ঘড়ির কাঁটার মতো ডিউটি করে, বার ছয়-সাত চা খায়, প্রচুর মদ খায়, ভীষণ চিৎকার করে, স্ত্রীপুত্রকে ধরিয়া ঠেঙায়।[৮]

এইরকম একটি মানুষের সাহায্যেই গৃহহীন-কর্মহীন নিতাই আশ্রয় পেয়েছে, কাজ পেয়েছে। একজন প্রকৃত বন্ধুর মতো নিতাইকে সে অনুভব করেছে, ভালবেসেছে,

সম্মান করেছে তার প্রতিভাকে। আর সর্বোপরি নিতাইকে নির্দিষ্ট বাসস্থান ও আর্থিক স্বাবলম্বনের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। রাজার সহায়তায়-

নিতাই এখন স্টেশনে কুলিগিরি করে, ভদ্রলোকজনের মোট তুলিয়া দেয়, নামাইয়া লয়, গ্রামান্তরেও মোট বহিয়া লইয়া যায়, উপার্জন তাহার ভালই হয়। স্টেশনে নামাইতে চড়াইতে মজুরি দুই পয়সা, এই গ্রামের মধ্যে যাইতে হইলে চার পয়সা, গ্রামান্তরে যাইতে হইলে রেট দূরত্ব অনুযায়ী। অন্য কুলিদের অপেক্ষা নিতাইয়ের উপার্জন বেশি। কারণ তাহার সহায় স্বয়ং রাজা।... দূরান্তরের যাত্রী অধিকাংশই পায় নিতাই। স্টেশনের জমাদাররাজার সুপারিশে যাত্রীরা নিতাইকেই লইয়া থাকে। নিতাইয়ের ব্যবহারও তাহারা পছন্দ করে।[৯]

যাত্রীদের নিতাইকে পছন্দ হওয়ার কারণ তার শিক্ষা, তার মার্জিত স্বভাব, তার কথা বলার ভঙ্গি, যা নিঃসন্দেহে অন্য কুলিদের থেকে আলাদা। জীবনধারণের জন্য যতই যে কুলিগিরি করুক না কেন, সে তার লক্ষ্যে সর্বদা অটল থেকেছে। নিতাইয়ের জীবনে রেলস্টেশনেরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এখান থেকে যেমন তার জীবিকার সংস্থান হয়, ঠিক তেমনই বহু মানুষের সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংযোগ গড়ে ওঠে। তাদের মধ্যে পারস্পরিক কথোপকথনের সূত্রে বিভিন্ন স্থানের নানা ঘটনা নিয়ে আলোচনা চলতে থাকে। বিশেষ করে স্টেশন সংলগ্ন চা-পানের দোকানগুলিতে। তবে নিতাইয়ের আগ্রহের বিষয় মূলত কবিগানের অনুষ্ঠান। কবে, কোথায় কবিগানের আসর বসবে, যাত্রাগান হবে, মেলা বসবে এসব খবরের দিকেই নিতাইয়ের খেয়াল। নিতাই একটি গানে তার মনের এই ইচ্ছেকে প্রকাশ করেছে-

সেই মেলাতে কবে যাব
ঠিকানা কি হায় রে!
যে মেলাতে গান থামে না
রাতের আঁধার নাই রে।
ও রসময় ভাই রে![১০]

এমন অনেক গান সে বেঁধেছে। কিন্তু কোনটাই সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে নি। একদিন হঠাৎই তাদের গ্রামের চণ্ডীমায়ের মেলাতে সত্য সত্যই নিতাই তার স্বপ্ন পূরণের সুযোগ পেয়ে গেলো। নিতাইয়ের গ্রামের প্রাচীন নাম অট্টহাস- যা ছিল একান্ন মহাপীঠের অন্যতম মহাপীঠ। এই মহাপীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন মহাদেবী চামুণ্ডা। প্রতিবছর মাঘী পূর্ণিমায় চামুণ্ডার পুজো উপলক্ষ্যে মেলা বসে গ্রামে। আর এই মেলার অন্যতম আকর্ষণ ছিল কবিগানের আসর। এই কবিগান ছিল মূলত লোকসঙ্গীতের একটি বিশেষ ধারা। কবিগান সম্পর্কে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে বলেছেন-

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত কৃষ্ণনগর থেকে ভাগীরথীর তীরবর্তী নাগরিক কেন্দ্র থেকে সদ্য-গঠিত কলকাতার বিত্তবান সমাজে একপ্রকার লঘু গীতবাদ্য, যাত্রাপাঁচালি প্রভৃতির বিশেষ প্রচলন হয়েছিল। তখন পুরাতন

ঐতিহ্যের পথ রুদ্ধ হয়ে এসেছে, নতুন শিক্ষাসভ্যতার স্বর্ণদ্বার উন্মুক্ত হয়নি, অথচ নাগরিক সমাজের অনেকের হাতে কাঁচা টাকা জমেছে প্রচুর। সেই বিকৃত রুচির নাগরিকদের রসের তৃষ্ণা মেটাবার জন্য একপ্রকার নাগরিক লোকগীতি, অভিনয় ও কাব্যকলার অনুশীলন হয়েছিল।[১১]

অর্থাৎ মধ্যযুগের প্রায় শেষদিকে অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলার এক বিশেষ আর্থ-সামাজিক–রাজনৈতিক জীবনের পরিবর্তনশীলতার প্রেক্ষিতে বাংলা সাহিত্যে উদ্ভব ঘটেছিল আখড়াই, হাফ-আখড়াই, দাঁড়া, কবিগান এর মতো ধারার। কবিগান গাওয়া হত মূলত প্রতিদ্বন্দ্বী দুটি দলের মধ্যে। প্রত্যেক দলে একজন করে মূল গায়েন থাকত। তাকেই বলা হত কবিয়াল। আর তাদের সঙ্গে থাকত কয়েকজন সহকারী গায়ক, যাদের বলা হত দোহার। এরা সাধারণত কবিয়ালের গানের কথাগুলিকেই দোয়ারকি দেয় বা পুনরাবৃত্তি করে থাকে। কবিয়ালরা মূলত মুখে মুখেই গান বাঁধত এবং বিভিন্ন আসরে সেই সব গান গাইত। সেই সময় গ্রাম বাংলায় যে কোনও পুজো-পার্বণ, মেলা উপলক্ষ্যে কবিগানের আসর বসতো। আমরা কবি উপন্যাসেও তা প্রত্যক্ষ করেছি। দেবী চামুণ্ডার পুজোর মেলায় যে কবিগানের আসর বসত তার বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক বলেছেন-

প্রায় দেড়হাজার লোকের একটি সমাবেশ...সমারোহ করিয়া আসর পাতা হইয়াছিল, সন্ধ্যায় চারিদিকে চারিটা পেট্রোম্যাক্স আলো জ্বালা হইল, কবিয়ালদের মধ্যে মহাদেবের দল আসিয়া আসরে বসিল, কিন্তু নোটনদাসের সন্ধান মিলিল না।[১২]

মহাদেব পাল ও নোটন দাস হল এই অঞ্চলের দুই বিখ্যাত কবিয়াল। তারা দুজনেই বহুদিন থেকে এই মেলায় গাওনা করে। দুই দলের কবিয়াল অর্থাৎ মূল গায়েন তারাই। আমরা কবি উপন্যাসে নিতাইকে প্রথমে কবিয়াল রূপে নয়, দেখেছি মেলায় কবিগানের আসরে অনুপস্থিত নোটন দাসের দলে দোয়ারকি করতে। নিতাইয়ের কবিয়াল হওয়ার যে স্বপ্ন এটা ছিল তার প্রথম পদক্ষেপ। আসরে উপস্থিত বহু মানুষের প্রশংসা নিতাইকে আরও বেশি উদ্বুদ্ধ করেছিল। এরপর সে যখনই কবিগান গাওয়ার সুযোগ পেয়েছে ছুটে গেছে, গান গেয়ে অর্থ উপার্জনও করেছে। লেখক বলেছেন-
নিতাই মেলায় গাওনা করিয়াছে ভালো। তার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর এবং বিচিত্র বিচার দৃষ্টি একটা নূতন স্বাদের সৃষ্টি করিয়াছিল।[১৩]

নিতাইয়ের জীবনের অন্যতম অনুপ্রেরণাদাত্রী ঠাকুরঝিকে নিয়ে লেখা নিতাইয়ের সেই অনবদ্য গান 'কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদো ক্যানে?...' সকলের মন জয় করে নিয়েছিল। মহাদেব, সৃষ্টিধর এর মতো কবিয়ালরাও তার প্রশংসা না করে পারেনি। নিতাই কবি হতে চেয়েছে। নতুন নতুন গান গেয়ে সকলের কাছে তার প্রতিভাকে পৌঁছে দিতে চেয়েছে। অজস্র গান সে আপন মনেই বেঁধেছে। ছেড়েছে সে

রেললাইনে কুলির কাজ। রামায়ণে দস্যু রত্নাকরের কাহিনি তাকে উদ্বুদ্ধ করেছে। রাজাকে সে বলেছে-

রত্নাকর, ধর কবি হলেন, তারপর কি তোমার তিনি ডাকাতি করতেন, না মানুষ মারতেন? ...কাল রাত্রির কথাটা একবার স্মরণ করে দেখ। চারিদিকে তো রটে গেল কবিয়াল বলে! ...আর কি আমার মস্তকে করে মোট বহন করা উচিত হবে? বাল্মীকি মুনির কথা ছেড়ে দাও। কার সঙ্গে কার তুলনা! ভগবানের অংশ, দেবতা ওঁরা। কিন্তু আমি তো কবি। না হয় ছোট। ...বল রাজন, আর কি আমার কুলিগিরি করা শোভন হবে? লোকে ছি ছি করবে না? বলবে না কবি মোট বহন করছে![১৪]

ফলে নিতাই আবার তার জীবিকা বদলে নিল। কুলিগিরির কাজ ছেড়ে নিজে স্বাধীনভাবে একটা দোকান শুরু করল। বিড়ির দোকান। আসলে এভাবে টাকা উপার্জন করা তার লক্ষ্য নয়। তার লক্ষ্য গান গেয়ে একজন নামকরা কবিয়াল হয়ে উঠবে।

এরপরেই নিতাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে ঝুমুর দলের। ঝুমুর দল সম্পর্কে লেখক উপন্যাসে বলেছেন-

বহুকাল পূর্বে ঝুমুর অন্য জিনিষ ছিল, কিন্তু এখন নিম্নশ্রেনীর বেশ্যা গায়িকা এবং কয়েকজন যন্ত্রী লইয়াই ঝুমুরের দল। আজ এখান, কাল সেখান করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, গাছতলায় আস্তানা পাতে। কেহ বায়না না করিলেও পথের ধারে নিজেরাই আসর পাড়িয়া গান-বাজনা আরম্ভ করিয়া দেয়। মেয়েরা নাচে, গায়- অশ্লীল গান। ভনভনে মাছির মত এ রসের রসিকরা আসিয়া জমিয়া যায়।[১৫]

নিতাইয়ের পরম বন্ধু রাজা একদিন হঠাৎ ট্রেন থেকে জোড় করে একটি ঝুমুর দলকে নামিয়ে এনে নিতাইয়ের সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে দেয় এবং সন্ধ্যায় বেশ সমারোহের সঙ্গে গানের আসরের আয়োজন করে। সম্ভ্রান্ত ভদ্রব্যক্তিরা না থাকলেও সাধারণ লোকের অভাব ছিল না সেই আসরে। সেই ঝুমুর গানের আসর সম্পর্কে লেখক বলেছেন-

দোকানদার শ্রেণির লোকেরাই হংসশ্রোতার মতো যথাসাধ্য সাজিয়া-গুজিয়া জাঁকিয়া বসিল, নিম্নশ্রেণির লোকেরা একেবারে ভিড় জমাইয়া চারিদিক ঘিরিয়া দাঁড়াইল। মাঝখানে আসর পড়িল ঝুমুর নাচের।[১৬]

প্রত্যেক ঝুমুর দলের সঙ্গেই একজন করে নিম্নস্তরের কবিয়াল থাকে। নিতাই প্রত্যাশা করেছিল এই দলের কবিয়ালের সঙ্গে সে পাল্লা দেবে। কিন্তু সেই কবিয়াল এই ঝুমুর দলের থেকে পিছিয়ে পড়াই শুধুমাত্র নাচগানের আসর হয়। তবে এই দলে নিতাই একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। কারণ সে কবিয়াল। তাই সে ভদ্রলোকের মতোই পরিস্কার জামাকাপড় পড়ে তার উপর চাদর জড়িয়ে ঝুমুর দলের আসরে গিয়ে বসে। নাচ-গানের আসর জমে ওঠে। খেমটার অনুকরণে শুরু হয় নাচ-গান। মেয়েরা প্রথমে গান ধরে, আর দোয়ারেরা সেই গানটির পুনরাবৃত্তি করে। প্রথম গান শেষ হতেই নিতাই কবিয়ালের ভঙ্গিতে চাদরখানা কোমড়ে বেঁধে আসরে উঠে দাঁড়ায় গান

গাওয়ার জন্য। প্রথমে সকলে আপত্তি করলেও তার মধুর কণ্ঠস্বর শেষ পর্যন্ত সকলের মন কেড়ে নেয়। একের পর এক সে তার বাঁধা গান গেয়ে যায়। এই ঝুমুর দলের প্রৌঢ়া দলনেত্রীর আহ্বানেই নিতাই একদিন আলেপুরের মেলায় কবিগান গাইতে ছুটে যায়। এই সে প্রথম কোনও আসরে কবিয়াল হয়ে গান গাওয়ার সুযোগ পেয়েছে। চণ্ডীমায়ের মেলায় মহাদেব কবিয়ালের সঙ্গে পাল্লা দেবার সুযোগ হয়েছিল বটে, তবে কবিয়াল রূপে নয়, দোয়ার হিসেবে। ফলে তার মনে এক অদ্ভুত উত্তেজনা, আনন্দ। বহু প্রতিকূলতা পেরিয়ে তার দীর্ঘদিনের স্বপ্নপূরণ হতে চলেছে। এই ঝুমুর দলেই নিতাই প্রথম স্বাধীনভাবে গান গাওয়ার সুযোগ পেয়েছে। প্রথম কবি রূপে প্রতিষ্ঠা ও সম্মান পেয়েছে। এই দলে থেকেই সে অনেক কিছু শিখেছে। প্রাচীন প্রসিদ্ধ কবিয়ালদের অনেক প্রসিদ্ধ পালাগান তার মুখস্থ। হরু ঠাকুর, গোপাল উড়ে, ফিরিঙ্গী কবিয়াল অ্যান্টনি সাহেব, কবিয়াল ভোলা ময়রা এবং তার প্রথম গুরু কবিয়াল তারণ মণ্ডলের গান সে সংগ্রহ করেছে। আগের থেকে তার গান আরও অনেক উন্নত হয়েছে, সমৃদ্ধ হয়েছে। নিতাই তার কবি প্রতিভার গুনে ঝুমুর দলের মেয়েদের লক্ষ্মীর ব্রতকথাকে পয়ার ছন্দে পাঁচালী করে তুলেছে। পূর্ণিমার বৃহস্পতিবারে মেয়েরা লক্ষ্মীপুজোর সময় যখন তার লেখা পাঁচালি পড়ে, তখন নিতাই একটু গম্ভীর হয়ে ওঠে। সে মনে মনে ভাবে আর কী এমন নতুন করে রচনা করা যায় যা দেশে দেশে লোকের মুখে মুখে ফিরবে। তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে। দিনের পর দিন তার জানার ও নিজেকে প্রকাশ করার ইচ্ছে প্রবল হয়ে ওঠে। ঝুমুর দলের দলনেত্রী মাসির কাছে শুনেছে সে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনি। পড়েছে দাশু রায়ের পাঁচালী। এভাবেই কবিয়াল ও কবিগানের শ্রোতাদের মধ্যে ক্রমশ নিতাইয়ের খ্যাতি গড়ে ওঠে। নিতাই আসরে গান গায়, বসন সেই গানের সঙ্গে নাচে। বসনের প্রতি নিতাইয়ের কৃতজ্ঞতার প্রকাশ ঘটেছে তার বক্তব্যে-

বসন্ত তাহাকে অনেক শিখাইয়াছে। সে তাহাকে টপ্পাগান শিখাইয়াছে। টপ্পাগান নিতাইয়ের বড় ভালো লাগে। এই তো গান। পদাবলীর ‘পিরীতি’ এক, আর টপ্পার ভালবাসা অন্য জিনিস- একেবারে খাঁটি ঘরোয়া পিরীতি। টপ্পার সঙ্গে নিধুবাবুর নামও সে জানিয়াছে। বসন্তই বলিয়া দিয়াছে। মনে মনে সে নিধুবাবুকে হাজার বলিহারি দেয়।...[১৭]

নিতাইয়ের সাধ সে একদিন নিধুবাবুর মতোই গান বাঁধবে। তার মৃত্যুর পরেও নতুন নতুন কবিয়ালরা তার গান গাইবে আর বাহবা দেবে। এটাই তো চেয়েছিল নিতাই। একদিন সে ভদ্র সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে, মাথা উঁচু করে সম্মানের সঙ্গে বাঁচবে, তার খ্যাতি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়বে। আর এই স্বপ্ন নিয়েই নিতাই একদিন ঘর ছেড়েছিল, তার পরিবার-পরিজন ছেড়েছিল। সমাজের একেবারে অন্ত্যজ স্তর থেকে,

ঘৃণ্য দস্যুবৃত্তির জীবন থেকে এক স্বাভাবিক সুন্দর জীবনে কবিরূপে প্রতিষ্ঠা হওয়ার স্বপ্ন নিতাইয়ের জীবনকে এক অন্য মাত্রা এনে দিয়েছিল।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবি' উপন্যাসেও আমরা জীবনের সেই বহুমাত্রিক রূপকে প্রত্যক্ষ করেছি। দেখেছি সমাজের একেবারে নিম্নস্তর থেকে উঠে আসা ডোমসন্তান নিতাইয়ের জীবনসংগ্রাম, কবি হওয়ার অদম্য আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়াস, দেখেছি নিজের পরিবার, সমাজ, গোষ্ঠী ছেড়ে একাকী আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই। পাশাপাশি এই উপন্যাসে আমরা পেয়েছি ঠাকুরঝি ও ঝুমুর দলের নর্তকী বসনকে। জীবন সংগ্রামের কঠিন লড়াইয়ে কোনো না কোনোভাবে তারাও সামিল। যারা গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে নিতাইয়ের জীবনকে।

ঠাকুরঝি নিতাইয়ের পরম বন্ধু রাজার শালিকা। সে বিবাহিতা নারী। বয়স তার পনেরো-ষোলো। গায়ের রং কালো। সংসার সামলানোর পাশাপাশি পাড়ার অন্য বউদের সঙ্গে গ্রামে গ্রামে গিয়ে দুধ দিয়ে আসা ছিল তার নিত্য কাজ। নিতাইকেও সে প্রত্যহ দুধের যোগান দিত। ঠাকুরঝি ছিল নিতাইয়ের গানের গুনমুগ্ধ ভক্ত এবং নিতাইয়ের অনুপ্রেরণাও। এই ঠাকুরঝিকে নিয়ে নিতাই অসংখ্য গান বেঁধেছে, এমনকি নিঃস্বার্থভাবে ভালোও বেসেছে তাকে। ঠাকুরঝিও ভালোবেসেছে নিতাইকে। কিন্তু নিতাই তার ভালোবাসাকে গ্রহণ করতে পারেনি। তার মনে হয়েছে সে যদি ঠাকুরঝির কাছে তার ভালোবাসাকে প্রকাশ করে তাহলে তার সংসার নষ্ট হবে, ঘরে-বাইরে তার নিন্দা রটবে, ঠাকুরঝির মাথা হেঁট হয়ে যাবে, লোকে তার সম্পর্কে কুৎসিত কটু কথা বলবে। কারণ সে পরস্ত্রী। নিতাইয়ের মনে হয়েছে-

সে যদি ঠাকুরঝিকে মাথায় করিয়া দেশান্তরী হয়, তবুও লোকে বলিবে-মেয়েটা খারাপ, নিতাইয়ের সঙ্গে ঘর ছাড়িরা পলাইয়া আসিয়াছে। ঠাকুরঝি সেখানে মাথা তুলিতে পারিবে না! ...

আপন মনেই বলিল আকাশের চাঁদ তুমি আমার ঠাকুরঝি। তুমি আকাশেই থাক।[১৮]

ঠাকুরঝি তার কাছে আকাশের চাঁদ, যাকে দেখে মুগ্ধ হওয়া যায়, কিন্তু তার কাছে যাওয়া সম্ভব হয় না। ঠাকুরঝির প্রতি ভালোবাসাকে সে সমাজের চোখে কলঙ্কিত করতে চাইনি। আর তাই নিতাই তার ভালোবাসাকে কোনও বন্ধনে আবদ্ধ না করে আত্মত্যাগের পথে নিয়ে গেছে।

ঠিক একইভাবে নিতাইয়ের জীবনে এসেছে অন্য এক নারী বসন্ত। ঝুমুরদলের নর্তকী সে। সমাজের অতি নিম্নস্তর থেকে এদের উদ্ভব। আক্ষরিক কোনো শিক্ষা এদের নেই। কিন্তু সঙ্গীতব্যবসায়িনী হিসেবে একটা অদ্ভুত সংস্কৃতি এদের মধ্যে আছে। পালাগানের মধ্যে দিয়েই এরা জেনেছে বিভিন্ন পুরাণ–কাহিনি।[১৯] বিভিন্ন জায়গায় দল বেঁধে ঘুরে ঘুরে তারা গানের আসর বসায় এবং নাচ গান করে জীবিকা অর্জন করে। পাশাপাশি রাত্রির অন্ধকারে চলে বসন্ত, ললিতা, নির্মলার মতো ঝুমুর দলের নারীদের

দেহব্যবসার কাজও। নিতাই দেখেছে অন্ধকার রাত্রির সেই বীভৎসতা। মেলার আলোকোজ্জ্বল সমারোহের বিপরীতে যে অন্ধকার দিকটি সকলের অলক্ষে থেকে যায় সে সম্পর্কে লেখক বলেছেন-

সে দিকটা সহজে মানুষের চোখে পড়ে না। আলোকের বিপরীত অন্ধকারে ঢাকা সে দিক। গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা বিপরীত দিকটিতে মাটির তলায় সরীসৃপের মত মানুষের বুকের আদিম প্রবৃত্তির ভয়াবহ আত্মপ্রকাশ সেখানে।[২০]

নিতাই প্রথমে এরকম একটি দলে থাকার জন্য অনুশোচনা করেছে। আখড়ার মোহন্তকে বলেছে- কর্মও যে অতি হীন প্রভু, ঝুমুর দলে- বেশ্যাদের সঙ্গে থাকি, কবিগান করি। নীচ সংসর্গে থাকার জন্য সে অনুতাপ করেছে। মোহন্ত তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছে প্রভুর সংসারে সকলেই সমান। মোহন্ত তাকে চিন্তামনি বেশ্যা ও সাধক বিল্বমঙ্গলের কাহিনির কথা বলেন।[২১]যে কাহিনি নিতাইয়ের অবগত। ঝুমুর দল ও সেই দলের নারীদের সম্পর্কে যে দ্বিধা, যে ঘৃণা, যে হীনমন্যতা তার মনকে গ্রাস করেছিল মোহন্তের কথায় নিতাইয়ের মনের পরিবর্তন ঘটল –

নিতাই ফিরিয়া আসিল – অদ্ভুত এক মন লইয়া। ঝুমুর দলের মেয়েগুলি গান-বাজনায় নাচে সুরে তালে পারদর্শিনী বলিয়া নিতাই তাহাদের খাতির করিত, কিন্তু মনের গোপন কোণে ঘৃণাই সঞ্চিত ছিল। আজ এই মুহূর্তে সেটুকুও যেন মুছিয়া গেল। মনটা যেন তাহার জুড়াইয়া গিয়াছে। ফিরিবার পথে বার বার তাহার চোখে জল আসিল।[২২]

নিতাই আরও অবাক হয়ে গেল একথা জেনে যে, ঝুমুর দলের মেয়েরা লক্ষ্মীপুজোর ব্রত করে সারাদিন উপোস থেকে। সন্ধ্যায় তারা বিবিধ উপাচারে পরম ভক্তির সঙ্গে লক্ষ্মী পুজো করে। ঝুমুর দলের নর্তকী বসন নিতাইকে ভালোবেসে অনেকটা বদলে গেছে। নিতাইও পারেনি শেষ পর্যন্ত বসনকে ভালো না বেসে থাকতে। বসনের জীবন ও জীবিকাকে স্বীকার করে নিয়েই নিতাই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তার পাশে থেকেছে। যদিও মৃত্যু অচিরেই তার জীবন থেকে কেড়ে নিয়েছে তার প্রিয় দুই নারীকে।

‘কবি’ উপন্যাসের সমগ্র কাহিনি যাকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে সেই নিতাই ও নিতাইয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল মানুষের জীবন ও জীবিকার বহুমাত্রিক রূপের প্রতিচ্ছবিকে আমরা তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছি আমাদের আলোচনায়। এক নিতান্তই সাধারণ ডোম সন্তান তার পারিবারিক ঘৃণ্য বৃত্তিকে পরিত্যাগ করে অনায়াসে কীভাবে সমাজ ও পরিবারের বিপরীত স্রোতে হাঁটল, জীবনে কবিরূপে প্রতিষ্ঠালাভের স্বপ্ন কীভাবে তাকে অজস্র প্রতিকূলতাকে কাটিয়ে তার লক্ষ্যে পৌঁছে দিল, কীভাবে একটু একটু করে সে নিজেকে সমৃদ্ধ করে তুললো, জানলো এদেশের বিখ্যাত কবিয়ালদের কথা, পরিচিত হলো তাদের কবিগানের সঙ্গে -এই সমস্ত কিছুই উঠে এসেছে আমাদের

আলোচনায়। আমারা আলোকপাত করতে চেষ্টা করেছি কবিজীবনের পাশাপাশি নিতাইয়ের ব্যক্তিজীবনের প্রতিও। ঠাকুরঝির প্রতি ভালোবাসা তার মনকে সংকীর্ণ গণ্ডি ছেড়ে আত্মত্যাগের পথে চালিত করেছে। ঝুমুর দলের নর্তকী, দেহোপজীবিনী বসনের প্রতি সে তার প্রাথমিক দ্বিধা-দ্বন্দ্বকে কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত ভালোবেসেছে। এমনকি উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে আমরা দেখেছি নিতাই শেষ পর্যন্ত তার গ্রামে ফিরে এসেছে মাটির টানে, মাটির মানুষের টানে। নিতাই তার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে জীবন ও জীবিকার লড়াইয়ে গ্রাম ছেড়ে, পরিচিত মানুষদের ছেড়ে যত দূরেই চলে যাক না কেন শিকড়ের টানে সে পুনরায় ফিরে এসেছে।

উল্লেখপঞ্জি:

১. *মধুসূদন রচনাবলী,* গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কবিতাবলী, বঙ্গভূমির প্রতি, কলকাতা: হরফ প্রকাশনী। ১৩৪৯। পৃ. ৩৯০
২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সোনার তরী,* যেতে নাহি দিব, কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। ১৩৪৮। নূতন সংস্করণ। পৃ. ৬৩-৬৪
৩. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার। *তারাশঙ্কর: দেশ কাল সাহিত্য।* কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ। ২০১২। পৃ. ১৯৩
৪. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*। কলকাতা: মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড। ১৯৮৪। সপ্তম সংস্করণ। পৃ. ২৯৮
৫. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। *কবি*। কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৪২৬, পৃ. ৩
৬. তদেব। পৃ. ১৫-১৬
৭. তদেব। পৃ. ১৬
৮. তদেব। পৃ. ১৮
৯. তদেব।পৃ. ২০-২১
১০. তদেব। পৃ. ১৮
১১. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত।* কলকাতা: মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড। ২০০৬-২০০৭। নূতন সংস্করণ। পৃ. ২৩৬
১২. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, *কবি*। প্রাগুক্ত। পৃ. ৪
১৩. তদেব। পৃ. ৪৯
১৪. তদেব। পৃ. ৩০
১৫. তদেব। পৃ. ৬৬
১৬. তদেব। পৃ. ৭২
১৭. তদেব। পৃ. ১২৯

১৮. তদেব। পৃ. ৬০
১৯. তদেব। পৃ ৬৭
২০. তদেব। পৃ. ৯৬
২১. তদেব। পৃ. ৯৮
২২. তদেব। পৃ. ৯৮

উৎপল দত্তের নাটকে ইতিহাস বীক্ষা

কমলেশ মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ :
অর্ধশতাব্দীব্যাপী বিপ্লবী থিয়েটারের সাধনায় ব্রতী উৎপল দত্ত মনে করতেন বিশ্বের সব দেশের মতো ভারতের ইতিহাসও শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস, অনবরত রক্তক্ষয়ীযুদ্ধের ইতিহাস। যুগ যুগ ধরে শাসকের অত্যাচার ও শোষিতের প্রতিরোধের ইতিহাস। তিনি মনে করেন, ভারতবর্ষের মানুষকে জানাতে হবে তাদের প্রকৃত ইতিহাসও ঐতিহ্য, শোষিত মানুষের কাছে তুলে ধরতে হবে তাদের সংগ্রামী ঐতিহ্য। তাঁর ইতিহাস সাধনা ও অনুসন্ধান প্রায় সব নাটকেই যুগ ও কালের বিশাল প্রেক্ষাপটে স্থান পেয়েছে। ইতিহাসের অতলে ডুব দিয়ে তিনি বারে বারে তুলে এনেছেন বিশাল কোনো যুগ ও কালকে, সেই সাথে পাঠক ও দর্শককে নিয়ে গেছেন সেই যুগ ও কালের সংঘাতে, সংঘর্ষে ও সত্য উপলব্ধিতে। ইতিহাস থেকে বিদ্রোহের কাহিনী নিয়ে নাটক করার প্রবণতা ও গণমানসে তার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির তাগিদ বরাবরই উৎপল দত্তের অন্তরাত্মায় জাগ্রত। ইতিহাসের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার ওপর ভর করে বর্তমানকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সংকল্প উৎপল দত্তের ইতিহাস চেতনাকে আরও মহিয়ান ও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছিল। তিনি আজীবন বিশ্বাস করেছেন ইতিহাস মানুষের শ্রেষ্ট সংকল্প, শ্রেষ্ট সাধনাও শ্রেষ্ট স্বপ্নের ফসল। মানুষ শুধু ইতিহাসের স্রষ্টা নয় মানুষ নিজেও ইতিহাসের সৃষ্টি, এই প্রত্যয়ে বিশ্বাসী ছিলেন উৎপল দত্ত। এই প্রত্যয় তাঁর ইতিহাস বীক্ষাকে প্রাণবন্ত রেখেছিল জীবনের অন্তিম পর্যায় পর্যন্ত।

সূচক শব্দ : বিপ্লব, ইতিহাস, কমিউনিস্ট, শ্রেণিসংগ্রাম, ঐতিহ্য, রাজনীতি, শ্রমজীবী, সাম্রাজ্যবাদ, আন্দোলন, শোষণ, গণচেতনা।

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা নাট্য ধারায় উৎপল দত্ত একটি ব্যতিক্রমী, উজ্জ্বল ও বিশিষ্ট নাম। অর্ধ শতাব্দীব্যাপী নাট্যচর্চায় তাঁর অভিনিবেশ ছিল Revolutionary (বিপ্লবিক থিয়েটার) এর সাধনায়। নাট্যজীবনের শুরু থেকেই উৎপল দত্ত শোষিত-বঞ্চিত মানুষের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার লড়াইকে তাঁর নাট্যসাধনার কেন্দ্রীয় বিষয় হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। শোষিত, বঞ্চিত গণমানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার যে লড়াই এবং সেই লড়াইয়ের অগ্রপথিকেরা তাঁর নাটকের বিষয় ও চরিত্র। কেবলমাত্র নাট্যবিষয় ও চরিত্র নয়, নাট্যনির্মানের ক্ষেত্রেও তাঁর নাটক সমূহ বাংলা নাট্যজগতে

নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। তিনি সদা সর্বদা মনে-প্রাণে বিশ্বাস রাখতেন- "নাটক হবে অসংখ্য সাধারণ মানুষের জন্য, নাটক কইবে সংগ্রামের কথা।" [১] উৎপল দত্তের প্রিয় বিষয় ছিল ইতিহাস ও ইতিহাসের অনুসন্ধান। উৎপল দত্তের এই ইতিহাস সাধনা ও অনুসন্ধান প্রায় সব নাটকেই যুগ ও কালের বিশাল প্রেক্ষাপটে থেকেছে। ইতিহাসের অতলে ডুব দিয়ে উৎপল দত্ত বারে বারে তুলে এনেছেন বিশাল কোনো যুগ ও কালকে, সেই সাথে পাঠক ও দর্শককে নিয়ে গেছেন, সেই যুগ ও কালের সংঘাতে, সংঘর্ষে ও সত্য উপলব্ধিতে। ইতিহাস থেকে বিদ্রোহের কাহিনী নিয়ে নাটক করার প্রবণতা ও গণমানুষে তার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির তাগিদ উৎপল দত্ত বরাবরই অন্তরাত্মায় জাগ্রত হত। 'এপিক থিয়েটার'-এর দ্বিতীয় সংখ্যায় উৎপল দত্ত লিখেছেন-

> "ইতিহাস থেকে বিদ্রোহের কাহিনী বেছে নিয়ে নাটক করার, যাত্রা লেখার চেষ্টা বহুদিন থেকে করছি। নৌবিদ্রোহের কাহিনী, ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ, ১৯০৩-৩৪ সালের বাংলার বিপ্লবীদের বীরত্ব, জালিয়ানওয়ালাবাগের পটভূমিকা, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, আফগান মুক্তিযুদ্ধ, প্যারি কমিউন, অক্টোবর বিপ্লব, চীন বিপ্লব- যেখানে যত বিপ্লবী সবাই আমাদের নিকটাত্মীয়..... আজকের কমিউনিস্ট যোদ্ধা এক বিরাট ঐতিহ্যের বাহক....সংগ্রামের এই অবিচ্ছিন্ন ধারাকে লোক মানসে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এই বিশ্বাসে উপরোক্ত সব বিপ্লবের কাহিনীকেই নাটকে এবং যাত্রার পালায় আনার প্রয়াস পেয়েছি।"[২]

উৎপল দত্তের নাটকে ইতিহাস এই বিশ্বাসের শক্তিতেই ভাষাময় ও উদ্দেশ্যময় হয়ে উঠেছে। ইতিহাসের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং সেই শ্রদ্ধার ওপর ভর করে বর্তমানকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার যে সংকল্প তা উৎপল দত্তের ইতিহাস বীক্ষাকে আরও মহিয়ান ও তাৎপর্যময় করেছে। উৎপল দত্ত আজীবন বিশ্বাস করেছেন ইতিহাস মানুষের শ্রেষ্ঠ সংকল্প, শ্রেষ্ঠ সাধনা ও স্রষ্ট স্বপ্নের ফসল। মানুষ শুধু ইতিহাসের শ্রেষ্টা নয়, মানুষ নিজেও ইতিহাসের সৃষ্টি, এই প্রত্যয়ে বিশ্বাসী ছিলেন উৎপল দত্ত। এই প্রত্যয় তাঁর ইতিহাস বীক্ষাকে প্রানবন্ত রেখেছে জীবনের অন্তিম পর্যায় পর্যন্ত।

মানুষে মানুষে ব্যবধান ও বৈষম্যের কার্যকারণ অনুসন্ধান উৎপল দত্তের বৈপ্লবিক চেতনা ও ইতিহাস জ্ঞানকে সুগভীর ও সুতীক্ষ্ণ করেছে। উৎপল দত্ত ছিলেন ইতিহাসের এক নিরন্তর পাঠক, বিপুল ও বিচিত্র ছিল তাঁর পঠন-পাঠন। সেন্ট জেভিয়ার্সের রত্নগর্ভ গ্রন্থাগার তাঁর এই বিপুল পঠন-পাঠনের সহায়ক ছিল। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক কাহিনী ও মতামত গভীরভাবে অনুধাবন ও আত্মস্থ করেছিলেন উৎপল দত্ত। পাশাপাশি পৃথিবীর শ্রেষ্ট নাট্যকারদের রচনাগুলির সাথেও তাঁর সাম্যক

পরিচয় ঘটেছিল; শেক্সপিয়র, ব্রেখট, ওডেটস, গোর্কির মত কীংবদন্তি নাট্যকারগণের রচনায় তিনি তাঁর আকাঙ্খিত ইতিহাস ও শিল্প চেতনা খুঁজে পান। উৎপল দত্ত লিখেছিলেন—"কৈশোর থেকেই তাঁর নানা বিষয়ে পড়াশোনার ঝোঁক ছিল।" উৎপল দত্তের ইতিহাসের জ্ঞান যে কতদূর বিস্তৃত ও ব্যাপক ছিল, সেটা তাঁর ঐতিহাসিক নাটক ও বিষয় নির্বাচনেই বোঝা যায়। তাঁর প্রিয় বিষয় ছিল ইতিহাস, পৃথিবীর বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনাবলী তিনি সুক্ষ্মভাবে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন ও অনুধাবন করেছেন। অতীত ও সমকালে পৃথিবীতে এবং পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ও তার গতি প্রকৃতিকে তিনি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন ও সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণে তা উপস্থাপিত হয়েছে শিল্প-সৃষ্টির মধ্য দিয়ে পাঠকের দরবারে।

বিশ্বের সব দেশের মতো ভারতের ইতিহাস ও শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস, অনবরত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ইতিহাস, যুগ যুগ ধরে শাসকের অত্যাচার ও শোষিতের প্রতিরোধের ইতিহাস। উৎপল দত্ত মনে করেন, ভারতবর্ষের মানুষকে জানাতে হবে তাদের প্রকৃত ইতিহাস ঐতিহ্য। শোষিত মানুষের কাছে তুলে ধরতে হবে তাদের সংগ্রামী ঐতিহ্য। উৎপল দত্ত লক্ষ্য করেন, ভারতবাসীর প্রকৃত ইতিহাসকে ভুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে শাসক শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রচিত বিকৃত ইতিহাস পাঠের মধ্য দিয়ে। ভারতের স্বাধীনতা এসেছে শান্তিপূর্ণ পথে, এই তত্ত্বের স্পষ্ট বিরোধিতা করেন উৎপল দত্ত। তিনি তাঁর 'জপেন দা জপেন যা' প্রবন্ধে লিখেছেন

> "কটা দল নাটকের মাধ্যমে ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র যুদ্ধের ঘটনাগুলো তুলে ধরছে? সময় এসেছে এ প্রদেশের প্রতি কোনায় সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধের কাহিনী পৌঁছে দেওয়ার, সেই সিরাজ, মীরকাশেম, মজনু শা থেকে ডিরোজিও, তিতুমীর, সিধু-কানু, মেঘাই সর্দার, কুঁয়র সিং, ঝাঁসির রানী, আজিমুল্লা, নানাসাহেবের পথ ধরে, ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, সূর্য সেন, গণেশ ঘোষ হয়ে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার নতুন ধরনের বিপ্লবীদের কথা পর্যন্ত। সুভাষ, আই এন এ, নৌবিদ্রোহ, তেলেঙ্গানা, চটকল আর সূতাকলের শ্রমিকদের সংগ্রাম--- এসব হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমাদের পূর্বসূরীদের প্রচন্ড আপোসহীন লড়াইয়ের একটি অধ্যায়।" [৪]

ভারতের শাসক শ্রেণি প্রচার করে "ভারতের ইতিহাস চিরদিন শান্তিপূর্ণ শ্রেণি সহযোগিতার ইতিহাস" এই কথার মধ্যে উৎপল দত্ত এক বিরাট মিথ্যা ও চাটুকারিতা আবিষ্কার করেন। স্বাধীনতা যুদ্ধে জনগণ যে বারবার সশস্ত্র অভ্যুত্থান করেছেন, অসংখ্য মানুষ আত্মবলিদান দিয়েছেন সেসব নজির ইতিহাস থেকে বেমালুম ছাটাই করা হচ্ছে শাসক শ্রেণির পক্ষ থেকে। ঐতিহাসিক সেই সত্যতা বজায় রাখার জন্য ঐতিহাসিক

ঘটনাবলিকে নিয়ে তিনি তাঁর শিল্পকর্মে নিপুনভাবে তুলে ধরার প্রচেষ্টা করেছেন। দীর্ঘ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের প্রায় প্রতিটি অধ্যাকেই তিনি তাঁর শিল্পকর্মে তুলে ধরেছিলেন, কেন না তিনি মনে করতেন- "সশস্ত্র বিদ্রোহের দীর্ঘ ঐতিহ্যটাকে রক্ষা করতে হবে। কারন আগামী বিপ্লবটা তারই ফলশ্রুতি, উত্তরাধিকারী'।"[৫]

উৎপল দত্ত তাঁর বিপ্লবী নাটক বিকাশের দুটি স্বতন্ত্র অভিমুখ নির্দিষ্ট করে নিয়েছিলেন। তাঁর লেখা নাটকগুলির দুটি সুস্পষ্ট ভাগ পরিলক্ষিত, একদিকে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্প্রতিক ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে লেখা নাটক। অপরদিকে থাকবে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ের উত্তালকারী নানাবিধ ঘটনাবলি, যা সমগ্র বিশ্বে আলোড়িত এবং সমকালীন আন্তর্জাতিক রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কেন্দ্রিক রচিত নাটক। অর্থাৎ সহজভাবে বলা যায় তাঁর নাটক লেখা হয়েছে দুটি সুস্পষ্ট প্রেক্ষিত নির্ভর করে—একটি জাতীয়; অপরটি হল আন্তর্জাতিক।

ভারতবর্ষকে কেন্দ্র করে লেখা নাটকগুলির মধ্যে যে কালপর্ব নির্ধারিত হয়েছে তা শুরু হয়েছে গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের (সূর্যশিকার) সময়কাল থেকে। উৎপল দত্তের এই ইতিহাসবীক্ষা বিস্তারলাভ করেছে বিশ শতকের নব্বইয়ের দশকের সাম্প্রদায়িক অশান্তির (জনতার আফিস) সময় পর্যন্ত। এই সুদীর্ঘ বিস্তৃত সময়ে ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক বিভিন্ন সংগ্রাম, ঐতিহাসিক বিবর্তন, সেই সাথে সাথে রাজনৈতিক-সামাজিক অবস্থার বিবর্তন উৎপল দত্ত সুণিপুনভাবে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর শিল্পকর্মে। শ্রেণি সংঘর্ষের বিভিন্ন পর্যায় ও তার ঐতিহাসিক ঘটনাবৃত্তান্তের অন্তরঙ্গ, বহিরঙ্গ রূপান্তরগুলির তিনি বিচার বিশ্লেষণ করেছেন শ্রেণি সংগ্রামের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। তাঁর জাতীয় ইতিহাসকে কেন্দ্র করে লেখা নাটকগুলির সিংহভাগ জুড়ে আছে জাতীয় সংগ্রাম অর্থাৎ সশস্ত্র বিপ্লবী সংগ্রাম- 'ফেরারী ফৌজ', 'কল্লোল', 'মহাবিদ্রোহ', 'তিতুমীর' প্রভৃতি। সশস্ত্র বিপ্লবের বিভিন্ন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে উৎপল দত্ত সুনিপুণভাবে উজ্জ্বল করে তুলেছেন তাঁর রচনায় ও প্রযোজনায়। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন-

"It will be our task to show that the country belongs to the working masses and not the bourgeois, and that the proletariat is the true patriot. It is he who has always done the real fighting; it is he who has been shot at the barricade, he paid the puritive fine, he was whipped at crossroads, his house was burnt, his womenfolk were violated and the congress leader meanwhile sat sipping the

Englishman's wine (or a glass of goat's milk) talking compromise with him."[৬]

জাতীয় ইতিহাস বা জাতীয় সংগ্রাম-ই শুধু নয়, উৎপল দত্ত আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনাবলী, রাজনৈতিক সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন অন্তরঙ্গ, সুনিপুণ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন ও তাঁর শিল্প কর্মের উপস্থাপন করেছেন। তিনি শুধুমাত্র ভারতবর্ষের শ্রেণি সংগ্রামের বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনাবলি নয়, তিনি আন্তর্জাতিক ভাবনারও শরিক ছিলেন। তিনি যে আন্তর্জাতিক ভাবনার শরিক ছিলেন তা তাঁর আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতের ওপর লেখা নাটকগুলি দেখলে সহজেই অনুমেয়। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনাবলী, যা বিশ্ব ইতিহাসের পটপরিবর্তনে সমর্থ হয়েছিল ও সমস্ত পৃথিবীব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল উৎপল দত্ত সেগুলো নিপুণভাবে অন্তরঙ্গ দৃষ্টির সঙ্গে বিচার বিশ্লেষণ করে তাঁর নাট্যকর্মে উপস্থাপন করেছেন। এ প্রসঙ্গে উৎপল দত্ত বলেছেন—

> "I have also sought to bring, though my powers are woefully limited to bring the history of the proletarian armed struggle of other countries into our theatre।"[৭]

উৎপল দত্তের আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনাবলী অবলম্বনে লিখিত নাটকগুলির মধ্যে হল—'ব্যারিকেড', 'অজেয় ভিয়েতনাম', 'মানুষের অধিকারে', 'লেনিনের ডাক', 'লেনিন কোথায়?', 'স্তালিন (১৯৩৪), 'নীল-সাদা-লাল', 'ক্রুশ বিদ্ধ কুবা' ইত্যাদি।

উৎপল দত্তের নাটকে ইতিহাস চেতনার মোড়কে সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণির পাশে দাঁড়িয়েছেন বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। শোষক শ্রেণি দ্বারা শ্রমজীবি মানুষের অত্যাচার এক চিরন্তণ সত্য। ভারতবর্ষের ইতিহাসের পর্যালোচনা সাথে বিশ্ব ইতিহাসের অনুবীক্ষার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের শ্রমজীবি মানুষের সংগ্রাম যে সারা পৃথিবীর সর্বহারা সংগ্রামেরই অংশ এই ছবিটাই উৎপল দত্ত সুকৌশলে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন এদেশে সর্বহারা শ্রমজীবি মানুষের কাছে। যাতে তারা উপলব্ধি করে যে তারা বিচ্ছিন্ন নয় তাদের দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা কোনটিই বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, নাটকের মধ্য দিয়ে উৎপল দত্ত ভারতবর্ষের সর্বহারা মানুষকে সেই বার্তা দিতে চেয়েছেন। তিনি নাটকের মধ্য দিয়ে এদেশের নিরক্ষর, শ্রমজীবি মানুষের কাছে বারংবার আন্তর্জাতিক শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস পৌঁছে দেওয়ার প্রচেষ্টায় তৎপর ছিলেন। যার গভীরে আছে উৎপল দত্তের এক বৃহৎ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে তিনি বলেছেন- "The object has been precisely to show that the proletariat of all countries is fighting the same battle, and the communist, for that reason, is the motive force of

world-revolution. He inherits a world-tradition and is, there-fore, even when persecuted and imprisoned in my country, infinitely stronger than the fear crazed Indian ruling class. He is future of the world."[৮]

উৎপল দত্ত তাঁর নাটকে ইতিহাসকে এনেছিলেন এক বিশাল জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজতে। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের পতন, যুগ-যুগান্তর ধরে চলা শোষক শ্রেণি দ্বারা শোষিত শ্রেণির অত্যাচারের কাহিনি ইতিহাসের পঠন ভূমি থেকে কখনও বিচ্ছিন্ন করে দেখেননি। দুর্বল মানুষের ওপর সবল মানুষের নগ্ন চেহারা আবিষ্কার করেছেন তিনি। তিনি শুধু ইতিহাসকে সন্ধান করেননি, পৃথিবীর মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন নির্লজ্জ কলঙ্কময় প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকার থেকে ইতিহাসকে মুক্ত করার জন্য। মানুষকে তিনি দিয়েছেন ঘৃণা আর ক্রোধ, এই ঘৃণা আর ক্রোধ ছাড়া মানবতা মুক্ত হবে না। মুক্ত হবে না ইতিহাস কালা অধ্যায়ের নাগপাশ থেকে। উৎপল দত্ত এখানে স্বতন্ত্র যে তিনি শুধুমাত্র সত্যকে আবিষ্কার করেননি, শাসক শ্রেণির দ্বারা প্রচারিত ইতিহাস থেকে মুক্ত করার তৃষ্ণাও তিনি জাগিয়েছেন। শুধু ভারতবর্ষ কেন বিশ্ব বলয়ও এমন ব্যাপ্তি নিয়ে সত্যকে আপন করার তীব্র বাসনা ও আকাঙ্খা নিয়ে ক'জন নাট্যকার ইতিহাসকে নাটকে আনতে পেরেছেন, তা বলা শক্ত। দীনবন্ধু, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শেক্সপিয়ার, ইফসেন, গোর্কি, ব্রেখট এদের বিশাল ঐতিহ্যকে আত্মস্থ করে সৃষ্টি করেছেন ইতিহাসকে কেন্দ্র করে নাটক রচনার নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। এই বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির উপরেই দাঁড়িয়ে আছে উৎপল দত্তের ইতিহাস চেতনা।

উৎপল দত্তের ইতিহাস চেতনার অনন্য ফসল ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৮-ই ফেব্রুয়ারির নৌবিদ্রোহ, যা 'কল্লোল' নাটকের পটভূমি। উৎপল দত্তের তুফান তোলা নাটক 'কল্লোল' নাটকে ইতিহাসের ভিতরের ইতিহাসে পাঠককে নিয়ে গিয়েছেন। যে ইতিহাস মিথ্যার অন্ধকার থেকে মুক্ত করেছে সত্যকে, উন্মোচিত হয়েছে শাসকবর্গের মুখোশ। উৎপল দত্তের ইতিহাস-সন্ধান সেই অশেষ সত্যে পাঠককে নিয়ে গেছে, যেখানে কীভাবে অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে একটি আন্দোলন বিস্তৃতি পেয়েছিল। বিপ্লবী সার্দুল সিং-এর নেতৃত্বে খাইবার জাহাজে বিদ্রোহী নাবিকদের সব দাবি এসে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল স্বাধীনতার দাবিতে। উৎপল দত্ত সার্দুল সিং-দের সাহস ও শৌর্যে ভরা যুদ্ধকে ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায় হিসাবে তুলে ধরলেন তাঁর শিল্পকলায়। সেদিন ভারতের জাতীয় কংগ্রেস কীভাবে নৌ-বিদ্রোহীদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, ইতিহাসের সেই কালো অধ্যায়কে উৎপল দত্ত অসাধারণ তুলির ছোঁয়ায় অঙ্কণ করলেন। মুখোশ

খুলে দিলেন কিছু স্বার্থপর লোভী ও ক্ষমতা-লোভী বর্বরদের। ‘কল্লোল’ নাটক সম্পর্কে উৎপল দত্ত তাঁর ‘লিটল্ থিয়েটার ও আমি’ প্রবন্ধে বলেছেন—

> “‘কল্লোল’ নাটক স্বাধীনতা সংগ্রামে নাবিক ও মজদুরদের বীরত্ব গাথাই শুধু বলেনি, বলেছিল কংগ্রেসি বেইমানদের দেশদ্রোহিতার কথা। অহিংস সত্যাগ্রহ যে আসলে সাম্রাজ্যবাদের দালালি, অস্ত্র ছাড়া যে জয় নেই, এ কথাও বলার প্রয়াস হয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টির অতীত যে গৌরবময়, দেশপ্রেমিক সংগ্রামে যে ছিল প্রথম সারিতে, এ কথা সজোরে বারবার বলার দরকার আছে। শাসকশ্রেণির কুৎসা চিরদিন পার্টির তথাকথিত দেশদ্রোহিতার বিশ্লেষনেই মূঢ়ভাবে সীমাবদ্ধ। নানা নাটক মারফত ইতিহাসের নানা ঘটনা তুলে ধরে কমিউনিস্ট পার্টির ত্যাগ ও আপসহীন লড়াইয়ের কথা তুলে ধরতে হবে।”[৯]

সার্দুল সিং-এর অদম্য জেদ, বিদ্রোহ চালিয়ে যাওয়ার মানসিকতা ও অস্ত্র পরিত্যাগ না করার সংকল্পকে দমিত করতে না পেরে কংগ্রেস নেতাদের সহায়তায় ব্রিটিশরা এক ধূর্ত কৌশলের আশ্রয় নেয়। নৌসেনাদের সঙ্গে আলোচনায় কংগ্রেসের তরফ থেকে গ্যারান্টি দিয়ে বলা হয়েছিল তাদের গায়ে কেউ হাত দেবে না, কিন্তু সেই গ্যারান্টি তো দূরের কথা, তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদেরকে গ্রেপ্তার করানো হয়েছিল—

“রাজ।। র‍্যাটট্রের সঙ্গে আলোচনায় আমরা যাবো। ওঁরই বাংলোয়। তবে গ্যারান্টি চাই আমাদের গায়ে হাত দেওয়া হবে না।

মগন।। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস গ্যারান্টি।

রাজ।। সাকসেনাজী গ্যারান্টি দিন।

সাক।। কংগ্রেস নিজে দিচ্ছে, সেখানে—

রাজ।। কংগ্রেসের চেয়ে আপনি আমাদের ঢের বেশি কাছের লোক।

সাকসেনা।। বেশ, গ্যারান্টি দিচ্ছি—আপনাদের গায়ে হাত দেওয়া হবে না।”[১০]

গ্রেপ্তার না করার প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও ব্যাটট্রের বাংলোয় যখন আলোচনার জন্য খাইবারের নাবিকেরা উপস্থিত হয় তখন তাদের কিছু বুঝে ওঠার আগেই সশস্ত্র ব্রিটিশ ফৌজ তাদের ঘিরে ফেলে, গ্রেপ্তার করে ও জেলে পাঠায়, সমস্ত গ্যারান্টি নিমেশে হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। উৎপল দত্ত কংগ্রেস সরকারের বিশ্বাসঘাতকতা ও ইতিহাসের সেই কালো যবণিকা আলোচ্য নাটকে অতি নিপুনভাবে উন্মোচন করেছেন।

উৎপল দত্তের ইতিহাসে ডুব দিয়ে সত্যকে তুলে আনার প্রচেষ্টা নিরন্তর। ‘মানুষের অধিকারে’ নাটকে কালো মানুষদের প্রতি সাদা মানুষের অত্যাচার সারা পৃথিবী

জুড়ে এক অনিবার্য ও চিরন্তন সত্য। এই অত্যাচারের প্রতিবাদে সারা দুনিয়া যখন সরব তখন তিনি আলোচ্য নাটকটি রচনা করলেন। দেশে দেশে, কালে কালে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের প্রতি শ্বেতাঙ্গ মানুষের অন্যায় অত্যাচার ও শোষণ, ঘৃণা ইতিহাসের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে। উৎপল দত্ত ইতিহাসের পাতা থেকে সেরকমই একটি ঘটনাকে তুলে আনলেন—

> "লিবো।। মাননীয় মিস্টার ক্যালাহ্যান ঐ "নিগার" শব্দটি যেন এটর্ণি-জেনারেল আর ব্যবহার না করেন। এই হুকুম দিন।
>
> ক্যালা।। কেন?
>
> লিবো।। কথাটা ঘৃণ্য জঘন্য গালাগাল।
>
> ক্যালা।। মিস্টার লিবোভিট্ স, দক্ষিণে কথাটি দৈনন্দিন ব্যবহার হয়। গালাগালি নয়।
>
> লিবো।। দৈনন্দিন কেন, প্রতি সেকেন্ডে ব্যবহার হলেও ওটা গালাগাল। অভিধানে ওটাকে গালাগাল বলা হয়েছে, দেখতে পারেন।
>
> ক্যালা।। অভিধান জানি না, এলাবামায় কথাটির কোনো অবজ্ঞাসূচক অর্থ নেই। ওকথা নিষিদ্ধ করা যায় না। যার যেমন অভিরুচি বলতে পারেন।"[১১]

উৎপল দত্ত কালো মানুষের উপর সাদা মানুষের অবিচারের পটভূমিতে শোষণের নগ্ন চেহারা আবিষ্কার করেছেন। তিনি শুধু ইতিহাসকেই সন্ধান করেননি, সেই সাথে সাথে পৃথিবীর মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকার থেকে ইতিহাসকে মুক্ত করার। তিনি ইতিহাসকে মুক্ত করেছেন মিথ্যার অন্ধকার জগৎ থেকে, কালো অধ্যায়ের নাগপাশ থেকে।

'অজেয় ভিয়েতনাম' নাটকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে বিয়েতনামের মানুষের যে রক্তক্ষয়ী মুক্তি সংগ্রাম চলেছিল, ভিয়েতনামের উপর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের যে নৃশংস আক্রমণ ও ভিয়েতনামবাসীদের প্রবল প্রতিরোধ ও আন্দোলন, যা সারা বিশ্বকে বা বিশ্বের রাজনীতিকে তোলপাড় করে তুলেছিল। তার প্রতিলিপি সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে উৎপল দত্তের লেখনীতে। পৃথিবীর সমস্ত বিবেকবান মানুষ ভিয়েতনামের মানুষের দুঃসাহসিক প্রতিবাদ প্রতিরোধকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। এই উত্তাল পরিস্থিতিতে উৎপল দত্তের লেখনীও থেমে থাকেনি। তিনি এগিয়ে এলেন তাঁর নাটক নিয়ে বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদের শরিক হয়ে। তাঁর নাটকের মধ্যেই এই জঘন্য ঐতিহাসিক ঘটনা বৃত্তান্তকে ফুটিয়ে তুললেন প্রতিবাদের ভাষা হিসাবে। 'অজেয় ভিয়েতনাম' নাটকের ইতিহাস বীক্ষায় উৎপল দত্ত গভীর অনুসন্ধানে দেখিয়েছেন ভিয়েতনামবাসীদের উপরে মার্কিন সেনানীদের অকথ্য অত্যাচারের দৃশ্য। সাম্রাজ্যবাদী

শক্তি লোভ-লালসা ও তাদের কর্তৃত্ব কায়েম করার জন্য বীভৎস অত্যাচার তিনি আলোচ্য নাটকে প্রস্ফুটিত করেছেন—

> “প্রথম— ছুরি, একটু একটু ক’রে ঢুকিয়ে। দ্বিতীয়— কাঁটাতারের ফাঁস, গলায় পরিয়ে চাপ। তৃতীয়— বন্দুকের কুঁদো দিয়ে হাতের আঙুল ছেঁচে দয়া। চতুর্থ—
>
> ফিনি।। কোনো লাভ হয় না, স্যার, বিয়েনহোয়াতে আমরা সঙীন্, গরম ক’রে সারা গায়ে ছেঁকা দিয়েছি, তবু কেউ কিছু বলে নি।
>
> জেনারেল।। বলার ওপর অত জোর দিচ্ছেন কেন, কর্ণেল, আমরা তো জানি বলবে না। তবু যন্ত্রণা দিতে হবে। টর্চার থেকে গবেষণার আনন্দ যদি না পান, হলদে উলঙ্গ দেহগুলোকে ছটফট করতে দেখে যদি একটা বৈজ্ঞানিক শিহরণ না জাগে শিরদাঁড়ায়, তবে বুঝবেন ভিয়েৎনামে লড়বার মতন স্নায়ু তৈরি করা হয় নি এখনো— এক্ষুনি বদলির আবেদন করুন। চতুর্থ- চোখের সামনে ফ্লেম- থ্রোয়ারের ফিউম ছেড়ে চোখ গলিয়ে দেয়া। পঞ্চম থেকে একাদশ— মনস্তাত্ত্বিক চাপসৃষ্টি, যথা মায়ের সামনে ছেলেকে, স্বামীর সামনে স্ত্রীকে, বা অন্যান্য আত্মীয়ের সামনে আত্মীয়কে নির্যাতন।
>
> নাইট।। প্লেই মে- তে একটা মেয়েকে স্বামীর সামনে ধর্ষণ করিয়েছিলাম।”[১২]

‘সূর্য শিকার’ নাটকে উৎপল দত্ত সুগভীর জিজ্ঞাসা এবং সত্যের আয়োজনে নিয়ে গেছেন পাঠকবর্গকে। বর্তমানে প্রচলিত ইতিহাস গুপ্ত যুগকে স্বর্ণযুগ আখ্যা দিয়েছে। উৎপল দত্তের গবেষণা স্বর্ণযুগের মুখোশকে উন্মোচন করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন ইতিহাসের এক বিরাট মিথ্যা। শাসকদের অনুগ্রহে রচিত তথাকথিত ইতিহাস আড়াল করেছে দাস ব্যবস্থার ভিতের উপর দাঁড়িয়ে থাকা ইতিহাসের এক অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগকে। উৎপল দত্তের গভীর গবেষণা ইতিহাসের সেই অনালোকিত সত্যকে উদ্ঘাটন করেছে। তিনি ইতিহাসের অতলে ডুব দিয়ে ডুবুরির মত তুলে এনেছেন ঐতিহাসিক চরম সত্যকে। ‘সূর্যশিকার’ নাটকে উৎপল দত্তের সদয় স্বদেশ চেতনার স্বরূপ পরিলক্ষিত। বিদেশের সব ভালো, সব কিছুই শ্রেষ্ট ও অনুকরণ যোগ্য— এই দাস মনোবৃত্তের উপর উৎপল দত্তের ক্ষমাহীন প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে আলোচ্য নাটকে। শাসকদের সাজানো ইতিহাস বারবারই বঞ্চিত করেছে ভারতবর্ষকে, ভারতবর্ষের সংগ্রামকে, ভারতবর্ষের ঐতিহ্যকে। উৎপল দত্তের লেখনী তার বিরুদ্ধেই

গর্জে উঠেছে। ‘সূর্য শিকার’ নাটকের ইতিহাস বীক্ষা ভারতবর্ষের মতো বিশ্বের নাট্যসাহিত্যেও অনন্য নজির সৃষ্টি করেছে।

উৎপল দত্ত ইতিহাসের ভিতরের ইতিহাসে পাঠককে অবগাহন করিয়েছেন অত্যন্ত মুন্সিয়ানার সাথে। সেই ঐতিহাসিক সত্যে তিনি উপনীত হয়েছেন যেখানে সাধারণ মানুষ প্রকৃত মানবিক আন্দোলন ইতিহাসকে এগিয়ে নিয়ে যায়। ‘একলা চলো রে’ নাটকের ইতিহাস বীক্ষায় এই অমোঘ সত্য পরিলক্ষিত হয়। নাটকটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কিছু লোভী, চক্রান্তকারী, স্বার্থসর্বস্ব মানুষের লোভানলে দেশ বিভাগের মত কলঙ্কিত অধ্যায়ের সম্মুখীন হতে হয়েছে ভারতবাসীকে, সেই সাথে সাথে জাতির জনক মহাত্মাগান্ধিকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছিল তাদের লোভের আগুনে। গান্ধি হত্যার মধ্যে দিয়ে উৎপল দত্ত নাটকের পূর্ণচ্ছেদ টানেননি। সেই উত্তাল বিক্ষুব্ধ সময়ে জনজাগরণের রূপ কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সমাজ সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লড়াই এবং কংগ্রেস সরকারের কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণার ঝড় তোলার মধ্য দিয়ে নাটকের পরিসমাপ্তি---

> “ডক্টর রয়, জবাহর। দেরি করবেন না, পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনি করুন।..... শুধু হঠকারী লাইন নিয়েছে বলে নয়, তারা বলেছে এ স্বাধীনতা ঝুটো স্বাধীনতা। যারাই ১৯৪৭-এর আগষ্ট মাসের সিদ্ধান্তগুলোকে চ্যালেঞ্জ করবে, তাদের কণ্ঠরোধ করতে হবে নির্দয়ভাবে।.... পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টিকে অবিলম্বে নিষিদ্ধ ঘোষণা করুন। পশ্চিমবঙ্গ চিন্তার ক্ষেত্রে সারা ভারতের পথপ্রদর্শক, পশ্চিমবঙ্গের গলা টিপে না ধরলে আগামীকাল সারা ভারত ঐ কথাই বলবে।”[১৩]

পাঠকের মনেও ঝড় এনে দেন তিনি, এই ঝড় এনে দেওয়া, গভীর জিজ্ঞাসার মধ্যে পাঠককে ঠেলে দেওয়া জনগণের শিল্পী উৎপল দত্তের ইতিহাস চেতনার মূল কথা। ইতিহাসের চালক যে, জনসাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ—এই স্থির বিশ্বাসও পাঠকের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

উৎপল দত্ত তাঁর নাটকে বারে বারে ভারত ইতিহাসের নানা পর্বকে তুলে ধরেছিলেন। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে এ বিষয়ে উৎপল দত্তকে প্রশ্ন করা হয়েছিল—“অতীত ইতিহাসের একটা period নেওয়া এবং সেটাকে closely project করা”—এটা আপনাকে বারে বারে আকর্ষণ করে কেন? উৎপল জবাবে বলেছিলেন—

> "মার্কসবাদী দৃষ্টিতে ইতিহাসকে না দেখলে মার্কসবাদী দৃষ্টিতে বর্তমানকেও দেখা যায় না। এটা আমরা বিশ্বাস করি, এবং নাটকের একটা অন্যতম প্রধান কাজ হচ্ছে অতীতকে সঠিকভাবে মার্কসবাদী আলোকে তুলে ধরা। কেননা, আগের সমস্ত বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানেরই ঐতিহ্য বহন করছে আজকের কমিউনিস্টরা। কমিউনিস্টরা কোনও ভুঁইফোড় শক্তি নয়। তারা পৃথিবীতে যত বিপ্লব এর আগে হয়ে গেছে, অভ্যুত্থান যত ঘটে গেছে – সে সমস্ত ঐতিহ্যের তারা হচ্ছে উত্তরসূরী।"[১৪]

উৎপল দত্ত ভারতবাসীর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামের ইতিহাসকে মার্কসবাদী আলোকে বিচার করেছিলেন। তাঁর এই কাজের মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় জনগণের বৈপ্লবিক ঐতিহ্যের সঙ্গে কমিউনিস্টদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের অন্তর্নিহিত যোগসূত্রটাকে উন্মোচন করা। আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল যে—কংগ্রেস প্রচার করত ভারতের স্বাধীনতা এসেছে কংগ্রেসের অহিংস আন্দোলনের ফলে এবং কংগ্রেস ভারতবর্ষকে স্বাধীন করেছে। উৎপল দত্ত এটাকে ডাহা মিথ্যা বলে মনে করতেন, এই মিথ্যাটাকে ভাঙতে চেয়েছেন। এবং ভাঙা একটা মস্ত বড় Cultural Revolution-এর কাজ। তিনি সেটাই চেষ্টা করেছেন তাঁর নাটকের মধ্য দিয়ে।

উৎস নির্দেশ:

১. উৎপল দত্ত, 'আমার রাজনীতি আমার থিয়েটার', কলকাতা, ২০০৫, পৃ.২৩
২. নৃপেন সাহা (সম্পা), 'উৎপল দত্ত এক সামগ্রিক অবলোকন', উৎপল দত্ত নাট্যোৎসব ২০০৫ কমিটি, কলকাতা, ২০০৫, পৃ.২৬৯
৩. উৎপল দত্ত: 'লিটল থিয়েটার ও আমি', 'এপিক থিয়েটার', মার্চ ১৯৯৪, পৃ.৪৬
৪. উৎপল দত্ত, 'শিকড়', 'জপেন দা জপেন যা', উৎপল দত্তের, গদ্য সংগ্রহ, প্রথম খন্ড, সম্পা: শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, জুলাই ২০১৫, পৃ.১৮৫
৫. তদেব, পৃ.১৮৩
৬. Utpal Dutta, "Political Theatre", "Towards Revolutionary Theatre', M.C. Sarkar & Sons Pvt. Ltd., 1995, Pg-62
৭. তদেব, Pg-63
৮. তদেব, Pg-63
৯. উৎপল দত্ত, 'লিটল থিয়েটার ও আমি', 'উৎপল দত্ত এক সামগ্রিক অবলোকন', পৃ. ৪৫৬-৪৫৭

১০. উৎপল দত্ত, ‘উৎপল দত্ত নাটক সমগ্র’ (২য় খন্ড), শোভা সেন ও সৌভিক রায়চৌধুরী (সম্পা), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, মে, ২০১৮, (৫ম মুদ্রণ), পৃ.৩০০
১১. তদেব, পৃ. ৯৪
১২. উৎপল দত্ত, ‘উৎপল দত্ত নাটক সমগ্র’ (৩য় খন্ড), শোভা সেন ও সৌভিক রায়চৌধুরী (সম্পা), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, চৈত্র ১৪২০ (৩য় মুদ্রণ), পৃ. ১৬৭
১৩. উৎপল দত্ত, ‘উৎপল দত্ত নাটক সমগ্র’ (৭ম খন্ড), শোভা সেন ও বিষ্ণুপ্রিয়া দত্ত, সৌভিক রায়চৌধুরী (সম্পা), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৌষ ১৪২৫ (৩য় মুদ্রণ), পৃ.-৪৩৩
১৪. উৎপল দত্ত, ‘‘শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে সাক্ষাৎকার’’, ‘শূদ্রক’, শরৎ ১৪০০, পৃ.১৪৫

বর্তমান ভারতীয় সমাজ ও বাল্মীকিরামায়ণ

হরিপদ মহাপাত্র
অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ
সাঁকরাইল অনিল বিশ্বাস স্মৃতি মহাবিদ্যালয়

সংক্ষিপ্তসারঃ আদি কবি বাল্মিকী আদি কাব্য রামায়ণ ভারতবর্ষে রমনীয় সম্পদ এবং ভারতীয়দের পরম শ্রদ্ধার বস্তু। রামায়ণ শুধু ভারতবর্ষের জাতীয় মহাকাব্য নয়, আদি কবির আদি কাব্য রূপে ও তা প্রসিদ্ধ।রামায়ণে প্রতিফলিত হয়েছে ভারতবর্ষের জীবনাদর্শ ও হৃদয়াবেগ। ধনীর প্রাসাদ থেকে দরিদ্রের পর্ণ কুটির পর্যন্ত এই মহাকাব্য আজও পরম শ্রদ্ধায় সমাদৃত। এই বিশালায়তন মহাকাব্য টি যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষের সমাজ ধর্ম ও সাহিত্যে যে প্রভাব বিস্তার করে আসছে তা তুলনাহীন। আবহমান কাল ধরে প্রতিটি ভারতবাসী রামায়ণের অমৃত নিষ্যন্দীকথাশ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রবন করে আসছে। ভারতবাসীর চিন্তায় ও সাহিত্যে রামায়ণ যুগে যুগে এই এমনই অমৃত প্রভাব বিস্তার করেছে যে, পৃথিবীর অন্য কোন মহাকাব্য অন্য কোন জাতির সমাজ ও সাহিত্যকে এতখানি প্রভাবিত করতে পারেনি।ভারতীয় সমাজ ও সাহিত্যে বাল্মীকি রামায়ণ যুগে যুগে যে অমৃত প্রভাব বিস্তার করেছে তা-ই আমার আলোচনার মুখ্য বিষয়।

সূচকশব্দঃ বাল্মীকি রামায়ণ;মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং; ভারতীয় সমাজ ; রামচরিত মানস; রঘুবংশ

মুখ্য আলোচনাঃ আদি কবি বাল্মীকির আদি কাব্য রামায়ণ ভারতবর্ষে রমনীয় সম্পদ এবং ভারতীয়দের পরম শ্রদ্ধার বস্তু। আদি কবি হৃদয়ের অপূর্ব মাধুরী দিয়েমহাকাব্য কে বিচিত্রতায় পূর্ণ করে তুলেছেন। ব্যাধের শরাঘাতে নিহত ক্রৌঞ্চেরবিরহেক্রৌঞ্চবধূর করুণ ক্রন্দনে ঋষি হৃদয়ের উদ্বেলিত শোক শ্লোক রূপ পরিগ্রহ করে। ঋষি কবির কণ্ঠ থেকে নিষ্ঠুর ব্যাধের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত হয় কঠোর অভিশাপ বাণী ----

"মানিষাদপ্রতিষ্ঠাংত্বমগম: শাশ্বতী: সমা:।
যৎক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধী: কামমোহিতম্।।"[১]

নিজের মুখ থেকে সহসা নির্গত এই ছন্দোবদ্ধ শ্লোকে বিস্মিত বাল্মীকি ব্রহ্মার আদেশে দেব দুর্লভ রামচন্দ্রের দেবোপম চরিতকথাকে অবলম্বন করে রামায়ণ রচনা করেন।
রামায়ণ শুধু ভারতবর্ষের জাতীয় মহাকাব্য নয়, আদি কবির আদি কাব্য রূপে ও তা প্রসিদ্ধ। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র ও গৌরবে এবং সৃষ্টির বিশালতায় এই মহাকাব্য আজও অনন্য। আদি কবি বাল্মিকী তার হৃদয়ের অপূর্ব মাধুরী দিয়ে এই মহাকাব্য রচনা করেছেন।

আদি কবি তাঁর এই কালজয়ী রচনায় আপনার কল্পনা ও অভিজ্ঞতা কেরামায়ণের চরিত্র গুলির মধ্যে সমগ্রতায় পূর্ণ করে তুলেছেন।তিনি রামায়ণের কাহিনী

ও তার সুমহৎ চরিত্রগুলিকে এমন নিবিড়তায় আমাদের প্রাণের বস্তু করে তুলেছেন যে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভারতের আপামর জনসাধারণ তাতে চির অনুপ্রাণিত হয়ে এসেছে। রামায়ণে প্রতিফলিত হয়েছে ভারতবর্ষের জীবনাদর্শ ও হৃদয়াবেগ।ধনীর প্রাসাদ থেকে দরিদ্রের পর্ণ কুটির পর্যন্ত এই মহাকাব্য আজও পরম শ্রদ্ধায় সমাদৃত।এই বিশালায়তন মহাকাব্য টি যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষের সমাজ ধর্ম ও সাহিত্যে যে প্রভাব বিস্তার করে আসছে তা তুলনাহীন। আবহমান কাল ধরে প্রতিটি ভারতবাসী রামায়ণের অমৃত নিষ্যন্দীকথাশ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রবন করে আসছে। ভারতবাসীর চিন্তায় ও সাহিত্যে রামায়ণ যুগে যুগে এই এমনই অমৃত প্রভাব বিস্তার করেছে যে, পৃথিবীর অন্য কোন মহাকাব্য অন্য কোন জাতির সমাজ ও সাহিত্যকে এতখানি প্রভাবিত করতে পারেনি। রামায়ণের এই সর্বাতিশায়ী প্রভাব সম্পর্কে অধ্যাপকWinternitzতাইযথার্থই মন্তব্য করেছেন------"it has been the property of the whole Indian people and as scarcely any other poem in the entire literature of the world has influenced the thought and poetry of a great nation for centuries."[২]
রামায়ণ একাধারে ধর্ম শাস্ত্র ও মহাকাব্য। একটি ধর্ম অর্থ কামও মোক্ষ এই চর্তুবর্গের রত্নময় আধার। মহাসমুদ্রের ন্যায় তা গভীর শ্রুতি মনোহর ও হৃদয় নন্দন।তাই আদি কবি বলেছেন-------

"কামার্থগুনসংযুক্তংধর্মার্থগুনবিস্তরম্।
সমুদ্রমিবরত্নাঢ্যংসর্বশ্রুতিমনোহরম্।।"[৩]

ভারতের সমাজ জীবন ধর্মজীবন রাষ্ট্র জীবন ও সাহিত্যে এই মহাকাব্যের প্রভাব অপরিসীম।ধর্ম বীর ও কর্তব্যনিষ্ঠ রামচন্দ্র কবি কল্পনার স্পর্শে দেবত্বের -সমুন্নত মহিমায় উন্নীত হয়েছেন।তাঁর অনন্য সাধারণ পিতৃভক্তিঅলোক সামান্য সত্যনিষ্ঠ , প্রজানুরঞ্জন প্রভৃতি সকলকেবিস্ময়ে অভিভূত করে ,ত্যাগের মাহাত্ম্য ,পৌরুষ।

সীতার সতীত্ব এবং পতিব্রত্যের মহিমা ভারতীয় রমনীর কাছে আজও অননুকরনীয় দৃষ্টান্তের উজ্জ্বল ধ্রুবতারা স্বরূপ। আজও আমরা পিতৃভক্ত সন্তানকে রামচন্দ্রের সঙ্গে, অনুগত ভ্রাতাকে লক্ষণ ও ভরতের সঙ্গে, পতিব্রতা নারীকে সীতার সঙ্গে তুলনা করে থাকি। রামায়ণে যৌথ পরিবারের যে প্রীতি মধুর সম্পর্কচিত্রিত হয়েছে তা সর্বদা অনুকরণযোগ্য। রামায়ণের প্রতিফলিত পারিবারিক চিত্র সমাজ কল্যাণে গৃহ ধর্মকে অখন্ড সৌন্দর্যের তাৎপর্য ও পবিত্রতায় মণ্ডিত করেছে।

ভারতীয় ধর্মজীবনেও রামায়ণের প্রভূতপ্রভাব অনুমিত হয়। ভারতের নরনারী পরম শ্রদ্ধার সঙ্গেরাম সীতার পবিত্র নাম জপ করে। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে বা কোন বারব্রতে ধর্মগ্রন্থ রুপেআজও রামায়ণ পঠিত হয়। দেবালয়ে বা সাধারণের মিলনস্থানে রামায়ণের কথকতা বা রামায়ণ গান আজও অবশ্য করণীয় রূপে বিবেচিত।'রামরাম'কথাটি উত্তর ভারতের লোক মাত্রই পারস্পরিক মিলন সম্ভাষনে পর্যবসিত হয়েছে। উত্তর ভারতের

মন্দিরে মন্দিরে আরাধ্য দেবতার রূপে রামচন্দ্র পূজিত হন।পরাধীনতার নাগ- পাশ থেকে মুক্ত হওয়ার পর স্বাধীন ভারতের কর্ণধারগণ রাম রাজ্যের প্রতিষ্ঠাকেই আদর্শ গণতন্ত্র বলে মনে করেছেন।রামরাজ্য বলতে রামায়ণের সেই রাজ্যের কথাই স্মৃতিপথে উদিত হয় যেখানে কল্যাণ ও আনন্দের হিল্লোল সতত অনাবিল ধারায় প্রবাহমান। 'রঘুপতি রাঘব রাজা রাম' ----- মহাত্মা গান্ধীর এই প্রার্থনা সঙ্গীতে আদর্শ প্রজানুরঞ্জক রাজার এক আবেশময়ী মূর্তি মানসপটে উদিত হয়। হনুমানের অটল প্রভু ভক্তির জন্য তিনিও মন্দিরে মন্দিরে পুজিত হন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে প্রতিবৎসর'দশেরা' উপলক্ষে রামোহোৎসব পালিত হয়।ধর্ম সাধনার ক্ষেত্রে রাম অবতার ভারতবাসীর অন্যতম উপাস্য দেবতা।ভারতীয় ধর্ম সমাজ ও সংস্কৃতির নেয় সাহিত্যের ক্ষেত্রেও রামায়ণের সুদূরপ্রসারী প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। রামায়ণ বাল্মীকির প্রতিভাদীপ্ত মৃত্যুঞ্জয়ী মহাকাব্য।এই আদি কাব্য উত্তর কালের কবিগণের প্রধান উপজীব্য ------ "পরংকবীনামাধারম্"[৪]।ভারতীয় কবিবৃন্দ রামায়ণ থেকে অজস্র উপাদান আহরণ করেছেন। নিজ নিজ প্রতিভার আলোকে রামায়ণের পুরাতন কাহিনীকে তাঁরা নতুন রূপ দিয়েছেন। রামায়ণের মধ্যে নিহিত অমৃতময় চরিত কথার অনন্ত মাধুরী সরস কাব্যশ্রী ও সৌন্দর্যের সীমাহীন ভান্ডার যুগ যুগ ধরে ভারতীয় কবিদের প্রভাবিত করে আসছে।রামায়ণ থেকে তিলে তিলে তা আহরণ করে ভারতীয় কবিরা তাদের কাব্যে নাটকেও সংগীতে সন্নিবেশ করেছেন।ভারতবর্ষের সাহিত্যে তাই রামায়নের প্রভাব বর্ণনাতীত।

প্রথীতযশানাট্যকার ভাসের 'প্রতিমা' ও 'অভিষেক' নাটকের মূল কাহিনী রামায়ণ থেকে গৃহীত।মহাকবি কালিদাসের কালাতিশায়ী মহাকাব্য 'রঘুবংশ' বস্তুত রামায়ণে বর্ণিত রঘু রাজগণের মাহাত্ম্য কীর্তন।ভবভূতির'মহাবীর চরিত' এবং উত্তর 'রামচরিত' নাটকের উপাদান রামায়ণ থেকেই সংগৃহীত।প্রথম নাটকটি রামচন্দ্রের প্রথম জীবনের ঘটনা এবং দ্বিতীয়টি রামায়ণের উত্তর কাণ্ডের ঘটনার চিত্ররূপ।

ভট্টির 'রাবণ বধ' বা 'ভট্টি কাব্য', কুমার দাসের 'জানকীহরন', মুরারীর 'অনর্ঘ রাঘব' নাটক, ক্ষেমেন্দ্রের' রামায়ণ মঞ্জরী', রাজশেখরের 'বাল রামায়ণ', জয়দেবের' প্রসন্নরাঘব', ভোজের'চম্পূ রামায়ণ'----এই সকল সাহিত্যকৃতির উপাদান ও রামায়ণ থেকেআহূত।অশ্বঘোষের'বুদ্ধচরিতে' কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম' নাটকের অভিজ্ঞানঅঙ্গুরীয়ক কল্পনায়, মেঘদূত এর দূত প্রেষনে এবং বিরহ বেদনায় রামায়ণের প্রভাব সুস্পষ্ট।'কুমার সম্ভব' মহাকাব্যের তৃতীয় সর্গের বসন্ত বর্ণনা এবং রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকান্ডের প্রথম অধ্যায়ের বসন্ত বর্ণনার মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। 'বিক্রমোর্বশীয়'-----নাটকের চতুর্থ অঙ্কে উর্বশীর বিরহেপুরূরবারমানসিক অবস্থা রামায়ণে সীতা হরণের পর বিরহী রামচন্দ্রের মানসিক অবস্থাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। বাল্মীকির রামায়ণ অবলম্বনে পরবর্তীকালে রচিত হয়েছে----অধ্যাত্ম রামায়ণ,, অদ্ভুত রামায়ণ,যোগ বশিষ্ট রামায়ণ প্রভৃতি।হেমচন্দ্রের জৈন রামায়ণের উৎস ও বাল্মীকি

রামায়ণ পরবর্তীকালের কবিরা বহু চিত্র, বহু উপমা, বহু শব্দভাণ্ডার এবং বর্ণনারীতির দিক দিয়েও অনেকাংশে বাল্মীকির কাছে ঋণী।

বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার সাহিত্যে ও রামায়ণের প্রভাব কম নয়। তামিল ভাষায় রচিত কিম্বরামায়ণ, হিন্দি ভাষায় তুলসী দাসের 'রামচরিত মানস' বিশেষ জনপ্রিয়। ভানু ভক্তের 'নেপালী রামায়ণ' নেপালীদের কাছে পরম শ্রদ্ধেয় গ্রন্থ। ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষাতেও রামায়ণের অমৃতময়ী কথা অনুদিত হয়েছে। বাঙালি কবি কৃত্তিবাস রামায়ণের অমৃতময়ী কথাকে সংস্কৃতের জটাজাল থেকে মুক্ত করে বাঙালির একান্ত নিজস্ব সামগ্রী করে তুলেছেন। কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাঙালির কাব্যরস পিপাসু হৃদয়কে রামায়ণের কাব্যসুধাদানেচরিতার্থ করেছে। পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের'সীতার বনবাস', ভবভূতি প্রণীত উত্তর রামায়ণ চরিত নাটকের গদ্যরূপ হলেও তা রামায়ণমূলক। কবি মধুসূদন দত্ত আদি কবি বাল্মীকিকে প্রণাম জানিয়ে তার 'মেঘনাদবধ' কাব্যের সূত্রপাত করেছেন----'নমি আমি কবিগুরু তব পদাম্বুজেবাল্মীকি'। এই কাব্যের উপাদান ও রামায়ণ থেকে সংগৃহীত। রবীন্দ্র মানসেও রামায়ণের প্রভাব কম নয়। তাঁর 'বাল্মীকি প্রতিভা' নামক গীতিনাট্য বস্তুত আদি কবিরউদ্দেশ্যেবিশ্বকবির শ্রদ্ধার্ঘ্যরই বাণী রূপ।রামায়ণের সুমধুর সংগীত রবীন্দ্রনাথের মনকে কতখানি প্রভাবিত করেছিল তা রবি কবির একটি উক্তিতে স্পষ্ট----'আজিওসেগীতমহাসঙ্গীতে বাজেমানবের কানে'।রামায়ণের কাহিনীকে অবলম্বন করে বাংলা ভাষায় রচিত হয়েছে অজস্র লোকযাত্রা বা যাত্রাপালা। রামায়ন রচনা কালে ব্রহ্মা বাল্মীকিকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন------

"যাবৎস্থাস্যন্তিগিরয়:সরিতশ্চমহীতলে।
তাবদরামায়নী কথা লোকষুপ্রচরিষ্যতি।।"

যতদিন পর্যন্ত পৃথিবীতে গিরি নদী থাকবে ততদিন পর্যন্ত রামায়ণের কাহিনী লোক সমাজে প্রচারিত হবে। ব্রহ্মার এই আশীর্বাদ বাণী বর্ণে বর্ণে সার্থক হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১ . রামায়ণ, বালকাণ্ড –২ ১৫/
২. Winternitz :. HIL.Vol.1,Page-418
৩. রামায়ণ ,বালকাণ্ড – ৩/৮
৪ . রামায়ণ, বালকাণ্ড-৪/২১

গ্রন্থপঞ্জি:

১. বাল্মীকি রামায়ণ বালকান্ড ডঃ শ্যামাপদ ভট্টাচার্য সংস্কৃত বুক ডিপো ২০০৩।
২. বাল্মীকিয়ম রামায়ণং , ডক্টর জয়শ্রী চট্টোপাধ্যায় সংস্কৃত বুক ডিপো ২০০৩।
৩. সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, যুধিষ্ঠির গোপ ,সংস্কৃত বুক ডিপো ২০১৭।
৪. সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, ডঃ দেব কুমার দাস, শ্রী বলরাম প্রকাশনী ১৪১৪।
৫. সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা ডক্টর বিমান চন্দ্র ভট্টাচার্য বুক ওয়ার্ল্ড ২০০৬।
৬. সংস্কৃত সাহিত্য পরিচয়, অর্ধেন্দুশেখর বাশুরি, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার ২০১৯।

হাসান আজিজুল হকের ছোটগল্পে দেশভাগ ও বিপন্ন মানুষ

আশিস কুমার সাহু
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
সাঁকরাইল অনিল বিশ্বাস স্মৃতি মহাবিদ্যালয়

সংক্ষিপ্তসার: স্বার্থান্বেষী কিছ মানুষের চক্রান্ত ও জঘন্য সংকীর্ণ স্বার্থ কায়েম করার লক্ষ্যে **১৯৪৭** খ্রীষ্টাব্দের এক মধ্যরাতে ব্রিটিশ বেনিয়ার শাসনমুক্ত স্বধীনতার নামে অখণ্ড ভারতভূমি দ্বিখণ্ডিত হয়। শুধুমাত্র সম্প্রদায়ের নামে, ধর্মের উপর ভিত্তি করে বিভাজনের রাজনীতির শিকার হয়ে লক্ষ লক্ষ হিন্দু মুসলমান ভাই বোন নিজভূমে পরবাসী হন। শুধুমাত্র ধর্মের রঙে চিহ্নিত হয়ে পালাতে হয় সাতপুরুষের ভিটে ছেড়ে এক অস্থির অন্ধকার ভবিষ্যতের পথে। দেশভাগ বাঙালির ইতিহাস-সমাজ-সংস্কৃতির উপর যে ভয়ংকর প্রভাব ফেলেছে তার বাস্তব রূপচিত্র ফুটে উঠেছে এপার বাংলা ও ওপার বাংলায় রচিত সাহিত্যের মধ্যে। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা, দেশভাগ, দেশভাগ পরবর্তী উদবাস্তু সমস্যা, দেশভাগের বিষাদময় স্মৃতি-এককথায় দেশভাগকে মূল ভাববস্তু হিসেবে ধরে বাংলা সাহিত্যে রচিত হয়েছে অজস্র ছোটোগল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা প্রভৃতি। বাংলা ছোটোগল্পের জগতে দেশভাগকে কেন্দ্র করে যাঁরা লেখনি ধরেছেন তাঁদের মধ্যে হাসান আজিজুল হক অন্যতম একজন অবিস্মরণীয় ছোটগল্পকার। হাসান আজিজুল হক নিজেই একজন উদবাস্তু মানুষ। নিজের চোখে দেখেছেন হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা, দেশভাগ, উদবাস্তুদের নিদারুণ জীবনযন্ত্রণা। তাঁর গল্পের বিষয়ভাবনা হিসেবে উঠে এসেছে দেশভাগজনিত উদবাস্তু সমস্যা, সাম্প্রদায়িক হানাহানি, নারী লুঠ, ধর্ষণ-এসবের পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, দেশত্যাগের বেদনাবহ স্মৃতিচারণ, দেশভাগ-পরবর্তী সময়ে আইডেনটিটি সমস্যা প্রভৃতি। তাঁর লেখা প্রায় বেশিরভাগ গল্পের মধ্যেই উঠে এসেছে দেশভাগের প্রসঙ্গ। তাঁর লেখা একটি উপন্যাস ‘আগুনপাখি’ এবং ছয়টি গল্প যথাক্রমে ‘উত্তর বসন্তে’, ‘আত্মজা ও একটি করবী গাছ’, ‘পরবাসী’, ‘মারী’, ‘খাঁচা’, ‘দ্বিবাস্বপ্ন’তে দেশভাগকে খুবই গুরুত্ব সহকারে চিত্রিত করেছেন। মানুষের জীবনে দেশভাগের নিদারুণ যন্ত্রণা ও তার বাস্তব রূপচিত্র হাসান আজিজুল হকের ছোটোগল্পে কতখানি প্রতিফলিত হয়েছে, তা-ই আমার আলোচনার মুখ্য বিষয়। কয়েকটি নির্বাচিত গল্পের কাহিনী বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে দেখিয়েছি মানুষের জীবনে দেশভাগের নির্মম যন্ত্রণার বাস্তব ছবি কতখানি প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর ছোটোগল্পে।

সূচক শব্দ: দেশভাগ, হাসান আজিজুল হক, উদবাস্তু, ছিন্নমূল, উত্তর বসন্তে, পরবাসী, আত্মজা ও একটি করবী গাছ।

মূল আলোচনাঃ কতিপয় স্বার্থান্বেষী মানুষের চক্রান্ত ও জঘন্য সংকীর্ণ স্বার্থ কায়েম করার লক্ষ্যে **১৯৪৭** খ্রীষ্টাব্দের এক মধ্যরাতে ব্রিটিশ বেনিয়ার শাসনমুক্ত স্বধীনতার নামে অখণ্ড ভারতভূমি দ্বিখণ্ডিত হয়। তৈরি হয় একদিকে হিন্দুস্থান তথা ভারতবর্ষ, অন্যদিকে পাকিস্তান। পাকিস্তান আবার পূর্ব ও পশ্চিম এই দুইভাগে বিভাজিত হয়। পূর্ব পাকিস্তান আবার **১৯৭১** খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম পাকিস্তানের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে বাংলাদেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ভারত তথা পৃথিবীর রাজনৈতিক মানচিত্র অনুযায়ী একই বঙ্গভুমি দুই নামে পরিচিত হয়। পূর্ববঙ্গ তথা পূর্ব পাকিস্তান তথা অধুনা বাংলাদেশ অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষের একটি অঙ্গরাজ্য। **১৯৪৭** সালে মুলত অখণ্ড ভারতবর্ষ ভাগ হয়েছিল সম্প্রদায়গত দ্বিজাতি তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে। শুধুমাত্র সম্প্রদায়ের নামে, ধর্মের উপর ভিত্তি করে বিভাজনের রাজনীতি ধর্মের রাজনীতির শিকার হয়ে লক্ষ লক্ষ হিন্দু মুসলমান ভাই বোন নিজভূমে পরবাসী হন। শুধুমাত্র ধর্মের রঙে চিহ্নিত হয়ে পালাতে হল সাতপুরুষের ভিটে ছেড়ে এক অস্থির অন্ধকার ভবিষ্যতের পথে। এপার বাংলার থেকে ওপার বাংলায়, ওপার বাংলা থেকে এপার বাংলায় নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ছুটতে থাকল মানুষ। মনুষ্যত্বকে ভুলে গিয়ে সংকীর্ণ রাজনীতি আর সাম্প্রদায়িক উস্কানিতে এপার ওপার দুই বাংলায় নির্বিচারে চলল খুন, লুণ্ঠন ধর্ষণ রাহাজানি। এককথায় সোনার বাংলা পরিণত হল নরককুণ্ডে। খুন, লুণ্ঠন, ধর্ষণের হাত থেকে কোনো প্রকারে বেঁচে কেউ কেউ আশ্রয় পেল আবার কেউ কেউবা পথে ঘাটে প্রাণ হারাল আবার কেউবা উদবাস্তু হয়ে আজও কোনো রকমে টিকে রয়েছে এপার-ওপার বাংলার কোনো না কোনো প্রান্তে জমাটবাঁধা বেদনাঘন স্মৃতির পাহাড়কে বুকে চেপে রেখে।

দেশভাগ বাঙালির ইতিহাস-সমাজ- সংস্কৃতির উপর যে ভয়ংকর প্রভাব ফেলেছে তার বাস্তব রূপচিত্র ফুটে উঠেছে এপার বাংলা ও ওপার বাংলায় রচিত সাহিত্যের মধ্যে। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা, দেশভাগ, দেশভাগ পরবর্তী উদবাস্তু সমস্যা, দেশভাগের বিষাদময় স্মৃতি- এককথায় দেশভাগকে মূল ভাববস্তু হিসেবে ধরে বাংলা সাহিত্যে রচিত হয়েছে অজস্র ছোটোগল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা প্রভৃতি। এপার বাংলা ও ওপার বাংলার যে সকল সহৃদয়বান লেখকের রচনায় দাঙ্গা, দেশভাগের নির্মম বাস্তবচিত্র এবং স্মৃতিভারাতুর চিত্র ফুটে উঠেছে তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন সলিল সেন, মনীন্দ্র রায়, বিষ্ণু দে, সোমেন চন্দ, বিভুতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ, সমরেশ বসু, অমিয়ভূষণ মজুমাদার, হাসান আজিজুল হক, প্রফুল্ল রায়, প্রমুখ।

বাংলা কথাসাহিত্যের জগতে দেশভাগকে নিয়ে যাঁরা কলম ধরেছেন তাঁদের মধ্যে হাসান আজিজুল হক (১৯৩৯-২০২১) এক অবিস্মরণীয় রচনাকার হিসাবে বাংলা সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। হাসান আজিজুল হক নিজেই একজন উদবাস্তু মানুষ। তিনি **১৯৩৯** খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে অখণ্ড ভারতভূমির বর্ধমান জেলার যবগ্রামে এক

সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম করেন। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর ১৯৫৪ সালে অনেকের সাথেই তাঁকেও জন্মভূমি ত্যাগ করে চলে যেতে হয় ওপার বাংলায়। নিজের চোখে দেখেছেন হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা, দেশভাগ, উদবাস্তুদের নিদারুণ জীবনযন্ত্রণা। লেখকের নিজের ভাষায়,-"আমার পক্ষে আমূল পরিবর্তন হয়েছিল ১৯৫৪ সালে। প্রায় নবজন্ম। রাঢ় থেকে যা পাই, দক্ষিণ বাংলার নাবি অঞ্চলে এসে তা হারাই না। দুটি ব্যাপার ঘটতে থাকেঃ রাঢ়কে নতুন করে পেতে শুরু করি আর একই সঙ্গে আমার গল্পের জায়গা জমিও বাড়তে বাড়তে দক্ষিণ বাংলা গ্রাস করে ফেলে প্রায়। এই ব্যাপারটা কঠিন হয়েছিল আমার পক্ষে। নতুন করে মন জোড়া। বুক জোড়া। দেশ দখলের কাজ কঠিন সন্দেহ কি ।" (গল্পের জায়গা জমি মানুষ, চালচিত্রের খুঁটি নাটি, হাসান আজিজুল হক)"[১] তাঁর লেখা উপন্যাস 'আগুনপাখি' এবং ছয়টি গল্প যথাক্রমে 'উত্তর বসন্তে', 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ', 'পরবাসী', 'মারী', 'খাঁচা', 'দ্বিবাস্বপ্ন'তে দেশভাগের বিপর্যয়কে খুবই গুরুত্ব সহকারে চিত্রিত করেছেন। দেশভাগ সাধারণ অসহায় মানুষের জীবনে যে নিদারুণ যন্ত্রণার বাহক ও অভিশাপ রূপে দেখা দিয়েছিল তারই বাস্তব রূপচিত্র হাসান আজিজুল হকের ছোটোগল্পে যে স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে প্রতিফলিত হয়েছে, তা-ই আমার আলোচনার মুখ্য বিষয়। কয়েকটি নির্বাচিত গল্পের কাহিনী বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে দেখিয়েছি দেশভাগের ফলে বিপন্ন মানুষের জীবনে কীভাবে নেমে এসেছে ভয়ঙ্কর অন্ধকারময় দুঃস্বপ্ন। কেউ ভয়ঙ্কর ও নির্মম হত্যার শিকার হয়েছে আবার যারা বেঁচে গেছে তারা নিদারুণ যন্ত্রণাকে আঁকড়ে ধরে দুঃস্বপনের পথ হেঁটেছে বাকিটা জীবন। প্রথমেই আমরা তাঁর ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত 'উত্তর বসন্তে' গল্পটির পাঠ বিশ্লেষণ করে দেখে নিতে পারি। 'সমুদ্রের স্বপ্ন, শীতের অরণ্য' গ্রন্থের 'উত্তর বসন্তে' গল্পটির মুখ্যবিষয় মধ্যরাঢ়ের একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের উদ্বাস্তু জীবনের বাস্তব রূপচিত্র। দেশভাগের মতো অতিস্পর্শকাতর বিষয় উদবাস্তু মানুষের জীবনে কী ভয়ঙ্কর অভিশাপ হয়ে নেমে এসেছে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 'উত্তর বসন্তে' গল্পটি । গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র বাণী। দেশভাগ বাণীর পরিবারকে নিঃস্ব করেছে অসুস্থ করেছে সকল স্বপ্নকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। দেশভাগের চরম আঘাতে বাণী ও তার বাবা-মা সহ পুরো পরিবারটিকে সাতপুরুষের ভিটে ত্যাগ করে দেশান্তরিত হতে হয় পূর্বপাকিস্তানে। নতুনভাবে জীবন শুরু করতে গিয়ে সবই অচেনা মনে হয়। মানসিক দিক থেকে পরিবারের কেউ সেই পরিবেশ পরিস্থিতি লোকজন কোনোকিছুকেই মানিয়ে নিতে পারে না। ফলস্বরূপ পরিবারের সকল সদস্যরাই মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। একদিকে মানসিক বিপর্যয় অন্যদিকে দেশান্তরিত হওয়ার কারণে অর্থনৈতিক বিপর্যয় এই দুই বিপর্যয়ের মাঝে পড়ে খাবি খেতে থাকে পুরো পরিবারটাই।

দেশভাগের সময় মন না চাইলেও ছেলের হাত ধরে জন্মভূমি ছাড়তে হয়েছিল বাণীর বাবা মাকে। মানসিক দোলাচলের মধ্যে থেকে ভবিষ্যতের সুখ স্বপ্নকে পাথেয়

করেই সেদিন পথে নেমেছিল পরিবারটি। কিন্তু স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়। সুখের পথ দুস্বপ্নের অন্ধকারে হারিয়ে যায় অনির্দেশের পথে। হতাশা নৈরাশ্য গ্রাস করে ফেলে পুরো পরিবারটিকে। দিন দিন গভীর অস্তিত্বের সঙ্কটে হারিয়ে যেতে থাকে পরিবারের প্রত্যেকটি সদস্য। বস্তুত দেশভাগ তাদের জীবনে এক ভয়ঙ্কর অভিশাপ রূপে নেমে আসে। তাদের কাছে 'জীবনটা জীর্ণ ন্যাকড়ার মতো বাতাসে উড়ছে।' তাদের কাছে বেঁচে থাকাটাই এক ভয়ংকর যন্ত্রণার। বাণীর বাবা পরিবারের গৃহকর্তা দেশভাগের অভিশাপে মনোবিকারগ্রস্ত নিঃসম্বল অসহায় এক জীবে পরিণত হয়ে কোনোরকমে টিকে রয়েছেন, বাণীর কথায় "কী দিনে কী রাতে ওর একটাও জানালা খোলেন না আব্বা। দিনের বেলাতেও মশারির ভিতর হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে পাথরের মতো বসে থাকেন আব্বা আর মাঝে মাঝে দাঁত খিঁচিয়ে চিৎকার করে ওঠেন কারণে অকারণে । আব্বাকে ভাবতে গেলেই তাঁকে আলোর জীব বলেই মনে হয় না, অস্পষ্ট অন্ধকারে তাঁকে যেন জীবন্ত বলেই মনে হয় না।"[২] কোনো প্রকারে শরীরগুলোকে টিকিয়ে রাখার সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকে পরিবারের প্রত্যেকটি সদস্য। সেই সংগ্রামের একজন অন্যতম সৈনিক বাণী। বাণী তার মা কে বলে –"আর একটা বছর। আমি বিএ পাস করব অনার্স নিয়ে। তখন আর আমাদের কোনও কষ্ট থাকবে না।"[৩] এভাবেই বাণী তার পারিবারিক বিপর্যয়ের সঙ্গে লড়াই জারি রেখে পরিবারের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার স্বপ্ন দেখতে থাকে। সামগ্রিক অস্থিরতার মাঝে বাণী যখন অতীতের স্মৃতিচিত্রগুলোকে একটু একটু করে আড়ালে রেখে নতুন করে পথ হাঁটার চেষ্টায় মগ্ন তখনই তার কলেজে ইতিহাসের নতুন অধ্যাপকের উপস্থিতি তার ফেলে আসা বেদনাবহ স্মৃতিকে উসকে দেয়। ইতিহাসের অধ্যাপককে দেখে তার চোখে ভেসে ওঠে ফেলে আসা স্মৃতির এক বেদনাবহ চিত্র। লিপির সঙ্গে কবীরের ভালোবাসার স্মৃতিচিত্র। লিপি ও কবীরের সেই ভালোবাসার একমাত্র সাক্ষী বাণী। যে ভালোবাসার অপমৃত্যু ঘটিয়েছে দেশভাগ। গল্পে বাণী বলে – "ওদিকের ওই বন্ধ ছোট ঘরটায় লিপি যে থার্ড ইয়ারে পড়তে পড়তে একদিন তার সমস্ত ভালোবাসা নিয়ে মরে যাবে তা আমি জানতাম না। আর আজ লিপি যে গিয়েছে সে কথা প্রায় যখন ভুলতে বসেছি, এতদিন পরে, ভালো করে বাঁচবার আকুল চেষ্টায় এই পঁচিশ বছর বয়সে যখন লেখা পড়ার আর- একটা উদ্যম চলছে, যখন ভালোবাসা কথাটা উচ্চারণ করলেই আমার বুকটা ধ্বক করে ওঠে, তখন ইতিহাসের নতুন অধ্যাপক কবীর সাহেব আমাকে সেই লাল রোদের কথা আবার মনে করিয়ে দিল।"[৪] এইরূপ বেদনাবহ স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে বাণী ইতিহাসের অধ্যাপক কবীরকে একদিন ডেকে নিয়ে যায় তাদের নতুন বাসায়। মায়ের কাছ থেকে ঘরের পুরনো চাবিগুলো নিয়ে ছোট্ট অন্ধকার ঘরটা খুলে কবীরকে দেখায় "লিপির হাস্যস্ফুরিত বড় ছবিটা হাওয়ায় দুলছে। বাণী থেমে থেমে বলল, লিপি। বিশ্রী গুমোট ঘরটার মাঝখানে দু'হাতে মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে রইল কবীর। আব্বা চিৎকার করে উঠলেন তাঁর ঘর থেকে, ও ঘরটা খুলল কে? কে খুলল ঘরটা? অ্যাঁ? বাণী

বলল, এখন তোমাকে যেতে হবে কবীর। এ বাড়ির সবকটি মানুষ অসুস্থ।”[৫] দেশভাগের যন্ত্রণা যে কতখানি ভয়ঙ্কর তার বাস্তব রূপচিত্র আমাদের সামনে গল্পকার বর্ণনা করেছেন সুচারু দক্ষতার সঙ্গে।

দেশভাগের পরিণতি স্বরূপ দেশান্তরিত ছিন্নমূল অসহায় মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ের করুণ মর্মবিদারক দৃশ্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত প্রতীক ও ব্যঞ্জনাধর্মী গল্প ‘আত্মজা ও একটি করবী গাছ’। আলোচ্য এই গল্পটির মধ্যেও রয়েছে দেশভাগের অভিশপ্ত মর্মান্তিক যন্ত্রণার বেদনাবহ করুণ চিত্র। গল্পের শুরু হয়েছে এক নির্দয় শীতকালের জোছনামাখা হিমেল রাত্রে এক ব্যঞ্জনাধর্মী চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে – “ঈশেন কোণ থেকে ধর ধর লে লে শব্দ আসে, অন্ধকার – ভূত অন্ধকার কেঁপে কেঁপে ওঠে, চাঁদের আলো আবার ঝিলিক দেয় টিনের চালে। গঞ্জের রাস্তার ওপর উঠে আসে ডাকু শিয়ালটা মুখে মুরগি নিয়ে। ডানা ঝামরে মুমুর্ষু মুরগি ছায়া ফেলে পথে, নেকড়ের মতো ছায়া পড়ে শিয়ালটারও, রাস্তা পেরোয় ভেবেচিন্তে, তারপর স্কুলের রাস্তার বাদাড়ে ঢোকে। হাতে লাঠি চাঁদমনির বাড়ির লোক ঠ্যাঙাড়ের দলের মতো হল্লা করে রাস্তায় পড়ে, কোনদিকি গেল শালার শিয়েল, কোনদিকি ক দিনি।”[৬] এখানে শিয়াল ও মুরগী প্রতীক মাত্র। এর অন্তরালে ফেকু সুহাস ইনামের মতো নারীললুপ লালসাময় চরিত্রকে তুলে ধরেছেন গল্পকার। অন্যদিকে ডানা ঝামরানো মুরগীর প্রতীকে দেশান্তরিত বিপন্ন পিতার অসহায় কন্যা রুকুকে দেখাতে চেয়েছেন। গল্পটির মধ্যে দেশভাগের ফলে এক বিপন্ন বৃদ্ধ পিতা তার পরিবারের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য দু টাকার বিনিময়ে আত্মজা রুকুকে তুলে দেয় কামনাললুপ শিয়াল সদৃশ্য ফেকু সুহাসের হাতে। দেশত্যাগ করা ছিন্নমুল মানুষগুলোর কাছে ঘর বলে কিছু নেই। ঘরের ভেতর বাহির সবই সমান তাদের কাছে। গল্পে বৃদ্ধের কথায় – “দেশ ছেড়েছে যে তার ভেতর বাইরে নেই।”[৭]

গল্পটির নামকরণ ‘আত্মজা ও একটি করবী গাছ’ ব্যঞ্জিত করে তুলে দেশান্তরিত বৃদ্ধ পিতা ও কন্যাকে। গল্পের শেষে অসহায় বৃদ্ধ পিতার আত্মক্রন্দনধ্বনি জানিয়ে দেয় দেশ তাদের জীবনে কতখানি অভিশাপ হয়ে নেমে এসেছে। এক বৃদ্ধ অসহায় পিতা, যে তার আত্মা থেকে জাত কন্যার সম্ভ্রম বিক্রি করে সংসার চালাতে বাধ্য হয় তার কাছে দেশভাগ কতখানি মর্মবিদারক তা ভাষায় প্রকাশ অসম্ভব বলে আমার মনে হয়। তাই সে গল্পে কখনো আক্ষেপ আর বিলাপের স্বরে বলেছে- “...মরে গেলেই তো হয় এখন, কী বলো তোমরা ? টক করে মরে গেলাম ধরো। তারপর? আমার আর কী – ড্যাং ড্যাডাং ড্যাং, চলে গেলাম, বুঝে মরগে তুই বুড়ি – ছানাপোনা নিয়ে বুঝে মরগে”[৮] আবার কখনো বলেছে –“আমরা শুকনো দেশের মানুষ বুইলে না? সব সেখানে অন্যরকম, ভাবধারাই আলাদা আমাদের । এখানা না খেয়ে মারা যেতাম তোমরা না থাকলে বাবারা।”[৯] এইকথাগুলো দেশভাগ পরবর্তী ছিন্নমূল প্রতিটি মানুষের

হৃদয়ে কথা। গল্পের শেষে দেখি দু টাকা দিতে না পারায় ইনাম রুকুর ঘরে যেতে পারেনি। ফেকু সুহাসরা যখন রুকুর ঘরে তখন ইচ্ছের বিরুদ্ধে গিয়েও অসহায় বৃদ্ধ পিতার করুণ পরিণতির গল্প শুনে বিরক্তির সঙ্গে। -"এখানে যখন এলাম – আমি প্রথম একটা করবী গাছ লাগাই ... তখন হু হু করে কে কেঁদে উঠল, চুড়ির শব্দ এল, এলোমেলো শাড়ির শব্দ আর ইনামের অনুভবে ফুটে নিটোল সোনারঙের দেহ – সুহাস হাসছে হি হি হি – আমি একটা করবী গাছ লাগাই বুঝলে? বলে থামল বুড়ো, কান্না শুনল, হাসি শুনল, ফুলের জন্য নয়, বুড়ো বলল, বিচির জন্যে, বুঝেছ, করবী ফুলের বিচির জন্যে। চমৎকার বিষ হয় করবী ফুলের বিচিতে। আবার হু হু ফোঁপানি এল আর এই কথা বলে গল্প শেষ না করতেই পানিতে ডুবে যেতে, ভেসে যেতে থাকল বুড়ার মুখ – প্রথমে একটা করবী গাছ লাগাই বুঝেছ আর ইনাম তেতো তেতো – এ্যাহন তুমি কাঁদতিছ? এ্যাহন তুমি কাঁদতিছ? এ্যাহন কাঁদতিছ তুমি?"[১০] দেশান্তরিত দারিদ্র্যলাঞ্ছিত অক্ষম পিতা যখন নিজের চোখের সামনে শিয়াল সদৃশ্য ফেকু সুহাসদের হাতে নিজের মেয়ের দেহদান করে দু'টাকার বিনিময়ে তখন দেশভাগের মূল হোতাদের উদ্দেশ্য কতখানি মহৎ ছিল সে নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন থেকেই যায়।

দেশভাগ পরবর্তী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অমানবিক করুণ পরিণতির প্রেক্ষাপটে রচিত তাঁর আর একটি বিখ্যাত গল্প 'পরবাসী'(১৯৬৪)। গল্পের কাহিনি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে বিশ্বাস নিয়ে সাধারণ নারী পুরুষরা জীবনকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিল, সেই বিশ্বাস ও মনুষ্যত্বের মৃত্যু ঘটেছে গল্পের শেষে। বশির এবং গ্রামের বৃদ্ধ চাচা ওয়াজদ্দির কথোপকথনে উঠে আসে দেশভাগ পরবর্তী হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার প্রসঙ্গ। বশির জানায় –'পাকিস্তানে হিঁদুদের লিকিন একছার কাটছে – কলকাতায় তেমনি কাটছে মোচলমানদের।"[১১] বশিরের কথায় চাচা ওয়াজদ্দি গুরুত্ব না দিয়ে খেঁকিয়ে ওঠে। পরিস্থিতি নিয়ে যখন হতভম্ব বশির কি করবে বুঝতে পারে না, তখন বশিরের উদ্দেশে ওয়াজদ্দির প্রশ্ন – "তোর বাপ কটো? মা কটো? একটো তো? দ্যাশও তেমনি একটো। বুইলি?"[১২] কিন্তু গল্পের শেষে আমরা দেখি ওয়াজদ্দির এই বিশ্বাস আর বেঁচে থাকে না। তাকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বলি হতে হয়। একদল অপরিচিত খুনিদের দল গ্রামটিকে ঘিরে ধরে। বশিরের চোখের সামনেই খুন হয় ওয়াজদ্দি । তারপর পুরো গ্রামটিতে তাণ্ডবলীলা চালায় তারা। বাড়িতে বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। গল্পে লেখকের ভাষায় – "বল্লম দিয়ে মাটির সঙ্গে গাঁথা বশিরের ছেলেটা। ছাব্বিশ বছরের একটি নারীদেহ কালো একখণ্ড পোড়া কাঠের মতো পড়ে আছে ভাঙা দগ্ধ ঘরে। কাঁচা মাংস- পোড়ার উৎকট গন্ধে বাতাস ভারী।"[১৩] বুকফাটা চিৎকার করে উঠে বশির। দেশভাগ তার বুক থেকে কেড়ে নিয়েছে তার স্ত্রীকে, সন্তানকে। নিরীহ অসহায় স্ত্রী ও সন্তানের মৃত্যু তাকে বদলে দিয়েছে। সে কয়েকদিন ধরে ভয়ংকর মৃত্যু আর রক্তের ছবি দেখতে দেখতে পাগলের মতো হয়ে গেছে। সে তার গ্রাম ছেড়ে দেশ ছেড়ে চলে এসেছে অনেকদূর ভারত - পাকিস্তানের সীমানায়। সে আর কারো কাছে কোনো কিছুর

জন্য কোনোরূপ প্রার্থনা জানায় না, কারো কাছ থেকে তার চাওয়ারও কিছুই নেই আর। সে শুধু মনে মনে বলেছে – "আমি আর বচির নাই – বচির শ্যাষ, বচিরের হয়ে গেলচে – দ্যাশ ফ্যাশ নাই – আমি এ্যাকোন আর এক দ্যাশে জন্ম লোব।"[১৪] শেষপর্যন্ত দেশভাগ তার স্ত্রী ও সন্তানকে শুধু কেড়ে নেয়নি তাকেও শেষপর্যন্ত বানিয়েছে খুনি - আততায়ী। দেশভাগের পরিণতিতে ধুতি পরিহিত এক হিন্দুকে সামনে দেখে শান্ত বশিরের বুকের রক্ত গরম হয়ে যায়। প্রতিশোধস্পৃহায় মেতে উঠে সে। "তীব্র চোখে মানুষটার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ কুড়ুলটা তুলে নিয়ে তার মাথায় প্রচণ্ড একটা আঘাত করল বশির।"[১৫] হতচকিত একটা মৃত্যু চিৎকার করে খালের ভিতর গড়িয়ে পড়ল মানুষটা। ওয়াজদ্দির, বশিরের স্ত্রী ও সন্তান কিংবা ধুতি পরিহিত হতভাগ্য হিন্দু মানুষটা যারা দেশভাগের চরম পরিণতি স্বরূপ অসহায়ভাবে ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক হত্যার শিকার হল, কিংবা বশিরের মতো সাধারণ মানুষটি স্ত্রী ও সন্তানকে হারিয়ে শেষপর্যন্ত স্ত্রী ও সন্তানের খুনের প্রতিশোধস্পৃহায় অন্ধ হয়ে একজন খুনী আততায়ীতে পরিণত হল এই সব কিছুর বিচারে বলা যেতে পারে তাদের জীবনে দেশভাগ গভীর অন্ধকার ও চরম বিপর্যয় বয়ে নিয়ে এসেছিল। যার বাস্তব বর্ণনা হাসান আজিজুল হক তুলে ধরেছেন আলোচ্য গল্পে।

তাঁর লেখা 'মারী' গল্পে দেখতে পাই দেশভাগের ফলে সৃষ্টি হওয়া উদবাস্তু মানুষের জীবনের নিদারুণ যন্ত্রণা ও হাহাকারের ছবি। একইভাবে 'খাঁচা' গল্পেও লেখক দেখিয়েছেন দেশভাগ কীভাবে মানুষের সমস্ত সুখস্বপ্নকে ভেঙে দিয়েছে।

পরিশেষে একথায় বলা যেতে পারে, দেশভাগের ফলস্বরূপ এপার বাংলা অপার বাংলার মানুষের স্বাভাবিক জীবনে যে চরম বিপর্যয় নেমে এসেছিল তারই বাস্তব চিত্র হাসান আজিজুল হক তাঁর ছোটগল্পে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। দেশ ভাগকে কেন্দ্র করে তৎকালীন সাম্প্রদায়িক হিংসার জীবন্ত উদাহরণ বলা যেতে পারে তাঁর ছোট গল্পগুলি।

তথ্যসুত্র:

১. হাসান আজিজুল হক; পঞ্চাশটি গল্প; (সঙ্কলন ও গ্রন্থনা সুশীল সাহা); আনন্দ পাবলিশার্স ; ২০১৭; গ্রন্থ প্রসঙ্গে

২. হাসান আজিজুল হক; পঞ্চাশটি গল্প; (সঙ্কলন ও গ্রন্থনা সুশীল সাহা); আনন্দ পাবলিশার্স ; ২০১৭ পৃ;- ১৯

৩. তদেব; পৃ;- ২০

৪. তদেব; পৃ;- ২৫

৫. তদেব; পৃ;-২৬

৬. তদেব; পৃ;- ৮৫

৭. তদেব; পৃ;- ৯০
৮. তদেব; পৃ;-৯০
৯. তদেব; পৃ;- ৯০
১০. তদেব; পৃ;-৯১
১১. তদেব; পৃ;-৬৪
১২. তদেব; পৃ;-৬৪-৬৫
১৩. তদেব; পৃ;-৬৫
১৪. তদেব; পৃ;-৬৫
১৫. তদেব; পৃ;-৬৭

পশ্চিমবঙ্গের সাঁওতালদের উৎসব ও আধুনিকীকরণ- একটি সুসংগঠিত সংস্কৃতি

বাপি কুমার মন্ডল
শিক্ষক, রাজবল্লভপুর রঙ্গিলাবাদ রামলাল মেমোরিয়াল হাই স্কুল
উস্থি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

সারসংক্ষেপ: এই পৃথিবীর প্রত্যেক জাতির নিজস্ব উৎসব আছে। কোনো জাতির নিজস্ব উৎসব সমূহ শুধুমাত্র ওই জাতিকেই চিহ্নিত করে না, সেই সঙ্গে ঐ জাতির ভাষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, প্রভৃতি তাদের ওই সমাজ ব্যবস্থা কতটা লব্ধ প্রতিষ্ঠিত তা সূচিত করে। আবার অন্যদিকে তাদের এই চিরাচরিত ও উন্নত সংস্কৃতিগুলিকে যদি না সংরক্ষণ করা যায় তবে তা ক্রমশ বিলুপ্তির পথে ধাবিত হবে। চিরাচরিত উৎসবগুলিতে বিভিন্ন জাতিগুলি তাদের প্রচলিত পোশাক পরার রীতি প্রচলিত আছে, এর দ্বারা ওই সমস্ত জাতির নিজস্ব বৈশিষ্টগুলিকে মেলে ধরার চেষ্টা করে। এর দ্বারা বোঝা যায় ওই সমস্ত পোশাক পরিহিত হবার ফলে তারা যেমন একদিকে স্বাচ্ছন্দ বোধ করে তেমনি অন্যদিকে নিজেদের জাতিগত পরম্পরাটি প্রকাশ পায়। ভারত বর্ষে সংখ্যার দিক থেকে বৃহত্তম উপজাতিদের মধ্যে সাঁওতাল গণ হলেন অন্যতম বৃহত্তম জনগোষ্ঠী। এই সাঁওতাল গণ তারা নিজেদের ঐতিহ্য ও পরম্পরা বেশকিছু ক্ষেত্রে গতানুগতিক পোশাক পরিচদের মধ্যে ধরে রাখতে পেরেছে। বিভিন্ন উৎসব গুলিতে তারা এই সমস্ত পোশাক পরিহিত হয়ে বিভিন্ন উৎসব প্রাঙ্গনে ধামসা মাদল বা অন্যান্য বাজনা সহ নাচ ও গান গুলি করতে থাকে। এ ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে ছৌ নৃত্য আজ পৃথিবী ব্যাপী পরিচিতি লাভ করেছে। সাঁওতালদের মূল উৎসব বা পরব হল-সার হুল (কৃষি উৎসব) যা নভেম্বর জানুয়ারি মাসে পালিত হয়। সাঁওতালদের পরব গুলি নিতান্ত অন্যন্য সংস্কৃতির দৃষ্টান্ত স্বরূপ। তাদের এই পরব গুলি জীবনমুখী, প্রকৃতি প্রেমীক সর্বোপরি মানবতা বাদী। মানুষের সঙ্গে মানুষের, প্রকৃতির সঙ্গে প্রকৃতির মিশ্রনে যে মানব-প্রকৃতির মেলবন্ধন তৈরী হয় তার প্রতিফলন ফুটে ওঠে তাদের এই পরব গুলির মধ্যে। আমার এই গবেষণা পত্রটি মূলত সাঁওতালদের ধর্মীয় উৎসবসমূহ এবং তাদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি হিন্দু বা অন্যান্য জাতিদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ও এখনো পর্যন্ত কিভাবে স্বতন্ত্রতা বজায় রেখেছে তা দেখানোর চেষ্টা করেছি।

সূচক শব্দ: সাঁওতালদের পরিচয়-উৎসবসমূহ-হিন্দু ধর্ম ও সাঁওতালগণ-আধুনিকতার প্রবেশ-স্বতন্ত্র সংস্কৃতি।

মূল আলোচনা: ভারত বর্ষে আদিবাসী গোষ্ঠী গুলির মধ্যে তৃতীয় বৃহত্তম গোষ্ঠী হল সাঁওতাল জনগোষ্ঠী। জনসংখ্যার বিচারে ভিল ও গোন্দদের পরেই এদের স্থান। আবার

পশ্চিমবঙ্গে যত আদিবাসী গোষ্ঠী বসবাস করে তাদের মধ্যে বৃহত্তম উপজাতি হল সাঁওতালগন। প্রায় সব জেলাতেই এদের অস্থিত্ব থাকলেও মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, মালদহ জেলায় তারা পুরুষানুক্রমে বসবাস করছেন। ফলেই এই সমস্ত জায়গাতে তাদের ইতিহাস প্রসিদ্ধ নিজস্ব সমাজ, সংস্কৃতি, লোকাচার গড়ে উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া বিহার ওড়িষ্যা এবং আসামের এদের বসতি ছড়িয়ে আছে। এছাড়া বাংলাদেশ ও নেপালে কিছু কিছু সাঁওতাল জাতির অভিপ্রয়াণ ঘটেছে। সর্বত্র সাঁওতালরা নিজেদের 'হড়' বলে পরিচয় দিয়েছে, 'হড়' কথার অর্থ হল-মানুষ।

ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কের পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ গ্রন্থে পাওয়া যায়-'সাঁওতাল পুরান সংগ্রাহক স্ক্রেপস রুড সাহেবের মতে, সাঁওতাল শব্দটি সম্ভবতঃ 'সাওন তার' শব্দে অপভ্রংশ এবং এই নামটি তারা এদেশে কয়েক পুরুষ ধরে বসবাস করার পর গ্রহণ করে। [১]আবার সাঁওতাল ঐতিহ্য অনুসারে 'খেরওয়াড়' জনপ্রবাহ থেকে সাঁওতালদেড় উৎপত্তি। প্রকৃত পক্ষে সাঁওতালদের উৎপত্তি ও অভিপ্রয়াণ বেশ রহস্য জনক, সে রহস্যের খোরাক জুগিয়েছে সাঁওতালি উপকথার মাধ্যমে। আবার সুরঞ্জন মিদ্দের সম্পাদনায় সাঁওতাল ও মিশনারি গ্রন্থে জনৈক লেখকের লেখনীতে দেখি সাঁওতালরা সিন্ধু উপত্যকাকে নিজেদের বাসভূমি বলে বর্ণনা করেছেন। [২]তারা আর্য আক্রমণে ক্রমশ জঙ্গলে বসবাস করতে থাকে। কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায়, যারা সিন্ধু অঞ্চলে বসবাস করতো তারা পুরোপুরি নাগরিক জীবনের সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছিল। এই আদিবাসীরা পরবর্তীকালে তাদের সেই নাগরিক জীবন যাত্রার ও সংস্কৃতি কিভাবে ভুলে যেতে পারলো? তবে ঐতিহাসিক বিভিন্ন দলিল থেকে একথা বলা যায় যে সাঁওতাল গণ একসময় বিহারের চম্পা বা হাজারীবাগ থেকে পশ্চিমবঙ্গ নেপাল, বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এ ক্ষেত্রে শুচিব্রত সেনের ভারতের আদিবাসীর সমাজ পরিবেশ ও সংগ্রাম নামক গ্রন্থ্ থেকে জানা যায় যে ১৭৭০ এর দুর্ভিক্ষে বাংলার গ্রামগুলি যখন শ্রীহীন হয়ে পড়ে, গ্রামীণ সমাজ ও সংস্কৃতি যখন পুরোপুরি ভেঙে যায় তখন বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে করেছি অর্থনীতিকে পুণঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য সাঁওতালদের আমন্ত্রণ করা হয়। 'একদিকে কৃষকের অভাব, অন্যদিকে জমির জন্য সাঁওতালদের হাহাকার, এই উভয়েরই সমাধান হলো জঙ্গল মহলে সাঁওতালদের আগমনের সুবাধে।' [৩]এই বিতর্কের মাঝে অবশ্যই স্মরণ করতে হবে বর্তমানে আবিষ্কৃত 'লালগড়ের শৈলচিত্র' কিংবা বাঁকুড়া, পুরুলিয়া অঞ্চলে পুরানো প্রস্থর যুগের আয়ূধ সমূহ আদিবাসী পরিবারের পূর্ব পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত ছিল বলে মনে হয়।

সাঁওতাল সমাজে উৎসবের শেষ নেই। এদের উৎসবমুলত দুই প্রকার- সামাজিক উৎসব ও ধর্মীয় উৎসব। সামাজিক উৎসবের মধ্যে বিবাহ অনুষ্ঠান, জন্মানুষ্ঠান, মুখে ভাত নামকরণ অনুষ্ঠান ইত্যাদি। তবে এদের ধর্মীয় উৎসবগুলি বেশ উল্লেখযোগ্য। এদের প্রধান উৎসবগুলি হলো বাহাপরব, বাধনা পরব, করম উৎসব, জাওয়া পরব, সহরা ইত্যাদি। ভারতের বিভিন্ন জাতির উৎসবগুলি বর্তমানে একটির

দ্বারা আরেকটি দারুণভাবে প্রভাবিত হচ্ছে এবং তার প্রতিফলিত রূপগুলি আমাদের চোখে পড়ে। আমার এই গবেষণা পত্রে দেখানোর চেষ্টা করেছি এই বিশ্বায়নের যুগে ও সাঁওতাল উৎসবগুলি কতটা প্রভাবিত হয়েছে ও কতটা স্বতন্ত্রতা রক্ষা করতে পেরেছে।

কৃষি কাজ ও বনজ সম্পদ সংগ্রহ করে সাঁওতালরা জীবিকা নির্বাহ করে। মেয়েরা কৃষিকাজে লাঙ্গল চালায় না, স্ত্রী পুরুষ উভয়েই কৃষিকাজ করে, যাদের ক্ষেত খামার নেই তারা অন্যের জমিতে ক্ষেত মজুর হিসাবে কাজ করে। এদের অনেকেই আবার আসে পশে গ্রামে 'নামাল' খাটতে যায়। ধান রোপন আর কাটার সময় তারা মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া থেকে দলে দলে সাঁওতাল স্ত্রী পুরুষ বর্ধমান, হুগলি ও হাওড়া জেলায় 'নামাল' খাটতে যায়, কয়লা খনির ও কলকারখানায় শ্রমিক হিসাবে কাজ করে। অফিস, আদালত, হাসপাতাল এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বহু সাঁওতালকে কাজ করতে দেখা যায়। [৪]সাঁওতাল নারী পুরুষ এতই প্রানোজ্জল যে দেখা গেছে সারাদিন মাঠে কাজকর্ম করার পর সারারাত ধরে ধামসা-মাদল-হাঁড়িয়া সহযোগে নৃত্য করছে, তাতে তাদের প্রাণশক্তি এতো টুকুও কমেনি।

সাঁওতালরা বিভিন্ন রীতিতে বিভিন্ন উৎসব পালন করে। দৈনন্দিন জীবনের ঘটনা গুলোকে কেন্দ্র করেই তাদের এসব উৎসবের সৃষ্টি। প্রত্যেকটা উৎসবের সঙ্গে প্রকৃতি শস্য, ফল, মূল, শিকার তথা সাঁওতালদের একটা আত্মিক যোগ লক্ষ্য করা যায়। বীজ বপনের সময় তারা পালন করে 'এরক সিম' উৎসব, শস্য কাটার সময় পালন করে 'জান থাড়' উৎসব, আবার শস্য তোলার সময় পালন করে 'সহরায়' উৎসব। প্রকৃতির কোলে মানুষ হওয়া প্রকৃতির সন্তান সাঁওতাল গণ প্রকৃতিকে সর্বদা মাতৃজ্ঞানে পূজা করে এসেছে। বসন্তের আগমনে যখন সমস্ত পৃথিবী ফুলে ফলে ভোরে ওঠে, পশু পাখিদের উল্লাসে চারিদিকে মুখরিত হয়ে ওঠে, প্রকৃতি যখন তার রঙিন রূপ সবার সামনে মেলেধরে তখন তারা পালন করে তাদের আনন্দের উৎসব তথা শ্রেষ্ঠ উৎসব বাহা (Flower Festival) [৫]।

বাহা উৎসব- বাহা সাঁওতালদের অতি পবিত্র উৎসব ফাল্গুল মাসে শুক্ল পক্ষের দ্বাদশী তিথি থেকে বাহা পর্ব আরম্ভ হয়। এটা মূলত নতুন বর্ষ শুরু হওয়ার পরব। এই সময় শাল গাছে, পলাশ গাছে, মহুয়া গাছে নতুন কুড়ি আসে ও ফুল ফোটে তাই 'বাহা' পরব শেষ না হলে ওই সকল ফুলের রস পান করা যায় না ও মাথায় কোনো ফুল গোজানো যায় না। এই পুজো জাহের থানে হয়ে থাকে। জাহের এরা, মারাংবুরু, গোঁসায় এরা-র নামে পুজো হয়ে থাকে। পুজো শেষে নায়কে বাবা (পুরোহিত) ডালায় শাল ফুল নিয়ে প্রত্যেক বাড়ি বাড়ি যান এবং বাড়ির মেয়েরা পুরোহিতের পা ধুইয়ে দিলে পুরোহিত তার ডালার শাল ফুল মেয়েদের উপহার দেন। মেয়েরা সেই শাল ফুল খোঁপায় পরে। এর পরের দিন সাঁওতালরা শাল-পলাশের ফুল থেকে প্রাকৃতিক রং তৈরী করে হোলি খেলা করে, এক্ষেত্রে লাল রং সামাজিক ভাবে নিষিদ্ধ।

সহরায়- পশ্চিমবঙ্গের সাঁওতালদের সবচেয়ে বড় পরব হল সহরায়। এই উৎসব ফসল কাটার পরেই পৌষ মাসে পালিত হয়, পাঁচ দিন ধরে চলে এই উৎসব। বন্ধু, বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন বিশেষ করে বাড়ির মেয়ে জামাইকে অবশ্যই নিমন্ত্রণ করতে হয়। সহরায় উৎসবের সময়েই গৃহ পালিত গবাদি পশুর কল্যাণ কামনা করে জাগরণী গান গাওয়া হয়। মারাং বুরু, গৃহ দেবতা ও পূর্ব পুরুষদের উদ্দেশ্যে পূজা দেওয়া হয়। আত্মীয়-স্বজন সবাই একসাথে খাওয়া দাওয়া করে, সে সঙ্গে যুবক যুবতীরা একসাথে নাচ, গান, আনন্দ উচ্ছাস ও হৈ, হুল্লোড়ের মধ্যে এই কয়েক দিন কাটিয়ে দেয়।

সাকরাত- এই উৎসবটি পৌষ মাসের শেষ দিনে অর্থাৎ পৌষ সংক্রান্তিতে পালিত হয়। পৌষ মাসের অন্য দুটি উৎসব 'বাহা' ও 'সহরায়' মতো এটিও একটি গুরুত্ব পূর্ণ উৎসব। এই সময় প্রত্যেক বাড়িতে বাড়িতে পূজা হয় ও পূজার ভোগ পিঠা, চিঁড়া, মুড়ি, মারাং বুরু নামে উৎসর্গ করা হয়। যে সমস্ত পুরুষ মহিলারা বাইরে কাজে যায় তারা এই সময় বাড়িতে ফিরে আসে এবং উৎসবে যোগদান করে। এই উৎসবকেই গিরে নানান প্রতিযোগিতা মূলক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

এরxক সিম- পশ্চিমবঙ্গের সাঁওতালদের ওপর অন্যতম উৎসব এরক সিম যা আষাঢ় মাসে পালিত হয়। এরx কথার অর্থ 'বপন করা', সিম কথার অর্থ হলো মুরগি। ভালো ফসল পাওয়ার জন্য দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করা হয়। জাহের থানে পূজা হয় এবং নায়কে বাবা (গ্রাম্য পুরোহিত) সেখানে মারাং বুরু জাহের এরা, গোঁসাই এরা ও অন্যানো দেবতাদের উদ্দেশে এক একটি করে মুরগি উৎসর্গ করেন ।

হটরিয়াড় সিম- ধান রোপনের শেষে শ্রাবন মাসে হটরিয়াড় সিম পূজা করা হয়। ধান যেন সবুজ হয়ে থাকে। হটরিয়াড় কথার অর্থই হল সবুজ। এই সময় শুধু গ্রাম দেবতাকেই পূজা করা হয়।

ইড়ি গুন্দলি- নতুন ফসল তোলার আগে ভদ্র মাসের শেষের দিকে এই পুজো হয়ে থাকে। গ্রামের নায়কে বাবা স্নান করে যার মাঠে ধানের প্রথম শীষ হয়েছে ওখান থেকে একটা শীষ কেটে নিয়ে আসে এবং সেটা নিয়ে জাহের থানে পূজা দেয়। প্রথমে জাহের এরা পর পর মারাং বুরু, গোঁসাই এরা প্রভৃতির নামে উৎসর্গ করা হয়। উদ্দেশ্য একটাই ফসল খেয়ে যেন তাদের পেট ব্যাথা ও মাথার যন্ত্রনা না হয়।

জান থার- অগ্রায়ন মাসে জান থার পূজা হয় এই পুজোতে শুকর অথবা ভেড়াকে জাহের থানের পারগনা থানে উৎসর্গ করা হয়। এই পূজা জগ-নায়কে করে থাকে। উদ্দেশ্য হলো মাঠে ঘটে ফসল তোলার সময় কোনোরকম সমস্যা না হয়।

মাঘ সিম- এই পূজা মাঘ মাসে হয়ে থাকে বলে এটি মাঘ সিম নামে বেশি প্রচলিত। এই উৎসবের সাঁওতাল সমাজ পুরাতন বছরকে বিদায় জানায়।এই উৎসবের সামাজিক গুরুত্ব অনেক বেশি কারণ এই সময় সাঁওতাল গ্রাম পঞ্চায়েতের সদ্দস্যরা যথা মাঝি হারাম, জগ মাঝি, জগ প্রামানিক, গোরাইত, নায়কে প্রমুখরা পদত্যাগ করেন এবং নতুন ভাবে আবার এক বছরের জন্য পঞ্চায়েত সদ্যসরা নিযুক্ত হন।

করম পূজা- এটা ভাদ্রমাস পূর্ণিমা তিথিতে হয়ে থাকে। এই পুজোতে করম দেবতাকে সন্তুষ্ট করা হয়। বন থেকে করম গাছের ডাল এনে করম থানে পুঁতে এই পূজা হয়। এই পূজাতে সাধারণত যুবতী মায়েরাই অংশগ্রহণ করে। এই উৎসবের মূল উদ্দেশ্য সমাজের অশুভ শক্তির বিনাশ ঘটিয়ে শুভ শক্তির আগমনকে আহ্বান করা।

জম সিম-এই পূজা প্রতি বছর হয় না, কখনো কখনো হয়ে থাকে। এই পুজো সূর্য দেবতার নামে হয়ে থাকে। তাদের বিশ্বাস এই দেবতাকে মাঝে মাঝে সন্তুষ্ট করে না রাখলে পরলোকে ভালো রাখবে না। পূর্বে সূর্য দেবতা একক ভাবে পূজিত হলেও পরবর্তী কালে 'জম সিম' বঙাকে এই নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

পাতা উৎসব- পাতা কথাটির আক্ষরিক অর্থ হল মেলা। সাঁওতালদের এই পাতা পার্বণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় হয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের ঝাড়গ্রাম জেলায় সিলদাপাতা এবং পুরুলিয়া জেলায় বোরো পাতা বিখ্যাত।

ছাতা উৎসব- এই পরব আদিবাসী তথা সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর একটি অন্যতম উৎসব। ছাতা পরব একটি নিদিষ্ট দিনে বিশেষ করে বিশ্বকর্মা পূজার রাত্রে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এখানে তাদের কোনো উপাসক দেবতা থাকে না, মূলত তখনকার দিনে রাজাকেই ফুল মালা দিয়ে রাজাকে বরণ করে। বলা বাহুল্য এখানে রাজা ও প্রজার এক মিলন ক্ষেত্র।

দিসম সেন্দ্রা- সেন্দ্রা কথার অর্থ হল খোঁজা বা অন্বেষণ করা। এটি একটি বাৎসরিক শিকার উৎসব এই উৎসবটি ফেব্রুয়ারি, মার্চ মাসে হয়ে থাকে। এটি সাধারণত তিন দিন ধরে হয়। যতদূর জানা যায় প্রাথমিক পর্বে এই উৎসব ছিল ভেষজ উদ্ভিদ সংগ্রহের উৎসব পরবর্তী কালে তা শিকার উৎসবে রূপান্তরিত হয় । তবে এখন পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ে জৈষ্ঠ মাসে পূর্ণিমা তিথিতে সবচেয়ে প্রাচীন ও বড়ো শিকার উৎসব পালিত হয়।

বাঁধনা পরব- পশ্চিম বঙ্গের সাঁওতালদের অন্যতম বড়ো উৎসব হল বাঁধনা পরব। এই উৎসবটি কার্তিক থেকে পৌষ মাসের মধ্যে হয়ে থাকে। এই পরব উপলক্ষ্যে গরু বা মোষকে খোঁটায় বেঁধে নানা ধরণের খেলা খেলানো হয়। খোঁটায় বেঁধে খেলানো হয় বলে একে বাঁধনা বলা হয়েছে। [৬]এই উৎসবের মধ্যে তারা ফসল ও গো সম্পদ বৃদ্ধির আবেদন জানায়। বর্তমানে এই উৎসবে মোষ বা গরুকে হত্যা করা হয় না। বাড়ির কর্তা-গৃহিনী ছাড়া সবাই মহুয়া, হাঁড়িয়া খেয়ে ধামসা-মাদলের সাথে সাথে নাচ ও গান করতে থাকে।

মাঃ মড়ে- সাঁওতালদেড় ওপর উল্লেখযোগ্য উৎসব হলো মাঃ মড়ে। পাঁচ বছর অন্তর অন্তর বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাসে এই উৎসব হয়ে থাকে। পূর্ব নির্ধারিত দিনে সাঁওতালগন প্রতিশ্রুতি মতো মরেকো তুরিইকো, এই দেবতাকে সাদা ছাগল উৎসর্গ

করা হয়। ভালো বৃষ্টি, ভালো ফসল হওয়া এবং মহামারী, দুর্ভিক্ষ, রোগব্যাধি, প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মাঃ মড়ে পূজার আয়োজন করা হয়।

সাঁওতাল সমাজ ব্যবস্থা এক অটুটু বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। গোষ্ঠী বদ্ধ জীবনে তারা বড়ো হয়েছে। এই সহজ সরল অরণ্যের সন্তানগণ কোনোদিন মিথ্যার আশ্রয় নেয় নি, ছল চাতুরী বা হটকারিতা তাদের জীবনে ছিলনা বললেই চলে। দীর্ঘ দিন ধরে সাঁওতাল জাতি ও হিন্দু সমাজ পাশাপাশি বসবাস করেছে। ফলে তাদের মধ্যে বহু সংস্কৃতিক আদান প্রদান ঘটেছিল- একথা বলা যায়। বিশেষ করে ধর্মীয় ক্ষেত্রে তা স্বীকার করতেই হবে। শুচিব্রত সেনের ভারতের আদিবাসী সমাজ গ্রন্থে দেখি 'হিন্দুদের যে কোনো মঙ্গল কর্মে ধান, দূর্বা, নারকেল, সিঁদুর, পান পাতা, সুপারী প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়, এগুলি সবই মুন্ডা, হো, সাঁওতালদের কাছ থেকে গ্রহণ করা। ধর্মে আভ্যুদয়িকের প্রথা আজ ও প্রচলিত, এ প্রথাও সাঁওতালদের কাছ থেকে নেওয়া। ৭ আজ হিন্দুদের মধ্যে গঙ্গায় অস্থি বিসর্জন করা-এই প্রথা তো সাঁওতালরা জন্মলগ্ন থেকে করে আসছে দামোদর নদীতে অস্থি ভস্ম বিসর্জন দিয়ে। এই অনুষ্ঠান তো 'জাঙতপা' নামেও পরিচিত সাঁওতালদের কাছে। এখনো হিন্দু সমাজের কোনো কোনো ক্ষেত্রে ১লা বৈশাখে গোয়ালে 'গোট' পুজা করা হয়। তখন গরুগুলোর পা ধুইয়ে দেওয়া হয়। তাদের রং, সিঁদুর বা হলুদ মাখানো হয় কপালে ও সিঙে। এই প্রথা সাঁওতালদের সহরায় বা বাঁধনা পরবের সঙ্গেই তুলনীয়। আবার অন্যদিকে সাঁওতাল সমাজে হিন্দু ধর্মের আধুনিকী করণের ও সংস্কৃতায়নের ছোঁয়া যে লাগেনি তা জোর দিয়ে বলা যায় না। এ প্রসঙ্গে ভগীরথ মাঝির নেতৃত্বে 'সাফাহড়' আন্দোলনের কথা বলা যায়। 'সাফা' কথার অর্থ হল পবিত্র এবং 'হড়' কথার অর্থ হলো সাঁওতাল। ৮ ভগীরথ হিন্দুত্বের উত্তরণের জন্য মঙ্গল দাস গোঁসাই এর কাছে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে এবং দক্ষিণ ভাগলপুরের এক মন্দিরে একটি সভা আহ্বান করেন। ইনি নিজেকে হিন্দু অনুসারী করার জন্য সিংহ বাহিনী , মহাদেব ও রামের উপাসনা চালু করেন। এ সময়ে মনে হয় সাঁওতালগন আধুনিকী করন ও সংস্কৃতায়নের দিকে ঝুঁকে ছিল। বহু সাঁওতাল সংস্কৃতি, পূজা পার্বন তাদের নিজস্বতা ধরে রাখতে পারলেও আজকের আধুনিকী করণের যুগে ওই সমস্ত ঐতিহ্য গুলিতে আধুনিকতার স্পর্শ লেগেছে। বর্তমান সাঁওতাল সমাজ গুলিতে বিশেষ করে যুবকরা হিন্দুদের বহু অনুষ্ঠান সাড়ম্বরে পালন করে থাকে। যেমন কালীপূজা, দুর্গাপূজা, সরস্বতীপূজা, বিশ্বকর্মা পূজা, হোলি ইত্যাদি। এছাড়া সাঁওতাল যুব সমাজে বর্তমানে যে গুলি বেশি পরিমানে প্রচলিত সেগুলি হল- জন্মদিন পালন, বিবাহ বার্ষিকী বা ভেলেন্টাইন ডে পালন উল্লেখযোগ্য। তারা কর্মজীবনে প্রবেশের সাথে সাথে তাদের খাদ্যাভাস, এবং পোশাক পরিচ্ছদের আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তন এতই বেশি যে শুধু জঙ্গল মহল বা পুরুলিয়ার প্রত্যন্ত কোনো গ্রামের সঙ্গে এদের পার্থক্য খুব সহজেই চোখে পড়ে। এতো কিছুর পরে ও এই কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে সাঁওতালদের সমাজ, সংস্কৃতিক

জীবনে বা উৎসবগুলিতে বিভিন্ন ধর্মের প্রভাব দেখা গেলেও তাদের চিরা চরিত উৎসব বা সাজিক জীবনে প্রাচীন ঐতিহ্যের শিকড় এখনো পর্যন্ত দৃঢ় ভাবে বর্তমান। এতো কিছুর পরেও তারা সামাজিক দিক থেকে এই সমাজে বিশেষ কিছু বিচ্যুতি ঘটেনি তার একমাত্র কারণ হল- ভাষা, সাহিত্য ও সংগীত, নৃত্যে সাঁওতালদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের একটি পরম্পরা বজায় আছে। নিজেদের এই সভ্যতা ও ঐতিহ্য নিয়ে তারা কখনোই হীনমন্যতায় ভোগেনি, বরং তারা আত্মতৃপ্ত ও আত্মসন্তুষ্ট।

তথ্য সূত্র :

১. ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে-পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ, বাস্কে পাবলিকেশন, কলকাতা-২০১৮, পৃ-১৮৭ ।

২. সুরঞ্জন মিদ্দে-সাঁওতাল ও মিশনারী, নান্দনিক, কলকাতা-২০১৮, পৃ-৩০।

৩. শুচিব্রত সেন-ভারতের আদিবাসী সমাজ, পরিবেশ ও সংগ্রাম, বুকপোস্ট পাবলিকেশন, কলকাতা-, পৃ-১৩৫।

৪. ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে-পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ, বাস্কে পাবলিকেশন, কলকাতা-২০১৮, পৃ-১৯২।

৫. ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে-পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ, বাস্কে পাবলিকেশন, কলকাতা-২০১৮, পৃ-২১৩।

৬. ইয়াসিন খান সম্পাদিত- জঙ্গল মহল: সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্য, প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা-২০১৯, পৃ-১৩৯।

৭. শুচিব্রত সেন-ভারতের আদিবাসী সমাজ, পরিবেশ ও সংগ্রাম, বুকপোস্ট পাবলিকেশন, কলকাতা-, পৃ-১৫৪।

৮. শুচিব্রত সেন-ভারতের আদিবাসী সমাজ, পরিবেশ ও সংগ্রাম, বুকপোস্ট পাবলিকেশন, কলকাতা-, পৃ-১৬০।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোট গল্পে নারী

সুপর্ণা কুণ্ডু চ্যাটার্জী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রানাঘাট কলেজ

সারসংক্ষেপ:
প্রেমেন্দ্র মিত্র বাংলা কথাসাহিত্য জগতের সর্বাধিক উজ্জ্বল পুরুষদের অন্যতম একদম। ব্রিটিশশাসিত ভারতবর্ষে বিশ শতকের ত্রিশের দশকে বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও প্রেমেন্দ্র মিত্র – কল্লোলীয় ধারাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। সাধারণ জনজীবনের দারিদ্র্যক্লিষ্টতাকে প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর ছোটগল্পে শৈল্পিক সার্থকতায় তুলে এনেছেন। যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নারী চরিত্র।

বাংলা সাহিত্যে নারী চরিত্র নতুন কিছু নয়, তবুও, প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাহিনীতে এর বহুমাত্রিকতা তৈরী হয়েছে। প্রায় সমস্ত সম্ভাব্য দৃষ্টি দ্বারা এই নারী চরিত্র গুলি চিত্রিত হয়েছে প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রথম দিকের গল্পগুলি মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্তদের অবলম্বনেই রচিত। পিতা স্বার্থান্ধ না হয়ে নিজ পুত্রের চেয়েও প্রতিবেশী সৎ-পুত্রের জীবনকামনা করেন (পুন্নাম)। গতানুগতিকতার চাপে দারিদ্র্যের কষাঘাতে সকল আদর্শ লুপ্ত হয়ে যায় (ভবিষ্যতের ভার) উচ্ছৃঙ্খলতার কাছে জীবনের করুণতম আবেদনও ব্যর্থ হয় (জীবন যৌবন)। ভালোবাসার জন্য জীবনের ভবিষ্যৎকে নষ্ট করার মধ্যে একটা আত্মত্যাগ আছে, তেমনি আছে নারীর প্রতি একটা কৃপা, বর্তমানে নারী সেই কৃপা চায় না (বৃষ্টি), অভ্যাস বা কুসংস্কারের কাছে যৌবনের সব স্বপ্ন একদিন ধূলিসাৎ হয়ে যায় (অমোঘ), পতিত জীবনকে দূর থেকে অবজ্ঞেয় মনে হলেও তারা অনেক সময়েই অবজ্ঞার পাত্রী নয় (বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে) এর মধ্যে আছে নিরুপায় বীভৎসতার এক সংযত চিত্র; দুর্বোধ্য জীবন, তার চেয়েও দুর্বোধ্য জটিল মানুষের মন (মৃত্তিকা, এবং পরাভব)। ১৯২৩ এবং ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে শুধু কেরানী, গোপনচারিণী ছোটগল্প এবং পাঁক উপন্যাস নিয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে গুঢ়তর বাস্তবতা অন্বেষণের স্পৃহা ও তৎপরতার একটি অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।

বস্তুত প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পগুলির মধ্যে এমন একটি ভাবসত্য আছে, যা কেবল মাত্র সাময়িকের নয়, যা চিরন্তনী। সেজন্য প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পগুলির আবেদনও সুদূর প্রসারী। নারী যার অলঙ্কার নয়, সামগ্রিক ভাবনার সঙ্গে অস্থি মজ্জায় মিশে যাওয়া চরিত্রের সমাহার।

মূল প্রবন্ধ

প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-৮৮) বাংলা কথাসাহিত্য জগতের সর্বাধিক উজ্জ্বল পুরুষদের অন্যতম একদন। ব্রিটিশশাসিত ভারতবর্ষে বিশ শতকের ত্রিশের দশকে বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-৭৬) ও প্রেমেন্দ্র মিত্র – কল্লোলীয় ধারাকে এগিয়ে নিয়ে

গেছেন। সাধারণ জনজীবনের দারিদ্র্যক্লিষ্টতাকে প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর ছোটগল্পে শৈল্পিক সার্থকতায় তুলে এনেছেন। যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নারী চরিত্র।

বাংলা সাহিত্যে নারী চরিত্র নতুন কিছু নয়, কিন্তু একথা মাথায় রাখতে হবে, প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাহিনীতে এর বহুমাত্রিকতা তৈরী হয়েছে। প্রায় সমস্ত সম্ভাব্য দৃষ্টি দ্বারা এই নারী চরিত্র গুলি চিত্রিত হয়েছে। এক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি কাহিনী ব্যবহৃত হলো।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'শুধু কেরানী'(১) নববিবাহিত কেরানি তার নববধূকে যেভাবে ভালোবাসায় আগলে রাখে; এবং বউটিও একইভাবে – সে-প্রসঙ্গই গল্পটিতে তুলে ধরা হয়েছে। ফুলের মালা এনে দিয়েছে স্বামী তার স্ত্রীকে। ট্রামে না এসে, ট্রামের ভাড়া বাঁচিয়ে সেই টাকা দিয়ে ফুলের মালা কিনে আনতে হয়েছে কেরানিকে। এ-নিয়ে স্ত্রী অভিমান করেছে - স্বামীর কষ্ট হয়েছে বলে। স্ত্রীর জ্বর হলে স্বামী তাকে রাঁধতে দিতে চায় না। কারণ গরমে-ঘামে স্ত্রীর জ্বর আরো বেড়ে যাবে। পরস্পরের প্রতি প্রচণ্ড রকম ভালোবাসা তাদের। সুখানুভূতি তাদের প্রবল। অর্থাভাব ও দারিদ্র্যক্লিষ্টতায় তারা জর্জরিত হলেও তাদের হৃদয়ানুভূতি পরস্পরের জন্য উত্তুঙ্গ ও উদ্গ্রীব। কেরানি প্রায়ই হেঁটে আসে অফিস থেকে; ট্রাম ভাড়া বাঁচিয়ে তা দিয়ে 'সূতিকা' রোগী স্ত্রীর চিকিৎসা-খরচ জোগানোর জন্য। তবু স্ত্রীকে শেষ পর্যন্ত বাঁচানো যায় না। দুজনের কেউ-ই ভগবানের প্রতি অভিযোগ করে না। স্ত্রীর বেঁচে থাকার ইচ্ছা এবং স্বামীর স্ত্রীকে বাঁচিয়ে রাখার আকাঙক্ষা – উভয়ের হৃদয়গত ক্রন্দন যেন সমস্ত পাঠকের ক্রন্দন হয়ে ওঠে গল্পটিতে।

'শুধু কেরানী' গল্পটির শেষ বাক্য মনে করা দরকার : 'তখন কাল-বৈশাখীর সমীকরণ আকাশে নীড়ভাঙার মহোৎসব লেগেছে।' (২) অর্থাভাবে স্ত্রীর ভালো চিকিৎসা করাতে না পারায় স্বামী-কেরানির অন্তরের যে-রক্তক্ষরণ স্ত্রীর করুণ হাসির মধ্যে যে প্রতিভাত তা নিম্নোক্ত ভাষ্যে স্পষ্ট : 'একটা হাসি আছে – কান্নার চেয়ে নিদারুণ, কান্নার চেয়ে যেন বেশি হৃৎপিন্ড নেংড়ানো।' (৩) অনুভূতিময় দাম্পত্য যে দারিদ্র্যক্লিষ্টতায় কীভাবে আপামর পাঠকের কান্নায় রূপায়িত হয়, সে প্রমাণ এখানে পাওয়া যায় : 'শুধু সেদিন জ্ঞান হারাবার আগে মেয়েটি একটিবারের জন্যে এতদিনকার মিথ্যাকরণ ছলনা ভেঙে দিয়ে কেঁদে ফেলে বললে – 'আমি মরতে চাইনি – ভগবানের কাছে রাতদিন কেঁদে জীবন ভিক্ষা চেয়েছি, কিন্তু -' (৩ক)।

সামগ্রিক কাহিনীতে নারী চরিত্রটি সীমিত হলেও তার এক স্বাভাবিক বিশ শতকের দুর্দশা ক্লিষ্ট রূপের আভাস পাওয়া যায়। যা নিশ্চিতভাবেই প্রেমেন্দ্র মিত্রের জীবন থেকে নেওয়া দৃষ্টি ভঙ্গীর ফসল।

'পুন্নাম'(৪) – গল্পটির ঘটনা-বস্তুসার হলো নিম্নবিত্ত ললিত ও ছবির পাঁচ বছরের পুত্রসন্তানের ক্রমশ সুস্থ হয়ে ওঠা। খোকা ঘুমায় না। তার ঘুম আসে না। সর্বক্ষণ জেগে থাকে। মা-বাবাকে ঘুমাতে দেয় না। সে সবসময় কাঁদে। মা ছবি বিরক্ত হয়ে তাকে

চাপড় মারে। জাহাজের চাকুরে ললিতও চাকরি থেকে এসে ছেলের চিৎকার-চেঁচামেচিতে ঘুমাতে পারে না। ডাক্তার বলেছে, হাওয়া পরিবর্তন করলে খোকা সেরে উঠবে। গরিব পিতার চেঞ্জে যাওয়ার সামর্থ্য নেই। স্ত্রীর হাতের চুড়িই একমাত্র সম্পদ তাদের। ললিত বাধ্য হয়ে জাহাজের গাঁটরি বিক্রি করে অর্থ জোগাড় করে ছেলেকে চেঞ্জে নিয়ে গেছে। চেঞ্জে নিয়ে গিয়ে টুনু নামক এক শিশুর সঙ্গে তাদের পরিচয় হয়। সে খোকার সঙ্গে খেলতে আসে। ললিতের অর্থাভাব ও নিম্নবিত্ততার মধ্যে তার ছেলে খোকার অনুদারতা ও হিংসার বীজ লুকায়িত – সেটিই লেখক প্রকারান্তরে গল্পটিতে তুলে এনেছেন।

এক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে নারী চরিত্র খুবই সামান্য। কিন্তু কোথাও যেন খোকার অনুদারতা তার মায়ের অন্তর্নিহিত চরিত্র তুলে ধরে। কারন খোকার অসুস্থতার জন্য তার বাবা ললিত তাকে ঘোরাতে নিয়ে যেতে চাইলে ছবি কিন্তু বাধা দিয়েছিল।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'সাগর সংগম' (৫) গল্পের একজন ধর্মপ্রাণ বিধবা নারী প্রথমে এক যৌনকর্মীর কিশোরী মেয়ে বাতাসিকে নেতিবাচকভাবে গ্রহণ করেছিল; সাগরসঙ্গমে যাওয়ার পথে নৌকায় তাদের পরিচয় ও তীর্থে তাদের সময়যাপনের পরে সেই যৌনকর্মীর কন্যা বাতাসিকেই নিজ কন্যা হিসেবে পরিচয়দানের মধ্যে প্রকাশ পায় তার মাতৃত্ব ও ঔদার্য। বালবিধবা দাক্ষায়ণী বালিকা বয়সে বিধবা হলেও তার 'অননুকরণীয় নিষ্ঠা ও ধর্মাচরণের জন্য' লোকজন তাকে শ্রদ্ধা করতো। লক্ষ্মণ তীর্থযাত্রার ব্যবস্থা করেছিল। প্রচণ্ড ভিড় ছিল নৌকায়। এই কারণে দাক্ষায়ণীর লক্ষ্মণের প্রতি প্রচণ্ড রাগ ছিল। অন্যদিকে, যৌনকর্মীদের নৌকায় তোলায় সে আরো বিরক্ত হলো। তার শুচিতা ও পবিত্রতা যেন নষ্ট হচ্ছে সেজন্যে।

বাতাসি নৌকায় ডাকসাইটে দাক্ষায়ণীকে 'ধুমসী মাগী' বলায় দাক্ষায়ণী বাতাসির প্রতি অত্যন্ত কুপিত ছিল। পরপর দুবার নৌকাডুবির ফলে অন্য সকলের সলিলসমাধির পর দাক্ষায়ণী ও বাতাসির মধ্যে যে মা-মেয়ের সম্পর্কোন্নয়ন ঘটে – তাতে জীবনের ঔদার্যের মাত্রারই পরিচয় বহন করে এই কাহিনী।

দাক্ষায়ণী যৌনকর্মীদের প্রচণ্ড ঘৃণা করতো; সেই সূত্রে তাদের কন্যা বাতাসিকেও; সেই দাক্ষায়ণীর মন ক্রমশ পরিবর্তিত হয়, হতে পারে সে বেশ্যাকন্যা নয়; বেশ্যার পালিতা-কন্যা; কোনো সদ্বংশজাত। অথবা যদিও বা হয়

বেশ্যা-কন্যা বাতাসির তো এই পঙ্কে জন্মগ্রহণের কোনো হাত ছিল না এসব ভাবতে থাকে দাক্ষায়ণী। মাতৃত্ব-মায়ায় বাতাসিকে অন্তর থেকে গ্রহণ করার মধ্যে দাক্ষায়ণীর চিন্তার একপ্রকার পুনর্জন্ম ঘটিয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র পরম মানবিক ঔদার্যের পরিচয় প্রদান করেছেন, নিজের এবং নিজসৃষ্ট নারী চরিত্রের।

কাহিনীটি সামগ্রিক ভাবে নারী চরিত্রের ভিত্তিতে রচিত, এবং নিশ্চিতভাবে লেখক শুধু নিজের নয়, একজন নারীর সর্বজনীন মাতৃত্ব কে দেখিয়েছেন, আক্ষরিক

অর্থেই শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর কাহিনী ছাড়া বাংলা সাহিত্যে এমন পূর্বাপর কোনো উদাহরণ নেই।

'মহানগর'(৬) গল্প আসলে কলকাতা মহানগরসমূহ পৃথিবীর যে কোনো শহরের প্রতীক। কলুষ-কালিমা ও রিরংসাকাতরতায় যে-মহানগর জড়িয়ে রয়েছে – রতনের বোন চপলা সেই মহানগরেরই কলুষ-কালিমার শিকার এক নারী। চপলার বিয়ে হয়েছিল। কোনো সূত্রে তাকে মহানগর থেকে রিরংসাচাপল্যে প্ররোচিত করে অথবা জোর করে বেপথু করা হয়। চপলার বাবাসহ পরিবারের কেউ চপলার কথা আর বলে না, মনে করে না, তাকে বাড়ি আনতে চায় না।

রতন বয়সে ছোট। বেশ্যাবৃত্তির ব্যাপারে সে জানে না। বাবার সঙ্গে সে শহরে যায়। তার দিদি যে উল্টোডিঙি শহরে থাকে – তা রতন জানে। সে কৌশলে তার বাবার থেকে ছিটকে পড়ে অনেক দূরের পথ – উল্টোডিঙি খুঁজে বের করে। ভাগ্যক্রমে সে তার দিদিকে অন্য এক বেপথূ মহিলার মাধ্যমে পেয়ে যায়। কিন্তু রতন জানে না এই মহিলা কে। রতন জানে না কেন তার দিদি চপলা তাকে বলে যে, কেন রতন চপলার এই ঘরে থাকতে পারবে না। রতন জানে না কেন চপলার পক্ষে আর বাড়িতে ফেরা সম্ভব নয়। চপলা যেহেতু নিষিদ্ধপল্লীতে থাকে – ঘৃণিত জীবন যাপন করে – সেজন্য তার পক্ষে তার নিজ ও শ্বশুর বাড়িতে আর ফিরে যাওয়া অসম্ভব। তবে রতন যে বলেছে, সে বড় হয়ে তার দিদিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, কারো কথা সে শুনবে না।

চপলা নাম্নী রমনীদের এমন কাহিনী কলকাতার মহানাগরিক জীবনের অঙ্গ যার থেকে এই ' কল্লোলিনী তিলোত্তমা' নামক চোখ ধাঁধানো নামটির সম্পর্ক এর জন্মলগ্ন থেকে। কিন্তু রতনরাই যুগ যুগ ধরে স্বপ্ন দেখে এই দুঃস্বপ্ন মুছে দেওয়ার, আর চপলারা আশায় আশায় স্বপ্ন দেখে ' কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে ' - তাদের জন্যও।

'সংসার সীমান্তে' (৭) গল্পের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর ঘরসংসার করার যে পারিবারিক বৃত্ত – সেটি থেকে বেরিয়ে এসে জীবনের অবৈধ রিরংসা ও অর্থপ্রাপ্তির মাধ্যমে জীবনকে কোনোরকমে যাপনের বার্তা বিঘোষিত হয়েছে। একটি টাকার জন্যে রজনী প্রথম রাতে অঘোর দাসকে ঘরে আশ্রয় দিয়েছে। আবার অঘোর দাস এলে টাকা নিয়ে অঘোর পালিয়েছিল বলে সেই প্রতিশোধ নিতে রজনী অঘোরকে চোর হিসেবে সাব্যস্ত করায় লোকজন তাকে মেরে প্রায় আধমরা করে ফেলেছিল। পুলিশের এবং বাড়িওয়ালিরও যাতে হাঙ্গামা না হয় সেজন্যে আহত অঘোর দাসকে রজনী বেশ কিছুদিন ধরে শুশ্রূষা করেছে। পাঁচ টাকার বিনিময়ে। অঘোর দাস চুরি করে রজনীকে টাকা এনে দিয়েছে। রজনী তাকে বলেছে যেন সে আর চুরি না করে। অঘোর রজনীকে নিয়ে অন্য জায়গায় গিয়ে কলকাতা থেকে দূরে কোথাও ঘরসংসার করতে চেয়েছে। রজনীর বাড়িওয়ালির টাকা, ঋণ ও কিস্তির টাকাও অঘোর দাস চুরি করে মিটিয়ে দিয়ে

রজনীকে নিয়ে ঘর বাঁধতে চেয়েছে। এরপরেও অঘোর জেলে গেছে। এভাবে অঘোর-রজনীর সংসার সীমান্ত হয়ে পড়েছে বিপদসংকুল।

এখানে যে জীবন ফুটে উঠেছে তা মধ্যবিত্ত জীবনের চিত্র নয়। কিন্তু এই জীবনেই নারী আছে, তার লড়াই, প্রেম, সংসার করার আকাঙ্খা, অপেক্ষা, সব আছে। আছে প্রতিশোধ নেওয়ার সাধ, আবার নিজের সংসারে বাঁচার সাধ। সব মিলিয়ে এখানেও নারী অপরূপা।

'শৃঙ্খল' (৮) গল্পের ভূপতি ও বিনতির যে দাম্পত্য-জীবন শৃঙ্খলিত ও উদ্ধত। ভূপতির মা বিধবা। চৌদ্দো-পনেরো বছরের এক ভীরু লাজুক নিরীহ মেয়ে হলো বিনতি। একা বড় হওয়ায় – একমাত্র মা ভূপতির সঙ্গী হওয়ায় সামাজিক নির্দিষ্টতায় সে বড় হতে পারেনি। আচরণে ও অনুভবে সে চোস্ত হতে পারেনি। খাপছাড়া স্বভাব। অনেকটাই অনুভূতিহীন,কোমলতাহীন, রূঢ়, অনাকর্ষণীয় ও রুক্ষ। জীবন দিয়ে জীবনকে, অনুভূতি দিয়ে অনুভূতিকে গাঁথার মানসিক সামর্থ্য ভূপতির ছিল না। সেজন্যেই বিনতিকে সে অন্তরের অনুভব দিয়ে আনন্দিত করতে পারেনি। ভূপতির মাকে সে খরচের টাকা দিতে দেরি করেছে; মা তার কাছে টাকা চেয়েছে; ভূপতি বলেছে তার পুত্রবধূর কাছ থেকে নিতে। এতে মা কষ্ট পেয়েছে। পুত্রবধূকে মা শাসন করতে পারছে না বলে মাকে ভূপতি অভিযুক্ত করেছে। এতেও ভূপতির মা কষ্ট পেয়েছে। কষ্ট নিয়েই মা মারা গেছে। বিনতি মৃত সন্তান প্রসবের পর ডাক্তার বিনতিকে আরো কয়েকদিন হাসপাতালে রাখতে ভূপতিকে পরামর্শ দিয়েছে। ভূপতি তা মানেনি। তাতে বিনতি মারাও যেতে পারতো বলে ডাক্তার আশংকা করেছিল। ভূপতির অনুভূতির মধ্যেই এই ধরনের গূঢ় নিষ্ঠুরতা কাজ করতো। বিনতিকে বায়োস্কোপ দেখাতে নিয়ে গিয়ে তাকে না নিয়েই সে হঠাৎ করে শো শেষ হওয়ার আগেই বাড়িতে আসার জন্য বেরিয়ে পড়েছিল। বিনতি এই প্রত্যাখ্যানের কষ্ট পেয়ে হয়তো আর ভূপতির বাড়িতেই যাবে না – এই ধরনের দূরত্ব ও সম্পর্কচ্ছেদের জন্যেই ভূপতি তা করেছে। এই ধরনের গোপন নিষ্ঠুর-কদর্যতা ভূপতির স্বভাবের মধ্যে ছিল।

ভূপতি কে কেন্দ্র করে আবর্তিত দুই প্রজন্মের দুই নারী, অবদমিত আখাঙ্খা ও অনাস্বাদিত ইচ্ছার অপ্রাপ্তি নিয়েই তারা রয়ে যায় এই সমাজে এই নারী কেন্দ্রিক চিত্র ফুটে ওঠে এই কাহিনীতে।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' (৯) একটি অনন্যসাধারণ ছোটগল্প। বাংলা ছোটগল্পের জগতে ভাষাশৈলী, বর্ণনাবিন্যাস ও চরিত্রসৃজনে এই গল্পটি শ্রেষ্ঠ দশটির মধ্যে একটি । যামিনীর রূপের যে শ্যামলিমা ও কারুণ্য এবং করুণ চাহনির যে শান্ত-সৌম্য উত্তীর্ণতা, নিরঞ্জনের জন্য প্রতীক্ষমানতার যে স্বপ্ন, যামিনীর মায়ের কোটরাগত চোখের মধ্যে স্বপ্ন-দুঃস্বপ্নের যে ছায়াপাত, নিরঞ্জনকে পাওয়ার পর মেয়ে যামিনীর তার সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে শুনে যামিনীমাতার যে প্রশান্তির প্রদীপ্তি, নিরঞ্জনের বদলে নায়ক হিসেবে যে নিজেকে সেই জায়গায় উপস্থাপন করছে, তেলেনাপোতায়

আবার বড়শি দিয়ে মৎস্য শিকারে যাওয়া, নিসর্গ দর্শন এবং যামিনীর করুণ-সৌম্য দৃষ্টির সঙ্গে সন্নিপাতের যে আকাঙক্ষা, সর্বোপরি গ্রাম বাংলার নৈসর্গের চিত্র এবং তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কাহিনীর সমাহার প্রেমেন্দ্র মিত্রকে পাঠকের অন্তরে স্থাপন করেছে – তাঁকে বাংলা ছোটগল্পের এক অসাধারণ শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। তেলেনাপোতা আসলে পাঠকের স্বপ্নপ্রতিম একটি জায়গা, আকাঙক্ষার একটি আকর, প্রেমের একটি পাদপীঠ। যামিনীর রূপের প্রচ্ছায়ার বর্ণনা একটি প্রদীপ্ত নান্দনিকতা প্রেমেন্দ্র মিত্রের। সে যুগপৎ আনন্দ-বিষণ্ণ বর্ণন মনে করা যাক : 'মেয়েটি কোন্ বয়সের আপনি বুঝতে পারবেন না। তার মুখের শান্ত করুণ গাম্ভীর্য দেখে মনে হবে জীবনের সুদীর্ঘ নির্মম পথ সে পার হয়ে এসেছে, তার ক্ষীণ দীর্ঘ অপুষ্ট শরীর দেখলে মনে হবে কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে উত্তীর্ণ হওয়া তার যেন স্থগিত হয়ে আছে।' (৯ক)

যামিনির চরিত্র তার জীবনের রূপক, তা যেন প্রতিটি নারীরই জীবন, কজনই বা কাঙ্ক্ষিত সঙ্গী লাভ করে।

'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' (১০) গল্পে জীবনের বিকার ও বিকৃতির ইতিবৃত্ত বিবৃত হয়েছে। ঘর ভাড়া এবং বাড়িওয়ালিকে খোরপোশ দিতে না পারা এক পতিতা বেগুনের শিকার ধরার প্রচেষ্টা গল্পে বর্ণিত হয়েছে। বিকৃত চেহারার একজনকে পছন্দ না হওয়ায় তাকে তার কাজের শিকার হিসেবে গ্রহণ না করে বেগুন চলে গেছে। জুয়াড়িকেও বেগুন জড়িয়ে ধরেছিল ভিড়ের মধ্যে। এক শিখ এসে বেগুনকে ভিড় ঠেলে বাইরে সরিয়ে দেয়। রূপো নাম্নী অন্য এক রূপোপজীবীর বৃদ্ধ শিকারকে বেগুন শেষ পর্যন্ত ধরল। কিন্তু দারোয়ান বৃদ্ধকে ধরে নিয়ে যাওয়ায় সেই খদ্দেরকেও বেগুন পেল না। অর্থাভাবে জীবন চলে না বেগুনের। ফেরার পথে আবার বেঞ্চে শুয়ে থাকা সেই বিকৃত-চেহারার লোকটির সঙ্গেই বেগুন আলাপ জমিয়ে খদ্দের হিসেবে তাকে গ্রহণের চেষ্টা চালায়। কিন্তু তার কাছে এক কপর্দক পয়সাও ছিল না। তাই তো বেগুনের চিৎকার : 'বিনি-পয়সায়ইয়ার্কি দিতে এসেছ হারামজাদা চোর।' (১১)। বাড়িভাড়া দিতে না পারাসহ নিজের ক্ষুণ্ণিবৃত্তি নিবারণের জন্যে বিগত-যৌবনা এই বেগুন তার কামসঙ্গী জোগানোর কত প্রচেষ্টা চালাল; কিন্তু পেল না – এই বৃত্তান্ত গল্পটাতে বিধৃত আছে। তাই বাধ্য হয়ে জীবনে বেঁচে থাকার জন্যে পতিতাবৃত্তিতে জড়িয়ে বিগতযৌবনা হয়ে যাওয়ার কারণে খদ্দের না পাওয়াতে অর্থাভাবে জীবন আর যাপন করা যাচ্ছে না বেগুনের। ক্ষুধার ফাঁদে এভাবে বেগুন জড়িয়ে পড়েছে। বেগুনের কাজ যেহেতু বিকৃত; এজন্য গল্পকার গল্পের নাম দিয়েছেন 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে'।

বেগুনদেরও আর্থিক সংস্থান থাকলে তারা হয়তো ঘৃণ্য এ বেশ্যাবৃত্তির সঙ্গে জড়িত থাকত না। ঘৃণ্য এই পাপকর্মে বেগুন আসলে জড়াতে চায়নি। বেঁচে থাকার প্রয়োজনে বাধ্য হয়ে সে তাতে জড়িয়েছে।

নিশ্চিতভাবে একথা বলা চলে ' বেগুন ' চরিত্র টি যেমন একাধারে ওই নারীর প্রকৃতিকে চিহ্নিত করে, তেমনই তুলে ধরে তার গুন অথবা গুনহীনতা কিংবা সর্ব গুণের আধার বা সর্ব রকম প্রয়োজনে ব্যবহৃত খাদ্য টিকে যা নারীটির কাহিনি গত বৈশিষ্ট্য।

সব্যসাচী লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতার মতো গল্পেও যন্ত্রণা, প্রতিবাদ, অসহায়ত্ব আছে। আবার কবিতার যে জীবন-প্রেম, সুন্দরের জন্য গভীরতম আর্তি, গল্পেও তাও আছে। তিনি সমকালীন জীবনের দুঃখ, মায়ের চোখের অসহায় অশ্রু, গলিত কুষ্ঠ, লোভের নিষ্ঠুরতা, অপমানের ভীরুতা, লালসার জন্য বীভৎসতা, নারীর ব্যভিচার, কদাকার অহঙ্কার, উন্মাদক বিকলাঙ্গ। রুক্ষ-গলিত শব্দ এ সমস্ত দেখেছেন। কিন্তু এসব দেখেও তিনি কল্যাণকে অভিনন্দিত করতে চান। তাই তাঁর দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, জীবন সম্পর্কে ভাব-ভাবনায় আছে সন্ধিৎসু মনের প্রাবল্য।

পৃথিবীর একদিকটা আলোকিত - সেদিকটা যেমন সত্য, অন্যদিকের অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকটাও সমানসত্য। সমাজের ক্ষেত্রেও সে কথা একইভাবে প্রযোজ্য। তাই সেই অনালোকিত সমাজের দিকটাও নিপুণ চিত্রকরের মতো ফুটিয়ে তুলেছেন। ‘একটি রাত্রি’, ‘সংসার সীমান্তে’ কিংবা ‘পয়লা চোরের কেচ্ছা’ তারই নিদর্শন।

‘সংসার সীমান্তে’ গল্পটি এমন দুই নারী পুরুষের গল্প যারা প্রকৃত অর্থে সংসার সীমানার বাইরে বসবাসকারী অতি নগন্য মানুষ – অঘোর দাস একজন চোর, আর রজনী বিগতযৌবনা রূপহীনা পতিতা। এই নরনারীর মাধুয্যেও যে মধুর প্রণয়ঘটিত সম্পর্ক হতে পারে তা তথাকথিত ভদ্র সম্প্রদায়ের ভাবনার বাইরে। সন্দেহ নেই বাংলা সাহিত্যে এমন প্রেম বিরল, আর প্রেমেন্দ্র মিত্র বসলেন সেই রূপকথার গল্প লিখতে। গল্পে পলাতক আসামি অঘোর বর্ষাক্লান্ত গভীর রাতে চুরি করতে গিয়ে পালিয়ে বাঁচতে আশ্রয় নিয়েছে রজনীর ঘরে। আবার ভোরে সকলের অলক্ষে পালিয়ে গিয়েও দুপুরে আবার এসেছে। কলঙ্কিত ইতিহাসে রূপকথার গল্প বুনেছে সেবা – মন কষাকষি – শাসন কিংবা ‘আজ একটু অম্বল রাঁধতে পারিস’ এর মতো আবদারে। এরপর সেই রূপকথার গল্প ঘর বাঁধার প্রস্তুতি নিয়েছে। আর ঠিক তখনই আছড়ে পড়েছে বাস্তবের মাটিতে। রজনীর ধার শোধার জন্য প্রয়োজনীয় কুড়ি টাকা জোগাড়ে শেষ চুরি করতে গিয়ে অঘোরের পাঁচ বছরের জেল আর রজনীর ডিবার নিবো নিবো আলো হাতে প্রতীক্ষা – নির্মম বাস্তবের শাশ্বত ছবি, এ ছবি স্বপ্ন দেখা ও স্বপ্নভঙ্গের ইতিকথা – এর মধ্যে দিয়েই চলে ‘সংসার সীমান্তে’ থাকা মানুষের জীবন।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রথম দিকের গল্পগুলি মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্তদের অবলম্বনেই রচিত। পিতা স্বার্থান্ধ না হয়ে নিজ পুত্রের চেয়েও প্রতিবেশী সৎ-পুত্রের জীবনকামনা করেন (পুন্নাম)। গতানুগতিকতার চাপে দারিদ্র্যের কষাঘাতে সকল আদর্শ লুপ্ত হয়ে যায় (ভবিষ্যতের ভার) উচ্ছৃঙ্খলতার কাছে জীবনের করুণতম আবেদনও ব্যর্থ হয় (জীবন যৌবন)। ভালোবাসার জন্য জীবনের ভবিষ্যৎকে নষ্ট করার মধ্যে একটা আত্মত্যাগ

আছে, তেমনি আছে নারীর প্রতি একটা কৃপা, বর্তমানে নারী সেই কৃপা চায় না (বৃষ্টি), অভ্যাস বা কুসংস্কারের কাছে যৌবনের সব স্বপ্ন একদিন ধূলিসাৎ হয়ে যায় (অমোঘ), পতিত জীবনকে দূর থেকে অবজ্ঞেয় মনে হলেও তারা অনেক সময়েই অবজ্ঞার পাত্রী নয় (বিকৃত ক্ষুধার ফাদে) এর মধ্যে আছে নিরুপায় বীভৎসতার এক সংযত চিত্র; দুর্বোধ্য জীবন, তার চেয়েও দুর্বোধ্য জটিল মানুষের মন (মৃত্তিকা, এবং পরাভব)। ১৯২৩ এবং ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে শুধু কেরানী, গোপনচারিণী ছোটগল্প এবং পাঁক উপন্যাস নিয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে গুঢ়তর বাস্তবতা অন্বেষণের স্পৃহা ও তৎপরতার একটি অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। (১২)

বস্তুত প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পগুলির মধ্যে এমন একটি ভাবসত্য আছে, যা কেবল মাত্র সাময়িকের নয়, যা চিরন্তনী। সেজন্য প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পগুলির আবেদনও সুদূর প্রসারী। নারী যার অলঙ্কার নয়, সামগ্রিক ভাবনার সঙ্গে অস্থি মজ্জায় মিশে যাওয়া চরিত্রের সমাহার।

তথ্যসূত্র:

১. শুধু কেরানী - *প্রবাসী* (২৩ ভাগ ২য় খণ্ড), চৈত্র ১৩৩০, পৃষ্ঠা ৮১৯-৮২২, সম্পা: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

২. ঐ - পৃষ্ঠা ৮২২।

৩. ঐ - পৃষ্ঠা ৮২১।

৩ক. ঐ - পৃষ্ঠা ৮২২।

৪ পুন্নাম, *প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প,* পৃষ্ঠা ১-১৪, *প্রকাশক শ্রী সৌরেন্দ্রনাথ বসু, নাভানা,* ৪৭ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা ১৩। ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ (১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ)।

৫. সাগর সঙ্গম, ঐ - পৃষ্ঠা ১৫৬-১৮১।

৬. মহানগর, ঐ - পৃষ্ঠা ২০৩-২১৪।

৭. সংসার সীমান্তে, ঐ - পৃষ্ঠা ১০৩-১২১।

৮. শৃঙ্খল, ঐ, পৃষ্ঠা ৬১-৭৫।

৯. তেলেনাপোতা আবিষ্কার, ঐ - পৃষ্ঠা ২৬৮-২৮০।

৯ক. ঐ, ঐ - পৃষ্ঠা - ২৭৩।

১০. বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে, প্রেমেন্দ্র মিত্রের নির্বাচিত গল্প - পৃষ্ঠা ৯৮-১০১। *দে'জ পাবলিশার্স,* ১৪২০।

১১. ঐ - পৃষ্ঠা ১০১।

১২. বাংলায় গল্প ও ছোটগল্প ড. সরোজ মোহন মিত্র, গ্রন্থবিকাশ, ২০১১।

কারাগার : উপনিবেশিক ভারতবর্ষে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রনের মাধ্যম

অরোজিৎ হালদার
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
দমদম মতিঝিল রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপঃ কারাগার সমাজ ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কারাগারের ধারণা প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষেও বিদ্যমান ছিল। কিন্তু উপনিবেশিক আমলে ভারতবর্ষে কারাগারের ধারণায় পরিবর্তন ঘটে। এইসময় কারাব্যবস্থায় সংস্কার সাধনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ এই সময় কারাগার সংশোধনাগারে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায় সরকার কারাগারের অভ্যন্তরে শিক্ষা সংস্কার, স্বাস্থ্য সংস্কার ও অন্যান্য সংস্কারমূলক কর্মসূচি প্রবর্তনের অজুহাতে ভারতীয় কারাবন্দীদের শারীরিক ও মানসিক ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিল। যার মাধ্যমে তারা ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থাকে নিজেদের বশীভূত করতে চেয়েছিল। তাই উপনিবেশিক সরকারের দ্বারা গৃহীত এই উদ্যোগ গুলি আদৌ কতটা আন্তরিক ও স্বতস্ফুর্ত ছিল তা নিয়ে গবেষণার প্রয়োজন আছে।

সূচক শব্দঃ কারাগার, রেগুলেশন এক্ট, কর্নওয়ালিস কোড, জুলুম, নিয়ন্ত্রণ, অন্ধকূপ, সংস্কার, শাস্তি, অপরাধ, সংশোধনাগার, আন্দোলন, গ্রেফতার, মগজধোলাই, স্বাস্থ্যবিধি, সিভিলাইজিং মিশন, অধঃস্তন, উৎপাদক, শিল্পক্ষেত্র, আইন-শৃঙ্খলা, উপনিবেশীকরন, আধিপত্য, বৈষম্য, পুনর্বাসন।

ভূমিকাঃ

ভারতবর্ষের বর্তমান আইন ও বিচার ব্যবস্থার গঠনের প্রক্রিয়া আকস্মিক নয়। বহু বছর ধরে ধীরে ধীরে ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান ভারতীয় আইন ও বিচার ব্যবস্থার সূত্রপাত ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি অতি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বিচার বিভাগ রাষ্ট্রের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যদি সমাজে একটি সুসংগঠিত আইন ও বিচার ব্যবস্থা থাকে তাহলে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকবে, বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে না। আবার এই বিচার ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল শাস্তিদান প্রক্রিয়া। আর এই শাস্তিদান প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হল জেল ব্যবস্থা বা কারাগার।

ভারতবর্ষে জেল ব্যবস্থার সূত্রপাত হয় প্রাচীন আমলে। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে বিচারের জন্য কিছু ছোট ছোট সংগঠন ছিল। ভারতীয় গ্রামীণ সমাজ আইনগত ও বিচার গত ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। তবে প্রাচীন ভারতীয় সমাজে একেবারে সুসংগঠিত এবং সুশৃঙ্খল আইন ও বিচার ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল - একথা বলা যাবে না। সেখানে বেশ কিছু ত্রুটিও ছিল। তবে তা সত্ত্বেও বলা যায় যে ছোট ছোট অপরাধ ও স্থানীয় বহু সমস্যার সমাধানে বিভিন্ন গ্রামীণ সংগঠন এবং গিল্ড গুলি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন

করেছিল। প্রাচীন ভারতীয় সমাজের আইন গুলি মূলত 'মনুস্মৃতি', 'যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি', চাণক্যের বিভিন্ন রচনা এবং বিভিন্ন শাস্ত্র থেকে সংগৃহীত হত। যা প্রাচীন ভারতীয় সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সাহায্য করেছিল। এরপর প্রথমে সুলতান ও পরে মুঘলরা আসার পর তারা এই আইন ও বিচার ব্যবস্থায় তেমন কোনো হস্তক্ষেপ না করে এটিকেই এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এটিই প্রথম প্রমাণ করে ভারতীয়রা নিজেরাও নিজেদের সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম।

এরপর ব্রিটিশরা আসার পর তারা নিজেদের স্বার্থে নতুন আইন ও বিচার ব্যবস্থার উত্থান ঘটায় ভারতবর্ষে। ভারতবর্ষে তাদের কার্যকলাপ মসৃণভাবে চালানোর জন্য ব্রিটিশরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের মাধ্যমে পূর্বতন জমি কেন্দ্রিক অভিজাততন্ত্রের পতন ঘটিয়ে একটি নতুন আইনি কাঠামো তৈরি করতে চেয়েছিল। এই সময় ভারতবর্ষের গ্রামীণ ক্ষেত্রে হিংসার ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছিল ব্রিটিশদের বিরোধিতা করে। এই অবস্থায় ব্রিটিশরা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে ভারতীয় সমাজের সমস্ত ক্ষমতাকে পরিশোধন করতে চেয়েছিল এবং এইসব হিংসাত্মক ঘটনা কে নিয়ন্ত্রন করতে চেয়েছিল। তারা ভেবেছিল এর মাধ্যমে তারা ভারতীয় নাগরিকদের প্রতিদিনের আচার-আচরণকে নজরে রাখতে সক্ষম হবে। এই উদ্দেশ্যেই পুরনো আইনগুলির সংস্কার করে বহু নতুন আইন প্রবর্তন করা হয়। যার মধ্য দিয়ে উপনিবেশিক পুলিশি ব্যবস্থার গোড়াপত্তন করা হয়। বহু বিচারালয় স্থাপন করা হয় এবং সর্বোপরি একটি নতুন কারা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়।

১৭৭৩ সালে লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস রেগুলেটিং অ্যাক্ট ও জেনারেল রেগুলেশন প্রবর্তন করেন। যার মাধ্যমে ভারতবর্ষে প্রথম সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর ১৭৯৩ সালে কর্নওয়ালিস কোড প্রবর্তনের মাধ্যমে ভারতে একটি নির্দিষ্ট আইন প্রবর্তনের কথা বলা হয়। ১৮৩৬ সালে Prison Discipline Committee (জেল শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি) গঠন করা হয়। যার সভাপতি ছিলেন টি বি ম্যাকাউলে। ১৮৬৪ সালে Prison Enquiry Committee (জেল অনুসন্ধান কমিটি) গঠন করা হয়। এখানে জেলখানা বা কারাগার সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কোন প্রতিষ্ঠান নয়, বরং এর মাধ্যমে বৃহত্তর সমাজে উপনিবেশিক জ্ঞানের প্রসার ঘটত। এই সময় কারাগারের কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আসে। কারাগার আগেও ছিল কিন্তু এই সময়ে এসে তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। এই সময় কারা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য পাল্টে যায়। একই সঙ্গে কারাগার সামাজিক নিয়ন্ত্রণ এবং আইনগত জুলুম বা নিগ্রহের অস্ত্র হয়ে দাঁড়ায়। এই সময় সমাজ থেকে অপরাধীদের উৎখাত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, যে কাজ করতে থাকে কারাগার গুলি।

বিগত তিন শতাব্দীতে ভারতবর্ষে শাস্তিমুলক প্রতিষ্ঠানগুলি এবং সমগ্র আইন ও বিচার ব্যবস্থার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে বেশ কিছু মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু

এ সত্বেও প্রশ্ন ওঠে যে উপনিবেশিক ভারতবর্ষে প্রবর্তিত কারা, আইন ও বিচার ব্যবস্থা আদৌ কি ব্রিটিশ ভারতের কারাগার গুলির প্রকৃত সংস্কার ঘটিয়েছিল, নাকি এর মাধ্যমে ব্রিটিশরা ভারতীয় জনগণ ও সমাজ ব্যবস্থাকে শুধুমাত্র নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিল ? অর্থাৎ কারাগারগুলি কি ব্রিটিশদের দ্বারা ভারতীয়দের উপর শোষণের অন্যতম প্রধান হাতিয়ারে পরিণত হয়েছিল ? উপনিবেশিক ভারতবর্ষের কারাগার গুলি সম্পর্কে ইতিহাস চর্চা করতে হলে উক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞানলাভ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কারাগার পরিচালনার মাধ্যমে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণঃ

ইংল্যান্ডে জেরেমি বেন্থাম এর হাত ধরেই ফৌজদারি আইনের সংস্কারের জন্য আন্দোলন শুরু হয়। বেন্থাম ইংল্যান্ডের পুরনো জেল গুলির ভারি ভারি স্থাপত্য কে সমালোচনা করেছিলেন। সেই সঙ্গে তিনি একটি অন্ধকারময় ঘরে বন্দীদের গাদাগাদি করে অবস্থানের বিষয়টিকে সমালোচনা করেন এবং একটি আলো-বাতাসময় জেল কাঠামো গড়ে তোলার দাবি জানান, যেখানে প্রত্যেক বন্দি পৃথক পৃথকভাবে এবং স্থায়ীভাবে বসবাস করতে সক্ষম হবে। ১৭৯১ এ তিনি তার গ্রন্থ 'Panopticon' (প্যানপটিকন) এ বৃহৎ বৃহৎ জেল ভবন গঠনের প্রস্তাব দেন। সেই সঙ্গে তিনি অন্ধকার কূপ এর বিরোধিতা করেন। তিনি এমন এক কারাগার গঠনের প্রস্তাব দেন যেখানে একজন পাহারাদার সর্বদা নজর রাখতে পারবেন।[১]

মিশেল ফুকোর মতে 'প্যানপটিকন' শুধুমাত্র কারাগারের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয় এটি সমাজের যে কোন আবদ্ধ মূলক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। প্যানপটিকন এর ধারণা পশ্চিমের দেশগুলিতে গৃহীত হয় এবং এর ফলে অপরাধ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে একটি নতুন পদ্ধতির জন্ম হয়। মিশেল ফুকো এর 'Discipline and Punish : The Birth of the Prison' গ্রন্থটি ১৭৫৭ সালে ফ্রান্সের প্যারিসে যে সমস্ত গণনির্যাতন বা অত্যাচারের ঘটনা ঘটেছিল সেগুলির পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হয়েছিল। এই সময় ফ্রান্সে রাষ্ট্র যেকোন অপরাধীকে অত্যন্ত নির্মমভাবে শাস্তি প্রদান করত। কখনো গায়ে গরম তেল ঢেলে দেওয়া হত, কখনো ছুটন্ত ঘোড়ার লেজের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হত, কখনো শূলে চড়ানো হত। এইভাবে সেই সময় রাষ্ট্র তার কর্তৃত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করত। তবে ফুকোর মতে ১৮৩০ এর দশক থেকে এই ধরনের বর্বরোচিত শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটতে থাকে। কোন কোন শাস্তির ধরন বিলুপ্ত হতে থাকে। বিশেষত যে সমস্ত শাস্তির মাধ্যমে শরীর ব্যপকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হত সেই ধরনের শাস্তি গুলি বিলুপ্ত হয়ে যায়। এই সময় শাস্তি প্রদান করার ক্ষেত্রে অপরাধীর শরীরকে এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা শুরু হয়। শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে বেশ কিছু সংশোধন মূলক প্রক্রিয়া শুরু হয়। ফুকোর মতে, নতুন এই দণ্ড ব্যবস্থায় আসামীর শরীরের তুলনায় তার আত্মা ও মননের শাস্তিকে আরও বেশি করে সুনিশ্চিত করা হয়। এই সময় থেকে শাস্তি প্রদানের মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় যাতে অপরাধী এই ধরনের শাস্তি গ্রহণের মাধ্যমে

সে তার দ্বারা সৃষ্ট অপরাধকে হৃদয়ের গভীর থেকে উপলব্ধি করতে পারে। এছাড়া এই সময় অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে কারাগারের সঙ্গে বিদ্যালয়, হাসপাতাল, প্যারেডগ্রাউন্ড, কল-কারখানা প্রভৃতিও যুক্ত হয়েছিল।[২]

কারাগার সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই আমাদের জানতে হবে কারাব্যবস্থা কি ? কারা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য গুলি কি কি ? এবং কেনই বা সমাজে কারাগারের প্রয়োজন ? যেকোনো সমাজে কারাগার প্রতিষ্ঠার পশ্চাদে চারটি মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে, সেগুলি হল - ১) Retribution ২) Incapacitation ৩) Deterrence এবং ৪) Rehabilitation। ১) Retribution অর্থাৎ যদি কোন ব্যক্তি সমাজে অন্যায় করে থাকে অথবা সমাজ বিরোধী কোনো কাজ করে থাকে তখন ঐ ব্যক্তি নীতিগতভাবে অথবা সাংবিধানিক ভাবে তার অপকর্মের জন্য যে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য সেই শাস্তি তাকে প্রদান করা। যাতে অপরাধী সমাজের প্রতি তার ঋণ পরিশোধ করতে পারে। ২) Incapacitation অর্থাৎ অপরাধীকে সমাজ থেকে বহিষ্কারের মাধ্যমে তাকে অক্ষম করা, যাতে সে সমাজের নিরাপরাধ অসহায় সাধারণ মানুষের কোন ক্ষতি সাধন করতে না পারে।

৩) Deterrence অর্থাৎ অপরাধীর সামনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির মাধ্যমে তাকে ভবিষ্যতে অপরাধ জনক কাজকর্ম থেকে প্রতিহত করা। যাতে মানুষ কোন অপরাধ করার আগে বহুবার চিন্তা করে। এর মাধ্যমে কারাগার গুলি সর্বদা চেষ্টা করে যাতে মানুষের জেলমুখি গমনের প্রবণতাকে কিছুটা হলেও কমানো যায়। ৪) Rehabilitation অর্থাৎ জেলের ভিতরে বিভিন্ন শিক্ষামূলক পাঠদান, কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিমূলক শিক্ষা প্রদান এবং মনস্তত্ত্ববিদ এর পরামর্শ ইত্যাদি প্রদান করার মাধ্যমে অপরাধীকে সামাজিক জীবনে পুনর্বাসিত করা। এর মাধ্যমে অপরাধী অপরাধী থেকে সমাজের একজন আইন মান্যকারী সভ্য মানুষে পরিণত হয় এবং তার দ্বারা সৃষ্ট অপরাধকে হৃদয়ের গভীর থেকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়।[৩]

কারাগারের ধারণার সাথে অপরাধের ধারণাটিও বোঝা ভীষণভাবে জরুরী। একটি নির্দিষ্ট স্থানে একটি নির্দিষ্ট সময়ে আইন ভঙ্গ করে যদি কোনো হিংসার ঘটনা ঘটে তখন তাকে অপরাধ বলা হয়। সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বলা যায় একজন মানুষ যখন প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে ব্যর্থ হয় তখন সে ঐ ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে সেখান থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে। তখনই তাকে অপরাধী বলা যায়। কারাগার হলো সমাজ ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। অপরাধীকে গ্রেফতার করা থেকে তার বিচার নিষ্পত্তি হওয়া পর্যন্ত সমগ্র প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অপরাধীর সামাজিক মর্যাদাটিও নির্ধারিত হয়। এর মাধ্যমে ওই ব্যক্তিকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয় এবং তাকে সংখ্যালঘুর মর্যাদা দেওয়া হয়। ডোনাল্ড আর ক্রেসি বলেছেন, একদিকে কারাগার গুলি যেমন অপরাধীদের শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে তাদের অপরাধ বিরোধী

মূল্যবোধ গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে, সম্ভাব্য অপরাধীদের ভয় দেখানোর মধ্য দিয়ে, তাদের সংস্কারের মধ্য দিয়ে এবং সমাজে আইন-শৃংখলার পুনরুদ্ধারের মধ্য দিয়ে সমাজকে সুরক্ষা প্রদান করে, তেমনি অন্যদিকে এর মাধ্যমে বন্দীদের সামাজিক মর্যাদারও হ্রাস ঘটায়।

যদিও দেখা যায় উপনিবেশিক ভারতবর্ষে বেন্থামের আদর্শ ও ফুকোর ধারণা অনুযায়ী কারাগার গঠনের প্রয়াস খুব একটা সফল হয়নি। ব্রিটিশরা এটি উপলব্ধি করেছিল যে কারাগার সমাজ ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। তাই ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা কে দখল করার জন্য কারা ব্যবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন যে অত্যন্ত জরুরি ছিল এটি বুঝতে তাদের বিশেষ অসুবিধা হয়নি। তারা উপলব্ধি করেছিল যে ভারতে বিভিন্ন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকে ঠেকাতে গেলে ও সেগুলিকে দমন করতে গেলে ভারতবর্ষে একটি সুসংগঠিত ও সুনিয়ন্ত্রিত জেল নেটওয়ার্ক গঠনের প্রয়োজন। যার মাধ্যমে তারা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকারীদের আটক করে রাখতে পারবে এবং ভারত বিরোধী বিভিন্ন পশ্চিমী চিন্তা ধারায় তাদের মগজ ধোলাই করতে পারবে।[৪]

উপনিবেশিক কারাগারগুলিতে চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে আসলে জেল কর্তৃপক্ষের ক্ষমতার বৃদ্ধি ও তার পুনরুদ্ধারের প্রয়াস নেওয়া হয়েছিল। ডেভিড আর্নল্ড বলেছেন, সবেমাত্র পথ চলা শুরু করা এই দুর্বল ও নীতি জ্ঞানহীন রাষ্ট্রে একদিকে দুর্ভিক্ষ, রোগ, বিদ্রোহ, কারারুদ্ধ জীবন অন্যদিকে কারাগারগুলির খাদ্য, আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে বন্দীদের শারীরিক অসুস্থতা দেখা গিয়েছিল। ফলে সেখানে চিকিৎসক নিয়োগ করা জরুরী হয়ে পড়ে।[৫] যেহেতু জেলবন্দীদের বেশিরভাগই সমাজের নিম্নবর্গের মানুষ ছিলেন তাই তাদের জীবনের কোন মূল্য দেওয়া হত না। তাদের মৃত্যুর ঘটনা ছিল জেল প্রশাসনের কাছে তুচ্ছ বিষয়। মূলত কলেরা, যক্ষা ও আন্ত্রিক রোগের কারণে বন্দীদের মৃত্যুর ঘটনা ঘটতো। যদিও বন্দীদের এই অসুস্থতাকে সত্যিকারের অসুস্থতা হিসেবে দেখা হবে নাকি অসুস্থতার অজুহাত হিসেবে দেখা হবে তা ঠিক করতো জেল কর্তৃপক্ষ এবং চিকিৎসকরা। বহু ক্ষেত্রে চিকিৎসক রোগীর স্পন্দন পরীক্ষা করার অজুহাতে তার শরীরকে আঘাতগ্রস্থ করত। এ থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে জেল কর্তৃপক্ষের ক্ষমতার প্রসারের জন্য তাদের দালালে পরিণত হয়েছিল উপনিবেশিক চিকিৎসকরা।[৬]

বাংলার জেলগুলির ইন্সপেক্টর জেনারেল ড: এফ. জে. মট তার পর্যবেক্ষণের পর জানিয়েছিলেন যে কারাগার গুলির জল নিকাশি ব্যবস্থা, বায়ু চলাচল ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্যবিধির প্রতি খুব একটা নজর দেওয়া হয়নি। এরপর ১৮৮৯ সালে জেল কমিটির পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। সেখানে বলা হয় পুরনো কারাগার গুলিকে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত কারাগারে পরিণত করার কোনো প্রয়াস সরকারের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়নি। এই সময় সরকার কারাগারগুলির ক্ষেত্রে কম খরচে বেশি

সুরক্ষার নীতি (Maximum security in minimum cost) নেয়। এই সময় কারাগারগুলিতে বন্দীদের রোগ ও মৃত্যু বৃদ্ধির কারণ ছিল পর্যাপ্ত জায়গার অভাব, বাতাস চলাচলের অভাব, অপরিকল্পিত জেল ভবন গঠন, অপরিকল্পিত জল নিকাশি ব্যবস্থা এবং উপযুক্ত তত্ত্বাবধান এর অভাব।[৭] ১৯১৯ সালে ভারত সরকার তৎকালীন ভারতবর্ষের সমগ্র জেলের প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কে তদন্তের জন্য একটি কমিটি গঠন করে। এই কমিটি তার রিপোর্টে বলে যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আন্দামানে চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও কর্মচারীর অভাব দেখা দিয়েছিল। সঙ্গে ছিল দেশব্যাপী ইনফ্লুয়েঞ্জা। পোর্ট ব্লেয়ারের এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির বিরোধিতা করে বহু রাজনৈতিক হিংসার সূত্রপাত হয়। কমিটির সদস্যরাও ব্যাপকভাবে পক্ষপাতদুষ্ট ছিলেন। ফলে তারাও জেলের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতির জন্য কোন উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি।[৮]

কারাগারগুলিতে সাধারণ পরিদর্শক হিসেবে যিনি নিয়োজিত হতেন তিনিই আবার চিকিৎসকের কাজ করতেন। কারাগারগুলিতে পর্যাপ্ত বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা, জল নিকাশি ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা প্রায় কিছুই ছিল না। চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের অজুহাতে বন্দীদের উপর বিভিন্ন পাশ্চাত্য ঔষধ ও টিকা প্রয়োগের মাধ্যমে বন্দীদের শরীরের উপর জেল কর্তৃপক্ষ তথা উপনিবেশিক সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হতো। এমনকি সেখানে ভারতীয় বন্দীদের নিজস্ব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রীতিনীতি ও সংস্কার গুলি কে পর্যন্ত পালন করার অনুমতি দেওয়া হত না।[৯]

ডেভিড আর্নল্ড ১৮৬০ এর দশকের জেল গুলি সম্পর্কে বলেছেন যে এগুলি চিকিৎসা সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য আদর্শ স্থানে পরিণত হয়েছিল।[১০] ১৮৩৮ এর জেল শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির রিপোর্ট জেলের স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে জেল প্রশাসকদের সচেতনতার অভাবকেই সূচিত করে। ... ১৮৬৩ সালে রয়্যাল কমিশন প্রথম উপনিবেশিক সেনাবাহিনীর স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার উপর গুরুত্ব দেয়। এই সময় বৃহত্তর সমাজের ক্ষেত্রেও স্বাস্থ্যসচেতনতার বিষয়টি কিছুটা চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যদিও এক্ষেত্রে সেনাবাহিনীকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল যে সেনাবাহিনীর স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল সেই উপনিবেশিক সেনাবাহিনীই সমস্ত ক্ষমতার উৎস হয়ে উঠেছিল, যা ভারতবর্ষকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল।[১১] ডেভিড আর্নল্ডের মতে মূলত উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এসে ফুকোর ধারণা অনুযায়ী কারাগার সংস্কারের বিষয়টি কিছুটা কার্যকরী হয়। যদিও অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে সিভিলাইজিং মিশন, কারাগার সংস্কার এবং নিয়ন্ত্রণ একসঙ্গে পাশাপাশি চলত।[১২]

১৯১৯ ও ১৯২০ সালে ভারতীয় জেল কমিটি তাদের প্রস্তাবে জেলের শিক্ষার উপর তেমন একটা জোর দেয়নি। কমিটি শুধুমাত্র কয়েকটি পরামর্শ দিয়েছিল, যথা -

১) শিক্ষাবিধি সমস্ত কেন্দ্রীয় ও জেলার জেলগুলিতে লাগু হলেও কিছু শিক্ষাকে ২৫ বছরের কম বয়সী বন্দীদের জন্য নিষিদ্ধ করার কথা বলা হয়। ২) জেল বন্দীদের যে শিক্ষা প্রদান করা হত তা অত্যন্ত আদিম প্রকৃতির ছিল। যেমন জেলে তাদের শুধুমাত্র হস্তচালিত শিল্পেরই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। আধুনিক শিল্পের প্রশিক্ষণের কথা বলা হয়নি। ৩) জেল শ্রমিকদের শ্রমকষ্টের প্রতি কোন প্রকার লক্ষ্য না রেখেই শিক্ষার উপলক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে উপনিবেশিক সরকার কারাগারগুলির সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তনের ক্ষেত্রে খুব একটা আগ্রহী ছিল না। এই শিক্ষা ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য ছিল শুধুমাত্র প্রশিক্ষিত অধঃস্তন কর্মচারী তৈরি করা, যারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কে পরিচালনার ক্ষেত্রে যন্ত্রের ভূমিকা পালন করবে।[১৩]

জেল বন্দীদের সংস্কারের মাধ্যমে সরকার তাদের উৎপাদক শ্রেণী হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিল। এর মাধ্যমে তারা শ্রমিকদের ক্ষমতাকে সংগঠিত করতে চেয়েছিল। ১৮৩০ এর দশকে ১৩০০০ জেলবন্দি বাংলায় রাস্তা সংস্কারের কাজে নিয়োজিত ছিল।[১৪] ১৮৫০ এর দশকে জেলগুলিতে শিল্পায়িত উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রথমদিকে কারাগারগুলিকে শুধুমাত্র শাস্তি প্রদানের জায়গা হিসেবে দেখা হলেও পরবর্তীকালে সরকারের উদ্দেশ্য ও আগ্রহ হয়ে দাঁড়ায় জেলগুলিতে স্কুল অফ ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তোলা।[১৫] যদিও কেউ কেউ জেল বন্দীদের কারখানায় কাজে যোগদানের বিষয়টিকে সমালোচনা করেছেন। তাদের মতে এর ফলে জেল সুরক্ষা ও আইন-শৃঙ্খলার বিষয়টি বড়োসড়ো প্রশ্নচিহ্নের মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল। এই সময় কারাগারগুলিতে শিল্প কলকারখানা গড়ে উঠেছিল, যা উপনিবেশিক সরকারের আর্থিক লাভের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। যদিও এ থেকে উপনিবেশিক সরকার জেল গুলিকে সংশোধনাগারের তুলনায় শিল্পক্ষেত্র হিসাবে বেশি ব্যবহার করেছিল কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।[১৬]

ব্রিটিশরা ভারতীয় জেলগুলিতে বিভিন্ন নিয়ম কানুন লাগু করার মাধ্যমে ভারতীয়দের শরীরকে উপনিবেশীকরন করতে থাকে। বন্দীদের শারীরিক ভাবে এবং আদর্শগত দিক থেকে উপনিবেশীকরন এর প্রয়াস নেওয়া হয়। এর মাধ্যমে তারা ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল।[১৭] প্রথমে জেলের মধ্যে ভারতীয়দের বিরোধী বিভিন্ন নিয়ম কানুন লাগু হয়। এরপর সেখানে বেশি পরিমাণে পুলিশ নিয়োগ করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন রকম পাঠ্যপুস্তক রচনার মাধ্যমে কারাগারের মধ্যে পশ্চিমী সংস্কৃতিকে প্রচার করা হয়। এইভাবে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির উপর উপনিবেশিক আধিপত্য স্থাপন করা হয়।[১৮]

আইন এবং সমাজ একে অপরের সাথে আঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আইন সমাজের রূপান্তর ঘটায় এবং সমাজ আইন কে পরিবর্তন করে। যদি সমাজের অগ্রগতির জন্য আইন কে ব্যবহার করা হয় তবে সমাজের পরিবর্তনের গতি অনেক মসৃণ হয়। যেমন ইংল্যান্ডে আইন ও বিচার ব্যবস্থার গঠনের ক্ষেত্রে যে আধুনিক নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল

তা ইংল্যান্ডের উন্নতিসাধন করেছিল। কিন্তু ভারতবর্ষে উপনিবেশিক শাসকবর্গের দ্বারা প্রবর্তিত এই নতুন আইনি ব্যবস্থা স্বতস্ফূর্ত ছিল না। এটিকে বলপূর্বক চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেখানে ব্রিটিশরাজের মতাদর্শ ও ভারতীয়দের বাস্তব অবস্থার মধ্যে এক বিরাট ব্যবধান ছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে উপনিবেশিক প্রশাসন বেশকিছু বিদ্রোহের সম্মুখীন হয়েছিল, যেমন সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, ফকির বিদ্রোহ, চুয়াড় বিদ্রোহ, পাগলপন্থী বিদ্রোহ, তিতুমীরের আন্দোলন, সাঁওতাল বিদ্রোহ ইত্যাদি। এইসব হিংসাত্মক আন্দোলন ব্রিটিশ প্রশাসনের উপর চাপজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। এই ধরনের হিংসাত্মক আন্দোলনকে দমন করার জন্য এবং আন্দোলনকারীদের গ্রেপ্তারের উদ্দেশ্যেই ব্রিটিশরা কারা ব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটায়। পরবর্তীকালেও ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্বাধীনতা আন্দোলনকে দমন করার ক্ষেত্রেও ব্রিটিশরা কারাগারগুলিকে ব্যবহার করেছিল। মূলত অনিয়ন্ত্রিত পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ রাজের কাছে নিয়ন্ত্রণের প্রধান অস্ত্র হয়ে উঠেছিল কারাগার।[১৯]

ভারত সরকার কারাগারগুলির সংস্কারের জন্য বেশকিছু রূপরেখা স্থানীয় সরকার গুলিকে প্রেরণ করেছিল। সেই সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশও করেছিল। কিন্তু অর্থের অভাবে অনেক ক্ষেত্রেই সেই সুপারিশকে কার্যকর করা সম্ভব হয়নি।[২০] পাঞ্জাব সরকার ১৫০০ জন বন্দির জন্য মুলতানে একটি নতুন কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার তৈরীর জন্য বাজেট তৈরি করেছিল। ১৯২৭ থেকে ১৯৩৩ এর মধ্যে তিনটি নতুন কারাগার তৈরি হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কারাগারগুলিতে জনবহুলতাকে ঠেকানোর জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। ফলে সময়ের সাথে সাথে কারাগারগুলিতে বন্দি সংখ্যা বহুগুণ বেড়ে যায়। ১৯১৯ - ১৯৩০ সালে সরকার-বিরোধী আন্দোলন বৃদ্ধি পায় এবং জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক অসহযোগ এবং আইন অমান্য আন্দোলনের কারণে বহু সংখ্যক ধরপাকড় ও গ্রেফতারের ফলে ভারতবর্ষের জেলগুলি জনবহুল হয়ে ওঠে।[২১] গান্ধীজীর নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হলে যুক্ত প্রদেশের জেল গুলির জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ১৯৪১ সালে যুক্ত প্রদেশের জেলগুলিতে মোট বন্দি সংখ্যা দাঁড়ায় ৪২০০০ এ।[২২]

ভারতবর্ষে বিভিন্ন আইন প্রবর্তনের ক্ষেত্রেও ব্রিটিশদের নিরপেক্ষতার অভাব ছিল। এই আইনগুলি পুরোমাত্রায় উপনিবেশিক রাষ্ট্রের স্বার্থে পরিচালিত হয়েছিল। একই আইনের মাধ্যমে যেখানে ব্রিটিশ আসামীদের দ্বীপান্তর থেকে মুক্তি দেওয়া হয়, সেখানে দ্বীপান্তর ভারতীয় বন্দীদের জীবনের অন্যতম অংশ হয়ে দাঁড়ায়।[২৩]

উপনিবেশিক শাসনের শেষ দিকে এবং স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম দিকে সরকার প্রবর্তিত কারাগার নীতিঃ

১৯১৯ সালের এপ্রিল মাসে ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষের জেল প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কে তদন্তের জন্য একটি কমিটি গঠন করে। কমিটির প্রস্তাবে - ১) জেল গুলিতে

আসামীদের সংশোধন ও শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতার উপর জোর দেওয়ার কথা বলা হয়। ২) আসামীদের পূনর্বাসনের উপর জোর দেওয়া হয় এবং ৩) জেলে শিল্পের উন্নতির জন্য শক্তি চালিত যন্ত্রের ব্যবহার শুরু করার কথা বলা হয়।[২৪] সুতরাং দেখা যায় ব্রিটিশরা ভারতে তাদের কর্মকাণ্ডের শেষ দিকে এসে আইন ও বিচার ব্যবস্থায় বেশকিছু সংস্কার মূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তবে সেখানে ভারতীয়দের অবদান কম ছিল না। কারণ এই সময় ভারতবর্ষের আইন ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা ও প্রশাসনের অন্যান্য ক্ষেত্রে বহু ভারতীয় অংশগ্রহণ করেছিলেন।[২৫]

স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষে শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসে। জেলের অভ্যন্তরীণ শিক্ষা ব্যবস্থাতেও পরিবর্তন সূচিত হয়। ১৯৪৮ সালে বম্বে জেল সংস্কার কমিটি জেলের শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য সুপারিশ করে। এই সময় জেল গুলিতে শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় বন্দীদের প্রকৃত শিক্ষিত করে তোলা এবং তাদের মধ্যে সামাজিক সচেতনতা ও দায়িত্ব-কর্তব্যের উন্নতি ঘটানো।[২৬] একটি তালিকার মাধ্যমে তৎকালীন কারা শিক্ষার প্রকৃত অবস্থাকে বোঝানো হল।

Examination	Number of Prisoners who appeared for Examination	Number of Prisoners who Passed the Examination	Percentage of Passing
Year	**1970**	**1970**	**1970**
i Standard	1009	721	71
ii Standard	441	368	81
iii Standard	304	270	89
iv Standard	940	775	82
v Standard	27	24	88
vi Standard	_	_	_
vii Standard	_	_	_
viii Standard	108	95	88
Total -	2,829	2,253	80

Datir, ***Prison as a social system : with special reference to Maharashtra state,*** p - 330[২৭]

ব্রিটিশ ভারতে কোন সুসংগঠিত জেল নীতি না থাকার কারণে স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষে কারা ব্যবস্থা সম্পর্কে সর্বপ্রথম একটি জাতীয় নীতি গ্রহণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ১৯৭২ সালে তৎকালীন ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ভারতীয় কারাগারগুলি

সম্পর্কে জাতীয় নীতি গ্রহণের জন্য একটি কমিটি গঠন করে। এর প্রস্তাবে বলা হয় - ১) কারাগার গুলিকে আরও কার্যকরী করে তোলা হবে। ২) বন্দীদের পৃথকীকরণ ও তাদের চিকিৎসাকে আরও বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে করা হবে। ৩) কারাগারগুলিতে বন্দী সংশোধন ও পূনর্বাসনের উপর জোর দেওয়া হবে। যা জাতীয় উন্নতির জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এইভাবে সমাজের সুরক্ষার ক্ষেত্রে কারাগারের গুরুত্বকে স্বীকার করে নেওয়া হয়।[২৮]

মূল্যায়নঃ

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, আইনের শাসন সার্বিক ভাবে সমাজের জন্য একটি ন্যায়সংগত ব্যবস্থা বলে বিবেচিত হলেও এবং সাম্যের উন্মোচন ঘটালেও ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এটি সাম্যের উন্মোচন ঘটায়নি, বরং এটি ব্রিটিশদের জাতি বৈষম্যমূলক নগ্ন আচরণকেই তুলে ধরেছিল। প্রাক উপনিবেশিক ভারতবর্ষে রাজ পরিবার ও অন্যান্য ধনী পরিবারগুলির সদস্যদের জন্য আইন ছিল এক রকম, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের জন্য আইন ছিল আরেকরকম।। অর্থাৎ সেই সময় আইনের সমতা ছিল না। ব্রিটিশরা আসার পর ভারতবর্ষে আধুনিক আইন ও কারা ব্যবস্থার উত্থান ঘটেছে। আইন, বিচার ও শাস্তি দান প্রক্রিয়ায় ইউরোপীয় পাশ্চাত্য চিন্তাধারার প্রভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু তার পরেও প্রশ্ন ওঠে যে, ভারতবর্ষের সকল মানুষের জন্য কি আইনের সমতা আসছে আদৌ ? আইনের চোখে আদৌ সকলে কি সমান বলে পরিগণিত হচ্ছে ? কারণ বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায় ব্রিটিশ্ররা ভারতবর্ষের প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিতে কোন ভারতীয়কে নিয়োগ করতে চায়নি। লর্ড কর্নওয়ালিস মন্তব্য করেছিলেন, 'আমি আইন ও বিচার ব্যবস্থার গঠনের প্রক্রিয়ায় কোন ভারতীয়কে নিয়োগ করার পক্ষপাতি নই।' এছাড়া, এমন অনেক উদাহরণ আছে যেখানে দেখা যায় যে ভারতে অবস্থিত ব্রিটিশদের জন্য আইন ছিল একরকম, ভারতীয়দের জন্য আইন ছিল ভিন্ন রকম। উদাহরণস্বরূপ ইলবার্ট বিল বিরোধী আন্দোলনের কথা বলা যায়। এইভাবে দেখা যায় আইনগুলি পুরোমাত্রায় উপনিবেশিক রাষ্ট্রের স্বার্থে পরিচালিত হয়েছিল। উনবিংশ শতকের শেষ দিকে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ বিরোধী হিংসাত্মক কার্যকলাপ শুরু হয়। সমগ্র ভারতে দাঙ্গা, বিদ্রোহ ও আন্দোলনের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। ব্রিটিশরা এগুলিকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করে এগুলিকে দমন করার জন্য Criminal Tribes Act - এর প্রবর্তন করে। কিন্তু প্রশ্ন হল এইসব হিংসা, দাঙ্গা বা বিদ্রোহগুলি আদৌ কি অপরাধ ছিল ? কোথাও কি এগুলি ভারতবাসীর প্রতি হওয়া অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ছিল না ?

ব্রিটিশরা উপলব্ধি করেছিল যে কারাগার সমাজ ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং এটি সমাজের সঙ্গে আঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাই ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে দখল করার জন্য কারা ব্যবস্থার উপর নিয়ন্ত্রন স্থাপন যে অত্যন্ত

জরুরী ছিল - এটি বুঝতে তাদের বিশেষ অসুবিধা হয়নি। তারা বুঝেছিল যে ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনগুলিকে ঠেকাতে গেলে ও তাকে দমন করতে গেলে এখানে একটি সুসংগঠিত ও সুনিয়ন্ত্রিত জেল নেটওয়ার্ক গঠনের প্রয়োজন, যার দ্বারা তারা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকারীদের আটক করে রাখতে পারবে এবং তাদের ভারত বিরোধী বিভিন্ন পশ্চিমী চিন্তাধারায় মগজধোলাই করতে সক্ষম হবে।

উপনিবেশিক ভারতীয় কারাব্যবস্থা আদর্শগতভাবে ইউরোপীয় আধুনিক কারাব্যবস্থার তুলনায় ভিন্ন প্রকৃতির ছিল। উপনিবেশিক আমলে ভারতীয় কারা ব্যবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছিল উপনিবেশিক রাষ্ট্রের ক্ষমতা প্রদর্শনের একটি জায়গা। সেই সঙ্গে তারা কারা ব্যবস্থা পরিচালনার মাধ্যমে ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে বহু জ্ঞানের অনুসন্ধান করেছিল। যা তাদের কারাগারের বাইরের বৃহত্তর ভারতীয় সমাজকে শাসন করার ক্ষেত্রে সহযোগীতা করেছিল। কারণ কারাগার কখনোই বৃহত্তর সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না, এটি সমাজেরই একটি অংশ ছিল। এদিক দিয়ে বলা যায় যে, উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে কারা ব্যবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছিল রাষ্ট্র দ্বারা সমাজ ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করার একটি হাতিয়ার। অর্থাৎ কারা ব্যবস্থা যে উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে সমকালীন ইউরোপের তুলনায় রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত একটি সংকীর্ণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল - একথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এসবের ফলে একটা বিষয় পরিষ্কার যে, প্রাক-ব্রিটিশ আমলে ভারতবর্ষের কারাগার গুলি যতটা না ছিল অপরাধীর অপরাধ ঘোচানোর জায়গা উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে, বরং তার থেকে অনেক বেশি ছিল রাষ্ট্রের ক্ষমতা প্রদর্শনের জায়গা। ব্রিটিশ শাসনকালেও এই বিষয়টার ক্ষেত্রে বিরাট কোন রকম পরিবর্তন ঘটছে না। এই সময় সামান্য কিছু পরিবর্তন ও সংস্কারমূলক কর্মসূচি নেওয়া হলেও ভারতীয় কারাগার গুলি উপনিবেশিক আমলে মূলত রাষ্ট্রের ক্ষমতা প্রদর্শনের জায়গাতেই থেকে যাচ্ছে। এছাড়া, উপনিবেশিক কারাগার গুলিতে চিকিৎসা ব্যবস্থার কিছুটা উন্নতি ঘটলেও এক্ষেত্রে ব্রিটিশরা মূলত চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের অজুহাতে নিজেদের বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসা বিদ্যার উন্নতির স্বার্থে মৃত ভারতীয়দের শরীরকে এবং অনেক ক্ষেত্রে জীবিত ভারতীয় জেল বন্দীদের শরীরকে চিকিৎসাজনিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ব্যবহার করেছে এবং তারপর সেই বিজ্ঞান বা চিকিৎসা পদ্ধতি তারা নিজেদের দেশের মানুষের ভালোর জন্য কাজে লাগিয়েছে এবং পরে তা অন্য দেশে বিক্রয় করার মাধ্যমে নিজেরা বাণিজ্যিক ভাবে লাভবান হয়েছে।

সুতরাং পরিশেষে বলা যায় যে ব্রিটিশ আমলের সামগ্রিক ও বৃহত্তর প্রশাসনিক ব্যবস্থার তুলনায় কারাব্যবস্থা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমগ্র বিচার ব্যবস্থার প্রতি গ্রহণ করা ব্রিটিশ নীতিগুলি অনেক ক্ষেত্রেই পশ্চাদগামী ও সীমাবদ্ধ ছিল। যা উপনিবেশিক ভারতীয় কারা ব্যবস্থার তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। তা শুধুমাত্র উপনিবেশিক রাষ্ট্রের স্বার্থ চরিতার্থ করেছিল। আর এই কারণে

ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর স্বাধীন ভারতবর্ষে স্বচ্ছ ও উন্নত কারা ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে একটি সুসংগঠিত জাতীয় নীতি গ্রহণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে এবং ১৯৭২ সালে আইপিএস কিরণ বেদীর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়।

তথ্যসূত্র:

১. Bentham, *The Panopticon Writing*, Introduction
২. Foucault, *Discipline and Punish : The Birth of the Prison,* Introduction
৩. ---*www.stoptheaca.org > purpose*
৪. Datir, *Prison as social system : with special reference to Maharashtra state*, p - 3
৫. ---*Brief history of Bengal Jails since colonial times - structural and legal dimensions*, p - 64
৬. Ibid, p -65
৭. Sen, *Prison in colonial Bengal,1838 - 1919,* p - 32
৮. Barker, *The modern prison system of India : A report to the department,* pp - 1,2
৯. --- *Brief history of Bengal Jails since colonial times - structural and legal dimensions,* p - 65
১০. Clark, *Prison reform in nineteenth century British-India,* p - 89
১১. Ibid, pp - 87,88,89
১২. Ibid, p - 90
১৩. Datir, *Prison as social system : with special reference to Maharashtra state,* p - 330
১৪. Arnold, *The colonial prison : Power, Knowledge and Penology in nineteenth century India,* p - 30
১৫. Ibid, p - 30
১৬. Ibid, p - 31
১৭. Ibid, p - 11
১৮. Ibid, p - 12
১৯. Sen, *Prison in colonial Bengal, 1838 - 1919,* p - 24
২০. Barker, *The modern prison system of India : A report to the department,* p - 4
২১. Ibid, p - 5
২২. Ibid, p - 10

২৩. Sen, *Prison in colonial Bengal, 1883 - 1919,* pp - 10,11

২৪. Barker, *The modern prison system of India : A report to the department,* p - 1

২৫. Ibid, p - 3

২৬. Datir, *Prison as social system : with special reference to Maharashtra state,* p - 330

২৭. Ibid, p - 330

২৮. --- *National policy on prison reforms and correctional administrations,* introduction

গ্রন্থপঞ্জি

১. Bentham Jeremy, *The Panopticon Writings,* Verso (2011)

২. Foucault Michel, *Discipline and Punish : the birth of the prison,* New York (1977)

৩. Internet source -- *www.stoptheaca.org > purpose*

৪. Datir R.N., *Prison as social system : with special reference to Maharashtra state,* Bombay (1978)

৫. Internet source -- *Brief history of Bengal Jails since colonial times - structural and legal dimensions,* https://shodhganga.inflibnet.ac.in > bitstrea.PDF

৬. Sen Madhurima, *Prison in colonial Bengal, 1838 - 1919,* Kolkata (2007)

৭. Barker F.A. Colonel, *The modern prison system of India : A report to the department,* Delhi (1936)

৮. Clark Joannah, *Prison reform in nineteenth century British-India,* University of Canterbury (2015)

৯. Arnold David, *The colonial prison : Power, Knowledge and Penology in nineteenth century India,* Subaltern studies, vol - viii, Delhi (1994)

১০. Internet source -- *Indian Judicial system and comparative study with other legal systems*

১১. Internet source -- *National policy on prison reforms and correctional administrations*

কিয়েকেগার্ডের দৃষ্টিতে মানব অস্তিত্বের স্তর

সৌভিক ঘোষ
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, দর্শন বিভাগ
রানাঘাট কলেজ

সারসংক্ষেপঃ প্রথাগত পাশ্চাত্য দর্শনে মানুষের জ্ঞান, নীতি, নৈতিকতা ইত্যাদি সমস্ত কিছুর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে কিন্তু উপেক্ষিত হয়েছে মানব অস্তিত্বের দিকটি। তারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ঊনবিংশ শতাব্দীতে উদ্ভব হয় অস্তিবাদী সম্প্রদায়ের। অস্তিবাদী দর্শনিকদের কাছে কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু হল ব্যাক্তি মানুষের যাপিত জীবন। এই সম্প্রদায়ের সূচনা হয় কিয়েকেগার্ডের দর্শন থেকে। কিয়েকেগার্ড ছিলেন অস্তিবাদী দ্বন্দ্বতত্ত্বের সমর্থক। কিয়েকেগার্ড এই অস্তিবাদী দ্বন্দ্বতত্ত্বের সাহায্যে মানব অস্তিত্বের তিনটি স্তরকে ব্যাখ্যা করেছেন। অস্তিত্বের এই তিন প্রকার স্তর হল-নান্দনিক স্তর, নৈতিক স্তর, এবং ধর্মীয় স্তর। নান্দনিক স্তরে মানুষ শুধু সুখের অনুসন্ধান করে। নান্দনিক স্তরের একঘেয়েমি, বিরক্তি, অসন্তোষ ইত্যাদি থেকে মুক্তি পাবার জন্য ব্যক্তি স্বাধীনভাবে বেছে নেই নৈতিক স্তরকে। এই স্তরে ব্যক্তি ভাল-মন্দ, শুভ-অশুভ, কল্যাণ-অকল্যাণ, ন্যায়-অন্যায়, নৈতিক-অনৈতিক ইত্যাদি ধারনাগুলির মধ্যে পার্থক্য করার মধ্যে দিয়ে নিজের জীবনকে কল্যাণ বা মঙ্গলের ধারনার উপর প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে।এই নৈতিক স্তরের মধ্যেও ব্যক্তি যেন সম্পূর্ণভাবে সুখী হতে পারেনা, কারণ বিশুদ্ধ নৈতিক জীবনযাপন করা বাস্তবে সম্ভব নয়। তাই ব্যক্তি স্বাধীনভাবে ধর্মীয় জীবনকে নির্বাচন করে। কিয়েকেগার্ডের মতে এটিই মানব অস্তিত্বের অন্তিম স্তর। এই স্তরে ব্যক্তি নিজেকে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করে বিশ্বাসের দ্বারা। এভাবেই তিনি অস্তিবাদী ধারার মধ্যে থেকেও ঈশ্বরকে স্বীকার করেছেন।

সূচক শব্দ: মানব অস্তিত্ব, দ্বন্দ্বতত্ত্ব, বিশ্বাস, স্বাধীনতা।

কিয়েকেগার্ডের দৃষ্টিতে মানব অস্তিত্বের স্তর

ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রথাগতভাবে পাশ্চাত্য দর্শনচর্চার বিরোধিতা করে উদ্ভব হয় নতুন এক সম্প্রদায়ের। এই সম্প্রদায় হল অস্তিবাদী সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের মতে এতদিন দর্শনে সমস্ত কিছুর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে কিন্তু উপেক্ষিত হয়েছে মানব অস্তিত্বের দিকটি। অস্তিবাদী দর্শনের উদ্ভবের আগে পর্যন্ত সমস্ত পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা তাদের দর্শনে মানুষের জ্ঞান, নৈতিকতা, জগত ও জীবনকে তাদের নিজস্ব দার্শনিক ভাবনা ও তত্ত্বের দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। তাই অস্তিবাদী সম্প্রদায়ের উদ্ভবের পূর্বে পাশ্চাত্য দর্শনে মানব অস্তিত্বের দিকটি সম্পূর্ণভাবে অবহেলিত হয়েছিল। তাই এই সমস্ত দার্শনিক তত্ত্বের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া স্বরূপ উদ্ভব হয় অস্তিবাদী দর্শনের। অস্তিবাদী দর্শনিকদের কাছে কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু হল ব্যাক্তি মানুষ। ব্যাক্তি মানুষের সক্রিয় মূর্ত অস্তিত্ব অর্থাৎ

ব্যাক্তি মানুষের প্রাত্যহিক যাপিত জীবন। অস্তিবাদীদের কাছে দর্শন মানেই ব্যাক্তি মানুষের দর্শন। অস্তিবাদী দর্শনের সূচনা আমরা দেখতে পাই কিয়ের্কেগার্ডের এর দর্শন থেকে। পরবর্তীকালে হাইডেগার ও সার্ত্রে অস্তিবাদী দর্শনের প্রসার ঘটান।

কিয়ের্কেগার্ড হলেন অস্তিবাদের জনক। তিনি পাশ্চাত্য দার্শনিক হেগেলের দর্শন চর্চার দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি মূলত হেগেলের দর্শনের সমালোচনার মাধ্যমে তাঁর দর্শনকে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি প্রাথমিক ভাবে অস্তিত্ব বলতে ব্যক্তি মানুষের প্রাত্যহিক, সক্রিয় ও মূর্ত অস্তিত্বের কথা বলেছেন। অর্থাৎ অস্তিত্ব মানে ব্যক্তি মানুষের যাপিত জীবনের অস্তিত্ব, ব্যক্তির ব্যাবহারিক জীবনের অস্তিত্ব। ব্যক্তির এই যাপিত অস্তিত্বের মধ্যে তিনি স্বাধীনতাকে ভীষণভাবে প্রাধান্য দিয়েছেন। কিয়ের্কেগার্ড হেগেলের দ্বন্দ্বতত্ত্বের দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিলেন। হেগেলের দ্বন্দ্বতত্ত্ব মূলত একটি অধিবিদ্যক তত্ত্ব। এই অধিবিদ্যক দ্বন্দ্বতত্ত্বের দ্বারা হেগেল তাঁর দর্শনে ভাববাদকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু হেগেলের ভাববাদী দ্বন্দ্বতত্ত্বের পরিবর্তে কিয়ের্কেগার্ড আমাদের উপহার দিয়েছেন অস্তিবাদী দ্বন্দ্বতত্ত্ব। কিয়ের্কেগার্ড এই অস্তিবাদী দ্বন্দ্বতত্ত্বের সাহায্যে মানব অস্তিত্বের বিভিন্ন স্তরকে ব্যাখ্যা করেছেন।

কিয়ের্কেগার্ড মানব অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে মানুষের অস্তিত্বের তিনটি স্তরের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, মানুষ নিজের সমগ্র জীবনযাপন করতে গিয়ে একপ্রকার অস্তিত্বমূলক দ্বান্দ্বিকতার (existential dialectic) মধ্যে দিয়ে যায়। এর ফলে মানব অস্তিত্বের তিন প্রকার স্তর লক্ষ্য করা যায়। এই প্রসঙ্গে Solomon বলেছেন, "In the existential dialectic, we confront three alternative ways of life, three fundamental commitments, for as Keirkegaard elsewhere title them, "views of life," "existential categories," "spheres of existence," "mode of existence," and "stages on life's way."। অর্থাৎ এগুলিকে "views of life" বলা যেতে পারে, "existential categories" বলা যেতে পারে, "spheres of existence" বলা যেতে পারে, "mode of existence" বলা যেতে পারে অথবা "stages on life's way" ও বলা যেতে পারে। কিয়ের্কেগার্ড মানব অস্তিত্বের এই তিন প্রকার স্তরের ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাঁর দ্বন্দ্বতত্ত্বের (dialectical method) দ্বারা। তিনি বলেছেন মানুষ তার নিজের স্বাধীন নির্বাচনের মাধ্যমে অস্তিত্বের এক স্তর থেকে অন্য স্তরে আসে। অস্তিত্বের প্রথম স্তরের মধ্যে থাকা অসম্পূর্ণতা, অসঙ্গতি ব্যক্তিকে অস্তিত্বের দ্বিতীয় স্তরে নিয়ে যায়। Solomon তাঁর *From Rationalism to Existentialism* বই এ বলেছেন, কিয়ের্কেগার্ডের মতে কোন ব্যক্তি সারাজীবন একটি স্তরের মধ্যে নিজের সম্পূর্ণ জীবন কাটিয়ে দিয়ে পারে, বা প্রত্যেক স্তরের অসম্পূর্ণতা, অসঙ্গতি ব্যক্তিকে পরবর্তী স্তরে নিয়ে যেতে পারে। অস্তিত্বের এই তিন প্রকার স্তর হল- i) Aesthetic satge বা নান্দনিক স্তর, ii) Ethical Stage বা নৈতিক স্তর, iii) Religious stage বা ধর্মীয় স্তর।

Aesthetic satge বা নান্দনিক স্তরঃ এই স্তর হল মানব অস্তিত্বের প্রাথমিক স্তর বা প্রথম স্তর। এই স্তরে মানুষ শুধু সুখের অনুসন্ধান করে। এই স্তরে ব্যক্তির জীবনের মূল মন্ত্র হল- 'Pursuit of pleasure' অর্থাৎ সুখকে অনুসন্ধান করা এবং সুখকে নিশ্চিত করা। এই আদর্শই নান্দনিক স্তরকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই স্তরে ব্যক্তির যা কিছু ভাললাগা, যা কিছু ব্যক্তিকে সুখ দেয় তাকেই ব্যক্তি পেতে চাই। এই সুখ হল তাৎক্ষণিক সুখ। এই স্তরে ব্যক্তি তাৎক্ষণিক সুখের পিছনে দৌড়ায়। তাই এই স্তরকে Solomon বলেছেন, "The aesthetic mode of existence is the life of pure 'immediacy'."। অর্থাৎ এই নান্দনিক স্তর হল 'life of pure immediacy' বা সম্পূর্ণ তাৎক্ষণিকতার স্তর। এই স্তরে মানুষ কেবলমাত্র স্থূল সুখের পিছনেই ছোটে। এই স্তরকে একই সাথে তিনি বলেছেন 'অ-অনুধ্যানমূলক' কারণ এই স্তরে মানুষের মধ্যে কোনরকম অনুচিন্তন বা অনুধ্যান লক্ষ্য করা যায় না। তাই এই স্তরে কোনরকম নৈতিক আদর্শ বা নৈতিক অনুজ্ঞা স্বীকৃত নয়। কোনপ্রকার নৈতিক অনুচিন্তন মানুষের মধ্যে এই স্তরে না থাকায় কর্তব্য, অনুজ্ঞা, পরহিত ইত্যাদি কোন প্রকার ধারনাই মানুষের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না। তাই বলে এই স্তরকে 'অবৌদ্ধিক' বা 'Unintelligent' বলা যায় না। কারণ এই স্তরে মানুষ অনেক কিছুই সৃষ্টি করতে পারে, যেমন- সাহিত্য, শিল্প, কবিতা, সঙ্গীত, চিত্র এমনকি দর্শনও সৃষ্টি করতে পারে। কারণ তাৎক্ষণিক সুখের অনুভূতি থেকে অনেক কিছুই উপলব্ধি ও সৃষ্টি করা সম্ভব। এই বিষয়ে Solomon বলেছে, "The aesthetic life, although essentially unreflective, need not be unintelligent, for it may consists in the enjoyment or even creation of music (Mozart) or poetry, or even philosophy, as long as there are enjoyed purely for their immediate satisfaction."।

কিন্তু এই নান্দনিক স্তরে ব্যক্তি সারাজীবন থাকতে পারেনা। অধিকাংশ ব্যক্তিই এই স্তরকে অতিক্রম করে পরবর্তী স্তরে পৌঁছায় এবং অনেকে এই স্তরেই তার সমগ্র জীবন কাটিয়ে দেয়। এই স্তরে থাকতে থাকতে ব্যক্তি সত্তা সংকটের বিষয়টিকে অস্বীকার ও উপেক্ষা করতে পারে না। এই জীবনের পরিনতি স্বরূপ ব্যক্তি এক বিশেষ সংকটের সম্মুখীন হয়। এই সংকট হল তার নান্দনিক জীবনের একঘেয়েমি, অসন্তোষ, অপূর্ণতা ইত্যাদির সংকট। কেবলমাত্র সুখের অন্বেষণ করতে গিয়ে ব্যক্তি হতাশ হয়ে পরে এবং কোনপ্রকার কাঙ্খিত সন্তোষজনক অবস্থায় সে পৌছাতে পারে না। কোন প্রকার নৈতিক আদর্শ না থাকায় তার জীবন বিশৃঙ্খল ও অবিন্যস্ত হয়ে পড়ে। এবং এই হতাশা, অপূর্ণতা, একঘেয়েমি, বিরক্তি থেকে মুক্ত হবার জন্যই ব্যক্তি নৈতিক স্তরকে বেছে নেয়। ব্যক্তি মনে করে যে- শুভ-অশুভ, কল্যাণ-অকল্যাণ, ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদি পার্থক্য গুলো মেনে নেওয়ার মধ্যে দিয়েই সে এক সন্তোষজনক জীবনযাপন

করতে পারবে। এভাবেই ব্যক্তি নান্দনিক স্তর থেকে নৈতিক স্তরে উপনিত হয়। কিয়ের্কেগার্ড মনে করেছেন এটিই ব্যক্তির স্বাধীন নির্বাচন।

Ethical Stage বা নৈতিক স্তরঃ_ নান্দনিক স্তরের একঘেয়েমি, বিরক্তি, অসন্তোষ ইত্যাদি থেকে মুক্তি পাবার জন্য ব্যক্তি স্বাধীনভাবে বেছে নেই নৈতিক স্তরকে। এই স্তরকে বলা হয় 'Reflective life' বা 'অনুধ্যানমূলক জীবন'। কারণ এই স্তরে ব্যক্তির অনুধ্যান বা অনুচিন্তন লক্ষ্য করা যায়। এই স্তরে ব্যক্তি ভাল-মন্দ, শুভ-অশুভ, কল্যাণ-অকল্যাণ, ন্যায়-অন্যায়, নৈতিক-অনৈতিক ইত্যাদি ধারনাগুলির মধ্যে পার্থক্য করার মধ্যে দিয়ে নিজের জীবনকে কল্যাণ বা মঙ্গলের ধারনার উপর প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে। এ বিষয়ে Solomon বলেছেন, "Unlike aesthetic life, the ethical life is characterized by reflection and self-appraisal, and with reflection one can appraise the meaningfulness of his life."

কিয়ের্কেগার্ড এই স্তরে মানুষ নিজেকে একপ্রকার সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে চেনে। এবং এই স্তরে ব্যক্তি একটি নৈতিক আদর্শকে অবলম্বন করে একটি আদর্শনিষ্ঠ জীবনযাপনে আগ্রহী হয়। এই জন্য এই স্তরকে অনেক সময় সামাজিক জীবন বলে মনে করা হয়। এই স্তরে মানুষ নিজের আন্তঃজীবন নিয়ে চিন্তাভাবনা করে অর্থাৎ তার চিন্তাভাবনাই থাকে সে কতটা উন্নত জীবনযাপন করতে পারবে, কতটা পরিশীলিত জীবনযাপন করতে পারবে ইত্যাদি। এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ব্যক্তি উপলব্ধি করে যে, নৈতিক আদর্শকে অনুসরণের মধ্যে দিয়ে সে এক পরিশীলিত জীবনযাপন করতে পারবে। এই কারণে সে সামাজিক সত্তা হিসেবে নিজের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেয়। সে স্বীকার করে সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে সে অন্যান্য সত্তার সাথে, অন্যান্য মানুষের সাথে এই সমাজে বাস করছে এবং অন্যান্য অপরের প্রতি তার একটা দায় আছে। এই দায় হচ্ছে তার 'নৈতিক দায়' বা 'Moral responsibility'। তাই মানুষ তার প্রতিটি আচরণকে নিয়ে অনুচিন্তন করে অর্থাৎ বিশ্লেষণ করে। পরিশীলিত, আদর্শনিষ্ঠ জীবনের প্রতি ব্যক্তির একটি আগ্রহ তৈরি হয় কারণ সে এক আনন্দময়, সন্তোষময় সুখের জীবনকে লাভ করতে চায়, পেতে চায়। এবং এই স্তরেই ব্যক্তি একপ্রকার দায়িত্ব অনুভব করে, যে দায়িত্ব শুধু তার নিজের প্রতি নয়, সমাজের প্রতি। এই নৈতিক আদর্শ বিষয়ে কান্টের নৈতিক দর্শনের সাথে কিয়ের্কেগার্ডের নৈতিক দর্শনের অনেক মিল পাওয়া যায়। কান্টও বলেছিলেন তাঁর নৈতিক দর্শন হল নৈতিক আদর্শ অনুযায়ী জীবনযাপন, এবং এই নৈতিক আদর্শকে হতে হবে সার্বিক এবং বিষয়গত বা 'objective' এবং তা হবে 'categorical' বা শর্তাধীন। কিন্তু কান্টের নীতি দর্শনে এই নৈতিক আদর্শ গুলির আদর্শ হল বুদ্ধি। তাই কান্ট যে নৈতিক আদর্শগুলির ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা হল বৌদ্ধিক ব্যাখ্যা বা Rational explanation । কিন্তু অস্তিবাদীরা মনে করেন এই নৈতিক মুল্যের উৎস আবেগও হতে পারে। আবেগও নৈতিকতার সৃষ্টি করতে পারে। মানুষের আবেগই ভাল-মন্দ, শুভ-অশুভ, কল্যাণ-

অকল্যাণ, ন্যায়-অন্যায়, নৈতিক-অনৈতিক ইত্যাদি বোধগুলিকে সরাসরি ধরতে পারে। তাই অস্তিবাদীরা মনে করেন এগুলির উৎস হল 'Human emotion' বা মানুষের আবেগ। অন্যদিকে কান্ট মনে করতেন এই নৈতিক বোধ গুলির উৎস হল মানবীয় বুদ্ধি।

কিয়ের্কেগার্ড ব্যক্তিগত জীবনের তিনটি সম্পর্কের কথা বলেছেন, যার মাধ্যমে আমরা দায়, দায়িত্ব, নৈতিকতা, ন্যায়, অন্যায় ইত্যাদি বোধগুলি সম্পর্কে সচেতন হই। এই তিনপ্রকার সম্পর্ক হল- i) বন্ধুত্ব, ii) বৈবাহিক সম্পর্ক এবং iii) নিয়োগকর্তা ও নিয়োগীর সম্পর্ক। এই তিনপ্রকার সম্পর্কের মধ্যে তিনি বন্ধুত্বকে প্রথম রেখেছেন। তিনি বলেছেন বন্ধুর জন্য বন্ধুর দায়বদ্ধতা থাকে। দায়বদ্ধতার উপরই বন্ধুত্বের সম্পর্ক দাঁড়িয়ে থাকে। এই বন্ধুত্বের সম্পর্ক থেকেই পারস্পরিক বিশ্বাস, দায়বদ্ধতা, কর্তব্য, ভাললাগা ইত্যাদি বোধগুলি আরও ভালভাবে জেগে ওঠে। দ্বিতীয়ত, তিনি বৈবাহিক সম্পর্কের কথা বলেছেন, কারণ বৈবাহিক সম্পর্কও দাঁড়িয়ে থাকে একে অপরের প্রতি বিশ্বাস, কর্তব্য ও দায়িত্বের উপর। তৃতীয়ত, তিনি নিয়োগকর্তা ও নিয়োগীর সম্পর্কের কথা বলেছেন কারণ এই প্রকার সম্পর্কও পারস্পারিক সম্মান, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, কর্তব্যের উপর দাঁড়িয়ে থাকে।

কিয়ের্কেগার্ড বলেছেন এই তিনটি সম্পর্কের কোন একটির মধ্যে দিয়ে ব্যক্তি গেলেই সে নৈতিক আদর্শ ও কর্তব্য সম্পর্কে বুঝতে পারে। এবং এর মাধ্যমেই ব্যক্তি প্রাথমিকভাবে দায়বদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন হয়। তিনি বলেছেন এই নৈতিক স্তরের মধ্যেও ব্যক্তি যেন সম্পূর্ণভাবে সুখী হতে পারেনা, কারণ বিশুদ্ধ নৈতিক জীবনযাপন করা বাস্তবে সম্ভব নয়। নানা রকম দ্বান্দ্বিকতা ব্যক্তির মধ্যে এই স্তরে লক্ষ্য করা যায় ফলে ব্যক্তি বাধ্য হয় পরবর্তী স্তরে প্রবেশ করতে। অস্তিত্বের এর পরবর্তী স্তর হল ধর্মীয় স্তর।

Religious stage বা ধর্মীয় স্তরঃ কিয়ের্কেগার্ড বলেছেন ধর্মীয় স্তর হল মানব অস্তিত্বের সর্বোচ্চ এবং সর্বশেষ বা চরম স্তর। এই স্তরের পূর্বে নৈতিক স্তরে ব্যক্তি একপ্রকার আদর্শনিষ্ঠ জীবনযাপনে আগ্রহী হয়ে পড়ে। এই আদর্শনিষ্ঠ জীবন থেকেই ব্যক্তি অবসাদগ্রস্থ হয়ে পড়ে, এই অবসাদ থেকে মুক্তি পাবার জন্য সে আর উচ্চতর কোন নীতির কথা ভাবতে পারে না। তখন ব্যক্তি এক অসীম ও পূর্ণ সত্তার কথা ভাবতে শুরু করে। এবং মনে এই এই পূর্ণ সত্তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করলেই সে হয়তো পূর্ণতার স্বাদ উপলব্ধি করতে পারবে। তাই ব্যক্তি স্বাধীনভাবে ধর্মীয় জীবনকে নির্বাচন করে। এই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মূল ভিত্তি হল 'বিশ্বাস' ও 'পাপবোধ'। নিজের সম্পর্কে পাপবোধ জাগলে তবেই ব্যক্তি ঈশ্বরের সম্মুখীন হয়। এই পাপবোধ ব্যক্তির নিজের সম্পর্কে পাপবোধ। নিজের সীমাবদ্ধতা, অক্ষমতা, ত্রুটি, অসম্পূর্ণতা ইত্যাদি বোধ থেকে পাপবোধ জাগে। তাই ধর্মীয় স্তরকে বলা হয় পাপবোধের স্তর। এই

পাপবোধ থেকেই ব্যক্তির ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস জন্মায়। এই বিশ্বাস থেকেই ব্যক্তি নিজেকে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করে। এই বিশ্বাস হল বা ব্যক্তিগত। তাহলে মনে হতে পারে কিয়ের্কেগার্ড এই বিশ্বাসের ব্যাখ্যা কীভাবে দিয়েছেন? কিয়ের্কেগার্ডের মতে এই বিশ্বাস হল ব্যক্তিগত। এই বিশ্বাসকে কখনো বস্তুগত দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার ও ব্যাখ্যা করা যাবে না। কিয়ের্কেগার্ড বলেছেন নৈতিক আদর্শ ও বিশ্বাসের মধ্যে যদি দ্বন্দ্ব হয় তাহলে একজন ধর্মীয় স্তরে অবস্থানরত ব্যক্তির নৈতিক আদর্শকে উপেক্ষা করে বিশ্বাসকেই গ্রহন করতে হবে। বাইবেল থেকে একটি উদাহরন দিয়ে বিষয়টি বোঝানো যেতে পারে- আব্রাহামের ছেলে ছিলেন ইজাক। আব্রাহাম তাঁর সমগ্র জীবন ঈশ্বরের নিকট সমর্পণ করেছিলেন। আব্রাহাম ঈশ্বরের দ্বারা আদিষ্ট হয়েছিলেন যে তার সন্তানকে ঈশ্বরের নিকট সমর্পণ করতে হবে। এই অবস্থায় আব্রাহাম একটি বিশেষ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। একদিকে একজন পিতা এবং সাধারন মানুষ হিসাবে তাঁর নৈতিক কর্তব্য তাঁর সন্তানকে রক্ষা করা, অপরদিকে একজন প্রকৃত ঈশ্বর বিশ্বাসী হিসেবে তাঁর উচিত তাঁর সন্তানকে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করা। এই অবস্থায় আব্রাহাম যেহেতু ঈশ্বরের কাছে তাঁর সমগ্র জীবন সমর্পণ করেছেন তাই তিনি তাঁর সন্তানকে হত্যা করেন।

তাই কিয়ের্কেগার্ড বলেছেন ব্যক্তি যখন তার স্বাধীন ইচ্ছা অনুযায়ী ধর্মীয় জীবনকে বেছে নেয় এবং ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থাশীল হয় তখন সে ভাল-মন্দ, শুভ-অশুভ, কল্যাণ-অকল্যাণ, ন্যায়-অন্যায়, নৈতিক-অনৈতিক ইত্যাদি দ্বন্দ্বগুলিকে অতিক্রম করে যায়। ধর্মীয় জীবনে ব্যক্তির সমগ্র ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের মাধ্যমে অতিবাহিত হয়। ফলে এই স্তরে যে কোন নৈতিক আদর্শ ব্যক্তির কাছে অ-প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। একেই কিয়ের্কেগার্ড বলেছেন ‘Teleological suspention of the Ethical’ বা ‘নৈতিকতার উদ্দেশ্যমূলক স্থিতিকরন’। কিয়ের্কেগার্ড বলেছেন একমাত্র ‘বিশ্বাস’ বা ‘faith’ এবং ‘কষ্ট’ বা ‘suffering’ মধ্যে দিয়ে আমি একা উপলব্ধির জগতে ঈশ্বরের সম্মুখীন হতে পারি। যেহেতু ঈশ্বর অতিবর্তী, অনন্ত, অসীম সেই কারণে তাকে যুক্তি বুদ্ধির দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। ঈশ্বরকে একমাত্র বিশ্বাসের দ্বারা লাভ করা যায়। এইভাবে ব্যক্তি ধর্মীয় জীবনে বৌদ্ধিকতার স্তরকে অতিক্রম করে বৌদ্ধিকতার ও বিশ্বাসের জগতে প্রবেশ করে। এই স্তরে ব্যক্তি তার যে কোন সংকল্পকে বিশ্বাসের জন্য ত্যাগ করতে রাজি থাকে। এই কারনে এই স্তরকে ‘Life of faith and subjectivity’ বলা হয়েছে। তিনি বলেছেন মানুষের সর্বশেষ লক্ষ্য হওয়া উচিত ঈশ্বরের নিকট নিজেকে সমর্পণ। অর্থাৎ তিনি ধর্মীয় জীবনকে ভীষণভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন।

কিয়ের্কেগার্ড তাঁর নিজের ব্যক্তিগত জীবনে অস্তিত্বের এই তিনটি স্তরের মধ্যে দিয়েই গিয়েছিলেন। তিনি ধর্মীয় জীবনকে সর্বাপেক্ষা বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি অস্তিবাদী ধারার মধ্যে থেকেও ঈশ্বরকে স্বীকার করেছেন। তবে তাঁর কাছে ঈশ্বর হল ব্যক্তিগত। অর্থাৎ তিনি “Personal God” এ বিশ্বাসী ছিলেন। তাই তিনি বলেছেন

খ্রিষ্টধর্মে কেউ জন্মগ্রহন করলেই খ্রিষ্টান হয় না, তাঁর কাছে খ্রিষ্টান এর অর্থ হল খ্রিষ্টান হয়ে ওঠা।

গ্রন্থপঞ্জী:

১. Barrett, Willam. ***Irrational Man.*** London: Heinemann, 1961.

২. Blackham, H.J., ***Six Existentialist Thinkers.*** London and New York: Taylor and Francis e-Library, 2002.

৩. Macquarrie, John. ***Existentialism.*** New York: Penguin Press, 1972.

৪. Solomon, R. C. ***From Rationalism to Existentialism.*** New York: ৫. Haspers & Row Publishers, 1972.

৬. সরকার, স্বপ্না. ***অস্তিবাদী দর্শন ও প্রতিভাস বিজ্ঞান.*** কলেজস্ট্রীট, কলকাতা ৭৩: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০৩.

কৃত্তিবাসের 'শ্রীরামপাঁচালি' কাব্যে লোকায়ত ভাবনা

মনোতোষ মাজি
গবেষক ও প্রাবন্ধিক

সারসংক্ষেপ
ভারতবাসীর জাতীয় জীবনে দুটি মহাকাব্যের মধ্যে রামায়ণের গুরুত্ব অপরিসীম। বাল্মীকি রচিত সংস্কৃত রামায়ণ ভারতবর্ষের প্রায় সব আঞ্চলিক ভাষাতেই অনূদিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে কবি কৃত্তিবাস ওঝা বাঙালি সমাজ ও সংস্কৃতিকে সামনে রেখে রামায়ণের অনুবাদ করেন। কৃত্তিবাসের 'শ্রীরাম পাঁচালি'-তে উঠে এসেছে মানবিকতা, শঠতা, খাদ্যাভ্যাস, সামাজিক রীতি-নীতি, রাজনীতি, ইত্যাদি বিষয়। তাঁর কাব্যের কাহিনি বুননে পরতে পরতে গ্রন্থিত হয়েছে সমকালের বাঙালি সমাজের বিভিন্ন লোকায়ত ভাবনা। 'শ্রীরাম পাঁচালি'-তে লোকায়ত ভাবনার সর্বপ্রথম যে বিষয়টি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হল – লোকায়ত আচার ও সংস্কার। বাংলা সাহিত্যে কৃত্তিবাসী রামায়ণ বাঙালির জীবনে সবথেকে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে। গত কয়েক শতাব্দী ধরে বাঙালি জাতির হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণ বাঙালির দৈনন্দিন জীবনে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। কৃত্তিবাসী রামায়ণে লোকায়ত বিষয়গুলির অন্তর্ভুক্তির কারণে কাব্যটি বাংলা সাহিত্যের রত্নসমূহের অন্যতম।
সূচক : 'শ্রীরাম পাঁচালি'. কৃত্তিবাস ওঝা, জাতিগঠন, লোকায়ত ভাবনা।

মূল আলোচনা:
ভারতবাসীর জাতীয় জীবনে দুটি মহাকাব্যের মধ্যে রামায়ণের গুরুত্ব অপরিসীম। বাল্মীকি রচিত সংস্কৃত রামায়ণ ভারতবর্ষের প্রায় সব আঞ্চলিক ভাষাতেই অনূদিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে কবি কৃত্তিবাস ওঝা বাঙালি সমাজ ও সংস্কৃতিকে সামনে রেখে রামায়ণের অনুবাদ করেন। কৃত্তিবাসের 'শ্রীরাম পাঁচালি'-তে উঠে এসেছে মানবিকতা, শঠতা, খাদ্যাভ্যাস, সামাজিক রীতি-নীতি, রাজনীতি, ইত্যাদি বিষয়। তাঁর কাব্যের কাহিনি বুননে পরতে পরতে গ্রন্থিত হয়েছে সমকালের বাঙালি সমাজের বিভিন্ন লোকায়ত ভাবনা।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যচর্চায় কবি কৃত্তিবাস রাম-রাবণের যুদ্ধবর্ণনার পাশাপাশি গার্হস্থ্য জীবনের ছোট-ছোট দুঃখ, ব্যথা, হাসি-কান্না, হিংসা-প্রতিহিংসা প্রভৃতি বিষয়গুলিকে কাব্যসজ্জায় স্থান দিয়েছেন। রামায়ণ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন্তব্য–

> **রামায়ণের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাহা ঘরের কথাকেই অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইয়াছে। পিতা-পুত্রে ভ্রাতায়-ভ্রাতায় স্বামী-স্ত্রীতে যে ধর্মের বন্ধন, যে প্রীতিকর সমন্ধ, রামায়ণ**

> **তাহাকে এত মহৎ করিয়া তুলিয়াছে যে তাহা অতি সহজেই মহাকাব্যের উপযুক্ত হইয়াছে।[১]**

রবীন্দ্রনাথের রামায়ণ বিষয়ে উপরের মন্তব্যটি বর্তমান সময়ে আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। বাঙালি জীবনে রামায়ণের প্রভাব প্রসঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সমালোচক, অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য–

> **কৃত্তিবাস বাঙালির প্রিয়তম কবি। তাঁর রামায়ণ বাঙালির জাতীয় মহাকাব্য।...কৃত্তিবাসের রামায়ণ বর্তমানে যে রূপ লাভ করেছে, তা আর ব্যক্তি বিশেষের রচনা নেই, তার উপরে সমগ্র জাতির হাতের ছাপ পড়েছে।[২]**

সমালোচক-এর মন্তব্যটিকে সমর্থন করে আমরা বলতে পারি, বাঙালি জীবনের ছাপ শুধু এই মহাকাব্যে উপস্থাপিত হয়নি; কয়েক শতাব্দী ধরে 'শ্রীরাম পাঁচালি'বাঙালি জাতিগঠনের সঙ্গে বাঙালি সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হয়ে উঠেছে।তবে আমাদের কৃত্তিবাস মহাকাব্যের বিশালতাকে স্বীকার করে আঞ্চলিক বিষয়ভাবনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এই বিষয়ে সমালোচক দীনেশচন্দ্র সেনের উল্লেখ– "...জাতীয় প্রতিভার হস্তে কৃত্তিবাসের প্রতিভা নূতনরূপে গঠিত হইয়াছিল।"[৩ক]সেইকারণে কৃত্তিবাসের কাব্যকাহিনি নির্মাণে, চরিত্র সৃষ্টিতে ও সবিশেষ লোকায়ত ভাবনায় উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এইপ্রসঙ্গে আমরা অধ্যাপক ভবতোষ দত্তের মন্তব্যকে উপস্থাপন করতে পারি– "...রামায়ণের ব্যক্তির প্রতি ব্যক্তির ভালোবাসা, বনবাসে রামসীতার মধুর দাম্পত্যজীবনের ছবি, সীতাকে হারিয়ে রামের বিরহ দুঃখ, প্রকৃতির সৌন্দর্যের এমন আলেখ্যও আর কোনো মহাকাব্যে পাওয়া যাবে না।"[৩খ]

'শ্রীরাম পাঁচালি'-তে লোকায়ত ভাবনার সর্বপ্রথম যে বিষয়টি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হল–লোকায়ত আচার ও সংস্কার। 'শ্রীরাম পাঁচালি'-র দ্বিতীয় কাণ্ডে আমরা দেখতে পাই রামের রাজ্যাভিষেকের আয়োজন। এই অনুষ্ঠান পরিকল্পনায় কবি রামের অধিবাসের বিস্তারিত তথ্য পরিবেশন করেছেন এইভাবে–

> **নানা পুষ্প সুগন্ধি বসন্ত চৈত্র মাস।**
> **কালি করিব শ্রীরামের অধিবাস।।**
> **রামের অধিবাস করিতে যতেক দ্রব্য লাগে।**
> **সকল দ্রব্য আনিয়া যোগায় রাজা আগে।।[৪]**

এছাড়াও সীতার সাধভক্ষণ, রাম-সীতা বিবাহের অধিবাস, সুমিত্রার বিবাহের নান্দীমুখ, বাসি বিবাহ ও কালরাত্রি, রামের বিবাহকালে এয়োনারীদের বরবরণ। এই আচমন বিধিগুলির মধ্যে দশরথের চারপুত্রের বিয়ের অধিবাস 'শ্রীরাম পাঁচালি'তে আড়ম্বরপূর্ণভাবে চিত্রিত–

> **চারি কন্যার অধিবাস করিলা হরিষে।।**

আগে চারি কন্যার কৈল মঙ্গল আচার।
তবে অধিবাস করিলা চারি কুমারি।।

..
রামের অধিবাস দেখিয়া হরিষ দেবগণ।।[৫]

বিবাহের প্রত্যেকটি আচার-প্রথা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে উপস্থাপিত করেছেন। রামচন্দ্রসহ তাঁর ভাইদের সাতপাক আবর্তিত হওয়ার প্রথাটিও কাব্যে উঠে এসেছে–"সাতবার প্রদক্ষিণ কৈলা চারিজন। / কন্যাবরে পুষ্পবৃষ্টি হইল আটজন।।"[৬]বিবাহের এইসকল বর্ণনা বিষয়ে সমালোচক কালিদাস রায়ের উক্তি–"প্রাচীন বাংলার কাব্যগুলিতে শিবের বিবাহ-প্রসঙ্গ লইয়া রঙ্গ-রহস্য করা হইয়াছে – বাঙ্গালী সংসারের একটা বৈবাহিক চিত্রেরও আভাস দেওয়া হইয়াছে। কৃত্তিবাস সেই প্রথা অনুসরণ করিয়াছেন – বলা যায়। রামায়ণের মূল গল্পের সঙ্গে ইহার কোনো যোগ নাই— এই কাহিনীকেবল সে-কালের আদর্শেরকাব্যকে সম্পূর্ণাঙ্গ করিবার জন্য। প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে মূল উপাখ্যানের পক্ষে অনাবশ্যক বলিয়া ইহা বজ্জিত হইয়াছে।"[৭] শুধুমাত্রবিবাহ নয়, পরে সীতার-বনবাস বিষয়ে কবি লোকসাহিত্যের ধারাকে অনুসরণ করেন। এই বিষয়ে গবেষকের মত–"রামের সীতা- নির্বাসন সম্বন্ধে কবি অনেকটা লোক সাহিত্যের ধারা অনুসরণ করিয়াছেন।"[৮]

কৃত্তিবাসী রামায়ণে জন্ম, বিবাহ ও অন্যান্য রীতি-নীতির সঙ্গে মৃত্যুর পরে নানা সংস্কারের কথা পাওয়া যায়। যেমন আদিকাণ্ডে সগর বসু মহারাজার শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের প্রসঙ্গ–"বসু মহারাজা।/শ্রাদ্ধকালে বিপ্রগণে করে তার পূজা।।"[৯] একইসঙ্গে আমরা রাবণের মৃত্যু ও পরে তার সৎকার বিষয়ে নানা উপাচারের উল্লেখ পাই–

অকালে না মরে কেহো শুন বিভীষণ।
রাবণের অগ্নিকার্য্য করহ তর্পণ।।
রাবণের পরলোকচিন্তা করহ ব্যাপার।
রাবণ রাজার আগে করহ সৎকার।।[১০]

'শ্রীরাম পাঁচালি'-তে সমকালে সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন যানবাহনের পরিচয় পাওয়া যায়। আদিকাণ্ডে দশরথের এক যাত্রাপথ বর্ণনায় আছে – "রথে চড়ি দশরথ চলিলা ত্বরিত।।"[১১]এরপর নদীপথে যাওয়ার প্রসঙ্গও উল্লেখিত–

নৌকাপথে আমরা যাইব দেশে।
তবে নৌকা বনমধ্যে করিল প্রবেশ।।[১২]

ভারতবর্ষ নদীপ্রধান দেশ সেইকারণে যাত্রাপথে নৌকার ব্যবহার বেশি পাওয়া যায়। এছাড়াও ঘোড়া ও হাতির সঙ্গে পালকি সহযোগে যাতায়াতের উল্লেখ আছে।

বাঙালি গৃহস্থালির নানা উপকরণ এই কাব্যে গ্রন্থিত আছে। কলসি, প্রদীপ, থালা ইত্যাদির কথা-ই প্রধানত কাব্যে উঠে এসেছে। মাটির কলসি ব্যবহারের বিষয়টি কাব্যে বর্ণিত আছে এইভাবে–

পর্ব্বত প্রমাণ চাহি তিল রাশি রাশি।
তিরাশী লক্ষ বিল্বদল ঘৃতের কলসি।।[১৩]

সমগ্র 'শ্রীরাম পাঁচালি'-তে বিভিন্ন অনুষ্ঠান ক্রিয়াকর্মে প্রদীপের দেখা মেলে। রামের অধিবাসে প্রদীপ জ্বেলে রাত্রি জাগরণের কথা বলা হয়েছে–"ঘৃত প্রদীপ জ্বালিয়া আজি, / থাকিহ জাগরণে।।"[১৪]সমকালীন সমাজের বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের কথা আমরা কৃত্তিবাসের কাব্য থেকে জানতে পারি। সীতার জন্মের সময় শোনা যায় দুন্দুভির ধ্বনি–

স্বর্গে দুন্দুভি বাজে হরিষ দেবগণ
জনকেরে ডাকিয়া বলেন দেবগণ।।
চাষভূমি কন্যা তোমায় দিলেম বিধাতা।
লাঙ্গলের মুখে জন্ম নাম থুইল সীতা।।[১৫]

আদিকাণ্ডে নারদের বীণা বাদনের প্রসঙ্গ আছে–"নারদ বীণা ছাড়িলে তম্বুরা ছড়ে গীত।"[১৬]বাদ্যযন্ত্রের নানা সুরে 'শ্রীরাম পাঁচালি'-তেএকটি সংস্কৃতির বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণে লোকায়ত ভাবনার অন্যতম বিষয় রসনাপ্রিয় বাঙালির খাদ্যাভ্যাস সুচারুরূপে চিত্রিত হয়েছে। কাব্যমধ্যে আতপ চাল, দুধ, দই, মধু, ঘি ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্যের উল্লেখ আছে।সেইসময়ে ব্যবহৃত প্রবাদ-প্রবচন ও লৌকিক ভাষাকে কবি তাঁর কাব্যে পরিস্ফুট করেছেন। যেমন – ১। 'পিঁপিড়ার পাখা উঠে মরিবার তরে' ২। 'আপনি কুঠার মারি আপনার পায়'।

বাংলা সাহিত্যে কৃত্তিবাসী রামায়ণ বাঙালির জীবনে সবথেকে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে। গত কয়েক শতাব্দী ধরে বাঙালি জাতির হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণ বাঙালির দৈনন্দিন জীবনে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। 'শ্রীরাম 'শ্রীরাম পাঁচালি'-তে যুদ্ধ, কোলাহল, রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়কে ছাড়িয়ে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, বাৎসল্য, স্নেহ-ভালোবাসা, ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের হৃদ্যতা বাঙালি জাতিকে সামাজিক নীতিবোধের পাঠ দিয়েছে। কালের গতিকে কৃত্তিবাসী রামায়ণ জয় করেছে ; যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে বাঙালি জাতি অনেক পরিবর্তিত হলেও রামায়ণ বিষয়ে তাদের মনোভাব অপরিবর্তিত আছে।কৃত্তিবাসী রামায়ণে লোকায়ত বিষয়গুলির অন্তর্ভুক্তির কারণে কাব্যটি বাংলা সাহিত্যের রত্নসমূহের অন্যতম। এইপ্রসঙ্গে অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরীর মন্তব্যটি স্মর্তব্য–"তথ্যে বাল্মীকির বহুল অনুসরণ, ভাষায় প্রথম রচয়িতার সংহত সাবধানী পদক্ষেপ এবং চরিত্রচিত্রণে তথা বিবৃতিগুণেও বাঙালি লোকজীবনের কাছাকাছি চলে আসার আগ্রহ...। এই লোক বোঝানোর সাবলীল সামর্থ্যে কৃত্তিবাস

যেমন চিরকালের বাঙালি মনের নিত্য সঙ্গী হয়েছেন , তেমনি প্রচেষ্টার সাফল্য বশেই তাঁর কাব্য হয়ে উঠেছে অভিজাত অনভিজাত সংস্কৃতির মিলন সেতু – আদি মধ্যযুগের সাহিত্যের প্রমুখ কাব্য প্রতিনিধি।”[১৭]অধ্যাপক চৌধুরী যথার্থই বলছেন। এইবিষয়ে অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতও একই–

> **কৃত্তিবাস বাঙালির প্রাণের চাহিদা বুঝিয়াছিলেন।...কৃত্তিবাস বাঙালির অন্তর লুঠ করিয়া লইয়াছেন।**[১৮]

সমালোচক ভবতোষ দত্ত রবীন্দ্রনাথের ‘রামায়ণ চর্চা’ বিষয়ে আলোচনাসূত্রে জানিয়েছেন–“সীতা বৈদিক শব্দ, ঋগ্‌বেদে তিনি কৃষিলক্ষী, রামায়ণে তিনি হলরেখা থেকেই উত্থিত। আবার অহল্যাও হলচালনার অযোগ্য অনুর্বর পাষাণীভূমি। রামচন্দ্র কৃষিকন্যা সীতাকে যেমন গ্রহন করেছেন, অহল্যা ভূমিকেও আশীর্বাদ করে সঞ্জীবিত করেছেন। উভয় ক্ষেত্রেই কৃষি বা শস্যসৃষ্টির ব্যঞ্জনা আসে। রাম শব্দের যে ব্যাখ্যা ওয়েবার করেছেন, রবীন্দ্রনাথ তা না করে তাঁর নিহিতার্থ করেছেন শান্তি বা মাধুর্য। তেমনি রাবণের অর্থ তিনি করেছেন অশান্তি বা পীড়ন।”[১৯] এইপ্রসঙ্গে আমরা স্মরণ করতে পারি রবীন্দ্রনাথের ‘রক্তকরবী’-র ভূমিকাংশে উল্লেখিত ‘কর্ষণ-জীবী’ এবং ‘আকর্ষণ-জীবী’র দ্বন্দ্ব। এই আলোচনার সূত্র ধরেই রবীন্দ্রনাথ দশাননের সীতা হরণ সেইকালের না এইকালের বলে প্রশ্ন তুলেছেন। আমরা সহজেই বলতে পারি রামায়ণে ‘কর্ষণ-জীবী এবং ‘আকর্ষণ-জীবী’ আজকের সময়েও বর্তমান। সেইকারণেই কৃত্তিবাসী রামায়ণে রূপকের মাধ্যমে কাহিনির বিস্তৃতি পর্যালোচনা করলে লোকায়ত উপাদানেরই অনুসঙ্গ পেয়ে থাকি।

লোকায়ত ভাবনার মোড়কে কবি কৃত্তিবাস যে কাব্যমাধুর্য পরিবেশন করেন, পরে অন্যান্য বিখ্যাত সাহিত্য রচনার পদার্পণেও ‘শ্রীরাম পাঁচালি’ তার আসন হারায় নি। কাল-কে জয় করে ‘শ্রীরাম পাঁচালি’হয়েছে কালজয়ী।

তথ্যসূত্র:

১. ‘প্রাচীন সাহিত্য’ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা- ১৭,প্রথম প্রকাশ-১৩১৪, পুনমুর্দ্রণ-১৪২২, পৃ. ৯।

২. ‘রামায়ণ। কৃত্তিবাস-বিরচিত’, সম্পাদনা - সুখময় মুখোপাধ্যায়, ভারবি, ১৩/১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, ভারবি প্রথম প্রকাশ-১৯৮০, পুনমুর্দ্রণ-২০১৬, পৃ. ১৫। (অতঃপর গ্রন্থটি ‘রামায়ণ। কৃত্তিবাস-বিরচিত’ নামে উল্লেখিত।)

৩. ক) ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’ শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস থেকে মুদ্রিত, ২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১৪ সেপ্টম্বর ১৮৯৬ , ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৪৩৪।

৩. খ) 'ঐতিহ্য ও রবীন্দ্রনাথ' ভবতোষ দত্ত, বিশ্বভারতী গবেষণা ও অন্যান্য প্রকাশন বিভাগ, শান্তিনিকেতন, প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৯৬, পৃ. ১৭। (অতঃপর গ্রন্থটি 'ঐতিহ্য ও রবীন্দ্রনাথ' নামে উল্লেখিত।)

৪. 'রামায়ণ। কৃত্তিবাস-বিরচিত', পৃ. ১৩৭।

৫. তদেব, পৃ. ১২৭।

৬. তদেব, পৃ. ১২৯।

৭. 'প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য' কালিদাস রায়, রসচক্র সাহিত্য-সংসদ্ প্রকাশিত, সন্ধ্যার কুলায় ৪১/১৩, রসা রোড, টালিগঞ্জ, কলকাতা, প্রকাশ – আশ্বিন ১৩৪৯, পৃ. ৬৭।

৮. 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত'অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (তৃতীয় খণ্ড:প্রথম পর্ব), মডার্ণ এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, ১০ বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, পুনর্মুদ্রণ ২০১৩-২০১৪, পৃ. ২৮০। ('বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত'(তৃতীয় খণ্ড:প্রথম পর্ব নামে উল্লেখিত।)

৯. 'রামায়ণ। কৃত্তিবাস-বিরচিত', পৃ.১২৬।

১০. তদেব, পৃ.৪৪৩।

১১. তদেব, পৃ. ৯৬।

১২. তদেব, পৃ. ১০৪।

১৩. তদেব, পৃ. ১০৫।

১৪. তদেব, পৃ. ১৩৭।

১৫. তদেব, পৃ. ১১০।

১৬. তদেব, পৃ. ১০৬।

১৭. 'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা' (প্রথম পর্যায়), ভূদেব চৌধুরী, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, পুনর্মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ১১০-১১১।

১৮. 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত'(তৃতীয় খণ্ড:প্রথম পর্ব), পৃ. ২৮১।

১৯. 'ঐতিহ্য ও রবীন্দ্রনাথ', পৃ. ২৮।

পৃথিবীর আলো থেকে কন্যাভ্রুণের প্রান্তিকীকরণ

মুনমুন দত্ত
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
হাজী এ. কে. খান কলেজ
পশ্চিমবঙ্গ, ভারতবর্ষ

সারসংক্ষেপ : মানবসভ্যতার অন্তর্গত অর্ধেক মানবসত্তা, নারী, আজ বিপন্ন। এই বিপন্নতার কারণ হিসাবে কোনো ভৌগলিক বা রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক বিষয়কে দায়ি করা যায় না, এর জন্য দায়ি লিঙ্গ বৈষম্য। এই লিঙ্গ বৈষম্য সমাজ নির্মিত। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারী সন্তানের জন্ম দেওয়ার জন্য কাঙ্ক্ষিত, সেখানেও আবার পুত্রসন্তানেই অভিপ্রেত। কন্যাসন্তানের চাহিদা খুব একটা আশানুরূপ নয়, যার প্রতিফলন ঘটে কন্যাসন্তানের লালন-পালনের ক্ষেত্রেও। বর্তমান সমাজের আধুনিকতার ছোঁয়াও এই ধ্যানধারণার পরিবর্তন ঘটাতে অক্ষম। বরং অত্যাধুনিক প্রযুক্তিও অনেক সময় নারীর প্রতি বঞ্চনার দিকটিকে আরো সুনিশ্চিত করে। চিকিৎসাবিদ্যায় প্রযুক্তিগত উন্নতির অন্যতম নিদর্শন হল আলট্রাসনোগ্রাফি, যার সাহায্যে গর্ভবতী নারীর গর্ভের ভ্রুণের লিঙ্গ নির্ধারণ করা যায়। সেই লিঙ্গ নির্ধারণে ভ্রুণটি যদি কন্যাভ্রূণ হয়, তাহলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তার পরিনতি হয় মৃত্যু। মাতৃগর্ভেই কন্যাভ্রূণটিকে হত্যা করা হয়। কন্যাভ্রূণ হত্যার ফলে নারী-পুরুষের প্রাকৃতিক ভারসাম্য আজ আশঙ্কাজনক অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে, যা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক। সুস্থ সুন্দর সমাজ গঠনের জন্য আবশ্যক নারী-পুরুষের অনুপাতে সামঞ্জস্যতা, যার জন্য আবশ্যক সচেতনতা এবং উন্নত মানসিকতা।

সূচক : ভ্রুণ, কন্যাভ্রুণ, লিঙ্গ বৈষম্য, আলট্রাসনোগ্রাফি, কন্যাভ্রুণ হত্যা, সচেতনতা।

মূল আলোচনা :

বর্তমান বিশ্বে মানব সভ্যতা আজ বিভিন্ন দিক থেকে বিপন্ন। এই বিপন্নতার পিছনে কখনও ভৌগোলিক কারণ, আবার কখনও রাজনৈতিক কারণ অথবা অর্থনৈতিক কারণ বিদ্যমান। ভৌগোলিক কারণ এর পিছনে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতি মানুষের অসতর্কতা এবং রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কারণের পিছনে মানুষের লোভ, হিংসা প্রভৃতি অনৈতিক মনোভাবগুলি দায়ি। আর এই অনৈতিক মনোভাবের পরিণতি হল যুদ্ধ, সন্ত্রাস; যা মানব সভ্যতাকে বিপন্ন করে তুলেছে। সুতরাং বিপন্ন মানব সভ্যতার ধারাবাহিকতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, মানুষের অসতর্ক জীবনযাত্রাই আজ মানব সভ্যতাকে বিপন্ন করে তুলেছে। কিন্তু এই মানব সভ্যতার অন্তর্গত অর্ধেক মানবসত্তা নারী, প্রচলিত সমাজের সৃষ্ট লিঙ্গ পরিচয়ের কারণে বিপন্ন। অর্থাৎ নারী শুধুমাত্র তার লিঙ্গ পরিচয়ের কারণে বিপন্ন। নারীর বিপন্নতার জন্য যে বিষয়টি দায়ি,

তা হল সমাজ আরোপিত লিঙ্গ পরিচয়। নারীর বিপন্নতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, শুধু বর্তমান সমাজে নয়; প্রাচীন ভারতবর্ষে ও নারীর প্রয়োজনীয়তা পুত্র সন্তানের জন্মদানের জন্যই কাঙ্ক্ষিত ছিল। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় বংশের উত্তরাধিকার রক্ষার জন্য পুত্র সন্তানের চাহিদা লক্ষ্য করা যায়, আবার পুত্র সন্তানের জন্মদান এর জন্য নারীর প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য করা যায়; কিন্তু কন্যাসন্তানের জন্ম কোন ভাবেই কাঙ্ক্ষিত নয়। আশ্চর্যের বিষয় হল, কন্যাসন্তানই ভবিষ্যতের পুত্রসন্তানের জন্মদানকারী নারী, কিন্তু তাও কন্যাসন্তান কাম্য নয়। পুত্রসন্তান কামনার কথা উপনিষদ, পুরাণ, প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্র বা মহাকাব্যেও উল্লেখ আছে।

> "বৃহদারণ্যক উপনিষদের ঋষি যাজ্ঞবল্কও বলেছেন যাহা পুত্র কামনা তাহাই বিত্তকামনা। "যা হি এব পুত্রৈষণা সা বিত্তৈষণা।" (৩/৫/১)। দেবীপুরাণেও সেই কামনা "ধনং দেহি পুত্রং দেহি।"" **১**

প্রাচীন ভারতবর্ষের ধর্মশাস্ত্রগুলিতেও পুত্রের জন্মকেই অধিক প্রাধান্য দেওয়া হত। এই প্রাধান্য দেওয়ার অন্যতম কারণ ছিল পুণ্যলাভের আকাঙ্ক্ষা। কোনো বংশে পুত্রসন্তানের জন্ম হলে তার পরিবারের পিতৃপুরুষদের স্বর্গ লাভ হবে - এমন ধারণা প্রকাশ পায় ধর্মশাস্ত্রগুলিতে। পুত্রসন্তানের জন্ম একজন পিতাকে পিতৃঋণ থেকে মুক্ত করে, পিতৃকুলের বংশ-পরম্পরা রক্ষা করে। তাই পুত্র সন্তানের কামনা প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থারই অংশ। ধর্মশাস্ত্রের যুগ হোক অথবা মধ্যযুগ, কন্যাসন্তান কোনো সময়ে কাম্য ছিল না। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে কন্যাসন্তান বংশ রক্ষা করতে অসমর্থ। তাই কন্যাসন্তান দুঃখের কারণ রূপে গণ্য হয়ে এসেছে। আর এই দুঃখের কারণটি বেঁচে থাকার যোগ্য কিনা তা অনেক সময়ই বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্থির করা হত। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে,

> "তৈত্তিরীয় সংহিতায় আমরা দেখি, সোমযোগের একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে কতকগুলি যজ্ঞীয় পাত্র মাটিতে রাখা হতো, কতকগুলি আবার উপরে রাখা হতো। "সেই জন্য শিশুকন্যাদের জন্মের পর মাটিতে রাখা হয়, শিশুপুত্রদের তুলে ধরা হয়" (৬/৫/১০/৩)। রোমে শিশুকে জন্মের পর মাটিতে রাখা হতো, এবং পিতাকে ডাকা হতো। এটা যদি শিশুকে দেখে বেঁচে থাকার যোগ্য মনে করত, সে তাকে মাটি থেকে তুলে নিত।" **২**

কন্যাসন্তানের জন্মগ্রহণ করার বিষয়টি অনাকাঙ্ক্ষিত হওয়ার সাথে সাথে জন্মের পরবর্তীতে তাকে বাঁচিয়ে রাখার বিষয়টিও অনেক সময় আবার নির্বাচিত হওয়ার অপেক্ষায় থাকত। জন্মের পর অনেক ক্ষেত্রেই বিভিন্নভাবে কন্যাসন্তান হত্যার ইতিহাস চোখে পড়ে। ভারতবর্ষের মধ্যে এই বিষয়ের শীর্ষে অবস্থান করে রাজস্থান। যেখানে কন্যাসন্তান হত্যা করতে করতে কন্যাসন্তান শূন্য গ্রামের দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়।

বর্তমান সমাজ পূর্বের থেকে অনেক আধুনিক। এই আধুনিকতার ফলস্বরুপ সমগ্র সমাজকাঠামোয় দেখা গেছে আমূল পরিবর্তন। অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কার, প্রযুক্তিতে উন্নতি যেমন ঘটেছে; তেমনি মানুষের বুদ্ধিও হয়েছে ক্ষুরধার। কিন্তু এত কিছুর পরিবর্তন হলেও একটি বিষয় অপরিবর্তিতই থেকে গেছে, তা হল মানসিকতা। কন্যাসন্তানের প্রতি অনাকাঙ্ক্ষা, অবহেলার মানসিকতার কোনো পরিবর্তন ঘটেনি সমাজে। তখনই কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণের পর তার বেঁচে থাকার বিষয়টি নির্বাচিত হত, আজও কন্যাসন্তানের বেঁচে থাকার বিষয়টি নির্বাচিত হয় তার জন্ম গ্রহণের পূর্বেই। চিকিৎসা বিদ্যায় অত্যাধুনিক প্রযুক্তির অন্যতম নিদর্শন হল আলট্রাসনোগ্রাফি, যার মাধ্যমে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ করা যায়। লিঙ্গ নির্ধারণের পর সেটি কন্যাভ্রূণ হলে মাতৃগর্ভেই তাকে হত্যা করা হয়। কন্যাভ্রূণ হত্যার ক্ষেত্রে ধনী থেকে দরিদ্র, শহরাঞ্চল থেকে গ্রামাঞ্চল, শিক্ষিত থেকে অশিক্ষিত - কোন ক্ষেত্রেই খুব একটা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। এই সমস্ত কিছুর পিছনে কাজ করে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের লিঙ্গবৈষম্যের মানসিকতা। যে মানসিকতার বশবর্তী হয়ে সেবা কল্পে নিযুক্ত চিকিৎসকরাও তাদের নীতি-নৈতিকতাকে বিসর্জন দিয়ে জীবন দান করার পরিবর্তে জীবন নাশ করতেও পিছপা হচ্ছেন না। যার ফলস্বরুপ চিকিৎসাবিদ্যার মত সেবামূলক কার্যটি আজ আনেকের কাছে শুধুমাত্র ব্যবসায় পরিণত হয়েছে।

> "সাধারণত মনে করা হয় যে আল্ট্রাসনোগ্রাফির মাধ্যমে ভ্রুণের লিঙ্গ নির্ধারণ কেন্দ্রগুলি প্রধানত শহরকেন্দ্রিক হাওয়ার ফলে গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী দরিদ্র এবং অপেক্ষাকৃত অশিক্ষিত পরিবার অপেক্ষা শিক্ষিত এবং ধনী পরিবারেই কন্যাভ্রূণ হত্যার ঘটনা ঘটে বেশি। কিন্তু তথ্য সে কথা বলে না। শহরাঞ্চলের হাওয়া লেগে গ্রামাঞ্চলেও ক্রমশ ভ্রূণ পরীক্ষা ও গর্ভপাত কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সমীক্ষা বলে যে রাজস্থান, হরিয়ানা, গুজরাট, কর্ণাটক প্রভৃতি রাজ্যের ব্লক স্তরে লরি ও ভ্যানের মাথায় পৌঁছে যাচ্ছে আল্ট্রাসনোগ্রাফি মেশিন। যেখানে গর্ভস্থ ভ্রূণ পরীক্ষা ও ভ্রূণ হত্যার কেন্দ্রগুলিতে গড়ে উঠেছে ডাক্তার-রেডিওলজিস্ট-দালালদের চক্র, যে চক্র লিপ্ত থাকছে নিরব শিশুহত্যার ব্যবসায়ে।" **৩**

অনেক সময় আবার কোনো কারণে পরিবারের অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কন্যাসন্তানের জন্ম রোধ করতে না পারলে অবাঞ্ছিত ভাবে কন্যাসন্তানের জন্ম হয়ে যায়। কিন্তু সেই সদ্যজাত শিশুকে অনেক সময়েই গলা টিপে শ্বাসরোধ করে, মুখে নুনু দিয়ে, দুধের গামলায় তাকে ডুবিয়ে, প্রকৃতি বিভিন্ন অমানবিক পন্থা অবলম্বন করে হত্যা করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে বেশ কিছু পরিবার আবার লোকলজ্জা অথবা আইনি জটিলতায় পড়ার ভয়ে সদ্যোজাত কন্যাসন্তানকে প্রত্যক্ষভাবে হত্যা করা থেকে বিরত থাকে। কিন্তু সেই অবাঞ্ছিত কন্যাসন্তান সঠিক লালন-পালন যখন থেকে বঞ্চিতই থেকে যায়। তাদের মধ্যে অনেকেই পর্যাপ্ত খাদ্যের অভাবে অপুষ্টি জনিত কারণে, সঠিক পরিচর্যার অভাবে

অসুস্থতা অথবা বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। সেই মৃত্যুও কিন্তু এক প্রকার হত্যার সামিল। কিন্তু কন্যা শিশু অপুষ্টির অথবা অসুস্থতার কারণে মারা গেলে তা প্রত্যক্ষভাবে হত্যার দায় থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। অনেক সময় সদ্যজাত কন্যাসন্তানকে শ্বাসরোধের মতো প্রত্যক্ষভাবে হত্যার পন্থা অবলম্বন করলে আইনগত দৃষ্টিকোণ থেকে হত্যাকারী হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, আবার মানসিক দিক থেকেও নিজেকে অপরাধী মনে করার অপরাধবোধে ভুগতে হতে পারে। কিন্তু অপুষ্টি অথবা অসুস্থতার কারণে কন্যাসন্তানের মৃত্যু হলে আইনগত এবং মানসিক উভয় প্রকার দিক থেকেই ‘হত্যা’ নামক অপরাধ থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখতে পারে, আবার পুরুষতন্ত্রের ধারাকে অব্যাহত রাখতে পারে।

> “... জন্মের পর থেকে অবহেলা, অসুস্থতা ও অচিকিৎসার ফলে এই বয়সের কন্যার মৃত্যু সংখ্যা পুত্রের মৃত্যুর সংখ্যা অপেক্ষা বাড়তে থাকে।... দরিদ্র পরিবারে পুত্র কন্যা দুই-ই থাকলে পুত্রটি অসুস্থ হলে হাসপাতালে নিয়ে সাধ্যমতো চিকিৎসা করানো হয়। কিন্তু কন্যা অসুস্থ হলে অনেক সময়ই তাকে বাড়িতে রেখে টোটকা ঔষধের উপর নির্ভর করা হয়। গ্রামাঞ্চলে এই রীতিই বেশি প্রচলিত কারণ দরিদ্র পরিবারে কন্যাটি না বাঁচলেও ক্ষতি নেই। বরং একটি দায় কমে।” **৪**

আসলে ‘হত্যা’ হল একটি গর্হিত অপরাধ, যাকে কোনো অবস্থাতেই সমর্থন করা যায় না। তাই কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করার পর সেই মানবসত্তাকে হত্যা করা অন্যায়। কিন্তু জন্মগ্রহণ করার পূর্বেই যদি কন্যাভ্রুণটিকে মাতৃগর্ভেই মেরে ফেলা হয় তাহলে তা হত্যা হবে কিনা, সে ব্যাপারে নানা বিতর্ক আছে। কারণ, মানবসত্তা হত্যা অন্যায়, কিন্তু কন্যাভ্রুণকে মানবসত্তা সমতুল্য রূপে বিবেচনা করতে নারাজ অনেক মানুষই। সন্তান জন্ম গ্রহণের পর তার প্রাণের স্পন্দন প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করা যায়, তাই তাকে মানবসত্তা রূপে মেনে নিতে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু ভ্রুণ মাতৃগর্ভে অপরিণত অবস্থায় থাকা কালিন তার প্রাণের অস্তিত্ব তাকে পূর্ণ মানবসত্তা রূপে চিহ্নিত করে না। অনেক উদারপন্থীগণের মতে, একটি ভ্রুণ যতক্ষণ পর্যন্ত না মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সে মানবসত্ত্বা রূপে জীবনের অধিকার অর্জন করতে পারে না। কিন্তু ভ্রুণ হল এমন সত্তা, যার থেকে মানব জীবনের সূচনা হয়। সেই ভ্রুণ মাতৃগর্ভে যতদিন থাকে তা আমাদের সাধারণভাবে প্রত্যক্ষ গ্রাহ্য না হলেও তার জীবন সত্তাকে অস্বীকার করা যায় না। কারণ মাতৃগর্ভে ভ্রূণের প্রথম অস্তিত্বশীল হওয়া থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার মধ্যে তার প্রাণের স্পন্দনের কোনো ছেদ বা বিভাজন লক্ষ্য করা যায় না। অর্থাৎ ভ্রুণ থেকে মানবশিশুর জন্মের মধ্যে তার সত্তার কোন পরিবর্তন ঘটে না, তাই মানবশিশুকে তার জন্মের পর হত্যা করা যদি গর্হিত অপরাধ হয়, তাহলে ভ্রুণকেও তার জন্মের পূর্বে মাতৃগর্ভে হত্যা করা গর্হিত অপরাধ রূপেই গন্য হওয়া উচিত। কিন্তু তা সত্বেও

আল্ট্রাসনোগ্রাফির মাধ্যমে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ করে কন্যাভ্রুণটিকে মাতৃগর্ভে বিনষ্ট করার ঘটনা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। এই ঘটনা প্রাকৃতিক ভারসাম্যকে নষ্ট করে নারীর প্রতি বৈষম্যকে আরো উৎসাহিত করে। লিঙ্গ নির্বাচন করে কন্যাভ্রূণ হত্যার বিষয়টি ভারতবর্ষ-চিনের মতো দেশে বিষম লিঙ্গ-অনুপাতের সমস্যার সৃষ্টি করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়,

> "সম্ভবত সব থেকে উদ্বেগজনক লিঙ্গ নির্বাচনের ঘটনা ঘটে চিনে। চিনের এত বেশি দম্পতি কন্যা-ভ্রুণ নষ্ট করে এবং এত বেশি পুরুষ ভ্রুণকে বাড়তে দেয় যে সেখানে নারী-পুরুষের মাত্রা বিপজ্জনক মাত্রায় পৌঁছেছে।... সম্প্রতি এক সমীক্ষায় জানা গেছে, যেখানে দম্পতির প্রথম সন্তান কন্যা সেখানে ৯২ শতাংশ ক্ষেত্রে যেখানে প্রি-নাটাল আল্ট্রাসাউন্ড এর সাহায্যে জানা গেছে পরের সন্তানটি কন্যা হতে চলেছে, সেখানে গর্ভপাতের ঘটনা ঘটেছে। শিশুর লিঙ্গ-নির্বাচন তখনই নৈতিক দিক থেকে অস্বস্তিকর যখন অবাঞ্ছিত কন্যা-সন্তানকে বর্জন করা হয়।" **৫**

লিঙ্গ নির্ধারণকরে কন্যাভ্রূণ হত্যা আটকানোর জন্য 'কন্যাভ্রূণ হত্যা আইন'ও তৈরি হয়। কিন্তু মানুষের মধ্যে যদি সচেতনতা না জাগে, তাহলে শুধু আইন করে কন্যাভ্রূণ হত্যা বন্ধ করা যায় না। কোনো কিছু জোরপূর্বক আটকাতে চাইলে তার পরিণাম আরো মারাত্মক হতে পারে, কন্যাভ্রূণ হত্যার আইনও তার ব্যতিক্রম নয়। কন্যাসন্তানের প্রতি অনীহা পোষণকারী ব্যক্তিগণকে জোরপূর্বক আইন করে কন্যাভ্রুণ হত্যা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করলে তারা গোপনে গর্ভপাত করার চেষ্টা করে। যার ফল হয় আরো বিপজ্জনক। অভিজ্ঞ ডাক্তারগণ আইনের ভয়ে গর্ভপাত করা থেকে বিরত থাকলে গর্ভপাতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ অনভিজ্ঞ হাতুড়ে ডাক্তারের শরণাপন্ন হন। অনভিজ্ঞ হাতুড়ে ডাক্তারদের মধ্যে অনেকেই গর্ভপাত ঘটানোর অভিজ্ঞতা না থাকা সত্বেও তারা অধিক অর্থের বিনিময়ে গর্ভপাত ঘটান। যার ফলস্বরুপ অনেক ক্ষেত্রে গর্ভধারিণী মায়ের জীবন বিপন্ন হতে পারে, এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। তাই শুধু আইন করে নয়, আইনকে সঠিকভাবে বলবৎ করার ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে হয়। কারণ অনেক ক্ষেত্রে আবার আইনের মধ্যেও ফাঁক থেকে যায়, যার সাহায্যে অভিযোগকারী যথাযোগ্য শাস্তি পায় না। এ প্রসঙ্গে বলা যায়,

> "... কন্যাভ্রুণ হত্যা আইন তৈরি হয় ১৯৯৪ সালে। কিন্তু তার রূপায়নে কোনো ব্যবস্থাই নেয়নি কোনো রাজ্য সরকার। সম্প্রতি জনগণনার রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর শিশুকন্যাদের সংখ্যায় আতঙ্কজনক হ্রাস দেখে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করে দুটি বেসরকারি সংস্থা।... কিন্তু আইনের যে মূল উদ্দেশ্য, অপরাধী ডাক্তারদের বিচার, সেই বিষয়ে প্রি-নেটাল সেক্স সিলেকশন অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক টেকনিকস (পি. এন. ডি. টি) অ্যাক্ট, ১৯৯৪ যে কতখানি ঠুটো তা প্রতিবেদনটি থেকেই জানা যায়, সেখানে বলা হয়েছে রেজিস্ট্রেশন ছাড়া

> কেউ আল্ট্রাসাউন্ড যন্ত্র ব্যবহার করলে তার বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ দায়ের করা যায়, কিন্তু যন্ত্রটা বাজেয়াপ্ত করা যায় না। ফলে দুটি ক্ষেত্রে আদালতে মামলা চলার সত্ত্বেও অভিযুক্ত ডাক্তাররা বেআইনি যন্ত্রেই অবাধে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ করে চলেছে।” **৬**

কন্যাভ্রুণ নির্ধারণ করে তাকে হত্যা করার বিষয়টি বর্তমানে প্রকৃতি রাজ্যের ভারসাম্যকে নষ্ট করে দিচ্ছে। পুত্রসন্তানের থেকে কন্যাসন্তানের অনুপাত ক্রমশ কমছে। কন্যাভ্রুণ হত্যা ও কন্যাসন্তানের প্রতি অবহেলা ও অনাদরের জন্য সমাজের কিছু কুপ্রথাকে দায়ি করা হয়। যার অন্যতম নিদর্শন হল পণপ্রথা। কন্যাসন্তানের পিতামাতাকে কন্যার বিবাহের সময় পণের যে ভয়াবহতার সম্মুখীন হতে হয়, তার ফল হিসাবে কন্যাভ্রূণের প্রতি পিতা-মাতার অনীহা প্রকাশ পায়। শুধুমাত্র বিবাহের সময়ই নয়, বিবাহের পরবর্তীতেও এই কুপ্রথার প্রভাবে চলে কন্যার প্রতি নির্যাতন। অনেক সময় পণের দাবি মেটাতে না পারার জন্য সেই কন্যার শেষ পরিণতি হয় হত্যা অথবা আত্মহত্যা। এই হত্যা অথবা আত্মহত্যার ভয়াবহ প্রভাব কন্যাটির পিতামাতা ও পরিবারকে সারা জীবন বয়ে বেড়াতে হয়। এই সমস্যার সমাধানের পথ হিসাবে অনেক পিতামাতাই কন্যাভ্রূণ হত্যার পথ বেছে নেয়। যার ফলস্বরূপ সমাজে নারীর অনুপাত ক্রমশ কমছে এবং লিঙ্গ ভিত্তিক অসাম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। অমর্ত্য সেনের ‘নিখোঁজ নারী’র গবেষণার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে লিঙ্গ-নির্ধারণ করে কন্যাভ্রূণ হত্যার মধ্যে। প্রাসঙ্গিকভাবে বলা যায়,

> “একুশ শতকে এই নিখোঁজ নারীর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে ‘কন্যাভ্রূণ হত্যা’র মধ্যে। আল্টাসনোগ্রাফ পরীক্ষা করে সন্তানসম্ভাবা নারীর ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ এবং ‘মেয়ে’ চিহ্নিত হলে তা নষ্ট (অ্যাবর্শন) করার ঘটনা ভারতে আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে গেছে বলে তথ্য মিলছে। ‘মেয়ে জন্মই পাপ’ - এই সামাজিক ধ্যানধারণা নারীর বিপন্নতা বাড়িয়ে দিচ্ছে ভ্রুণ হত্যার মাধ্যমে।” **৭**

কন্যাভ্রুণ হত্যাকে রুখতে শুধু মাত্র আইন প্রণয়ন করলেই হবে না, সেই আইনকে বাস্তবে বলবৎ করার জন্য প্রয়োজন সচেতনতা এবং মানসিকতার। মানুষের মধ্যে সচেতনতা অভাববোধ থেকেই কন্যাভ্রূণ হত্যার বিষয়টি সমাজে প্রসার লাভ করে। কেবলমাত্র সচেতন মানুষই উপলব্ধি করতে পারবে যে, সমাজের সুস্থ স্বাভাবিকভাবে অগ্রগতির জন্য নারী ও পুরুষের ভারসাম্য রক্ষা করা কতটা আবশ্যক। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সৃষ্টির ধারাবাহিকতাকে বজায় রাখার জন্য নারী ও পুরুষের অনুপাতের সামঞ্জস্য থাকা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু এই বাস্তব সত্য সম্পর্কে সচেতনতার অভাবের জন্য কন্যাভ্রূণ হত্যার সুদূরপ্রসারী ফল অনুধাবন করতে অক্ষম সমাজের একাংশ। তারা কেবল পুরুষের প্রভাব-প্রতিপত্তি বজায় রাখার জন্য অথবা কন্যাদায়গ্রস্ত পিতামাতা কন্যাসম্প্রদানের সময় পণপ্রথার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অথবা বংশের

উত্তরাধিকার সুনিশ্চিত করার জন্য কন্যাসন্তান জন্ম গ্রহণের পূর্বে তাকে মাতৃগর্ভেই হত্যা করে চলেছে। কন্যাভ্রূণ হত্যা এভাবেই চলতে থাকলে ভবিষ্যৎ সমাজের পুরুষ তার প্রভাব প্রতিপত্তি জাহির করার জন্যও তার বিপরীত লিঙ্গের অর্থাৎ নারীর অস্তিত্বও থাকবে না, আবার বংশের উত্তরাধিকারীর জন্মের জন্য মাতৃগর্ভেরও অভাব দেখা দেবে। এই প্রকৃত সত্যকে উপলব্ধির জন্য আবশ্যক সচেতনতা। সচেতনতা সাথে সাথে আরো একটি বিষয় একান্ত আবশ্যক, তা হল মানসিকতা। লিঙ্গবৈষম্যের সমর্থনকারী মানসিকতার পরিবর্তন খুবই প্রয়োজন। আমরা বর্তমান সমাজকে সভ্য এবং আধুনিক সমাজ বলে দাবি করি, কিন্তু আমাদের মানসিকতা এখনও সেই আদিম বর্বর যুগে পরে আছে। ভ্রূণ হত্যা মানুষের বর্বর মানসিকতারই নিদর্শন। এই বর্বর মানসিক ধ্যানধারণা সমকালের সচেতন ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপন্থি। সচেতন ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি নারী ও পুরুষের লিঙ্গ বৈষম্যকে সমর্থন করে না। এই সমস্যা প্রসঙ্গে বলা যায়,

> “সমস্যার মূল কারণ, মানুষের মানসিক গড়ন ও সেজন্য চাই তার বদল - একথা আমরা শুনে থাকি হামেশাই। এই পরিভাষার আদত অর্থটা কী? অভিধানের ভাষায়, মানসিক গড়ন বলতে বোঝায় ‘প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি কারও আস্থা, অটুট বিশ্বাস।’ দৃষ্টান্ত হিসেবে অভিধান উল্লেখ করেছে ‘মনে হয় অঞ্চলটি মধ্যযুগের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আটকে।’ কন্যা না পুত্র - এভাবে লিঙ্গ-নির্ধারণ প্রথা সম্পর্কে ধারণা ও তার বিরোধিতা করার প্রসঙ্গে, আমার মনে হয় এই সংজ্ঞা এবং উদাহরণ খুব ভালোভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।” **৮**

কন্যাভ্রূণ হত্যা নামক সমস্যার কারণ হিসাবে বরবর মানসিকতার সাথে সাথে অর্থ-সামাজিক পরিবেশের কথাও উল্লেখ করা যায়। পরিবারগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক মন্দাভাব শিশু জন্মদানের প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে। কন্যাসন্তানের জন্মের সিদ্ধান্তের প্রসঙ্গে তাঁর পরিবারের মাথায় সেই কন্যার লালন-পালন, বিবাহ, পণ সকল বিষয়ের চিন্তা থাকে। তাই অনেক সময়ই আর্থিক টানাপোড়নের পরিবারগুলি কন্যাসন্তানের জন্মকে বোঝা মনে করে। অপরদিকে, পুত্রসন্তানের ক্ষেত্রে, পণ দেওয়ার কোনো সমস্যাও থাকে না এবং তাকে লালন-পালন করে বড় করে তোলার পর সেই পুত্রসন্তান রোজগার করে বৃদ্ধ বয়সে তার পিতামাতা ও পরিবারের ভরণপোষণ চালাবে - এমন ধারণা কাজ করে। এই ভরণপোষণ চালানোর জন্য পুত্রসন্তান যে কাজের সুযোগ পায়, কন্যাসন্তানদের তেমন সুযোগ দেওয়া হয় না। কাজের সুযোগের অভাবের জন্য জনসংখ্যার সামঞ্জস্যবিধান একান্ত আবশ্যক। অত্যাধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য কাজের বাজারেও মন্দা দেখা যায়, যার প্রভাব সবথেকে বেশি পরে মেয়েদের ওপর। বর্তমান সমাজে কর্মক্ষেত্রে মহিলা অনুপ্রবেশ ঘটলেও তা পুরুষদের থেকে কম। তাছাড়া রোজগারী কন্যাসন্তানের সুফল ভোগ সাধারনত তার স্বামীর পরিবারই করে থাকে। তাই কন্যাসন্তানের আর্থিক দিক থেকে অস্বচ্ছল পিতামাতা ও তার পরিবারের কাছে

জন্মের পূর্বে লিঙ্গ নির্ধারণ ও কন্যাভ্রূণ হত্যার আশঙ্কা থেকেই যায়। প্রসঙ্গক্রমে বলা যুক্তিযুক্ত হবে যে,

> "অর্থনীতির ব্যাপক বাড়বাড়ন্ত এবং ভোলবদল সত্বেও, নির্মম সত্যিটা হল, এই বিকাশ হয়েছে খুব অসম এবং একটু বেশি বয়সীদের জন্য যথেষ্ট নতুন কাজের সুযোগ করে দেওয়া যায়নি। এর মধ্যে, সবচেয়ে বেশি ভুগতে হয়েছে মেয়েদের। কিছুটা সচ্ছল (হতদরিদ্র নয়) পরিবার তাদের আর্থিক হাল ফেরানোর চেষ্টা করছে সন্তান সংখ্যা কম রেখে। তারা, এক আধটা ছেলেপুলে হলে, তাদের জন্য বিনিয়োগ করতে পারে। এধরনের পরিবারের ভ্রূণের লিঙ্গ বাছাই-এর চল সবচেয়ে বেশি হবার আশঙ্কা।" **৯**

আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে কন্যাসন্তানের অবমূল্যায়নকারী দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য সরকারিভাবে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। কন্যাভ্রুণ হত্যা রোধ করে যাতে পরিবারগুলির কন্যাসন্তান জন্ম দেয়, স্কুলে যেতে দেয়, প্রাপ্তবয়স্ক না হলে যাতে বিয়ে না দেয় - প্রভৃতির জন্য বেশকিছু সরকারি প্রকল্প চালু হয়েছে। প্রত্যেক প্রকল্পেই কন্যাসন্তানের অবমূল্যায়ন রুখতে তার পরিবারকে টাকা দেয়ার প্রবণতা দেখা যায়। অর্থাৎ কন্যাসন্তান জন্মালে দেওয়া হবে টাকা, তার পড়াশোনার জন্য দেয়া হবে টাকা, আঠারো বছর পর্যন্ত বিয়ে না দিলে দেয়া হবে টাকা। এই প্রকল্পগুলি সাময়িকভাবে কার্যকরী হলেও তার সুফল দীর্ঘমেয়াদী হতে পারে না। কারণ জোর করে, শর্ত সাপেক্ষ, টাকা দিয়ে কন্যাসন্তানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করানো সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে বলা যায়,

> "নাম থেকেই বোঝা যায়,... প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে কন্যার জন্মের জন্য পরিবারকে উৎসাহ যোগাতে।... এসব প্রকল্পের ধ্যানধারণার পিছনে আছে অনাকাঙ্ক্ষিত কন্যার 'বোঝা ' টাকায় পুষিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা। এসব প্রকল্প অবশ্য শর্তে বোঝাই। ফলে প্রকল্পগুলির কাজকর্ম হোঁচট খাচ্ছে।" **১০**

কন্যাভ্রূণ হত্যা রুখতে শর্ত সাপেক্ষ প্রকল্প দিয়ে, আইনের মাধ্যমে জোড়পূর্বক পদক্ষেপগুলি ততক্ষণ কার্যকরী হবে না, যতক্ষণ না মানসিকতার পরিবর্তন ঘটবে। সমীক্ষায় দেখা গেছে, যে সকল অঞ্চলে সচেতনতা বেশি, মহিলারা আর্থিকভাবে আত্মনির্ভর, সেই সকল এলাকায় কন্যাভ্রূণ হত্যার ঘটনা অনেক কম। সচেতনতাই সফলতা দান করে। আর জোড় করে আইন বলবৎ করতে গেলে ভালো থেকে মন্দই বেশি হয়। যার দৃষ্টান্ত স্বরূপ সবিতা হলপ্পনবার মৃত্যুর কথা বলা যেতে পারে। পেশায় দন্ত চিকিৎসক ছিলেন সবিতা হলপ্পনবা। ২০১২ সালে সেপটিসিমিয়া রোগে আক্রান্ত হন, যখন তিনি অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। জোড়পূর্বক আইন বলবৎ করতে গিয়ে ডাক্তাররা তার গর্ভপাত করতে রাজি হননি। যার পরিণতি স্বরূপ মাত্র ৩১ বছর বয়সে তার মৃত্যু হয়। অর্থাৎ সেখানেও একজন কন্যাসন্তানকেই হারাতে হয় আমাদের।

> “গণভোটে গর্ভপাতের পক্ষে প্রচারের ‘মুখ’ সবিতাই। ফোনে বাবা বলেন, ‘হাসপাতালের শয্যায় শুয়ে মিনতি করেছিল চিকিৎসকদের। নিজে ডাক্তার ছিল তো। বুঝেছিল গর্ভপাত না করলে মৃত্যু অনিবার্য। কেউ কথা শুনল না। একবিংশ শতাব্দীতেও কী অদ্ভুত নিয়ম।” **১১**

তাই শুধু জোড় করে আইন প্রণয়ন নয়, সচেতন মানসিকতার মাধ্যমে প্রকৃত আইন বলবৎ হবে। আইন তো অন্ত:সারহীনন, মানসিকতার পরিবর্তনের মাধ্যমেই তার মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হতে পারে, তার থেকে সুফল পাওয়া যেতে পারে। আর তার জন্য পুত্র ও কন্যা সন্তানের মধ্যে ভেদাভেদ দূর করতে হবে। সচেতন মানসিকতায় এই ভেদাভেদ দূর করে সমাজের অগ্রগতি ঘটাতে পারে।

তথ্যসূত্র :

১. কঙ্কর সিংহ, মনুসংহিতা এবং নারী, রেডিক্যাল, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৪০
২. সুকুমারী ভট্টাচার্য, প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৮২
৩. কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, নারী দহন, স্ট্যান্ডার্ড বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ৮
৪. তদেব., পৃ. ৯-১০
৫. ড. সন্তোষ কুমার পাল, ফলিত নীতিশাস্ত্র, লেভান্ত বুকস, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৭৬
৬. শ্রী খগেন্দ্রনাথ ভৌমিক, পুরুষশাসিত সমাজে নারী মুক্তি, সঞ্চলন প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ২৯
৭. মালেকা বেগম, বিপন্ন নারী : সতীদাহ থেকে কন্যাভ্রূণ হত্যা, পুলক চন্দ (সম্পা.), নারীবিশ্ব, গাঙচিল, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ৮৫
৮. মেরি ই জন, কন্যাসন্তানের প্রতিকূল অনুপাত, সমাজের মানসিকতা ও সরকারি নীতি, সুজিত সেন (সম্পা.), নারী মুক্তি : নানা দিক, লাকী পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ৪০৯
৯. তদেব., পৃ. ৪১০
১০. তদেব., পৃ. ৪১১

গ্রন্থপঞ্জী :

১. ড. সন্তোষ কুমার পাল, ফলিত নীতিশাস্ত্র, লেভান্ত বুকস, কলকাতা, ২০১২
২. কঙ্কর সিংহ, মনুসংহিতা এবং নারী, রেডিক্যাল, কলকাতা, ২০১০
৩. কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, নারী দহন, স্ট্যান্ডার্ড বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০১৬

৪. পুলক চন্দ (সম্পা.), নারীবিশ্ব, গাঙচিল, কলকাতা, ২০০৮
৫. সুকুমারী ভট্টাচার্য, প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১০
৬. সুজিত সেন (সম্পা.), নারী মুক্তি : নানা দিক, লাকী পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৪
৭. শ্রী খগেন্দ্রনাথ ভৌমিক, পুরুষশাসিত সমাজে নারী মুক্তি, সঞ্চলন প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৮

জ্যোতির্ময়ীদেবীর নারীভাবনা ও 'মর্ত্যের অপ্সরা'

রেণুকা অধিকারী
সহকারী অধ্যাপক
বারাসাত সরকারি মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় জোতির্ময়ী দেবী একটি বিশিষ্ট নাম। জোতির্ময়ী দেবীর সাহিত্য চর্চা নিছকই অবসর চর্চা ছিল না, তিনি তার দীর্ঘ জীবনবৃত্তে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন আর তার প্রকাশ ঘটেছে তাঁর সাহিত্যে। বাঙালি পারিবারিক গল্পগুলি লেখিকার গভীর অভিজ্ঞতার ফসল। একক বা একান্নবর্তী পরিবার এবং তার সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক, বংশগৌরব ও আভিজাত্যবোধ, বাঙালি জীবনের প্রথা সংস্কার ও বিশ্বাস, সমাজজীবন ও ব্যক্তিজীবনের ঘাত-প্রতিঘাত, পরিবার ও সমাজে নারীর স্থান প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়কে অবলম্বন করে উৎসারিত হয়েছে তাঁর ছোটগল্পের প্রবাহ। তিনি বাংলা এবং বাংলার বাইরের সমাজে খুঁজেছেন মেয়েদের অবস্থানের বাস্তব ছবি, যেখানে যত নিপীড়িত প্রবঞ্চিত ভাগ্যতাড়ি অবহেলিত নারী– সেখানে প্রসারিত করে দিয়েছেন তাঁর সমানুভবের এষণা।তাঁর মাথার মধ্যে নানা উত্তরবিহীন প্রশ্ন, মনে হতে থাকে-"মেয়েদের দাম শুধু তাকে একজন মানুষের দরকারের ? সমস্ত সম্পর্ক অতিক্রম করে মানুষ হিসেবে তার মূল্য নেই? দরকার নেই ? পৃথিবীর কোনোখানে চিরদিনের ইতিহাসে একদিনও সে মানুষ হিসেবে পরিচিত হল না কেন? [১] এইসব প্রশ্ন আর তার উত্তর সন্ধান করতে করতে একদিন কলম হাতে তুলে নিলেন আর জীবনভর সেই কলমই রয়েগেল তাঁর অবলম্বন। যুগ যুগ ধরে সমাজ-সংসারে নারীদের যেভাবে অত্যাচার আর অবিচারের শিকার হতে হয়-সেই অবিচারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন লেখনির মধ্যদিয়ে। তাই কি বাঙালী সমাজ কি রাজস্থানের রাজপুতনা সমাজ সর্বত্রই তাঁর শানিত ও অন্তর্ভেদী দৃষ্টি লক্ষ্য করেছে পুরুষশাসিত সমাজে মেয়েদের অবহেলিত, উপেক্ষিত অবস্থানটি।আরাবল্লীর আড়ালে রাজস্থানের সুন্দরীদের অপরূপ মুখশ্রীর গভীরে লুকানো ক্লান্ত, বিষন্ন, অসহায় মুখ যেমন ধরা পড়েছে তাঁর বহু ছোটগল্পে,কিংবা 'মর্ত্যেরঅপ্সরা' গল্পে তুলে ধরেছেন বারাঙ্গনাদের যাপিত জীবনের ছবি। কত অবহেলিত এদের জীবন, মৃত্যুর পর এদের দেহকে অচ্ছ্যুৎ বলে মনে করে সমাজ অথচ একদা এই শরীর ছিল আদৃত। 'পিঁজরাপোল' গল্পে কাশীর পথে পথে অসহায় সহায় সম্বলহীন বিধবাদের সারি। এরা সংসারের অপ্রয়োজনীয় বস্তুর মতো পরিত্যক্ত।'আন্নাকালী' গল্পে গায়ের রঙ কালো হওয়ায় আন্নাকালীর অবহেলিত জীবন, শেষ পর্যন্ত পুত্র সন্তানের বোঝা হয়ে না থেকে শিক্ষিত চাকুরিজীবী মেয়ের সঙ্গে কাশীবাস। এভাবে মেয়েদের যন্ত্রনার অন্তঃপুরের নানা দিক প্রকাশিত হয়েছে জ্যোতির্ময়ী দেবীর ছোটগল্পে। লেখিকার দৃষ্টি দিয়ে আমরা যেন

আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কের সরলতা-জটিলতা গুলিকে নতুন আলোয় আবিষ্কার করি। বুজতে শিখি যে এর আপাত দৃষ্ট দৃশ্যের আড়ালে সমাজে নারীদের প্রকৃত অবস্থানের বাস্তব ছবি। সমগ্র ছোটগল্প নয়, তিনটি গল্পে নারীরাপরিবারওসমাজেরআবেষ্টনীরমধ্যেনিত্যদিনকিভাবেবেঁচেআছেতা অন্বেষণই আমার আলোচ্য প্রবন্ধের বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছি।

সূচক শব্দ: সংসারে আন্নাকালীর অবস্থান, কাশীধামে বিধবা নারীদের অসহায়তা, প্রথা ও সংস্কার, পতিতা নারীদেরজীবনযন্ত্রণা।

প্রতিপাদ্য বিষয়: জ্যোতির্ময়ী দেবী বাঙালি হলেও পারিবারিক সূত্রে রাজস্থানের জয়পুরের মেয়ে।সেই সময়ের নিয়ম মতো পরিবারে রক্ষণশীলতা এবং পর্দা প্রথার প্রচলন ছিল। তবে পিতামহ ও পিতা ছিলেন প্রগতিশীল এবং শিক্ষানুরাগী প্রকৃতির মানুষ। সেইজন্য জ্যোতির্ময়ীপরিবারের প্রয়োজনে গড়ে তোলা গ্রন্থাগারে পড়াশুনা করা সুযোগ লাভ করেন। কিন্তু সামাজিক নিয়মানুসারে মাত্র দশ বছর বয়সে তার বিয়ে হয়ে যায় হুগলি জেলার কিরণ চন্দ্র সেনের সঙ্গে। দাম্পত্য জীবন স্থায়ী হয়নি, মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে বিধবা হয়ে ফিরে আসেন পিত্রালয়ে। এই অবস্থায় তিনি ভেঙে পড়েন নি বলা ভালো পারিবারিক আবেষ্টনী তাকে ভেঙে পড়তে দেয় নি। সমস্ত বাধা কাটিয়ে নতুন উদ্যমে পড়াশুনায় মনোনিবেশ করেন।প্রবেশকরেনলেখালেখিরজগতে।এরপর তাঁর লেখনি আর থেমে থাকে নি, রচনা করেছেন অজস্র ছোটগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ এবং কবিতা, সমৃদ্ধ করে তুলেছেন বাংলা সাহিত্যের ভান্ডার।'মর্ত্যের অপ্সরা' সম্পর্কে লেখিকা নিজেই জানিয়েছেন, "মর্ত্যের অপ্সরা" লেখাটি 'আলেখ্য' পত্রিকাতে কিছুকাল পূর্বে প্রকাশিত হয়। অপর দুটি অংশ "আন্নাকালী" "পিঁজরাপোল" অনেক আগের লেখা। এইগুলি 'উত্তরা' এবং 'মেয়েদের কথা' পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছিল।বিষয়গুলি পরস্পর সংলগ্ন ও পরিপূরক।এজন্য একসঙ্গে পুস্তকআকারে সন্নিবিষ্ট করা হল। 'আন্নাকালী' 'পিঁজরাপোল', 'মর্ত্যের অপ্সরা' তিনটি গল্পেসংসার ও সমাজ ব্যবস্থায় মেয়েদের স্থান, এবং তার স্বরূপ উদ্ঘাটন লেখিকার এই তিনটি গল্পের প্রতিপাদ্য বিষয়। সমাজের দিকে দৃষ্টি ফেরালে দেখাযায় সমাজ ও সংসার নারীকে তাঁর প্রয়োজনবাদের খাপে খাপে ভরে নিজের ব্যবহার উপযোগী করে নিয়েছে। সামাজিক অনুশাসন গুলি চাপিয়া দেওয়া হয়েছে মেয়েদের উপর এতে নারীর ব্যক্তিসত্তা ও সৃজনশীল মানসিকতা প্রকাশের পথ রুদ্ধ হয়েছে। নারীর হয়ে উঠেছে একান্তভাবে পুরুষের উপর নির্ভরশীল। প্রাচীনকালে নারীদের কাজ ছিল সন্তানের জন্ম দেওয়া, লালন-পালন করা এবং পতির সেবা করা। নারী এটাকেই তাদের ভাগ্য বলে মেনে নিয়েছিল। রান্নার পর খাওয়া, খাওয়ার পর রান্না সংসারের জাঁতাকলে পিষ্ট অথচ সমাজে নিজের মতো করে বেঁচে থাকার নিজস্ব অধিকারটুকু তাদের নেই। 'দৈব' প্রবন্ধে এই কথাই জ্যোতির্ময়ী দেবী বলেছেন প্রাঞ্জলভাবে, "মানুষ হিসেবে আমরা ব্যবহার

পাইনা। পাই আশ্রিত হিসেবে; যেটা শ্রদ্ধার পথে আসে না, আসে দয়ার পথে।”[২]সংসার এবং সমাজ নারীদের তার প্রাপ্য সম্মানটুকুও দিতে চায় না। শুধুমাত্র প্রয়োজনে ব্যবহার করে প্রয়োজন শেষ হলে দূরে সরিয়ে দিতেও দ্বিধাবোধ করে না। যারা একদিন সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করে এসেছে তারাই শেষ পর্যন্ত করুণার, অবজ্ঞার পাত্রী হয়ে যায়। অবাঞ্ছিত বস্তুর মতো ছুড়ে ফেলে দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। নারীরাও শেষ পর্যন্ত জীবনের এই পরিণতিকে তাদের জীবনের পরম সত্য বলে মেনে নেন। নিষ্ঠুর সমাজ নারীদের ভোগ্যপণ্যের মতো ব্যবহার করে কিন্তু ঘরে রাখে না। সময় হলে আবর্জনার মতো দূরে ফেলে দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। ‘আন্নাকালী’ ‘পিঁজরাপোল’, ‘মর্ত্যের অপ্সরা’ এই তিনটি গল্পে সংসার ও সমাজে মেয়েদের এই প্রকৃত অবস্থান এবং তার স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে লেখিকার অসাধারণ অভিজ্ঞতা ও নিপুণতায়।

‘আন্নাকালী’ গল্পটির মুখ্য চরিত্র আন্নাকালী। তাকে কেন্দ্র করে গল্পের কাহিনি আবর্তিত। আন্নার মধ্যদিয়ে গল্পে পুরুষ পরম্পরা আর সামাজিক বিধি ব্যবস্থায় নারীর প্রকৃত অবস্থানের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে। আমাদের সমাজে কন্যা সন্তান জন্মানো যেন শোকের বিষয়, তাই তার আবির্ভাব পিতৃগৃহ আনন্দমুখরিত হয় না, বরং কন্যা সন্তানের জন্ম দেওয়ায় গৃহিণীর মুখের ভাবটুকু মিলিয়ে যায়। সমস্ত মুখ কঠিন ও আড়ষ্ট হয়ে উঠে- “আবার খুকী! যেন সহসা অনাগত ভবিষ্যতের দায়-দায়িত্ব, হয়ত ঋণ, হয়ত কন্যাদায়গ্রস্তের কুটুম্বের কাছে অপমান লাঞ্ছনার কাহিনী সব একসঙ্গে তাঁর মনের অবচেতন কোণে ভিড় করে দাঁড়াল।’[৩] লেখিকা আশালতা সিংহের ‘নারীর মূল্য’ গল্পে একই সুর শোনা যায়- “বাঙালী ঘরে ছেলেতে মেয়েতে এতই পার্থক্য। আকাশপাতাল ব্যবধান। ছেলে হইলে সবারই মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিবে, ঘন ঘন শাঁখ বাজিবে। আর মেয়ে যদি দৈবক্রমে জন্মাইল, জননী নিজেকে মনে করিবেন অপরাধী, পরিজনের কাছে তাঁহার মাথা হেঁট হইবে। নবজাতা অতিথিটির জন্য মানব-সংসারে কোথাও কোন অভ্যর্থনা কোন সম্মানের আয়োজন হইবে না।”[৪] আন্নাকালী’ গল্পে পরপর তিন কন্যা সন্তান জন্মানো মায়ের আবার যখন কন্যা সন্তান জন্ম নেয় তখন মায়ের মন বিরূপ হয়ে উঠে। আর একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেওয়ায় মায়ের সংকোচের সীমা থাকে না, অত্যন্ত অভিমানে আর শাঁখটা তুলে রাখতে বলে ঠাকুরঝিকে। কন্যা সন্তান বলে নতুন অতিথিকে অভ্যর্থনার আয়োজন করা হয় না। পুত্রসন্তানের জন্ম না হওয়ায় অবিভাবকেরা ক্ষুব্ধ। অবহেলিত কন্যা সন্তানের নাম রাখা হয় আন্নাকালী। কন্যা সন্তান হওয়ায় শৈশব থেকে নিতান্ত অনাদর আর উপেক্ষায় বেড়ে হয়ে ওঠে আন্না, উপেক্ষিত আন্নার প্রথম হাসি, প্রথম কথা কওয়া, প্রথম পা ফেলা কেউই চেয়ে দেখল না। অথচ সে সুস্থ, নীরোগ, হৃষ্টপুষ্ট দেহে বড় হয়ে উঠতে লাগল। তার গায়ের কালো রঙের জন্য কেউ তাকে মানুষের পর্যায়ে ফেলতে চায় না। এইভাবে অনাদরে দশ বছরে পা দেয় আন্না। সামাজিক নিয়মানুসারে বাবা-মা, আত্মীয়স্বজন সকলের মতে মাত্র দশ বছর বয়সে তার চেয়ে বয়সে অনেক বড় এক পাত্রের সঙ্গে তার বিয়ে দেওয়া হয়। শ্বশুর

বাড়ি ও স্বামীর সম্পর্কে সম্যক ধারণা তখনও তার জন্মে নি। তখন তার পুতুল খেলার বয়স, ঘর-সংসার করার নয়। কিন্তু তার স্বামী এই আটপৌরে আনাড়ি অল্প বয়সি স্ত্রীটিকে আদর করে ভালোবাসা দিয়ে ঘর–সংসার করার উপযোগী তোলার চেষ্টা করতে লাগল অনবরত। স্বামীর সান্নিধ্যে শ্বশুর গৃহে আন্নার কিছুটা পদবৃদ্ধি হল। স্বামী শিবেশ্বর তার নাম পরিবর্তন করে রাখেন-'আমাদের বাড়িতে তোমার নামটা অন্নপূর্ণাই থাক।' স্বামীর বদান্যতায় আন্নাকালী থেকে হয়ে উঠল অন্নপুর্ণা। সন্তানের জন্ম নারীর জীবন সার্থকতা বলে ধরে নেওয়া হয়। আন্নাকালী পর পর তিনটি কন্যা সন্তানের জন্ম দিল। কিন্তু সংসারে নারী নিজে যতদিন না একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেন ততদিন তার গৌরব থাকে না বলে ধরে নেওয়া হয়।একটিও পুত্র সন্তানের জন্ম নাদেওয়ায় রূপগৌরবে ও পুত্রগৌরবে আন্নাকালী নিরূপমার নীচেই রয়ে গেল কারণ নিরুপমার পুত্রসন্তানের জননী। সংসারে নিজের স্থান পাকা করার চেষ্টায় খামতি রাখেনি আন্না তাই তিনটি কন্যা সন্তানের জন্মের পর আন্না একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিল, অমনই সমাজ-সংসারে তার সম্পূর্ণ পদবৃদ্ধি ঘটল, সে যেন নিরুপমার সমকক্ষ হয়ে উঠল। লেখিকা তীর্যক ভাষায় সংসারে আন্নার পদবৃদ্ধির বিষয়টি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন- "আন্নার যেন দ্বিজত্ব লাভ হয়েছে। তিন মেয়ের মা হয়েও যে মাতৃত্ব গৌরব সে লাভ করেনি, একটিমাত্র ছেলে হতেই সেই গৌরব যেন তাঁর সম্মুখে ভবিষ্যতের একটি সোনার দুয়ার আকস্মিকভাবে খুলে দিল। সে স্বর্ণতোরণ যে কোথায়, আন্না তা জানে না। অথচ মাথা যেন তার উঁচু হয়ে গেল।মন পরিপূর্ণ হয়ে গেল। আশা, দুরাশায় আর সীমাবদ্ধ ত্রিভূবন- রান্নাঘর, ভাড়ারঘর শোয়ার ঘর অপরূপ স্বপ্নে ভরে উঠল এবং গোপন গর্বে সে আজ নিরুপমার সঙ্গে সমান আসন পাবার অধিকার পেল।"[৫] পুত্র সন্তানের জননী হওয়ার গৌরব লাভ করেছে আন্না। আজ তার আর কোন দুঃখ নেই।কন্যা সন্তানের কোন স্থান সংসারে নাই, সে কথা এক আত্মীয়ার মুখে শোনা গেল– "কন্যেসন্তান কি কাজে লাগে দিদি ? মিথ্যে মানুষ করা।"[৬] পুত্র সন্তানের জননী হয়ে আন্না একেবারে সগৌরবে গৃহিনীত্বের চূড়ান্ত ধাপে আরোহন করল। অর্থাৎ সেই পুরুষ পরম্পরাকে আন্না প্রতিষ্ঠা করল নিজের সংসারে। আর এই পদমর্যাদা বৃদ্ধি হল শুধু সমাজের চোখেই নয়, আন্নার নিজের চোখেও। এরপর আন্নার সংসারেই আন্নার নিজের স্থান পরিবর্তন দেখা গেল। এখন শিবেশ্বর আন্নার মতামত ও পছন্দের গুরুত্ব দেয় কারণ আন্না তার পুত্র সন্তানের জননী। নানাবিধ খেলনা আসে বংশপ্রদীপ পুত্র প্রদীপ জন্য। কন্যাসন্তানের জন্য না আসে কোন খেলনা বরং বোন ভাইয়ের খেলনা নিয়ে খেলতে চাইলে মা ধমক দিয়ে বলে, ওকে জ্বালাতন করিস না। পুত্রসন্তান যে মানুষের কত আশা আকাঙ্ক্ষার পাত্র তারই বাস্তব চিত্র লেখিকা দেখিয়েছেন এই গল্পে। আন্নার স্বামী শিবেশ্বর মনে মনে মেয়েদের স্নেহ করলেও বাস্তবে তাদের জন্য কিছুই সংস্থান করে রেখে যেতে পারেননি, তার মনেও হয়ত সমস্ত অর্থ সম্পত্তি পুত্রের জন্যই

সংরক্ষিত রাখার গোপন অভিলাষ ছিল। এইভাবে পুরুষ-পরম্পরা নিজেদের অধিকার কায়েম করে চলে আর মায়ের ও মেয়েদের অন্নসংস্থান ছেড়ে রাখা হয় পুরুষের দয়া দাক্ষিণ্যের উপর। মৃত্যুর পূর্বে শিবেশ্বর সমস্ত সম্পত্তি নির্দ্বিধায় লিখে দেয় পুত্র প্রদীপের নামে। পুত্রের পিতার সম্পত্তিতে একচ্ছত্র আধিপত্য বজায় রইল। আর কন্যাদের ভার রইল ভাইয়ের দাক্ষিণ্যের ওপর। অচিরে ভাইয়ের কাছে বোনেরা হয়ে উঠল অবাঞ্ছিত, বাড়তি অর্থব্যয়ের কারণ। প্রদীপের মুখে শোনা যায়- "হ্যাঁ, কিন্তু খরচও তোমাদের বেশ। ধরো না,এই ছোড়দির কলেজের খরচ, বড়দির ছেলের মেয়ের স্কুলের পড়ার,মাস্টারের মাইনের, তারপর এতবড়ো সংসারের খরচ।"[৭] মেয়েদের জন্য এমনকি মায়ের জন্য অর্থকড়ির কোন বন্দোবস্ত নেই। আন্নার মনে হতে লাগল আবার সে অন্নপূর্ণা থেকে আন্নাকালীতে পরিণত হয়েছে। এরআর কোন পরিবর্তন হবে না। আন্নাকালীর এই কথার মধ্যে যে এক করুণ বেদনা লুকিয়ে আছে তা আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না। পিতার সম্পত্তি থেকেবঞ্চিত বোনেরা চলে যায় দূরে, আপন অর্জিত অর্থে অতসী নিজের জীবনের ভার নিজেই গ্রহণ করে, শুধু তাই নয় সে ভার নেয় তার দিদি এবং তার সন্তানদেরও এমনকি মা আন্নাকালীরও। 'বংশপ্রদীপ' পুত্রকে মা-বোনের দায় মুক্ত করতে কাশীবাসিনী হয় আন্নাকালী।এই অন্যায় বঞ্চনার জন্য পুত্রের প্রতি কোনো অভিযোগ বা তিরস্কার শোনা যায় না আন্নাকালীর মুখে বরং যেন নীরব প্রশ্রয়ই আছে। এইভাবে আন্না নিজেই পুরুষ পরম্পরা কে প্রতিষ্ঠা করল সংসারে। অথচ নিজের স্থান হল সংসারের বাইরে। অপরদিকে অতসী নিজের জীবন, মা, দিদি ও তার সন্তানদের দায়িত্ব গ্রহন করার মতো কাজ করেও কোন মূল্য পায় না তার ভাই প্রদীপের কাছে। মা, দিদির অসহায় অবস্থা দেখে শিক্ষিত অতসীর মনে পড়ে-" দীর্ঘদিন আগে শোনা মায়ের জন্ম ও বাল্যকাহিনী মনে পড়ে গেল। সেদিন অত বোঝেনি। আজ মনে হল, শুধু তার মাকে নয়, তাদের সকলকে, সব মেয়েকে ওরা সকলকে ইচ্ছামতো বলছে-' আর না' 'আর চাই না তোমাকে','আর নেই পথ তোমার', 'আর গতি নেই', 'আর তোমাকে দরকার নেই!'..."[৮] সমাজ রচিত বিধিবিধান কিভাবে নারীর জীবনকে নিয়ন্ত্রন করে, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ এই গল্পটি।

হিন্দু বিধবাদের জীবনের অন্তিম আশ্রয় বাবা বিশ্বনাথের চরণ সেই পুণ্যতীর্থ বারাণসীই হল 'পিঁজরাপোল'।পুণ্য অর্জনের আপাত অন্তরালে পরিবারের অবাঞ্ছিত মানুষগুলিকে সংসার থেকে বিদায় করে দেওয়া হয় বারাণসী, কাশী প্রভৃতি তীর্থস্থানে। অসাধারণ পর্যবেক্ষণ শক্তির অধিকারী জ্যোতির্ময়ী দেবীর সমাজের, পরিবারের সেই মূল উদ্দেশ্যটুকু উপলব্ধি করতে দেরি হয়নি। যে নারী সারাজীবন পতি, পুত্রদের সংসারে শ্রম দিয়ে তাদেরই সংসার গড়ে তোলেন, আপনমনের মনের মাধুরী মিশিয়ে গড়ে তোলেন সুখের নীড়, সেই নারীই বৃদ্ধ বয়সে স্বামীর মৃত্যুর পর পরিবার পরিজনের কাছে হয়ে যায় অপাংক্তেয়। শুধু তাই নয় এই বিধবা নারীরা পুত্র এবং ভাইয়ের সংসারে হয়ে যান অবাঞ্ছিত, পরমুখাপেক্ষী। তাদের ভরণপোষণের দায় দায়িত্ব নিতেও

অস্বীকার করে। আমরা জানি রামমোহন রায়ের কর্তৃক সমাজে সহমরণ প্রথা রদ হয়েছিল, কিন্তু তার ফলস্বরূপ সমাজে বিধবাদের সংখ্যা বেড়ে গেল।সমাজে রীতি-নিয়মের বেড়াজালে তাদের আষ্টেপিষ্টে এমনভাবে রাখা হয় তাদের জীবন অতিষ্ট হয়ে ওঠে। বেঁচে থাকার অধিকার লাভ করে হিন্দু বিধবারা, কিন্তু বেঁচে থেকে তিলে তিলে মৃত্যু ঘটে তাদের যা মৃত্যুর নামান্তর। নিকট আত্মীয়-স্বজন বঞ্চনায়, অপমান, অবহেলায় নিত্য তাদের বেঁচে থাকা। 'পিঁজরাপোল' গল্পে সংসারের এই উদ্বৃত্ত মানুষগুলির জীবন যন্ত্রনার কথা লেখিকা ফুটিয়ে তুলেছেন তীব্র শ্লেষাত্মক ভাষায়-" হিম অবাক হয়ে এই নারী জনস্রোত দেখে। শুধু তাঁর মনে হয় মানুষের কি বিপুল অপচয়। সহসা এই অপচয়ের একেবারে গোড়ার কথা তাঁর মনে হল-একান্ত দেহগত দরকারের ওপর অস্তিত্বের ওপর এই আদর্শের ভিত্তি। যাকে বহু বাক্যে অলংকৃত করে- সুন্দর করে বহু মহিমায় ভূষিত করে চিরদিন বলা হয়। ধনী, দরিদ্র, ইতর, ভদ্র, সভ্য, অসভ্য, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, সব মেয়েরই এই চিরন্তন এক পথ-এক প্রয়োজন আর অপ্রয়োজন। হয়ত সব দেশেই। তার মনে হয় যেন আশে পাশে সামনে পিছনে সাদা য়ুনিফরম পরা মৃত প্রাণীর সারি চলেছে। সমাজের প্রচ্ছন্ন অভিমত পরিস্ফুট করে তাদের বাঁচবার অধিকার নেই, দাবি নেই।"[৯]পরিবার-পরিজন দ্বারা নির্বাসিত এই নারীসমাজ কাশীতে এসে বিশ্বনাথের চরণে আশ্রয় লাভ করে। প্রতি মাসে পুত্র অথবা পরিজনদের কাছ থেকে সামান্য টাকা মাসোহারা আসে তাই দিয়ে তাদের জীবন চলে, কারুর আবার তাও নেই বাধ্য হয়ে লোকের বাড়িতে রাঁধুনীবৃত্তি করে, কেউ ভিক্ষা করে দিন অতিবাহিত করে। লেখিকা সংসারে তাদের স্থান ও উপার্জনের বাস্তব পন্থা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন আমাদের সামনে-"বিরাজ ব্রাক্ষ্মণের মেয়ে। অল্প বয়সে বিধবা হয়েছিল, দেশেই ছিল। শেষে স্বজনের মন যোগানোর ভার আর কাজের চাপ এবং কথার কাঁটা তাকে একদিন অতিষ্ট করে দিলে। ফলে সেখানে অন্নের মুষ্টিভিক্ষাটুকু আর আশ্রয়ের ছাতের তলাটুকু তার গেল। আপনারজনেরা বললেন,' বিয়ের সঙ্গে সম্পর্ক নেই কূলোপানা চক্র', এমন আপনারজনকে তাদের দরকার নেই। .... এখন বিরাজ কোন বড়লোকের বাড়ি রাঁধে। সন্ধ্যার পর রাত্রিতে যখন ছাড়া পায় ওপরে এসে একটু মহাভারত-রামায়ণ পড়ে অথবা শোনে। সুন্দর আকৃতি, বড় ঘরের মেয়ের রূপ রাঁধুনি ঝিয়ের ছেঁড়া কাপড়ের আড়ালেও চাপা পড়ে না।"[১০] স্বদেশ এবং স্বজন পরিত্যাগী এই নারীরা কাশীতে এসে পরস্পর পরস্পরের আত্মীয়ে পরিণত হয়। সম্পর্ক তৈরি করে সুখ-দুঃখে একে অপরেরপাশেথাকে। বিপদে একে অপরকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। এই সহায় সম্বলহীন নারীদের দীনতা, হীনতা এবং আচারসর্বস্বতার ছবি এঁকেছেন লেখিকা এই গল্পের পাতায় পাতায়। সমাজ যাদের দূরে ঠেলে দিয়েছে, সেই সমাজেরই ভয়ে সদা ত্রস্ত আতঙ্কিত থাকে এরা, সারাদিন ধরে সমাজের মূঢ় প্রথা মেনে চলে। অতসীর চোখের সামনে ভাসে সেই দৃশ্য, এরা সবাই সমাজের নিয়মনিষ্ঠা বজ্রের মতো পালন

করে, এইসব পুণ্যার্থীনিরা পূণ্য অর্জনের জন্য সন্ধ্যে হলে দল বেঁধে একান্নপীঠের কথকতা, পুরাণপাঠ এবং মনসামঙ্গল কাব্য পাঠ শুনতে বেরিয়ে পরে। এইতো তাদের দৈনন্দিন জীবনের রোজনামচা। অতসীর কাকা সুরেশ্বর তাদের স্বরূপ উপলব্ধি করেছেনএইভাবে-"যাদেরবাইরের দৈন্যের সীমা নেই, দারিদ্র্যের শেষ নেই, অন্তরেও সমস্ত অভাব, অভিযোগ, ক্ষমা দয়া মূঢ় মূক হয়ে গেছে। এই তীর্থ ও পুণ্য তাদের আত্মাকে জানার উপায় নয়, আত্ম-উপলব্ধির পথ নয়। এ শুধু অজানা এক পরলোকের ভয়, পুণ্যলাভের কামনা, তারপর তাদের এইখানেই শেষ।"[১১] এইসব নারীর প্রাণের সজীবতা হারিয়ে যাওয়ার পিছনে রক্ষনশীল সমাজ ব্যবস্থাকে দায়ী করেছেন লেখিকা। সমাজ নিজের মতো করে নিয়ম তৈরি করেছে যাতে নারীরা নিজেদের দৈন্যদশা ও বঞ্চনার কথা বুজতে না পারে। নিজেদের দৈন্যকে, বঞ্চনাকে ভাগ্য বা অদৃষ্ট নাম দিয়ে সান্ত্বনা লাভের চেষ্টা করে। পুরুষশাসিত সমাজ আবহমানকাল ধরে নারীকে করেছে অপমান এবং অবজ্ঞা। অতসীর মনে হয় –"যে ভাই অন্ন দাতা সে বয়সে ছোট হলেও তার অপমান করার, অন্যায় করবার, লাঞ্ছনা করবার অধিকার আছে। বিচার তো করবেই। অভিভাবকত্বের দায় ও দায়িত্ব তার।"[১২] অতসী শিক্ষিত কাশীতে একটি স্কুলে চাকুরী করে সে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী এটা তার ভাই প্রদীপ মেনে নিতে পারে না, অভিভাবকের মতো শাসন করে। তাকে অপমান করে, এমনকি পুত্র স্নেহে অন্ধ মাও সেই অপমান প্রাপ্য বলে ধরে নেয়, এমনকি কাশীতে সীতেশের মতো ভালো ছেলের সঙ্গে মেলামেশা, ভালো বন্ধুত্বকে প্রদীপ মেনে নিতে পারে না। 'আমার লেখার গোড়ার কথা' প্রবন্ধে লেখিকা বলেছেন,- "মেয়েদের জীবনের সবটাই বিপর্যয় ও সংঘাতের মধ্যে চলা। পুরুষের চলাফেরার বিধি-নিষেধ নেই। বন্ধু নির্বাচনেও বিধি-নিষেধ নেই। যেখানে যে গুণীর বা মনোমতো সঙ্গীর সন্ধান পাবেন সেখানেই যেতে পারেন। কিন্তু মেয়েরা সঙ্গী ও সঙ্গহীন জাত।"[১৩] রক্ষণশীল সমাজ ব্যবস্থার নিয়ম কানুন নারীদের অক্ষম নারী করে রাখতা বাধ্য করে। অতসী সেই সমাজের রীতিনিয়মের থেকে বেরিয়ে বাইরের জগতে পা রেখেছে। অতসী তার তীর্যক বাক্যবান ছুঁড়ে দিয়েছে সমাজের কর্তা পুরুষ সমাজের দিকে–"ওরা স্বাধীন জীবিকা অর্জনকারিণী এখানকার মেয়েদের ঘৃণা করে, আগের দিনের নিঃসহায় নির্জীব ভীরু অন্নবস্ত্রের দায়ে একান্ত নির্ভর করা মেয়েদেরও অবজ্ঞা করে। এরা এখনও আধুনিক কালের নারী সম্পর্কে রক্ষণশীল নিষ্ঠুর মনোভাবশালী পুরুষ। এরা সেকালের মতোও দায়িত্ব নেয় না, একালের মতোও দায়িত্ব নেয় না।"[১৪] পুরুষশাসিত সমাজ এইভাবে যুগ যুগ ধরে নারীকে তাদের কুক্ষিগত করে রাখতে চায় পুরুষ সমাজ। তাই প্রদীপের অন্যায় অবিচার এর প্রতিবাদ করতে পারে না অতসী। এই সব দেখে অতসীর ভাবনায় নিজের স্বাবলম্বী হতে পারার জন্য আনন্দ নয়, হতাশা বোধ জাগে। অতসীর মনে হয় মেয়েরা পুরুষের সম্পত্তি, নিজের মতো করে স্নেহ করে, সোহাগ করে, সাজায়, যত্ন করে।বিবাহিত জীবনের সমস্ত দায়-দায়িত্ব পালন করে। তারপর একসময় দায়মুক্ত হয়ে আশ্রয় নেয় কাশীধামে। অতসীর চোখের

সামনে ভেসে আসে অসংখ্য মেয়ের কথা, যাদের উপায়হীনতা বা প্রয়োজন এই পথ অবলম্বন করিয়েছে, তাঁরা হয়তো বহু দায়িত্ব বহন করেছে।নিজের পায়ে নিজে দাঁড়ানোই যেখানে পুরুষের সম্মান, ওঁরা সেখানে কৃপা ও অবজ্ঞার পাত্রী। লেখিকা অতসীর মধ্যদিয়ে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় মেয়েদের প্রকৃত অবস্থানের বাস্তব ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

‘মর্ত্যের অপ্সরা’ গল্পে সমাজে ‘বারবধূ’ বলে ঘৃণিত মেয়েদের জীবনের বেদনার ইতিহাস উন্মোচন করেছেন লেখিকা। এদের পরিচয় সম্পর্কে গল্প থেকে জানতে পারি, কেউ বা কেনা মেয়ে, কেউ কুড়িয়ে পাওয়া, কিংবা হারিয়ে যাওয়া ছোট্ট মেয়ে, এইরকম সব।প্রথম জীবনে প্রবঞ্চনা, প্রতারণায় মুগ্ধ, প্রলোভনে মোহের বশে আকৃষ্ট হয়ে গৃহজীবনের চৌকাঠের বাইরে পা ফেলেছিল অথবা সাময়িক ভ্রান্তিবশত বা কোন পুরুষের প্ররোচনায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল। একসময় তারা নিজের ভুল উপলব্ধি করে কিন্তু ততক্ষণে তারা এসে পৌঁছায় পতিতা নিবাসে। তখন তাদের সমাজে বা পরিবারে ফেরার পথ বন্ধ হয়ে যায়। গল্পে দেখি এরকম একটি মেয়ের কথা –“ নিচের আর একটা মেয়ে। বয়স ১২/১৩। কে তাকে এখানে এনেছে, এনে ঢুকিয়ে দিয়েছে এই বাড়িতে। তার একটা মাসি না দিদি। নাম ও গ্রাম সম্পর্কে ওরকম মাসি-দিদিদের ঐসব কাজের সময় অভাব হয় না।”[১৫] এই বাড়িতে একবার প্রবেশ করলে ইচ্ছে করলে বেরোবার পথে নেই। পালাবার উপায় নেই। একদিন যারা সমাজেরই একজন ছিল, এই ভুলের ফলে তারা সমাজের বাইরে পতিতা বা পরিত্যক্তা বলে অভিহিত। মাসী এই ফুলের মতো মেয়েটির এই ক্লেদাক্ত জীবনে প্রবেশ করুক চায় নি। কিন্ত এই মেয়েটি এই জায়গায় এসে পড়েছে, সমাজ ও সংসার পুনরায় কিছুতেই আর তাদের গ্রহণ করে না। ফলে বাধ্য হয়ে রয়ে যায়। ক্রমশ এই জীবিকার প্রতি মোহ জন্মে আর সুস্থ সমাজে ফিরে যেতে চায় না। লেখিকার ভাষায় –“ওদের পিছনে স্বজনহীন অন্ধকার জগৎ। কোন পরিচয় নেই। ছিল কি ? ছিল কি বাবা- মা, পরিজন, স্বামী, ভাইবোন, সন্তান, যা জগতের অন্য নারীদের আছে ? দেহ-সম্পর্ক যা দেহাতীত এক জগৎ। .... কাকে বলে অতীত, কাকে ভবিষ্যৎ বলে, ঐ সব ‘বর্ণপরিচয়’ পড়া, হয়ত প্রায় নিরক্ষর, মেয়েদের জানা নেই। ভাববার ক্ষমতা নেই। তাদের পিছনে সামনে শুধু অর্থে জন্য এই জীবিকা। দেহজীবিকা।”[১৬] সমাজের চোখে এরা পতিত। অথচ আশ্চর্য এই যে পুরুষ সমাজ একই অপরাধে লিপ্ত, সে কিন্তু সমাজের চোখে ‘পতিত’ হয় না। একই অপরাধে অপরাধী দুটি মানুষের প্রতি সমাজের কি বিষম বিচার ! লেখিকা দেখিয়েছেন সমাজের ভিতরে আছে জীবিকা অর্জনের দুটি পথ একদিকে আলোকিত দিনে সামাজিক নরনারীর জ্ঞান ধর্ম কর্ম শ্রমময় চিরাচরিত জীবন ও জীবিকা, অন্যদিকে অন্ধকার রাত্রিতে নানা রকম আলোয় আলোকিত জ্ঞান-বিদ্যা-ধর্ম-কর্মহীন অনাদিকাল থেকে আচরিত আরেক জীবিকা-মূঢ় জৈব জীবিকা। যার কোন

অতীত নেই, ভবিষ্যৎ নেই। এই আত্মীয়-পরিজন শূন্য নিঃসঙ্গ মানুষগুলি সমাজের কাছে অশুচি কিন্তু বেঁচে থাকার মোহ, দেহ ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ এদের চাই। তাদের সেই প্রয়োজনকে কাজে লাগায় কিছু ভোগ বিলাসী পুরুষের দল। তাদের লালসাকে চরিতার্থ করে এদের দেহ। তবে পরিস্থিতির কারণে এই গ্লানিময় জীবন গ্রহণ করতে হলেও এই জীবনকে এরা ঘৃণা করে।চপলার মুখে শোনা যায়-" আচ্ছা মাসি, আমরা কি আর কোন কাজকর্ম করতে পারি না ? ওইসব লোকজনের সঙ্গে বসা-টসা ছাড়া ?"[১৭] সমাজের আর দশজন নারীর মত সন্তান-সন্ততি সহ আনন্দ পূর্ণ দাম্পত্যজীবন কামনা করে। কিন্তু পুরুষনির্মিত সমাজ নিজের সুবিধার্থে এক বিশেষ গন্ডিতে আবদ্ধ করে রাখে। অন্ধকারময় গ্লানিময় এই নারকীয় জীবনই হয় তাদের নিয়তি। কিন্তু কাহিনী মোড় আসে সহকর্মী চাঁপার আকস্মিক মৃত্যুতে। সমাজ বুঝিয়ে দেয় তাদের প্রকৃত অবস্থান। মৃত চাঁপাকে দাহ করা জন্য পায় না কোন সহৃদয় ব্যাক্তির সাহায্য অথচ এরাই এতদিন চাঁপার শরীর ভোগ করে এসেছেন। আজ চাঁপা তাদের কাছে অচ্ছুৎ, দেহজীবিনী ছাড়া আর কিছু নয়। এমন একজন ভোগবিলাসী পুরুষের কণ্ঠে শোনা যায়- "তোমাদের শরীর ঘাড়ে করে নিয়ে যাব আমরা ? কি ভেবেছ তোমরা ? নোংরা মেয়েমানুষ ! পয়সা দিয়ে তোমাদের ঘরে বসি আমরা। অমনি বসি না।"[১৮] এর চাইতে কদর্য ভাষা আর কি হতে পারে। এই পুরুষ সমাজের আচরণে তারা হতভম্ব হয়ে যায়। নিজেরাই তাদের সহকর্মীকে নিয়ে যায় শ্মশানভূমিতে।এই দমবন্ধ করা পরিবেশ, কদর্য জীবনযাপন থেকে তারা বেরিয়ে আসতে চায়, শুধু তাই নয় এই জীবন ত্যাগ করে ভিন্নতর জীবিকায় গিয়ে এই নিত্য গ্লানিময় অভিজ্ঞতা ঝেড়ে ফেলতে চায়–" মাসী আমরা কোনো চাকরী, কাজকর্ম, অন্যরকমের কিছু করতে পারি না কেন এই রকমের থাকা ছাড়া ?"[১৯]নানা কাজ করার কথা ভাবছিল, যাতে সৎ পথে উপার্জন করতে পারে। সেই প্রসঙ্গে ফুলকুমারীর মুখে শোনা যায় থিয়েটারে কাজ করে অর্থ উপার্জন করার কথা, 'ঠাকুর রামকেষ্ট নাকি বিনোদিনীকে আশীর্বাদ করেছিলেন।' আমরা জানি এই বিনোদিনী থিয়েটার করতেন। সমাজের চোখে নিন্দনীয় হলেও রামকৃষ্ণ তার অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকে আশীর্বাদ করেছিলেন। লেখিকাও হয়তো মনে প্রাণে চেয়েছেন এই পঙ্কিল জীবন থেকে তাদের একটি সুস্থ স্বাভাবিক পরিবেশে নিয়ে যেতে যেখানে তারা প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নিতে পারবে। অতীতের সব কিছু পিছনে ফেলে তারা মাসীর সঙ্গে তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ে, ফুলকুমারীর মতো তিনজন মেয়ে, আর সুখোর মা, তার মেয়ে। তারা হার চুড়ি বালা বিক্রি করে, বাঁধা দিয়ে, ধার করে, সবাই সরমা, স্বর্ণদের সহযাত্রিনী হয়েছে। এমন তীর্থযাত্রার সুযোগ ছাড়েনি তারা। অবশেষে তারা আশ্রয় লাভ করে কাশীধামে। তারা সাধু সঙ্গ লাভ করে সেখানে সরমার গুরু ভাইয়ের মুখে শুনতে পাই–" আপনাদের বিবেকানন্দজী ঐ কজন গুরুভাইকে নিয়ে কতবড় মিশন গড়ে তুললেন দেখতে পান ? পৃথিবীভরা রামকৃষ্ণ মিশনের জ্ঞানী ধার্মিক সেবাব্রতী সাধু ব্রহ্মচারীতে।"[২০] সিদ্ধ মহারাজের প্রেরণায় ভালো কাজের সন্ধান পায়–"নিয়ে এসো, যা

পারে কাজ করুক। ভালো পথে থাকবার পথ দেখিয়ে দেওয়াটাই তোমাদের জীবনের কাজ হোক। ব্রত হোক। যা হয়ে গেছে তা নিয়ে কথা আর ভাবনা ছেড়ে নতুন করে একটা আশ্রয়-আশ্রম গড়ে তোলো। যাতে নতুন কাজের আদর্শ গড়ে ওঠে একটা ।.... অতীতের পাঁক থেকে যে করে হোক তাকে টেনে তোলো, পড়ুক, কাজ করুক। ধর্ম-কর্ম সেবা কাজ করুক।”[২০] আসলে আশাবাদী লেখিকা জ্যোতির্ময়ী রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের আদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে পতিতা নারীদের পঙ্কিল, গ্লানিময় জীবন থেকে সত্য ও ধর্মের মার্গ নির্দেশ করতে চেয়েছেন এই গল্পে।

'মর্ত্যের অপ্সরা' গল্পগ্রন্থের তিনটি গল্পেই লেখিকা সমাজের তিনটি স্তরের যেমন 'আন্নাকালী' গল্পের আন্নাকালী, 'পিঁজরাপোল' গল্পে পরিবার থেকে বহিষ্কৃত কাশীধামে আশ্রিত বিধবারা, 'মর্ত্যের অপ্সরা' গল্পে বারাঙ্গনা নারীদের প্রকৃত অবস্থানের এক নিখুঁত বাস্তব ছবি অত্যন্ত সহানুভূতি এবং মানবিক দৃষ্টিতে আমাদের সম্মুখে উন্মোচিত করেছেন। গল্প তিনটির মুল সুর এক বিন্দুতে এসে মিশিছে তা হল সত্য ও ধর্মের পথ। সংসার-সমাজ যাদের দূরে ঠেলে দেয়, তারা শেষ পর্যন্ত বেছে নেয় এই পথ।

তথ্যসূত্র:

১. জ্যোতির্ময়ী দেবী, বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ', রচনা-সংকলন ১, দে'জ পাবলিশিং, ১৯১১, পৃষ্ঠা-৬৯

২. জ্যোতির্ময়ী দেবী, 'দৈব' প্রবন্ধ, রচনা-সংকলন-৫, সম্পাদনা-গৌরকিশোর ঘোষ দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৪, পৃ-১১০

৩। জ্যোতির্ময়ী দেবী,'আন্নাকালী, রচনা-সংকলন ৩। সম্পাদনা-গৌরকিশোর ঘোষ, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৪, পৃ-৮৭

৪. আশালতা সিংহ,'নারীর মূল্য', গল্প-সংকলন -২, সম্পাদনা-অভিজিৎ সেন, অনিন্দিতা ভাদুড়ী, দে'জ পাবলিশিং,পৃ.-২৬২

৫. জ্যোতির্ময়ী দেবী, 'আন্নাকালী',রচনা-সংকলন-৩, সম্পাদনা-গৌরকিশোর ঘোষ, দে'জ পাবলিশিং,১৯৯৪,পৃ-৯৬

৬. জ্যোতির্ময়ী দেবী, আন্নাকালী', রচনা-সংকলন-৩, সম্পাদনা-গৌরকিশোর ঘোষ,দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৪,পৃ-৯৭

৭. জ্যোতির্ময়ী দেবী, 'আন্নাকালী', রচনা-সংকলন-৩,সম্পাদনা-গৌরকিশোর ঘোষ, দে'জ পাবলিশিং,১৯৯৪, পৃ-১১২

৮. জ্যোতির্ময়ী দেবী,'আন্নাকালী', রচনা-সংকলন-৩, সম্পাদনা-গৌরকিশোর ঘোষ,দে'জ পাবলিশিং,১৯৯৪, পৃ-১১৬

৯. জ্যোতির্ময়ী দেবী,'পিঁজরাপোল', রচনা-সংকলন-৩, সম্পাদনাগৌরকিশোর ঘোষ, দে'জ পাবলিশিং,১৯৯৪, পৃ- ১২৬

১০. জ্যোতির্ময়ী দেবী,'পিঁজরাপোল,রচনা-সংকলন-৩, সম্পাদনা-গৌরকিশোর ঘোষ, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৪,পৃ- ১১৯
১১. জ্যোতির্ময়ী দেবী,'পিঁজরাপোল',রচনা-সংকলন-৩,সম্পাদনা–গৌরকিশোর ঘোষ,দে'জ পাবলিশিং১৯৯৪, পৃ- ১৪৬
১২. জ্যোতির্ময়ী দেবী,'পিঁজরাপোল',রচনা-সংকলন-৩, সম্পাদনা–গৌরকিশোর ঘোষ,দে'জ পাবলিশিং,১৯৯৪, পৃ- ১৫২
১৩. জ্যোতির্ময়ী দেবী,'আমার লেখার গোড়ার কথা',রচনা-সংকলন-৪,সম্পাদনা – গৌরকিশোর ঘোষ, দে'জ পাবলিশিং,১৯৯৪,পৃ.১২১
১৪. জ্যোতির্ময়ী দেবী,'পিঁজরাপোল',রচনা-সংকলন-৩,-সম্পাদনা –গৌরকিশোর ঘোষ, দে'জ পাবলিশিং,১৯৯৪, পৃ- ১৫৩
১৫. জ্যোতির্ময়ী দেবী,'মর্ত্যের অপ্সরা',রচনা-সংকলন-৩, সম্পাদনা –গৌরকিশোর ঘোষ,দে'জ পাবলিশিং,১৯৯৪, পৃ- ১৭১
১৬. জ্যোতির্ময়ী দেবী,'মর্ত্যের অপ্সরা', রচনা-সংকলন-৩, সম্পাদনা –গৌরকিশোর ঘোষ, দে'জ পাবলিশিং,১৯৯৪,পৃ- ১৬১
১৭. জ্যোতির্ময়ী দেবী,মর্ত্যের অপ্সরা',রচনা-সংকলন-৩, সম্পাদনা –গৌরকিশোর ঘোষ, দে'জ পাবলিশিং,১৯৯৪,পৃ- ১৬৬
১৮. জ্যোতির্ময়ী দেবী,মর্ত্যের অপ্সরা', রচনা-সংকলন-৩, সম্পাদনা –গৌরকিশোর ঘোষ, দে'জ পাবলিশিং,১৯৯৪,পৃ- ১৬৮
১৯. জ্যোতির্ময়ী দেবী,'মর্ত্যের অপ্সরা',রচনা-সংকলন-৩,সম্পাদনা –গৌরকিশোর ঘোষ, দে'জ পাবলিশিং,১৯৯৪, পৃ- ১৬৭
২০. জ্যোতির্ময়ী দেবী,মর্ত্যের অপ্সরা',রচনা-সংকলন-৩, সম্পাদনা –গৌরকিশোর ঘোষ, দে'জ পাবলিশিং,১৯৯৪, পৃ-১৮৯
২১. জ্যোতির্ময়ী দেবী,মর্ত্যের অপ্সরা',রচনা-সংকলন-৩, সম্পাদনা –গৌরকিশোর ঘোষ,' দে'জ পাবলিশিং,১৯৯৪,পৃ-১৯০

গ্রন্থপঞ্জি:

১. উমা মাজি মুখোপাধ্যায়,'বাংলা সাহিত্যে মহিলা কথাকার', দে'জ পাবলিকেশন, ২০১২
২. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য,'কুড়ি একুশ শতকের নারী ঔপন্যাসিক', আশাদীপ, ২০১৪
৩. ড দেবেশ কুমার আচার্য্য,বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, ২০১৯
৪. জয়ন্তী সাহা রায়,'ব্যতিক্রমী সাহিত্যপ্রতিভাআশালতা সিংহ', যোধন প্রকাশনী, ২০১৩

টিনের তলোয়ার: গতানুগতিকতার প্রতি বিদ্রোহের একটি হাতিয়ার

ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য্য
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কান্দরা রাধাকান্ত কুণ্ডু মহাবিদ্যালয়

সংক্ষিপ্তসার: বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে ১৮৭৬-এর নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন এবং ১৯০৮-এর কর্পোরেশন অ্যাক্ট নাটক রচনা এবং থিয়েটারে সেই নাটক অভিনয়ের প্রভূত ক্ষতিসাধন করেছিল। এর সঙ্গে এসে জুটেছিল বেনিয়াবৃত্তি, যা নাটকের যে মূল উদ্দেশ্য, লোকশিক্ষা ও জাতীয়তাবোধের সঞ্চার—তা হতে দেয়নি। উৎপল দত্তের 'টিনের তলোয়ার' এরকম গতানুগতিক নাটক রচনা ও তার অভিনয় নিয়ে বিদ্রোহ করেছে। এখানে বীরকৃষ্ণের মতো থিয়েটার ব্যবসায়ীদের হাতে পড়ে থিয়েটারের কীরূপ দৈন্যদশা হয় তা আলোচনা করা হয়েছে। বেণিমাধবের মতো যোগ্য নাট্যশিক্ষকেরা নবজাগরণ ও জাতীয়তাবোধের রাস্তা থেকে সরে গিয়ে থিয়েটারকে ভুল পথে চালিত করে। শুরুর দিকে পৌরাণিক ও নিছক কল্পনাভিত্তিক নাটক—যার সঙ্গে বাস্তবের চূড়ান্ত অমিল, সেরকম নাটক নিয়ে মাতামাতি এবং শেষে বেণিমাধবের মধ্যে জাতীয়তাবোধ এবং দেশাত্মবোধের অভ্যুত্থান ঘটায় দেশপ্রেমমূলক নাটকের অভিনয় কীভাবে গতানুগতিকভাবে চলে আসা নাট্যধারাকে পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিল তারই আলোচনা করা হয়েছে।

সূচক শব্দ: 'টিনের তলোয়ার' নাটকের পটভূমি, উৎপল দত্তের প্রতিবাদী চেতনা, অলীক নাটক নিয়ে মাতামাতি এবং দেশাত্মবোধের জাগরণে নাট্য জগতের মোড় পরিবর্তন।

মূল আলোচনা:

বাঙালির নাট্যচর্চার ইতিহাসে সবচেয়ে কলঙ্ককালিমালিপ্ত ও অভিশপ্ত বছর হল ১৮৭৬ সাল। কারণ, এই বছরই ব্রিটিশ রাজশক্তি কর্তৃক বাংলা নাট্যচর্চার গলা টিপে ধরা হল। ১৮৭৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর তদানীন্তন ইংরেজ সরকার চালু করে Dramatic performances Act. কিন্তু এর সূত্রপাত ঘটে ১৮৭২ সালে। দুটি ঘটনা-যা ব্রিটিশ সরকারের রাতের ঘুম কেড়ে নেবার জোগাড় করে। একটি হল-বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রকাশ, যা হয়ে উঠেছিল তৎকালীন মননশীল বাঙালির চিন্তা প্রকাশের একটি অবাধ স্থান ; এবং দ্বিতীয়টি হল বাঙালির প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় ন্যাশনাল থিয়েটয়ারের প্রতিষ্ঠা, যেখানে বাঙালির দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবোধের জাগরণ ঘটানোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল। ১৮৭২ সালের ৭ ডিসেম্বর ন্যাশনাল থিয়েটারের দ্বারোদ্‌ঘাটন হল দীনবন্ধু মিত্রের লেখা 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের মাধ্যমে। তবে ১৮৬১ জুলাই মাসের মামলার ফলে 'নীলদর্পণ'-এর আপত্তিকর অংশগুলি বাদ দিয়েই অভিনয়

হয়েছিল। তাই এ নিয়ে তখনো ব্রিটিশ মহলে শোরগোল শুরু হয়নি। শুরু হল ১৮৭৫ সালে দক্ষিণারঞ্জন চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক লিখিত 'চা-কর-দর্পণ' নাটকটি প্রকাশিত হবার পর। কারণ, এই নাটকে অভিজাত ব্রিটিশ চা-ব্যবসায়ীদের নগ্ন রূপটিকে উন্মোচিত করা হয়েছে। এ নাটক অভিনীত হলে তো সরকারের ভাবমূর্তিও বজায় থাকে না, আবার চা-কর সাহেবরাও যাবে ক্ষেপে। তাই ব্রিটিশ সরকার নড়েচড়ে বসল। সেইসঙ্গে ঘটল আরো একটি ঘটনা, যা ১৮৭৬ এর Dramatic Performances Act বিধিবদ্ধ হবার রাস্তাকে এক হাত প্রসারিত করেছিল। ১৮৭৫ এর ১৩ ডিসেম্বর কোলকাতায় এলেন প্রিন্স অফ ওয়েলস (মহারানী ভিক্টোরিয়ার পুত্র)। ১৮৭৬ সালে জানুয়ারি মাসে কোলকাতা হাইকোর্টের উকিল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রিন্সকে নিমন্ত্রণ করে নিজের বাড়ি নিয়ে এলেন। তাই শুধু নয়, তার বাড়ির মহিলারা এমনকি জগদানন্দ বাবুর স্ত্রী শঙ্খবাদন ও হুলুধ্বনির দ্বারা প্রিন্সকে বরণ করে নিলেন। যে ঘটনায় সমস্ত কোলকাতায় ছি ছি রব উঠে গেল। কারণ, তখনো হিন্দু নারীরা বাইরের কোনো পুরুষকে নিজের মুখ দেখাতে পেত না, ইংরেজ সাহেব তো নৈব চ নৈব চ। এই ঘটনা নিয়ে উপেন্দ্রনাথ দাস বেনামে নাটক লিখলেন। নাম দিলেন 'গজদানন্দ যুবরাজ'। ১৮৭৬ সালে ১৯ ফেব্রুয়ারি শনিবার গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে 'সরোজিনী' নাটকের পরে অভিনয় হয়ে গেল এই নাটকটি। এর পর অভিনীত হল 'The Police of Pig and Sheep' নামের একটি প্রহসন এবং এর সঙ্গে দেখানো হল উপেন্দ্রনাথ দাস-এর 'সুরেন্দ্রবিনোদিনী' নাটকটি।

উপরোক্ত এইসব ঘটনাগুলি ব্রিটিশ সরকারকে বাধ্য করেছিল নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়নে। কারণ, তা না হলে জনরোষ সঞ্চিত হচ্ছিল ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে। ঔপনিবেশিক শাসন বজায় রাখতে তাই বাংলা নাটকের গলা টিপে ধরা হল। ব্যাহত হল বাঙালির অবাধ নাট্যচর্চা। কারণ, তখন কোন নাটক অভিনয়ের জন্য ছাড়পত্র পাবে, নাটকের কোন অঙ্ক, কোন গর্ভাঙ্ক, কোন দৃশ্য বর্জন করতে হবে তা ঠিক করে দিত পুলিশ। মূলত পুলিশই হয়ে উঠল সে সময়ের বাংলা নাটকের হর্তা-কর্তা-বিধাতা। তাই আমাদের আলোচিত 'টিনের তলোয়ার' নাটকে উৎপল দত্ত *লিখেছেন-"১৮৭৬ সনই সাম্রাজ্যবাদের নিজ মুখে মসীলেপনের কুখ্যাত বৎসর। এ বৎসর বাংলা নাট্যশালার টিনের তলোয়ার দেখিয়া ভীত সন্ত্রস্ত ব্রিটিশ সরকার অর্ডিন্যান্স জারি করিয়া নাট্যনিয়ন্ত্রনের নামে নাট্যশালার কন্ঠরোধ করিবার ব্যবস্থা করে।।"*

তবে এ প্রসঙ্গে আরো একটি আইনের সম্পর্কে একটু আলোচনা করে নেওয়া প্রয়োজন। তা না হলে আলোচনা সম্পূর্ণ হয় না। কারণ, "নাট্যশালার কন্ঠরোধ" করতে সেই আইনটিরও যথেষ্ট ভূমিকা আছে। ১৯০৮ সালে ১৫ সেপ্টেম্বর কোলকাতায় চালু হল 'কর্পোরেশন অ্যাক্ট'(Corporation Act, 1908). Dramatic Performances Act 1876 যদি বাংলা নাট্যরচনার সর্বনাশ করে তবে Corporation Act 1908 রঙ্গমঞ্চের বিপুল ক্ষতিসাধন করল। এই আইনে বলা হল যে, রাত্রি একটার পর আর

অভিনয় চালানো যাবে না, চালালে পঁচিশ টাকা জরিমানা দিতে হবে। সে সময়ে কোলকাতার রঙ্গমঞ্চ গুলি দর্শকের সুবিধার জন্য সাড়ে আটটার দিকে অভিনয় শুরু করত এবং ভোররাত্রি পর্যন্ত অভিনয় চালাত যাতে দর্শকের বাড়ি ফিরতে সুবিধা হয়। কারণ ভোর না হলে গাড়ি ঘোড়া চলে না। তাই সে সময়ে রঙ্গালয়ে প্রধানত বড় বড় বই নামানো হত বা একাধিক নাটকের অভিনয় হত। কিন্তু এই আইনের ফলে দর্শকের রাত্রি একটার পরে বাড়ি ফেরা একপ্রকার অসম্ভভ হয়ে পড়ল। তাই ভয়ে মানুষ নাটক দেখতে আসা কমিয়ে দিল। যার ফলে এই সব সাধারণ রঙ্গালয়গুলি প্রভূত ক্ষতির মুখ দেখতে শুরু করল। তবে, অমরেন্দ্রনাথ দত্তের মত অনেকেই পঁচিশ টাকা জরিমানা দিয়েও সারা রাত্রি অভিনয় চালিয়ে যেতে লাগল। তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকার নানা উপায়ে বাংলা নাট্যাভিনয়ের জগৎকে ছিন্নভিন্ন করে দেবার চেষ্টা চালিয়েছিল। Corporation Act 1908 , ১৯০৫ এর বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে খর্ব করার উদ্দেশ্যেই প্রণয়ন করা হয়েছিল। এইভাবে দেখতে পাই ব্রিটিশ বিরোধী কোনো আন্দোলনই হোক বা দেশবাসীর মধ্যে জাতীয়তাবাদের বিপুল সঞ্চারই হোক—যখনই কিছু প্রবল হয়ে উঠেছে তখনই সৃষ্টি হয়েছে নতুন আইন। কিন্তু বলাই বাহুল্য যে, কোনো কিছুই আন্দোলনের জেরে ধোপে টেকেনি। জয়ী হয়েছে থিয়েটারের টিনের তলোয়ার। পরাজিত হয়েছে রাজশক্তির গোলাবারুদ, জয়ী হয়েছে বাঙালি আর তার নবজাগরণ। নবজাগরণের আলোতেই মুছে গেছে ইতিহাসের সকল কালিমালিপ্ত অধ্যায়। শুরু হয়েছে এক বিস্তৃত জয়যাত্রা। এই জয়যাত্রার গল্পই আছে উৎপল দত্তের 'টিনের তলোয়ার' নাটকে।

উৎপল দত্তের 'টিনের তলোয়ার' নাটকের সময়কাল ও স্থাননির্দেশ প্রসঙ্গে নাট্যকার লিখেছেন- *"এ নাটকের স্থান ১৮৭৬-এর মোকাম কলিকাতা-চীৎপুর, বৌবাজার এবং শোভাবাজারস্থ নাট্যশালা।।"* অর্থাৎ ১৮৭৬-এর সেই কুখ্যাত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই আলোচ্য নাটকটি লিখিত। প্রতিবাদী চেতনা এবং গতানুগতিকতার প্রতি বিদ্রোহের আগুনেই লিখিত হয়েছে এই নাটক। দীনবন্ধু মিত্র, উপেন্দ্রনাথ দাস-এর মতো নাট্যকারেরা যে ধারার সূত্রপাত করেছিলেন সেই ধারা ব্রিটিশ রাজশক্তির রক্তচক্ষুতে ফল্গু ধারার মতো বয়ে চলেছিল। এর কারণ, সেই সময়ে থিয়েটারের স্বত্ব চলে গিয়েছিল প্রতাপচাঁদ জহুরী, গুর্মুখ রায়-এর মতো কিছু ব্যবসায়ীর হাতে। যাঁরা থিয়েটার নিয়ে শুরু করলেন ব্যবসা। ব্যবসায়িক লাভ পাবার জন্য তাঁরা এমন কিছু করলেন না যাতে ব্রিটিশ সরকার ক্ষুব্ধ হয় বা মুনাফা কমে আসে। তাই শুরু হল পৌরাণিক নাট্য চর্চা। 'সতী কি কলঙ্কিনী', 'অশ্রুমতী', 'রাবণবধ', 'সাবিত্রী সত্যবান', 'অভিমন্যুবধ'- ইত্যাদির মত নাটক যার সঙ্গে সমসাময়িক সমাজবাস্তবতার কোনো যোগ নেই এবং যার দ্বারা মনোরঞ্জন ব্যতীত আর কোনো লাভই হয় না। উৎপল দত্তের ঠিক এ জায়গাতেই আপত্তি। তিনি নাটককে নিছক মনোরঞ্জনের মাধ্যম বা ব্যবসায়িক

মুনাফালাভের মাধ্যম হিসেবে সীমাবদ্ধ রাখতে চাননি। চেয়েছিলেন ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি পরিত্যাগ করে থিয়েটার হয়ে উঠুক লোকশিক্ষার মাধ্যম। তাই তিনি নাটকের শুরুতেই লিখেছেন- *“বাংলা সাধারণ রংগালয়ের শতবার্ষিকীতে প্রণাম করি সেই আশ্চর্য মানুষগুলিকে—যাঁহারা কুষ্ঠগ্রস্ত সমাজের কোনো নিয়ম মানেন নাই; সমাজও যাঁহাদের দিয়াছিল অপমান ও লাঞ্ছনা।। যাঁহারা মুৎসুদ্দিদের পৃষ্ঠপোষকতায় থাকিয়াও ধনীর মুখোস টানিয়া খুলিয়া দিতে ছাড়েন নাই।। যাঁহারা পশুশক্তির ব্যাদিত মুখগহ্বরের সম্মুখে টিনের তলোয়ার নাড়িয়া পরাধীন জাতির হৃদয়বেদনাকে দিয়াছিলেন বিদ্রোহ মূর্তি।। যাঁহারা বহু পত্র পত্রিকা, বহু বাচস্পতি শিরোমণি, বহু রাজা মহারাজার শত পদাঘাতে জর্জরিত, যাঁহারা অপাংক্তেয় ছোটোলোকের আশীর্বাদধন্য, যাঁহারা ভালোবাসার বিশাল আলিংগন উন্মুক্ত করিয়া জনগণের গভীরে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। যাঁহারা সৃষ্টিছাড়া, বেপরোয়া, বাঁধনহারা।। যাঁহারা মাতাল, উদ্দাম, সৃষ্টির নেশায় উন্মাদ।। যাঁহাদের উল্লসিত প্রতিভায় সৃষ্টি হইল বাঙালির নাট্যশালা, জাতির দর্পণ, বিদ্রোহের মুখপাত্র।। যাঁহারা আমাদের শৈলেন্দ্র-সদৃশ পূর্বসূরী।।”* তাই বলা যায় ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য নিয়ে যাঁরা নাটক লিখেছে তাঁরা নয়—যাঁরা জনগনের হিতসাধনে, দেশের হিতসাধনে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছেন হাতে টিনের তলোয়ার নিয়ে তাঁরাই হলেন উৎপল দত্তের পূর্বসূরী।

মার্কসীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণিত উৎপল দত্ত সমাজের নীচু তলার মানুষদের চিরকাল যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই ভূমিকাতেও তিনি বলেছেন যে, ধনীদের নয় ছোটোলোকের, অপাংক্তেয়র আশীর্বাদে যাঁরা ধন্য তাঁরাই হলেন তাঁর অনুপ্রেরণা। ‘টিনের তলোয়ার’ নাটকের শুরুতে তাই মথুর নামে এক মেথরকে পাচ্ছি যে কিনা ‘কলকাতার তলায়’ থাকে। যে জানাচ্ছে যে, সে থিয়েটার দেখে না। কারণ সে থিয়েটারের কিছু বোঝে না। সেখানে যা দেখানো হয় তা ঠিক তাদের মতো নয়। তার ভাষায়—*“কেন দেখব? বেল পাকলে কাকের কি? বাবুরা রোওয়াবি করবেন, বাজারের কসবি নিয়ে হলাহলি গলাগলি করবেন, আর এমন সব ভাষা বলবেন যা আমরা বুঝিনা। তার চেয়ে বাইজীর খ্যামটা ভালো। আমাদের বস্তীর রামলীলা ভাল।”* আসলে সে থাকে কোলকাতার নীচু স্তরে, সমাজের নীচু শ্রেণির প্রতিনিধি। আর ‘বাংলার গ্যারিক’ মর্যাদাসম্পন্ন বেণিমাধব চাটুয্যের মতো লোকেরা হল ব্যবসায়িক থিয়েটারওয়ালার মুৎসুদ্দিদের প্রতিনিধি। সে বীরকৃষ্ণ দাঁ-এর মতো ব্যবসায়ীদের “মাথায় কাঁঠাল ভেঙে” থিয়েটার চালায়। তাই তাকে করতে হয় ‘ময়ূরবাহন’—এর মতো পালা। যে পালায় আছে কেবল দাঁতভাঙা কিছু শব্দের ঝনঝনানি আর আপাদমস্তক অবাস্তবতা। তাই মথুরকে বলতে *শুনি—“এতো নেকাপড়া করে টিনের তলোয়ার বেঁধে ছেলেমানুষী করো কেন?... যা আছো তাই সাজো না!”* কিন্তু বেণিমাধবের মতো মানুষের তাতে লজ্জা হয়। সেই জন্য সাধারণ মানুষের থিয়েটারের প্রতি জন্মে গিয়েছিল প্রবল অনীহা। থিয়েটার মানে তাদের কাছে কিছু অবোধ্য শব্দরাশি, বাজারের বেশ্যা নিয়ে নাচানাচি। তাই মথুরকে বলতে শুনি—*“...তাই চকচকে পোষাক পরে চৌগোঁপ্পা*

দাড়ি এঁটে রবক সবক কিছু কবিতা বলে ধাপ্পা মারো। কই যুবরাজ ছেড়ে আমাকে লিয়ে লাটক ফাঁদতে পারবে? হেঁঃ চাটুজ্যে বামুনের জাত যাবে তাতে।" সত্যিই তো বেণিমাধবেরা এদের নিয়ে নাটক ফাঁদতে পারবে না। কারণ, এতে তাদের ওপর রাজরোষ এসে পড়বে, জেলের ভাত খেতে হবে সবাইকে। সাধারণ মানুষের সুখ, দুঃখ, অভাব, অভিযোগ—এসব নিয়ে নাটক লেখা মানে ব্যবসায়ক ক্ষতি--কম টিকিট বিক্রি। তাই প্রিয়নাথ মল্লিকের 'পলাশীর যুদ্ধ'-এর মতো নাটক, যা নবজাগরণের আলোয় আলোকিত এবং যেখানে রবার্ট ক্লাইভের মুখোশ খুলে দেওয়া হয়েছে, সেই নাটক পড়ে থাকে আস্তাকুঁড়েতে। আর অভিনীত হয় কাশ্মীরের যুবরাজকে নিয়ে লেখা 'ময়ূরবাহন' নাটক। তাই প্রিয়নাথ বলেছে—"আমি বহুদিন যাবৎ লক্ষ্য করেছি আপনাদের কদর্য জীবনবোধ বর্জিত নাটকের মিথ্যা আড়ম্বর। বাইরে পুরাতন সমাজ বিধ্বস্ত হচ্ছে আর নাট্যশালায় আপনারা কাশ্মীরের যুবরাজের মূর্খ প্রেমের অলীক স্বর্গ রচনা করে চলেছেন।" কিন্তু বেণিমাধবের পক্ষে মঞ্চে "ব্রিটিশ দস্যু জালিয়াৎ ক্লাইভের মুখোস উন্মোচন" করা সম্ভব নয়। কারণ, তাতে হাতকড়া পড়ার সম্ভাবনা প্রবল। কিন্তু প্রিয়নাথের মতো নব্যযুবকেরা সে ভয় করে না। নাটক তাদের কাছে সাধনার সমান এবং নাট্যশালা হল মন্দির। সেখানে মদ খেয়ে টলতে টলতে ওঠা যায় না। তাই নবজাগরণের নেশায় উন্মত্ত প্রিয়নাথকে বলতে শুনি—"ভেবেছিলাম আপনাদের রিফরমেশনের আলোয় টেনে আনবো। ভেবেছিলাম ভারতের স্বাধীনতা মন্ত্রে দীক্ষা দেব এবং আমিই পারবো।" কিন্তু পাল্টা বেনিমাধব আবার প্রিয়নাথের মত নব্যবঙ্গীয় যুবকদের প্রতিনিধিদের মুখোশ উন্মোচন করে বলেছেন—"রিফরমেশনের আলোক দেখাচ্ছে। মাথায় ট্যাশেল দেওয়া টুপি, পাইনাপেলের চাপকান, পেটি, সিল্কের রুমাল, গলায় চুলের গার্ডচেন, বাপের বিরাট ব্যবসা, মাসির বাড়ি অন্ন লুসেন, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি শোন, আর সেনেদের বাড়ি বসবার আড্ডা এদের হাড়ে হাড়ে চিনি। পকেট ভর্তি টাকা, অথচ গরীবের জন্য প্রাণ কাঁদে। ব্রাহ্মসভায় গিয়ে মদ খান, আর বক্তিমে করেন। ক'টা গরীবকে চেন বাপু? কথায় কথায় যে ইঞ্জিরি ঝাড়ো দেশের মানুষ বোঝে?"--একথা সত্যি যে, প্রিয়নাথের মতো ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত নাট্যকারদের নাটক বোঝা সাধারণ মানুষদের পক্ষে সহজ নয়। কিন্তু তবুও যে এরা গতানুগতিকতার ধারাটিকে ভেঙ্গে দিতে চেয়েছিলেন—সেটিই কম বড় অবদান নয়। যুগসমাজের চাহিদা অনুযায়ী নাটক লেখা হবে সেটিই অভিপ্রেত। কিন্তু বেণিমাধবের মতো নাট্য পরিচালকেরা তা না করে "এইসব দুর্গন্ধযুক্ত অর্থহীন রূপকথা"-তেই মজে ছিলেন।

তবে এ কথা সত্য যে, বেণিমাধব চাটুয্যে 'ময়ূরবাহন' পালা নিয়ে পড়ে থাকলেও তাদের প্রতিভা নেহাতই কম ছিল না। এই চরিত্রের মধ্যে কিছুটা গিরিশচন্দ্র ঘোষের ছাপ আছে। কারণ, ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রিকা তাকে 'বাংলার গ্যারিক' বলেছে এবং ময়নার মতো অতি সামান্যা নারীকে যিনি শংকরী দেবীতে পরিণত করতে পারেন তিনি

আর যাই হন সাধারণ কোনো নাট্যশিক্ষক হতে পারেন না। এবং এই আশ্চর্য ক্ষমতা বাংলা নাটকের জগতে কার মধ্যে ছিল সে কথা আমাদের অনুমান করে নিতে অসুবিধা হয় না। যদিও সব দিক থেকে মিল পাওয়া যায় না। তবে, গিরিশচন্দ্র ঘোষও যেমন প্রথম দিকে মনে করতেন সামাজিক নাটক রচনা কিছুটা নর্দমা ঘাঁটার সমান, এবং তিনি তিনি প্রথম দিকে পৌরাণিক নাটক রচনায় ব্রতী ছিলেন; ঠিক তেমনি বেণিমাধবও প্রথম দিকে 'ময়ূরবাহন'-এর মতো নাটক নিয়ে পড়ে ছিলেন। তার কাছে 'পলাশীর যুদ্ধ', 'তিতুমীর'-এর মতো নাটক ছিল অর্থহীন ও অভিনয় অযোগ্য এবং প্রিয়নাথের মতো নাট্যকারেরা নাটক লিখতে জানে না। তবে শেষের দিকে বেণিমাধবও 'তিতুমীর'-এর অভিনয় করেছেন, কারণ তিনি তার ভুল বুঝতে পেরেছেন।

বেণিমাধবের মতো নটগুরুর প্রয়োজন সে সময়ে অতি অবশ্যই ছিল। শুধু প্রয়োজন ছিল তাদের জাতীয়তাবাদী মননের জাগরণ ঘটানো। থিয়েটার এবং অভিনয়কে এরা কখনোই অসম্মান করেনি। 'ময়ূরবাহন' নাটক উপস্থাপনার সময় বকশ্ -এ গণ্যমান্য বাবুরা যখন শংকরীদেবীর নাচ দেখে অশ্লীল চিৎকার করছিল তখন বেণিমাধব চরিত্র ছেড়ে বেড়িয়ে এসে তাদের উদ্দেশ্যে *বলে,-"মেয়েছেলে চান তো কাছেই বিশেষ পাড়া আছে, সেথায় স্বচ্ছন্দে গমন করতে পারেন। এটা নাট্যমন্দির। জলসাঘর নয়। এখানে পূজারীর ভাব নিয়ে বসতে হয়। না পারলে বেড়িয়ে যান।"* এ বক্তব্য তো কোনো মাতাল অভিনেতার হতে পারে না। এ যেন সত্যিই এক নাট্যপূজারীর কথা। বীরকৃষ্ণ দাঁ-এর মতো স্বত্বাধীকারীদের হাতে পড়ে এদের এহেন দুর্গতি। তাই বীরকৃষ্ণ থিয়েটারের স্বত্ব বেণিমাধবের হাতে তুলে দেবার প্রস্তাব দিলে বেণিমাধব যে কোনো মূল্যে তা চায় এবং সবচেয়ে খুশি হয় সে এখানে থাকবে না তাই। কারণ, তাতে তারা নিজের ইচ্ছামত নাটক করতে পারবে। আসলে, বীরকৃষ্ণের মতো স্বত্বাধীকারীরাই ব-কলমে ঠিক করে দিত নাট্য জগতের ভবিষ্যৎ। বেণিমাধবদের মতো থিয়েটারওয়ালাদের কিছু করার ছিল না। তাই খুশি হয়ে বেণিমাধব *বলে—"নিজেদের থিয়েটার! (কণ্ঠ তুলে ভীম গর্জনে) আমি কাঁপিয়ে দেব! আমি ব্রহ্মার মুখের ওপর তর্জনী নেড়ে বলব, নাট্যশালায় গড়েছি এমন জগৎ, যা তোমার চার মাথায় কোনোটাতেই আসেনি, দেবতা। আমি এখনও অভিমন্যু রথী, নিক্ষেপিব রথচূড়, রথচক্র, কভু ভগ্ন অসি সপ্তরথী দুর্ভাগ্যের পানে। জানেন বাবু, আপনার কোন কথাটাতে আমি সবচেয়ে খুসি হয়েছি? তিন নম্বর! আপনি আর থাকছেন না। বংকিম-দীনবন্ধুর ওপর আর যে দবদবা চালাবেন না, এটা জেনে--...।"* অর্থাৎ মুক্তি, বেনিয়া বীরকৃষ্ণের হাত থেকে থিয়েটারের মুক্তি। কিন্তু এর জন্য চরম দাম দিতে হল বেণিমাধবকে। নিজের হাতে তিল তিল করে গড়া তিলোত্তমা শংকরীদেবীকে তুলে দিতে হবে বীরকৃষ্ণের মতো নারীলোলুপ শয়তানের হাতে—তার রক্ষিতা হবার জন্য। বেণিমাধব থিয়েটারের জন্য সে ত্যাগ স্বীকার করতেও রাজি। সে বীরদর্পে ঘোষনা *করে—"...থিয়েটারের জন্য সব করতে পারি, করে এসেছি, করে যাবো।"* তার কাছে নীতিবোধ নিয়ে থিয়েটার চালানো

যায় না। তাই ময়নার সতীত্বকে বাজী রেখেও সে থিয়েটার চালাবে। কারণ তার কাছে সতীত্বের পরিভাষা কিছুটা এরকম— *"সতীত্ব! সতীত্ব! সেটা একটা কুসংস্কার। ...সতীত্ব-টতীত্ব আমি মানি না। বীরকেষ্ট ওকে ছুঁলেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে, এমন পবিত্র সোনার অংগ ওঁর নয়। এ কালে আর সীতা সাবিত্রীদের দরকার নেই। কলকেতার বাবুর দল ওঁদের ভিটেছাড়া করেছেন।"*

আসলে, বেণিমাধবের মতো নটুয়াদের কাছে সংস্কার জিনিসটাই বড়ো আপেক্ষিক। থিয়েটারের স্বার্থে এরা যে কোনো সংস্কারের গ্রহন বা বর্জন করতে পারে অবলীলাক্রমে। তবে মানবিক মূল্যবোধ ও দেশাত্মবোধ—এই দুটোই এদের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় ছিল। বসুন্ধরা ও ময়নার চোখের জল এবং প্রিয়নাথ মল্লিকের মতো নবজাগরণের আলোয় আলোকিত নব্যযুবকের তীক্ষ্ণ খরশান বাক্যবান এদের চোখ খুলে দিয়েছিল। তাই 'আট' সংখ্যক পরিচ্ছেদে আমরা দেখতে পাচ্ছি দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' নাটক অভিনয়ের মঞ্চে তিতুমীরের অভ্যুত্থান ঘটেছে হঠাৎ করেই। হঠাৎ করেই টিনের তলোয়ার উন্মুক্ত করে দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান জানায় তিতুমীরবেশী বেণিমাধব। এ যেন এক অন্য বেণিমাধব। বর্তমান যুগসময় যে বেণিমাধবকে চায় সেই বেণিমাধব। তার হাতের টিনের তলোয়ারের ঝনঝনানিতে ল্যামবার্ট সাহেবও পিছু হঠতে বাধ্য হয়। বেণিমাধব বলে *ওঠে—"যতক্ষণ এক ফিরিংগি শয়তান দেশের পবিত্র বুকে পা রেইখে দাঁড়গে থাকবে, ততক্ষণ এই ওয়াহাবি তিতুমীরের তলোয়ার কোষবদ্ধ হবে নে কখনো।"* এই যে হুঙ্কার, এই হুঙ্কারই বাংলা নাট্যজগতের প্রকৃত সংলাপ। ল্যামবার্ট সাহেবের রক্তচক্ষুকে তুচ্ছজ্ঞান করে সকল অভিনেতারা সমবেত হয়ে মাইকেল মধুসূদন দত্তের দেশপ্রেমমূলক গানে প্রেক্ষাগৃহ কাঁপিয়ে দিলেন। আর বেণিমাধবের মুখে জয়ের হাসি। এ হাসি নাট্যজগতের হাসি, জাতীয়তাবোধ ও নবজাগরণের হাসি, পরাধীনতার নাগপাশে জর্জরিত ভারতমাতার হাসি, গতানুগতিকতার প্রতি বিদ্রোহের হাসি।

তথ্যসূত্র:

১. উৎপল দত্ত, টিনের তলোয়ার, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭০/ জুন ১৯৬৩
২. অরূপ মুখোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত জীবন ও সৃষ্টি, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, ২০১১ (শক ১৯৩২)
৩. শিবব্রত চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস(১৭৯৫-১৯২০), সাহিত্যলোক
৪. ডঃ অজিতকুমার ঘোষ, বাংলা নাটকের ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণঃ মে ২০১০, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭
৫. ডঃ অজিতকুমার ঘোষ, নাটক ও নাট্যকার, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীর সংস্করণ, মার্চ ২০১১, ফাল্গুন ১৪২৭

৬. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস ১৭৯৫-১৮৭৬, করুণা প্রকাশনী, নভেম্বর ২০১৩
৭. কুন্তল মুখোপাধ্যায়, উৎপল দত্তের টিনের তলোয়ারঃ একটি ভাষ্য, রত্নাবলী, তৃতীয় মুদ্রণঃ শ্রাবণ ১৪১৭/ আগস্ট ২০১০
৮. দেবনারায়ন গুপ্ত, একশো বছরের নাট্য-প্রসঙ্গ, সাহিত্যলোক, শ্রাবণ-১৩৮৯
৯. দর্শন চৌধুরী, বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস, পুস্তক বিপনি, পঞ্চম পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১১
১০. সুনীল দত্ত, নাট্য আন্দোলনের ৩০ বছর ১৯৪২-১৯৮৬, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, দ্বিতীয় প্রকাশ-১ জানুয়ারি ১৯৮৭, পৌষ ১৩৯৩

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্রের প্রভাব: পর্যালোচনা

রাকিবুল হাসান বিশ্বাস
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, বাংলা বিভাগ
শ্রীচৈতন্য কলেজ, হাবড়া, উ: ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ

সারসংক্ষেপ:
বিংশ শতকের এক অস্থির সময়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভাব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে বাংলার সমাজজীবনের পরিবর্তিত ভাবধারায় পরিপুষ্ট তাঁর রচিত উপন্যাসগুলি। প্রায় প্রতিটি উপন্যাসেই পুরাতন গ্রামীণ সমাজ, সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয় এবং বণিকতন্ত্রের সূর্যোদয়ের ভাবটি ফুটে উঠেছে। সেখানে ব্যাক্তি তারাশঙ্কর ও তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শের ছাপ সুস্পষ্ট। তিনি সারাজীবনই মানুষের দুঃখ খুব কাছ থেকে দেখেছেন। তাই তাঁর উপন্যাসে রোমান্টিক ভাবের পরিবর্তে দুঃখবাদ বেশি প্রত্যক্ষ করা যায়। সমাজের ভাঙা-গড়ার চিত্র প্রায় প্রতিটি উপন্যাসের সারবস্তু হিসেবে লক্ষ করা যায়। সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয়কে কেন্দ্র করে রচনা করেছেন 'ধাত্রীদেবতা' (১৯৩৯), 'গণদেবতা' (১৯৪২), 'পঞ্চগ্রাম' (১৯৪৪), 'কালিন্দী'র (১৯৪০) মতো বিখ্যাত উপন্যাস। জমিদার-জমিদার সংঘাত, বণিক-জমিদারের সংঘর্ষ চিত্র, সামন্ততন্ত্রের অত্যাচার ও নিপীড়িত সমাজের আর্তনাদের কাহিনি উপন্যাসগুলির উপজীব্য বিষয়।
সূচক শব্দ: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, গ্রামীণ সমাজ, দুঃখবাদ, জমিদার, সামন্ততন্ত্র, বণিকতন্ত্র, অবক্ষয়, ইতিহাস, ভূমিসংস্কার আইন, সাঁওতাল, জনসেবা।

মূল আলোচনা:

(১)

সাহিত্যজগতে উপন্যাস আধুনিক সৃষ্টি এবং সৃষ্টির বৈচিত্রে উপন্যাস আধুনিককালের সমৃদ্ধতর শাখা। উপন্যাস বাস্তব জীবননির্ভর শিল্পকর্ম বলে সাহিত্যের অন্যান্য শাখা থেকে উপন্যাস জীবনকে ভিন্নভাবে রূপায়িত করে। সমাজের দর্পণ হতে গিয়ে তাকে সমাজ ও মানুষের রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক সর্বত্র দিকেই ছুটে বেড়াতে হয়। সেখানে লেখকের ইতিহাস চেতনা, মূল্যবোধ, ও জীবনদর্শনের ছায়াপথ ঘটে।

বাংলা উপন্যাসগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে না হলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে বাংলার সমাজজীবন মৌলিকভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল। মানুষ হয়ে উঠেছিল বস্তুনিষ্ঠ, আত্মকেন্দ্রিক এবং অস্থিরচিত্ত। বাংলা সাহিত্যেও এই কালপ্রবাহের সুদূরপ্রবাহী ব্যঞ্জনা রঞ্জিত হতে দেখা যায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাঙালি সমাজ, জনজীবনকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত না করলেও, যুদ্ধের ভয়াবহতা বাঙালিকে স্পর্শ না করলেও তার পরোক্ষ প্রভাবের ফলে উনিশ শতকের মূল্যবোধের ভিত্তি বিপর্যস্ত হয়েছিল। উনিশ শতকের সাহিত্যচর্চা মানবমহিমার যে মূল্যবোধকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল, বিংশ শতকের সূচনালগ্নেই তা আন্দোলিত হল। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, অসহযোগ থেকে শুরু করে বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলন ও বৈপ্লবিক কর্মপন্থা বাঙালির জনজীবন ও মননে-চিন্তনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাই যে মূল্যবোধকে কেন্দ্র করে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে উপন্যাসের জয়যাত্রার সূচনা, বিংশ শতকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের হাতে সে মূল্যবোধ অনেকখানি বিপর্যস্ত হল—পরিবর্তন হল। রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক অস্থিরতা এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার টানাপোড়েনে বাংলা উপন্যাস তার গতিপথ পরিবর্তন করতে বাধ্য হল।

(২)

বিংশ শতকের এমনই এক অস্থির সময়ে জীবনরসের শিল্পী রূপে বাংলা কথাসাহিত্যের জগতে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভাব। তিনি অনেকাংশে কল্লোলকেন্দ্রিক চেতনা ও পাশ্চাত্যমুখীনতাকে পশ্চাতে ফেলে নিজস্ব দেশীয় সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে এবং তার বিবর্তনের ধারাকে উপন্যাসে রূপায়িত করতে চেয়েছেন। সে-কারণে সমাজের ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্র এবং তার সঙ্গে ধনতন্ত্রের সংঘাত, উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের জীবনকাহিনি, বীরভূমের উদ্দাম অসংস্কৃত জীবনধারা তাঁর উপন্যাসে প্রবলভাবে বিধৃত। তাঁর প্রথমপর্বের উপন্যাসে সমাজ-সচেতনতা ও গ্রামীণ জীবনের অপ্রতিরোধ্য ভাঙনের কথা প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তী ও পরবর্তীকালীন উপন্যাসগুলিতে সামন্তব্যবস্থার সমান্তরাল ধারার সঙ্গে আছে বণিক সভ্যতার রূপায়ণ, বিশ্বযুদ্ধ প্রভাবিত নৈতিক মূল্যবোধের পরিবর্তনজনিত জীবনচর্যার বিশ্বস্ত চিত্রণ। তাঁর প্রথমপর্বের উপন্যাসগুলো গ্রামীণ জীবনধারার ছবি তুলে ধরেছেন, যেখানে সবসময় দেশের মাটিকে ঘনিষ্ঠভাবে স্পর্শ করে এগিয়ে চলার অঙ্গীকার ধ্বনিত হয়েছে। অপরদিকে, তাঁর মধ্যপর্বের রচনায় মার্কসীয় ইতিহাস ব্যাখ্যার প্রভাব খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ‘ধাত্রীদেবতা’ (১৯৩৯) ও ‘কালিন্দী’ (১৯৪০) এবং কিছু পরের ‘গণদেবতা’ (১৯৪২) ও ‘পঞ্চগ্রাম’ (১৯৪৪) তাঁর লক্ষণীয় নিদর্শন। সামন্ততন্ত্রের ভাঙন আর বণিকতন্ত্রের অভ্যুত্থান সমাজে যে ভাঙা-গড়া সৃষ্টি করেছে, তারাশঙ্করের এই-সকল উপন্যাসে তা খুব সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে। শ্রেণিগত স্বার্থ ও স্বভাব সমাজে কেমন করে আত্মপ্রকাশ করে তাও তারাশঙ্কর নিখুঁতভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। প্রসঙ্গত তারাশঙ্করের ‘ধাত্রীদেবতা’ (১৯৩৯) ও ‘কালিন্দী’ (১৯৪০) উপন্যাস-দুটি আলোচনা করা যেতে পারে।

(৩)

‘ধাত্রীদেবতা’য় চিরন্তন জমিদারি অভিমান ও আড়ম্বরের সঙ্গে নবজাগ্রত দেশাত্মবোধের দ্বন্দ্ব দেখানো হয়েছে। এর ফলে জমিদারি গৌরব শেষপর্যন্ত লুটিয়ে পড়েছে ব্যক্তিত্বের মহিমার কাছে। এই জমিদারি আত্মভিমান ও দম্ভের দুই প্রকাশ ‘ধাত্রীদেবতা’র পিসিমা ও গৌরী চরিত্রে। শিবনাথের বংশপরিচয় দিতে গিয়ে তারাশঙ্কর ক্ষুদ্র জমিদারের পরিচয় দিয়েছেন সাড়ম্বরে—“বাঁড়ুজ্জেরা ক্ষুদ্র জমিদার; সাত আনায় শিবনাথের আয় হাজার চারেক টাকা। তবে পাকা বন্দোবস্ত অনেক আছে; পালকি-বহনের বেহারা চাকরান জমি ভোগ করে, মহলে পাইকদের জমি দেওয়া আছে, সদরে কাজ করিবার জন্যও চারজন পাইকের কায়েমি বন্দোবস্ত; নাপিত, বৃত্তিভোগী, পুরোহিত, দেবদত্তের পূজক, এমনকি গয়া শ্রীক্ষেত্র কাশী প্রভৃতি তীর্থস্থলের পাণ্ডারা পর্যন্ত জমি ভোগ করেন।” জমিদারের কাছারিবাড়ির বর্ণনাতেও লেখক চিরন্তন জমিদারি ঐশ্বর্য ও আড়ম্বরের চিত্র তুলে ধরেছেন। বিবাহ উৎসবে জমিদারি ঠাঁট বজায় রাখার জন্য বাবুদের কারখানায় খেমটা নাচের ঐতিহ্যকেও পিসিমা শিবনাথের বিবাহে বাদ দিতে চাননি।

পিসিমা ক্ষুদ্র জমিদার হলেও সেই জমিদারি নিয়ে প্রতিবেশী জমিদার ও জমির অংশীদারের সঙ্গে পাল্লা দিতেন। নিজের জেদ বজায় রাখার জন্য খরচ করে শিবনাথকে ঘোড়া কিনে দিলেন। কিন্তু সেখানে মূল সমস্যা বা বললে চলে—অভিযোগ ছিল—মাটির সঙ্গে মালিকের, প্রজার সঙ্গে জমিদারের যোগ না থাকা। সেখানেই শিবনাথ ও তার মায়ের সঙ্গে পিসিমার দ্বন্দ্বের সূত্রপাত। শিবু জনজীবনের মধ্যে নেমে এসেছে—জনসেবায় আত্মনিয়োগ করেছে, যা একান্তভাবেই জমিদারি চালচলনের পরিপন্থী। শিবুর মা শিবুকে পড়াশোনার জন্য কাছারিতে বসতে দিতে চায় না—এতে পিসিমার আপত্তি। পিসিমা সবক্ষেত্রেই জমিদারি ঐতিহ্যকে টিঁকিয়ে রাখতে চাইলেও যুগধর্মের প্রভাবে ধীরে ধীরে ক্রমান্বয়ে তা ক্ষয় পেতে থাকে। স্রোতের টানে পিসিমাকেও নেমে আসতে হয় জনসমুদ্রে। জমিদারের অহমিকা, স্বার্থপরতার প্রতীক গৌরীকেও শেষ পর্যন্ত শিবনাথের আদর্শকে বড় বলে মেনে নিতে হয়। ‘বাংলা সাহিত্যের সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাধারা’ গ্রন্থে অধ্যাপিকা গীতা মুখোপাধ্যায় বলেছেন—“নবজাগ্রত আদর্শবাদ এবং দেশপ্রেমের কাছে আত্মসর্বস্ব জমিদারি ঐতিহ্যের এ এক শোচনীয় পরাজয়। তারাশঙ্কর এখানে আদর্শকেই বড় করেছেন।”

(৪)

প্রাচীন জমিদার বংশগুলি ক্রমশ বহুধা বিভক্ত হয়ে পূর্ব-গৌরব ও সম্পদ হারিয়েছে ঠিকই, কিন্তু তাদের দম্ভ ও অহমিকা হ্রাস পায়নি। প্রতিবেশী জমিদার ও জমির অংশীদারের সঙ্গে বিরোধ ও দলাদলি লেগেই থাকে। তারই একটি নিখুঁত চিত্ররূপ হল ‘কালিন্দী’ (১৯৪০)। ‘প্রবাসী’ মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'কালিন্দী'

উপন্যাসের কাহিনিতে জমিদার, চাষী, সাঁওতাল, মিলের মালিক—এই চারটি স্তর লক্ষ করা যায়। জমিদার ইন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে এক নতুন যুগের ব্যবসাদার বিমলবাবু সংঘাত-চিত্র উপন্যাসের মূল উপজীব্য বিষয়। বিমল মুখার্জি কালিন্দীর চরে গড়ে ওঠা চিনিকলের মালিক। সেই মালিকত্ব নিয়ে জমিদার ইন্দ্রনাথ রায়ের সাথে তার দ্বন্দ্ব ও মামলা বাধে। 'আমার কালের কথা' গ্রন্থে তারাশঙ্কর বলেছেন—"এমনই দ্বন্দ্বের সমারোহে সমৃদ্ধ লাভপুরের মৃত্তিকায় আমি জন্মেছি। সামন্ততন্ত্র বা জমিদারতন্ত্রের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের দ্বন্দ্ব আমি দুচোখ ভরে দেখেছি।... আমরাও ছিলাম ক্ষুদ্র জমিদার। সে দ্বন্দ্বে আমাদেরও অংশ ছিল।" ইন্দ্রনাথ রায় ও বিমল মুখার্জি দ্বন্দ্ব সে-দিকটিকেই আলোকিত করেছে। নতুন যুগের শিল্প সভ্যতার কাছে জমিদার শাসনতন্ত্রের পরাজয়ই এখানে বড় হয়ে উঠেছে।

উপন্যাসে দেখা যায়, জমিদার ইন্দ্রনাথ রায় চাষীদের সামনে রেখে বিমল মুখার্জির সঙ্গে লড়াইয়ের পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু রংলালের ভুলে সে-পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যায় আর ইন্দ্র রায় রেগে গিয়ে রংলালের মুখে লাথি মারেন। মেয়ে উমা বকাবকি করলে ইন্দ্র রায় বলেছেন—"মানুষের দিন যখন শেষ হয় তখন অমনি করেই মতিভ্রম হয়। আমাদের দিন শেষ হয়েছে মা।"

'কালিন্দী'তে কেবল সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয়ের দিকটিই পরিস্ফূট হয়নি, তার সাথে আধুনিককালের আর এক বাস্তব সত্য উন্মোচিত হয়েছে এবং তা হল বিলীয়মান সামন্ততন্ত্রের আর্থিক দুরবস্থার সুযোগে মহাজনী বা ব্যবসায়ী অর্থাৎ বণিকতন্ত্রের সূচনা। কালিন্দীর চরে যখন শরিকীলড়াই মাথাচাড়া দিল, তারই সুযোগে কীভাবে পুঁজিবাদী ব্যবসায়ীরা আপন আপন সুবিধা করে নিয়েছে তার দৃষ্টান্ত 'কালিন্দী'র কাহিনিতে রয়েছে। গ্রামীণ সমাজব্যবস্থা ক্রমে ভেঙে পড়েছে, বণিকের কাছে জমি পত্তনি দিয়ে জমিদারেরা ক্রমশ শহরমুখী হচ্ছে—এইভাবেই সামন্ততন্ত্র ক্রমশ বণিকতন্ত্রের কাছে নিজেদের বিলিয়ে দিতে বাধ্য হয়।

কালিন্দীর চর স্বার্থের প্রয়োজনে প্রজাদের মধ্যে বিলি-বন্দোবস্ত করার চেষ্টায় যে রক্তাক্ত ইতিহাস গড়ে উঠেছিল, তার চরম পরিণতি ঘটল চিনিকলের মালিকদের জোর-জবরদস্তি করে চর দখল করার ঘটনায়। মামলায় জমিদার পক্ষের পরাজয় ঘটল। কলের মালিক বিমলবাবু মোটরলাঙল চালিয়ে চর দখল করল। জমিদার ইন্দ্রনাথ রায় শেষবারের মতো চাষীদের সমবেত হওয়ার ডাক দিলেন জমিদখল রুখতে। কিন্তু নির্বোধ চাষীরা ইতিপূর্বেই মজুমদারের খপ্পরে পড়ে শেষ পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে। অতএব পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে।

(৫)

সুতরাং দেখা যায়, তারাশঙ্করের 'ধাত্রীদেবতা' (১৯৩৯), 'কালিন্দী' (১৯৪০) প্রভৃতি উপন্যাসে এবং এই একই পর্বের 'গণদেবতা' (১৯৪২), 'পঞ্চগ্রাম' (১৯৪৪) প্রভৃতি উপন্যাসে একদিকে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ও অপরদিকে তার বিরুদ্ধে সঞ্চিত

গণবিক্ষোভ প্রবলতর হয়ে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের সম্ভাবনাকেই স্পষ্ট করেছে। শুধু জমিদারি চরিত্র ও শোষণনীতিই নয়, লেখক তারাশঙ্কর তৎকালীন সময়ের নানান ভূমিসংস্কার ও প্রজা-স্বত্বাধিকার আইনের ত্রুটি-বিচ্যুতির ঘোর সমালোচনাও করেছেন এবং সেইসঙ্গে শোষিত মানুষের নবজাগ্রত চেতনা ও তার জয়যাত্রা সামন্ততন্ত্রের যে অবক্ষয় অবধারিত করে তুলেছে, তারও সুস্পষ্ট আভাস তিনি রেখেছেন। তাই ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে বাংলা সাহিত্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কীর্তির কথা বলতে গিয়ে বলেছেন—"শরৎচন্দ্র অবলম্বন করেছিলেন পারিবারিক ও সামাজিক নীতি-দুর্নীতিঘটিত প্রভাব-প্রতিবেশে বর্ধিত কয়েকটি নর-নারীর ব্যক্তিগত সমস্যা। তারাশঙ্কর সেই সমস্যা ও সীমার চৌহদ্দি অনেক বাড়িয়ে দিয়ে বিদায়ী পুরাতন এবং নবীন আগন্তুকের সংঘর্ষের বিশালতর পটভূমিকায় এঁকেছেন।"

গ্রন্থপঞ্জি :

১. তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় : আমার সাহিত্য-জীবন : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি : ১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-৭০০০২০ : প্রথম আকাদেমি সংস্করণ : জুলাই, ১৯৯৭

২. প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য (সম্পাদনা) : তারাশঙ্কর- ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য : সাহিত্য অকাদেমি : ২৩এ/৪৪এক্স, ডায়মন্ড হারবার রোড, কলকাতা-৭০০০৫৩ : প্রথম প্রকাশ : ২০০১

৩. গীতা মুখোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যে সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাধারা (সেকাল ও একাল পর্ব) : কে পি বাগচী এন্ড কোম্পানি : ২৮৬ বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১২ : প্রথম প্রকাশ : জুলাই, ২০০২

৪. নাজমা জেসমিন চৌধুরী : বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি : আহমদ পাবলিশিং হাউজ : ৭, জিন্দাবাহার প্রথম লেন, ঢাকা : প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল, ১৯৭১

৫. উজ্জলকুমার মজুমদার (সম্পাদনা) : তারাশঙ্কর- দেশ কাল সাহিত্য : মডার্ন বুক এজেন্সি : ১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩ : প্রথম প্রকাশ : চৈত্র, ১৩৬৫ ব.

৬. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী : বাংলা কথাসাহিত্য প্রসঙ্গ : অন্নপূর্ণা পুস্তক মন্দির : এ ১৮ এ, কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা-৭০০০০৭ : প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ১৯৫৭

দিগিন্দ্রচন্দ্রের দীপশিখা : মন্বন্তরের আলোকবর্তিকা

মল্লিকা ষন্নিগ্রহী
গবেষক, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: 'দীপশিখা' নাটকটি পঞ্চাশের মন্বন্তরের পটভূমিতে লেখা। এই নাটকটিতে দিগিন্দ্রচন্দ্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, খাদ্যাভাব, ভুখামিছিল, কালোবাজারি, এবং অনাহারজনিত মৃত্যুতে বিপর্যস্ত বাংলার ছবি তুলে ধরেছেন। মন্বন্তরকালীন পরিবেশ পরিস্থিতিকে তিনি এই নাটকে তুলে ধরেছেন অভিনব দৃশ্য পরিকল্পনার সাহায্যে। আমরা এই প্রবন্ধে পঞ্চাশের মন্বন্তরের কারণ, প্রকৃতি, এবং তার ভয়ানক পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করব।

সূচক শব্দ: মন্বন্তর, প্রাকৃতিক কারণ, মনুষ্যসৃষ্ট কারণ, পঞ্চাশের মন্বন্তর।

মূল নিবন্ধ:

সাহিত্য সমাজের প্রতিচ্ছবি। তাই সাহিত্যের দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয় সমাজ, দেশ, কাল, সংস্কৃতি। সাহিত্যের মধ্য দিয়ে আমাদের পরিচয় হয় মানুষের সুখ, দুঃখ, আশা, আকাঙ্ক্ষা, নৈতিকতা, আর্থিক অবস্থা, ধর্মীয় বিশ্বাস, রাজনৈতিক আদর্শ বোধের সাথে। তাই সমাজের যে কোন ছোট বড় ঘটনা যখন জনজীবনকে আন্দোলিত করে তখন সেই ঢেউ এসে দোলা জাগায় শিল্পী সাহিত্যিকদের মনে। জীবনের ভাঙ্গা গড়ার খেলায় সাক্ষী থেকে তাঁরা তাদের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত করেন সাহিত্যের পাতায় পাতায়। সাহিত্যের প্রতি শাখায় সেই অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে। আর সেই সাহিত্য হয়ে ওঠে সমাজের দলিল।

মন্বন্তর সমাজের বুকে এক চরম বিপর্যয় নিয়ে আসে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ এই বিপর্যয়ের শিকার হয়। মন্বন্তরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সমাজের বিভিন্ন স্তরে এর প্রভাব কত ব্যাপক এবং সুদূরপ্রসারী। সামাজিক অনুশাসন, চিরাচরিত ধ্যান-ধারণা খড়কুটোর মতো ভেসে যায় মন্বন্তরের চোরাস্রোতে। পারিবারিক শালীনতা, আত্মসম্মানকে বেআব্রু করে নির্লজ্জ ক্ষুধা।

মন্বন্তর শব্দটির অর্থবিশ্লেষণ করতে গেলে আমরা দেখতে পাব শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। মন্বন্তর শব্দটি- মনুর শাসনকাল অর্থে ব্যবহৃত হয়। মন্বন্তর অর্থাৎ অন্য মনু। চতুর্দশ মনুর মধ্যে এক এক মনুর অধিকার কালকে নির্দেশিত করে মন্বন্তর। এছাড়াও মন্বন্তর শব্দটি দিয়ে বন্যা, বিপ্লব, প্রলয়, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি বোঝায়। কিন্তু প্রচলিত অর্থে মন্বন্তর বলতে আমরা দুর্ভিক্ষকে বুঝি। ভারতকোষে দুর্ভিক্ষের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে- **"প্রাকৃতিক অথবা মানবিক কারণে সংগঠিত খাদ্যশস্যের অত্যন্ত অভাবের ফলে ব্যাপক অন্নকষ্ট সৃষ্টি হয়। সাধারণত বহু স্থলে খাদ্যাভাবে মৃত্যু ঘটিলে তবেই অবস্থাটিকে দুর্ভিক্ষ বলা হয়।"**[১] এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকাতে মন্বন্তর

বা ফেমিন শব্দটির অর্থ নিরূপণ করতে গিয়ে বলা হয়েছে-" An extreme and protracted shortage of food. Usually resulting in higher than normal death rates."[২] অর্থাৎ যখন কোন স্থানে চূড়ান্ত খাদ্যাভাব দেখা যায় এবং খাদ্যাভাব দীর্ঘস্থায়ী হয়ে স্বাভাবিকের তুলনায় অত্যধিক হারে মানুষের মৃত্যু ঘটে তখন তাকে দুর্ভিক্ষ বা মন্বন্তর বলে।

এই মন্বন্তর পরিস্থিতি সৃষ্টির পিছনে মূলত দুটি কারণ রয়েছে। যথা- ১। প্রাকৃতিক কারণ ২। মনুষ্যসৃষ্ট কারণ। প্রাকৃতিক যে কারণগুলির জন্য মন্বন্তর দেখা দিতে পারে সেগুলি হল –

প্রথমত, অতিবৃষ্টি। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত মন্বন্তরের কারণ হতে পারে। ঠিক যেমন ১৬৫০ - ৫২ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়াতে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের জন্য দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল এবং এই দুর্ভিক্ষে বহু মানুষ মারা যায়।

দ্বিতীয়ত, অনাবৃষ্টি বা খরা। বৃষ্টিপাত না হলে খরা দেখা দেয়। বৃষ্টির অভাবে কৃষি কাজ বন্ধ হয়, তার সাথে সাথে খাদ্য উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়, যার ফলে দেখা দেয় খাদ্যাভাব। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে একাধিকবার অনাবৃষ্টি বা খরার জন্য দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। ভারতবর্ষেও ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দ এবং ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে খরার জন্য দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং এই দুর্ভিক্ষে বহু মানুষের প্রাণহানি হয়।

তৃতীয়ত, বন্যা। বন্যার জন্য দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে পারে। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে বন্যার ফলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল এবং এই দুর্ভিক্ষ প্রচুর মানুষের মৃত্যু ঘটেছিল।

চতুর্থত, কীটপতঙ্গ, পঙ্গপালের আক্রমণ দুর্ভিক্ষের কারণ হতে পারে। এদের আক্রমণে প্রচুর পরিমাণে শস্যের ক্ষতি হয় এবং খাদ্যাভাব দেখা যায়।

মনুষ্যসৃষ্ট কারণগুলির মধ্যে অন্যতম হল- **প্রথমত,** যুদ্ধ বা যুদ্ধের আশঙ্কা। মনুষ্যসৃষ্ট কারণগুলির মধ্যে যুদ্ধের আশঙ্কা বা যুদ্ধের জন্য সরকার কর্তৃক খাদ্যশস্যের বাজেয়াপ্তকরণের ফলে রাতারাতি বাজার থেকে খাদ্যশস্যের অন্তর্ধান দুর্ভিক্ষ ডেকে আনে। বিভিন্ন দেশে যুদ্ধ পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কায় বিপুল পরিমাণে খাদ্যশস্য বাজেয়াপ্ত করার জন্য যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল তাদের মধ্যে অন্যতম হলো ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে গ্রীস, ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে ওয়ারশ , ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে নাইজেরিয়ার দুর্ভিক্ষ।

দ্বিতীয়ত, মুনাফা লোভী ব্যবসায়ীদের খাদ্যশস্য বেআইনিভাবে মজুত করতে শুরু করার ফলেও দুর্ভিক্ষ দেখা যায়। খাদ্যশস্যের কালোবাজারি দুর্ভিক্ষের একটি কারণ।

তৃতীয়ত, মহামারী। মহামারীর প্রকোপের ফলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে পারে। কারণ মহামারীতে প্রচুর পরিমাণে মানুষের মৃত্যু ঘটে এবং জনসংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাওয়ার কারণে শস্য উৎপাদন ব্যাহত হয়। যার ফলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়।

বাংলাদেশের মন্বন্তরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাবো বেশ কয়েকবার বাংলা দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে পতিত হয়েছিল। এরমধ্যে ১১৭৬ বঙ্গাব্দে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর এবং ১৩৫০ বঙ্গাব্দে পঞ্চাশের মন্বন্তর ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ। এই দুই মন্বন্তরে লোকক্ষয় হয়েছিল সর্বাপেক্ষা বেশি। অগণিত মানুষের মৃত্যু বাংলাকে শ্মশানে পরিণত করেছিল। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর দীর্ঘ ১৭৪ বছর বাংলাদেশে সেরকম কোনো বড় খাদ্যসংকট বা দুর্ভিক্ষ দেখা যায়নি। স্বল্প সময়ের জন্য খাদ্যাভাব দেখা দিলেও, সেগুলিতে মানুষ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।

পঞ্চাশের মন্বন্তরের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখতে পাই প্রাকৃতিক এবং মনুষ্যসৃষ্ট দুই কারণে ১৩৫০ বঙ্গাব্দে দুর্ভিক্ষ বাংলার মানুষের দুয়ারে কড়া নাড়ে। প্রাকৃতিক কারণগুলির মধ্যে দেখা যায় ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে আউশ ধান ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এবং আমন ধানের ফসলও সেবছর সেরকম ভালো উৎপাদন হয়নি। এই সময় ধানের ফাঙ্গাস জাতীয় এক ধরনের রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যাওয়ার ফলে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। অন্যদিকে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে ১৬ই অক্টোবর মেদিনীপুরের বুকে আছড়ে পড়ে সর্বনাশা সাইক্লোন। যার ফলে মেদিনীপুরের সাথে সাথে পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে দেখা দেয় বন্যা। বন্যায় মানুষের ঘরবাড়ি, ফসল জলের তলায় চলে যায় এবং খাদ্য সমস্যার সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে মনুষ্য সৃষ্ট কারণগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে ১০ই মার্চ জাপান কর্তৃক বর্মা দখল হলে ব্রিটিশ সরকার ভারতে বিদেশি সৈন্যের আক্রমণ রুখতে পোড়ামাটি নীতি প্রয়োগ করে। পূর্ববঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ফসল বাজেয়াপ্ত করে সেগুলিকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। তখন বর্মা থেকে কয়েক লক্ষ টন চাল আমদানি হত ভারতে কিন্তু জাপানি সেনা কর্তৃক বর্মা দখল হওয়ার পর চাল আমদানির পথ বন্ধ হয়ে যায়। অন্যদিকে জাপানি সৈন্যকে বাধা দেওয়ার জন্য সীমান্তে প্রচুর পরিমাণে সৈন্য মোতায়েন করা হয়। যাদের খাদ্য যোগানের দায়িত্ব ছিল ভারত সরকারের উপর। তাই সৈন্যদের রসদ মজুদ রাখার জন্য সরকার রাতারাতি বাজার থেকে চাল মজুদ করা শুরু করে। ফলে বাজারে চালের ঘাটতি দেখা দেয়। চালের দাম দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। সর্বোপরি পঞ্চাশের মন্বন্তরের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল সরকারের উদাসীনতা। তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার বাংলার দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতিকে প্রথমে স্বীকারই করেনি। পরিস্থিতি দিন প্রতিদিন ভয়াবহ আকার ধারণ করলে সরকার দুর্ভিক্ষকে অস্বীকার করে বাংলায় যথেষ্ট খাদ্য মজুত রয়েছে বলে বাইরের দেশ থেকে আসা বাংলার জন্য ত্রাণ সামগ্রী বোঝাই করা জাহাজকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল। যার ফলে দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণের আহুতি দেয় ব্রিটিশ সরকার। গ্রাম থেকে শহরে ছুটে এলো বুভুক্ষের দল। কলকাতা নগরীর পথে পথে ভিক্ষুকের মিছিল। চারিদিকে হাহাকার, পথে ঘাটে অগণিত মানুষের মৃত্যু, বাংলাকে সেদিন শ্মশানে পরিণত করেছিল। সরকারি রিপোর্ট

অনুযায়ী এই দুর্ভিক্ষে প্রায় ১৫ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয় কিন্তু পঞ্চাশের মন্বন্তরে প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটেছিল।

পঞ্চাশের মন্বন্তর যে বিপর্যয় মানুষের জীবনে নিয়ে এসেছিল তার পরিণতি ছিল ভয়ানক। এই মন্বন্তর বেআব্রু করে সাধারন মানুষের জীবনকে। পারিবারিক শালীনতা, প্রচলিত মূল্যবোধ, বিবেক, মনুষ্যত্ব প্রচন্ড ঘা খেল। পঞ্চাশের মন্বন্তরে অন্তঃপুরের মেয়েদের রাস্তায় বার করে আনলো বীভৎস ক্ষুধা। মনুষ্যত্বের চরম বিপর্যয় দেখা গিয়েছিল এই সময় পর্বে। বাবা-মা সন্তান বিক্রির মত জঘন্য কাজ করতে বাধ্য হয়েছিল। ঘরের মেয়েরা দুমুঠো ভাতের জন্য সতীত্বকে বিসর্জন দিয়ে বেছে নিয়েছিল গণিকা বৃত্তি। সমাজের এরকম বিশৃঙ্খলা এবং মানুষের আত্মিক অপচয় শিল্পী সাহিত্যিকদের হৃদয়কেও নাড়া দিয়েছিল সেদিন। তাই সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় এই মন্বন্তরের বীভৎসতা ও তার ভয়ানক পরিণতির কথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন সমাজমনস্ক সাহিত্যিকরা। সাহিত্যের অন্যান্য শাখা গুলির মতোই নাট্যসাহিত্যও পিছিয়ে ছিল না । বিজন ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের মতো নাট্যকাররা কলম তুলে নিয়েছিলেন এই অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়ের ছবি তুলে ধরতে। নাট্যসাহিত্যের সূচনা লগ্ন থেকেই নাটকে সমাজ সচেতনতা এবং সামাজিক সমস্যাকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হত। বিংশ শতাব্দীতেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন', দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দীপশিখা' এবং শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'রাজধানীর রাস্তায়' যার প্রমাণ।

পঞ্চাশের মন্বন্তরকে প্রেক্ষাপট করে দিগিন্দ্রচন্দ্র তাঁর 'দীপশিখা' নাটকটি রচনা করেন। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে নাটকটি রচিত হয়। পাঁচটি দৃশ্যে সমন্বিত এই একাঙ্ক নাটকটিতে দিগিন্দ্রচন্দ্র মন্বন্তর পীড়িত মানুষের জীবনের কষ্টময় ইতিহাস তুলে ধরেছেন। নাট্যকার পাঁচটি দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে খাদ্যসমস্যার স্বরূপ, পরিণতি এবং এই সমস্যার জন্য যারা দায়ী তাদের পরিচয় তুলে ধরেছেন। নাটকটিতে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি ভিখারিনী চরিত্রকে প্রাধান্য দিয়ে নাটককার সমকালীন সমস্যাকে ব্যক্ত করেছেন।

নাটকটির প্রথম দৃশ্যে আমরা দেখতে পাই অন্ধকার প্রেক্ষাপটে ক্ষুধা, ক্ষুধা , খেতে দাও, খেতে দাও বলে বিকট চিৎকার। এক অন্ধ ভিখারী গান গেয়ে ভিক্ষা চেয়ে বেড়াচ্ছে। বিজলী নামের একটি আধুনিকা মেয়ের কাছে সে ভিক্ষা চেয়েছে কিন্তু খালি হাতে অন্ধ ফিরে যায়। বিজলীর বিপরীতে দিগিন্দ্রচন্দ্র লতিকা নামের একটি সাধারণ মেয়েকে উপস্থিত করে দুটি মেয়ের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে মন্বন্তরের আর্ত অসহায় মানুষগুলির প্রতি তাদের মনোভাব কিরূপ তা তুলে ধরেছেন। লতিকা একটি অত্যন্ত সাধারণ মেয়ে। মন্বন্তর পীড়িত অসহায় মানুষগুলির প্রতি তার মমত্ব এবং সহানুভূতি রয়েছে। এই অসহায় মানুষগুলির পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সাহায্য করাই তার জীবনের

ব্রত। অন্যদিকে বিজলীর মনের মধ্যে এই মানুষগুলির প্রতি রয়েছে তীব্র বিতৃষ্ণা এবং ঘৃণা। একটি ভিখারিনী মা তার দুটি ছোট ছোট সন্তান অভুক্ত রয়েছে বলে বিজলীর কাছে দুটো পয়সা ভিক্ষে চেয়েছে কিন্তু বিজলী অবজ্ঞা ভরে তাদের এড়িয়ে গেছে। ছোট বাচ্চা দুটি বিজলীর শাড়ি ধরে টানলে সে বিরক্তির সাথে বকাবকি করে ছোট্ট ছেলেমেয়েগুলিকে। দুটি ক্ষুধার্ত শিশুর কাতর ক্রন্দন বিজলীর কানে পৌঁছায়নি, শুধু আর্ত ক্রন্দন পাহাড়ের বুকে প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে এসেছে।

অন্যদিকে কন্ট্রোলের দোকানের চার ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার পরও জনৈক মহিলা চাল না পেয়ে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে। তার বাড়িতে তিনটি বাচ্চা অভুক্ত রয়েছে। বাড়িতে চাল নিয়ে না গেলে তাদের মুখে কি তুলে দেবে ভেবে সে অস্থির হয়েছে। বাজারের দামে চাল কিনতে পারা তার মত মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। মহিলাটির সংলাপে চালের মূল্য বৃদ্ধি এবং গরিব মানুষের অসহায় অবস্থার ছবি ফুটে উঠেছে- **"বাজারে কিনতে গেলে তো এ পয়সায় অর্ধেক চালও মিলবে না। বাবু গো, এবার দেখছি গরিবের মরণ।"**[৩] দিগিন্দ্রচন্দ্র এ দৃশ্যে দরিদ্রের প্রতি মজুতদার মহাজনের নির্মম ব্যবহারটিকে তুলে ধরেছেন বাস্তবানুগভাবে। এই নাটকের মহাজনের গলায় তুলসীর মালা, গলায় কণ্ঠী, মুখে সর্বদা হরিনাম। এই বাহ্যিক ধর্মপ্রাণ মহাজনের আড়তে চাল মজুদ করার সময় সবার অলক্ষে সের খানেক চাল বস্তা থেকে মাটিতে পড়ে যায়। ভিখারিনী ও তার দুটি বাচ্চা, সেই চালগুলি দেখে খুশি হয়ে ওঠে। ভিখারিনী চালগুলি আঁচলে তুলে নিলে মহাজন এসে ভিখারিনীর কাছ থেকে চালগুলি কেড়ে নিয়ে তাকে চাল চুরির অপরাধে পুলিশে দিতে উদ্যত হয়। ভিখারিনী তখন বলে- **"বাবু গো আমি চোর নই। ছিলেম বড় চাষী বউ। পেটের জ্বালায় কলকাতায় চলে এসেছি। এখন আমি ভিক্ষে করেই খাই। আকালে আর ভিক্ষে মিলছে না।"**[৪] পঞ্চাশের মন্বন্তরে ভিক্ষাজীবী মানুষেরা কেউই ভিক্ষুক ছিলেন না। তারা বাধ্য হয়ে এই বৃত্তি অবলম্বন করেছিল, কিন্তু দুর্ভিক্ষে তাদের দুমুঠো ভিক্ষেও জোটেনি। অনাহারে অনশনে রোগে ভুগে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায় পঞ্চাশের মন্বন্তরে। মহাজনের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে ভিখারিনী মহাজনের হাত কামড়ে দিয়ে সেখান থেকে দ্রুত পালিয়ে যায়। মহাজনের লোক পিছু নিলে আত্মরক্ষার জন্য সে ভুখা মিছিলে মিশে গিয়ে আত্মগোপন করে।

দ্বিতীয় দৃশ্যে নাট্যকার সচেতন ভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কলকাতা নগরীতে জাপানি বিমান হানার প্রসঙ্গটি উত্থাপন করে সমকালীন সময় ও পরিস্থিতিকে তুলে ধরেছেন। সাইরেনের শব্দে প্রাণভয়ে ভীত হয়ে একটি নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য কুলি, মজুর, হাড়ি, ডোম, ভিখারি, মহাজন, সরকারি কর্মচারী, ধনীকন্যা বিজলী একই ছাদের তলায় আশ্রয় নেয়। জীবনের শঙ্কায় শ্রেণীভেদ লুপ্ত হয়ে সবাই এক শ্রেণীতে পরিণত হয় এই দৃশ্যে। তৃতীয় দৃশ্যে ক্ষুধার্ত মানুষের কাতর প্রার্থনা গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে। ভিখারিণী তার বাচ্চা দুটি নিয়ে বিজলীদের বাড়িতে দুটো ভাতের জন্য আবেদন জানায়।

গৃহস্থের বাড়িতে ভাত না পেলেও ভাতের ফ্যান টুকু পাওয়ার আশায় মাটির সরা নিয়ে দাঁড়ায়। বিজলীর মা নিজে আধপেটা খেয়ে এই অসহায় মানুষগুলিকে নিজের খাবার তুলে দেন। অন্যদিকে ভিক্ষার অন্নগুলি নিয়ে পার্শ্ববর্তী ভিক্ষুকদের নিজেদের মধ্যে মারামারি কাড়াকাড়িতে ধরা পড়েছে ক্ষুধার জ্বালায় মানুষের জান্তব পরিণতি।

চতুর্থ দৃশ্যে হাসপাতালে অনাহারক্লিষ্ট রোগীদের সারি। এখানে সবার এক অসুখ ক্ষুধা। এই হাসপাতালই আসে একটি সন্তানহারা ভিখারিনী মা। তার ছেলে তার চোখের সামনে না খেতে পেয়ে মারা গেছে। একটি মেয়ে ছিল সেও কোথায় পথে হারিয়ে গেছে। বিকারগ্রস্ত ভিখারিনীকে ডাক্তার পরীক্ষা করে দুধ বার্লি খাওয়ার পরামর্শ দেন। নার্স রোগীটিকে কিছুতেই খাওয়াতে পারেনা। সন্তান হারানোর বেদনায় কাতর একটি মায়ের হাহাকারে মন্বন্তরের বীভৎসতা দেখে চোখের পাতা ভিজে যায়।

পঞ্চম দৃশ্যে আত্মরক্ষা সমিতির শিশু শিবির। লতিকা এই সমিতির একজন কর্মী। দুর্ভিক্ষে হারিয়ে যাওয়া ছেলে মেয়েদের তাদের বাবা মার কাছে ফিরিয়ে দেওয়াই তাদের কাজ। লতিকা ভিখারিনীর মেয়েটিকে খুঁজে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে তাকে সমিতিতে নিয়ে আসে। শিবিরের বাচ্চাগুলির প্রতি ভিখারিনির স্বতঃস্ফূর্ত মাতৃ হৃদয়ের ভালোবাসা ও দায়িত্ব বোধ দেখে তাকে এই সমিতির একজন কর্মী করে নেয় লতিকা। ভিখারিনী তার একমাত্র মেয়ে নীলাকে ফিরে পায় এই শিবিরে এসে। একদিকে সন্তানের সাথে মায়ের মিলন অন্যদিকে পাশের ঘরে দুটি শিশুর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নাটকের যবনিকা পতন হয়।

দিগিন্দ্রচন্দ্র তাঁর 'দীপশিখা' নাটকটিতে পঞ্চাশের মন্বন্তরের এক একটি চিত্রকে তুলে ধরেছেন এক একটি দৃশ্যে। তাঁর 'দীপশিখা' মন্বন্তরের সাক্ষী। যার পাতায় রয়েছে পঞ্চাশের মন্বন্তর পীড়িত মানুষের করুণ ইতিহাস। যে ইতিহাস উত্তর প্রজন্মের কাছে তুলে ধরে মন্বন্তর পীড়িত মানুষের দুঃখ, কষ্ট, অসহায়তার কাহিনি। সমকালীন সময়, পরিবেশ পরিস্থিতিকে তুলে ধরেছেন পাঁচটি দৃশ্যে। আদি মধ্য অন্তযুক্ত নিটোল কাহিনী না থাকলেও 'দীপশিখা' নাটকটি মন্বন্তরের ইতিহাস হয়ে থাকবে চিরদিন।

তথ্যসূত্র:

১. 'ভারতকোষ' (৪র্থ খণ্ড), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৭০, পৃষ্ঠা- ৭৫।

২. 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা'(৪র্থ খণ্ড), উইলিয়ম বেন্টন পাবলিশার, শিকাগো, ১৯৭৪, পৃষ্ঠা-৪৬।

৩. দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, " দীপশিখা", বেঙ্গল পাবলিশার্স , দ্বিতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, পৃষ্ঠা -২০।

৪. তদেব, পৃষ্ঠা- ২২।

ধাঁধা ও গাছপালা

মনোজ মণ্ডল
সহঅধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, খিদিরপুর কলেজ

সারসংক্ষেপ : মৌখিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয় ধাঁধা। ধাঁধায় থাকে প্রশ্ন। আর সেই প্রশ্নে থাকে বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। সাধারণ মানুষ অবসর বিনোদনে, আনন্দ অনুষ্ঠানে, মাঠে-ঘাটে কাজ করতে করতে ধাঁধার প্রশ্নোত্তর খেলায় মেতে থাকে। ধাঁধার কোন নির্দিষ্ট বিষয় নেই, যেকোন কিছু নিয়েই রচিত হতে পারে। বৃক্ষ এবং তার আনুষঙ্গিক বিষয় নিয়ে যেসব ধাঁধা রচিত হয়েছে, সেগুলিই মূলত বর্তমান প্রবন্ধের আলোচনায় তুলে ধরার প্রয়াস রয়েছে।

সূচক শব্দ : ধাঁধার বিষয়, বাঁশ, সজনে, কলা, নারকেল, ধান।

মূল প্রবন্ধ:

ধাঁধা বাংলার অতি পরিচিত একটি প্রকরণ। ধাঁধা একটি তাৎক্ষণিক বুদ্ধি নির্ভর বিষয়। ধাঁধাকে একটি প্রাচীন সমাজের প্রচলিত জীবন নির্ভর সন্দর্ভ বলা চলে। ধাঁধা অবশ্যই শিক্ষামূলক ও জ্ঞানমূলক তো বটেই, সেইসঙ্গে আনন্দেরও একটি প্রকরণ। "প্রাচীন সমাজে ইহার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর কিছুই ছিল না। ইহার উত্তর দিয়া সুখ এবং সমৃদ্ধি লাভ হইত; এমন কি, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিও কেবল ধাঁধার উত্তর দিয়া জীবন লাভ করিত। সুতরাং জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ইহার ব্যবহার হইত। ধাঁধার ভিতর দিয়া বৈদিক যাগযজ্ঞের মন্ত্র রচিত হইত, দেবতা এবং প্রকৃতিকে তুষ্ট করিবার জন্য পুরোহিত, অগ্নিহোতৃ এবং অধ্বর্যুগণ ধাঁধা এবং তাহাদের উত্তর দানের মধ্য দিয়া প্রার্থনা জানাইতেন।"[১]

সুতরাং ধাঁধাও প্রাচীনকালে প্রচলিত ও ব্যবহৃত একটি বিষয়রূপে সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল এবং তা সাহিত্যেরও একটি বিষয়রূপেও মান্যতা অর্জন করেছিল। ধাঁধা একটি দ্বন্দ্ব বা ধন্দমূলক বিষয়। ধাঁধার কিছু সাধারণ বিশেষত্ব আছে, যেমন-১. সাধারণত ছন্দে রচিত হলেও, কখনো কখনো গদ্যেও রচিত হতে দেখা যায়।২. প্রশ্নকর্তা ও উত্তরদাতা— এই যৌথপ্রথা ধাঁধার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।৩. ধাঁধায় থাকে শিক্ষানীয় দিক।৪. এতে থাকে গণিতের মতো সমাধান সূত্র।৫. এর মধ্যে উপমা ও রূপকধর্মিতা বহুল পরিমাণে থাকে।৬. বিষয় ভাবনার বাঁধা কোনও রীতি নেই, যেকোন বিষয় নিয়েই ধাঁধা রচিত হতে পারে।৭. উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় ধাঁধার মধ্যে থাকে।৮। ধাঁধার অন্যতম গুণসংক্ষিপ্ততা। ৯। অনেক ক্ষেত্রেই ধাঁধার মধ্যে একটা আক্রমণাত্মক ভাব থাকে। ইত্যাদি।সব মিলিয়ে ধাঁধা পরীক্ষাকেন্দ্রিক বিষয়, একজন প্রশ্নকর্তা এবং একজন উত্তরদাতার দ্বারাই ধাঁধার সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায়। ধাঁধা পৃথিবীর সর্বত্রই একটি পরিচিত বিষয়। ধাঁধার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে- "A

periphrastic presentation of an unmetioned subject the design of which is to excite the reader or hearer to the discovery of the meaning hidden under a studies obscurity of expression."[২]এ সংজ্ঞাটি একেবারে লৌকিক স্তরে প্রচলিত জনসমাজের ধাঁধা চর্চাকে সামনে রেখেই রচিত বলেই মনে করা যায়।

ধাঁধা যেকোন বিষয় নিয়েই রচিত হতে পারে। ধাঁধার নানাবিষয়মুখী প্রবণতা লক্ষ করা যায়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু বিষয় হল— ১. পৌরাণিক কাহিনি নির্ভর।২. পশু-পাখি বিষয়ক।৩. ঘর-গৃহস্থালি বিষয়ক।৪. চাষ-বাস-কৃষি বিষয়ক। ৫. প্রকৃতিকেন্দ্রিক। ৬. পেশা কেন্দ্রিক। ৭. বৃক্ষ-গাছ-পালা বিষয়ক। ইত্যাদি।

সাধারণত ধাঁধার বিষয়-বিন্যাসের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা বলতে বিশেষ কিছু নেই। যে কোনো কিছুই বিষয় হতে পারে। শুধু তার উত্তর যুক্তিনির্ভর হতে হবে।

ধাঁধা একটি মৌখিক লোকসাহিত্যভুক্ত বিষয়। এবং সেই লোকায়ত জীবনে প্রকৃতিকেন্দ্রিক তথা প্রকৃতজাত গাছ-পালা, ফুল-ফল প্রভৃতি নিয়ে ধাঁধার একটি বৃহত্তর পরিসর তৈরি হয়েছে। ধাঁধায় এমন সব গাছ-পালার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়, যা আমাদের অতি পরিচিত এবং গ্রাম জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত অত্যন্ত চেনা, যাকে বর্জন করে গ্রামজীবন অচল। ধাঁধায় পরিচিত গাছ-পালা রূপক ও উপমার অন্তর্জালে কি অসামান্য রূপে উপস্থাপনা এবং তার গূঢ়ার্থ কি সহজেই ধাঁধার উত্তরে প্রকাশ পায়, এ যেন দুর্বোধ্য আধুনিক কবিতার মতো একটি প্রকৃষ্ট উপলব্ধির আনন্দময় প্রকাশের দিগবলয়। জীবনের সঙ্গে বাঁশের সম্পর্ক কালথেকেকালান্তরে।

বাঁশের মতো দরকারী বৃক্ষ নেই বললেই চলে। জন্ম থেকে মৃত্যু, মানুষের প্রাত্যহিক জীবন চর্চায় বাঁশের বিকল্প নেই, সেই বাঁশকে অবলম্বন করে সৃষ্টি হয়েছে বহু ধাঁধা। যেমন-

১. দীর্ঘতম তৃণ বল কি আছে ধরায়, / খাড়াভাবে উর্ধ্বমুখে সদাই দাঁড়ায়।
২. ছেলেবেলায় পরে জামা, / বড় হলে ন্যাংটা মামা।
৩. যৌবনেতে ঘোমটা দিয়ে থাকে শ্বশুর বাড়ি, / বৃদ্ধকালে ন্যাংটা হয়ে পড়ে না আর শাড়ি।
৪. বাল্যকালে উলঙ্গ / বুড়ো বয়সে জটাধারী / মাঝে মাঝে সুরঙ্গ।
৫. গাছের নাম নবডং / পাতার নাম চৌডং, / যদি গাছে ফুল হয়, / হাজার টাকার মূল হয়।

বাঁশগাছ সম্পর্কিত ধাঁধায় বাঁশের প্রথম অবস্থা থেকে বাড়-বৃদ্ধি পর্যন্ত কালের বিবর্তনের দিকটিকে তুলে ধরা হয়েছে।বাঁশ যখন ঝাড়ে জন্ম নেয়, তখন তাকে কোঁড়া বা কোড়ক বলা হয়। সেই কোড়ক থাকে মোড়কে আচ্ছাদিত, সেইআচ্ছাদনকে কোথাও বলা হচ্ছে

জামা, কোথাও বা বস্ত্র। যেমন-হাওড়া-হুগলিতে বলা হয়েছে 'জামা' কিন্তু পূর্ববঙ্গের (অধুনা বাংলাদেশ) চট্টগ্রামে 'বস্ত্র'। চট্টগ্রামেরর ধাঁধাটি এরূপ-

পোআকালে বস্ত্রধারী / যোয়ানকালে উলঙ্গ / বুড়াকালে জটাধারী / মইধ্যে মইধ্যে সুরঙ্গ।

আমাদের ধাঁধাকাররা কত সচেতন, হাতের কাছে, বাড়ির আশে-পাশে বহু জানা-অজানা গাছের ঠিকানা তাঁদের কাছে পাওয়া যায়। এমন অনেক গাছ আছে, যা প্রতিদিনই সাধারণ মানুষের চোখে পড়ে। সেগুলিকে নিয়েই রচিত হয় ধাঁধা। যেমন-'সজিনাগাছ' সজনে, সংস্কৃতে যাকে 'শোভাঞ্জন' বলা হয়েছে। সেই সজনে গাছকে নিয়েও ধাঁধা রচিত হয়েছে। যথা-

১. জন্মকালে মুড়ি আমি / শৈশবকালে খৈ, / যৌবনকালে লাঠি হয়ে / গাছের মধ্যে রই।
২. এক গাছে তিন তরকারি / দাঁড়িয়ে আছে লালবিহারী।
৩. পৌষ মাসে পুষ্প / মাঘ মাসে জটাধারী, / ফাগুন মাসে ফাটলো মাথা / মোদের ঘরে তার তরকারী।

একটি সামান্য গাছকে (সজনে) মানবিকরূপে রূপান্তরিত করে, গাছের ফুল-ফলকে রূপকের অন্তরালে যেভাবে পেশ করা হয়েছে, তা সত্যিই অসাধারণ। সজনে গাছে যখন সদ্য কুঁড়ি হয় তখন তা সাদা মুড়ির মতো, যা প্রতিটি বাঙালিরই অতি প্রিয় খাদ্য। তারপর সেই কুঁড়ি প্রস্ফুটিত হয়ে ফুলে পরিণত হলে তা বাঙালির আর এক পরিচিত খাদ্য খৈয়ের মতো দেখতে হয়। এবং শেষে সেই ফুল থেকে সজনের লম্বা লম্বা সুন্দর ডাঁটা বের হয়, যা সরু লাঠি সদৃশ। আমাদের পরিচিত বিষয়েরই রূপকে সজনেকে উপস্থাপিত করা হয়েছে ধাঁধার মধ্যে। আবার সজনের 'লালবিহারী'নামকরণের মধ্য দিয়ে তার মধ্যে মানবীয়তা আরোপ করা হয়েছে।

আমাদের পরিচিত গাছ-পালা, ফুল-ফল কম নেই। সেইসব অতি পরিচিত বৃক্ষ হিসাবে কদলী বৃক্ষকেও ধাঁধার অনুষঙ্গে জায়গা দেওয়া হয়েছে। কলা কিংবা কলাগাছ সম্পর্কিত বেশ কিছু ধাঁধা রয়েছে। কলার গাছ এবং ফল পবিত্র হিসেবে মানা হয়, সব ধরণের শুভ কাজে ব্যবহৃত হয়। খেতেও সুস্বাদু, আমরা সবাই খেতে পছন্দ করি। পাকাকলা ফল হিসেবে, কাঁচা অবস্থায় তরকারী হিসেবে রান্না করে খাওয়া হয়। কিন্তু এই সুমিষ্ট ফলকেই যখন অন্য কেউ খেতে বলে তখন আমরা রেগে যাই কিংবা অপমানিত বোধ করি। সেই প্রসঙ্গটি একটি ধাঁধায় তুলে ধরা হয়েছে—

পাকাতেও খান, কাঁচাতেও খান, / খেতে বললে চটে যান।

আরো কিছু কলা সম্পর্কিত ধাঁধা—

১. এক গাছে তিন তরকারি / গাছটি বড়ই দরকারি।

বিকল্প-

একগাছে তিন তরকারি / তার নাম রাসবিহারী।

২. বাপ রয়েছে পেটে / পুত্র গেছে হাটে।

৩. এত্তি গেনু, উত্তি গেনু, গেনু চিলকার হাট, / একলা বুড়ির দেখি আসিনু যোল্লো কোণা দাঁত।

৪. মায় মরছে কাল, / পোলা হইছে আজ।

১ নং ধাঁধার উত্তর- কলাগাছ। এই গাছের মোচা, থোড় ও কলা রান্না করে খাওয়া হয় অর্থাৎ একই গাছ মানুষের খাদ্যাভ্যাসে তিনরূপে ব্যবহার করা যায়।

২ নং ধাঁধার সমাধান- মোচা বা কলার ছড়া। গাছের কাণ্ড বা থোড় গাছের মাঝখানে থাকে, যা পেটে বলা হয়েছে এবং কলা বা মোচা বিক্রি করা হয়, সেই অর্থে হাটের কথা উঠে এসেছে ধাঁধাটিতে।

৩ নং ধাঁধার সমাধান হিসেবে জানা যায়- কলার ছড়া বা মোচা (মোচার ভিতরে সার সার দাঁত সদৃশ বলে)। দাঁতের রূপকে' বা উপমায় কলার মোচা/ছড়াকে বোঝানো হয়েছে।

৪ নং ধাঁধার উত্তর কলাগাছের চারা—কলাগাছ কাটার খুব অল্প সময়ের মধ্যেই নতুন চারাগাছ জন্মায়।

"ধাঁধায় অসম্ভবকে সম্ভব করার প্রচেষ্টাও লক্ষণীয়। মনুষ্য জগতে পিতার জন্মের আগে পুত্র কখনই হয় না। সব পিতার মধ্যে আগামী বংশধর ঘুমিয়ে থাকে। সেখানে পিতার পূর্বে পুত্রের জন্ম অস্বাভাবিক ব্যাপার... কলা ও কলার থোড়কে দিয়ে সেই অস্বাভাবিক ঘটনাকে স্বাভাবিক করা হয়েছে। পারিবারিক সম্পর্ক সুস্পষ্ট কিন্তু চারিত্রিক বৈপরীত্য সৃষ্টি করা হয়েছে। থোড় পিতা আর কলা পুত্র। থোড়কে না কেটেই কলার কাঁদি কেটে হাটে-বাজারে বিক্রি হতে চলে গেল। তাই পিতার আগে পুত্রের জন্ম বলা হয়েছে। এখানে পিতা ও পুত্রের পারিবারিক সম্পর্কই মানবিক দিকটিতে দৃশ্যায়িত করেছে, অসম্ভব ঘটনার মধ্যে দিয়ে। এর ফলে যেমন সম্পর্ক জীবন্ত হয়ে উঠেছে তেমনি লালবিহারী, রাসবিহারী... প্রভৃতি নামকরণ করে সমাজে বিশেষ ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিতকরণ করা হয়েছে।...আবার এই কলার ছড়াকে এক বুড়ির দাঁত হিসেবেও উল্লেখ করা হয়েছে।"[৩]

আমাদের বাংলাদেশে বেলের ব্যবহার সাহিত্য-সংস্কৃতিতে কম নয়। বেল ধাঁধারও অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছে। যেমন-

১। ফুলতো কাঞ্চন, ফলতো বেল / বড়ো বড়ো পণ্ডিতের লেগে যায় ভেল। — উত্তর : বেল

২। কোন গাছে মরার মাথা, / একথা যে বলতে না পারে সে একটা গাধা। — উত্তর : বেল গাছ

৩। তিন তিরিক্কা পাতা সর্বডালে কাঁটা, / খেতে লাগে মজা, মুখে লাগে আঠা। — উত্তর বেল

লংকা চেনেন না এমন মানুষ কম আছে, কিন্তু সবাই লংকা গাছ সেভাবে চেনেন না। কাঁচালঙ্কা সবুজ, পাকলে লাল টকটকে। সেই লংকাও ধাঁধায় স্থান করে নিয়েছে তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের কারণে। —

১. একটুখানি গাছে। / রাঙা বৌটি নাচে।

২. এত টুকুন গাছে,/ লাল বাবু ঝুলে।

লংকাগাছ উচ্চতায় বৃহৎ নয়, গাছটি ডালপালাবিশিষ্ট, ফুল ছোট সাদা। কাঁচা লংকা সাধারণত সবুজ, পাকলে লাল রঙের হয়, টকটকে লালই বলা চলে। সেই লাল লংকা যখন গাছের ডালে, ঝোলে। সেই ঝুলন্ত লংকাটির মনুষ্যরূপের সদৃশ 'রাঙাবৌ' কিংবা 'লালবাবু' রূপের আবরণের মধ্যেই ধাঁধার ফলাফল প্রকাশ হয়ে যায়।

'লংকা' নিয়ে আরও বহু ধাঁধা রয়েছে। যেমন— শ্যামচরণের ছোট্ট খোকা/ করে থস্ থস্/ বয়সকালে টুকটুকে লাল,/ রাগে গস্ গস্।

কিংবাআর একটি ধাঁধায় বলা হয়েছে-মা ঝাঁপড়ি,/ বিটি সুন্দরী।

একটি গাছও তার ফলকে ধাঁধার আধারে অসাধারণ কৌশলে প্রয়োগ করে বাংলা ধাঁধার গুণমানকে যেভাবে সমৃদ্ধ করেছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়। 'লংকা' সম্পর্কিত ব্যাখ্যা সম্পর্কে জানা যায়-

"লঙ্কা গাছটি হচ্ছে মা আর লঙ্কা পাকলে লাল হয়তাই সুন্দরী বেটি। ঘন সবুজ পাতার ঝোপে হঠাৎ লাল লঙ্কা সুন্দরই লাগে। আর গাছতো সারা বিশ্বে মানবিক চরিত্র হিসেবেই চিহ্নিত। গাছ আর নারী উভয়েই ফলবতী হওয়ার কারণে সমীকৃত হয়ে গেছে সংস্কৃতির ধারায়। পাকা লংকা শুধু কন্যাই নয়... সুন্দরী বঙ্গবধূও বটে। রাঙা অর্থে ফর্সা এখানে লাল রংকেই ফর্সা ধরা হয়েছে। গাছটি নড়লেই লংকাগুলো নড়তে থাকে, তাই সেটাকে সুন্দরী বউয়ের নাচনের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। সমাজে অল্পবয়সী সুন্দরী স্ত্রী যদি হয়, তাহলে তার বয়স ধর্মের চাপল্য সুযোগ পেলেই বেরিয়ে পড়ে। লংকা যখন পুরুষ... তখন সে নাম বিশিষ্ট না হলে সমাজে পরিচিত থাকে না। তার ওপর যদি ফর্সা ও সুপুরুষ হয়, তবে তো উপযুক্ত নামও হওয়া চাই, তাই লালবাবু। লাল শব্দটা পাকা লংকার রংকেই স্মরণ করিয়ে দেয় এবং ঝালের মেজাজটাও তো থাকা চাই, কারণ প্রকৃতিতে অনেক ফলই আছে পাকলে লাল হয় কিন্তু মেজজাটা লংকার আছে তার নেই। লংকা যখন ছোট খোকা, তখন শ্যামবর্ণ কৃষ্ণ স্বরূপ। কারণ সব শিশুই মা রূপ যশোদার কাছে কৃষ্ণ, সে ফর্সাই হোক আর কালোই হোক, বাৎসল্য রসের আধিক্য থাকে। তখন চলন ফেরন স্থূলকায়ের জন্য থস্ থস্ অর্থাৎ লংকার ঝাঁজটা বয়সকালেই প্রকাশ পায়। তাই ঝাঁজ ও ঝাল যখন সে লাল বর্ণ ধারণ করবে।...তাই লংকার সব অবস্থাতেই মানবিক বৈশিষ্ট্যগুলো আরোপিত হলেও উভয়কে স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য থেকে যেন আলাদা করা যায় না।"[৪]

আমাদের অতি পরিচিত আর একটি গাছ ও ফল হল নারকেল। ধাঁধাকাররা নারকেলও ধাঁধার মধ্যে ঠাঁই দিয়েছেন।—

১। খালে বিলে জল নেই / গাছের আগায় জল।

২। হে ভগবান করলে কি / গাছে ঝোলে ঠাণ্ডা জল।

৩। আকাশ পবন দড়ি / মিল কুমারের হাঁড়ি। / বিনা মেঘে জল / তোরা কি বলছিস বল।

৪। হাঁড়ার উপর হাঁড়া / তাতে নীল কমলের দাঁড়া, / তাতে কালো মেঘের জল / তাতে বিনা দুধের দই, / এমন গোয়ালা কই।

গাছের উপরে ঠাণ্ডা জল পাওয়া যায় নাকি? অথচ ধাঁধায় এরকম হেঁয়ালি করা হয়, এবং যার উত্তর মানুষের নিত্যদিনের অভিজ্ঞতার বাইরে নয়। নারিকেল গাছের সঙ্গে সবাই পরিচিত। তার ফল কচি অবস্থায় ‘ডাব’ এবং পরিণতিতে যার নাম ‘নারকেল’। সেই ডাব বা নারকেলের মধ্যে সুস্বাদু ঠাণ্ডা জল আর শাঁস আমরা পেয়ে থাকি, পান করে থাকি। আর সেই জল যে গাছের উপরে থাকতে পারে, তা তাৎক্ষণিক উপলব্ধিতে আসে না। কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে বসবাস করায় তা সহজেই উত্তর হয়ে চলে আসে। আর এখানেই ধাঁধার প্রকৃত রস ও সার্থকতার বিষয়টি বর্তমান।

শুধু অতি পরিচিত গাছই নয়, অনেক স্বল্প চেনা গাছও বাংলা ধাঁধায় স্থান পেয়েছে। যেমন-

১। গাছটি ভরে যায় সহস্র ফলে / বীজে হয় না, গাছ হয় ডালে।— উত্তর : জামরুল

২। আল্লার কি কুদরত, / লাঠির ভিতর শরবত। — উত্তর : আখ। ইত্যাদি

এরকম অল্প পরিচিত, অতি পরিচিত বহু গাছ ও তার ফল ধাঁধার রাজ্যে স্থান পেয়েছে তাদের গুণগত ধর্মকে সামনে রেখে। হিসেবমতো বিচার করে দেখা যায় ধাঁধায় এদের ব্যবহার এবং এর উত্তরের সমাধানও যুক্তিসঙ্গতভাবে মিলে যায়। জোড়াতালি দিয়ে বোঝানোর কোনও চেষ্টা নেই। গাছ নিয়ে ধাঁধার যেন একটি আখ্যান গড়ে উঠেছে, সেখানে রয়েছে জানা অজানা অসংখ্য গাছ-পালা ও ফুল-ফলের সমাহার। কেন এই গাছ-পালার সমাদর ধাঁধা রচনার ক্ষেত্রে? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা চলে গাছ-পালার প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানবৃক্ষ আগামী থেকে অর্বাচীনকালের পরিধি পর্যন্ত ব্যাপ্ত। সব মানুষই গাছের বপন থেকে শুরু করে নিধন পর্যন্ত অবহিত কম বেশি। আর যেহেতু ধাঁধা ভারবাহী নয়, একেবারে বস্তুধর্মী এবং মানুষ ও বৃক্ষ তথা গাছ-পালা এতো নিবিড়ভাবে ও অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত, যাকে উপলব্ধি করতে মানুষের বোধবুদ্ধিতে সমস্যা হয় না। যদিও আজকাল ধাঁধা চর্চা সেভাবে হয় না। আদিম মানুষ তাঁদের অবসর বিনোদনের বিষয় হিসেবে ধাঁধা চর্চায় ব্যস্ত থাকতেন। সেই অবসরেই নিজেদের জ্ঞান ও বুদ্ধির বিকাশেরও একটি মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করতেন। দেখা গেছে বিবাহ-অনুষ্ঠানে, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কিংবা কাউকে তার মেধা পরীক্ষণে ধাঁধার প্রচলন ছিল সগৌরবে। আর

এই ধাঁধা চর্চা পৃথিবীর সব দেশেই সব সম্প্রদায়ের মধ্যে সচল ছিল। আমাদের প্রতিবেশী আদিবাসীদের বিবাহে ধাঁধা একটি বিশিষ্ট সংস্কৃতির পর্যায়ে পড়ে। সুতরাং ‘ধাঁধা’ মানুষের জীবনে একটি অবসরকালীন সংস্কৃতি হলেও এর মধ্য দিয়ে যে বুদ্ধির বিকাশ সাধিত হয়, এ নিয়ে কোনো সংশয় নেই। বিগত শতকে প্রকাশিত শিশুসাহিত্য বিষয়ক পত্রিকাতেও নিত্য-নতুন ধাঁধা প্রকাশিত হত, এবং যাঁরা সঠিক উত্তর দিতে পারতেন, তাঁদের নামও প্রকাশের একটা ব্যবস্থা ছিল, যা শিশু-কিশোরদের কাছে ছিল একটি আকর্ষণীয় বিষয়। একই সঙ্গে মেধা ও বুদ্ধির বিকাশ এবং একটি সাংস্কৃতিক বস্তুগত চেতনারও জগৎ উদ্বোধিত করতে সাহায্য করতো ‘ধাঁধা’। সুতরাং ধাঁধা কেবল আনন্দযজ্ঞের বিষয় নয়, ধাঁধা মানুষের জ্ঞান চেতনারও অমৃতফল।

তথ্যসূত্র:

১. দুলাল চৌধুরী ও পল্লব সেনগুপ্ত সম্পাদিত লোকসংস্কৃতিরবিশ্বকোষ,পুস্তক বিপণি, ২০২২, পৃঃ-৮৭

২. Maria Leach Editor, Standrad Dictionary of Folklore, Mythology and Legend, New York, 1949, p-944

৩ সর্বাণীরায়, মানুষ, প্রকৃতি ও প্রাণীজগত :লোকসংস্কৃতির দর্পণে, পুস্তক বিপণি, ২০০২, পৃঃ-২৬৮-১৬৯

৪. ঐ, পৃঃ-২৬৯-১৭০

দুর্গাপুর বাঁধ, আঞ্চলিক অর্থনীতি ও পরিবেশ: একটি পর্যালোচনা

জয়দীপ ঘোষ
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
বিদ্যাসাগর কলেজ ফর উইমেন

সারাংশ: নদীকেন্দ্রিক সভ্যতা সুপ্রাচীন কাল থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠেছে। দামোদর নদ ও তার সুবৃহৎ অববাহিকাকে কেন্দ্র করে বহু পূর্ব থেকেই মানুষের জীবন-জীবিকা নির্বাহ হত। দামোদর ছিল বর্ধমানের প্রধান নদ। এখানকার কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির পিছনে দামোদরের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। উপনিবেশিক পর্বেও দামোদর নদকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল যদিও সেগুলি আশানুরূপ ছিল না। স্বাধীনতাত্তোর পর্বে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে যে সমস্ত বহুমুখী নদী পরিকল্পনার প্রকল্প গৃহীত হয়েছিল, দামোদর নদ পরিকল্পনা ছিল তার অন্যতম। **১৯৪৮** সালে তৈরী হয় D.V.C. বা 'দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন'। ডি.ভি.সি'র বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যে অন্যতম প্রকল্প ছিল দুর্গাপুর বাঁধ নির্মাণ। বিদ্যুৎ উৎপাদন, সেচের জন্য জল সরবরাহ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, প্রমোদ ভ্রমণ প্রভৃতি একাধিক উদ্দেশ্য নিয়ে এই প্রকল্প রচিত হয়েছিল। দুর্গাপুর বাঁধ নির্মিত হলে বর্ধমান জেলার অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হয়। কৃষিজ ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, পূর্বের তুলনায় বন্যাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। তবে পরিবেশের উপর এর কিছু নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। এই প্রবন্ধে দুর্গাপুর বাঁধ নির্মাণের প্রেক্ষাপট ও তার প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।
সূচক শব্দ: দামোদর, বন্যা, মহামারী, সেচকার্য, বাস্তুতন্ত্র, উন্নয়ন।
নদীর সঙ্গে সভ্যতার সম্পর্ক সুপ্রাচীন। নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল অনেক সভ্যতা। মানুষ নদীর জল-সম্পদকে ব্যবহার করে আসছে স্মরণাতীত কাল থেকেই। নদী বা জলাশয়কে কেন্দ্র করে কৃষির ইতিহাসও খুব প্রাচীন। নদীর জলকে বিভিন্ন প্রয়োজনে ধরে রেখে মানুষ তার চাহিদা পূরণ করেছে। নদী যেমন কোন সভ্যতাকে শস্য-শ্যামলা করে তোলে, তেমনি নদীর ভয়ঙ্কর প্লাবন আবার অনেক সময়ে ধ্বংসের কারণও হয়ে দাঁড়ায়। প্লাবন থেকে উদ্ভূত জমা জল প্লেগ, মহামারী প্রভৃতি একাধিক রোগের সৃষ্টি করে, যা মানুষের জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে। এজন্য মানুষ বরাবরই চেষ্টা করে এসেছে নদীকে নিয়ন্ত্রণ করার। নদীতে বাঁধ দিয়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করার প্রচেষ্টা এর উদাহরণ। মানুষ নিজের প্রয়োজনে নদীকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায় - এই ভাবনা থেকেই শুরু হয়েছে নদী বাঁধ নির্মাণ ও নদীকে কেন্দ্র করে একাধিক পরিকল্পনা গ্রহণ। নদী বাঁধ নির্মাণ বা নদীতে নিয়ন্ত্রণ করার বিভিন্ন পদ্ধতি স্থানীয় অর্থনীতি ও

আঞ্চলিক স্তরে পরিবেশের পরিবর্তন ঘটায়। তাই নদী বাঁধ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত পরিবর্তনের দিকটিও চলে আসে। আলোচ্য প্রবন্ধে দুর্গাপুর বাঁধ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সমগ্র প্রবন্ধে কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর দেবার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। এগুলি হল - দুর্গাপুর বাঁধ নির্মাণের প্রকৃত কারণ কী? দুর্গাপুর বাঁধের বৈশিষ্ট্য এবং নদীতে বাঁধ নির্মাণের পর দুর্গাপুর এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত কী পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল?

দুর্গাপুর বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে দামোদর নদের উপরে যা সাধারণত 'দুর্গাপুর ব্যারেজ' নামে পরিচিত। দুর্গাপুর বাঁধ নির্মাণ শুরু হয়েছিল **১৯৫২** খ্রিঃ এবং এর নির্মাণ কার্য শেষ হয়েছিল **১৯৫৫** খ্রিস্টাব্দে।[১] এখন প্রশ্ন হল দুর্গাপুরে দামোদর নদের উপর বাঁধ বা 'ব্যারেজ' কেন নির্মাণ করা হয়? দামোদর নদ ছোটনাগপুর মালভূমির উষ্ণ প্রস্রবণ থেকে উৎপন্ন হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে হুগলী নদীতে মিশেছে। দামোদর ছিল স্থানীয় সাঁওতালদের কাছে 'পবিত্র' নদ।[২] জল, জঙ্গল ও জমিন কে কেন্দ্র করে এদের জীবন অতিবাহিত হত। দামোদর নদ অববাহিকায় প্রচুর শস্য উৎপাদনের পিছনে এই নদের জল সম্পদের যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু অতিরিক্ত বন্যার ফলে এই নদ বারংবার প্লাবিত হত। অতীতকাল থেকেই দামোদরে একাধিকবার বন্যা দেখা দিয়েছে এবং জীবন ও শস্য হানি হয়েছে। দামোদর নদে বারবার বন্যার ফলে উপকূল অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্থ হতে থাকে। তাই উপনিবেশিক পর্ব থেকেই দামোদর নদের উপর বাঁধ নির্মাণ বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয়। এই চিন্তাভাবনা আরো তীব্র হয় যখন **১৯৪৩** খ্রিঃ জুলাই মাসে প্রবল বন্যায় নদের বাম তীর ভেঙে যায় এবং পূর্ব রেল ও গ্রান্ট ট্রাঙ্ক রোডের ক্ষতি সাধন হয়।[৩] **১৯৪৫-৪৬** খ্রিঃ ভারত সরকার বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য 'টেনেসি ভ্যালি অথরিটি'র বিশেষজ্ঞ Voorduin কে নিযুক্ত করেন একটি পরিকল্পনা তৈরীর জন্য। তিনি বিস্তৃত দামোদর উপত্যকার উপর একটি স্কীম তৈরী করেন।[৪] স্বাধীনতার পর দামোদর নদকে কেন্দ্র করে যে 'Unified Development Scheme' তৈরী হয়, তাকে Voorduin প্রস্তাবিত প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ রূপ বলা যেতে পারে। দুর্গাপুর বাঁধ নির্মাণ ছিল ডি.ভি.সি প্রকল্পেরই একটা অংশ। উপনিবেশিক পর্বে দামোদর নদের উপর বাঁধ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হলেও তা বাস্তবে সেভাবে রূপায়িত হয়নি। উপনিবেশিক সরকারের শোষনমূলক নীতি এর পক্ষে সায় দেয়নি।

স্বাধীনতাত্তোর পর্বে দেশের অর্থনৈতিক মানোন্নয়নের জন্য এবং নদীর জলকে বহুমুখী উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য ভারত সরকার কর্তৃক একাধিক পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। যেমন 'ভাকরা-নাঙ্গাল প্রজেক্ট (পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান), হীরাকুঁদ প্রজেক্ট (ওড়িশা), চম্বল ভ্যালি প্রজেক্ট (মধ্যপ্রদেশ) তুঙ্গভদ্রা প্রজেক্ট (অন্ধপ্রদেশ), নাগার্জুন সাগর প্রজেক্ট (অন্ধ্রপ্রদেশ), গন্ডক ভ্যালি প্রজেক্ট (বিহার) ইত্যাদি। স্বাধীনতার পর ভারতের অন্যতম ও গুরুত্বপূর্ণ নদী পরিকল্পনা ছিল 'দামোদর ভ্যালি প্রজেক্ট' (পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার)। এগুলি ছিল বহুমুখী নদী পরিকল্পনা। এই সকল পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল বন্যা

নিয়ন্ত্রণ, সেচ কার্য পরিচালনা, জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন, মৎস্যচাষ ইত্যাদি।[৫] সুতরাং বলা যায় নদ-নদীর জলকে সঠিক পদ্ধতিতে ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়াস চালানো হয়েছিল। অর্থাৎ দুর্গাপুর বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমেও বন্যা নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি বহুমুখী উদ্দেশ্য সাধনের প্রচেষ্টা করা হয়েছিল।

দুর্গাপুর বাঁধের কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল। সমগ্র বাঁধটি কংক্রীটের তৈরী। এর বামদিকে ৮৫ মাইল ও ডান দিকে ৫৫ মাইল দীর্ঘ সেচ ও নৌ-পরিবহন যোগ্য ‘ক্যানাল’ রয়েছে। এছাড়া আরো ছোটখাটো শাখা চ্যানেল এই বাঁধের সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে। দুর্গাপুর বাঁধের দৈর্ঘ্য ২২৭১ ফুট এবং উচ্চতা ৩৮ ফুট। বাঁধটি উচ্চ দামোদর উপত্যকা থেকে আগত জলকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং প্রয়োজনীয় সেচ ক্যানেলের মধ্যে পাঠায়। এই ক্যানেল সেচ দ্বারা খারিফ শস্যের সময় ৯৭০০০ একর জমিতে এবং রবি শস্যের সময় ১,০০,০০০ একর জমিতে চাষ সম্পন্ন হয়। সর্বোচ্চ ৫৫০,০০০ কিউসেক জল দুর্গাপুর বাঁধ থেকে ছাড়া হয়।[৬] বামতীরের সেচ ক্যানাল দ্বারা পশ্চিমবঙ্গের কয়লাখনি অঞ্চলের সঙ্গে কলকাতারও একটি পরিবর্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে। দামোদরের বামতীরের উপত্যকায় অধিকাংশ শিল্প কারখানা অবস্থিত। এই শিল্পগুলি জলের জন্য এই ক্যানালগুলির উপর নির্ভরশীল।

ডি.ভি.সি’র অধীনে ব্যারেজ ও ইরিগেশন প্রজক্টেরেই একটা অংশ হল দুর্গাপুর বাঁধ নির্মাণ পরিকল্পনা। দামোদর নদে বার্ষিক বন্যার জল নির্গমন হয় ৬-১/২ লাখ কিউসেক। ব্যারেজ নির্মাণের সময় এই বিষয়টিকে নজরে রাখা হয়। ব্যারেজের ডান ও বাম দিকে জলের গতি নিয়ন্ত্রণকারী দুটি ‘হেড রেগুলেটর’ অবস্থান করছে। বাম দিকের হেড রেগুলেটর খারিফ শস্যের সময়ে ১৯৪৭ কিউসেক জল বহির্গমন করে। এই দুটি হেড রেগুলেটর নৌ পরিবহনযোগ্য ক্যানাল ব্যবস্থার প্রধান নিয়ন্ত্রক। ব্যারেজের কাজ সম্পন্ন হবার পর ব্যারেজের উপর দিয়ে ‘রোড ব্রিজ’ তৈরী করা হয় যেটি ২২ ফুট চওড়া। এটি বর্ধমান ও বাঁকুড়ার যোগাযোগ ব্যবস্থাকে অনেক সুবিধাজনক করে তুলেছে। বামতীরের প্রধান ক্যানালটি দামোদরের সঙ্গে একটি ‘লক–গেট’ দ্বারা সংযুক্ত রয়েছে।[৭] দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়ে এখানে Steel Plant, Coke Oven Plant এবং বিভিন্ন শিল্প কারখানার পত্তন হয়।

এখন দুর্গাপুর বাঁধ নির্মানের প্রভাব জনজীবনের উপর কী রকম পড়েছিল তা আলোচনা করবো। দুর্গাপুর ব্যারেজ নিঃসন্দেহে মানব কল্যাণের কাজে সহায়তা হয়েছে। দুর্গাপুর বাঁধ সেচ কল্যাণের কাজে সহায়তা করেছে, বন্যা নিয়ন্ত্রণের সহায়ক হয়েছে। ব্যারেজ থেকে নির্গত দুটি ক্যানেল দ্বারা ১০,২৬,০০০ একর জমিতে সেচ কার্য সম্ভবপর হয়েছে। বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলী ও হাওড়া – এই চারটি জেলার সেচকার্যে সহায়তা করেছে দুর্গাপুর ব্যারেজ প্রকল্প।[৮]

দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে যে ক্যানাল গুলি খনন করা হয়েছে, সেগুলি হল আধুনিক ডিজাইনে তৈরী। এগুলিতে পলি পড়ে যাতে ভরাট না হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখা হয়েছিল। বিজ্ঞান সম্মতভাবে ক্যানালের ঢাল নির্ধারণ করা হয়েছিল, যাতে তা দীর্ঘস্থায়ী হয়। চাষযোগ্য এলাকা নির্দিষ্ট সময়ে ক্যানেলের জল দ্বারা পরিপূর্ণ হত। চাষযোগ্য এলাকাকে কতকগুলো ব্লকে ভাগ করা হয়েছিল। জল বিভিন্নস্থানে নিয়ে যাবার জন্য গ্রামবাসীরা নিজেদের উদ্যোগে কিছু 'চ্যানেল কাটতো। এই চ্যানেলগুলিতে জল আসত 'ক্যানাল' থেকে। শাখা ক্যানাল গুলিতে প্রয়োজনীয় জল সরবরাহ করত প্রধান ক্যানাল গুলি।[৯] গ্রাম চ্যানেল গুলি অনেক ক্ষেত্রে সরাসরি জমির সঙ্গে যুক্ত থাকত। গ্রামের কৃষকরা সেচের বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিল।

দুর্গাপুর 'ব্যারেজ নির্মিত হবার ফলে খারিফ ও রবি শস্য চাষ উভয়ই উপকৃত হয়েছিল। হুগলী, বর্ধমান ও হাওড়া জেলায় মূলত রবিশস্য উৎপাদনে সহায়ক হয়েছিল 'ক্যানাল'গুলি। সেচের জল দ্বারা ধান ছাড়া অন্যান্য শস্যও উৎপাদিত হত। অন্যান্য ফসলের মধ্যে গম, আলু, আখ, সব্জী প্রভৃতি ছিল অন্যতম। আসলে রবি শস্য বেশী হবার কারণ এখানকার মাটি। এখানকার মাটি ছিল রবি শস্য চাষের উপযোগী। এখানে রবিশস্য বেশী হবার কারণ ছিল এখানকার সমতলভূমি। বর্ধমান, হুগলী, বাঁকুড়ার প্রায় ৩,১৩,০০০ একর জমিতে রবিশস্যের চাষ হত।[১০] আর এই বিস্তৃত এলাকায় রবি শস্য চাষে সহায়তা করেছিল দামোদর নদ থেকে কাটা প্রধান ও শাখা 'ক্যানাল' গুলি।

দুর্গাপুর বাঁধ প্রকল্পের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নিম্ন দামোদর উপত্যকায় কৃষি কাজের জন্য সেচের জলের যোগান দেওয়া ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা। বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তার জন্য মৌসুমী বায়ুর আগমনের তারতম্যের কারণে প্রধান খাদ্যশস্য ধানের উৎপাদন ব্যহত হত। এমনকী কোন কোন বছর যে খরা হয়নি - তাও নয়। পূর্বে এ অঞ্চলে যে সেচ ব্যবস্থা ছিল, তা যথোপযুক্ত ছিল না। সেচ কার্যে জলের যোগান দেওয়া ছাড়াও দুর্গাপুর ব্যারেজের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল নিম্ন দামোদর উপত্যকায় নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি ঘটানো। এই দুটি উদ্দেশ্যই দুর্গাপুর ব্যারেজ তৈরী হবার পর সফল হয়েছিল। নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি ঘটার ফলে গ্রামাঞ্চলে সুস্থ জীবনের বিকাশ ঘটেছিল। এই প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বামতীরের ক্যানেল দ্বারা নৌ-পরিবহনের ব্যবস্থা করা। নৌ-পরিবহনের উন্নতি ঘটায় ছোট শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের পণ্য পরিবহনের সুবিধা হয়, কেননা রেলপথে পণ্য পরিবহন ছিল অপেক্ষাকৃত ব্যয় সাপেক্ষ। এছাড়া ক্যানাল পরিবহনের মাধ্যমে কয়লা ও অন্যান্য দ্রব্য বহনের সুবিধা হয়েছিল।[১১] ফলে সচল অর্থনীতি বিকশিত হয়েছিল বলা যেতে পারে। নৌ-পরিবহন দুর্গাপুর-আসানসোল অঞ্চলে শিল্প স্থাপনের সহায়ক হয়। কালক্রমে এই অঞ্চল 'ভারতের রূঢ়' নামে পরিচিতি লাভ করে। এক কথায় বলা যায় বর্ধমান জেলার আর্থ-সামাজিক বিকাশে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল দুর্গাপুর ব্যারেজ ও দামোদর নদের জলসম্পদ।

ডি.ভি.সি. প্রকল্প দুর্গাপুর শহরের বিকাশে সহায়তা করে। দুর্গাপুর ‘ব্যারেজ’ ও দুর্গাপুর থার্মাল পাওয়ার পরিকল্পনা কার্যকর হওয়ার পর দুর্গাপুরে গড়ে উঠতে থাকে একাধিক শিল্প। ১৯৫৫ খ্রিঃ দুর্গাপুর কোক ওভেন প্ল্যান্ট, ১৯৬৫ তে দুর্গাপুর স্টীল অ্যালয় প্ল্যান্ট আত্মপ্রকাশ করে।[১২] দুর্গাপুরে গঠিত হয় ডি.ভি.সি.’র কলোনী। এই সমস্ত শিল্পের বিকাশ দুর্গাপুরের অর্থনীতিকে পরিবর্তন করে দেয়। ১৯২০-১৯৫৫ পর্যন্ত দুর্গাপুরে নগরায়নের হার ছিল ধীর গতিতে। কিন্তু ডি.ভি.সি.’র প্রকল্পগুলি কার্যকর হবার পর থেকে গ্রামীণ বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তে দুর্গাপুরে শহরের বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটে উঠতে থাকে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে। বিশ শতকের ছয়ের দশকে দুর্গাপুরে গড়ে ওঠে একাধিক ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প। যেমন – ‘দুর্গাপুর কেমিকেল লিমিটেড, মাইনিং এ্যন্ড অ্যালায়েড মেসিনারী কর্পোরেশন, দুর্গাপুর ফাটিলাইজার কর্পোরেশন ইত্যাদি।[১৩] স্বাধীনতাত্তোর পর্বে দুর্গাপুরে যে শিল্পায়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়, তার পিছনে ছিল ডি.ভি.সি.’র বিদ্যুৎ ও জলসম্পদ। ছয় ও সাতের দশকে দুর্গাপুরে বেশ কিছু টাউনশিপ গড়ে ওঠে। দুর্গাপুরে গড়ে উঠতে থাকে বেশ কিছু বাজার এলাকা।

তবে দুর্গাপুর ব্যারেজ নির্মাণের কিছু নেতিবাচক প্রভাব পরিবেশের উপর পড়েছিল। নদ-নদী প্রাকৃতিক ছন্দে বয়ে চলে। নদীর উপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ শুরু হলে এই স্বাভাবিক ছন্দ বিনষ্ট হয়। স্বভাবতই জলজ প্রাণীর জীবনে নেমে আসে বিপর্যয়, নদীর উপর নির্ভরশীল মানুষের জীবনের উপরও প্রভাব ফেলে। পরিবর্তন আসে স্বাভাবিক বাস্তুতন্ত্রে। দুর্গাপুর ব্যারেজ নির্মাণ করলে প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রে পরিবর্তন আসে। অনেক স্থানীয় আদিবাসী মানুষকে উৎখাত হতে হয়। একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায় পূর্বে যে সমস্ত প্রাণী ও পক্ষী দামোদর নদ তীরবর্তী অঞ্চলে দেখা যেত, তাদের মধ্যে অনেক পক্ষী ও প্রাণী লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। জলবিদ্যুৎ ও তাপ বিদ্যুতের নিকটবর্তী অঞ্চলে এই প্রবণতা সর্বাধিক।[১৪] পরিবেশ দূষণের কারণেই প্রাণী ও পক্ষী বিলুপ্তির ঘটনা ঘটে। এছাড়া কলকারখানা তৈরী হবার ফলে বর্জ্য পদার্থ পড়ে জল দূষণের ঘটনাও ঘটে। থার্মাল পাওয়ারের ‘ফ্লাই অ্যাশ’ পরিবেশ দূষণের অন্যতম কারণ। ব্যারেজ সংক্রান্ত পরিকল্পনাকে কার্যকরী করতে গিয়ে পার্শ্ববর্তী বনাঞ্চলকেও নষ্ট করা হয়। জঙ্গল নির্ভর আদিবাসীদের জীবনে এর প্রভাব পড়ে। পুনর্বাসনের যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট ছিল না।

বাস্তুতন্ত্রের মূল ভিত্তি হল জীবজগত ও তাদের স্বাভাবিক বাসভূমি। কিন্তু প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার, নদীর স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ করা প্রভৃতি বিষয়গুলো পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। দামোদরের স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ করে, বাঁধ দিয়ে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের যে প্রক্রিয়া তার ফলে জলজ প্রাণীরা ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। বিভিন্ন নদী বাঁধ নির্মাণের পূর্বে দামোদর ও তার শাখানদী সমূহ ঘন জঙ্গলে ঢাকা ছিল। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তী পর্বে বিভিন্ন ‘ড্যাম’ তৈরী হতে থাকলে সমগ্র

অঞ্চলের স্বাভাবিক বাস্তুতন্ত্র ও পরিবেশের চিত্রটি বদলে যেতে শুরু করে। এর ফলে শুধু যে জলজ প্রাণী তা নয়, বৃহত্তর প্রাণী ও পক্ষী সমাজের উপরেও বিরূপ প্রভাব পড়তে থাকে।[১৫] এখন স্বাভাবিকভাবেই একটি প্রশ্ন উঠে আসে, সেটি হল তাহলে কী অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রক্রিয়া বন্ধ করে দিতে হবে? আসলে আধুনিক বিশ্বায়নের যুগে অর্থনৈতিক উন্নয়ন যেমন প্রয়োজন; তেমনই প্রয়োজন পরিবেশের সুরক্ষা। তাই পরিবেশের সুরক্ষা বজায় রেখে অর্থনৈতিক উন্নয়ন করলে তা হয়ে উঠবে প্রগতির সহায়ক। উৎখাত হওয়া মানুষদের সঠিক মাত্রায় পুনর্বাসন, তাদের বিকল্প জীবিকার প্রচেষ্টা করা, নতুন বনাঞ্চল সৃষ্টি, প্রভৃতির মাধ্যমে বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য অনেকটাই বজায় রাখা সম্ভব হবে। তাই অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা নদী বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশের সুরক্ষা বিষয়ক প্রকল্প গ্রহণ করলে তা প্রকৃত অর্থেই হয়ে উঠবে প্রগতির দিশারী।

তথ্যসূত্র:

১. *An out-line of the Damodar Valley Project*, D.V.C., 1966, P.10
২. J.C.K. Peterson, *Bengal District Gazetteers, Burdwan*, Govt. of West Bengal, Reprint 1994, P.6
৩. *Eight Years of DVC*, 1955, P.4
৪. R.B. Mandal, *Multipurpose River Valley Projects* in R.B. Mandal (ed), *Water Resources Management*, Concept Publishing Co., New Delhi, 2006. P.294-308
৫. *Ibid*, P.308
৬. *Completion Report of Durgapur Barrage*, Vol I, DVC, P.2
৭. *Ibid*, P.10
৮. *Durgapur Barrage and Canals: A Souvenir of the Opening Ceremony performed by Shri Sarvapalli Radhakrishnan*, DVC, Cal 1957, P.5
৯. *Ibid*, P.10-11
১০. *Ibid*, P.14-15
১১. *Ibid*, P.17-18
১২. Arun Kumar Singh, *Urbanisation and Administration of Urban Infrastructure*, Inter India Publication, New Delhi, 1990, P.29-30
১৩. Jugendra Sahai, *Urban Complex of an Industrial City*, Chugh Publication, Allahabad, 1980, P.56
১৪. *Record of the Zoological Survey of India*, Kolkata, 1911, P.1-29
১৫. *Ibid*, P.20-45

বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের ধারা

গার্গী চট্টোপাধ্যায়
স্টেট এডেড কলেজ টিচার – ক্যাটাগরি ১
আজাদ হিন্দ ফৌজ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, ডোমজুড়, হাওড়া

সারসংক্ষেপ: ইউরোপের প্রভাবে বাঙালির সচেতন ইতিহাস চর্চা শুরু হয়। টডের ' Annals and Antiquities of Rajasthan 'থেকে উপাদান সংগ্রহ করে মধুসূদন দত্ত, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রমুখ ঐতিহাসিক নাটক লিখেছেন।গিরিশচন্দ্র ঘোষ অশোকের সময় থেকে শুরু করে ইংরেজ শাসন পর্যন্ত বহু ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেছেন ।বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের যুগে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের ইতিহাস আশ্রয়ী নাটকগুলি জনপ্রিয় হয় ।যোগেশ চৌধুরী, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ,মন্মথ রায় প্রভৃতিদের ঐতিহাসিক নাটক বিশেষ স্বাতন্ত্র্যতার দাবি রাখে।

মূল শব্দ: অনুসন্ধান, বিবরণ ,তথ্য, চিরন্তন সত্য, জাতীয়তাবাদ, দেশাত্মবোধ, দেশপ্রেম।

মূল আলোচনা::

গ্রিক শব্দ Historia – র অর্থ ' অনুসন্ধান, জ্ঞান ও বিবরণ ' । প্রথম এই শব্দটি ব্যবহার করেন হেরোডাটাস । যে কোন বিষয় সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান হল ইতিহাসচর্চা । তবে ইতিহাস ব্যাখ্যা ও তথ্য আশ্রয়ী ,সাহিত্য অনুভব বা অভিজ্ঞতা মুখী, ইতিহাস জীবনকে ব্যাখ্যা করে, সাহিত্য তাকে অনুভব করায় ।ইতিহাস অতীতের কথা বলে ,বর্তমানের চোখ দিয়ে সে অতীতকে বিশ্লেষণ করছে তাতে তার সামগ্রিক চেহারা প্রকাশ করবার জন্যে। সাহিত্য অতীতকে আশ্রয় করবে কিনা সেটা তার ইচ্ছে, আশ্রয় করলে সে উদ্ধার করতে চায় কিছু চিরকালীন অনুভব যা বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে সহমর্মী করে তুলবে । ইতিহাস বলে নির্দিষ্ট তথ্যের কথা ,আর সাহিত্য বলে চিরন্তন সত্যের কথা । ইতিহাসের আগ্রহ সমাজবদ্ধ মানুষের প্রতি।ইতিহাস সমাজকে দেখতে চায় ব্যক্তির পটে ,আর সাহিত্য ব্যক্তিকে দেখতে চায় সমাজের পটে দাঁড় করিয়ে।

ইউরোপের প্রভাবে বাঙালীর সচেতন ইতিহাসচর্চা শুরু হয়। অষ্টাদশ শতকে বাংলায় গভর্নর হেনরি ভ্যান্সিটার্টের উৎসাহে বাংলায় ইতিহাস লেখেন সলিমুল্লা। ১৮০৬ থেকে ১৮১৮ – র মধ্যে রচিত হয় জেমস মিলের ' হিস্টরি অব ব্রিটিশ ইন্ডিয়া ' ,১৮৩৯ সালে প্রকাশিত মাউন্ট স্টুয়ার্ট এলফিনস্টোনের বিখ্যাত বই ' হিস্টরি অব ইন্ডিয়া' । তবে বাঙালী লেখকদের যে বইটি বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল তা হল টডের 'অ্যানালস অ্যান্ড অ্যান্টিকুইটিজ অফ রাজস্থান '– প্রথম খন্ডের প্রকাশ ১৮২৯ সালে, দ্বিতীয় খন্ড ১৮৩২ সালে ।

মধুসূদন দত্ত ' রিজিয়া ' নামে একটি ঐতিহাসিক নাটকের পরিকল্পনা করেও শেষ পর্যন্ত তিনি নাটকটি রচনা করেন নি।মুসলিম ইতিহাস ছেড়ে তিনি রাজপুত

ইতিহাস থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে লেখেন ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে 'কৃষ্ণকুমারী ' নাটক । কর্ণেল টডের ' Annals and Antiquities of Rajasthan ' থেকে কৃষ্ণকুমারী নাটকের উপাদান গ্রহণ করেন । কৃষ্ণকুমারী অপরূপা সুন্দরী – উদয়পুরের রাজা ভীমসিংহের কন্যা ।জয়পুরের রাজা জগৎসিংহ ও মরুদেশের রাজা মানসিংহ উভয়ে কৃষ্ণকুমারীকে লাভ করবার জন্য উদয়পুর আক্রমণ করেন । জগৎ সিংহের রক্ষিতা বিলাসবতী জগৎসিংহের সঙ্গে কৃষ্ণকুমারীর বিবাহ ভাঙতে সচেষ্ট ছিলেন । বিলাসবতী মদনিকা নামে এক পরিচারিকাকে পুরুষের ছদ্মবেশে উদয়পুরে পাঠিয়েছিলেন । মদনিকা কৃষ্ণকুমারীকে মরুদেশের রাজা মানসিংহের প্রতি আকৃষ্ট করে তুলেছিলেন । মদনিকা একটি নকলপত্রে মানসিংহকে জানান যে, কৃষ্ণকুমারী তার প্রতি আসক্ত । ভীমসিংহ জগৎসিংহের সঙ্গে কৃষ্ণার বিবাহ দিতে চেয়েছিলেন । এদিকে কৃষ্ণা মানসিংহের প্রতি অনুরক্তা জেনে গভীর সংকটে পড়লেন । জগৎসিংহ এবং মানসিংহ উভয়েই কৃষ্ণাকে লাভ করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন । দুই রাজাই প্রতিজ্ঞা করেন, কৃষ্ণকুমারীকে না পেলে উদয়পুর ধ্বংস করবেন। শেষ পর্যন্ত উদয়পুরকে বাঁচানোর জন্য কৃষ্ণা আত্মহত্যা করেন।

গিরিশচন্দ্র ঘোষের দেশপ্রেমমূলক ইতিহাস আশ্রয়ী নাটক গুলি হল – 'আনন্দ রহো '(১৮৮১),' চন্ড '(১৮৯০),' কালাপাহাড় '(১৮৯১),'ভ্রান্তি '(১৯০২),' সৎনাম'(১৯০৪), ' সিরাজউদদ্দৌলা '(১৯০৬), ' মীরকাশিম'(১৯০৬),' ছত্রপতি শিবাজী '(১৯০৭), ' অশোক'(১৯১০) ইত্যাদি। ' আনন্দ রহো' নাটকের আখ্যান নাট্যকার রাজপুত ইতিহাস থেকে সংগ্রহ করেছেন । প্রতাপ ,মানসিংহ, আকবর প্রভৃতি ঐতিহাসিক চরিত্রকে যথাযথভাবে পরিস্ফুট করেছেন ।টডের রাজস্থান সংক্রান্ত ইতিহাসকে অবলম্বন করে গিরিশচন্দ্র লিখেছেন ' চন্ড' ।' কালাপাহাড় ' কে নাট্যকার 'ভক্তিরসাত্মক ঐতিহাসিক ' নাটক বলেছেন । গিরিশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নাটক 'সিরাজউদদ্দৌলা ' । ব্রিটিশ সরকার নাটকটির অভিনয় এবং প্রকাশ নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল । গিরিশচন্দ্র সিরাজকে সমস্ত রকম দোষের বাইরে রেখে যথার্থ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলেছেন । সিরাজকে তিনি প্রজাপ্রেমিক নবাব ,যথার্থ পিতা ও যথার্থ স্বামী হিসেবে প্রতিস্থাপন করেছেন। কিন্তু সিরাজের প্রধান ত্রুটি হল মীরজাফরকে ষড়যন্ত্রকারী জেনেও তাকে শেষ পর্যন্ত শাস্তি দিতে পারেন নি ,আর সেখানেই তার ট্রাজেডি । ' মীরকাশিম 'নাটকে গিরিশচন্দ্র মীরকাশিমকে জাতীয় বীর হিসেবে গড়ে তুলেছেন । এই নাটকে জাতীয়তাবাদ, হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ দূর করে মানবসত্যের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন নাট্যকার । ' ছত্রপতি শিবাজী 'ঐতিহাসিক নাটকটির উপাদান সংগ্রহ করা হয়েছে – সত্যচরণ শাস্ত্রীর' ছত্রপতি শিবাজী' গ্রন্থ থেকে । এই নাটকে নাট্যকার তার জাতীয়তাবাদী ভাবাদর্শ প্রচার করেছেন । ' অশোক ' পঞ্চাঙ্ক নাটকে অশোকের জীবন বৃত্তান্ত বিবৃত করা হয়েছে। যৌবনের ভোগী অশোক থেকে বার্ধক্যের ত্যাগী অশোকের বিবর্তন দেখিয়েছেন নাট্যকার । শিক্ষিত মানুষের সচেতনতা,

দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবাদ এইসব নাটকে দেখা যায় । নাট্যকার যুগের দাবি মেটাতে গিয়ে ইতিহাসের দাবি সর্বদা মেটাতে পারেননি । তবে তিনি ইতিহাস আশ্রয়ী নাটকে দেশাত্মবোধের কথা প্রচার করেছেন ।

রাজকৃষ্ণ রায় অনেক ইতিহাস আশ্রয়ী নাটক লিখেছেন। ধাত্রীপান্নার কাহিনীকে নিয়ে লেখা নাটক ' ' বনবীর ' (১৮৯২)তাঁর সার্থক ঐতিহাসিক নাটক। এছাড়া ইতিহাস আশ্রয়ী তাঁর অন্যান্য নাটক গুলি হল 'রাজা বিক্রমাদিত্য ' (১৮৮৪), 'মীরাবাঈ '(১৮৮৯)।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইতিহাসাশ্রয়ী দেশাত্মবোধক নাটক গুলি হল ' পুরুবিক্রম '(১৮৭৪), ' সরোজিনী নাটক '(১৮৭৫),'অশ্রুমতি '(১৮৭৯), ' স্বপ্নময়ী '(১৮৮২)।' পুরুবিক্রম্ ' নাটকটি গ্রিক বীর সেকেন্দরের সঙ্গে পুরুর যুদ্ধ কাহিনী নিয়ে রচিত হয়। উনিশ শতকের দেশাত্মবোধের বাণী প্রচার করে নাটকটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে । 'সরোজিনী নাটক ' টডের রাজস্থান কাহিনীকে ভিত্তি করে রচিত হয় । ছয় অঙ্কে সমাপ্ত এই নাটকে রাজপুত নারীদের দেশপ্রেম নাট্যকার যথাযথভাবে পরিস্ফুট করেছেন । বাংলার ইতিহাস নির্ভর দেশাত্মবোধক নাটক 'স্বপ্নময়ী ' জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিখ্যাত রচনা ।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ইতিহাসাশ্রয়ী নাটকগুলি হলো– ' তারাবাঈ '(১৯০৩), প্রতাপসিংহ'(১৯০৫), 'দুর্গাদাস '(১৯০৬),' সোরাবরুস্তম ' (১৯০৮),' নূরজাহান'(১৯০৮), ' মেবারপতন'(১৯০৮), ' সাজাহান'(১৯০৯), ' চন্দ্রগুপ্ত'(১৯১১), 'সিংহলবিজয়'(১৯১৫) ইত্যাদি।

ইতিহাসের আখ্যানকে কেন্দ্র করে যখন নাটক রচিত হয় ,তখন তা হয়ে ওঠে ইতিহাসাশ্রয়ী নাটক । তারাবাঈ '(১৯০৩) দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রথম ইতিহাস আশ্রয়ী নাটক। দ্বিজেন্দ্রলাল ইতিহাসকে অনুসরণ করে টডের রাজস্থান কাহিনী থেকে উপাদান সংগ্রহ করে ইতিহাস আশ্রয়ী নাটক তারাবাঈ রচনা করেন। ' প্রতাপ সিংহ '(১৯০৫) নাটকে ইতিহাসের প্রতাপ সিংহের স্বদেশ ভাবনা রূপায়িত হয়েছে। টডের ' Annals and antiquities of Rajasthan ' কে কেন্দ্র করে দ্বিজেন্দ্রলাল ' দুর্গাদাস '(১৯০৬) রচনা করেন। দুর্গাদাসের মধ্য দিয়ে নাট্যকার স্বদেশ প্রেমের ভাব উদ্দীপনা সঞ্চার করতে চেয়েছেন। ইতিহাসের নূরজাহান কে অবলম্বন করে দ্বিজেন্দ্রলাল রচনা করেন ' 'নূরজাহান '(১৯০৮) নাটক। স্বদেশপ্রেমের চেয়ে মানব প্রেম প্রাধান্য লাভ করেছে নাটকে। টডের রাজস্থান কাহিনী অবলম্বন করে দ্বিজেন্দ্রলাল 'মেবার পতন' নাটক লেখেন। এই নাটকে নাট্যকারের বিশ্বপ্রেম তত্ত্ব অভিব্যক্ত হয়েছে ।' সাজাহান 'নাটকটি শেক্সপিয়রের নাটকের আদর্শে রচিত হয়েছে। ইতিহাস ও মনস্তত্ত্বের সুনিপুণ মেলবন্ধনে ' সাজাহান 'হয়ে উঠেছে দ্বিজেন্দ্রলালের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক ।' চন্দ্রগুপ্ত ' পঞ্চাঙ্ক

নাটক ইতিহাসের চন্দ্রগুপ্তের পৌরুষ ও বীরত্ব নিয়ে নাটকটি রচিত হয়। ' সিংহল বিজয় ' নাটকে দেশপ্রেমের প্রকাশ ঘটেছে।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের ইতিহাসাশ্রয়ী নাটকগুলি হল ' বঙ্গের প্রতাপাদিত্য '(১৯০৩), 'পদ্মিনী '(১৯০৬),' চাঁদবিবি '(১৯০৭),' পলাশীর প্রায়শ্চিত্য'(১৯০৭),' নন্দকুমার '(১৯০৭), ' অশোক'(১৯০৮),' বাঙ্গালার মসনদ'(১৯১০), ' খাঁজাহান '(১৯১২), ' আহেরিয়া '(১৯১৫), ' বঙ্গে রাঠোর '(১৯১৭),' আলমগীর ' (১৯২১), ' গোলকুন্ডা '(১৯২৫)। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের যুগে ক্ষীরোদপ্রসাদের ইতিহাস আশ্রয়ী নাটকগুলি জনপ্রিয় হয়। 'বঙ্গের প্রতাপাদিত্য' নাটকে প্রতাপাদিত্যের বীরত্ব ও সাহসিকতাকে বিশ শতকে স্বাধীনতার আন্দোলনের যুগে নতুনভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়ে নাট্যকার বাঙালির মনে দেশপ্রেম জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। 'পদ্মিনী 'নাটকের নাম হলেও ,ট্রাজেডি সৃষ্টিতে পদ্মিনী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেনি। ' চাঁদবিবি' নাটকে দেশাত্মবোধের অভাব লক্ষ্য করা যায়।' পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত ' নাটকে মোহনলালের দেশপ্রেম বাঙালী জীবনে সঞ্চারিত করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বাঙালি কে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন নাট্যকার।' নন্দকুমার ' নাটকে ওয়ারেন হেস্টিংসের সঙ্গে নন্দকুমারের বিবাদ এবং নন্দকুমার এর দেশপ্রেম জাতীয়তাবাদের যুগে নাটকটিকে জনপ্রিয় করে তুলতে বিশেষভাবে সহায়তা দান করেছিল। নাটকটির অভিনয় ব্রিটিশ সরকার বন্ধ করে দেয়।' অশোক' নাটকে বীতশোক, ধুন্ধুমার, চিত্রা চরিত্রের ওপর নাট্যকার অধিক সহানুভূতি দেখানোর ফলে অশোকের চরিত্র মহিমা ম্লান হয়ে গেছে।' বাঙ্গালার মসনদ 'আলীবর্দী খাঁর বাংলা জয় করার কাহিনী নিয়ে রচিত হয়েছে ।' খাঁজাহান ' নাটকে ইতিহাসের চরিত্র থাকলেও নাট্যকারের কল্পনা ইতিহাসের চরিত্রের ঐতিহাসিক মহিমা হ্রাস করেছে।' আহেরিয়া ' নাটকে মূলরাজের অন্তর্দ্বন্দ্ব, সংগ্রামী মানসিকতা ,প্রতিজ্ঞাবদ্ধতা প্রশংসনীয়।' বঙ্গে রাঠোর 'পাঠান রাজত্বের শেষ সময়ের ঘটনা নিয়ে রচিত হয়েছে । 'আলমগীর 'নাটকে আলমগীর –উদিপুরীর কাহিনী, মনকে আকর্ষণ করে । ক্ষীরোদপ্রসাদ ইতিহাসের ' টোন' কে সব সময় ঠিকমতো ধরতে না পারলেও দর্শকদের মধ্যে প্রেম সঞ্চার করতে সমর্থ হয়েছেন। "ক্ষীরোদপ্রসাদের ঐতিহাসিক নাটকের ইতিহাসবোধও গভীর নয় , উচ্চ ঐতিহাসিক কল্পনারও যথেষ্ট অভাব ,তবুও তার এই শ্রেণীর নাটকগুলি জনচিত্তে প্রবল আলোড়ন তুলেছিল কারণ ক্ষীরোদপ্রসাদ উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন বলিষ্ঠ জাতীয়তাবাদের মন্ত্রে ।সেই জাতীয় চেতনার মূল ভিত্তি ছিল– শক্তি ,প্রেম ও ধর্ম । বাঙালি দর্শকদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগানোর জন্য নাট্যকারের একাগ্রতা প্রশংসনীয় ।তিনি সেদিন ঐতিহাসিক নাটকের মাধ্যমে জীর্ণপ্রাণ নিষ্ক্রিয় বাঙালিকে জাগিয়ে তুলতে পেরেছিলেন একদিকে ইতিহাসের ঘটনা, অন্যদিকে পরাধীন দেশের ছবি –এই দুই মিলে তার ঐতিহাসিক নাটকের প্রাণ প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। "১.। যোগেশচন্দ্র চৌধুরী নাদির শাহকে নিয়ে ' দিগ্বিজয়ী'(১৯২৮) নাটক লিখেছেন ।

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'সিরাজউদ্দৌলা ', 'গৈরিক পতাকা' প্রভৃতি ঐতিহাসিক নাটক জনপ্রিয় হয়েছিল। ইতিহাসের কাহিনীর মধ্যে তিনি স্বদেশ প্রেমের উত্তাপ সঞ্চার করতে সমর্থ হয়েছেন । পাকিস্তান প্রস্তাবের বিরোধিতা করা হয়েছে সিরাজউদ্দৌলা নাটকে। অসহযোগ আন্দোলন এবং গান্ধীজীর আদর্শের কথা বর্ণিত হয়েছে ' ' গৈরিক পতাকা' য়।

মন্মথ রায়ের ইতিহাস আশ্রয়ী নাটকগুলি হল ' অশোক' (১৯৩৩), ' মীর কাশিম'(১৯৩৮),'সাঁওতাল বিদ্রোহ '(১৯৫৮),অমৃত অতীত '(১৯৫৯)ইত্যাদি। অশোক 'নাটকে মানবতা বিরোধী অশোক কিভাবে ধর্মীয় অশোকে পরিণত হলো তার বিবর্তন দেখিয়েছেন। অশোকের পরিবর্তনের মাধ্যমে পরাধীন ভারতবাসীর মানসিকতার পরিবর্তন সাধন করতে চেয়েছেন নাট্যকার।' মীরকাশিম 'নাটকে মীরকাশিমের ব্রিটিশ শক্তির বিরোধিতার মধ্য দিয়ে, মীরকাশিমের সংকল্পের মধ্য দিয়ে জাতীয় জীবনের সংকল্পকে নাট্যকার বড়ো করে তুলে ধরেছেন।' সাঁওতাল বিদ্রোহ 'নাটকে সাঁওতাল পরগনা এবং বাংলাদেশের সম্পর্ক এই নাটকের কাহিনী ও ঘটনায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। অষ্টম শতকের গৌড়ের গোপালদেবকে কেন্দ্র করে রচনা করেন 'অমৃত অতীত'। সিপাহী বিদ্রোহ থেকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পর্যন্ত ভারতবর্ষের ঘাত-প্রতিঘাত ,রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন চেতনার প্রকাশ ঘটেছে ' মহাভারতী' তে (১৯৫১)।মেদিনীপুরের এক গ্রামের কৃষক মহাভারত এবং তার পরিবার এই বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছে । এটি দেশাত্মবোধক নাটক।

প্রত্যক্ষভাবে মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত নন ,কিন্তু ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বকে নিয়ে জীবনী নাটক রচনা করেছেন বনফুল (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়)। তাঁর জীবনী নাটকগুলি হল 'শ্রীমধুসূদন '(১৯৩৯)ও ' বিদ্যাসাগর'(১৯৪১)।

মহেন্দ্র গুপ্তের ইতিহাসাশ্রয়ী নাটকগুলি হল 'মহারাজা নন্দকুমার',' হায়দার আলি ','সোনার বাংলা'(১৯৩৬),' শতবর্ষের আগে '(১৯৩৭),'স্বর্গ হতে বড়',' টিপু সুলতান'(১৯৪৪) ইত্যাদি।

মার্কসবাদী ভাবনার পটভূমিকায় ইতিহাসের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে উৎপল দত্ত তাঁর নাটক রচনা করেন। ভারত ইতিহাসের প্রতিটি বিপ্লবী ঘটনার মূল্যায়নে সচেষ্ট ছিলেন তিনি। যেমন 'টোটা 'নাটকে দেখা যায় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তির আকাঙ্খায় ভারতীয় সৈন্যের লড়াই এর কাহিনী।' সূর্যশিকার 'নাটকে প্রাচীন ভারতে সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের সমকালীন বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের স্বরূপ উল্লিখিত হয়েছে।'সন্ন্যাসীর তরবারি ' নাটকে আছে ফকির সন্ন্যাসীদের সংঘবদ্ধ সংগ্রামের কাহিনী ।' অগ্নিশয্যা'নাটকে সতীদাহ প্রথার নির্মম কাহিনীর পাশে রামমোহন রায়ের সংগ্রামী প্রয়াস স্থান পেয়েছে।

ঐতিহাসিক পটভূমিতে কাল্পনিক কাহিনী রচনা করতে চেয়েছেন অনেকেই তাতে জোর পড়েছে সমকালের উপরে। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'স্বদেশী নকশা' বা মনোজ মিত্রের 'গল্প হেকিম সাহেব 'এই জাতীয় রচনা ।ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ ভাঙার ঘটনা নিয়ে শেখর সমাদ্দার লিখেছেন 'তীর্থযাত্রা '। যা ঠিক ঐতিহাসিক নাটক নয় ,তবে ইতিহাসের সঙ্গে অব্যবহিত বর্তমানকে মেলানোর চেষ্টা আছে।

আধুনিক নাট্যকাররা ইতিহাস বিমুখ। তবে আশা করা যায় ,এই অচলাবস্থা কাটবে ।যুগের প্রয়োজনে, বিশেষ স্থান-কাল আর শ্রেণী দিয়ে ঘেরা বাংলা নাট্য জগতে নবীন প্রজন্মের নাট্যকারেরা এসে ঐতিহাসিক নাটক লিখবেন.

তথ্যসূত্র:

১. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আধুনিক যুগ ১৮০০ – ১৯৫০)/ ডঃ দেবেশ কুমার আচার্য /ইউনাইটেড বুক এজেন্সি /পৃষ্ঠা ৪২৬।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (পঞ্চম খন্ড)/সুকুমার সেন।

২. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত(৬– ৯)/অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩. বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা/ (৩ —৪)/ ভূদেব চৌধুরী।

৪. বাংলা নাটকের ইতিহাস/ অজিত কুমার ঘোষ।

৫. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আধুনিক যুগ ১৮০০ – ১৯৫০) ড : দেবেশ কুমার আচার্য্য ।

বিবেকী কণ্ঠস্বরে জনশিক্ষা ও বর্তমান ভারতবর্ষ

প্রণব ঘোষ
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
যতীন্দ্র রাজেন্দ্র মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারতবর্ষ

সারসংক্ষেপ: মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতার প্রকাশহল শিক্ষার সার্থকতা। শিক্ষার সাথে জীবনের মেলবন্ধনে পূর্ণতার প্রকাশই মানুষের শিক্ষা সাধনার পরম প্রাপ্তি।শিক্ষার মাধ্যমে বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা হয়, ফলে মনের সর্বত্র উন্নীত হয়, আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায় এবং অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ হয়।প্রকৃতিগতভাবে প্রত্যেক মানুষ অসীম-অনন্ত শক্তির অধিকারী।শিক্ষার আলোকে প্রত্যেক মানুষকে অসীম-অনন্ত শক্তির নিরন্তর ও নিরলস চর্চা করা প্রয়োজন।শিক্ষা নিহিতথাকেজ্ঞানেরমধ্যে। জ্ঞান যেখানে অন্যাশ্রয়ী বা বিষয়াশ্রয়ীসেখানে প্রকৃত শিক্ষার আবেদন নেই। প্রত্যেকেই যখন মৌলিকভাবে জ্ঞানসৃজক, জ্ঞানাহরণ, জ্ঞানপিপাসু ও জ্ঞানজিজ্ঞাসু হবে তখনই শিক্ষার শুভ ও সার্থক জয়যাত্রা শুরু হবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে জ্ঞানের সাথে ব্যক্তি মানুষের সম্বন্ধ সমবায়সম্বন্ধেআবদ্ধ। অর্থাৎ যা অবিচ্ছেদ্য ও আত্মজ।

স্বামীজী বলেছেন যে জাতির জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা কম সেই জাতি বিভিন্ন দিক থেকে পিছিয়ে আছে এবং যে জাতির জনসাধারণের ভিতরে বিদ্যা বুদ্ধি বেশি প্রচারিত সেই জাতিতত পরিমাণে উন্নত। যদি পুনরায় আমাদের জগতশ্রেষ্ঠহয়েউঠতে হয় তাহলে জনসাধারণের মধ্যেশিক্ষার প্রচার করে উঠতে হবে। সুতরাং দেশের উন্নতির জন্য দরিদ্র ও অনগ্রসর ছেলেমেয়েদের শিক্ষার দিকে নজর দিতে হবে। যদিও সার্বজনীন শিক্ষার চরিত্রটি আজও স্পষ্ট না হওয়ায় জনশিক্ষার বিস্তারে শিক্ষার পরিকাঠামো কেমন হওয়া প্রয়োজন সে বিষয়ে আমরা সচেতন হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষার বিকিরণ আশানুরূপ হচ্ছে না। দরিদ্র ও অনগ্রসর মানুষের সমাজ জীবনের ক্ষেত্রে সহানুভূতি ও সহমর্মিতা যে অন্তর্নিহিত শক্তির উদ্বোধকএবং সৎ ব্যবহার হল শিক্ষার নির্জাস এই সত্যটি শিক্ষায় সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে এবং সেই অনুসারে সকল জনসাধারণের জন্য, বিশেষ করে দরিদ্রদের জন্য শিক্ষার আকাশ আনন্দময় ও অবাধ গড়ে তুলতে হবে।আর এইরূপ শিক্ষাই হবে মানুষের আলোকবর্তিকা, সকল প্রকার মুক্তির প্রকাশক।

মূলশব্দ: শিক্ষা, পূর্ণতা, প্রকাশ, জ্ঞান, জনশিক্ষা, মানবতা, আত্মবিশ্বাস, আত্মস্বরূপ।

স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তার উন্মেষ ঘটেছে তাঁর জীবনদর্শন ও জাগ্রত বিবেক থেকে উৎসারিত সামাজিক ধ্যান ধারণার উপর ভিত্তি করে। তিনি মানবকেন্দ্রিক জীবন দর্শনেরউপর ভিত্তিকরে মানুষের সকল সমস্যাকে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে তার সমাধানের চেষ্টা করেছেন।শিক্ষা সম্পর্কে তার স্বকীয় চিন্তাভাবনা প্রকাশের মধ্য

দিয়ে শিক্ষানীতির যে স্বরূপ উদঘাটন করেছেন তাতে তিনি সমগ্র বিশ্বের শিক্ষাবিদদের মধ্যে হয়ে উঠেছেন অগ্রগণ্য। মানুষের সমস্যাগুলিকে আলোচনা করতে গিয়ে দেখেছেন, যেকোন বিষয় নিয়েই পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা হোক না কেন দেখা যাবে সব বিষয়েই ওপর ওপর সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে, সমস্যার গভীরে ঢুকে তার মূল উৎপাটন করার চেষ্টা করা হয়নি।একটু গভীরভাবে বিষয়টি দেখলেই বোঝা যায় যত কিছু সমস্যা আছে সেই সমস্যাগুলো মূলে জড়িয়ে আছে একটি নাম 'শিক্ষা'। সেজন্য তিনি বলেছেন,"কেবল শিক্ষা,শিক্ষা,শিক্ষা, ইউরোপের বহু নগর পর্যটন করিয়া তাহাদের দরিদ্র্যদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ ও বিদ্যা দেখিয়া আমাদের গরিবদের কথা মনে পড়িয়া অশ্রুজল বিসর্জন করিতাম। কেনএই পার্থক্য হইল? শিক্ষা জবাব পেলাম।"[১]

শিক্ষা কী? স্বামীজীশিক্ষার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন,"শিক্ষা হচ্ছে মানুষের ভিতর যে পূর্ণতা প্রথম হতেই বিদ্যমান, তারই প্রকাশ"[২]অর্থাৎ শিক্ষা হলো সকল শিক্ষার্থীর অন্তরের মধ্যে বিদ্যমান অসীম শক্তি ও শুদ্ধ গুণাবলীর আবিষ্কার ও বিকাশ সাধন। জাগতিক বস্তু সমূহ ও বাহ্য জগতের কোন জ্ঞানই বাইরে থেকে আসে না, সবই ব্যক্তির অন্তর্জগতে প্রবিষ্ট থাকে। মানুষ যত প্রকার জ্ঞান লাভ করেছে সবই তার অন্তর জগত থেকে উৎসারিত হয়েছে। জগতের অনন্ত পুস্তক ভান্ডার মানুষের মনের মধ্যে বাঅন্তর্জগতে সুপ্ত অবস্থায় অবস্থান করে আছে, শুধুমাত্র উদ্দীপকের অভাবে সেগুলি প্রকাশের অপেক্ষায়।বস্তুওউদ্দীপক সমূহ হল মানুষকে অধ্যয়ন করার উপলক্ষ মাত্র।আবরণসমূহ বাহ্যবস্তু বাবাহ্যউদ্দীপকদ্বারাদূরীভূত হয়ে গেলে ব্যক্তির অন্তর্নিহিত অনন্ত জ্ঞানওঅসীম শক্তি বিভিন্ন দ্বার দ্বারা প্রবাহিত হয়ে ব্যক্তিকে সর্বজ্ঞ ও নানা প্রকার শক্তিতে পরিপূর্ণ করে তোলে। স্বামীজীর মতে মানুষের অন্তর্নিহিত আবরণগুলি দূর করার উপায় বা উদ্দীপক হলো শিক্ষা।[৩]

শিক্ষার অর্থ কতগুলি শব্দ শেখা নয় বা তথ্য পরিবেশনের উপায় মাত্র নয়- এটি হল জীবন নিয়ন্ত্রন শক্তির যথাযথ ভাবকে পরিপাক করার উদ্বোধক।জ্ঞান ও বুদ্ধি হল অধিগত বিদ্যা- এগুলি অর্জিত হয় জীবন চর্চার মধ্য দিয়ে। কিন্তু শিক্ষা ব্যক্তির অন্তর্জগতে যেসৃজনীপ্রতিভা, আধ্যাত্মিক চেতনা, সামাজিক চেতনা, নিজস্বতাও উৎকর্ষতা রয়েছে তার মাধ্যমে মনুষ্যত্ববোধের বিকাশ ঘটায়, যা আমাদের আচরণের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিজীবনে ও সমাজ জীবনে প্রতিফলিত হয়।তাই কতকগুলি তথ্য মাথায় ঢুকিয়ে দিলেই শিক্ষালাভ করা হয়না, শিক্ষা লাভ করা হয় তখনই যখন বিভিন্নভাবের আত্তীকরণ ঘটে। বিবেকানন্দ তাই দুঃখ করে বলেছিলেন,"কয়েকটা ভাল বক্তৃতা করতে পারলেই তোদের কাছে শিক্ষিত হল! যে বিদ্যার উন্মেষে কোন ইতর সাধারণকে জীবন সংগ্রামে সমর্থ করা যায় না,যাতে মানুষের চরিত্রবল, পরার্থপরতা, সিংহসাহসিকতা এনে দেয় না, সে কি আবার শিক্ষা? যে শিক্ষায় জীবনে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে পারা যায়, সেই হচ্ছে শিক্ষা।"[৪]

শিক্ষার সংজ্ঞায় ব্যবহৃত দুটি শব্দ-‘পূর্ণতা’ ও ‘প্রকাশ’-র দ্বারা স্বামীজী একইসঙ্গে শিক্ষাকে ব্যক্তি ও সমাজের কাছে অর্থবহ করে তুলেছেন।‘পূর্ণতা’ শব্দটিরদ্বারা শিক্ষার ব্যক্তিগত তাৎপর্যটিকে তুলেধরেছেন। কারণ তার মতে ‘পূর্ণতা’ হল ব্যক্তি মানুষের অন্তর্নিহিত স্বকীয়শুদ্ধগুণাবলী, যা মানুষের অন্তরে নিহিত এবং তাসহজাত। কোন জ্ঞানই বাইরে থেকে আসে না, সমস্ত জ্ঞান ভেতরেই আছে। কেবল আত্মপ্রকাশের জন্য প্রতীক্ষা করছে। এইজন্য প্রত্যেক ব্যক্তি মানুষ তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী নিজস্ব বিকাশ লাভ করে। সংজ্ঞায় ব্যবহৃত ‘প্রকাশ’ শব্দটি সামাজিক তাৎপর্য-এর বাহক, এই অর্থে যে, মানুষের অন্তরের যে পূর্ণতা তা প্রকাশের শুধুমাত্র মাধ্যম হলো পরিবেশ ও সমাজ।মানুষ তার এই ভিতরের পূর্ণতা কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে যদি প্রকাশ করতে না পারে তাহলে সেই পূর্ণতার মূল্য শূন্য। সেজন্য স্বামীজীবলেছেন, “মানুষ যাহা ‘শিক্ষা করে’, প্রকৃতপক্ষে সে উহা ‘আবিষ্কার করে’discover শব্দটির অর্থ- অনন্ত জ্ঞানের খনিস্বরূপ নিজ আত্মা হইতে আবরণ সরিয়ে লওয়া।”[৫]মহাবিজ্ঞানী আইজ্যাক নিউটন যে মধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন, সেই আবিষ্কার তার মননজাত।এই তত্ত্ব আবিষ্কারের পূর্বেই তার অন্তর্জগতে বা মানসলোকে বিদ্যমান ছিল, কিন্তু এ সম্পর্কে তখন তিনি অবগত ছিলেন না। একটি নির্দিষ্ট সময়ে যখন তিনি আপেলের বক্ষচ্যুতি দেখতে পেলেন তখন তার মানসলোকে একটি বিদ্যুতের ঝলকের ন্যায়উদ্দীপনাবা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। যখন কোন বস্তু উপযুক্ত শক্তিসহ ব্যক্তির ইন্দ্রিয়- এর সামনে উপস্থিত হয় তখন ব্যক্তি বস্তুটিকে স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করে বিষয়টির প্রতি মনোযোগী হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে বাহ্যজগতে আপেলের গাছের ডাল থেকে ছিন্ন হয়ে মাটিতে পড়া উদ্দীপক রূপে বিজ্ঞানী নিউটনের অন্তর্জগতের আবরণ সরিয়ে দিয়ে তার মানসলোকের অমৃত ‘মধ্যাকর্ষণ শক্তি’জ্ঞান রূপে প্রকাশিত হলো।সুতরাংযাবতীয় জ্ঞান মানুষের মনের মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকে, বাইরের জগতের বস্তুসমূহ কেবল মানুষের মনকে অধ্যয়ন করবার উত্তেজককারণবা উপলক্ষ মাত্র।স্বামীজীবলেছেন,“বাহ্য জগৎ হইতে আমরা কেবল উত্তেজনা পাই, এমনকি সেই উত্তেজনার অস্তিত্ব জানিতে হইলেও আমাদিগকে ভিতর হইতে প্রতিক্রিয়া করতে হয়; আর যখন আমরা এই প্রতিক্রিয়া করি, তখন প্রকৃতপক্ষে আমরা আমাদের নিজ মনেরকিছুটাই সেই উত্তেজনারদিকে প্রেরণ করি; আর যখন আমরা উহাকেজানিতে পারি, তখন আমাদের নিজমন ঐ উত্তেজনা দ্বারা যেভাবে আকারিত হয়, আমরা সেইভাবে আকারিত মনকে জানতে পারি।”[৬]স্বামীজী মনে করতেন জ্ঞানপ্রকাশের যথাযথ সময় ও পরিবেশের একান্ত প্রয়োজন। কারণ মানুষের জ্ঞান আত্মপ্রকাশের প্রতীক্ষায় সর্বদা উন্মুক্ত রয়েছে। তিনি বলেছেন, “অগ্নি যেমন একখণ্ড চকমকিতে নিহিত থাকে, জ্ঞান তেমনি মনের মধ্যেই রহিয়াছে।”[৭]

স্বামীজী শিক্ষার সংজ্ঞায় পূর্ণতা ও প্রকাশ শব্দের দ্বারা শিক্ষাকে ব্যক্তি ও সমাজের নিকট চূড়ান্ত সমন্বয়সাধন করলেও সেটি তাঁর নিকট পর্যাপ্ত বলে বিবেচিত হয়নি। কারণ তিনি সংশয়ের মধ্যে ছিলেন যদি পরবর্তীতে সমাজের মধ্যে ব্যক্তিপ্রাধান্য-এর আধিক্য দেখা দেয়, তাহলে সমাজে জাতিতত্ত্বের প্রসার ঘটবে ফলে জাতি মানসে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে অবহেলিত ভাব দেখা দেবে। সেজন্য তিনি বলেছেন, "আমরা দিনরাত কেবল তাদের বলছি 'ছুঁসনে ছুঁসনে'। ...ইচ্ছা হয়, তোর ছুৎমার্গের গণ্ডি ভেঙে ফেলে এক্ষুনি যাই- ...একটা অঙ্গ পড়ে গেলে, অন্য অঙ্গ সবল থাকলেও ওই দেহ নিয়ে বড়ো কাজ আর হবেনা- এ নিশ্চয়ই জানবি।"[৮]এই কারণে স্বামীজী জাতীয় জীবন গঠনের পন্থা রূপে জনশিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। জনশিক্ষা হলো জাতি, বর্ণ, ধর্ম, নির্বিশেষে সকল জনসাধারণের জন্য শিক্ষার বিস্তার। কিন্তু এই জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। কারণ আমাদের দেশে নেই পর্যাপ্ত প্রাচুর্য, নেই পর্যাপ্ত অর্থএবং নেই সকলকে বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষা গ্রহণ করাবার ক্ষমতা।এত কিছু না থাকা সত্বেও যদি গ্রামে গ্রামে অবৈতনিক বিদ্যালয় খুলে দেওয়া যায় তাহলেও কি জনশিক্ষার প্রসার ঘটবে? কারণ এই গরীব দেশের গরীব ঘরের ছেলে মেয়েরা, যারা সারাদিনে পেট ভরে দুবেলা খেতে পায়না তারা কি প্রাত্যহিক খাবারের যোগড়ের পরিবর্তে শিক্ষা কে গ্রহণ করবে! তারা বরং শিক্ষা গ্রহণকরার পরিবর্তে জীবিকা অর্জনকেই অগ্রাধিকার দেবে। তাহলে কি জনশিক্ষা প্রসার ঘটবে না? এর উত্তর স্বামীজীবলেছেন, "আমি এরই মধ্যে একটা পথ বের করেছি। তা এই যদি পর্বত মহম্মদের কাছে না-ইআসে, তবে মহম্মদকে পর্বতের কাছে যেতে হবে। দরিদ্র মানুষ যদি শিক্ষার কাছে না পৌঁছাতে পারে... তবে শিক্ষাকেই চাষীরলাঙ্গল-এর কাছে, মজুরের কারখানায় এবং অন্যত্র সব স্থানে যেতে হবে।"[৯]

এখানেও প্রশ্ন হবে এটাও বা কি করে সম্ভব? এর উত্তরে স্বামীজি বলেছেন এই দেশে নিঃস্বার্থ সৎ শিক্ষিত শত শত ছেলে মেয়ে অবশ্যই পাওয়া যাবে যারা গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে, কোন জনবহুল স্থানে গিয়ে ধর্ম শিক্ষারসাথে সাথে প্রথাগত শিক্ষা ও নৈতিক শিক্ষা তুলে ধরবেন। যেমন, কোন এক গ্রামের অধিবাসীরা সারাদিন কাজকর্ম সম্পন্ন করে আসার পর কোন একটা গাছের নিচে অথবা কোন একটা স্থানে মিলিত হয়ে গল্পগুজব করে সময় অতিবাহিত করছে, সেই সময় দুই-তিনজন শিক্ষিত যুবক তাদের কাছে গিয়ে ধর্ম, বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন দেশের ইতিহাস, গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতি সম্বন্ধে বক্তৃতাবা আলোকচিত্র ইত্যাদির মাধ্যমে এই সমস্ত বিষয়গুলি বুঝিয়ে দেয়,স্বামীজীর মতে, এমন করলে "সমস্ত জীবন বই পড়ে তারা যা না শিখতে পারে, তারচেয়ে শতগুণ বেশি জিনিস এই ভাবে মুখে মুখে শিখতে পারে।"[১০] এর ফলে তারা অনেক নতুন কিছুর সাথে পরিচিতিলাভ করার সাথেসাথে কিছু কিছু বিষয়ে জ্ঞান অর্জনও করবে এবং ধর্মের শিক্ষার সাথে সাথে নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠবে।যার ফলে সন্তান-সন্ততি, পরিবার সর্বোপরি সমাজে তার ভাল প্রভাব পড়বে এবং এর থেকে

ভবিষ্যতে অপেক্ষাকৃত আরও ভালো ফল হবে এটুকু আশা করতে পারি। জনসাধারণের প্রতি আমাদের দায়িত্ব এটুকু পর্যন্ত, বাকিটুকু তারা নিজেরাই সম্পন্ন করবে।স্বামীজী বলেছেন, "তোদের দেশের mass of people[জনসাধারণ] যেন একটা sleeping leviathan [ঘুমন্ত বিরাট জলজন্তু]। ... এখন কাজ হচ্ছে, দেশে-দেশে, গাঁয়ে-গাঁয়ে গিয়ে দেশের লোকদের বুঝিয়ে দেওয়া যে, আলিস্যি করে বসে থাকলে চলছে না। ...[তোরা] সকলকে বোঝাগে, ব্রাহ্মণদের মত তোমাদের ধর্মে সমান অধিকার। চন্ডালকে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত কর।আর সোজা কথায় তাদের ব্যবসা বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতি গৃহজীবনেরঅত্যাবশ্যক বিষয়গুলি উপদেশদিগে।"[১১]

স্বামীজী বলেছেন নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা জীবন সংগ্রামে প্রতিনিয়ত ব্যস্ত থাকায় তাদের জ্ঞানের প্রতি কোন অনুরাগ দেখা যায়নি। এতদিন তারা সারাটাদিন যন্ত্রের মত শুধু কাজ করে এসেছে, বাইরের জগতের প্রতি, নিজের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে উঠতে পারেনি এবং তাদের এই পরিশ্রমের উপার্জনের ফল ভোগ করে এসেছে বুদ্ধিমান চতুর বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা।কিন্তু কালক্রমে এই নিম্নশ্রেণীর লোকদের মধ্যে জ্ঞানের উন্মেষ ঘটার ফলে তারা বুঝতে পেরেছে তাদের প্রতি অত্যাচার, অবদমনের বিষয়গুলি। এরফলে তারা ওই বড়লোক শ্রেণীর প্রতি রুখে দাঁড়িয়ে সকলেমিলে সমবেত হয়ে নিজেদের পাওনা গন্ডা আদায়ের জন্য দূর প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠেছে।এখন তথাকথিত ভদ্রজাতেরা হাজার চেষ্টা করলেও ছোটজাতদের আর অবদমিত করে রাখতে পারছে না। এমতাবস্থায় ভদ্রজাতেদের একমাত্র কল্যান হল ইতরজাতির প্রাপ্য অধিকারটুকু পেতে সাহায্য করা। তিনি বলেছেন,"... তোরা এই mass-এর [জনসাধারণের] ভেতর বিদ্যার উন্মেষ যাতে হয় তাতে লেগে যা।এদের বুঝিয়ে বলগে-'তোমরা আমাদের ভাই, শরীরের একাঙ্গ, আমরা তোমাদের ভালোবাসি,ঘৃণা করি না।' তোদের এই Sympathy (সহানুভূতি) পেলে এরা শতগুণ উৎসাহে কার্য তৎপর হবে। আধুনিক বিজ্ঞান সহায়ে এদের জ্ঞান উন্মেষ করে দে। ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, সাহিত্য সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের গূঢ়তত্বগুলি এদের শেখা। ঐ শিক্ষার বিনিময়ে শিক্ষকগণেরও দারিদ্র্য ঘোচে যাবে। আদান-প্রদানে উভয়ই উভয়ের বন্ধু স্থানীয় হয়ে দাঁড়াবে।"[১২]

স্বামীজীর আরও বলেছেন এই জগতে, এমনকি আমাদের প্রকৃতিতেও যদি বৈষম্য থাকে তাহলেও সকলের মধ্যে সমান সুযোগ-সুবিধা থাকা উচিত। তথাপি যদি কাউকে সুযোগ সুবিধা দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে তাহলে অবশ্যই দুর্বলকে অধিক সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে বলবানকে নয়। এই বক্তব্যের বোঝাতে চেয়েছেন, একজন চন্ডাল-এর বিদ্যাশিক্ষার জন্য যে পরিমাণ সুযোগ-সুবিধার প্রয়োজন একজন ব্রাহ্মণের তার প্রয়োজন নেই। তিনি বলেছেন, "যদি ব্রাহ্মণের ছেলে একজন শিক্ষকের আবশ্যক, চন্ডালের ছেলের দশজনের আবশ্যক।"[১৩]"কারণ যাহাকে প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রখর করে

নাই, তাহাকে অধিক সাহায্য করিতে হইবে। তেলা মাথায় তেল দেওয়া পাগলের কর্ম।”[১৪]অর্থাৎ শিক্ষাদান করার সময় অনগ্রসর সম্প্রদায়ের মানুষের দিকে অধিক পরিমাণে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। আর এইভাবে শিক্ষা দিতে থাকলে জনশিক্ষা জনসাধারণের মধ্যে নিজেদের অবস্থান, কর্মদক্ষতা প্রভৃতি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়িয়ে তুলবে।

জনসাধারণের মধ্যে নিজেদের অবস্থান, কর্মদক্ষতা এবং আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলতেস্বামীজী ইতিমূলক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার কথা বলেছেন।বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার নেতিমূলকভাব তাকে গভীর ভাবে বিচলিত করেছিল। তিনি মনে করতেন নেতিমূলকভাব মানুষকে দুর্বল করে দেয়, ‘এদের দ্বারা কিছু হবে না’, ‘এরা বোকা’, ‘গাধা’ ইত্যাদি নেতিমূলক শব্দবন্ধ ব্যবহারকরার বদলে যদি তাদেরকে উৎসাহ দেওয়া হয়,তাদের প্রত্যেকটি কর্মের যদি ভালো দিকগুলো উন্মোচিত করে দেখিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে নিশ্চয়ই ভালো কিছু ঘটবে এবং এই সমস্ত বিষয়গুলিতে তাঁরা উৎসাহ পেলে তাদের নিজেদের মধ্যেই আত্মবিশ্বাসের সঞ্চার ঘটবে এবং সময়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখবে। “ঠাকুরকে দেখেছি- যাদের আমরা হেয় মনে করতুম, তাদেরও তিনি উৎসাহ দিয়ে জীবনের মতিগতি ফিরিয়ে দিতেন। তাঁর শিক্ষা দেওয়ার রকমটা অদ্ভুত!”[১৫]কিন্তু আমাদের দেশের বাবা-মায়েরা ছেলেদের নেতিমূলক শিক্ষা দিয়ে দিয়ে তাদের মানসিক অবস্থাকে বিপর্যস্ত করে তুলছে। তারফল কি হচ্ছে “শ্রদ্ধাহীনতা”। যে শ্রদ্ধা হল আমাদের দেশের বেদান্তের মূলমন্ত্র, এই শ্রদ্ধা বলেই নচিকেতা যমের কাছে গিয়ে তার মুখেরউপর প্রশ্নকরতে সাহসী করেছিল। কিন্তু আমাদের যে শিক্ষা ব্যবস্থা চলছে সেখানে ঘটেচলেছে শ্রদ্ধারলোপ।ফলস্বরূপআমরা বিনাশের আরোও নিকটে এগিয়ে চলেছি। তাইস্বামীজী আক্ষেপ করে বলেছিলেন, “তোমরা এখন যে শিক্ষা পাইতেছ, তাহার কতকগুলি গুন আছে বটে, কিন্তু অবার কতকগুলি দোষও আছে; আর এই দোষগুলি এত বেশি যে, গুণভাগ নগণ্য হয়ে যায়।প্রথমত ওই শিক্ষায় মানুষ তৈরি হয় না- এ শিক্ষা সম্পূর্ণ নাস্তিকভাব পূর্ণ। এইরূপ শিক্ষায় অথবা অন্য যে কোন নেতিমূলক শিক্ষায় সব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যায়- মৃত্যু অপেক্ষাও ভয়ানক।”[১৬]

স্বামীজি ব্যক্তি সাধারণকে সেই শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার কথা বলেছেন যা হবে আত্মনির্ভরশীল এবং জীবনের সমস্যা সমাধানকারী।কারণ তিনি মনে করতেন যদি জনসাধারণকে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার শিক্ষা না শেখানো যায় তাহলে এই বিশ্বের যেকোন ঐশ্বর্যই তার পর্যাপ্ত বলে বিবেচিত হবে না। জনসাধারণকে এমনভাবে শিক্ষিত করে তুলতে হবে যার দ্বারা তার চরিত্র এবং বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন ঘটে। এইরূপঘটলে তারা আত্মনির্ভরশীল ও মিতব্যয়ী হয়ে উঠবে এবং আমাদের মত গরীব দেশে দুর্ভিক্ষের কবল থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারবে।স্বামীজী এইরূপ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেই বলেছেন, “পাশ্চাত্যবিজ্ঞানসহায়ে মাটি খুঁড়তে লেগে যা, অন্নের সংস্থান কর, চাকরি-বাকরি করে নয়- নিজের চেষ্টায় পাশ্চাত্যবিজ্ঞান সহায়ে নিত্যনূতন পন্থা

আবিস্কার কর। ওই অন্নবস্ত্রের সংস্থান করার জন্যই আমি লোকগুলোকে রজোগুণ তৎপর হতে উপদেশ দেই। অন্নবস্ত্রাভাবে চিন্তায় চিন্তায় দেশ উৎসন্ন হয়ে গেছে- তার তোরা কি করছিস? ফেলে দে তোর শাস্ত্র-ফাস্ত্র গঙ্গাজলে। দেশের লোকগুলোকে আগে অন্নসংস্থান করার উপদেশ শিখিয়ে দে, তারপর ভাগবত শোনাস। কর্মতৎপরতা দ্বারা ঐহিক অভাব দূর না হলে ধর্ম-কথায় কেউ কান দেবে না।”[১৭]

ভারতবর্ষের অসহনীয় দারিদ্র্যকে শিক্ষা বিস্তারের পথে প্রধান বাধা বলে মনে করেছিলেন স্বামীজী। এই দরিদ্র বালকগণকে শিক্ষিত করার প্রয়াসে তারা যদি দারিদ্রতার জন্য বিদ্যালয়ে না আসতে পারে তাহলে শিক্ষক প্রতিনিধি দলকে তাদের কুঠিরে গিয়ে শিক্ষা দিয়ে আসতে হবে। ভারতবর্ষের দরিদ্রদের অসহনীয় অবস্থা দেখে তিনি বলেছিলেন, “যতদিন ভারতের কোটি কোটি লোক দারিদ্র্য ও নিষ্পেষিত নরনারীর বুকের রক্তদ্বারা অর্জিত অর্থে শিক্ষিত হইয়া। উহাদের কথা একটি বার চিন্তা করিবার অবসর পায় না – তাহাদিগকে আমি ‘বিশ্বাসঘাতক’ বলিয়া অভিহিত করি।”[১৮]

স্বল্প জীবন পরিধির মধ্যে স্বামীজী তাঁর শিক্ষা দর্শনের যে বিশাল কর্মসূচির রুপরেখা এঁকেছিলেন তার চিন্তার আলোকে বর্তমান ভারতে কিছু মূল সমস্যা শিক্ষা প্রসারের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।বর্তমানে দেশে পড়াশোনায় ক্রমাবনতি হওয়ার অন্যতম কারণ হল শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা, আত্মসংযম, নিষ্ঠা ও প্রস্তুতির অভাব, উদ্যমহীনতা এবং কলুষিত পরিবেশও একটি অন্যতম কারণ। অধ্যবসায়, নিষ্ঠা এবং একাগ্রতার অভাবের ফলে তাদের মধ্যে দেখা দিচ্ছে পরীক্ষাভীতি এবং মৌলিক চিন্তা ভাবনার অভাব। ফলস্বরূপ শিক্ষার বিস্তার রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং হানি ঘটছে শিক্ষার মূল্যের ও মানের। তাছাড়া বর্তমান প্রথাগত শিক্ষাতে নেই নীতি শিক্ষার সুযোগ। এই সময়ের একান্নবর্তী পরিবার এই ধারণার বদলে তৈরী হয়েছে ‘ছোট পরিবার’ যেখানে বাবা-মা কর্মরত, বাচ্চারা মানুষ হচ্ছে কোন কাজের মাসির কাছে, কোন হাই সোসাইটি ফ্ল্যাট বাড়িতে। অতীতে ঠাকুমা, ঠাকুরদা ছাড়াও বাড়ীর অন্যান্য বড়দের কাছে রামায়ণ-মহাভারতের মতো মহাকাব্য গল্পের ছলে শুনে তাদের অবচেতন মনে রামের পিতৃ-আজ্ঞা, লক্ষণ-ভরতের ভাতৃভক্তি, সীতার পতিনিষ্ঠা, যুধিষ্ঠিরের সত্যবাদিতা, অর্জুনের অধ্যাবসায় ও একনিষ্ঠতা প্রভৃতি বিষয়ে নৈতিক জ্ঞানের উন্মেষ ঘটত। ফলে মহাকাব্যের যে সমস্ত বিষয়গুলি শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম, ত্যাগ, সত্যরক্ষা, পরার্থপরতা ইত্যাদি মূল্যবোধের জাগ্রত ঘটিয়ে বোধির বিকাশ ঘটাতো সেগুলি আজ অবলুপ্ত। বর্তমান যুগে পিতা-মাতা তাদের সন্তানদের যথার্থ শিক্ষিত হওয়ার দৌড়ে সামিল না করে কী করে কম সময়ে সহজ পন্থায় সবার আগেই পৌঁছাতে পারে সেই ইঁদুর দৌড়ের দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। ফলে তারা হাতে কলমে কিছু শেখার ব্যাপারে আগ্রহ হারাচ্ছে এবং শিশুর যেটা প্রকৃত জ্ঞান তার অন্তরের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে, সেটি

যথার্থ পরিবেশ না মেলায় প্রস্ফুটিত হতে পারছে না, অবদমিত থেকে অকালেই বিনাশপ্রাপ্ত হচ্ছে।

এই ভারতবর্ষ একটি উন্নয়নশীল দেশ। যে দেশের একটি গরিষ্ঠ অংশের জনগোষ্ঠী অতি দরিদ্র। যেখানে তাদের প্রত্যেকদিন ঠিকমতো অন্নের সংস্থান হয় না, প্রায়দিনই যাদের অর্ধাহারে বা অনাহারে দিন কাটাতে হয় সেইসব জনগোষ্ঠীর ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠানো তো বাতুলতা। তাদের কাছে অন্নের সংস্থান আগে, তারপর শিক্ষা। এর ফলে কী হচ্ছে সেই সমস্ত জনগোষ্ঠীতে সন্তানদের নিরক্ষর থেকে যেতে হচ্ছে। এইভাবে ভারতবর্ষের একটি বৃহত্তর জনগোষ্ঠী শিক্ষার হারে ক্রমান্বয়ে পিছিয়ে পড়ছে। আবার নিম্নবৃত্ত ও মধ্যবিত্ত জনসাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েরা প্রাথমিক, মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করলেও বিভিন্ন কারণে, যথা, অর্থের অভাব, কম বয়সে বিয়ে দেওয়া, পারিবারিক নানা কারণে শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছে না।

শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হলেও কতকগুলি উপায় গ্রহণ করে স্বামীজীর শিক্ষাদর্শকে সামনে রেখে ভারতবর্ষে শিক্ষার প্রসার ঘটানো যেতে পারে। যেমন : আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী সচ্ছল পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীরা বা শিক্ষিত ব্যক্তিরা যদি অবসর সময়ে এগিয়ে এসে দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের সাহায্য করতে পারেন তাহলে জ্ঞানের বিকাশ ঘটে। এইভাবে প্রত্যেকে প্রত্যেকের জন্য যদি এগিয়ে আসে তাহলে সমাজে অন্ধকার দূর হয়ে আলোর প্রকাশ ঘটবে। এই পুঁথিগত শিক্ষা দেওয়ার সাথে সাথে তাঁদেরকে কারিগরি শিক্ষার দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। স্বামীজী বলেছেন, "আমরা যত কাজ করি, তারমধ্যে অপরকে সাহায্য করা ভালো কাজ। যদিও আমরা শেষ পর্যন্ত দেখবো, পরকে সাহায্য করা নিজেরই উপকার করা।"[১৯] প্রথাগত শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত হলে তাদের মধ্যে মনোবল ও আত্মবিশ্বাসের বিকাশ ঘটবে। এর ফলে তারা নিজেরাই আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠবে এবং স্বামীজীর মতে এই আত্মনির্ভরশীলতাই হল জনশিক্ষার একটি অন্যতম পন্থা। স্বামীজী বলেছেন, "জনসাধারণকে যদি আত্মনির্ভরশীল হতে শেখানো না যায়, তবে জগতের সমগ্র ঐশ্বর্য একটা ক্ষুদ্র গ্রামের পক্ষেও পর্যাপ্ত হবে না। আমাদের কাজ হওয়া উচিত প্রধানত: শিক্ষা দান - চরিত্র এবং বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি সাধনের জন্য শিক্ষার বিস্তার... (যাতে) ওই শিক্ষার ফলে তারা আত্মনির্ভরশীল ও মৃতব্যায়ী হয়ে হতে পারে।"[২০]এরূপ বিকাশ সাধনের ক্ষেত্রে চারটি সুত্র সকলের কাছে শিক্ষণীয় - (১) শ্রদ্ধাবান হওয়া (২) নির্ভয় চিত্ততা হওয়া (৩) নিঃস্বার্থ চিত্ততা হওয়া এবং (৪) সত্যবাদিতা অর্থাৎ সত্যের জন্য সবকিছু ত্যাগ করলেও কোন অবস্থাতেই সত্যকে ত্যাগ না করা। 'এই চারটি সূত্রকে কাজে লাগাতে স্বামীজীর 'Three H' ফর্মুলা বা Head (মস্তিষ্ক বা বোধি), Hand (নিষ্কাম কর্ম) এবং Heart (অনন্ত প্রেমের পরিপূর্ণ হৃদয় বা বোধ) ফর্মুলা খুবই কার্যকরী। এই তিনের সমন্বয়ে হারানো মূল্যবোধ ফিরে আসবে এবং যা 'হওয়া' ছিল তা 'করা'য় রূপান্তরিত হবে।'[২১]

কেউ কেউ বলবেন স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তার রূপরেখার বাস্তব প্রয়োগ খুব সহজ বিষয় নয়। একথা অনেকাংশে সত্য হলেও কিন্তু অসম্ভব নয়, এটিও সত্য। স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণ উপদৃষ্ট পথে যে শ্রীরামকৃষ্ণমঠকে স্থাপন করে গেছেন সেই সমস্ত মঠ ও মিশন পরিচালিত বিদ্যালয়গুলিতে আজ স্বামীজীর শিক্ষাদর্শের যথাযথ প্রয়োগ হচ্ছে। তাছাড়া বর্তমানে সরকারী বিদ্যালয়গুলিতে 'মিড-ডে-মিল', 'সর্বশিক্ষা অভিযান' প্রভৃতি পরিকল্পনার রূপায়নের মধ্য দিয়ে শিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টা প্রতিনিয়ত এগিয়ে চলেছে। স্কুল কলেজগুলিতে Chalk and talk শিক্ষা প্রণালীর পরিবর্তে ভিন্নতর শিক্ষাদান প্রণালী যথা, audio-visual প্রণালীকে প্রয়োগ করা হচ্ছে। এছাড়াও সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সাথে সমান্তরালভাবে ভিন্ন ভিন্ন নামে চরিত্র গঠনকারী, কারিগরী শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। যেমন: চরিত্র গঠনকারী শিক্ষাগুলি value education, soft skill ইত্যাদি নামে এগিয়ে চলেছে, যদিও তাদের উদ্দেশ্য এক - মানুষের মধ্যে নিয়মনিষ্ঠা, কর্মনিষ্ঠা, সততা, আনুগত্য ইত্যাদি জাগিয়ে তোলা। জনশিক্ষা ও জনগণের উন্নতি সাধনের জন্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ বিশেষ সংরক্ষণ ব্যবস্থা নীতিও গ্রহণ করা হয়েছে। আবার স্বামীজীর পরিকল্পিত পথ অনুসরণ করে আমাদের মতো কৃষি প্রধান দেশ কৃষির উন্নতির সাধনের জন্য কৃষি বিদ্যালয় গড়ে তোলা হয়েছে। এই কৃষি প্রসঙ্গেই স্বামীজী বলেছেন,"নেহাত চাষাড়ে বুদ্ধিতে চাষ নয়, বিদ্বান বুদ্ধিমানের বুদ্ধিতে করতে হবে।... লেখাপড়া জানা লোক পল্লীগ্রামে বাস করলে আর চাষবাসটা বিজ্ঞান সাহায্য করলে উৎপাদন বেশি হয় - চাষাদের চোখ খুলে যায়।"[২২]

স্বামীজীর মতে শিক্ষার মূল কথা হল আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। যার জন্য প্রয়োজন গভীর আন্তরিকতা ও নিবিড় অনুশীলন। তিনি বলতেন, শিক্ষা মস্তিষ্ক, স্নায়ু, ধমনীতে বয়ে নিয়ে যাবে জীবনকে গঠন করার জ্ঞান ও বুদ্ধির জ্যোতি। তেমনি আবার এই গুণাবলীর অনুশীলন মনের গভীরে এমনভাবে সংবাহিত হবে যার ফলে মানুষের মনে হিংসা, লোভ, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি প্রস্ফুটিত হবে না। ফলে অন্তর্জগতে সাত্ত্বিকতার প্রকাশ ঘটবে। তিনি অন্তর্জগতের শিক্ষার উপযোগিতা বিশ্লেষণে আত্মনিষ্ঠ শিক্ষাই যে সব থেকে বেশি কাঙ্খিত সে বিষয়ে মেছুনীর গল্পের মাধ্যমে শিক্ষার বিষয়টি চমৎকার ভাবে উপস্থাপন করেছেন। পরিশেষে বলা যায়,স্বামীজী তাঁর জীবন সাধনায় 'বহুজন সুখায়, বহুজন হিতায়' যে আদর্শের জন্ম দিয়েছিলেন সেই আদর্শ ভারতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। শিক্ষাদানের পরমপ্রাপ্তি আসলে সহস্র কোটি ভারতবাসীর মঙ্গল বিধান।

তথ্যসূত্র :

১. স্বামীজীর বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২৫৪

২. স্বামীজীর বাণী ও রচনা, অষ্টম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২৭০
৩. তদেব,পৃষ্ঠা,০২
৪. স্বামীজীর বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৬৭
৫. শিক্ষা প্রসঙ্গ, স্বামী বিবেকানন্দ, পৃষ্ঠা,০২
৬. তদেব,পৃষ্ঠা, ০৩
৭. স্বামীজীর বাণী ও রচনা, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৪৪
৮. স্বামীজীর বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২৩৫-৩৬
৯. আমার ভারত অমর ভারত, স্বামী বিবেকানন্দ, পৃষ্ঠা, ৫৩
১০. স্বামীজীর বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা, ৪৪২
১১. স্বামীজীর বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১৩৪-৩৫
১২. শিক্ষা প্রসঙ্গ, স্বামী বিবেকানন্দ, পৃষ্ঠা,১১১-১২
১৩. আমার ভারত অমর ভারত, স্বামী বিবেকানন্দ, পৃষ্ঠা, ৫৪
১৪. স্বামীজীর বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা,৭২
১৫. স্বামীজীর বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১১১
১৬. শিক্ষা প্রসঙ্গ, স্বামী বিবেকানন্দ, পৃষ্ঠা, ৪৬
১৭. স্বামীজীর বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১৬৪
১৮. স্বামীজীর বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ০৪
১৯. স্বামীজীর বাণী ও রচনা, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২২৬
২০. স্বামীজীর বাণী ও রচনা, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা, ২২৬
২১. অন্তর্মুখ, সম্পা.খোকন কুমার বাগ , তন্মধ্যে 'বিবেকানন্দের শিক্ষা ভাবনা ও বর্তমান ভারত' , পৃষ্ঠা, ৬১
২২. যুগনায়ক বিবেকানন্দ, স্বামী গম্ভীরানন্দ, পৃষ্ঠা, ২১৬

গ্রন্থপঞ্জী:

১. কালিদাস ভদ্র(সম্পা.), জানা অজানা বিবেকানন্দ, হোলি চাইল্ড পাবলিকেশন, কলকাতা ১৪১৯।
২. খোকন কুমার বাগ(সম্পা.), অন্তর্মুখ, সাম্পান, বর্ধমান, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১২।
৩. নিমাই সাধন বসু(সম্পা.), শাশ্বত বিবেকানন্দ, আনন্দ, ষষ্ঠ মুদ্রণ, কলকাতা, ফেব্রুয়ারী ২০১২.
৪. শংকরীপ্রসাদবসু , বিবেকানন্দও সমকালীন ভারতবর্ষ, তৃতীয় খন্ড, মন্ডল বুক হাউস, কলকাতা,২০০৮।
৫. স্বামী গম্ভীরানন্দ, যুগনায়ক বিবেকানন্দ, প্রথম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৯৮৫।
৬. স্বামী চিদস্বরূপানন্দ (সম্পা.), বহুরূপে সম্মুখে তোমার, পুনশ্চ, কলকাতা, ২০১৩।

৭. স্বামী লোকেশ্বরানন্দ (সম্পা.), চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার, গোলপার্ক , কলকাতা, ২০১২।

৮. স্বামী বিবেকানন্দ, আমার ভারত অমর ভারত, বেলুড় মঠ, ২০১২।

৯. স্বামী বিবেকানন্দ,পত্রাবলী , উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০তম পুনর্মুদ্রণ, মাঘ ১৪২০।

১০. স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামীজীর বাণী ও রচনা, প্রথম খণ্ড, অষ্টাদশ পুনর্মুদ্রণ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০০৩।

১১. স্বামী বিবেকানন্দ,স্বামীজীর বাণী ও রচনা, দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চদশ পুনর্মুদ্রণ উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০২।

১২. স্বামী বিবেকানন্দ,স্বামীজীর বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড, , চতুর্দশ পুনর্মুদ্রণ উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০০২।

১৩. স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামীজীর বাণী ও রচনা, সপ্তম খণ্ড, দ্বাদশ পুনর্মুদ্রণ উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০০১।

১৪. স্বামী বিবেকানন্দ,স্বামীজীর বাণী ও রচনা, অষ্টম খণ্ড, দ্বাদশ পুনর্মুদ্রণ উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ফেব্রুয়ারী ২০০২।

১৫. স্বামী বিবেকানন্দ,স্বামীজীর বাণী ও রচনা, নবম খণ্ড,ত্রয়োদশ পুনর্মুদ্রণ উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, আগস্ট ২০০২।

১৬. স্বামী বিবেকানন্দ, শিক্ষা প্রসঙ্গ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০১১।

১৭. Dr. Subhas Chandra & Alok Ranjan Khatua(Ed.), Philosophical Perspective of Rabindranath Tagore & Swami Vivekananda on Education in the Present Scenario, Reader Service, Kolkata 2012.

মার্কিন বহুসংস্কৃতিবাদ : অজানা জগতের চেনা 'কলচর'

বিমান সাহা
সহকারী অধ্যাপক, রানাঘাট কলেজ, রানাঘাট, নদীয়া

সারসংক্ষেপ : বহুসংস্কৃতিবাদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক এবং আর্থ-সামাজিক পরিচিতি। বস্তুতঃ এশীয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আগত মানব স্রোত মূল ধারার সাদা আমেরিকানদের সঙ্গে কী ধরণের সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হবে, সেটি ভিন্ন সংস্কৃতির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের প্রশ্নে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক আলোচ্য বিষয়। একদিকে প্রতিটি সংস্কৃতির মানুষের স্বতন্ত্র পরিচিতির দাবি, অপরদিকে মূল ধারার মার্কিন সংস্কৃতির সঙ্গে মানিয়ে চলার দায়—এই দু'য়ের সামঞ্জস্য বিধানের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ বাস্তব কিছু ঘটনা মার্কিন বহুসংস্কৃতিবাদের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কার্যকরী।

মূলশব্দ: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বহুসংস্কৃতিবাদ, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, আর্থ-সামাজিক, এশীয়া।

'চড়তে হলে এভারেস্ট, পড়তে হলে বিদেশ।' মহানাগরিক 'কলচর' এখন যে এই মতেই বিশ্বাসী, তা পরিসংখ্যান সিদ্ধ। তবে কেবল পড়তে নয়, সাম্প্রতিক তথ্য বলছে নাগরিকত্ব ত্যাগ ও বিদেশী নাগরিকত্ব গ্রহণের ক্ষেত্রেও এসেছে জোয়ার। ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তথ্যানুসারে ২০২১ সালে ১.৬ লক্ষ-এর বেশি ভারতবাসী নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করে বিদেশের নাগরিক হয়েছেন। আবার, এর মধ্যে সবচেয়ে বেশী পাড়ি দিয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে (৭৮,০০০)। তবে এ প্রবণতা যে কেবল ভারতীয়দের, তা বললে মার্কিন 'কলচর'-এর বহুত্বে ব্যাথা লাগতে পারে! 'মাল্টিকালচারাল ম্যানার্স' শীর্ষক গ্রন্থে লেখক তথ্যবহুল যে পরিচিতি মার্কিন সমাজ সম্পর্কে রেখেছেন, তা বেশ আকস্মিক না হলেও, আকর্ষক তো বটেই! মার্কিন নাগরিকদের নয় জনের মধ্যে একজনের জন্মবৃত্তান্ত নাকি আমেরিকার বাইরে রচিত। আরও গুরুত্বপূর্ণ হল প্রতিবছর ১.৩ মিলিয়ন অভিবাসী আমেরিকায় পাড়ি দেন। যার ভিত্তিতে ইউ.এস. সেনসাস ব্যুরো-এর গণনা বলছে ২০50 সালের মধ্যে হিসপ্যানীয় এবং এশিয় মানুষের সংখ্যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তিনগুণ হবে। গল্পবৎ পরিসরে সত্যের অপলাপ হবে, যদি স্বীকার না করা হয় যে, নিউইয়র্ক, ক্যুইনস্ সহ কয়েকটি স্থানে জনসংখ্যার ৭০ শতাংশ প্রথম সূর্য দেখেছেন মার্কিন মুলুকের বাইরে। স্বাভাবিক ছন্দে কেবল সাধারণ কান্ডজ্ঞান বলে দেয় এহেন মার্কিন বটবৃক্ষ বহু ও বিভিন্ন পথে আগত পথিক কুলকে কেবল ক্ষণিক ছায়াবর্ষণই করেনি, নতুন পরিচিতি কে পাথেয় করে চলার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিয়েছে, দিয়েছে স্থায়িত্ব। আর, সেই সূত্রেই নব নব 'কলচর' (সৈয়দ মুজতবা আলী বর্ণিত) সহযোগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বহুসংস্কৃতির চর্চা ও চর্যা নজর কেড়েছে।

মার্কিন (বহু) সংস্কৃতির রস্বাসাদনের পূর্বে বহুসংস্কৃতিবাদের বিচিত্র প্রেক্ষাপট সহ কিঞ্চিৎ বিশিষ্ট মতামত গ্রহণ বিষয়ের সম্যক আলোচনার পক্ষে সুপেয় বলে বোধ করি। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথ যখন 'গীতাঞ্জলী'-তে লেখেন, "হেথায় আর্য, হেথায় অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন-শক-হুণ-দল-পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন" - তখন পশ্চিমী 'কলচর'-এর বহুত্ববাদের আধুনিক মাত্রা হয়ত থাকে না! প্রকৃত অর্থে, রবীন্দ্রনাথ-এর সনাতন ভারতীয় ঐতিহ্যের আলোকে বর্ণিত বৈচিত্র্যের সমাহার তথাকথিত আধুনিক আমেরিকার শ্লাঘাকে স্পর্শ করতে পারে কি? কারণ প্রেক্ষিত যে আলাদা! ইতিহাস বলে ভারত প্রাচীন মানব সভ্যতার ঐতিহ্য বহন করছে শুধু নয়, সমগ্র বিশ্বকে আধ্যাত্মিক আনন্দের নির্যাসও সরবরাহ করছে। অন্যদিকে, আমেরিকা একটি নব্য সভ্যতা। ১৬২০ সালে ব্রিটেন থেকে একদল ব্রিটিশ যাত্রা শুরু করে আমেরিকার উদ্দেশ্যে এবং ওই সনেরই শেষ দিকে (নভেম্বর) পৌঁছে যায়। এরপর থেকে সেখানে ক্রমে শুরু হয় ব্রিটিশদের আধিপত্য। আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের অবস্থার ক্রমাবনতী ঘটতে থাকে। পরবর্তী কালে আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা ও এশিয়া থেকে বহু মানুষের আগমণ ঘটে। অবশ্য কোন মহৎ উদ্দেশ্যে এই শুভাগমন হয়ত নয়; বরং কাজের লোক হিসেবে বা মানুষের নূন্যতম সম্মান বর্জিত ভাষায় বলা চলে 'কৃতদাস' হিসেবে তারা থাকতে বাধ্য হয় নতুন এই দেশে। আমেরিকার স্বাধীনতার (১৭৭৬ সালের ৪ঠা জুলাই) পর বহুবছর বাদে এই কালো মানুষদের স্বার্থে শুরু হয় গৃহযুদ্ধ (১৮৬১-১৮৬৫)। গৃহযুদ্ধের প্রাক্ কালীন আমেরিকায় ১৩ শতাংশ অ্যাফ্রো-আমেরিকান কালো মানুষ বাস করতেন দাস হয়ে। গৃহযুদ্ধের ফলস্বরূপ মার্কিন সংবিধানে তিনটি সংশোধনী আনা হয় (১৩, ১৪ ও ১৫) যথাক্রমে দাসপ্রথার বিলোপ, কালো মানুষদের নাগরিকত্ব প্রদান ও সমানাধিকারের ব্যবস্থা, এবং জাতি, বর্ণ বা পূর্ববর্তী দাসত্বের জীবনের নিরিখে ভোটাধিকার খর্ব না করার ভিত্তিতে। অবশ্য এর পরবর্তী পর্বে সাংবিধানিক সুরক্ষাকবচ যে বাস্তবিক বহুসংস্কৃতির পথকে মসৃণ করেনি - এটা যেমন সত্য, একই ভাবে সত্য হল বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে বিশেষ করে এশিয়া থেকে অজস্র মানুষ পাড়ি দিয়েছে এবং দিচ্ছে মার্কিন মুলুকে। ১৯৬৮ সালে ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফর্নিয়া বার্কলে -র স্নাতক স্তরের স্টুডেন্ট ইমা গী (Emma Gee) এবং য়ুজি ইচিওকা (Yuji Ichioka) একটি গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করলেন, যেখানে 'এশীয়-আমেরিকান'(Asian-American) শব্দ বন্ধটি সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয়েছে বলে জানানো হয়।

এই ভাবেই গড়ে উঠেছে 'থার্ড ওয়ার্ল্ড লিবারেশন ফ্রন্ট' এবং আরো কত সংগঠন, যা এইরকম তৃতীয় বিশ্বের থেকে আগত আমেরিকা নিবাসীদের স্বার্থ রক্ষার্থে ভূমিকা নেয়। কিন্তু এত সংগঠন, সিভিল রাইটস মুভমেন্ট ইত্যাদির পরেও ২০২০ সালের আমেরিকা সাক্ষী থাকলো ৪৬ বছর বয়সী আফ্রিকী-আমেরিকান জর্জ ফ্লয়েড-এর পুলিশ অফিসারের হাতে হত্যার ঘটনাটি। নতুন মাত্রা পেল 'Black Lives Matter'

নামক আন্দোলন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই ভিন্ন প্রেক্ষিত আমেরিকার বহুসংস্কৃতির ব্যাখ্যাকেও দিয়েছে ভিন্ন মাত্রা। 'মেল্টিং পট' নামক তত্ত্ব-এর মানদন্ডে বিশ্লেষণের যে ধারা বহমান, তা আসলে কানাডার 'স্যালাড বোল' (salad Bowl) প্রতিরূপের বিপরীত বলে প্রচারিত। সৈয়দ মুজতবা আলীর ভাষায় বলতে হয় - খুলে কই । বস্তুতঃ ১৯৭১ সালে কানাডায় সর্বপ্রথম আধুনিক অর্থে 'মাল্টিকালচারালিজম পলিসি' গৃহীত হয়েছে। এক্ষেত্রে যে দৃষ্টিভঙ্গি অনুসৃত হয়েছে, সেটি এইরকম যে, একটি স্যালাডের বাটিতে বিভিন্ন উপাদান যেমন শশা, গাঁজর ইত্যাদি নিজ নিজ অস্তিত্ব বজায় রেখেও একত্রে বিরাজমান থাকে, সেই রূপ কানাডার প্রতিটি সংস্কৃতির মানুষ নিজস্ব সংস্কৃতি অটুট রেখেও একত্রে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করবে। পক্ষান্তরে, আমেরিকার মেল্টিংপট তত্ত্বের নির্যাসটি ভিন্ন কথা কয় । সেই মতানুযায়ী সকল সংস্কৃতির মানুষ একটি সাংস্কৃতিক ঘরানাকে আয়ত্ত করে একত্রে বসবাস করবে। অর্থাৎ একই ভাষা, আদব-কায়দা, পোশাক, খাদ্য ইত্যাদির অভ্যাস আয়ত্ত করতে হবে। আর এখানেই ভিন্নতার প্রশ্ন - এভাবে বহুর নিজস্ব অস্তিত্ব থাকে তো? এই স্থানে ড্যামেজ কন্ট্রোলে নেমে উইল কিমলিকা-র মত উদারনৈতিক তাত্ত্বিকগণ বলেন, কেবল জাতিগত বিভিন্নতা নয়, বহুসংস্কৃতিবাদ মানবাধিকার, পৌর অধিকার সমূহ এবং গণতান্ত্রিক দায়বদ্ধতার বিষয়ে নেত্র নিক্ষেপ করে। কিন্তু ভিখুপারেখ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Rethinking Multi-culturalism' গ্রন্থে সততার সঙ্গে থিওডোর রুজভেল্ট-এর মতামতকে উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে, মার্কিন সংস্কৃতির দ্রুত আত্তীকরণই বিদেশ থেকে আগত অভিবাসীদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এক্ষেত্রে মার্কিন ভাষা এবং সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করা বহুসংস্কৃতির একটি অত্যাবশ্যকীয় শর্ত।

শর্ত যে সতত সতঃসিদ্ধ হবে, তা বইত নয়। কিন্তু এই প্রেক্ষাপটে আমরা চলে যাব মার্কিন (বহু) সংস্কৃতির বাস্তব চিত্র পরিবেশনকারী কিছু বাস্তব ঘটনার ঘনঘটায়। নোরাইন ড্রেসার তাঁর তথ্যবহুল গ্রন্থে এইরকমই কিছু সত্য ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। দেখা যাক্ কী রকম সেই ঘটনা। একটি জাপানি ব্যক্তির সংস্থা, যা মার্কিন মুলুকে বিস্তার ঘটিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত সেই সংস্থার প্রায় সকল কর্মী জাপানি। ব্যতিক্রম যে নেই, তা নয়। এই রকমই একজন হলেন হেলেন অলসন। জাপানি কর্মীদের সঙ্গে মার্কিনী কর্মীদের ভাষাগত যোগাযোগের সমস্যা এখানে রয়েছে। কিন্তু কাজের দিনে হেলেন তার ঊর্ধ্বতনের সঙ্গে একটি বিষয়ে কথা বলতে চাই। বাঁধ সাধে ভাষা। অগত্যা সে ইঙ্গিতের শরণাপন্ন হয়। কিন্তু সেখানেও তো সেই 'কলচর' -এ ফেঁসে যেতে হল। ঘটল কী? হেলেন মার্কিনী ইঙ্গিতে আঙুল বাঁকিয়ে জাপানি অফিসারকে ডাকলেন। কিন্তু 'কলচর' যে আলাদা, আর সে তো ইঙ্গিতেও আছে! ফলে জাপানি অফিসার বুঝলেন তার দেশজ সংস্কৃতির ধারায়। জাপানি ধারণায় এই ধরনের ইঙ্গিত করে ডাকা হয় পশুকে বা নিঁচু স্তরীয় কোন ব্যক্তিকে বা বৃহন্নলাদের। অর্থাৎ হেলেনের ইশারা জাপানি সংস্কৃতির মানদণ্ডে নিম্নমানের পরিচায়ক। হেলেন সে ভাব বুঝতে

অপারগ নয়। ফলত সে সেই সংস্থা ছেড়ে চলে গেলেন। অর্থাৎ দুই সংস্কৃতির মিশ্রণের যে সুফল, তা এখানে চোখে পড়ল না। মার্কিন নিরপেক্ষ সংস্কৃতি যে অভিবাসীদের কাছে অনেক ক্ষেত্রেই অপ্রীতিকর ও অস্বস্তিকর, সেটা বোঝানোর জন্য আসা যাক্ অপর একটি ঘটনায়। সচেতনতা বিষয়ক একটি আলোচনা চক্র। শ্রোতাদের মধ্যে রয়েছেন বিভিন্ন বয়সের মহিলা, যারা এশীয়-আমেরিকান। বিশেষ করে মুসলিম মহিলাগণও রয়েছেন। সকল এশীয়-আমেরিকান মহিলাদের মধ্যে যিনি এই সচেতনতা শিবিরে আলোচনা করছেন, তিনি একজন পুরুষ এবং মূলধারার আমেরিকান। এই পর্যন্ত সব ঠিক-ই ছিল। কিন্তু অন্তরের অস্বস্তি বাইরে বেরিয়ে আলোচনা কক্ষে দ্রুত ব্যাপৃত হল এবং মহিলারা এমনকি চোখ তুলে আলোচনা শুনতেও দ্বিধা বোধ করলেন। আলোচক ও শ্রোতৃবিন্দের মধ্যেকার সংস্কৃতির ভিন্নতা মূল আলোচনার সার্থকতাকে অনেকাংশে ব্যর্থতার ডাস্টবিনে ফেলে দিল। কারণ হল – পুরুষ আলোচক এইডস্-এর কারণ ও অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা ও শিক্ষণ প্রতিরূপ গুলি যা দেখাচ্ছিলেন, সেগুলির মধ্যে এমন কিছু ছিল যা একজন পুরুষের কাছ থেকে দেখা বা শোনা এশীয় নারীদের অনেকের ক্ষেত্রেই সংস্কৃতি রহিত।

এবারে দেখা যাক্ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আগত অভিবাসীদের মধ্যেকার সম্পর্কের গতি প্রকৃতি ঠিক কেমন এবং আচার-আচরণ এক্ষেত্রে কতটা গুরুত্ব পায়। লাতিন আমেরিকার দুটি দেশ কোস্টারিকা ও ইক্যুয়েডর। এই দুই দেশ থেকে মার্কিন মুলুকে আগত দুটি পরিবারের দু'জন মেয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি স্কুলে পড়াশোনা করে। এই দুইজনের মধ্যে বন্ধুত্ব বেশ জমাটি। লুইসা জন্মেছে কোস্টারিকায় কিন্তু বেড়ে উঠেছে ডোমিনিকান রিপাবলিকে। অপরদিকে, ভিভিয়ান এসেছে ইক্যুয়েডর থেকে। বন্ধুত্বের বন্ধন এতটাই যে দুইজন ঠিক করে ম্যাটিনি শো দেখতে যাবে সিনেমা হলে। যেমন কথা, তেমন কাজ। লুইসা চলে এসেছে ভিভিয়ানের বাড়ির দরজায়। কিন্তু আমাদের দেশেও যেমন অল্প বয়সের একটি মেয়ে রাতের বেলায় একাকী সিনেমা দেখার জন্য অপর বান্ধবীর বাড়ি আসে, বান্ধবীর মা অবাক হন। ঠিক তেমনি লুইসা দেখল ভিভিয়ানের মায়ের বিস্ময় দৃষ্টি তাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে। কিছুক্ষণ নির্বাক দৃষ্টি পর্ব চলল। অতঃপর লুইসা ভিভিয়ানদের বাড়িতে প্রবেশ করল। কিন্তু তখনও ক্লাইম্যাক্স বাকি! ভিভিয়ানের মা ভেতরে গিয়ে মেয়ে লুইসার আগমনের খবর দিলেন। পনেরো মিনিট পর ভিভিয়ানের প্রবেশ। অশ্রুপূর্ণ নয়ন রক্তবর্ণ হয়ে রয়েছে। ভিভিয়ান তবুও কথা বলল। বান্ধবী লুইসাকে সে জানালো কেন তার পক্ষে সিনেমায় যাওয়া সম্ভব নয়। তবে একটি আশ্বাসও এলো ভিভিয়ানের নিকট হতে - আগামীকাল স্কুলে দেখা হবে! আসলে বন্ধুত্বের এই রাত যে আর নতুন সূর্য দেখবে না, তা উভয়েরই হয়তো বোঝা হয়ে গেল! অতঃপর দুটি দেশের দুই যৌবনের বন্ধুত্বকে কেড়ে নিল সংস্কৃতির বিভিন্নতা। আসলে ইকুয়েডরের সংস্কৃতিতে ১৬ থেকে ২০ বছরের

মধ্যেকার মহিলাদের রাতে একা ঘর থেকে বেরোনোর অর্থ হল, সেই মেয়েটি চরিত্রের দিক থেকে অসৎ। আর এই মানসিকতা আমেরিকার মুক্ত পরিবেশেও ওই পরিবার থেকে বিতাড়িত হয়নি। তাই ভিন্ন দেশে বিবিধ দেশ থেকে আগত মানুষের একত্রে থাকার প্রয়োজনীয়তা ও বন্ধুত্ব যেখানে যুগের দাবী, সেখানেও সংস্কৃতির বাধ্যবাধকতা কতটা কঠোর হতে পারে, তা এই ঘটনায় প্রমাণ হয়। এই বৈপরীত্য যে কেবল লাতিন আমেরিকার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, তা নয়। অপর একটি ঘটনার অভিজ্ঞতার আঁচ নেওয়া যাক্। একবার একটি মার্কিন কোম্পানি চিনা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ব্যবসা বৃদ্ধির দায়িত্ব একজন কর্মচারীর হাতে অর্পণ করে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারী পরিকল্পনামাফিক একটি চীনা রেস্টুরেন্ট বুক করেন এবং ২০০ চৈনিক ব্যবসায়ী ও অতিথিকে আমন্ত্রণ জানান। এরা সকলেই বর্তমানে আমেরিকার অধিবাসী। পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট দিনের অনুষ্ঠান শুরু হল। ইতিমধ্যে ছয়জন চলেও এসেছেন। কিন্তু পরিকল্পনার ত্রুটি ধরা পরল যখন দেখা গেল বাকি ১৯৪ জন অনুপস্থিত রইল। পরে বেরিয়ে এল এর প্রকৃত কারণ। রেস্টুরেন্টের মালিক জানালেন যে আসলে ওই আমন্ত্রিত চৈনিকগণ মূলত মূল ভূখণ্ডের মানুষ, যারা তাইওয়ানকে শত্রু হিসেবেই দেখে। অপরদিকে, রেস্টুরেন্টের মালিক ছিলেন তাইওয়ানের মানুষ। স্বাভাবিক কারণেই অতিথিগণ পার্টিতে গরহাজির থাকেছেন। অর্থাৎ নতুন দেশের নতুন পরিবেশ দ্বন্দ্বকে ভুলতে দেয়নি। এই দ্বন্দ্বটি একাধারে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক।

নোরাইন ড্রেসার তাঁর বইটিতে এত সব বিষয়ের গভীরে গেছেন যে, তা কখনও মার্কিন বহুসংস্কৃতি সম্পর্কে ক্রোধ, কখনও হাসির উদ্রেক ঘটায়। এরকম কিছু দুষ্টু-মিষ্টি ঘটনা ভাগ করে নেওয়া যাক্। ছোট থেকে আমরা শুনি মানুষের চোখ হল দর্পণ। চোখ দেখলেই বোঝা যায় কোন্ মানুষ কেমন। একজন বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ফ্রান্সিস স্কট কী ফিজারল্ড-এর অনুভূতি হল –"বিশ্ব কেবল তোমার চোখে অবস্থান করে। তুমি তোমার মত করে একে বড় বা ছোট করতে পারো"। আবার বিল কোজী বলছেন, "প্রতিটি বন্ধ চোখ ঘুমন্ত নয় এবং প্রতিটি খোলা চোখ দৃষ্টি প্রদানকারী নয়"। বস্তুত দৃষ্টি গভীর হোক বা সংকীর্ণ, সু হোক বা কু, স্নেহময়ী হোক বা কাম-কাঞ্চন প্রত্যাশী - সে সর্বদাই আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু! 'চোখে চোখে' কথা বলার যে ভঙ্গিমা ভারতীয় যুব মনে প্রাণ সঞ্চার করে, তা মূলত আনন্দের বার্তা বাহক। আবার 'চোখে চোখ রেখে' কথা বলার মধ্যে ফুটে ওঠে বিনা যুদ্ধে 'সূচাগ্র মেদিনী' না ছাড়ার মনোভাব; যাতে থাকে ক্ষমতার আস্ফালন। কিন্তু এগুলির কোনোটি মার্কিন সংস্কৃতির চোখে চোখ রাখার ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এবারে আসি ঘটনায়। মি. হায়েস্ একজন আমেরিকান, যিনি একটি ঔষধ কোম্পানীর ম্যানেজার। তার বেশ নাম আছে এবং তিনি নিজেও নাক উঁচু স্বভাবের। মনে করেন তিনি যে ভাবে ব্যবসা পরিচালনা করছেন, সেটা যথেষ্ট ভালো এবং সকল কর্মচারী ও ক্রেতা খুবই সন্তুষ্ট চিত্ত। একদিন এই মনোভাবের সঙ্গে তিনি একজন কর্মচারীকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য কফির আমন্ত্রণ জানালেন এবং একটু বিশ্রাম

নেওয়ার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু ঘটল মজার এবং একই সঙ্গে অপমানজনক ঘটনা। যে ভদ্র মহিলা (কর্মচারী)-র সঙ্গে তিনি কথা বললেন, সে মাথা নিঁচু করে হায়েস-এর সঙ্গে কথা বলল। কিন্তু হায়েস যে মার্কিন সংস্কৃতিতে জন্মেছে, সেখানে মাথা নিঁচু করে কথা বলা এবং চোখে চোখ না রাখার অর্থ হল অপরকে অশ্রদ্ধা ও অসম্মান জ্ঞাপন। সুতরাং হায়েস তাঁর অধঃস্তন কর্মচারীকে তিরস্কার করলেন এবং চোখে চোখ রেখে কথা বলার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দিলেন। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে কর্মচারীর বিরুদ্ধে আপত্তিজনক অভিযোগ উঠল, তিনি নিজেই এতে অপমানিত হলেন। কারণ তার সংস্কৃতিকে বহুসংস্কৃতির দেশ আমেরিকা সম্মান জানাল না। সেই ভদ্রমহিলা ইসাবেলা কিছুদিন আগেই মেক্সিকো থেকে এসেছেন। আর, মেক্সিকোতে শিক্ষক, নিয়োগকর্তা, পিতা-মাতা ইত্যাদি মানুষদের সঙ্গে কথা বলার সময় তাদের শ্রদ্ধাবশত মাথা নিঁচু করে রাখাটাই শ্রেয়। এটাই তাদের সংস্কৃতি। কিন্তু সেটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তথা-কথিত (বহু) সংস্কৃতিতে অসম্মানজনক। তবে এই সমস্যা যে শুধু সামান্য বাদানুবাদ বা অসম্মানের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে, তা মনে করলে সমস্যার তল পাওয়া যাবে না। আমেরিকায় যে অ্যাফ্রো-আমেরিকানদের ফুটবল টিমে নিয়োগ করা হয়, সেই নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন অভিবাসী যদি মাথা নিচু করে চোখ সরিয়ে কথা বলে, তবে তার কপাল পুরবে! এটাই বাস্তব চিত্র।

অবশ্য এই সব পড়ে কেউ যদি মনে করে যে মার্কিন বহুসংস্কৃতিবাদ থেকে প্রাপ্ত নেতিবাচক অভিব্যক্তি গুলিতে সর্বদা মার্কিনদেরই অবদান; তবে এই গল্পের মজা অধরা থেকে যাবে। মার্কিন বহুসংস্কৃতির মধ্যে নিজস্ব সংস্কৃতিকে স্বমহিমায় টিকিয়ে রাখার প্রশ্নে অভিবাসীদেরও মানসিক বা অন্য দুর্বলতা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। মায়ের বুকের দুধ শিশুকে পান করাবার বিষয়ে আমেরিকা নিবাসী বিভিন্ন দেশ থেকে আগত অভিবাসীদের বিচিত্র অভিজ্ঞতা শোনা ও তা দূর করার জন্য দ্য কমিউনিটি হেলথ ক্লিনিক থেকে একটি সচেতনতা শিবির এর আয়োজন হয়েছে। সেখানে বিভিন্ন জন বিভিন্ন বিশ্বাসের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। কেউ বলেন একবছর হয়ে গেলে মায়ের দুধ শিশুর পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে যায়। কেউ বলেন দুধ যদি মাটিতে পড়ে, তবে তা সকলের জন্য অকল্যাণকর। এই মতটিও উঠে আসে ধূমপান, মদ্যপান এবং ঔষধের ব্যবহার শিশুকে কোন ক্ষতি করে না। এইসব বিশ্বাস বা মতামত এর পিছনে আছে বিভিন্ন সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্বকারী অভিবাসী মহিলা। যিনি সচেতনতা বৃদ্ধির দায়িত্বছিলেন, তিনি আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অথচ মারাত্মক প্রবণতা উপলব্ধি করলেন, সেটি হলো অনেক অভিবাসী মায়েদের মতে, বোতলের দুধ পান করানো হল আধুনিক চিন্তাপ্রসূত, কারণ এটি আমেরিকার নারীদের সংস্কৃতি। সে কারণে মার্কিন সংস্কৃতিকে গ্রহণ করাই শ্রেয়। অর্থাৎ শুধু যে আমেরিকানরাই তাদের সংস্কৃতি এশিয়া ,আফ্রিকা ইত্যাদি স্থান থেকে আগত মানুষদের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে, তা নয়; বরং অভিবাসীরাও অনেক কিছু স্বেচ্ছায়

গ্রহণ করছে, কেবল এই ভেবে যে আমেরিকানরা উন্নত, আধুনিক এবং তাই তাদের আদব-কায়দা গ্রহণযোগ্য।

শুধু খারাপ খারাপ - এই তকমা দিয়ে আমেরিকার বহুসংস্কৃতিবাদকে একমাত্র নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখাটাও হয়তো সমীচীন নয়। কারণ অনেক ক্ষেত্রে এটি উদার ও যুক্তিনিষ্ঠ আচরণ করে থাকে। যেমন শিখদের কৃপাণ ধারণের অধিকার প্রদান। একদা একটি মার্কিন স্কুলে দুটি বালক বাস্কেটবল খেলছিল। সেই সময় ১০ বছরের বালক রাজিন্দর এর কোমরে একটি অস্ত্র দেখে অপর ছাত্রটি সেটির বিষয়ে জানতে চায়। রাজিন্দর বলে যে সেটি কৃপাণ এবং শিখ ধর্মমত অনুযায়ী সেটিকে রাখতে হয়। কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষ এই অস্ত্র বিষয়ে ভীত হয়ে তিনজন শিখ ছাত্রকে স্কুল থেকে বিতাড়িত করে দেয়। আসলে খালসা শিখ ধর্মীয় গোষ্ঠীর মানুষগণকে পাঁচটি 'ক'-এর নিয়ম মানতে হয়। এগুলি হল কেশ বা চুল রাখতে হয়, কংঘ বা চিরুনি চুলের মধ্যে রাখতে হয়, কারা বা স্টিলের ব্রেসলেট হাতে পরতে হয়, কাচ্ছা বা বিশেষ সুতির কাপড় পড়তে হয় এবং কৃপাণ বা তলোয়ার রাখতে হয়। তিনশত বছর পূর্বের এই ধর্মীয় রীতি তাদের অবশ্য পালনীয়। এটি যখন ওই বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে বোঝানো হলো এবং এটিও জানানো হল যে, এর মাধ্যমে কোন ক্ষতির আশঙ্কা থাকে না, তখন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পুনরায় তিনজন ছাত্রকে পড়াশোনার সুযোগ দিল। একই ধরনের উদারতা পরিলক্ষিত হয় অপর একটি বিদ্যালয়ে। মি. গুসম্যান ছিলেন সেই বিদ্যালয়ের সবচেয়ে ভালো ইংরেজি শিক্ষক। তিনি প্রতি সপ্তাহের শেষে বিশেষ করে অভিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যাগুলি যত্নসহকারে সমাধানের চেষ্টা করতেন। এক্ষেত্রে তিনি প্রত্যেকের নাম করে লাল কালি দিয়ে মন্তব্য লিখে দিতেন, যাতে তারা ভালোভাবে সেই বিষয়ে যত্ন নেয়। কিন্তু এখানেই ঘটল সমস্যা। কোরিয়া থেকে আগত ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট এই লাল কালি বেশ সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ালো। কিন্তু কেন? আসলে কোরিয়ায় লাল কালি তখনই ব্যবহার করা হয়, যখন কেউ মারা যান। তাই এই লাল কালির মন্তব্য তাদের পরিবার গুলির কাছে বেশ অস্বস্তির হয়ে দাড়ায়। কিন্তু এশীয় সংস্কৃতিতে শিক্ষকদের সম্মান যথেষ্ট এবং তাদের বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ সাধারণত করা হয় না। সেই ধারা অনুযায়ী এখানেও মি. গুসম্যান এর লাল কালির মন্তব্য কোরিওদের সহ্য করতে হচ্ছিল। কিন্তু বিষয়টির সমাধান হল, যখন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নতির স্বার্থে অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে এই বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত হলেন। তারপর তিনি নির্দেশ দিলেন যাতে কোন শিক্ষক লাল কালি ব্যবহার না করেন। এইভাবেই কিছু ক্ষেত্রে মার্কিন বহুসংস্কৃতির ভালো দিক গুলিও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

অবশ্য তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ এই নয় যে এগুলির কারণে মার্কিন বহুসংস্কৃতি বিশ্বে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করতে পারে বা মানব উন্নয়নের এইটিই শ্রেষ্ঠ প্রতিরূপ। আসলে উন্নতি ও সংস্কৃতি - এই দুইয়ের মধ্যেকার সম্পর্কটি একরৈখিক নয়। কেবলমাত্র HDI

(Human Development Index) -এর নিরিখে যেমন সংস্কৃতি সচেতন উন্নত সমাজকে চিহ্নিত করা যায় না; আবার কেবল কিছু সাংস্কৃতিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমেও সেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়া অন্ধের হস্তি দর্শন স্বরূপ প্রতিপন্ন হয়। লালন ফকির -এর মানুষতত্ত্ব বলছে, "মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি। / মানুষ ছাড়া খ্যাপারে তুই / মূল হারাবি"।। আর এই মানুষতত্ত্ব কে সামনে রেখে যদি বিশ্লেষণ করা যায় দুটি ভিন্ন সংস্কৃতি সম্পন্ন দেশের মধ্যে, তবে কী ফল আসে দেখা যাক্। একটি সুপ্রাচীন জাতি ইহুদি। নেবুকাডনেজার থেকে আলেকজান্ডার, রোমান সম্রাট থেকে অটোম্যান তুর্কি একের পর এক আক্রমণ ও নির্যাতনে যে ইহুদী জাতির মানুষ পবিত্র জেরুজালেম থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং 'মার্চেন্ট অফ ভেনিস' -এর শাইলকের মতো স্বার্থান্ধ প্রতিপন্ন হয়ে রাশিয়া, জার্মানি সহ বিভিন্ন দেশে উৎপীড়িত হয়ে অবশেষে পুনরায় ১৯৪৮ -এ ইজরায়েল নামক দেশে একত্রিত হয়, তারা এখন বেশ উন্নত। বস্তুতঃ দলে দলে ইউরোপীয় 'আসকেনাজি ইহুদিরা রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, জার্মানি, পোল্যান্ড, বলকান, বলটিক দেশ সমূহ থেকে এবং 'সেফারডি' ইহুদীরা ইয়েমেন, ইরাক, মিশর, সিরিয়া, মরক্কো থেকে, ভারতের অরুনাচল ও ইথিওপিয়ার বেটা ইহুদিরাও মিলিত হল ইসরায়েলে। দীর্ঘদিন বিবিধ দেশে বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির সাহচার্য নতুন ইজরায়েলে ইহুদী ঐক্যে প্রশ্ন চিহ্ন তুলে দিল। কিন্তু ক্রমে ধর্মীয় বন্ধন এবং নবকলরবে প্রাচীন হিব্রু ভাষার পুনরুজ্জীবন সমগ্র ধরনের ইহুদীদের মধ্যে ঐক্যের নব হিল্লোল বয়ে আনে। এইভাবে নানা ভাষা, নানা মত কে এক সুতোয় বাঁধা, এটি যেমন ইজরায়েলে সম্ভব হয়েছে, অন্য ভাবে হলেও মার্কিন মুলুকেও সম্ভব হয়েছে। ইসরায়েলে আছে ধর্মীয় সংঘাত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আছে বর্ণের (সাদা-কালো) দ্বন্দ্ব। প্রেক্ষাপট ভিন্ন, ভিন্ন সমস্যা; কিন্তু তবুও অভিন্ন মানুষতত্ত্ব। ইজরায়েলের ধর্মীয় বন্ধন ভালো না মার্কিন ধর্মনিরপেক্ষতা, সেই জটিল প্রশ্নের জটিলতর উত্তরের সন্ধান না করেও উভয়ের গৌরবোজ্জ্বল উপস্থিতি স্বীকার করতেই হয়, যা অনেক সমস্যার সমাধান করেও নতুন জটিলতার জন্ম দিয়েছে (প্যালেস্টাইন ও ব্ল্যাক সমস্যা)।

শ্রেষ্ঠত্ব বা তুলনামূলক সুবিধাজনক অবস্থান বিষয়ে আলোচনা সর্বদা যে মতৈক্যে সম্পন্ন হয় না, সেটি জানা বা বোঝার জন্য সাধারন জ্ঞান যথেষ্ট, কোন মাইনর প্রজেক্ট হাতে নেওয়ার দরকার হয় না। ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা "The End of History and the Last Man" শীর্ষক গ্রন্থে উদারনৈতিক গণতন্ত্রকে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ স্তর বলে গণ্য করেছেন। আর এইরূপ গণতন্ত্রের কেন্দ্র যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু সাম্প্রতিককালে (২০২০) জর্জ ফ্লয়েড নামক কৃষ্ণাঙ্গের নারকীয় হত্যা আবারও প্রমাণ করল শিক্ষা-সংস্কৃতির উত্তর আধুনিক যুগের ধ্বজাবাহী মার্কিন মহিমাও কত ঠুনকো! আর, লব্ধপ্রতিষ্ঠ দূরদর্শী মানুষের দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি সাক্ষী থাকল সলমন রুশদী-র ওপর মধ্যযুগীয় আক্রমণের (২০২২)। তবে কানাডা,

অস্ট্রেলিয়া বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো অপেক্ষাকৃত নব্য সভ্যতা (প্রাচীন ঐতিহ্য রহিত) যে বহুসংস্কৃতির চর্চা ও চর্যায় অধিক ব্রতী হবে, সেটি ভৌগলিক, আর্থিক, রাজনৈতিক সমস্ত দৃষ্টিকোণ থেকেই সত্য। কিন্তু রাবীন্দ্রিক ছন্দে, 'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে' - এটি কালিতে যত সহজ, কাজে ততটাই কঠিন। ভলতেয়ার-এর ভাষায় বলতে হয়, "..... ইতিহাসের ঘটনা মালা বারবার ভুল, বিদ্বেষ, নির্বাসিত করেছে সত্য ও যুক্তিকে। চতুর সৌভাগ্যবানরা মূর্খ-অভাগাদের স্বাধীনতা হরণ করেছ ..."। তবুও যেহেতু এখনও 'End of History' হয় নি, 'End of Ideology'-তে মতৈক্য জোটে নি, তাই আশা রাখা যায় ধর্মীয় ভিত্তিক 'Clash of Civilization'- বহুসংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে চূড়ান্ত গতি পাবে না, হয়তো শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের তরে মার্কিন মুলুকে বহুসংস্কৃতির ভিত্তি হিসেবে স্থান পাবে লালন ফকিরের তত্ত্ব – "মানুষ ছাড়া মন রে আমার / দেখিবে সব শূন্যকার"।

তথ্যসূত্র:

১. Dresser Norine, Multicultural Manners: Essential Rules of Etiquette for the 21st century, John Wiley & Sons, New Jersey, 2005.
২. Fukuyama Francis, The End of History and the Last Man, Penguin Books, New York, 2012.
৩. Kymlica Will, The Rise and Fall of Multiculturalism? New debates on Inclusion and Accommodation in Diverse Societies, Black Well Publishing Ltd., Oxford, 2010.
৪. Jana Subhas, Lalaner Manus Tattwa-Ekti Moulik Alochana, Kamalini Prakashan Bibhag, Kolkata, 2017.
৫. Sen Ashoke Chandra, Pratibasi Prabase- Madhyaprachyer Dinlipi, Ananda Publishers Private Limited, Kolkata, 2014.

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে পারিলাহাট ও সংলগ্ন এলাকার ভূমিকা

সানাই সরকার
স্নাতকোত্তর, ইতিহাস বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে পারিলাহাট ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইংরেজ সেনাপতি রবার্ট ক্লাইভের হাতে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব সিরাজ উদ্দৌলার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়েছিল। শুরু হয়েছিল ভারতবাসীর উপর নানা ধরনের শাসন-শোষণ-বঞ্চনা-নিপীড়ন-অত্যাচার। দীর্ঘকাল ধরে চলা এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে বিভিন্ন জায়গায় গড়ে উঠেছিল সভা সমিতি। সংঘটিত হয়েছিল জায়গায় জায়গায় অহিংস ও সহিংস আন্দোলন। পারিলাহাট ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় আন্দোলনও এরূপ একটি সহিংস আন্দোলন।

মূল শব্দ: পারিলাহাট, মরাডাঙ্গা গ্রাম, পুলিশ বাহিনী, লস্করহাট, বালুরঘাট।

পারিলাহাট তৎকালীন দিনাজপুর জেলার তপন থানার অধীন একটি অখ্যাত গ্রাম। মূলত তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতি ভুক্ত মানুষের বাস, অন্য সম্প্রদায়ের মানুষও অল্পসংখ্যক রয়েছে। এখানকার মানুষের জীবনযাত্রা খুবই সরল। পুজো-পার্বণ, গান-কীর্তন এবং গ্রাম্য নানা উৎসবে একসঙ্গে মেতে ওঠা এদের বৈশিষ্ট্য। পড়াশোনা বলতে স্বল্প সংখ্যক মানুষের প্রাথমিক শিক্ষা। প্রাথমিক বিদ্যালয় এক দুটি। তবুও বহু দূরে এরূপ একটি এলাকায় স্বাধীনতা আন্দোলনের ঢেউ লাগে। তবে এর সূত্রপাত ঘটে অনেক আগে থেকেই। বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে শুরু হয় স্বদেশ চেতনা। তার ফলস্বরূপ ১৯০৫ সালে ও তার পরবর্তীকালে স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ ও বিদেশী দ্রব্য বর্জন কর্মসূচি পালিত হয়।

এরপর ১৯২২ সালে যখন অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হয় তখন বালুরঘাটের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ভাবেন শুধু শহরের মধ্যেই স্বদেশী চেতনা জাগিয়ে তুললেই চলবে না। গ্রামে গঞ্জেও তা সমানভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে। এই উদ্দেশ্যে বালুরঘাটের জনপ্রিয় কংগ্রেস নেতা সরোজরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, সুরেশরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, সুরেন্দ্র চন্দ্র বাগচী প্রমুখ তপন থানার বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে গিয়ে স্বদেশ চেতনা জাগিয়ে তুলতে শুরু করে।

বালুরঘাটে ৪২-এর ভারতছাড়ো আন্দোলন সবচেয়ে বড় স্বাধীনতা আন্দোলন। নিখুঁত পরিকল্পনার গুণে এই আন্দোলন দারুণভাবে সফল হয়। স্বাধীনতা আন্দোলনে

উদ্বুদ্ধ সংগ্রামীরা ১৯৪২ এর ১৪ই সেপ্টেম্বর বালুরঘাট আন্দলনের সফলতা পাওয়ার পর আরও উজ্জীবিত হয়ে পড়েন। তারই ফলস্বরূপ তপন থানার নওপাড়ার ধীরেন বর্মণের নেতৃত্বে ১৭ই সেপ্টেম্বর ভোর রাতে ৭০-৮০ জন সংগ্রামী মিলে বড়বাসার যদু ভগতের কাপড়ের দোকানে চুরি করেন। তারপর সকাল হওয়ার সাথে সাথে তাঁরা চলে আসেন লস্করহাট খাঁড়িতে। সেখান থেকে ১৭-১৮টি নৌকাতে ধান এবং চালের বস্তা বোঝাই করা হচ্ছিল। এগুলি এই খাঁড়ি দিয়ে বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা বিক্রমপুরে রপ্তানি হতো।

ভোর রাতে কাপড়ের দোকানে চুরি এবং সকালে লুঠপাটের খবর পেয়ে যদুবাবু চরম ক্ষেপে ওঠেন। সঙ্গে সঙ্গে নিজের ঘোড়া নিয়ে ছোটেন তপন থানার দিকে। থানায় ডায়েরী করে বড়বাবুকে বুঝিয়ে তৎক্ষণাৎ এর একটা বিহিত করার জন্য অনুরোধ করেন। ১৪ই সেপ্টেম্বর বালুরঘাটে সংগ্রামীদের মিছিল ও আন্দোলন আবার দুদিন যেতে না যেতে লস্করহাট খাঁড়িতে রপ্তানির জন্য নৌকা বোঝাই ধান-চাল লুঠ ও কাপড়ের দোকানে চুরি সব মিলিয়ে পুলিশরা ক্ষিপ্ত ও উত্তেজিত হয়ে ওঠে। খবর পাওয়া মাত্র বন্দুক হাতে ছুটে আসে একদল পুলিশ। লস্করহাটের খাঁড়ির কিছুটা দূরে আসতেই বন্দুক নিয়ে ফাঁকা আওয়াজ করতে থাকে। পুলিশ দূর থেকে আসতে দেখে ধীরেন বর্মণ নির্দেশ দেন – ‘যে যেখানে আছো দূরে পালিয়ে গিয়ে আত্মগোপন কর’। মুহুর্তের মধ্যে নির্দেশ মেনে প্রায় সকলেই আত্মগোপন করে। কিন্তু তিনজন সংগ্রামী তখনও নৌকায় থেকে যায়, পালাতে পারেনি। পুলিশের হাতে সহজেই ধরা পড়ে যায়। এঁরা হলেন মালঞ্চার অমরচাঁদ বর্মন, চাইবাসার বীরু বর্মন এবং জিটিহারের ডোচা বর্মন।

লস্করহাট বা তেলিঘাটার খাঁড়ি

ঐদিন সন্ধ্যেবেলায় গোপন বৈঠক বসে ধীরেন বর্মনের বাড়িতে পরবর্তী কর্মসূচী নিয়ে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কাউলির বসন্ত সরকার, মালঞ্চার গয়েশ্বর বর্মন, অর্জুনপুরের পুণ্যেশ্বর বর্মণ, তেপুকুরের পীতম্বর মণ্ডল, তিলনের কাশীনাথ বর্মন, ভবানীপুরের সুরেন বর্মন, বুনইলের প্রানকৃষ্ণ মণ্ডল, কাঁঠালপুরের অধর বর্মন প্রমুখ।

বৈঠকে সকাল বেলার ঘটনার সাফল্য ও ব্যর্থতা নিয়ে পর্যালোচনার পর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে - এখন থেকে জোতদার, ব্যবসায়ী ও পুলিশের কাজকর্মের উপর সব সময় সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে, সহজেই পুলিশের হাতে কারও ধরা পড়া চলবে না। ধরা পড়লে পুলিশের কাছ থেকে তাঁকে ছিনিয়ে নিতে হবে। প্রয়োজনে পুলিশের বিরুদ্ধেও 'অ্যাকশন' নিতে হবে। স্বাধীনতার লড়াই এ সবাইকে আত্মবলিদানেও প্রস্তুত থাকতে হবে।

এই সময় হঠাৎ সূত্র মারফৎ খবর আসে এই এলাকায় নেতৃস্থানীয় সংগ্রামীদের বাড়িতে শীঘ্রই পুলিশি অভিযান হবে। এতে রয়েছেন মূলতঃ নওপাড়ার ধীরেন বর্মন, কাউলির বসন্ত সরকার, অর্জুনপুরের পুণ্যেশ্বর বর্মন এবং মরাডাঙ্গাঁর ফুলচাঁদ বর্মন ও চাঁদিয়া বর্মন। কিছু দূরে মাত্র সরাডাঙ্গার গ্রামে দ্রুত এই খবর পৌঁছানো নিয়ে সাময়িক সমস্যা সৃষ্টি হলেও দায়িত্ব দেওয়া হয় ধীরেন বর্মনের ভাই খোকা বর্মণ ও বনুইলের প্রবণকৃষ্ণ মণ্ডলের উপরে। তারা 'যথা আজ্ঞা' বলে খাওয়া-দাওয়া করে সেই রাতেই লাঠি হাতে পায়ে হেঁটে রওনা দেন মরাডাঙ্গার গ্রামে খবর পৌঁছে দেবার জন্য।

খবর দিয়ে ফেরার পথে ভোরবেলায় দৌড়গঞ্জের কাছে মাল কোঁচা মারা ধূতি সহ লাঠি হাতে তাঁদেরকে আসতে দেখে টহলরত তপন থানার কয়েকজন পুলিশের সন্দেহ হয়। তাঁদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। উত্তরে তাঁরা জানান, "গ্রামে চুরি ডাকাতির উপদ্রব ভীষন বেড়েছে। তাই তাঁরা পালা করে গ্রাম পাহারা দিচ্ছেন।" তাঁদের উত্তর শুনে খুশি হতে পারে নি পুলিশ। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে তাঁদেরকে জেরবার করে তোলে। কিন্তু তবু তাঁরা তাঁদের সিদ্ধান্তে অনড় থাকেন। অবশেষে সন্দেহের অবসান ঘটাতে তাঁদেরকে ধরে নিয়ে যায় পারিলাহাটের সেই সময়কার প্রেসিডেন্ট জমিরালি খন্দকার ও ভাইস প্রেসিডেন্ট যদু মালাকারের কাছে। তাঁদেরকে বেঁধে রাখে একটি তেঁতুল গাছে। এই খবর সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে যায় নওপাড়া, বুনইল, মল্লিকপুর, কাঁঠালপুর, লস্করহাট, তিলন, অর্জুনপুর, মালঞ্চা সহ বিভিন্ন গ্রামে। দলে দলে সংগ্রামীরা লাঠি ও তির ধনুক নিয়ে ছুটে আসেন পারিলাহাটের গ্রামে।

ততক্ষণে বেলা অনেকটা বেড়েছে। বিচার সভা বসেছে প্রেসিডেন্টের বাড়ির সামনে প্রাইমারি স্কুল ও তেঁতুল বাগান যুক্ত মাঠে। চেয়ারে বসে প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং পুলিশ অফিসার। আর পাশেই একটি তেঁতুল গাছে দড়ি দিয়ে বাঁধা রয়েছে খোকা বর্মণ এবং প্রাণকৃষ্ণ মন্ডল। ধীরে ধীরে তাঁদেরকে চারদিকে ঘিরে ধরেছেন বিভিন্ন গ্রাম থেকে ছুটে আসা সংগ্রামীরা। প্রেসিডেন্ট পুলিশ অফিসারের কাছে জানতে চাইলেন 'এদের অপরাধ কি?' পুলিশ অফিসার উত্তর দিতে শুরু করতেই চার দিকে ঘিরে থাকা ধীরেন বর্মন, বসন্ত সরকার, গয়েশ্বর বর্মন সবাই একসঙ্গে বলে উঠলেন – 'এসব মিথ্যে কথা, এসব পুলিশের বানানো কথা। আমরা এসব মানব না। এঁরা নিরপরাধ। এঁদের ছাড়তে হবে। আমরা কোন কথা শুনতে চাইনা।'

শুরু হয় প্রচণ্ড বাকবিতণ্ডা, হৈ হট্টগোল, ধস্তাধস্তি। প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্টের 'শান্ত হও, শান্ত হও' কথা কেউ কানেই নিল না। হৈ হট্টগোল ও ধস্তাধস্তির মধ্যেই সংগ্রামীদের তীর এসে উড়িয়ে দেয় পুলিশ অফিসারের মাথার টুপি। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে পুলিশ। ভারপ্রাপ্য পুলিশ অফিসার অন্য পুলিশের হাট সংলগ্ন মাটির প্রাইমারি স্কুলের ঘরে ঢুকে গুলি চালানোর নির্দেশ দেন। ধীরেন বর্মণ ও বসন্ত সরকার সহ সব সংগ্রামী তেঁতুলগাছ ও ঘরবাড়ির আড়াল থেকে তির ছুঁড়তে থাকেন। চলতে থাকে পুলিশের বন্দুক বনাম সংগ্রামীদের তির-ধনুকের লড়াই।

পারিলাহাটে পুলিশের বন্দুক বনাম সংগ্রামীদের তির ধনুকের অসম লড়াইয়ের ক্ষেত্র

মাঝে মাঝে আঃ করে জোরে একটা আর্তনাদ কানে ভেসে আসতে লাগে। আর তেঁতুল গাছে গাছের মাঝে ফাঁকা জায়গায় এক একটা দেহ এসে পড়ে যেতে থাকে। কারো নিথর দেহ নিস্তব্ধ, কারো দেহে সামান্য প্রাণ; কেউ বন্দেমাতরম, কেউ বা জয় ভারতমাতা ; কেউ একটু জল, একটু জল; আবার কেউ আঃ আঃ স্বরে করুন আর্তনাদ করতে থাকে। দেহগুলি থেকে তখনও তাজা রক্ত ঝরে পড়তে দেখা যায়। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে ধরে চলে এই অসম লড়াই। এক সময় পুলিশের গুলি শেষ হয়ে গেলে তারা বুকে হেঁটে স্কুল ঘরের পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে স্বাধীনতা যোদ্ধাদের অজ্ঞাতসারে বালুরঘাট অভিমুখে রওনা দেয়। যায়।

সংক্রমীরা তখনও লড়াই চালিয়ে যেতে থাকেন। অনেকক্ষণ ধরে গুলির শব্দ না পাওয়ায় তাঁরা একে একে গাছ ও ঘর-বাড়ির আড়াল থেকে উঁকি মারতে লাগেন। তবু বন্দুকের গুলির কোন সাড়া না পাওয়ায় তাঁরা সবাই বেরিয়ে আসেন। দেখলেন এক অদ্ভুত কষ্ট ও যন্ত্রনাদায়ক দৃশ্য। এখানে ওখানে ছড়িয়ে রয়েছে অনেকগুলি দেহ। সব মিলিয়ে সংখ্যা দাঁড়াল একুশ। তাঁদের মধ্যে চারজন পুরোপুরি মৃত, তাঁরা হলেন – কাঁঠালপুরের অধর বর্মণ, বুনইলের কুকুরা বর্মণ, মালঞ্চার চেতু বর্মণ, এতোয়া, উঁরাও। আর বাকি সতেরো জন আহত, তাঁরা হলেন অর্জুনপুরের পুন্যেশ্বর বর্মণ, মালঞ্চার গয়েশ্বর বর্মণ প্রমুখ।

অন্যদিকে বাকি বেশিরভাগ সংগ্রামী স্কুল ঘরটিকে চারদিক দিয়ে ঘিরে ধরে পুলিশের আত্মসমর্পণ করার প্রস্তুতি চালান, কিন্তু ঘর থেকে কোন সাড়া না পেয়ে একজন দুজন ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করে দখেন কেউ নেই। পুলিশরা পেছনের দরজা দিয়ে চুপি চুপি পালিয়ে গেছে বুঝে তাঁরাও পূর্বদিকে ছুটে যান। অনেকক্ষণ ছোটার পর বহুদূরে ভাড়িলা খাঁড়ির কাছে পুলিশদের দেখতে পান। কিন্তু তার কাছে আসতেই পুলিশের নাগালের বাইরে চলে যায়। ফলে সে যাত্রায় আর তাদের ধরতে পারে না।

কয়েকদিন পর ভোর রাতে সাত সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে দারোগা রবীন্দ্রনাথ মুখার্জী পোর্ষা থানার মরাডাঙ্গা গ্রামের প্রতিপত্তিশালী স্বাধীনতা সংগ্রামী ফুলচাঁদ বর্মণ ও তার ভাই চাঁদিয়া বর্মণকে গ্রেপ্তার করতে হানা দেয় তাঁদের বাড়ি। এঁদের প্রাচীর ঘেরা মাটির বাড়ি ছিল দূর্গের মতো। বাইরে থেকে ভেতরে যেতে গেলে পর পর কয়েকটি প্রাচীরের দরজা অতিক্রম করে যেতে হত। দারোগার নির্দেশে সশস্ত্র পুলিশ একটার পর একটা দরজা ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করে। তাঁদের আসার খবরে এবং দরজা ভাঙ্গার শব্দে সংগ্রামীরা আড়ালে সশস্ত্র জড়ো হতে শুরু করেন বাড়ির চারিপাশে। পুলিশেরা পরপর দরজা ভেঙ্গে বাড়ির ভেতরে প্রবেশমাত্র প্রায় ৫০-৬০ জন সংগ্রামী যোদ্ধা অতর্কিতে মাছ ধরা জাল নিয়ে পুলিশের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বন্দুক, পিস্তল কেড়ে নিয়ে আট জনকেই দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলেন।

খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তেই বিভিন্ন গ্রাম থেকে দলে দলে সংগ্রামীরা ছুটে আসেন মরাডাঙ্গা গ্রাম থেকে। আসেন ধীরেন বর্মণ, বসন্ত সরকার প্রমুখও। সকালে বন্দি পুলিশদের নিয়ে বিচার সভা বসে ফুলচাঁদ বর্মনের খোলাবাড়িতে। ১৮ই সেপ্টেম্বর ভোরে দৌড়গঞ্জে বিনা কারনে খোকা বর্মণ ও প্রাণকৃষ্ণ মণ্ডলকে গ্রেপ্তার এবং পারিলাহাটে গুলি চালিয়ে চারজনকে হত্যা ও সতেরো জনকে কে জখম করার অপরাধে এদের বিচার হয়। বিচারে সংগ্রামীরা এদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারার জন্যে সোচ্চার দাবি তোলেন। কিন্তু দন্ডিতদের শেষ বক্তব্য বলার সুযোগ দেওয়া হয়। বিচারের রায় শুনে রবি দারোগা কান্নাভাঙ্গা কণ্ঠে কাকুতি মিনতি করে জানান যে পারিলাহাটে তিনি বা তাঁর সহকর্মীরা গুলি চালান নি। গুলি চালিয়েছে তপন থানার পুলিশ। তাঁরা এসেছে পোর্ষা থেকে এবং ১৪-ই সেপ্টেম্বর বালুরঘাটের পোস্টঅফিস, ট্রেজারি সহ বিভিন্ন অফিস, আদালত পোড়ানোর দায়ে অভিযুক্ত সক্রিয় সংগ্রামী ফুলচাঁদ মণ্ডল ও চাঁদিয়া মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করতে। কিন্তু এ কাজে এসে তাঁরা নিজেরাই বন্দি হয়ে মৃত্যুর মুখে পড়েছেন। তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বলেন- “আমি মরি দুঃখ নেই। কিন্তু আমি মরলে আপনাদের প্রিয় সরোজরঞ্জন খুব দুঃখ পাবেন। আমি মরলে তাঁর বোন বিধবা হবে।” একথা বলে তিনি উর্দির ভেতর থেকে পৈতা বের করে সবাইকে দেখান। তখন ফুলচাঁদ বর্মণ, চাঁদিয়া বর্মণ ধীরেন বর্মন প্রমুখ নেতৃস্থানীয় সংগ্রামীকে নিজেদের মধ্যে আলোচনার

মাধ্যমে একটা উপায় বের করেন। তা হল পুলিশেরা যদি আজ থেকে ইংরেজদের গোলামি ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দেয় তবেই তাঁদের মৃত্যুদন্ড রদ হবার সম্ভবনা আছে। শর্ত শোনামাত্র তাঁরা রাজি হয়ে যায়। পরবর্তী কালে তাঁরা সবাই কংগ্রেসে যোগ দেয় এবং পুলিশের ইউনিফর্ম পুড়িয়ে দেয়।

এই ঘটনায় সংগ্রামীরা সফলতা পায় বটে, কিন্তু তা স্থায়ী হয় না। কয়েক দিনের মধ্যে পুলিশ এর প্রতিশোধ নেয়। তপন, পোর্ষা ও ধামাইর থানায় পুলিশ একযোগে কাজ শুরু করে। প্রথমে মরডাঙ্গা গ্রামে লুঠপাট চালিয়ে শ্মশানে পরিণত করে। সেখানকার একটা পুকুর থেকে লুকিয়ে রাখা সাতটি রাইফেল, পিস্তল ও কার্তুজ উদ্ধার করে। তারপর এক একটা গ্রাম ধরে ধরে কোথাও লুঠপাট চালায়, কোথাও ধান-চাল এক জায়গায় জড়ো করে পুড়িয়ে দেয়, কোথাও পুকুরে ফেলে দেয়, কোথাও বা আবার তছনছ করে। পুলিশরা রেহাই দেয় না শিশু-কিশোর ও বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের। তাদের উপরও চরম শারীরিক নির্যাতন চালায়। তাদের হাত থেকে রেহাই পায় না যুবতী-বউরা। শারীরিক সম্ভ্রম লুঠ করে, আবার অকথ্য নির্যাতন চালায় তাদের উপর, পুলিশেরা হয়ে ওঠে নর পিশাচ নর খাদকের দল।

পুলিশের এই বিভৎস অত্যাচার ও অকথ্য শারীরিক নির্যাতন এবং ধ্বংসলীলার খবর গোপনে গোপনে সংগ্রামীরা পেয়ে যান। তাঁদের ভেতরে ভেতরে জ্বলে ওঠে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। গর্জে ওঠেন সরবে। কিন্তু অবস্থার চাপে অসহ্য কষ্ট বেদনা সয়েও তাঁরা নীরব থাকেন।

চারদিকে গ্রামে গ্রামে লুঠপাট, অত্যাচার ও সন্ত্রাস চালানোর পাশাপাশি তল্লাশি চালিয়ে পুলিশেরা একে একে ধরে ফেলে অনেক সংগ্রামীকে। অন্য সংগ্রামীরা নাম-ঠিকানা জানার জন্য তাঁদের উপর প্রচণ্ড মানসিক অত্যাচার চালায়। কিন্তু অত্যাচারের মাত্রা কঠোর থেকে কঠোরতর হলেও তাঁরা একটাও নাম ঠিকানা জানান না। কারন তারা দেশ মাতৃকার মুক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত, তাঁরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

তবুও লাগাতর দিনরাত চিরুনি তল্লাশিতে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন কাউলির পানিশা বর্মন, জলধর বর্মণ; ভগীনগরের দফাদারের সহায়তায় ধরা পড়েন রঘুনাথ বর্মণ; অর্জুনপুরের পুণ্যেশ্বর বর্ণন ধরা পড়েন তেপুকুরের পীতম্বর মণ্ডলের বাড়িতে। সঙ্গে পীতম্বর মণ্ডলও ধরা পড়েন। তিলনের কাশিনাথ বর্মন; মালঞ্চার গয়েশ্বর বর্মণ, চৈ বর্মণ, গান্ধী বর্মন ধরা পড়েন। পরে আরও অনেকে ধরা পড়েন।

বিচার হয় দিনাজপুরে স্পেশাল কোর্ট বসিয়ে। বিচারে ধীরেন বর্মনের সর্বাধিক ২৯ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়, বসন্ত সরকারের সাত বছর চার মাস কারাদণ্ড হয়। পাঁচ বছর কারাদণ্ড হয় – ফুলচাঁদ বর্মন, চাঁদিয়া বর্মণ, পুণ্যেশ্বর বর্মন, বসন্ত বর্মন, গণেশ বর্মন, বীরু বর্মন, কাশীকান্ত রায়, জটাধর বর্মন প্রমুখ।

এই ভাবে দেশ-বিদেশে নানা প্রান্তে নানা স্থানে অগণিত স্বাধীনতা সংগ্রামীর আত্মত্যাগে অহিংস ও সহিংস সংগ্রামের মধ্য দিয়েই ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারত

স্বাধীনতা লাভ করে। তাই আমরা আজ স্বাধীন ভারতের নাগরিক। তাঁদের মহান আত্মবলিদানের কথা আমরা কোন দিন ভুলব না। তাঁদের আমরা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি এবং সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

সাক্ষাৎকারঃ

১. চন্দ্রকান্ত সরকার (৮৫), ৩০-০৫-2022, পিতা- ৺বসন্তকুমার সরকার (স্বাধীনতা সংগ্রামী), গ্রাম কাওলি
২. দীননাথ বর্মন (৮১), ৫-2-2022, পিতা- ৺অমর চাঁদ বর্মণ, (স্বাধীনতা সংগ্রামী), গ্রাম- পারিলাহাট
৩. নগেন্দ্রনাথ মালাকার (৭৯), 2-2-2022, পিতা- ৺যদুনাথ মালাকার (স্বাধীনতা সংগ্রামী), গ্রাম-পারিলাহাট

গ্রন্থপঞ্জী:

১. দীপঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বাধীনতা সংগ্রামে দক্ষিণ দিনাজপুর, শারদীয় প্রত্যুষ ১৪১৬
২. দীপংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। আগস্ট ৪২ বালুরঘাট, পৃষ্ঠা ১৩৫, ১৩৬, ১৩৮
৩. বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। দিনাজপুর জেলার রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাস।
৪. ধনঞ্জয় রায়। দিনাজপুর জেলার ইতিহাস।

ভাষার আত্মিকরণ : " বর্ণমালা আমার দুঃখিনী বর্ণমালা" কবিতার আলোকে

সুমন্ত মন্ডল
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
মানভূম মহাবিদ্যালয়, মানবাজার, পুরুলিয়া,প . ব

সারসংক্ষেপ :
একটি বিশেষ সামাজিক মানুষ নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময় করে। যে জনসমষ্টি একই ধরনের ধ্বনি সমষ্টির বিধিবদ্ধ রূপের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময় করে তাকে বলা হয় ভাষা সম্প্রদায়। এই ভাষা সম্প্রদায় তার ভাষার মাধ্যমে ভাব প্রকাশ করে। সেই ভাবকে সর্ব মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেওয়ার মধ্যে তার প্রকাশ ক্ষমতা নির্ভর করে। মাতৃভাষাতে মানুষ প্রথম কথা বলতে শেখে।এই ভাষাতে তার মনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা কে অভিব্যক্ত করে। জলের মধ্যে মাছের মতই মানুষ মাতৃ ভাষায় অহরহ উচ্চারিত শব্দের তরঙ্গ মন্ডল এর মধ্যে ডুবে থাকে। সে কোথায় প্রাণসফুরণ ঘটাতে চেয়েছেন কবি শামসুর রহমান "বর্ণমালা আমার দুঃখিনী বর্ণমালা" কবিতায়।

সূচক শব্দ : মাতৃভাষা,শৈশব, ছড়া, বর্ণমালা, রক্ত,একুশে ফেব্রুয়ারি, সম্পর্ক।

মূল আলোচনা :

" নানান দেশের নানান ভাষা
বিনে স্বদেশীয় ভাষা পুরে কি আশা?"১

মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ভাষাকে অবলম্বন করেই ঘটে। আদর্শ ভাষা ছাড়া জাতি ও জাতি হয়ে উঠতে পারে না। বিশেষ একটা ভাষাকে কেন্দ্র করেই জাতীয় সত্তা রূপ পায় ও গড়ে ওঠে। এই বিশেষ ভাষা হল মাতৃভাষা- সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

কবি সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষাকে মাতৃদুগ্ধের সঙ্গে তুলনা করেছেন।মাতৃদুগ্ধ যেমন কোন জীবের স্বাভাবিক বিকাশ কে সম্ভব করে তোলে তেমনি মাতৃভাষা ও মানবিক সত্তার স্বাভাবিক বিকাশ ঘটায়। তাই মানব জীবনে মাতৃভাষার অবদান গুলি হল যথাক্রমে শিশুর জীবনের ভাষা চিন্তা ও ভাষার সংগতি সাধনের ভাষা, কল্পনাশক্তির সহায়ক ভাষা, সময় ও শক্তির অপচয় রোধ করবার ভাষা,বলার ও লেখার সহজতম মাধ্যম এর উপযোগী ভাষা, শিশুর আনন্দও স্বাচ্ছন্দর ভাষা, সৃজনশীল কর্মে অনুপ্রাণিত হওয়ার ভাষা, আত্মবিকাশের গতিকে ত্বরান্বিত করার ভাষা,ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক ভাষা,সর্বোপরি জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি আস্থা সৃষ্টির সহায়ক ভাষা।

বিভিন্ন দার্শনিক, কবি, মনীষী,শিক্ষাবিদ শিক্ষায় মাতৃভাষার গুরুত্ব এর কথা স্বীকার করেছেন। উভয় বাংলার জনপ্রিয় কবি শামসুর রহমান তাঁর কবিতায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অপরিসীম দরদ প্রকাশ করেছেন। তাঁর কবিতায় রয়েছে স্বদেশপ্রীতি, নিসর্গ দৃষ্টি, বাঙালির জাতীয়তাবাদ, জীবন ও সাহিত্যের নানা ধরনের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট এর চিত্র। তবে শামসুর রহমানের বিভিন্ন ধরনের প্রেক্ষাপটে রচিত কবিতা গুলির মধ্যে অন্যতম কবিতা হল মাতৃভাষা প্রীতির অনবদ্য নিদর্শন-" বর্ণমালা আমার দুঃখিনী বর্ণমালা "কবিতাটি।

কবি শামসুর রহমান(১৯২৯ - ২০০৬) ২৩শে অক্টোবর ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ববঙ্গের পুরানো ঢাকার মাহুত টুলিতে শামসুর রহমানের জন্ম হয়। বাবার নাম মুখলেসুর রহমান চৌধুরী ও মা আমেনা বেগম.১৩ জন ভাইবোনের মধ্যে কবি ছিলেন চতুর্থ সন্তান। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে ৮ই জুলাই কবি শামসুর রহমানের বিবাহ হয় জোহারা রহমানের সঙ্গে। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয় সাংবাদিক হিসেবে কর্মজীবন। সংবাদপত্রে কাজ করলো ও তার প্রিয় বিষয় ছিল কবিতা লেখা। কবি মনে করেনযুগ চেতনা কবি ও শিল্পীর থাকা বাঞ্ছনীয়। সত্য উদ্ঘাটনেই তাদের লক্ষ্য। কবি নিজেদের সম্পর্কে বলেন যুগসঙ্কটে বিশৃংখল কালে শব্দ ও ছন্দের সুর সঙ্গতি রক্ষা করা ও শৃঙ্খলা আনাই কবির কাজ। কবি তার সমকালে দেখেছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকা, দুর্ভিক্ষ মন্বন্তরের ১৯৪৭এ দেশভাগজনিত স্বাধীনতা,বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন (১৯৪৮ থেকে শুরু হওয়া) ১৯৫৮ তে আইয়ুব খানের স্বৈরাচারীতা ও উৎপীড়ন, ছাত্র আন্দোলন ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান সামরিক আইন জারি, ১৯৭০এর বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড়, ১৯৭১এ সেনা অভিযান ও গণহত্যা, মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তি।

সমাজ, সাহিত্য ও জীবনের নানান সংকট ময় অবস্থার প্রত্যক্ষদর্শী কবি শামসুর রহমানের কবিতায় তায় সহজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ পেয়েছে এবং তা পাঠকের হৃদয় কে স্পর্শ করে বিগলিত করেছে। এরকমই এক হৃদয়স্পর্শী বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত কবিতা - "বর্ণমালা আমার দুঃখিনী বর্ণমালা" কবিতাটি। জাতপাতের দ্বন্দ্ব, সাম্রাজ্যবাদী নীতি প্রভৃতির প্রশ্নে বাংলা ভাষার ১৯৭০ সালে যে দুর্ভোগের সম্মুখীন হয়েছিল তারই পরিপ্রেক্ষিতে রচিত এই কবিতাটি।

১৯৪৭ সালের দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়। পূর্ববঙ্গ যুক্ত হয় পাকিস্তান রাষ্ট্রের সঙ্গে। একমাত্র ধর্ম ছাড়া পাকিস্তানের দুই অংশ পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে কোন সাদৃশ্য ছিল না। দুই অংশের ভাষা, খাদ্যাভাস, আচরণ,পোশাক শিল্প সংস্কৃতি সবই ছিল ভিন্ন। যেহেতু পূর্ব পাকিস্তানের শাসনভার ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের উপর, তাই পশ্চিম পাকিস্তানের খাজা নিজাম উদ্দিন সরকার, পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলার পরিবর্তে উর্দুকে প্রাধান্য দেয়। ফলে মাতৃভাষার প্রতি

ভালোবাসা ও দায়বদ্ধতা ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি উত্তাল হয়ে ওঠে পূর্ব পাকিস্তান। ওইদিনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজের ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীরা একটি শান্তিপূর্ণ মিছিল বের করেন। এই মিছিলের উপর খাজা নিজাম উদ্দিন সরকারের পুলিশ গুলি চালায়,। মারা যান আব্দুল সালাম, রফিক উদ্দিন আহমেদ, শফিউর রহমান,আব্দুল বরকত, আবদুল জব্বর আরো অনেকেই। এরাই প্রথম ভাষা শহীদ। শহীদের সংখ্যা প্রায় ৪০, আহতের সংখ্যা ৫০০ র কাছে, বন্দী আরো কয়েক শত। গ্রেপ্তার করা হলও ছাত্রনেতা শিক্ষক, লেখক,বুদ্ধিজীবীদের।তবু ও থামানো গেল না মাতৃভাষার আন্দোলন। স্মরণীয় ১৯৫৪ সাল ও।শুধু মাতৃভাষা, বাংলা ভাষা কে কেন্দ্র করে মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় ঘটল। ৩০৯ টি আসনের মধ্যে ৩০০ টি আসনে পরাজিত হলো মুসলিম লীগ। সমগ্র বাঙালির মধ্যে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটলো

এরপর গ্রামবাংলা ভেঙ্গে জন্ কল্লোল এসে ভেঙ্গে দিল ঢাকা প্রশাসনের দুর্গ। বাধ্য হয়ে পাকিস্তান সরকার তাদের স্বৈরতন্ত্রী ভাষা আগ্রাসন রোধ করলেন।তবে বাংলাভাষী পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে, উর্দুভাষী পশ্চিম পাকিস্তানের ভাষা নিয়ে দ্বন্দ্ব চলতেই থাকলো। 1970 সালে আবার সেই সংঘাত চরম আকার ধারণ করল। মুক্তি আন্দোলনের ক্রান্তিকালে দাঁড়িয়েই কবি শামসুর রহমান 'নিজ বাসভূম' কাব্য গ্রন্থটি রচনা করলেন স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭১ রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার ঠিক এক বছর আগে রচিত এই কবিতায় বাংলা ভাষার প্রতি গভীর অনুরাগ ব্যক্ত হল। কবি যেমন এই কবিতায় ভাষা আন্দোলনের ঘটনাকে স্মরণ করে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেছেন, তেমনি অন্যদিকে বাঙালির অস্তিত্বের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন বন্ধনে আবদ্ধ শৈশব থেকে পরিণত বয়স পর্যন্ত বর্তমান মাতৃভাষার গুরুত্ব নিরূপণ করেছেন।

বর্ণমালা আমার দুঃখিনী বর্ণমালা (১৯৭০) কবিতায় কবি নিজের সততার সঙ্গে বর্ণমালার অঙ্গাঙ্গী অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক নিবিড় ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।কবির মনে হয়েছে মায়ের সাথে শিশুর যেমন মমতাময়ী স্নেহ মিশ্রিত সম্পর্ক, তেমনি বর্ণমালার সঙ্গে শিশুর সারা জীবনের এক মমতাময়ী নাড়ির টান রয়েছে। তাই মানুষের সচেতন অস্তিত্ব, তার চেতনা, তার ভাব লোক তার মন মননে সর্বত্র ব্যাপ্ত করে থাকে মাতৃভাষার উজ্জ্বল উপস্থিতি।মাতৃভাষা ছাড়া মানুষ যেন বিপন্ন মায়ের মতো সহজ সরলভাবে শিশুর সাথে মিশে গিয়ে মাতৃভাষা ও মানুষের জীবন যাত্রার মধ্যে সহজ স্বতস্ফূর্ত প্রকাশ ভঙ্গিমায় নক্ষত্ররাজির মতো নিজস্ব মহিমায় উজ্জ্বল করে মানবের জাগ্রত ঘুমন্ত চেতনাকে উদ্ভাসিত করে।মাতৃভাষা যেকোনো মানুষের পরম আদরের পরম ভালোবাসার ধন পরম মমতার ধন।এই মমতাময়ী ভাষায় কবিকে শ্যামল শ্রী অর্থাৎ কোমল মাধুর্য দান করে শৈশব থেকে শুরু করে আজীবন কবিতার এই মনোভাব এক সুন্দর উপমা সাহায্যে দেখিয়েছেন কবিতায় _----------

> "নক্ষত্রপুঞ্জের মতো জ্বলজ্বলে পতাকা উড়িয়ে আছো আমার সত্তায় / মমতা নামের প্লুত প্রদেশের শ্যামলিমা তোমাকে নিবিড় ঘিরে রয় সর্বদায় "২

কালো রাত্রি শেষে ভোর হলে শিউলি ফুলের শৈশব চিহ্নিত হয়।তা দিনের সূচনায় বোঁটা থেকে খসে পড়ে পৃথিবীর আলো, নির্মল বাতাস, প্রাণী জগতের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে, নিজস্ব সৌন্দর্য সুগন্ধ এর মাধ্যমে।প্রত্যেকটি মানব শিশু ও জীবনের প্রথম প্রহর অর্থাৎ শৈশবে মাতৃভাষার বর্ণমালার মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করলে শিক্ষার সঙ্গে জীবনের যোগসুত্র গড়ে ওঠে।শিশুর কাছে বাংলা বর্ণমালার মাধ্যমে শিক্ষালাভ তার স্বাধীন কল্পনাশক্তি চিন্তাশক্তিকে জাগ্রত করার পাশাপাশি শিশুকে এক অনাবিল আনন্দ দান করে। তাই পরিণত বয়সে পৌঁছে কবিতার শিশু পাঠের বইগুলোকে কবিতায় সম্মানের সাথে তুলে ধরেছেন.

প্রতিটি বাঙালি শিশুর শৈশব ছড়ার মধ্যে 'মদনমোহন তর্কালঙ্কার' রচিত 'শিশু শিক্ষার প্রথম ভাগের' অন্তর্গত 'প্রভাত বর্ণন' কবিতার প্রথমাংশ

'পাখি সব করে রব/ রাতি পোহাইল/ কাননে কুসুমকলি /সকলি ফুটিল-৩ কবিতাটি শান্ত অথচ গম্ভীর প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে শিশুর স্বদেশপ্রেমিক চেতনা ও সু অভ্যাস জাগ্রত হয়ে ওঠে।. শৈশবে এইরূপ পাঠের মধ্য দিয়েই শিশুর বর্ণমালার সঙ্গে আজন্ম সখ্যতা সৃষ্টি হয়, তেমনি শিশুর মধ্যে কল্পনা ও বাস্তবের মেলবন্ধন সেতু রচনা করে বর্ণমালা। বাংলা বর্ণমালা জাহাজে করেই কবি বিশ্বপ্রকৃতি বহির্বিশ্বের অফুরন্ত জ্ঞানের সন্ধান পান নিজের বন্দরে। বিশ্ব সমর্থকে নিজের ভাষার মাধ্যমে জানার মধ্যে থাকে আত্তীকরণের আনন্দ।

কবি মাছ ধরার উপমার মধ্য দিয়ে এই কবিতায় বোঝাতে চেয়েছেন শৈশব থেকে গভীর ধৈর্য নিষ্ঠা এবং প্রত্যয় এর মেলবন্ধন মাতৃভাষা পাঠের জন্য অত্যন্ত আবশ্যক হলে প্রত্যেক শিশুর কাছে মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষালাভের দ্বারা রঙিন মাছ রুপি স্বপ্নময় সাহিত্যের জগতে প্রবেশ করা সহজসাধ্য হয়। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'হাসিখুশি' বইটির সচিত্রে কাঠবেড়ালি,ঐরাবত, লাল টুকটুকে ঠোঁট টিয়া পাখি সহ সুন্দরছড়াগুলির আকর্ষণে কবি তাঁর সবচেয়ে প্রিয় খেলা নকশাকাটা কাগজ এবং বোতলের ছিপি ফেলে আগ্রহ সহকারে বাংলা সাহিত্যে রত্ন ভান্ডার আত্মবিশ্বাসের সাথে প্রবেশ করেন। তাই এই সাহিত্যের রত্নভাণ্ডার আবিষ্কারের জন্য কবির কাটা কম্পাস এর প্রয়োজন হয় না।

আনন্দময় পদ্ধতিতে কবি বর্ণ চিনেছেন বলে তা আজও থেকে গেছে তার মনের গভীরে। ঘুমের মধ্যেও তিনি দেখতে পান সেই সচিত্র বর্ণমালার কাঠবিড়ালি আর ঐরাবত। বাংলা ভাষার একান্নটি বর্ণ,একান্নটি সততা সবুজ মুখ। বাংলা ধ্বনির চিহ্নিত সাংকেতিক রূপ গুলি কবির চেতনার জগতে সদা সর্বদাই যেন নবীন কিশোর এর মত

বিরাজমান অর্থাৎ কোনদিনই যেন এর মর্যাদা মনে হয় না মানব জগতে। তাই বর্ণমালার স্মৃতি আজও দুলে ওঠে কবির হৃদয়ের গভীরে। পাঠশালার কচি মুখ গুলির মতোই তা কাঁচা সবুজ পবিত্র। এই সতত সবুজ বর্ণমালার কারণে দুলে ওঠে কবির চেতনা, স্বপ্ন, আশা, আকাঙ্ক্ষা কামনা-বাসনা কবি হৃদয়ের সমস্ত সত্তা জুড়ে বর্ণমালার এই উপস্থিত যেন চৈতন্যের এক দাঁড়, আর সেই দাঁড়এ বসে টিয়া পাখির মত যেন দোল খান।মাতৃভাষার শক্তি ও প্রভাব এতটাই যে তা গভীর নিদ্রার গভীরতম প্রদেশে নিহত স্বপ্নময় চেতনাকে প্রভাবিত করে।

ব্যক্তি জীবনে নানান উদ্দেশ্যে মাতৃভাষা বর্ণমালার ব্যবহার মানবজীবনকে পূর্ণতা দান করে। কবি এই বর্ণমালাকে অক্ষিগোলকের মাঝে আঁখিতারার সঙ্গে তুলনা করেছেন। মানুষের অক্ষিগোলকের মাঝে আঁখিতারার সুঅবস্থান মানুষকে দৃষ্টি শক্তি দান করে।মানব শরীরের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের মধ্যে চোখ অন্যতম মূল্যবান সম্পদ। যার সাহায্যে আমরা মানব জীবনের অপার মাধুর্যকে বুদ্ধির সাথে কাজে লাগিয়ে বিশ্ব প্রকৃতির সৌন্দর্য কে এবং বিশ্ব জ্ঞান ভান্ডার কে খুব সহজেই করা আয়ত্ত করে থাকি। শরীরের এই অমূল্য সম্পদের সঙ্গে কবি বর্ণমালাকে তুলনা করে মানবজীবনে বর্ণমালার কত গুরুত্ব তা বোঝাতে চেয়েছেন।শামসুর রহমানের মাতৃভাষার প্রিয় বর্ণমালা তার কাছে আঁখি তারার মতো। এই অমূল্য সম্পদ না থাকলে কবির আর কিছুই নিজস্বতা থাকে না। জগতের আশা-আকাঙ্ক্ষা দুঃখ বেদনা কে অনুভব ও প্রকাশ করতে পারে না।

কবি বিভিন্ন উদাহরণের সাহায্যে বারেবারে রেখেছেন মানবজীবন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ঘটনার সম্মুখীন হলে কিভাবে বাংলা ভাষার সাহায্যে তা সঠিকভাবে প্রকাশ করি। মানবজীবন সংকটের মুহূর্তে যথা যুদ্ধের আগুনে, মোড়কে পলায়ঙ্কর ব্যাপারে, প্রবল বর্ষায়,অনাবৃষ্টির বেদনায়, বারবণিতার নূপুরের শব্দে প্রভৃতিতে বাংলা ভাষায় একমাত্র প্রকাশ ও প্রতিবাদের ভাষা হয়ে সংকট মুক্তির হাতিয়ার হয়ে ওঠে। বাংলা ভাষার সাহায্যেই কবি নিজেদের মধ্যে অনেকে বেদনা বোধকে ঝেড়ে ফেলে আবার আনন্দের জগতে বিচরণ করেন। মানবজীবন সুখদায়ক অনুভূতিগুলি যথা পত্নীর বাহুবন্ধনে প্রেমালাপ সৃষ্টির আনন্দে মেতে ওঠে মধুমাসের সৌন্দর্যের সূচক বর্ণনা। বাংলা ভাষার মাধ্যমে ব্যক্ত করে সৃষ্টি সুখের আনন্দ লাভ করে।এই সকল বিবরণের মধ্য দিয়ে কবি বোঝাতে চেয়েছেন জীবনের নানা বিপর্যয় এবং বিপর্যয় মুক্ত চেতনাকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে বর্ণমালা রূপ আঁখিতারা। যে কোন ধ্বংস থেকে সৃষ্টি কার্য অংশগ্রহণকারী রূপে বর্ণমালা সদা সচেতন ভূমিকা লাভ করে।

১৯৪৮ এর ডিসেম্বর মাসে পশ্চিম পাকিস্তান সরকার নির্দেশ দিয়েছিল যে বাংলা ভাষার চর্চা করতে হবে আরবি হরফে, বাংলা বর্ণমালায় নয়। এই ঘটনাকে কবি উল্লেখ করেছেন বাংলা বর্ণমালা ও বাংলা ভাষাকে উপড়ে নেওয়ার সঙ্গে। এর প্রতিবাদে সংঘটিত হয় ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি রক্তক্ষয়ী এই ভাষা আন্দোলনের

শহীদদের প্রতি কবি রক্তিম পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেছেন তার বর্ণমালা আমার দুঃখিনী বর্ণমালা কবিতায়।বাংলা ভাষার সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করার বিভিন্ন কারণ উপমা সাহায্যে কবি ও মাতৃভাষার প্রেমিক শহীদদের মতো তুলে ধরেছেন ভাষা আন্দোলনকারীদের প্রতি শ্রদ্ধা । তাই ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলনের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়ে কবি স্মরণ করেছেন ---

'তোমাকে উপড়ে নিলে বল তবে, কি থাকেআমার?
১৯৫২ দারুন রক্তিম পুষ্পাঞ্জলী
বুকে নিয়ে আছে সগৌরবে মহীয়সী "৪

বর্ণমালা আমার দুঃখিনী বর্ণমালা কবিতায় কবি মাতৃভাষাকে সুন্দর ফুলের সঙ্গে তুলনা করেছেন। সুন্দর ফুলের পাপড়ি যদি কেউ বিনষ্ট করে তা যেমন সৌন্দর্য প্রেমিক মানুষকে আঘাত করে, তেমনি বাংলা ভাষা রূপি ফুলের উপর পশ্চিম পাকিস্তানের মৌলবাদী সরকার নানা প্রকার মৌলবাদী প্রভাব আরোপিত করে।ধর্মনিরপেক্ষ মরমী কবির পক্ষে বাংলা ভাষার অপমান ও অমর্যাদা অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। কারণ কবি জানেন যে, বাংলা ভাষা আপামর বাঙালির প্রাণময় জাতিসত্তাকে ফুটিয়ে তুলেছে বিশ্বের দরবারে নিজের স্বমহিমায়।

কবি আশৈশব মাতৃভাষাকে জীবন পথে চলার অকৃত্রিম সেতু হিসেবে জেনেছেন এবং উপলব্ধি করেছেন কিন্তু অপসংস্কৃতি আর নোংরামী তাকে অমর্যাদা অসম্মান ও অপমান এনে দিয়েছে। বাংলা ভাষার উপর বারেবারে আক্রমণ করেছে। নোংরা হাতের হিংস্রতা খিস্তি-খেউড়ের পৌষ মাস প্রভৃতি সামাজিক অবক্ষয় সমস্ত নোংরামী চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছানোকে পৌষ মাস বলেছেন।মাতৃভাষা বাংলার এই অপমান প্রতিটি বাঙালির অপমান, মায়ের অপমান কে সন্তান সহ্য করতে পারে না এই জন্য খুবই লজ্জিত মাতৃভাষাকে ঘিরে অশালীন শব্দের সৃষ্টি হয়ে চলেছে তা কবির কাছে একেবারেই অনভিপ্রেত। কবি তার "বর্ণমালা আমার দুঃখিনী বর্ণমালা "কথাটির মধ্যে যেন সমগ্র কবিতাটির মর্মবাণী সংহত করেছেন।

কবিতাটিতে যেমন একদিকে বর্ণমালার প্রতি কবি শামসুর রহমানের হৃদয়ের আবেগ অকৃত্রিম ভালোবাসা রয়েছে, অন্যদিকে সমস্ত মানব জীবনকে মাতৃভাষা বর্ণমালার মমতা যেন শত ধরার মতো সিঞ্চিত করে সজীব ও সুন্দরতা দান করেছে। কবি মাতৃভাষার সঙ্গে মানব জীবনের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক তুলে ধরে মাতৃভাষার অপমানের দিকটি তুলে ধরে সমাজ কে বা মানব কে সচেতন করতে চেয়েছেন।মাতৃভাষার অপমানকে নিজেদের অপমান বলে মনে করে সমাজকে সচেতনতা দান করে কবিতাটির পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন।এই কবিতায় তিনি নিজস্ব কাব্যভাষার এক নতুন নির্মাণ ঘটিয়েছেন ভাব-ভাষা ছন্দের শতদল ঝরনা ধারার মাঝে বাক -ছন্দের চমৎকার ঘরানা সৃষ্টি করেছেন।

তথ্য সূত্র :

১. রামনিধি গুপ্ত, নানান দেশের নানান ভাষা, সাহিত্য মেলা, বাংলা, সপ্তম শ্রেণী, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, দ্বিতীয় সংস্করণ অক্টোবর ২০১৩ পৃষ্ঠা নম্বর ২২.

২. শামসুর রহমান,"বর্ণমালা আমার দুঃখিনী বর্ণমালা" উচ্চমাধ্যমিক পাঠ সঞ্চয়ন, পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের পক্ষে বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত ফেব্রুয়ারি ২০২১ পৃষ্ঠা নম্বর ৪৫.

৩. মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত শিশুশিক্ষা, প্রথম ভাগ, কিশোর লাইব্রেরী, বগুড়া, পৃষ্ঠা নম্বর ১.

৪. পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র নং ২, পৃষ্ঠা নাম্বার-৪৭.

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১. আধুনিক বাংলা কবিতার রূপ লেখা (১৯০১ - ২০০৮) অশোক কুমার মিত্র, তৃতীয় সংস্করণ জানুয়ারী ২০১৩ মাঘ ১৪১৯ দে'জ পাবলিশিং কলকাতা-৭৩

২. লোকাভরন: আধুনিক কবিতা শৈলী, বিপ্লব চক্রবর্তী, পুস্তক বিপণি,দ্বিতীয় সংস্করণ জানুয়ারী,২০০৬ কলকাতা -৯

৩. কবির প্রেম কবির প্রতিবাদ তরুণ মুখোপাধ্যায় দে'জ পাবলিশিং,প্রথম প্রকাশ এপ্রিল,২০০৯ কলকাতা ৭৩

৪. আধুনিক কবিতার ইতিহাস,সম্পাদনা আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং জানুয়ারি ২০১১ কলকাতা-৭৩

৫. শামসুর রহমান,স্মারকগ্রন্থ, শামসুজ্জামান খান,আমিনুর রহমান সুলতান সম্পাদিত বাংলা একাডেমি, ঢাকা বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ২০১০

৬. শামসুর রহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা,-73, প্রথম প্রকাশ মার্চ ১৯৮৬ (পুনর্মুদ্রণ আগস্ট ২০০২)

৭. শামসুর রহমান কবিতার মানচিত্র,রিয়া চক্রবর্তী,বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ বড়দিন ২০১১ কলকাতা,-৭৩

৮. প্রসঙ্গ একালের কবিতা: অন্তরঙ্গ বিশ্লেষণ, সম্পাদনা ব্রম্ভ নারায়ণ মুখোপাধ্যায় ও পঙ্কজ কুমার মন্ডল,প্রকাশক সাহিত্য সঙ্গী, কলকাতা -৭৩,২০০৩.

৯. এ সময়ের কবিতা সম্পাদনা ড. তপন গোস্বামী, আশাদীপ পাবলিশার্স, এপ্রিল ২০০5

ভেজা বারুদ : এক বিপন্ন সময়ের চিত্র; সিন্ডিকেট রাজ

রাকেশ জানা
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
মেদিনীপুর সিটি কলেজ

সারসংক্ষেপ : স্বপ্নময় চক্রবর্তীর লেখায় বৈচিত্র্য রয়েছে, তথ্যের সমাহারে মেধা, বৌদ্ধিকতা ও অভিজ্ঞতার মিশেলে উদ্ভাবনী শক্তিতে লেখক বিপন্ন সময়ের দলিল নির্মাণ করেছেন। যাতে মিশে রয়েছে ক্ষমতা বদলের রাজনীতি। লেখক উপন্যাস সূচনা করার পূর্বে এক স্থানে লিখেছেন- "যে সময়ের মধ্যে আমরা স্থিত রয়েছি, সেই সময়কে কেন্দ্র করে কিছু লেখার মধ্যে একটা ঝুঁকি থেকে যায়। একটু দূরে সরে গিয়েই সময়কে বিচার করা রীতি সিদ্ধ। তবু সময়কে এড়িয়ে গিয়ে চোখ বুজে কোকিলের দিকে কান ফেরানোয় অন্তরের সায় থাকে না অনেক সময়। এই উপন্যাসের সমসময়ের ঘটনাবলী নিয়ে লেখা, মূল চরিত্রের সাধারণ জন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটি একটি রাজনৈতিক উপন্যাস"। আসলে প্রতিদিন আমরা নিজেদেরকে অপরের কাছে বিকিয়ে দিচ্ছি। প্রতিনিয়ত এই শাসক শ্রেণির মানুষেরা আমাদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে আমাদের মনুষ্যত্বকে ধুলোয় মিশিয়ে দিচ্ছে। স্বপ্নময়ের উপন্যাসে ঠেসে দেওয়া হয় জনপ্রিয়তার সস্তা মাল-মশলা, আবার অন্যদিকে এসব ছাপিয়ে উচ্চকিত হয়ে ওঠে মানবিক সুর। এই মানবিক সুরকে প্রকাশ করার জন্য তিনি বেছে নেন অতি সাধারণ মানুষকে। সময়ের সরলরৈখিকতাকে গ্রাহ্য করে তাঁর উপন্যাসে ফুটে উঠেছে বিপন্ন মানবতার বিষাদগাথা। ক্ষমতা, রাজনীতি, যৌনতাকে একটি মৌলিক দৃষ্টিকোন থেকে প্রকাশ করেছেন লেখক। সমসাময়িক ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের স্বেচ্ছাচারিতা, বুজরুকি তথা গোঁজামিলকে তুলে ধরেছেন লেখক। রাজনৈতিক গুন্ডাদের শাসানিতে খাঁচায় বন্দি সাধারণ মানুষ। শাসক বদলায় ক্ষমতার রূপ বদলায়, পরিবর্তন আসে কিন্তু শোষক-শোষিত শ্রেণির অবস্থান একই থাকে। দুনিয়াতে সৎ ও সাধারণ মানুষেরা সর্বদাই দুঃখী। এরাই হয় soft target, রাজনীতির বলি। আমরা শাসানির ভয়ে চুপ করে রয়েছি, আমাদের প্রত্যেকের ঘর আছে, বাবা-মা-ভাই-বোন রয়েছে। যাদের নিরাপত্তা আমার বিদ্রোহে যে কোন মূহুর্তে বিঘ্নিত হতে পারে। তাই সর্বস্বান্ত না হওয়া পর্যন্ত আমরা সহ্য করে যাই। সহ্য করতে করতে আমাদের ভেতরের বারুদগুলো ক্রমশঃ মিইয়ে যায়। শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়াবার সময় তখন পেরিয়ে গেছে। এতটাই অসহায় আমরা যে নিজের দাবিকে ছিনিয়ে আনতে শিখিনি; শিখেছি ধনীর উঞ্ছবৃত্তি ও ক্ষমতাসীনের অনুগ্রহকে ন্যায্য পাওনা হিসেবে মেনে নিতে। অধিকারের লড়াই আমাদের কাছে দূরঅস্ত, আমরা শান্তিপ্রিয় মানুষ-রফাতে বিশ্বাসী। ছবিতে চোখ, কান, মুখ বন্ধ করা বাঁদরের মতো থাকতে আমরা অভ্যস্ত; আমরা বুদ্ধিমান-জীব একেই

ভবিতব্য বলে মেনে নি। বধূহত্যা, ধর্ষণ, বোমাবাজি, তোলাবাজি- সিন্ডিকেট নামক শোষণের নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপারে আমাদের কিছু যায় আসে না, আমরা চোখ থাকতেও অন্ধ। এই আপোষ পন্থায় মানুষ মজে। অন্তর্মুখী মানুষগুলো নিজস্ব চাওয়া-পাওয়াতেই আটকে থাকে। কেন পেলাম না? এই নিয়ে অন্তরে অন্তরে গুমরে ওঠে; বাইরে এর বিষ্ফোরণ ঘটে না। অন্তরে অন্তরে সবাই আমরা ভেজা বারুদ হয়ে রয়েছি। স্বপ্নময়ের লেখায় তাই ফুটে ওঠে সাম্প্রতিককালীন রাজনীতির জাঁতাকলে পিষ্ট এক অসহায় বিপন্ন মানবতার চিত্র।

উপন্যাসে রাজনীতির প্যাঁচে পড়ে উপেক্ষিত ও উপহাসিত হয়েছে হরিপদ। 'জলে কুমীর ও ডাঙায় বাঘে পাওয়া' তার অবস্থা। রাজনৈতিক গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে হরিপদকে তুরুপের তাস রূপে ব্যবহার করেছে সমাজের দুই প্রভাবশালী প্রোমোটার- বাঁকা সাহা ও গুরুচরণ। এলাকা দখলের লড়াইয়ে জোর যার মুলুক তার-এ প্রবাদ চিরন্তন। তাই খুন হতে হয় প্রমোটার বাঁকা সাহাকে; প্রতিদ্বন্দ্বী গুরুচরণের উপর লোকে দোষারোপ করলেও আইনের চোখে সে নির্দোষ। ২০০৯ সালে লোকসভা ভোটের পর এলাকায় দখল নেয় তৃণমূল। পরিবর্তনের এই জোয়ারে দল পরিবর্তন যে বড় মাত্রায় ঘটেছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ক্ষমতার হস্তান্তরের রাজনীতিতে দলের বদল হয় কিন্তু ক্ষমতাসীন মানুষেরা একই রয়ে যায়। তাই দল বদলের এই রাজনীতিতে একই পার্টির মধ্যে সহযোগিতা ও সহাবস্থানের অভাব লক্ষ্য করা যায়। আসলে পার্টিতে আসে লোকে সুবিধা নেওয়ার জন্য, তাই সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী থাকলে সংঘর্ষ বাধে। বাঁকা সাহা ও গুরুচরণের সমস্যাটা মূলত প্রোমোটারির স্বার্থ ও ভবিষ্যত্‍ নিয়ে। তাই এদের মতো লোকের কাছে কোন দল ক্ষমতাসীন তা বড় ব্যাপার নয়; যে দল তাদের স্বার্থ পূরণে সহায়ক হবে সেই দলকেই এরা সমর্থন করবে।

সূচক শব্দ : রাজনৈতিক উপন্যাস,বিপন্ন মানবতার বিষাদগাথা, ক্ষমতা, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, প্রোমোটারি ব্যবসা ওসিন্ডিকেট, সামাজিক ব্যাধি- ধর্ষণ।

মূল আলোচনা : স্বপ্নময় চক্রবর্তীর লেখায় বৈচিত্র্য রয়েছে, তথ্যের সমাহারে মেধা, বৌদ্ধিকতা ও অভিজ্ঞতার মিশেলে উদ্ভাবনী শক্তিতে লেখক বিপন্ন সময়ের দলিল নির্মাণ করেছেন। যাতে মিশে রয়েছে ক্ষমতা বদলের রাজনীতি। লেখক উপন্যাস সূচনা করার পূর্বে এক স্থানে লিখেছেন- "যে সময়ের মধ্যে আমরা স্থিত রয়েছি, সেই সময়কে কেন্দ্র করে কিছু লেখার মধ্যে একটা ঝুঁকি থেকে যায়। একটু দূরে সরে গিয়েই সময়কে বিচার করা রীতি সিদ্ধ। তবু সময়কে এড়িয়ে গিয়ে চোখ বুজে কোকিলের দিকে কান ফেরানোয় অন্তরের সায় থাকে না অনেক সময়। এই উপন্যাসের সমসময়ের ঘটনাবলী নিয়ে লেখা, মূল চরিত্রের সাধারণ জন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটি একটি রাজনৈতিক উপন্যাস"। আসলে প্রতিদিন আমরা নিজেদেরকে অপরের কাছে বিকিয়ে দিচ্ছি। প্রতিনিয়ত এই শাসক শ্রেণির মানুষেরা আমাদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে আমাদের মনুষ্যত্বকে ধুলোয় মিশিয়ে দিচ্ছে। স্বপ্নময় লিখেছেন "পৃথিবীর নিয়মটা হল –বড়

মানুষেরাই ছোট মানুষদের আহা-উহু করবে, সহানুভূতি –স্বান্তনা এসব দেবে। ছোট মানুষেরা বড় মানুষদের এসব করে না"[১] তাই 'মানীলোক' স্বপ্নময়ের ভাষায় যার অর্থ 'পয়সাওলা লোক'-এর কাছে আমরা সদা সন্ত্রস্ত ও মাথা নোয়ানো অবস্থাতে থাকাটাই ভবিতব্য বলে মেনে নি। স্বপ্নময়ের উপন্যাসে ঠেসে দেওয়া হয় জনপ্রিয়তার সস্তা মাল-মশলা, আবার অন্যদিকে এসব ছাপিয়ে উচ্চকিত হয়ে ওঠে মানবিক সুর। এই মানবিক সুরকে প্রকাশ করার জন্য তিনি বেছে নেন অতি সাধারণ মানুষকে। সময়ের সরলরৈখিকতাকে গ্রাহ্য করে তাঁর উপন্যাসে ফুটে উঠেছে বিপন্ন মানবতার বিষাদগাথা। ক্ষমতা, রাজনীতি, যৌনতাকে একটি মৌলিক দৃষ্টিকোন থেকে প্রকাশ করেছেন লেখক। সমসাময়িক ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের স্বেচ্ছাচারিতা, বুজরুকি তথা গোঁজামিলকে তুলে ধরেছেন লেখক। রাজনৈতিক গুন্ডাদের শাসানিতে খাঁচায় বন্দি সাধারণ মানুষ। শাসক বদলায় ক্ষমতার রূপ বদলায়, পরিবর্তন আসে কিন্তু শোষক-শোষিত শ্রেণির অবস্থান একই থাকে। দুনিয়াতে সৎ ও সাধারণ মানুষেরা সর্বদাই দুঃখী। এরাই হয় soft target, রাজনীতির বলি। আমরা শাসানির ভয়ে চুপ করে রয়েছি, আমাদের প্রত্যেকের ঘর আছে, বাবা-মা-ভাই-বোন রয়েছে। যাদের নিরাপত্তা আমার বিদ্রোহে যে কোন মূহুর্তে বিঘ্নিত হতে পারে। তাই সর্বস্বান্ত না হওয়া পর্যন্ত আমরা সহ্য করে যাই। সহ্য করতে করতে আমাদের ভেতরের বারুদগুলো ক্রমশঃ মিইয়ে যায়। শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়াবার সময় তখন পেরিয়ে গেছে। এতটাই অসহায় আমরা যে নিজের দাবিকে ছিনিয়ে আনতে শিখিনি; শিখেছি ধনীর উঞ্ছবৃত্তি ও ক্ষমতাসীনের অনুগ্রহকে ন্যায্য পাওনা হিসেবে মেনে নিতে। অধিকারের লড়াই আমাদের কাছে দূরঅস্ত, আমরা শান্তিপ্রিয় মানুষ-রফাতে বিশ্বাসী। ছবিতে চোখ, কান, মুখ বন্ধ করা বাঁদরের মতো থাকতে আমরা অভ্যস্ত; আমরা বুদ্ধিমান-জীব একেই ভবিতব্য বলে মেনে নি। বধূহত্যা, ধর্ষণ, বোমাবাজি, তোলাবাজি- সিন্ডিকেট নামক শোষণের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে আমাদের কিছু যায় আসে না, আমরা চোখ থাকতেও অন্ধ। এই আপোষ পন্থায় মানুষ মজে। অন্তর্মুখী মানুষগুলো নিজস্ব চাওয়া-পাওয়াতেই আটকে থাকে। কেন পেলাম না? এই নিয়ে অন্তরে অন্তরে গুমরে ওঠে; বাইরে এর বিস্ফোরণ ঘটে না। অন্তরে অন্তরে সবাই আমরা ভেজা বারুদ হয়ে রয়েছি। স্বপ্নময়ের লেখায় তাই ফুটে ওঠে সাম্প্রতিককালীন রাজনীতির জাঁতাকলে পিষ্ট এক অসহায় বিপন্ন মানবতার চিত্র। যার বাহক হরিপদর মতো এক ছা-পোষা ব্যক্তি।

পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক স্বপ্নময় চক্রবর্তীর জন্ম হয় ১৯৫১ সালের ২৪ আগস্ট উত্তর কলকাতায়। তিনি রসায়নে বিএসসি, বাংলায় এমএ, সাংবাদিকতায় ডিপ্লোমা করেছেন। এছাড়াও সংস্কৃত জানতেন। তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় মাত্র ২২ বছর বয়সেই দেশলাইর সেলসম্যান হিসেবে। তারপর নানা পেশা বদলের পর যুক্ত হন আকাশবাণীর সঙ্গে। সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে তিনি লেখালেখির শুরু

করেন। তাঁর প্রথম গল্প 'অমৃত' পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও ছোট কাগজেই বেশি লিখেছেন। এ যাবত্ প্রায় সাড়ে তিনশোর মতো ছোটগল্প লিখেছেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'চতুষ্পাঠী' প্রকাশিত হয় ১৯৯২ সালে শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকায়। বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধ এবং মনোজ্ঞ রচনা কিংবা রম্যরচনাতেও তাঁর কলম সমানভাবে সাবলীল। তাঁর রচিত 'হলদে গোলাপ' উপন্যাসটি ২০১৫ সালে আনন্দ পুরস্কারে সম্মানিত হয়। ২০০৫ সালে 'অবন্তীনগর' উপন্যাসের জন্য তিনি বঙ্কিম পুরস্কার পান। এছাড়াও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পুরস্কার, সর্বভারতীয় কথা পুরস্কার, তারাশঙ্কর স্মৃতি পুরস্কার, গল্পমেলা, ভারতব্যাস পুরস্কার লাভ করেছেন। লেখালেখি ছাড়াও তিনি গণবিজ্ঞান আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন।

নিজের সাহিত্য সৃষ্টি প্রসঙ্গে স্বপ্নময়ের বক্তব্য তুলে ধরলাম- "১৯৭৮ সালে 'প্রমা' নামে একটি পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। সম্পাদকমণ্ডলীতে কয়েকটি নক্ষত্র—অরুণ মিত্র, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, পবিত্র সরকার। কার্যকরী সম্পাদক সুরজিৎ ঘোষ। ...প্রথম সংখ্যাটি থেকেই পত্রিকাটি ছিল বেশ উঁচু মানের। মহাশ্বেতা দেবী, শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, সৌরীন ভট্টাচার্য, শিশিরকুমার দাশরা এই পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। এক দিন সুরজিৎ ঘোষের চিঠি পেলাম। বলছেন—এই পত্রিকায় গল্প লিখতে হবে। আমি আহ্লাদিত। ওই পত্রিকায় গল্পও ছাপা হতে দেখেছি। মহাশ্বেতা দেবী, মতি নন্দী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ছাড়াও জয়ন্ত জোয়ারদার, সাধন চট্টোপাধ্যায়, কল্যাণ মজুমদারদের গল্প দেখেছি। ওঁদের সঙ্গে আমিও? এর আগে পাঁচ-সাতটার বেশি গল্প লিখিনি। প্রথম বইটির কথা বলতে গিয়ে প্রথম লেখাটার কথাও একটু বলতে হয়। ১৯৭২ সালে আমার প্রথম গল্প ছাপা হয় 'অমৃত' পত্রিকায়। মণীন্দ্র রায় ছিলেন সম্পাদক। পরের গল্প দুটো 'চতুরঙ্গ' এবং 'মধ্যাহ্ন' পত্রিকায় পাঠাই। ছাপা হয়। এর পর কয়েক বছর লেখা হয় না। চাকরির চেষ্টা, চাকরি পাওয়া, ছাড়া, আবার চেষ্টা ...১৯৭৩-১৯৭৭ তেমন লিখিনি। গল্পের উপাদান চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়েছি শুধু। বাগবাজারের এক গলির ছেলের কাছে কত বড় পৃথিবীর কতগুলো জানলা খুলে গেল কয়েকটা বছরে। যাদব-কুর্মি-ভূমিহার; ছাতু-লিট্টি; লোন্ডা-ঝুমুর নিয়ে বিহার। পশ্চিমবাংলার গ্রামের গভীরে গিয়ে দেখলাম মাটির সঙ্গে মানুষের কী নিবিড় আর জটিল সম্পর্ক। অবাক হয়ে দেখি, ধানের ভিতরেও দুধ হয়। ধান-খাওয়া মাঠের ইঁদুর এবং ইঁদুর-খাওয়া মানুষের আহ্লাদ। হাঁড়ি-ভর্তি গাঁজলা-ওঠা তাড়ি ঘিরে গাঁজলা-মুখ মানুষের সান্ধ্য সঙ্গীত। অন্ধকারে আকন্দ-ধুঁধুল জোনাকিতে ভরে গিয়েছে। বাবুইয়ের বাসা দোলে দখিনা বাতাসে! আলো আর বুলবুলি খেলা করে। পটে আঁকা ছবিটির মতো ছোট্ট নদীটির চরে শিশুরা করে খেলা, নিজেদের ত্যাগ করা বিষ্ঠা থেকে কাঠির আগায় বের করে নেয় নিজের পেটের কৃমি, খেলা করে। শুখা নদীর বালি খুঁড়ে জল বের করাও দেখি। শুনি গো-রাখালের কথকতা। বুঝলাম রায়ত-আধিয়া-কোর্ফা-মুনিষ-মাহিন্দার। এ যেন এক বিস্ময়-বিহ্বল আবিষ্কার। আমার চোখে ক্রম-উন্মোচিত গ্রামবাংলাকে নিয়ে পর

পর কয়েকটা গল্প লিখতে থাকি। খুব ছোট কাগজেই লিখতাম। পদাবলী, কল্পবাণী, উত্তরকাল... বড় কাগজে লেখা না-পাঠানোর পক্ষে কোনও জুতসই যুক্তি আমার কাছে নেই। পবিত্র সরকার তখন শিকাগো থেকে ফিরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার পড়াচ্ছেন। উনিই সুরজিৎ ঘোষকে আমার কথা বলেন। আমি প্রমা-য় গল্প লিখি। প্রথম গল্পটি সম্ভবত **'ভাল করে পড়গা ইস্কুলে'**। তখন আমি হাওয়া অফিসে। এর কিছু আগে 'ভূমি-ভূস্বামীর ভূত ও ভবিষ্যত' নামে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলাম একটা ছোট কাগজে। ভূমি-রাজস্ব দফতরে চাকরির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় প্রবন্ধটি লেখা। নামকরণে বিনয় ঘোষের প্রভাব। প্রবন্ধটা পড়ে অনুষ্টুপ সম্পাদক অনিল আচার্য আমাকে ওঁর পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখতে বলেন। উনি তখনও আমার গল্প পড়েননি। আমি বলি, গল্পই তো লিখি, গল্প লিখতেই ভাল লাগে। উনি বলেছিলেন, তা হলে তা-ই দিন। ভাল লাগলে ছাপব। এর পর ছাপা হতে লাগল প্রমা এবং অনুষ্টুপে। আমার বেশ খাতির হতে লাগল— কারণ দুটো গণ্য করার মতো পত্রিকায় বছরে দুটো করে গল্প বেরচ্ছে। নান্দীকার-এর ঘরে একটা গল্প পড়া হয়েছে, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় নাটক করার কথা ভাবছেন।

কফি হাউসে আসতেন সুরজিৎ ঘোষ। উনি ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার। অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ছিল। মুজতবা, বাদল সরকার, শঙ্খ-শক্তি-থার্মোডাইনামিক্স মুখস্থ বলে যেতেন। ওই আড্ডায় ১৯৮০ নাগাদ বললেন, বইও পাবলিশ করব প্রমা থেকে। বাছা বাছা বই বেরুবে। তার পর কফি হাউসে এক দিন বললেন, স্বপ্নময়, দশ-বারোটা গল্প রেডি করো। তোমার একটা বই করব। ...তত দিনে সতেরো-আঠেরোটা গল্প বেরিয়েছে। আমি দশটাই বাছলাম (বাকিগুলোর সন্ধান আমার কাছেও এখন আর নেই)। বেছে নেওয়া সব ক'টা গল্পই ছিল মাটির সঙ্গে জড়ানো মানুষদের নিয়ে। কৃষি মজুর, বর্গাচাষি, ভূমি সংস্কার করতে আসা সরকারি কর্মচারি, জোতদার, এরাই ছিল সব মুখ্য চরিত্রে। বইটার নাম দেব ভেবেছিলাম, 'মা-মাটি-মানুষ'। একটি গল্পে, ভূমিহীনদের বিলি করা জমি কী ভাবে আবার পুরনো মালিকের কাছেই ফিরে যায়, সেই কাহিনি বলা ছিল। গল্পটার নাম ছিল 'ভূমির নিত্যতা সূত্র'। পদার্থবিদ্যার 'শক্তির নিত্যতা সূত্র' মাথায় রেখে ওই নামকরণ, যে সূত্রের প্রতিপাদ্য হল, শক্তির বিনাশ নেই। সে কেবল রূপ পালটায়। শেষ পর্যন্ত বইটির নাম 'ভূমি সূত্র' রাখলাম। ভাগ্যিস নাম পালটেছিলাম। খরাক্লিষ্ট জমির ছবির ওপর, ভূমি সম্পর্কিত আইন ও ভূমি বিরোধের খবরের কাটিং কোলাজ করে একটি প্রচ্ছদ তৈরি করেছিলেন দেবব্রত রায়। প্রুফ দেখেছিলেন পবিত্র সরকার। বইটিতে কোনও ছাপার ভুল ছিল না। ১৯৮২ সালের বইমেলার মধ্যেই বইটি বেরিয়েছিল। মনে আছে, আবেগের বিহ্বলতা-জনিত কোনও থরোথরো অনুভূতি হয়নি। ব্যাগে করে দশটি বই নিয়ে এসেছিলাম বাড়িতে। মা বেঁচে নেই। বাবা এক বার দেখলেন, ব্যস। ক'দিন পরে সুরজিৎ ঘোষ জানালেন, মহাশ্বেতা দেবী বইটা পড়েছেন। কথা বলতে চাইছেন। তাড়াতাড়ি যাও। ওঁকে প্রথম দেখার

অনুভূতি এখন থাক। চার বছরে প্রথম সংস্করণ শেষ হয়েছিল। পরে আরও দুটো সংস্করণ হয়। এখন বইটি পাওয়া যায় না। বই আর বউ একই সময় হয়েছিল আমার। বইটি যখন সদ্যপ্রকাশিত, আমিও সদ্যবিবাহিত। একটা কপি রাষ্ট্রপতির পুরস্কার পাওয়া আমার হেডমাস্টার শ্বশুরমশাইকে দিয়েছিলাম। ক'দিন পর উনি বইটা ফেরত দিয়ে বলেছিলেন, 'পড়া গেল না।' দেখলাম গল্প সংশোধন করেছেন। গু কেটে বিষ্ঠা, রাঁড় কেটে বিধবা। এক জায়গায় ছিল একটি বালক 'বাগালি' না করে স্কুলে যাচ্ছে বলে ওর বাবা ওকে বলছে, অ্যাঁড় ছিচে দুব। কেটেছেন। কিন্তু বিকল্প শব্দ বসাতে পারেননি"[২]।

সুবল সামন্ত সম্পাদিত 'বাংলা গল্প ও গল্পকার' গ্রন্থে অরুণ কুমার ঘোষ স্বপ্নময়ের লেখা প্রসঙ্গে বলেছেন- "তাঁর গল্পের থিম হিসেবে প্রাধান্য পায় শোষণ বঞ্চনা, গ্রাম-নগরের সমাজ জীবনে ও রাজনীতিতে ব্যাপক দুর্নীতি, সমাজ-পরিবেশের অবক্ষয়ে ব্যক্তি চরিত্রের বিনষ্টি, মধ্যবিত্ত নিবীর্যতা ও সুবিধাবাদ, মুনাফার সর্বগ্রাসী লোভ, পার্থিব সাফল্য লাভের নির্বিবেক লোলুপতা, স্বপ্নময় গ্রামীণ পরিমন্ডলের বাস্তবতাকে সজীব সানুপুঙ্খতায় উপস্থাপন করেছেন, অবিরত ব্যবহার করেছেন গ্রামীণ ভাষার সংলাপ"[৩]। আলোচ্য 'ভেজা বারুদ' উপন্যাসেও স্বপ্নময়ের লেখায় নাগরিক সমাজ জীবনে দুর্নীতি, রাজনীতি, ব্যক্তি চরিত্রের বিনষ্টি, মধ্যবিত্তের নিবীর্যতার বিষয় ঘুরেফিরে এসেছে। তবে চরিত্রের অন্তরভেদী প্রক্রিয়াতে না গিয়ে চরিত্রকে ওপর ওপর থেকে দেখা স্বপ্নময়ের লেখার ত্রুটি বলে মনে হতে পারে। স্বপ্নময় নিজেও একথা স্বীকার করেছেন। তবে এটা অনেকটা উদ্দেশ্য প্রনোদিত; সাহিত্যিক রবিশঙ্কর বলের অকাল মৃত্যুর শ্রদ্ধাজ্ঞাপণ অনুষ্ঠানে স্বপ্নময় তাই বলেছেন- "আমার লেখার ধরণের সঙ্গে রবির লেখার অনেকটা তফাত্। আমি ব্যক্তি মানুষের ভেতরে খুব একটা ঢুকতাম না, রবি ব্যক্তি মানুষকে প্রাধান্য দিত। ব্যক্তির নিজস্ব বিশ্বাসের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিল। আমি একটা ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা এবং এক্সিসটেনশিয়ালিজমের পরিবর্তে সামাজিক মনে এবং তার প্রভাবে বিশ্বাসী ছিলাম। ফলে আমার গল্পের বিষয় আঙ্গিকে আলাদা হলেও আমার সঙ্গে খুবই সুসম্পর্ক ছিল। কারণ মতবাদের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিল রবি, ফলে আমার বিশ্বাসকে ও মর্যাদা দিত"[৪]।

রাজনীতির প্যাঁচে পড়ে উপেক্ষিত ও উপহাসিত হয়েছে হরিপদ। 'জলে কুমীর ও ডাঙায় বাঘে পাওয়া' তার অবস্থা। লেখক হরিপদর এই অসহায় দশার যথার্থ চিত্র পরিবেশন করেছেন- "হরিপদ বুঝতে পারে –ওর হল মারীচের দশা। রামে মারলেও মরবে, রাবনে মারলেও মরবে। যে কোনও একজনের হাতে মরতেই হত মারীচকে। মারীচ রামের হাতে মরাটাই বেছে নিয়েছিল। ও গুরুপদর নুন খেয়েছে"[৫]। রাজনৈতিক গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে হরিপদকে তুরুপের তাস রূপে ব্যবহার করেছে সমাজের দুই প্রভাবশালী প্রমোটার- বাঁকা সাহা ও গুরুচরণ। এলাকা দখলের লড়াইয়ে জোর যার মুলুক তার-এ প্রবাদ চিরন্তণ। তাই খুন হতে হয় প্রমোটার বাঁকা সাহাকে; প্রতিদ্বন্দ্বী গুরুচরণের উপর লোকে দোষারোপ করলেও আইনের চোখে সে নির্দোষ। আলোচ্য উপন্যাসে উঠে

এসেছে তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষ। রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের আগে সিপিএমের গড় ছিল বরানগর ও মধ্যমগ্রাম এলাকা। অতঃপর ২০০৯ সালে লোকসভা ভোটের পর এলাকায় দখল নেয় তৃণমূল। পরিবর্তনের এই জোয়ারে দল পরিবর্তন যে বড় মাত্রায় ঘটেছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ক্ষমতার হস্তান্তরের রাজনীতিতে দলের বদল হয় কিন্তু ক্ষমতাসীন মানুষেরা একই রয়ে যায়। তাই দল বদলের এই রাজনীতিতে একই পার্টির মধ্যে সহযোগিতা ও সহাবস্থানের অভাব লক্ষ্য করা যায়। আসলে পার্টিতে আসে লোকে সুবিধা নেওয়ার জন্য, তাই সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী থাকলে সংঘর্ষ বাধে। বাঁকা সাহা ও গুরুচরণের সমস্যাটা মূলত প্রোমোটারির স্বার্থ ও ভবিষ্যত্‌ নিয়ে। তাই এদের মতো লোকের কাছে কোন দল ক্ষমতাসীন তা বড় ব্যাপার নয়; যে দল তাদের স্বার্থ পূরণে সহায়ক হবে সেই দলকেই এরা সমর্থণ করবে। লেখক এই রাজনৈতিক দলগুলির এলাকা দখল ও তাদের প্রতি সাধারণ মানুষের ভীতিকর ও নিস্পৃহ অবস্থার ব্যাঙ্গাত্মক চিত্রটি কুশলতার সাথে ব্যক্ত করেছেন- "...মেঠো পথে পিচ সেখানে বাণিজ্যবায়ু ঢোকে। বিউটি পার্লার, বার্গার, মধুচক্র। এই পুরো পথ জুড়ে এক একটা নফরগঞ্জ, জিরাট বদনাপুরে উন্নয়ন চলছে এবং কাক ডাকছে। মূল শহর থেকে তাড়িত মানুষ আরও ধনী হবে বলে ফ্ল্যাট কিনে রাখছে, তাই নির্মাণ শিল্প। তাই এলাকা দখল। এলাকা ভাগ একটা অলিখিত চুক্তি। চুক্তিভঙ্গ প্রায়শই হয়। জীবজগতে এলাকা ভাগ আছে। কুকুরদের নিজেদের মধ্যে এলাকা ভাগে নিয়ম আছে, আর বেনিয়ম তো নিয়মের মধ্যেই নিহিত থাকে। পুরুষ বাঘেরা নিজেদের শরীর থেকে ফেরোমন বার করে, ফেরোমন নিঃসরণ করে জঙ্গলের বৃক্ষলতায় লেপে রাখে, ফেরোমনের গন্ধে জানায় এলাকা আমার। মানুষ বাঘেদের ফেরোমন নেই, বোমা আছে। বোমার চিৎকৃত শব্দে জানিয়ে দেয় এলাকা আমার। সমাজবন্ধুরা বোমা বানায়, বোমা কেনে, ঐশ্বর্যের মতো রেখে দেয় অন্দরে, অন্তরে। মাঝে মাঝে বোমা ফাটে, জিন্দাবাদ ধ্বনি হয়, ছায়াপিন্ড মানুষেরা চাউ খায়, ম্যাগি খায়, নিজেদের মধ্যে অধোস্বরে বলে কী যে হচ্ছে এবং যা হচ্ছে সেটাকেই ভবিতব্য মেনে নেয়"[৬]।

মানুষ ওপরে ওপরে যতই পরিশীলিত হওয়ার চেষ্টা করুক কিন্তু তার মধ্যে আদিম সত্তার পাশব প্রবৃত্তিটি বিলুপ্ত হয় না। তার সুপ্ত জৈব প্রবৃত্তিটি ক্ষমতা প্রকাশের সুযোগ পেলেই ভদ্র আবরণ উন্মোচন করে অত্যন্ত নির্লজ্জ রূপে প্রকাশ পায়। বর্তমান সময়ে মানুষের আচরণ বর্বরতা তথা প্রাগৈতিহাসিক স্তরে নেমে গেছে। পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ ও নারীর শরীরের দখলদারীতে মানুষের লোভ ও যৌন রিরংসা নগ্নরূপে প্রকাশ পেয়েছে। আলোচ্য উপন্যাসে গুরুচরণের মুম্বাচুম্বা ড্যান্স-বারটি তার প্রমাণ দেয়। পূর্বে অবচেতন স্তরে যৌন চেতনা সক্রিয় ছিল বর্তমানে চেতনার গভীরে যৌনতার অপ্রতিহত সক্রিয়তা। মানুষের রুচি অতি নিম্নগামী। সমাজের বিভিন্নস্তরে এই নির্লজ্জ বেহায়াপনা, নারী শরীর সংক্রান্ত খোলাখুলি মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। তাই স্বপ্নময়ের লেখায় এই

অবস্থার প্রতি কটাক্ষ বিদ্রূপ বর্ষিত হয়। আলোচ্য উপন্যাসে চানুও এই প্রবৃত্তির শিকার; গুরুচরণের পার্সোনাল অ্যাসিস্টেন্ট থাকাকালীন চানু গুরুচরণের ল্যাপটপে ইন্টারনেটে পর্ণ সাইট খুলে দেখে। লেখক এ প্রসঙ্গে বলেছেন- "ও বেশ বুঝতে পারছে ওর মনের ভিতরে গুটিশুটি মেরে শুয়ে থাকা তেলের বিজ্ঞাপণের সাপটা মাথা ওঠাচ্ছে"[৭]। তাছাড়া গুরুচরণের মতো তার ছেলের মধ্যেও বয়ঃসন্ধি কালের প্রবৃত্তির তাড়না প্রবল রয়েছে। বেকারত্বের সমস্যায় কিভাবে অপচিত হয়ে যায় মানুষের মুল্যবোধ ও নীতিবোধ চানু তার বড় উদাহরণ। গুরুচরণের লোভের থাবা চানুকে গ্রাস করে। চানুর সেখান থেকে বেরিয়ে আসা অসম্ভব হয়ে পড়ে। চানুকে চাকরি দিয়েই গুরুচরণ হরিপদর পরিবারকে কব্জা করে। উপন্যাসের শেষাংশে গুরুচরণ চানুকে তার ধর্ষিতা দিদি সুলতাকে বিয়ে করতে চাওয়ার কথার মধ্যে ক্ষমতাবাণ লোকের হুমকি রয়েছে। "তোমার বোনটা সুন্দরী। তাছাড়া ঘটনাটা তো জানি। ভেরি স্যাড। তোমার বাবার সঙ্গে কথা বল। তোমার বোন তো নয়। দিদি। বয়স তো হয়েছে। ফেলে রেখেছ। রাস্তায় মাংস পড়ে থাকলে শিয়াল কুকুর টানাহিচড়া করে। আমি যদি ওকে... ও কিন্তু উদ্ধার হয়। তোমার ফ্যামিলিটাও বাঁচে। আর শুনো, তোমার বাবা খুব ব্লান্ডার করেছে। সাদা কাগজে সই করে রেখেছে। যা হোক, ওটা এখন আমার কাছেই আছে"[৮]। ঘটনাতে দেখতে পাই হরিপদর মেয়েকে রেপ করিয়ে তাকে ভাতে না মেরে, জাতে মারার চেষ্টা ফলপ্রসু হয়েছে। এরপরে সাদা কাগজে হরিপদর সই গুরুচরণের কাছেই রয়েছে, এই হুমকিতে হরিপদকে একেবারে ঘটি হারা করা অর্থাত্‍ ধনে-প্রাণে সর্বস্বান্ত করার আভাষ মেলে। কথায় বলে ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না। গুরুচরণও নিজের অর্থের জোরে পলিটিক্যাল ইমেজ গড়ে তুলে। মধ্যমগ্রামের সর্বত্র প্রোমোটারি ব্যবসার মাধ্যমে সে নিজের ক্ষমতা প্রকাশ করতে গুন্ডা পুষতো। এলাকার অনেক যুবকদের কাজ ও অর্থ জুটিয়ে সবাইকে বশ করে এভাবেই সে নিজের দলের লোক বৃদ্ধি করেছিল; এভাবেই জড়ো করে কিটুদের। তাছাড়া নেতাদের কাছে নিজের পলিটিক্যাল ভাবমূর্তি ও ক্ষমতা জাহিরের সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র হল পোষা গুন্ডাদের দ্বারা এলাকা দখল। ভোটের আগে এভাবেই ভয় দেখিয়ে ক্ষমতায় আসতে হয়। এ রাজনীতি বহু পুরোনো। তাই ভোটের লোভে ক্ষমতাসীন প্রশাসনও ওদের ব্যভিচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে আইনি বন্দোবস্ত নেয় না। ফলে দাগী আসামী ঘাগী হয়ে সমাজে ঘুরে বেড়ায়, ক্ষমতা জাহির করে বোমা ও ধর্ষণে। ফলে ভয়ে সিঁটিয়ে থাকা মানুষগুলো এই তামাশাকে চোখে দেখেও 'ভেজা বারুদ' হয়ে থাকে।

হরিপদর জীবনের প্রথম পর্বে রয়েছে বরানগরের রায়বাড়ির ভাড়াটে গৃহে বেড়ে ওঠা। তারপর ক্রমশঃ হরিপদের চোখে কোলকাতার একটু একটু করে বদলে যাওয়ার চিত্রের ছবি এঁকেছেন লেখক। নতুন কোলকাতার বিচিত্র জনজীবনের সাথে তার পরিচয় বেড়েছে। পূর্বেকার ফাঁকা ফাঁকা মাঠগুলো ও জলা জঙ্গলগুলো ক্রমশঃ লোকবসতিতে ভরে উঠেছে। আলোচ্য উপন্যাসে উঠে এসেছে পুরোনো কোলকাতার

ইতিহাসের চিত্র, বিশেষ করে বরানগর ও মধ্যমগ্রামের পুরোনো ইতিহাসের চিত্র। লেখকের গবেষণা সমৃদ্ধ তথ্যের কিছু অংশ তুলে ধরলাম- "পলাশির যুদ্ধের পরে ইংরেজরা ওলন্দাজদের আর সহ্য করতে পারত না। এক বাঙালি মুনশিকে পাঠিয়েছিল ক্লাইভ ওলন্দাজদের কাছে বলেছিল- কুঠি ছেড়ে চলে যেতে। একটা বার্তা লেখা ছিল একটা চিঁড়েতনের গোলামের টেক্কার গায়ে- 'গেট আউট'। ওরা বলেছিল কেন গেট আউট? যাব না। মুনশি ক্লাইভকে গিয়ে বলেছিল- যাবে না বলছে, ক্লাইভ তখন কর্নেল ফোর্ডকে একটা অর্ডারে লিখলেন, ফোর্ড তিনশো সৈন্য নিয়ে বরানগর আক্রমণ করে ওলন্দাজদের তাড়িয়ে দিল। এটাই তাসের যুদ্ধ। একটা জায়গার নাম ছিল তাসের মাঠ। সেই যুদ্ধের স্মৃতি। মাঠ নেই। হরিপদ ছোটবেলাতে ওখানে মাঠ দেখেছিল, রাম যাত্রা হত। বহুদিন হল মাঠটাও নেই। বাড়ি বাজার, পাইস হোটেল। ওখানে আবার গোলাবারুদের শব্দ হয়েছিল, সেই সত্তরের দশকে। সেই বরাহনগরের বড়বাড়ি। বাইরের দিক থেকে ওঠা খাড়াই সিঁড়ি। একতলায়, যেখানে এককালে গুদাম ছিল, ওখানে পর্টিশন করে অনেক ছোট ছোট ঘর করা হয়েছিল"[৯]। অন্যত্র আবার মধ্যমগ্রামের শহরতলিতে বদলে যাওয়ার চিত্র ধরা পড়েছে- "এলাকাটা তো নতুন করে গড়ে উঠেছে। পনের-কুড়ি বছর আগেও তো গ্রামই ছিল। চাষ হোত, তৈশিরা ঘাস হত। নফরগঞ্জ, জিরাট, বদনাপুর এসব এলাকায় ছোট ছোট জনবসতি। একটা ডেয়ারি হল বিশ বছর আগে। রাস্তা চওড়া হল, বাস চলাচল শুরু হল, ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কো-অপারেটিভ করে বাড়ি বানাল, মধ্যমগ্রাম আর সোদপুরের রেললাইনের উপর ফ্লাই ওভার হল, এদিকে চলে এল ব্যাঁকা সাহা, ভীম ঘোষেরা। অটো চলাচল শুরু হয়ে গেল, দুটো ঝিল বুজে গেল, প্লট করে বিক্রি হতে লাগল। এবার ঘরবাড়ি উঠছে, সমাজবন্ধুরা তৈরি হয়েছে, যারা বাড়ি করছে, ইঁট বালি কোনও না কোনও সমাজবন্ধুর কাছ থেকেই নিতে হবে।"[১০]।

বদলে যাওয়া কোলকাতা শহরে নতুন সংযোজন সিন্ডিকেট। লেখক গুরুচরণের মুখে সিন্ডিকেট কি? তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন- "মানে –যে যা খুশি করতে পারে না। এলাকায় একটা ডিসিপ্লিন রাখার জন্য একটা সিন্ডিকেট করছি। নতুন নতুন লোক আসতাছে, সবারই ঝি দরকার, কামের লোক দরকার্, অনেক বাড়িতে বুড়ি-বুড়া আছে, মিঞা বিবি নোট কামাইতে বাইর হইয়া যায়, ঘরে আয়া দরকার হয়, সেই কারণে একটা সিন্ডিকেট করলাম। আমার ছোট ভাই চালায়। খালি বিল্ডিং ম্যাটেরিয়াল সাপ্লাইয়ের জন্যই সিন্ডিকেট লাগে এমন কথা নাই। সিন্ডিকেট ছাড়া কন্ট্রোল থাকে না। রিকশা ইউনিয়নের উপর আমাগোর কন্ট্রোল আছে। সেই জন্য সবাই একোই ভাড়া নেয়। এখান থেকা আপ টু ছোট মসজিদ আট টাকা, তারপর জয়পুরের মোড় পর্যন্ত দশ টাকা, সবার একরকম ভাড়া। নইলে খারাখারি বাইধ্যা যাইত। কাজের লোক-নার্স-আয়াবাড়ির কন্ট্রাকটার সাপ্লাইয়ের সিন্ডিকেটের নাম সমাজবন্ধু। নাড়ুর চায়ের দোকানের

পাশেই খাপরার ঘর। ওখানে গেলে পুরোইতও সাপ্লাই করে। গলায় একটা পৈতে ঝুলাইয়া আমি বড় পুরোইত, কাঁসার বাসন চাই, বিশখান শাড়ি চাই কইলেই চলব না। সমাজবন্ধুতে নাম লিখাতে হয়, তারপর ওরাই সাপ্লাই করে। একদম ঠিকঠাক মাল”[১১]। হরিপদ এসব শুনে একটু অবাক হয়, বাম আমলে বরানগরে রামপিয়ারি, বোঁচা নাড়ু, ভুটে শোনা নামে রাজনৈতিক তোলাবাজরা ছিল কিন্তু সিন্ডিকেটের নামে তোলাবাজি এই প্রথম। তাই তো হরিপদ তার বাবার বাৎসরিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে যে পুরোহিতকে সমাজবন্ধুর কাছ থেকে এনেছে তার অভিজ্ঞতায় গুরুচরণের ভাই নানুবাবু “সাক্ষাত ষাঁড়। ষাঁড় ছাড়া কী বলব? ফোকটে খায়। শালা তোলাবাজ। ...আচ্ছা বলুন তো, লোকের বাড়ি কাজ করে ওকে কেন টাকা দিতে যাব, এতে আমার আপনার সবারই তো ক্ষতি। বলতে যাবেন না যেন,”[১২]-সব কিছুতেই রয়েছে মানুষের ভেতরে ভেতরে গুমরে ওঠার অবস্থা, গর্জে উঠলে ক্ষতি অনিবার্য। তাই চুপ করে থাকতে হয়।

সংবাদপত্র খুললে আমরা একটাও ধর্ষণের ঘটনা পাব না এমন কখনো হয় না। ধর্ষণের অপরাধীর শাস্তি না পাওয়ার কারণে এই অপরাধ প্রবণতার হার ক্রমশঃ বেড়েছে। অনেকে আবার আইনের সহায়তা না নিয়ে সালিশির মাধ্যমে বিষয়টির রফা করে থাকেন। আবার কেউ কেউ পরিবারের সম্মানের কথা ও ধর্ষিত মেয়েটির ভবিষ্যতের কথা ভেবে কিছুই বলেন না বিষয়টি চেপে যাওয়ার চেষ্টা করেন। অনেক সময় ধর্ষনের অপরাধী ক্ষমতাসীন দলের খুব কাছের হলে, মোটা টাকায় আইনের চোখে ধুলো দিয়ে সমস্ত প্রমাণ লোপাট করে ব্যাপারটাকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা হয়। আলোচ্য উপন্যাসে ধর্ষণের শিকার দুই নারী। যে সময়ের রাজনৈতিক নেতা ঘরে ছেলে ঢোকানোর বার্তা দেয়, যখন ক্ষমতার প্রকাশ হয় সন্ত্রাসে-হুমকীতে ধর্ষণে; তখন নৈতিকতা শিকেয় তুলে এ হেন আচরণ অস্বাভাবিক নয়। সমাজপটে মেয়েদের অবস্থান বদলে গেলেও মহিলা-নিরাপত্তা কতটা এ সমাজে? এই প্রশ্নটির উত্তর এখনো অধরা। খবরের কেন্দ্রে আসা এই ঘটনাগুলি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যেকোনো মূহুর্তে পথচলতি ও গৃহকোনে আবদ্ধ মেয়ের সর্বনাশ ঘটতে পারে। যা প্রশাসনের কড়া আইনের তোয়াক্কা না করেই ঘটে; অনৈতিক পথে আইন-রক্ষকের মদতে সাক্ষপ্রমাণ লোপাটের চেষ্টা করা হয়। আলোচ্য উপন্যাসে আইন-রক্ষকের মদতে পাপিয়ার জেলে রহস্যজনক হত্যাকে তাই আত্মহত্যা বলে সাজানো হয়। পাপিয়ার বাবারও মত তাঁর মেয়ে আত্মহত্যা করতে পারে না। লেখকের এপ্রসঙ্গে বিবৃতিটিতে প্রকৃত ঘটনাটি পরিষ্কার হয়ে ওঠে –“...পাপিয়াকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানা লকআপে রাখা হয়েছিল। বাথরুমে সে গায়ে আগুন দেয়। ওর পরনে ছিল সিনথেটিক শাড়ি। থানা লকআপে দেশলাই কী করে পেল তা নিয়ে তর্কবিতর্ক চলেছিল। কেউ বলেছে বৃহত কোনও চক্রান্ত করে মেয়েটাকে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। মেয়েটাকে বাঁচিয়ে রাখলে অনেক কিছু ফাঁস হয়ে যেত। দীঘার ওই হোটেলের ৪০৩ নম্বর ঘরে এরা দুজন ছাড়াও আর

একজন ব্যক্তিকে একদিন আগে ঢুকতে দেখা গিয়েছে বলে জানাচ্ছে হোটেলের কর্মচারীরা। ওই ব্যক্তিটি সারা দুপুর ছিলেন। তবে কি প্রমোটার সাহা মেয়েটিকে নিয়ে গিয়েছিল কাউকে ভেট দিতে”[১৩]। আবার চানুর দিদি সুলতার ধর্ষণের সংবাদ সমাজে অপমানিত হওয়ার ভয়ে পরিবারের পক্ষ থেকে চেপে যাওয়া হয়। শুধু ধর্ষণ নয়, বধূহত্যার মতো কেসেও আইন-রক্ষকদের সহায়তায় অপরাধীরা ছাড় পেয়ে যায়। গুরুচরণ স্ত্রীকে অ্যাসিড খাইয়ে হত্যা করেও এভাবেই ছাড় পেয়েছে। লেখক চানুর দৃষ্টিতে এই বিষয়ে আলোকপাত করেছেন -“বিকেলে বউদি মারা গেল। ডেথ সার্টিফিকেটে অ্যাসিড-ট্যাসিডের কোনও ব্যাপার লেখা ছিল না। মৃত্যুর কারণ হিসেবে নিরাপদ কিছু লেখা হয়েছিল। ডাক্তার ডেথ সার্টিফিকেট লিখে মাথা নিচু করে ঠোঁট দাঁতে চেপে চলে গেল”[১৪]।

আলোচ্য উপন্যাসে রাজ্যে এই সময় সিন্ডিকেট, তোলাবাজি ও ব্যাভিচারের বাড়বাড়ন্ত নিয়ে লেখক সরব হয়েছেন। পরোক্ষে আবার তাঁর দৃষ্টিতে সমকালে কেন্দ্রিয় সরকারের ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বাতিলের সিদ্ধান্তও যে সমাজে তাৎক্ষণিক অব্যবস্থা সৃষ্টি করেছিল, তার বর্ণণা দিয়েছেন। এই নোট বাতিলের একটি সমস্যা হল খুচরোর যোগান কমে যাওয়ার সমস্যা। ফলে বাজারে খুচরো সামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পায়। আলোচ্য উপন্যাসে হরিপদ পুজোর নৈবেদ্য হিসেবে গুজিয়া প্রসাদ কিনতে গেলে মিষ্টি দোকানীরা খুচরো সমস্যায় তিন টাকার গুজিয়া পাঁচ টাকায় বিক্রি করেছে। ফলে সাধারণ মানুষকে হয়রানিতে পড়তে হয়েছে। তাই ব্ল্যাকমানি ও জাল নোটের বাড়বাড়ন্ত রোখার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নোট বাতিলের নীতিতে যে সাধারণ মানুষের চরম ভোগান্তি হয়েছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

আলোচ্য উপন্যাসে সুলতা অতি সাধারণ অনুজ্জ্বল একটি চরিত্র। একবিংশ শতাব্দীতে এই রকম নির্বুদ্ধিতায় ভরা নারী খুব কমই চোখে পড়ে। সুলতার পিতা হরিপদ যথাসাধ্য চেষ্টা করে সুলতার অভাব পূর্ণ করার। তবুও সুলতা ভেতরে ভেতরে পিপাসার্ত। তার মতো কোলকাতায় থাকা ও ভালো কলেজে পড়াশোনা করা মেয়ের এই রকম বুদ্ধিহীনের মতো টেলিভিশন সিরিয়ালের সব কিছুকেই সত্য বলে ধারনা করার ভাবনায় অসঙ্গতি রয়েছে। লেখক সুলতাকে এতখানি নির্বুদ্ধিতার মূর্তি হিসেবে না গড়লেই পারতেন। মেয়েদের বয়ফ্রেন্ড সম্পর্কে বন্ধুমহলে সে একপ্রকার ধারনা পেয়েছে। কলেজে থাকাকালীন দু-একটা প্রেম-প্রস্তাবও পেয়েছে, কিন্তু তখন এসব বিষয়কে সে আমল দেয়নি। পরে আবার কেন আমল দিল না এই ভেবেও সে পস্তেছে। তার মতন পরনির্ভর, বুদ্ধিহীনা মেয়ের ধর্ষণ যে অনায়াসেই সম্ভব হতে পারে লেখক বোধ হয় এভাবেই ভেবে ছিলেন। তাই ধর্ষণের পর সুলতাও পরিবারের সিদ্ধান্তই মেনে নিয়েছে। কিন্তু চানু গুরুচরণকে বিয়ে করার চাপ দিলে সে আত্মহত্যার পথ বেছে নেওয়ার ইঙ্গিত দেয়। এভাবেই লেখক পরনির্ভর একটি মেয়ের আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত

নেওয়ার মাধ্যমে এক ধরণের প্রতিবাদ বা ভেজা বারুদে অগ্নিসংযোগ করার চেষ্টা করেছেন। উপন্যাসের শেষে জনৈক বয়স্ক ব্যক্তির মুখেও একই বার্তা রয়েছে –"বুঝলে কিচ্ছু করার নেই। সব ব্যাধি, ব্যাধি। এক ফোঁটা রক্ত থেকেই সারা শরীরের জার্ম বোঝা যায়, একটা ঘটনা থেকেই বোঝা যায় সারা দেশ। আমরা জ্যান্ত থেকেও মড়া। এই জ্যান্ত থাকার মানে নেই। এখন আমরা সব ভেজা বারুদ। লোকটা চানুর পিঠে হাত দেয়। সহানুভূতির নাকি বলছে ওঠো জাগো...। স্বামী বিবেকানন্দর ছবির তলায় যেমন লেখাটা থাকে"[১৫]। কিন্তু আগুন জ্বলবে কী এই ভেজা বারুদে? লেখক সমাজের সামনে এই রকম একটি প্রশ্ন রেখে যান। তাই ছোটগল্পের আমেজ নিয়ে শেষ হয় উপন্যাসটি। শেষাংশের নাটকীয় মূহুর্তটি তুলে ধরলাম- "রাজি করাতে হবে দিদিকে। না হলে আবার রেপ। হরিপদ একজন ছোটখাটো সাধাসিধে লোক। কথাটা শুনেই তেড়ে উঠল। ...তার আগে কেরোসিন ঢেলে পোড়া। ...আমি রাজি...আমিও পুড়ে যেতে রাজি আছি রে ভাই...। আর মা বিছানায় উপুড় হয়ে কাঁপতে লাগল। এবারে সেই তার সানাইটা বেজে ওঠে। পথের পাঁচালি সিনেমায় সর্বজয়ার কান্নার পিছনে যেমন বেজেছিল। সেই শব্দের ভিতরেই যেন মাদল বাজন –ওখানে যাব না"[১৬]।

তথ্যসূত্র

১. স্বপ্নময় চক্রবর্তী। ভেজা বারুদ। পত্রভারতী। কলকাতা। জানুয়ারি ২০১৬। পৃ-১৫।
২. আনন্দবাজার পত্রিকা।রবিবাসরীয়।'হেডমাস্টার শ্বশুর বললেন, পড়া গেল না'। ০২ আগস্ট ২০১৫।
৩. সুবল সামন্ত সম্পাদক।এবং মুশায়েরা। 'গল্প ও গল্পকার সংখ্যা'।৬ষ্ঠ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা। কলকাতা।১৪০৬।
৪. আনন্দবাজার পত্রিকা। রবিবাসরীয়। 'হেডমাস্টার শ্বশুর বললেন, পড়া গেল না'। ০২ আগস্ট ২০১৫।
৫. স্বপ্নময় চক্রবর্তী। ভেজা বারুদ। পত্রভারতী। কলকাতা। জানুয়ারি ২০১৬। পৃ-১২৩।
৬. তদেব। পৃ-১৩০,১৩১।
৭. তদেব। পৃ-১১৪।
৮. তদেব। পৃ-১৫৯।
৯. তদেব। পৃ-২৩,২৪।
১০. তদেব। পৃ-১২৯,১৩০।
১১. তদেব। পৃ-৪২,৪৩।
১২. তদেব। পৃ-৫০।
১৩. তদেব। পৃ-১৫৪।
১৪. তদেব। পৃ-১৩৯।
১৫. তদেব। পৃ-১৫৮,১৫৯।
১৬. তদেব। পৃ-১৬০

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের স্বাধীনতা ও জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন

শিল্পী পাঁজা
সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক ইতিহাস বিভাগ, খিদিরপুর কলেজ

ভারতের ইতিহাসে মহাবিদ্রোহ পরবর্তী ব্রিটিশ শাসনের প্রকৃত রূপ ধীরে ধীরে যখন প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। এর নিরিখে সারা ভারতব্যাপী বিক্ষিপ্তভাবে জাতীয়তাবাদী কর্মসূচী শুরু হচ্ছে, ধর্মীয় সংস্কার ও পুনরুজ্জীবন আন্দোলন একটু একটু করে সংগঠিত হচ্ছে ঠিক তখনই ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম ভারতের রাজনীতি তথা ইতিহাসে যেমন এক সেরা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঠিক তেমনই আর এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের আবির্ভাব।ভারতের জাতীয় কংগ্রেস আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে।[১] বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এবং সমাজ সচেতন মধ্যবিত্ত শ্রেণির এই মানুষটির জন্ম ঊনবিংশ শতকেরশেষাশেষি,১৮৭৬ খ্রি.।প্রতিবাদী এই মানুষটি জাতীয় কংগ্রেসের চরমপন্থী মতবাদে বিশ্বাস করতেন এবং ভারতের রাজনীতিতে তিনি জড়িয়ে পড়লেন। তৎকালীন বহু প্রথম সারির রাজনীতিকের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ জাতীয়কংগ্রেসকে শক্তিশালীও সংশোধিত করেছিল। সেই সঙ্গে ধরলেন তিনি কলম। তিনি একদিকে প্রথম শ্রেণির সাংবাদিক, অন্যদিক সুলেখক ও সাহিত্যিক।দাসী, সুহৃদ, উৎসাহ, মুকুল, ভারতী, বঙ্গদর্শন প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর রচিত বহু গদ্য ও পদ্য প্রকাশিত হয়েছে। এ সমস্ত রচনায় তৎকালীন সমাজ ও রাজনীতির চিত্র ফুটে ওঠে। দীর্ঘকাল দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মসিক বসুমতী-র সম্পাদক ছিলেন। ইংরেজী বসুমতী-ও সম্পাদনা করেন।কিছুদিন মাতৃভূমি ও ফরওয়ার্ড পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এছাড়া তাঁর রচিত অসংখ্য গ্রন্থ আছে। তিনি একজন উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক চিন্তাবিদ হিসাবে ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে আছেন।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় সন্ধ্যা, প্রতিবাসী ও যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলি সে সময় আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তিনি ক্যালকাটা রিভিউ, ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট, ইন্ডিয়ান রিভিউ, হিন্দুস্থান রিভিউ প্রভৃতি পত্রিকায় লেখক ছিলেন। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা কম ছিল না। সমাজসেবায় তাঁর অবদান স্মরণীয়। তাঁর সমগ্র জীবন এক বিপুল কার্য ধারায় সমৃদ্ধ। তাঁর জীবন ও দর্শন ইতিহাসে স্থায়ী আসন লাভ করেছে।১৮৫৭- র মহাবিদ্রোহের পরবর্তী পর্যায়ে ব্রিটিশ শাসনের মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতকে অর্থনৈতিকভাবে শোষণ করা, মহাবিদ্রোহের পরবর্তী দু দশক জাতীয়তাবাদী কর্মসূচির অগ্রগতি ছিল মন্থর। ১৮৭৬ সালে লিটন যখন ভাইসরয় হিসাবে ভারতে আসেন তখনই তাঁর শাসনের প্রতিক্রিয়া হিসাবে জাতীয়তাবাদী কর্মধারার মন্থরগতি অকস্মাৎ দ্রুত হয়ে ওঠে। ঊনবিংশ শতকের শেষের

দিকে ভারতে ব্রিটিশ নীতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল ভারতীয় সমাজে বিভাজন সৃষ্টির প্রবনতা। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এবং বিশ শতকের শুরুতে ভারতীয় অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষিত হয়েছিল। এই সময় ভারতের শহর-নগরগুলিতে সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। উপনিবেশিক শাসনকালে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার বিকাশের ইতিহাসে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসাবে স্বীকৃতি, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে প্রথম একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সংগঠন জন্ম লাভ করেছিল।বলাবাহুল্য, ' ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ভূমিকা ছিল প্রধান'।[২]

যতই ভারতের মধ্যে জাতিগত, ধর্মগত পার্থক্য থাকনা কেন, তা সত্ত্বেও এরা পরস্পরের সম্বন্ধে সহিষ্ণুতাশীলএবং কংগ্রেস এদের মধ্যে ভেদাভেদ দূর করে এদের মধ্যে ঐক্যদৃঢ়করে।কংগ্রেসের মূলমন্ত্র এই যে, আমরা প্রথমে ভারতবাসী, পরে হিন্দু, মুসলমান,পার্শি,খৃষ্টান, পঞ্জাবী,মারহাটী, বাঙ্গালী, মাদ্রাজী'।[৩]নরমপন্থীদের নীতি ও কর্মপন্থার তীক্ষ সমালোচনা করে বঙ্কিমচন্দ্রই চরমপন্থীদের অনুসৃতব্য পথ আলোকিত করে দিয়েছিলেন। 'একটি ভাষা, একটি সাহিত্য এবং একটি জাতির স্রষ্টা' রূপে বন্দিত এই মানুষটি কোনও অর্থেই উচ্চপদ ও ক্ষমতালিপ্সু রাজনৈতিক নেতা বা সমাজ সংস্কারক ছিলেন না। তাই স্বাভাবিক কারণে তিনিই হয়ে উঠেছিলেন ঊনবিংশ শতকের সেই সব তরুণের অগ্রদূত যাঁরা নরমপন্থীদের সকরুণ আবেদন-নিবেদন-বিবৃতিদানের কর্মসূচীর উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন।[৪]১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে সেপ্টেম্বর (অন্যমতে ২৩শে সেপ্টেম্বর) বর্তমান বাংলাদশের যশোহর জেলায় চৌগাছা গ্রামে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের জন্ম হয়। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলকাতার হেয়ার স্কুল থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে ত্রন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করেন। প্রেসিডন্সি কলেজ থেকে ইংরেজিতে অনার্সসহ বি.ত্র. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র থাকাকালীন তিনি কলেজের ছাত্র সংগঠনের সদস্য হন এবং নিয়মিতভাবে আলোচনাসভাগুলিতে অংশগ্রহণ করতেন।পরবর্তীকালে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য পদ লাভ করেন। তাঁর সঙ্গে কংগ্রেসের নরমপন্থী নেতার নানা সময় বিরোধ দেখা দেয়।

ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষের কারণে দরিদ্রতা বেড়ে চলে। 'দেশের দূরবস্থার অন্ত ছিল না। দারিদ্র এ দেশে লোকের স্বাভাবিক অবস্থা; তাহা দুর্ভিক্ষে পরিণতি লাভ করিয়াছিল। তাহার উপর বোম্বাইয়ে মহামারীর আবির্ভাব। প্লেগ দমনের জন্য সরকার যে উপায় অবলম্বন করেন, তাহা পরিবারিক ব্যবস্থার বিরোধী বলিয়া লোকের ভয় হয়।'[৫] কংগ্রেস দারিদ্র সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা করলেও কিভাবে সেই কাজ সফল হবে তা নিয়ে কোনো পরিকল্পনা করেনি। বিদেশী পন্য বর্জনের পরিকল্পনা বা স্বদেশী পন্যের ব্যবহারের প্রস্তাব তখন কংগ্রেসের মধ্যে পরিলক্ষিত

হয়নি। ভবিষ্যতে বিলেতের সকল প্রকার জিনিসই বয়কট করা হবে- এতে কংগ্রেসের সকল সদস্য একমত হননি। তবে অধিকাংশ সদস্য একমত হন। তাঁরা বলেন- 'আবশ্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের জন্য যদি জাপান, যুক্তরাজ্য বা জার্মানীরদ্বারস্থ হইতে হয়, তাহাও ভাল; তথাপি এক পয়সার বিলাতী জিনিষও ক্রয় করা হইবে না।'[৬]
হেমেন্দ্রপ্রসাদ স্বদেশীয় শিল্পের প্রস্তাব উত্থাপন করলে নরমপন্থী নেতারা তা গ্রহণ করেননি।কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মডারেটদের বিবৃতি হল: 'বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্বায়ত্ব শাসনশীল দেশগুলিতে যেরূপ শাসন-পদ্ধতি আছে সেইরূপ শাসন পদ্ধতি লাভ ও সাম্রাজ্যের ব্যাপারে সেইসব দেশের লোকের মত দায়িত্ব সম্ভোগের উদ্দেশ্যে এই জাতীয় মহাসমিতি গঠিত হইয়াছে। বর্তমান শাসন পদ্ধতি ধীর অথচ অপ্রতিহতভাবে সংস্কৃত করিয়া আইন সঙ্গত উপায়ে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইবে।জাতীয় ঐক্যবৃদ্ধি, জাতীয় ভাবের উদ্বোধন, দেশের লোকের মানসিক, নৈতিক, আর্থিক ও বাণিজ্যগত উন্নতি সাধন করাও এই মহাসমিতির উদ্দেশ্য।'[৭]ব্রিটিশ শোষণ চরম পর্যায় পৌঁছেছিল, তারা নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য রাজনৈতিক শক্তি প্রয়োগ করতে ও উদ্যত হয়। সরকার কর ব্যবস্থা, বিভিন্ন আইনের শাসন ব্যবসায়ীদের উপর চাপিয়ে দিয়ে তাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথ বন্ধ করার চেষ্টা করে।

ঊনবিংশ শতকের শেষের দশকগুলিতে এমন ভয়াবহ পরিস্থিতি সূচনা হলেও কংগ্রেসের নরমপন্থী নেতারা 'আবেদন নিবেদন' নীতি থেকে সরে আসেননি। হেমেন্দ্রপ্রসাদ নরমপন্থী নেতাদের এই ব্রিটিশ তোষণ নীতি মেনে নিতে পারেনি। পরবর্তীকালে 'বামপন্থীরাই চাইছিলেন জঙ্গী যুদ্ধ-বিরোধী ও সরকার-বিরোধী আন্দোলন।'[৮] বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সূচনা হলে সক্রিয়ভাবে আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন এবং এই সময় নরমপন্থী নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়- এর সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য দেখা যায়। তাঁর রচিত কংগ্রেস গ্রন্থে এসব জানা যায়।[৯]

'বাঙ্গালীই কংগ্রেসের প্রণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিল আর কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার বিংশবর্ষ পরে- বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ্য করিয়া বাঙ্গালী দেশে নতুন ভাব প্রচারিত করিয়াছিল।'[১০]তিলকের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে বাংলার যুবসম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহন করেন অরবিন্দ ঘোষ ও বিভিনচন্দ্র পাল এবং পাঞ্জাবের যুবসম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন লালা লাজপৎরায়। এইভাবে এক আপস-বিরোধী চরমপন্থী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে ভারতের বৈপ্লবিক স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতে থাকে।[১১] হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ প্রথম থেকেই জাতীয় দলের নেতা ছিলেন এবং নরমপন্থী নেতাদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ আরও চরমে ওঠে ১৯০৬ সাল থেকে। বালগঙ্গাধর তিলকের কম্বুকণ্ঠে ঘোষিত হইয়াছিল- 'স্বরাজে ভারতবাসীর অধিকার জন্মগত। মিসেস বেসান্ট তখন হোমরুল লীল প্রতিষ্ঠিত করিয়া আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন।'[১২]

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বালগঙ্গাধর তিলকের আদর্শ ও কর্মজীবনকে শ্রদ্ধা করতেন। ১৯০৬ সালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বালগঙ্গাধর তিলকের মধ্যে মতবিরোধ হয়। সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রীঘোষের মতবিরোধ শুরু হয়। শ্রীঘোষ বলেন, ১৮৯৬ সালের তুলনায় ১৯০৬ সালের সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাজের মধ্যে বিরাট ফারাক ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের সময় দলাদলি শুরু হলে বিদেশ থেকে দাদাভাই নৌরজিকে আমন্ত্রণ জানানো হয় কংগ্রেসের সভাপতির আসন গ্রহন করার জন্য। প্রকৃতপক্ষে তিলককে সভাপতির আসন থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য এ ব্যবস্থা করা হয়। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মন্তব্য করেন, 'কংগ্রেসের সভাপতির আসনে বসিলে তিলকের গৌরব বর্ধিত হইত না। সে আসনের তাহাতে গৌরব বাড়িত।'[১৩]১৯০৬ সালের ৬ ই জুলাই 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' -এর গৃহে কংগ্রেস কমিটির এক সভায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি আসন গ্রহণ করার পর সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী নির্দিষ্ট কমিটি গঠন ও অভ্যর্থনা সমিতি গঠন নিয়ে সুরেন্দ্রনাথেরসঙ্গে হেমেন্দ্রপ্রসাদের মতবিরোধ চরমে ওঠে। ঐ বছরের ১১ই জুলাই সভার দু-দলের মধ্যে শক্তি পরীক্ষা হয়। ভূপেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন নরমপন্থী নেতাদের মধ্যে প্রধান।

জাতীয়দলের নেতা চিত্তরঞ্জন দাশ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, বিপিনচন্দ্র পাল, ব্রহ্মবান্ধবউপাধ্যায়, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের সঙ্গে ভূপেন্দ্রনাথ বসু কাজ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। নরমপন্থী দলের নেতারা জাতীয় দলের কোনো নেতাকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিতে অস্বীকার করেন। জাতীয় দলের নেতারা তা জানতে পারায় তাঁরা হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষকে অভ্যর্থনা সমিতির সহকারী সম্পাদক করবেন বলে স্থির করেন। তা নিয়ে দু-দলের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়। অনেক তর্কবিতর্কের পর ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও জানকীনাথ ঘোষাল, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, আশুতোষ চৌধুরী, বৈকুণ্ঠনাথ সেন, অম্বিকাচরণ মজুমদার, অশ্বিনীকুমার দত্ত ও এ. রসুল অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক প্রস্তাবিত হন। অনেক তর্কবিতর্ক মতপার্থক্যের পর ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ হেমেন্দ্রপ্রসাদকে সহকারী সম্পাদক হিসাবে নিযুক্ত করতে সমর্থ হন। ব্যারিস্টার প্রমথনাথ চৌধুরী এই মতের বিরোধিতা করেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রপ্রসাদকে সহকারী সম্পাদক হতে সরে আসতে বলেন। শ্রী ঘোষ তাতে রাজি হননি। অনেক বিবাদ বিতর্কের পর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাধ্য হয়ে প্রস্তাব করেন হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, সত্যানন্দ বসু, প্রাণকৃষ্ণ আচার্য, জে.এন.রায়, আবুল কাসিম,পৃথ্বীশচন্দ্ররায় সহকারী সম্পাদক হবেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তব্য ছিল, জাতীয় দল কংগ্রেসকে ধ্বংস করতে চায়। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ এর বিপরীতে বলেন, কংগ্রেসকে ধ্বংস করার কোনো লক্ষ্য জাতীয় দলের ছিল না, বরং জাতীয় দলের নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসে জনমতের প্রাধান্য বিস্তার করতে চায়।

১৯১৯ সালে রাওলাট আইন নিয়ে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের মতপার্থক্য পুনরায় শুরু হয়।হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের সঙ্গে

সুরেন্দ্রনাথের নানা মতপার্থক্য হলেও 'কংগ্রেস ও বাঙ্গালা' গ্রন্থে শ্রী ঘোষ সুরেন্দ্রনাথের জন্য ব্যথিত হয়েছেন। তিনি বলেছেন 'কংগ্রেসের বয়স পঞ্চাশ বছর হইল। এই উপলক্ষে দেশবাসীর মনোযোগ দেশের রাজনীতিক আন্দোলনে যাঁহাদিগেরসহিত নানাভাবে কখনো সদ্ভাবে কখনো বিবাদে কার্য করিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল তাঁহারাও আজ লোকান্তরিত। আজ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, মনমোহন ঘোষ, জানকীনাথ ঘোষাল, কাশীচরণ ব্যানার্জী, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, বৈকুন্ঠনাথ সেন, আশুতোষ চৌধুরী, যোগেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখের স্মৃতি আমাকে ব্যথিত করিতেছে। আমি তাঁহাদিগের নিকটে অবারিত স্নেহ পাইয়া ধন্য হইয়াছি।'

নরমপন্থী নেতাদের সঙ্গে বিরোধিতায় পাশাপাশি ব্রিটিশ বিরোধী প্রচার কার্য পুরোমাত্রায় চালান, ভারতবাসীকে ব্রিটিশরা স্বায়ত্তশাসন দিতে অস্বীকার করায় তিনি মন্তব্য করেন, ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বহু শ্বেতাঙ্গজাতিই সংগ্রাম করে স্বায়ত্তশাসন অর্জন করে- যেমন, মার্কিন সাম্রাজ্য। তিনি আরো বলেন, 'আইরিশ, আমেরিকান, কানডিয়ান, অস্ট্রেলিয়ান- সকলেই শ্বেতাঙ্গইংরাজের জ্ঞাতি।যখন তাহাদিগকে স্বায়ত্ত্ব শাসনাধিকার প্রদানেই ইংরাজের এত আপত্তি ছিল, তখন ভারতবাসীকে সে অধিকার প্রদানে ইংরাজের আপত্তিতে বিস্মিত হইবার কোনো কারণ নেই।'[১৪]

মর্লে-মিন্টো শাসন সংস্কার প্রবর্তিত হওয়া সত্ত্বেও লর্ড মার্ল মনে করেন, ভারতে স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সংগ্রাম হবে বলে তিনি মনে করেন। শ্রী হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ও চরমপন্থী নেতারা এই মতের বিরোধিতা করেন এবং তাঁর স্বায়ত্তশাসনের অধিকারের জন্য সোচ্চার হন।সাংবাদিক হিসাবে হেমেন্দ্রপ্রসাদ স্মরণীয়, তিনি দীর্ঘকাল দৈনিক ও মাসিক বসুমতী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। কিন্তু উভয় পত্রিকার ভার একযোগে বহন করা সম্ভব নয় বলে অগ্রহায়ণ ১৩৩০- এর পরে তিনি দায়িত্ব ত্যাগ করেন। বসুমতী পত্রিকার সাংবাদিক হিসাবেতাঁরখ্যাতিসারাবিশ্বেছড়িয়েপড়ে।সুরেশচন্দ্রসমাজপতিতাঁরসাংবাদিকজীবনের গুরু। তিনি সাপ্তাহিক বসুমতীরও সম্পাদক ছিলেন। ইংরেজি বসুমতীও সম্পাদনা করেন। দৈনিক হিন্দুস্থান নামে একটি বাংলা কাগজ বের করেন। কিছুদিন তিনি মাতৃভূমি ও ফরওয়ার্ড পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বসুমতী-র স্বত্ত্বাধিকারী সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মৃত্যুর পূর্বে বসুমতী পরিচালনার জন্য যে চারজন একজিকিউটর মনোনীত করেন তিনি তাঁদের অন্যতম ছিলেন। "কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইবার পর বাঙ্গালায় কংগ্রেসের প্রচার কার্য পরিচালনের উদ্দেশ্যে একখানি বাঙ্গালা সংবাদপত্রের প্রয়োজন অনুভূত হায় এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধির অভিপ্রায়ে ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে চৌথ কারবার হিসাবে 'হিতবাদী প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং কোম্পানী' প্রতিষ্ঠা করিয়া 'হিতবাদী' প্রকাশের ব্যবস্থা হয়।"[১৫]কংগ্রেসের মধ্যপন্থী ও জাতীয়পন্থী দুই দলের মতভেদ যখন প্রবল হয়ে ওঠে

তখন হিতবাদী পত্রিকা মধ্যপন্থী দলের হয় ও বসুমতী পত্রিকা জাতীয় দলের প্রধান পত্রিকা হয়ে ওঠে।

বসুমতী প্রথমে মনমোহন মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় পরিচালিত হয় এবং বঙ্গভঙ্গের সময় প্রসিদ্ধ সাহিত্য সমালোচক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি বসুমতী-র সম্পাদক হন। বাংলায় দেশাত্মবোধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বসুমতী-র ভূমিকা অপরিসীম। "যখন স্বদেশী পন্য প্রচারের জন্য 'ভাণ্ডার' মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়, তখন রবীন্দ্রনাথ তাহার সম্পাদনা ভারও গ্রহন করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, স্বদেশী পণ্যের প্রচার জন্য তিনি উদ্যোগী হইয়া একটি ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং কেদারনাথ দাস যখন ঐরূপ একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন তিনি সেই কার্য্যে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন।"[১৬]বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের সংগ্রামী চেতনাকে জাগিয়ে রাখার জন্য ১৯০৬ সালের ৬ই আগস্ট বিপিনচন্দ্র পালের সম্পাদনাতে বন্দেমাতরম প্রকাশিত হয় । এই পত্রিকার সম্পাদক সংঘে ছিলেন হেমেন্দ্রপ্রসাদ । অরবিন্দ ঘোষ ও বিপিনচন্দ্র পালের একান্ত অনুরোধে হেমেন্দ্রপ্রসাদ এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন ।যতদিন না পর্যন্ত পত্রিকাটি সরকারী রোষে পড়ে বন্ধ হয় ততদিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন এই পত্রিকার অন্যতম পরিচালক। বন্দেমাতরম পত্রিকাটি ছিল জাতীয় দলের মুখপত্র। বন্দেমাতরম কাগজখানির 'মটো' বা শিরোভূষণ ছিল: 'India for Indians'।পুরাতনপন্থীরা এর ভিতরে নিজেদের আদর্শ বিচ্যুতির আভাস পেলেন। বাঙালী নেতাদের মধ্যে আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী প্রাচীনপন্থীরা আবেদন নিবেদন প্রতিবাদে বিশ্বাসী ছিলেন । 'ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা কোনো জাতি স্বাধীনতা লাভ করতে পারেনি, তাঁরাও পারবেন না।'[১৭]বন্দেমাতরম-এর সম্পাদকমণ্ডলীতে ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি। অরবিন্দ ঘোষ কিছুকাল পরে সম্পাদকমণ্ডলীতে যোগ দেন ।[১৮] শিবাজী উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল সাধারণের ভিতর জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করার জন্য।'উৎসবের অঙ্গস্বরূপ একটি স্বদেশী মেলার আয়োজন হয় ও এর ভার পড়ে শ্রী হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের উপর। উৎসবের প্রধান হোতা হলেন বরিশালের অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়।'[১৯]

বাংলার স্বদেশী আন্দোলন ও নূতন ভাবধারার একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন বালগঙ্গাধর তিলক। তাই শিবাজী উৎসবে নিমন্ত্রিত হয়েই তিনি গণেশশ্রীকৃষ্ণ খাপার্দ্দে ও ডাক্তার বি.এস. মুঞ্জেকে সঙ্গে নিয়ে পরবর্তী ৪ ঠা জুন সোমবার কলকাতায় আগমন করলেন । কলকাতাবাসীরা তিলককে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিতকরে ঐদিন অপরাহ্নে মতিলাল ঘোষ কর্ত্তৃকঅনিরুদ্ধ হয়ে তিলক মেলার উদ্বোধন করেন। উৎসবে ভবানী পূজার-ও ব্যবস্থা হয় । শিবাজী উৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিবাজী শীর্ষক প্রসিদ্ধ কবিতাটি রচনা করেন। তিলক মহাশয় মেলাকে পলিটিক্যাল (political Festival) বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত উৎসব বলে আখ্যা দেন।[২০]হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লন্ডনের'ইনস্টিটিউট অফ জার্নালিস্ট'-এর সদস্য এবং ১৯১৭ সালে মেসোপটেমিয়ায়

প্রেরিত সাংবাদিক প্রতিনিধিদলের অন্যতম সদস্য ছিলেন। ১৯১৮ সালে ভারতীয় সংবাদপত্রসেবীদের প্রতিনিধিরূপে মহাযুদ্ধের সঠিক বিবরণ জানবার জন্য ইংল্যান্ড এবং মধ্যপ্রাচ্য যান। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হলে তিনি অধ্যাপক হন। সাহিত্যিক হিসাবে হেমেন্দ্রপ্রসাদের অবদান অনস্বীকার্য। ১৩০০ বঙ্গাব্দ থেকেই সাহিত্য পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। বহু বাংলা এবং ইংরেজী পত্রিকাতে এবং বহু গ্রন্থে অসংখ্য গল্পে, উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। এগুলির সাহিত্যগুণ অসামান্য । সাহিত্যিক হিসেবে হেমেন্দ্রপ্রসাদের উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি তাঁকে অনেক উঁচু স্থানে রেখেছে । তাঁর ঐ সব রচনায় তৎকালীন ভারতীয় ইতিহাসের এক সামগ্রিক চিত্র দেখতে পাই । 'সাহিত্য গল্পকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ যারলেখাতে স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব মাঝে মাঝে প্রতিফলিত হয়েছিল ।'[২১]

ভারতের জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের অবদান স্মরণীয় । ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ হলে বাংলায় অরন্ধন ও রাখী বন্ধন উৎসব হয় ।১৬ই অক্টোবর ছাত্ররা উপবাস করে নগ্নপদে বিদ্যালয়ে যায় ।ঢাকা কলেজের স্কুলে ও রংপুরের অধ্যক্ষরা সেই সকল ছাত্রদের দন্ডবিধান করেন। ১৯০৫ সালের ২০ অক্টোবর সরকার ক্রোধবশত এক ইস্তেহার জারি করে ছাত্রদের রাজনৈতিক অনুষ্ঠান, সভাসমিতিতে যোগদানের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করে ।অক্টোবরে ইস্তেহার প্রচার করা হয়, যা কার্লাইল সার্কুলার নামে পরিচিত । বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর লেখেন, 'স্কুলের ছেলে ও ছাত্রদিগকে যেরূপ রাজনৈতিক ব্যাপারে প্রযুক্ত করা হয়েছে তা শৃঙ্খলার বিরোধ ও ছাত্রদিগের স্বার্থের পরিন্থী । প্রয়োজন হলে বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্তাদিগের স্পেশাল কনস্টেবল করা হইবে।' হেমেন্দ্রপ্রসাদ এই ইস্তেহারের বিরুদ্ধে দীর্ঘপত্র লেখেন । তিনি বলেন, 'আমরা যদি আমাদের অর্থনৈতিক মুক্তির উপায় করিতে কৃতসঙ্কল্প হইতে পারি তবে শিক্ষা সম্বন্ধীয় মুক্তির উপায় করিব না কেন ? আমরা কি আমাদের জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত করিতে পারিব না? প্রস্তাবিত মিলনমন্দির অপেক্ষা জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রয়োজন যে অধিক সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না।' 'ছাত্রের মাতৃভাষাই যে তাহার পক্ষে শিক্ষার বাহন হওয়া সঙ্গত ও স্বাভাবিক, সে বিষয়ে বিশ্বের কোন বৃদ্ধিমান ব্যক্তির বিন্দুমাত্র সন্দেহ না থাকিলেও আমাদের বিদেশি শাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তাদের তাহাতে বিশেষ সন্দেহই ছিল এবং তাঁহারা বাঙ্গালীর ছেলেকে বাল্যাবধি বিদেশি ভাষা শিক্ষার নিযুক্ত রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন'। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে লিখিয়াছিলন- 'যে বাঙ্গালির ছেলে বিদেশী ভাষা শিখিতেই কাল কাটায়, তাহার অবস্থা শোচনীয় হইবেই ।'[২২]

বাংলারস্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় শিক্ষা বিস্তারের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। জাতীয় শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল, যুবকদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে

তোলা। ১৯০২ সালে জাতীয়শিক্ষা বিস্তারের জন্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'ডন সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০৬ সালে ১১ই মার্চ ৯২ জন সদস্যকে নিয়ে 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ' গঠিত হয়। এর পরিচালনায় 'বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ অ্যান্ড স্কুল' স্থাপিত হয়। প্রতিষ্ঠা হয়। 'বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ' এবং 'বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউশন'। বাংলায় বিভিন্ন স্থানে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয় । হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন।

বঙ্গভঙ্গের পর একটি নতুন জাতীয় ভাণ্ডার প্রতিষ্টিত হয় এবং তাতে প্রচুর অর্থ সংগৃহীত হয়েছিল। তা দিয়ে পাইকপাড়ায় একটি বয়ন বিদ্যালয় স্থাপিত হয় উন্নতমানের তাঁতে উৎপন্ন করার উদ্দেশ্যে। অবশিষ্ট অর্থ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ সভাপতি হিসাবে নিবেদিতা বিদ্যালয়ে দান করেন। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে হেমেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। শ্রী হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ তাঁর শ্রী অরবিন্দ -দ্য প্রফেট অব পেট্রিনিজম (Sri Aurabindo-The Prophet of Patriotism) গ্রন্থে লিখেছেন, 'Aurobindo Came to Calcutta to organise the National Council of Education and National Education in Bengal. Round him rallied men of talent and Patriotism among whom spacial mention should be made of Satish Chandra Mookherjee of the 'Dawn Society.'[২৩]

বাংলাদেশে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ ও জাতীয় শিক্ষা সংগঠনের জন্য অরবিন্দ কলিকাতায় এলেন। তাঁকে ঘিরে অনেক স্বদেশপ্রাণ ও প্রতিভাবান ব্যক্তি জড়ো হলেন। তাঁদের মধ্যে 'ডন সোসাইটির' সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[২৪] হেমেন্দ্রপ্রসাদের সারাজীবন সমাজ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সাংবাদিক, রাজনীতিক, লেখক হিসাবে তাঁর অবদানের সঙ্গে সঙ্গে সমাজভাবনায় তাঁর অবদানও কম নয়। হেমেন্দ্রপ্রসাদ তাঁর কংগ্রেস গ্রন্থে বলেছেন- "ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভারতে স্থাপিত হলে পল্লী সমাজের ক্ষতি হয়.ভারতের গ্রামগুলি এমনভাবে গড়ে উঠেছিল যাতে প্রতি গ্রাম স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে। এদেশে পঞ্চায়েত প্রথা-ও ছিল পুরনো। কিন্তু ব্রিটিশ শাসন স্থাপিত হলে এই সমস্ত ব্যবস্থা ধ্বংস হয়। ভারতে ব্রিটিশ শাসন স্থাপিত হলে সবথেকে বেশি ক্ষতি হয় 'ভাবের দিকে।"[২৫]

এদেশে ব্রিটিশ শাসন স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষার-ও প্রসার ঘটে এবং ইংরেজি শিক্ষিত ভারতবাসী ব্রিটিশদের অনুকরণ করতে শুরু করে, দেশের ঐতিহ্যের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা বিলুপ্ত হয়। শ্রী ঘোষের মতে এই ক্ষতি ছিল দেশের সর্বপ্রধান ক্ষতি। তিনি মন্তব্য করেছিলেন, ভারতবর্ষ আপনার স্বাতন্ত্র্যসভ্যতার সৃষ্টি করেছিল, আপনারশ্বাতন্ত্রসাহিত্য ও শিল্প গঠিত করেছিল.বিপ্লবের বার্তা ও বিজয়ের বন্যা সে স্বাতন্ত্র্যনষ্ট করতে পারেনি। কিন্তু বিপ্লবে ও বিজয়ে যা হয়নি ইংরেজি সভ্যতার প্রভাবে তাই হয়েছিল। ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষের কারণে

দারিদ্র্য বেড়ে গেলে তিনি কংগ্রেসে থেকে তৎকালীন নেতাদের এ বিষয়ে পরিকল্পনা ও প্রতিরোধের কথা চিন্তা করতে বাধ্য করিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, বিদেশি পণ্য বর্জনের পরিকল্পনা ও স্বদেশি পণ্যের ব্যবহারে প্রস্তাব করতে তিনি কংগ্রেসী নেতাদের চিন্তাভাবনা করতে বলেন।তাঁর অন্যতম চিন্তা ছিল বিদেশের উপর নির্ভরশীলতা ত্যাগ করে স্বাবলম্বী হওয়া। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন 'বয়কট' আন্দোলনে পরিণত হলে শ্রী ঘোষের কাজে কর্মে, বক্তৃতায়, লেখনীতে সমাজের মানুষকে ঐ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রেরণা যোগায়। 'বয়কট' আন্দোলন পরবর্তীকালে সামাজিক আন্দোলনে পরিণত হয়- যা দেশের যুব সমাজকে স্বদেশি আন্দোলন তথা স্বাধীনতা আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করে। বিলাতী দ্রব্য বয়কট ও স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার সম্বন্ধে তখন নেতাদের মধ্যে বেশ একটা মতভেদ দেখা দিয়েছিল। এই মতভেদ পরবর্তীকালেও বিদ্যমান ছিল।'[২৬]

কেবল বিলাতি দ্রব্য বয়কট নিয়ে মতভেদ ছিল তাই নয়, জাতীয় নীতি নিয়েও মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল । 'গোখলে ও তিলকের, সুরেন্দ্রনাথ ও চিত্তরঞ্জনের দ্বন্দ্ব প্রতিফলিত হয়েছে জাতীয় কংগ্রেসের রঙ্গমঞ্চে, আবার জাতীয়নীতি নিয়ে বিরোধ দেখা দিয়েছে দেশবন্ধু, মতিলাল ও গান্ধীর মধ্যে, গান্ধী ও নেহরুর মধ্যে, গান্ধী ও সুভাষের মধ্যে।'[২৭]১৯০৬ সালে বাংলা তথা ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অন্নকষ্ট প্রবলভাবে দেখা দেয়। ঐ সালের জুন মাসে বাংলায় অন্নকষ্ট তীব্র আকার ধারণ করে। স্বদেশমণ্ডলীর সদস্যরা ক্ষুধার্ত, দুর্ভিক্ষ-কবলিত মানুষকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। ২৪ শে জুন মাহেশের রথের মেলায় ক্ষুধার্ত মানুষদের জন্য হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, বিপিনচন্দ্র পাল, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি চাঁদা তোলেন। সেই সঙ্গে তাঁরা স্বদেশির আদর্শও প্রচার করেন। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ সারাজীবন মানুষের মঙ্গলের জন্য নিবেদিত ছিলেন। দুর্ভিক্ষের সময় তিনি রাস্তায় দাঁড়িয়ে চাঁদা তুলেছেন, গ্রামের গরীব মানুষের জন্য তাঁর চিন্তা-ভাবনা ছিল যুগোপযোগী । ব্রিটিশ শাসনের অবসান চাইতেন- কেননা ব্রিটিশরা শহরের মানুষের থেকে গ্রামের মানুষের বেশি ক্ষতি করেছিল। ব্রিটিশ নীতির ফলে গ্রামের মানুষের রুটিরুজিতে টান পড়েছিল। তারা অবর্ণনীয় দুঃখে কষ্টে দিনাতিপাত করেছিল। শ্রী ঘোষ কংগ্রেসে এ বিষয়ে প্রস্তাব ও পরিকল্পনার উপর বারবার জোর দিতেন।

তাঁর অজস্র লেখায় তাঁর সমাজ ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায় ।হেমেন্দ্রপ্রসাদের সমগ্র জীবন বর্ণময় । একদিকে তিনি ছিলেন সুলেখক, সাহিত্যিক আবার অন্যদিকে প্রথম শ্রেণীর সাংবাদিক। তা সত্ত্বেও জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর নাড়ীর টান ছিল। সেযুগে বহু সাংবাদিকের মতো হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ জাতীয় আন্দোলনে প্রেরণা দান করেছিলেন তাঁর বিভিন্ন লেখা, রচনার মধ্যে দিয়ে। "বেসরকারী শিক্ষা প্রসারের ফলে অনেকেই শিক্ষকবৃত্তি অবলম্বন করে। তেমনি সংবাদপত্রের প্রসার সাংবাদিকতাকে আকর্ষণীয় করল। সেযুগের বহু সাংবাদিক জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন বা প্রেরণা

দেন। নীলকর অত্যাচারের বিরুদ্ধে 'হিন্দু পেট্রিয়ট', দাক্ষিণাত্যের রাজস্ব বৃদ্ধির প্রতিবাদে 'মারাঠা' ও 'কেশরী' সিভিল সার্ভিস, স্বায়ত্তশাসন ও প্রজাস্বত্ব আইনের ব্যাপারে 'সোমপ্রকাশ' ও 'বেঙ্গলী', স্বদেশী আন্দোলনের সময় 'বন্দেমাতরম', 'সন্ধ্যা' ও 'যুগান্তর' এক গৌরবময় আদর্শ স্থাপন করে।"[২৮] হেমেন্দ্রপ্রসাদের নিজস্ব একটা দর্শন ছিল- যা ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপসহীন লড়াই। সোজা কথায় মানুষ হেমেন্দ্রপ্রসাদের দর্শন অনুকরণযোগ্য। জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে হেমেন্দ্রপ্রসাদের আত্মিক যোগ ছিল। তৎকালীন জাতীয় কংগ্রেসের নেতাদের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ উল্লেখযোগ্য ঘটনা- যা জাতীয় কংগ্রেসকে পরিশুদ্ধ করে। 'চরমপন্থীদের চোখে স্বদেশী, বয়কট, জাতীয় শিক্ষা গৌন, মুখ্য- স্বরাজ ।'[২৯]

কেবল এ নিয়ে কংগ্রেসে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মতবিরোধ হয়েছিল তাই নয়, স্বরাজ ছাড়াও বয়কট, স্বদেশি নিয়েও তাদের মধ্যে বহু মতপার্থক্য হয়েছিল। "চরমপন্থীরা চাইল সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সর্বাঙ্গীন বয়কট, নরমপন্থীরা কয়েকটি সীমিত ব্রিটিশ পণ্যের ব্যাপারে তার প্রয়োগ । স্বদেশির ব্যাপারে নরমপন্থীদের বয়ান ছিল, 'এমনকি স্বার্থত্যাগের দরকার হলেও', আর চরমপন্থী বয়ান ছিল, 'যে কোন ত্যাগে স্বদেশী'।"[৩০] এমনও দেখা গেছে তাঁর মত প্রথমে কেউ পাত্তা না দিলেও অথবা জাতীয় কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যে খেয়োখেয়ি দ্বন্দ্ব দেখাগেলেও পরবর্তীকালে তাঁর বক্তব্য যে সঠিক ছিল তা সকলে উপলব্ধি করেছেন । তিনি ছিলেন জাতীয় কংগ্রেসের চরমপন্থী মতবাদে বিশ্বাসী। জাতীয় কংগ্রেস যখন পরিকল্পনা, প্রস্তাব, চিন্তাভাবনাহীন ছিল তখন তাঁর উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা ও পরিকল্পনা জাতীয় কংগ্রেসকে অনেক শক্তিশালী করেছিল। তাঁর লেখা কংগ্রেস, কংগ্রেস ও বাঙ্গালা, জাতীয় মহাযজ্ঞ -এরইতিহাসে কংগ্রেস প্রভৃতি পুস্তকগুলিতে তাঁর উপরোক্ত মানসিকতাকে সমর্থন করে।অনেক প্রতিকূলতার মধ্যেও নিজস্ব চিন্তাভাবনা, বক্তব্য থেকে তিনি কখনো সরে আসেননি। অন্যায়ের সঙ্গে আপসহীন-ও করেননি । সেই সঙ্গে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে ও সামাজিক আন্দোলনে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগ ছিল। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে আসা এই মানুষটির রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধরণ। প্রত্যক্ষভাবে যোগদান না করলেও পরোক্ষভাবে তিনি বিপ্লবীবাদী সশস্ত্র আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন।

বাঙলার জাতীয় আন্দোলনের বহু নেতাকে তিনি সুপরামর্শ দান করতেন। তাঁর বাগ্মীতা, লেখনী তাঁকে ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসাবে চিহ্নিত করে রেখেছে। এর পাশাপাশি সারাজীবন তিনি সাহিত্যসেবা করে গেছেন। তিনি লিখেছেন- "স্যার আশুতোষ চৌধুরী ও ভূপেন্দ্রনাথ বসু বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করিয়া গিয়াছেন এবং বাঙ্গালা-সাহিত্যের প্রতি তাঁহাদের উভয়ের অনুরাগের অনেক প্রমাণ আমি পাইয়াছি । ভূপেন্দ্রনাথ প্রবাসে বাসকালে বহুবার আমাকে তাঁহার জন্য বাঙ্গালা পুস্তক পাঠাইতে হইয়াছে । আমি সেই দূরদেশে তাঁহাকে 'রামায়ণ', 'মহাভারত ' মনোযোগ সহকারে পাঠ করিতে দেখিয়াছি । তিনি যে আমার সম্পাদিত সংবাদপত্র সেই বিদেশে-ও পাঠ

করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করতেন, আমার প্রতি তাঁহার স্নেহ সে আগ্রহের অন্যতম প্রধান কারণ হইলেও তাহাতে আমি বিশেষ গর্ব্বানুভবকরিতে পারি।"[৩২]হেমেন্দ্রপ্রসাদ ছিলেন সত্যিকারের মানবদরদী । ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে, জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে তিনি ছিলেন প্রথম যুগের পথপ্রদর্শক। আধুনিক সমাজ ভাবনায় তাঁর অবদান অনস্বীকার্য এবং আধুনিক সমাজ গড়ার কারিগর এবং সমাজসংস্কারক । তিনি ছিলেন স্বতন্ত্র ধারার লেখক। সবশ্রেণির মানুষের জন্য তাঁর কলম ছিল সদা জাগ্রত। সব ধরণের লেখা ছিল তাঁর করায়ত্ত। তাঁর জ্বালাময়ী লেখায় তৎকালীন যুবসমাজ ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অনুপ্রেরণা পেয়েছিল। সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর মূল্যায়ন করা আবশ্যক। তাঁর চিন্তাভাবনা কংগ্রেস গ্রহণ করে পুষ্ট হয়েছিল। শ্রী হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ এক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। হেমেন্দ্রপ্রসাদের সারাজীবন কার্যাবলী পাঠ করে এটা উপলব্ধি করা যায়- ইতিহাসে তাঁর মূল্যায়ন জরুরি। ইতিহাসের অনেক হারানো জিনিস জানা যায় তাঁকে চর্চা করে। আমার লক্ষ্য স্বরণীয় ব্যক্তিত্ব হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ-এর বহুমুখী কার্যধারা আলোয় নিয়ে এসে পুনরাবিস্কার করে সর্বসমক্ষে উপস্থাপন করা।

সূত্রনির্দেশ

১. সুপ্রকাশ রায়, ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৬৬, জানুয়ারি ২০১২ , ডিক্যাল, কলকাতা, পৃ. ৩৭৬

২. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, পলাশি থেকে পার্টিশন-আধুনিক ভারতের ইতিহাস, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, প্রথম প্রকাশ, ওরিয়েন্ট লংম্যান প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৬, পুনর্মুদ্রণ ২০১২, পৃ. ২৬৩

৩. হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, কংগ্রেস ও বাঙ্গালা, ১৩৪২, ন্যাশনাল লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ১৫০

৪. অমলেশ ত্রিপাঠী, ভারতের মুক্তি সংগ্রামে চরমপন্থী পর্ব, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর ১৯৮৭, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ২৭

৫. হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ , কংগ্রেস ও বাঙ্গালা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩, ১৫৪

৬. মাসিক বসুমতী পত্রিকা, ১ম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩২৯, শ্রী হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ (স.) , পৃ. ২৬৮

৭. হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, কংগ্রেস ও বাঙ্গালা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১

৮. সুমিত সরকার, আধুনিক ভারত (১৮৮৫-১৯৪৭), কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, অক্টোবর, ১৯৮২, পৃ. ৩২৮

৯. হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, কংগ্রেস, ১৩২৭

১০. হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, কংগ্রেস ও বাঙ্গালা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

১১. সুপ্রকাশ রায়, ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস, ১৯৮০, কলিকাতা, পৃ. ৩৬
১২. হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, কংগ্রেস ও বাঙ্গালা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪
১৩. হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, কংগ্রেস, প্রাগুক্ত, ১৩২৭, পৃ. ৬২
১৪. হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, কংগ্রেস ও বাঙ্গালা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২
১৫. হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ, ১৩৪৮ সাল, কলিকাতা, পৃ. ২৮
১৬. তদেব, পৃ. ৩২
১৭. যোগেশচন্দ্র বাগল, মুক্তির সন্ধানে ভারত, তৃতীয় সংস্করণ ১৩৬৭, কলিকাতা, পৃ. ২৩১
১৮. তদেব, পৃ. ২৩৩
১৯. তদেব, পৃ. ২৩১
২০. তদেব, পৃ. ২৩১
২১. সৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলাসাহিত্য, আষাঢ় ১৩৬৭ ব., কলিকাতা, পৃ. ২২১
২২. বসুমতী পত্রিকা, আষাঢ়, ১৩২৯, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ (স.), পৃ. ৪০২
২৩. Sri Hemendraprasad Ghosh, Sri Aurobindo- The proper of patriotism, Calcutta, 1949, pp. 9-10
২৪. হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায়, জাতীয় আন্দোলনে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রথম সংস্করণ ১৯৬০ , কলিকাতা, পৃ. ৬৮
২৫. হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, কংগ্রেস, ১৩২৭
২৬. সৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য, পৃ. ১০১
২৭. অমলেশ ত্রিপাঠী, স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫-১৯৪৭), বৈশাখ ১৩৯৭ ব. পৃ. ১৫
২৮. তদেব, পৃ. ৩০
২৯. তদেব, পৃ. ৬০
৩০. তদেব, পৃ. ৬১
৩১. SumitSarkar, Modern India (1885-1947), 1983
৩২. মাসিক বসুমতী, ৪র্থ বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২ ব., পৃ. ২৫৬

'মালঞ্চ' কি ট্র্যাজিক উপন্যাস!

আশীষ কুমার সাউ
সহকারী অধ্যাপক, আর্য মহিলা পি.জি. কলেজ
বারানসী
(সম্বন্ধযুক্ত বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়)

সংক্ষিপ্তসার: নীরজা ছিল আদিত্যর 'রঙমহালের সাকী', 'নন্দনবনের ইন্দ্রানী'। অসুস্থতাবশত নীরজা যখন স্বামীর কর্মক্ষেত্র থেকে চিরতরে নির্বাসিত হল রোগশয্যায়, তখনও আদিত্যর পত্নীপ্রেমে ভাঁটা পড়েনি, ঘটেনি মনোযোগের অভাব। শত ব্যস্ততার মধ্যেও অসুস্থ স্ত্রীকে নৈমিত্তিক পুস্পার্ঘ নিবেদনে করেছে আদিত্য এবং তা ছিল আগের মতোই আন্তরিক। কর্মব্যস্ততার কারনে যেদিন এই নিয়মের বিঘ্ন-ঘটল সেদিন থেকে এদের দাম্পত্য জীবনে নেমে এল ট্র্যাজেডি। ডলির মৃত্যু থেকে শুরু করে একের পর এক ট্র্যাজেডি তুলে ধরেছেন লেখক। তাই নীরজার মৃত্যুর দৃশ্যে বীভৎসতার রং লেগেছে সত্য, কিন্তু সেজন্য লেখক কেন হবেন অভিযুক্ত? যে প্রবল মনোবিকারে নীরজা দিনের পর দিন উদভ্রান্ত হয়েছে তা যদি রমেনের মন্ত্রণায় প্রশমিত হত, তবে বরং খটকা লাগত। বীভৎস হলেও নীরজার মৃত্যু 'ট্রাজিক'। সরলার প্রতি তার বিষোদগার এমন এক মানুষের মনোবিকার যার বাঁচবার সাধ ছিল প্রবল – কিন্তু সামর্থ্য ছিল না। আমরা অনুভব করি, মৃত্যু যাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল, মরবার তার সময় হয়নি; সে বাঁচতে চেয়ে নিদারুণ মৃত্যুর কাছে নিরুপায় বলে হেরে গেল।

সূচকশব্দ: নন্দনবনের ইন্দ্রানী, রঙমহলের সাকী, চেতনাপ্রবাহ, ট্র্যাজেডি, লোকান্তরিতা, প্যানথেইসমের জালবোনা, পুঞ্জীভূত কালিমা, ত্যাগমন্ত্র।

মূল আলোচনা :

নিজের কবিতা ও গল্প উপন্যাসের জগতকে আলাদা করতে গিয়ে যে বিষয়টার উপর ঝোঁক দিলেন রবীন্দ্রনাথ তা হল অভিজ্ঞতা। বা অন্যভাবে বলা যায় যা দেখেছেন তিনি তাই নিয়েই তাঁর গল্প ও উপন্যাস সৃষ্টি করেছেন। Joyce তাঁর The Portrait of the Artist as a Yong Man উপন্যাসে তাঁর মতো করে সীমা টেনেছেন Lyric এবং Dramatic form –এর মধ্যে। অভিজ্ঞতার উপর গুরুত্ব প্রদানকারী রবীন্দ্রনাথ কি তাহলে শুধু যা দেখলেন তাই লিখে গেলেন? সাজিয়ে গেলেন ঘটনা প্রবাহ? এল না Life purified in and reprojected from the human imagination? এর উত্তর খুজঁতে আমাদের যেতে হবে উপন্যাস সম্পর্কে। উপন্যাস রচনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আলোচনায়, আলোকপাতে।

আমরা জানি বাংলা সাহিত্যের একজন বিদগ্ধ সমালোচক (ড. সুকুমার সেন) রবীন্দ্রকাব্যের সৃষ্টিকালকে প্রধান তিনটি যুগে ভাগ করেছিলেন- আত্মমুখীন

(Introspective), প্রাঙ্মুখীন (Prospective) এবং পরাঙ্মুখীন (Retrospective)। আমাদের মনে হয় রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস এবং গল্পগুলিকেও এই রকম তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়, আর সেই বিভাগ অনুসারে 'দুইবোন' ও 'মালঞ্চ' কে পরাঙ্মুখীন শ্রেণির বলে ধরা যেতে পারে। পরাঙ্মুখীন যুগের আরম্ভ 'যোগাযোগ' থেকেই বলা যেতে পারে। এখানে সমস্যা প্রধানত ব্যাক্তিবিশেষের হৃদয় নিয়েই দেখা দিয়েছে এবং ঘটনাও পরিবারকেন্দ্রিক। মানুষের মন, তার আনন্দ-বেদনা, উৎসাহ-সংশয়, প্রত্যয়-হতাশাকে অনেক বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন।

আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের অন্যতম প্রধান লক্ষ্মণ 'Stream of Consciousness' রীতির ব্যবহার। 'Stream of Consciousness' তথা 'চেতনাপ্রবাহ' কথাটি প্রথম ব্যবহৃত হয়, উইলিয়াম জেমস লিখিত 'Principles of Psychology' (1890) গ্রন্থে। শিশির চট্টোপাধ্যায় 'Stream of Consciousness' উপন্যাসের লক্ষ্যনীয় বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোকপাত করতে গিয়ে বলেছেন – চেতনা প্রবাহ পদ্ধতির লক্ষ্যনীয় মৌল উপাদান মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ – বিশেষভঙ্গিতে চরিত্র রূপায়ণ সময় ও কালের গতানুগতিকতা ও পৌর্বাপর্য অস্বীকার তথাকথিত বর্হিজাতিক বাস্তবতা পরিহার ও অন্তর্মুখী নববাস্তবতার প্রবর্তন। আত্মকথন, স্মৃতিচারণ, স্বপ্নালুতা ও লিরিকতা, অনুচ্চবচ প্রবৃত্তি, তির্যক বাক্যবিন্যাস, স্বগতোক্তি, অনুচ্চারিত আত্মকথন ও একটি বা দুটি চরিত্রকে মাধ্যম করে তাদের মানসলোকের আলোকে সমস্ত জগৎকে স্বীকরণ ও প্রকাশ এ সবই চেতনাপ্রবাহ উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য হিসেবে মানা হয়"।[১] 'মালঞ্চ' উপন্যাসে এই বৈশিষ্ট্য অনেকাংশে উজ্জ্বল।

যাইহোক আমরা জানি ট্র্যাজেডির উদ্ভব ও ক্রমপরিণতি প্রাচীন গ্রিসে। অ্যারিস্টটলের দি পোয়েটিক্স্ গ্রন্থে ট্র্যাজেডির স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। 'বিষাদাত্মক', 'বিয়োগান্তক', 'করুণরাসাত্মক' ইত্যাদি যে নামেই আমরা 'ট্র্যাজেডি'কে অভিহিত করি না কেন, বিষাদ-বিয়োগ-করুণা ট্র্যাজিক সংবেদনকে বোঝার পক্ষে যথেষ্ট নয়। যে কোনো ব্যক্তির- তা সে যতোই ভালো মানুষ হোক্ না কেন – যে – কোনো দুঃখ-বেদনা-শোক ট্র্যাজেডি বলে গণ্য হতে পারে না। পরস্পর-সম্পর্কিত দুই আবেগ 'Pity' ও 'Fear', যথাযথভাবে উদ্রিক্ত ও অতিরিক্ত আবেগমোচনের মধ্যে দিয়ে প্রশমিত না হলে ট্র্যাজেডি সম্ভব হবে না।[২] ট্র্যাজিক নায়ক/নায়িকা যথেষ্ট উচ্চমার্গীয় ও বিশিষ্ট চরিত্রের না হলে, তাঁদের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধামিশ্রিত অনুভব সঞ্চারিত না হলে, সে-সব চরিত্র কেবলমাত্র 'Pathetic' বলে বিবেচিত হবে। নিয়তির তাড়নায় কিংবা চরিত্রের কোনো বিভ্রম/ বিচ্যুতির কারণে উচ্চ অবস্থান থেকে ট্র্যাজেডির নায়ক/নায়িকা পতিত হবে অনিবার্য দুর্বিপাকে। নিতান্ত সাধারণ কোনো মানুষের বিপর্যয় আমাদের যতই বিচলিত করুক না কেন তা আমাদের মনে ট্র্যাজিক অপচয়ের বোধ সৃষ্টি করতে পারে না। তা হয় কেবলমাত্র দুঃখজনক ও

করুণ।[৩] এই অভিমুখ মাথায় রেখেই, 'মালঞ্চ' উপন্যাসের ট্র্যাজিক রূপ কতটা সার্থক তা নিয়ে আমরা আলোচনায় অগ্রসর হবো।

রবীন্দ্র-উপন্যাসের ধারায় মালঞ্চ বোধহয় সবচেয়ে ট্র্যাজিক রূপ। উপন্যাসটি দশটি পরিচ্ছেদে সমাপ্ত; প্রধানতঃ তিনটি চরিত্রকে আশ্রয় করে লিখিত- আদিত্য, নীরজা ও সরলা। ত্রিকোণ সম্যস্যার বিষয়টি তো সমালোচক উল্লেখ করেছেন নীরজার Tragedy দিয়ে। আমাদের আলোচনার সুবিধার জন্য রবীন্দ্রনাথের একটি ছোটগল্প 'মীনু'র সঙ্গে তুলনায় যাবো।

তপোব্রত ঘোষ তাঁর রবীন্দ্র-ছোটগল্পের শিল্পরূপ গ্রন্থে 'লিপিকা পর্ব'য় 'মীনু' গল্পটির সঙ্গে মালঞ্চ-র সাযুজ্য দেখিয়েছেন। ''মীনু''-তে অবশ্য ত্রিকোণ সমস্যা নেই, তবে আট দশ হাত জমির মধ্যে 'মীনু'-র আঙিনার বাগান যেমন আগেই আছে 'নিশীথে' গল্পে, তেমনি 'মীনু' –র কুকুর ভোঁতা পরে নীরজার কুকুর ডলি হয়ে দেখা দিয়েছেঃ 'মীনু'-র হিন্দুস্থানি দাই যেন মালঞ্চের রোশনিরই পূর্বাভাস।[৪] (রবীন্দ্র –ছোটগল্পের শিল্পরূপ, পৃঃ -৩৬০)

'মালঞ্চ' আর 'মীনু'কে পাশাপাশি রেখে পড়লেই উপন্যাসের ক্ষেত্রে উল্লেখিত 'greater variety of characters', 'greater complication of plot,' 'more sustained and subtle exploration of character ' বিষয়টি পরিস্কার হয়ে আসবে পাঠকের কাছে। ত্রিকোণ সমস্যার বিষয়টি তো সমালোচক উল্লেখ করেছেন যা নীরজার tragedy –কে মীনুর তুলনায় অনেক বেশি মর্মভেদী করে তুলেছে।[৫]

'মালঞ্চ'-য় মৃত্যুর ছায়া প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়েছে। নীরজার পোষা কুকুর ডলির মৃত্যু, নীরজার কোলে মাথা রেখেই। পরের মৃত্যুটি নীরজার গর্ভস্থ সন্তানের যার ফলস্বরূপ বৈশাখের শীর্ণ নদীর মতো শয্যায় লুটিয়ে পড়ে নীরজা, যা ধীরে ধীরে তার মৃত্যু-শয্যায় পর্যবসতি হয়। নীরজার জীবনে ডলি এবং আশ্রিত গনেশের ছেলের প্রতি স্নেহের প্রাবল্য তার সন্তান প্রসবের আগের ঘটনা। অর্থাৎ নীরজা চিরদিনের মতো রোগশয্যায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে গেছে তার নিখিলভুবন একটু একটু করে। যে নারীর ভালোবাসায় ছিল 'প্রচন্ড জেদ' সেই ভালোবাসার বিরুদ্ধে বিধাতারও হস্তক্ষেপ যার কল্পনার অতীত সেই নারীর বাধ্য হয়ে এমন সব খোয়ানো জীবন সত্যিই অসহনীয়।

বিয়ের পর আদিত্য আর নীরজার দশটা বছর কেটে গেছে 'অবিমিশ্র সুখে'। দশ বছর পর সন্তান প্রসব করতে গিয়ে নীরজা সন্তানের প্রাণের মূল্যে কোনোক্রমে বেঁচে গেলেও স্বাস্থ্য ও কর্মক্ষমতা খুইয়েছে চিরতরে। কোনোদিন আর সুস্থ হবে না জেনে রোগশয্যায় তার দিন কাটে। জানালা দিয়ে দেখতে পায় তাদের সাধের বাগান – দুজনের সম্মিলিত সৃষ্টি, এক দশকের পুস্পিত দাম্পত্যের যোগ্য উপমা। বাতাসে পায় বাগান থেকে ভেসে আসা নানা ফুলের গন্ধ, কানে আসে স্বামীর নিয়মে বাঁধা জীবনের

ছন্দ। মনের মধ্যে থেকে থেকেই জেগে ওঠে তোলপাড় করা নানা স্মৃতি, মাঝে মাঝে মৃত্যুর চিন্তায় ঘ্নিয়ে ওঠে বিষাদ – অরোধ্য ও অসহ্য।

আদিত্যর বাগান তো নীরজারই অংশ হয়ে গিয়েছিল! সেই মালঞ্চে সরলার আধিপত্য তার কাছে নিজের দেহ চিরে আরেকটি প্রাণ ঢুকিয়ে দেবার মতোই অসহ। আমরা জানি, 'মীনু' গল্পে দেখেছি-মীনু বকবক করে, দাই শোনে। মালঞ্চে দাই যেন হয়ে ওঠে নীরজার চেতনাপ্রবাহের ঠেকা। ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে থাকে নীরজার চরিত্রের অন্তর্নিহিত প্রাবল্য যেন মৃত্যু এবং আদিত্যকে সরলার হাতে হারানোর বিরুদ্ধে এক অপ্রতিরোধ্য কাব্যিক চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়। রবার্ট লিডেল বলেছিলেন – 'Novel deals with the individual. It is the epic of the struggle of the individual against society.'[৬]নীরজা যেন মালঞ্চ উপন্যাসের সকলেরই বিপ্রতীপে দাঁড়িয়ে একা চালিয়ে গেছে তার হার না -মানা সংগ্রাম।

নীরজা টের পেল তার 'জীবনের দাবি'-র সার্থকতা আদিত্যের নেই। বরং তার এই দাবি আদিত্যর সঙ্গে তার ব্যবধান দেবে আরও বাড়িয়ে। তাই নিজের প্রিয় হার সরলার গলায় পরিয়ে তাকে বরণ করার মধ্যে নিজের অস্তিত্ব স্থায়ী করার চেষ্টা করল। সংবেদনশীল নারী হিসেবে সরলা টের পেত তাকে হেয় করার অন্তরালে রয়ে গেছে নীরজার হঠাৎ সব হারানোর যন্ত্রণা।

'সে বোঝে বউদিদির বুকের ভিতরটা টনটন করছে। নিঃস্তান মায়ের সমস্ত হৃদয় জুড়েছে যে বাগান, দশ বছর পরে আজ এত কাছে আছে, তবু এ বাগান থেকে নির্বাসিত'। জীবনের প্রতি নীরজার যে ক্ষেদ তা ট্র্যাজেডিকে স্মরণ করে দেয়। রমনের প্রতি নীরজার উক্তি- "এই ভাঙা শরীরই তো আমার কপাল ভেঙেছে, ওর জন্যে মমতা কিসের! তারপরে আমার অবিশ্বাস – এ দেখা দিল কোথা থেকে। এ যে অক্ষম জীবন নিয়ে আমার নিজেরই উপরে অবিশ্বাস। সেই তাঁর নীরু আজ আছে কোথায়, যাকে তিনি কখনো বলতেন 'মালিনী', কখনো বলতেন 'বনলক্ষী'। আজ কে নিলে কেড়ে তার উপবন। আমার কি একটাই নাম ছিল। কাজ সেরে আসতে যেদিন তাঁর দেরি হত আমি বসে থাকতুম তাঁর খাবার আগলে, তখন আমাকে ডেকেছেন 'অন্নপূর্ণা'। সন্ধ্যেবেলায় তিনি বসতেন দিঘির ঘাটে, ছোটো রূপোর থালায় বেলফুল রাশ করে তার উপরে পান সাজিয়ে দিতেম তাঁকে, হেসে আমাকে বলতেন, 'তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী'। সেদিন সংসারের সব পরামর্শই আমার কাছ থেকে নিয়েছেন তিনি। আমাকে নাম দিয়ে ছিলেন 'গৃহসচিব', কখনো বা 'হোম সেক্রেটারি'। আমি যেন সমুদ্রে এসেছিলেম ভরা নদী, ছড়িয়েছিলেম নানা শাখা নানা দিকে, সব শাখাতেই আজ এক দন্ডে জল গেল শুকিয়ে, বেরিয়ে পড়ল পাথর।"

আবার অন্যদিকে আদিত্যর আহ্বান উড়িয়ে দিতে না পারলেও শেষ কটা দিন নীরজাকে আগলে রাখার শপথ করিয়ে নেয় সরলা। হয়তো সেই শপথই সরলার কারাবাসকালে আদিত্যকে নীরজার শ্রোতা করে তোলে। সেখানেই আমরা শুনি

মৃত্যুপথযাত্রিণীর মুখে এই সুন্দর ভুবনের জন্য আকুলতা। মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকার আর্তি। বাগানের ডায়রি আর বাগানের ম্যাপ নিয়ে কাগজ-পেন্সিলে সে মনের মতন সাজিয়ে দিতে চায় মালঞ্চকে, তারপর তুলে দেবে আদিত্যের হাতে। এই আকুলতা তার পূর্ণ হয়নি। সবই অলীক কল্পনা মাত্র। সে আরো কল্পনা করে বলেছে- 'সন্ধ্যেবেলায় অমনি করেই অস্পষ্ট আলোয় কাকেরা ফিরবে বাসায়, এমনি করেই দুলবে সুপুরিগাছের ডাল ঠিক আমারই চোখের সামনে। সেদিন তুমি মনে রেখো আমি আছি, আমি আছি, সমস্ত বাগানময় আমি আছি। মনে কোরো বাতাস যখন তোমার চুল ওড়াচ্ছে আমার আঙুলের ছোঁইয়া আছে তাতে। বল, মনে করবে?' আদিত্যকে বলতে হল, 'হ্যাঁ মনে করব'। কিন্তু এমন সুরে বলতে পারল না যাতে তার বিশ্বাসের প্রমাণ হয়।

আসলে আদিত্য যেন ভারপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকায় এসেছে, তাই বলতে হয়, কিন্তু সুর লাগে না। এর থেকে বড় ট্র্যাজেডি আর কি হতে পারে? ক্রমশ নীরজাও টের পেতে থাকে তার এই মরণোত্তর জীবন ভাবনার অসম্পূর্ণতা। যদি আদিত্য মনে না রাখে তাকে তাহলে কীভাবে বাঁচোবে সে। কিটসের মৃত্যুর পর অ্যাডোনিস -রূপী কিটস সম্পর্কে শেলি লিখতে পারেন 'he is a part of that loveliness which he once made more lovely'। নীরজার নিজেকে নিয়ে প্যানথেইসমের জালবোনা অপূর্ণ থেকে যাবে যদি না আদিত্যর 'দয়া' পায়।

'আমাকে দয়া কোরো, দয়া কোরো। তোমাকে এত ভালোবাসি সেই কথা মনে ক'রে আমাকে দয়া করো। এতদিন তুমি আমাকে যেমন আদরে স্থান দিয়েছ তোমার ঘরে, সেদিনও তেমনি করেই স্থান দিয়ো। ঋতুতে ঋতুতে তোমার যেসব ফুল ফুটবে তেমনি করেই মনে মনে ফুল তুলে দিয়ো আমার হাতে। যদি নিষ্ঠুর হও তুমি, তাহলে তো এখানে আমি থাকতে পারব না। আমার বাগান যদি কেড়ে নাও তাহলে হাওয়ায় কোন শূন্যে আমি ভেসে বেড়াব?'

হায়, 'তোমাকে এত ভালোবাসি'-র পরিপ্রেক্ষিতে চাইতে হয় 'দয়া'। এর থেকে ট্র্যাজেডি আর কি হতে পারে? নীরজা আদিত্যর দয়াতেই বাঁচতে চায় তার বাগানে। স্বামীকে সে পড়ে শোনাতে বলে অক্ষয়কুমার বড়ালের 'এষা' যা কবির লোকান্তরিতা পত্নীর প্রতি সম্বোধিত। চিতাকাঠে দাহ হলেই সারা হয় প্রিয়জন? কবি মানতে পারেন না – তুমি নাই, হয় না বিশ্বাস। প্রশ্ন তোলেন তিনি – মরণে কি মরে প্রেম, অনলে কি পুড়ে প্রাণ? তাঁর উপলব্ধিতে আসে তাঁর স্ত্রীকে তিনি হারাতে পারেন না :

হা প্রিয়া – শ্মশানদগ্ধা, হও পরকাশ,
ত্যজিয়াছ মর্ত্যভূমি তবু আছ – আছ তুমি
তুমি নাই –কোথা নাই, হয় না বিশ্বাস।[৭]

'রাত্রি তখন ন'টা। নীরজার ঘরের কোণে ক্ষীণ আলোতে জ্বলছে একটা মোমবাতি। বাতাসে দোলনচাঁপার গন্ধ। খোলা জানলার থেকে দেখা যায় বাগানের গাছগুলোর

পুঞ্জীভূত কালিমা, আর তার উপরের আকাশে কালপুরুষের নক্ষত্রশ্রেণী’। এভাবেই মৃত্যুদৃশ্যের উপস্থাপনা করেন রবীন্দ্রনাথ। না, এ অমল মৃত্যু নয় যাকে কিছু পরে ছুঁইয়ে যাবে সুধাময়ী পরশ। ‘বাগানের গাছগুলোর পুঞ্জীভূত কালিমা’ নীরজার মৃত্যুর মুহূর্তে প্রাণপ্রিয় মালঞ্চে সঞ্চারিত মৃত্যুচিহ্ন। সরলার কাছে নিজেকে সমর্পণের মহিমায় তুলে ধরার জন্য সে জপ করে চলেছে রমেণের ‘ত্যগমন্ত্র’। কিন্তু হল না। সরলা এসে পা ছুঁতেই বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো সমস্ত শরীর তার ‘আক্ষিপ্ত’ হয়ে উঠল –

‘পারলুম না, পারলুম না, দিতে পারব না, পারব না’। অস্বাভাবিক জোর পেয়ে জ্বলে উঠল দেহ, তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর বলে উঠল, “জায়গা হবে না তোর রাক্ষসী জায়গা হবে না। আমি থাকব, থাকব।” হঠাৎ ঢিলে-শেমিজ-পরা পাণ্ডুবর্ণ-শীর্ণ-মূর্তি খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। অদ্ভূত গলায় বললে “পালা পালা পালা এখনই, নইলে দিনে দিনে শেল বিঁধব তোর বুকে, শুকিয়ে ফেলব তোর রক্ত।”[৮] বলেই পড়ে গেল মেঝের উপর। বিপুল tragic waste –এর মধ্যে নীরজার এই শেষ জ্বলে ওঠার সাক্ষী ‘উপরের আকাশে কালপুরুষের নক্ষত্রশ্রেণী’।[৮]

সর্বোপরি একথা বলা যায় যে, রবীন্দ্র-উপন্যাসের ধারায় ‘মালঞ্চ’ বোধহয় সবচেয়ে ট্রাজিক। প্রথম দৃশ্য থেকেই সুতো ছড়িয়েছে মৃত্যুর নিপুণ শিল্প আর তার উল্টোদিকে অস্বাভাবিক প্রাণপ্রাচুর্যময় একটি জীবন জানিয়ে গেছে তার দাবি। একদিকে Nemesis, অন্যদিকে প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিনী – এ দু-এর বিরুদ্ধেই তার অসম অথচ আশ্চর্য সুষমাময় সংগ্রাম। তপোব্রত ঘোষ তাঁর রবীন্দ্র –ছোটগল্পের শিল্পরূপ গ্রন্থের প্রাককথনে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে অনু-বিশ্বের সঙ্গে মহাবিশ্বের সম্মেলন সার্থক হয়ে ওঠার কথা বলেছেন, যা উপন্যাসে ঘটেনি। উপন্যাস প্রসঙ্গে সাধারণভাবে এ কথা সত্য। গোরার নামগোত্রহীনতার আঘাত আমাদের প্রবলভাবে ধাক্কা দেয়, কিন্তু পোস্টমাস্টারের বিদায় উপলক্ষ্যে রতনের নামগোত্রহীনতার সকরুণ বেনু বিশ্ব নিখিলেই ছড়িয়ে যায়। এই ধারায় ‘মালঞ্চ’ বোধহয় ব্যাতিক্রম। উপন্যাসের অন্তর্নিহিত ট্র্যাজেডি নীরজার সঙ্গে সাধারণ পাঠককে একাকার করে না ঠিকই, কিন্তু এমন প্রবল, বর্ণময় প্রাণের অকাল প্রয়াণ আমাদের মধ্যে pity এবং fear সঞ্চারিত করে। Hardy –র বচনে আমাদেরও ব্যথাতুর বুক বলে ওঠে, তবে বোধহয় ‘happiness is an occasional episode in a general drama of pain!’. Hardy –র মতো আমাদেরও তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গে বলতে ইচ্ছে করে – ‘Justice was done, and the President of the Immortals, in Aeschylean phrase, had ended his sport with Tess! ’

‘মালঞ্চ’ নামটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক বৃত্তের আরেকটি অসুখী দাম্পত্যের ছায়া। অসুখী দাম্পত্যের কথা গল্পে তেমন না এলেও বাস্তবের বেলায় দাম্পত্যজীবনেও ছিল গভীর ম্লানতা। আসলে কাদম্বরী-ট্র্যাজেডি রবীন্দ্রনাথের মনের ইতিহাসের কেন্দ্রবিন্দু, একে ঘিরেই তরঙ্গায়িত তাঁর জীবনের অন্য সব ট্র্যাজেডি। সেই

মূলসুরটির সঙ্গেই কোথাও একটা সঙ্গতি তিনি বেঁধে রাখেন উপসুরগুলির। সেইসব মিলেমিশেই বেজে ওঠে মালঞ্চ-র সকরুণ ট্র্যাজেডি।

গ্রন্থঋণ:

১. সাহিত্যকোষ কথাসাহিত্য, পৃঃ-৫৯।

২. চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল। সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, কলকাতাঃ রত্নাবলী, ২০০৯, পৃঃ ১৪২।

৩. চট্টোপাধ্যায়, হীরেন। সাহিত্য প্রকরণ। কলকাতাঃ বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৫, পৃঃ ১০৭।

৪. ঘোষ, তপোব্রত। রবীন্দ্র –ছোটগল্পের শিল্পরূপ, পৃঃ ৩৬০।

৫. চক্রবর্তী, অঞ্জন। রবীন্দ্রনাথের মালঞ্চ মৃত্যুর ছায়া জীবনের দাবি, কলকাতাঃ অক্ষর বিন্যাস, ২০১১।

৬. চক্রবর্তী, অঞ্জন। রবীন্দ্রনাথের মালঞ্চ মৃত্যুর ছায়া জীবনের দাবি, কলকাতাঃ অক্ষর বিন্যাস, ২০১১।

৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র রচনাবলী, মালঞ্চ, ১৯৩৪, পৃঃ ৪৬৬।

৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র রচনাবলী, মালঞ্চ, ১৯৩৪, পৃঃ ৪৬৭।

কেতকী কুশারী ডাইসনের ‘মেয়েলী' : যাপিত জীবনের শাপিত ভুবন

অভীক প্রধান
গবেষক, বাংলা বিভাগ, কোলহান বিশ্ববিদ্যালয়

সংক্ষিপ্তসার :
ষাটের দশকের সাহিত্যিক কবি কেতকী কুশারী ডাইসন। তিনি তাঁর বিভিন্ন কবিতার মধ্যে যেমন সমাজের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন, তেমনি প্রাত্যহিক ঘটে যাওয়া আমাদের চোখের সামনে অতি সাধারণ ঘটনাগুলোকেও কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। তেমনি তাঁর একটি কবিতা ‘মেয়েলী'। কবিতাটিতে উপস্থাপিত ‘হেঁশেল' যেন বাইরের সমস্ত আলো কেড়ে নিচ্ছে, কেড়ে নিচ্ছে একটা গোটা নারী সমাজের আলোকিত জীবনকেও। স্তব্ধ করে দিচ্ছে একাধিক স্বপ্ন ও ভবিষ্যতকে।

সূচক শব্দ : মেয়েলী, হেঁশেল, নারী, সমাজ, কবিতা

মূল আলোচনা

সময়, সমাজ ও কবিতা – এগিয়ে চলে নিজস্ব ধারাতে। সময় কথা বলে সমাজের, সমাজের চিত্র প্রতিফলিত হয় সাহিত্যে, কবিতায়। সময়ের গতানুগতিক ধারাতে রুচি বদল হয় সাহিত্যিকের, পাঠকের। বদলে যায় মানসিকতা। দৃষ্টিকোণ বদল হয়, বদলে যায় ভাষা প্রকাশ। সাহিত্যের অন্যান্য শাখার থেকে কবিতার ভাবপ্রকাশ অত্যন্ত দ্রুত। নারীবাদ যদি বিষয় হয়, আর সে কবি যদি হন নারী, তখন তাঁর কণ্ঠস্বর আরও প্রকট হয়। কেতকী কুশারী ডাইসন বিশ শতকের ষাটের দশকের সাহিত্যিক। কবি সত্ত্বাই তাঁর লেখার মূল চালিকাশক্তি। কবিতার মধ্য দিয়েই জীবনকে তিনি দেখতে পেলেন। আধ্যাত্মিক নির্জনতা, একটু একা থাকা, একটুখানি সাহস – কবিতা লেখার জন্য এই সুবিধাগুলি তিনি তাঁর পরিবার থেকেই পেয়েছিলেন। ‘বল্কল' (১৯৭৭), ‘সজীব পৃথিবী' (১৯৮০), ‘জলের করিডর ধ'রে' (১৯৮১), ‘কথা বলতে দাও' (১৯৯২), ‘জাদুকর প্রেম, জাদুকর মৃত্যু' (১৯৯১) প্রভৃতি কেতকী কুশারী ডাইসনের বিশিষ্ট কাব্যগ্রন্থ। আলোচ্য ‘মেয়েলী' কবিতাটি কেতকীর চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ ‘কথা বলতে দাও' কাব্যগ্রন্থের দ্বাদশ সংখ্যক কবিতা। কাব্যগ্রন্থটি কবি উৎসর্গ করেন ‘আমার কবিতার পাঠকদের জন্য'।

বাংলা কবিতায় নারীবাদী কণ্ঠস্বর প্রথম সচেতনভাবে পাই কবিতা সিংহের কবিতায়। যার উত্তরাধিকার বহন করেছেন পরবর্তী কবিরা। কেতকী কুশারী ডাইসনের একাধিক কবিতায় প্রতিফলিত হয়েছে নারীচেতনার দিকটি। নারীদের নিয়ে তাঁর ভাবনা, তাঁর মনন তাঁর কবিতাকে সময়ান্তরে অন্য মাত্রায় নিয়ে গেছে। আলোচ্য ‘মেয়েলি' কবিতাটি আলোচনাসূত্রে তাঁর লেখায় নারীচেতনা সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়ার চেষ্টা করবো। কবিতাটি শুরু হুয়েছে হেঁশেল ঘর থেকে। হেঁশেল ঘর যুগ যুগ

ধরে নারীদের জীবনে এক বিশেষ স্থানে পরিণত হয়েছে। যে স্থান একদিকে অধিকারবোধের, অন্যদিকে আবদ্ধ জীবনের প্রতীক। হেঁশেল শব্দটার সাথে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কোথাও যেন নারীকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখতে চায়, এমনকি একজন নারীও অপর নারীকে হেঁশেলের অন্দরমহলের নানা দোষ-ত্রুটি নিয়ে শব্দবাণে বিদ্ধ করতে চায়। বিশেষ করে বাড়ির নববধূটিকে হেঁশেল ঘরের পান থেকে চুন খসার অপরাধে শুনতে হয় নানা কটুবাক্য। কবিতাটির শুরুতেই পাই, -

“ও মেয়ে,
তোমার হাঁড়িটা বড্ড উথলে উঠছে,
আঁচটা একটু কমিয়ে দাও না !” **(১)**

কবিতাটির প্রথমেই বধূটির ভুল ধরয়ে দেওয়া হয়েছে। সাথে সাথে ভাতের হাঁড়ির থেকে চোখ সরিয়ে বধূটির ভুল ধরা পড়ে আনাজের কড়াইয়ের উপর, -

“ও মেয়ে,
তোমার আনাজের কড়াইয়ে ঢাকনা নেই কেন ?
গুণ-ঘ্রাণ-রস উড়ে যাবে যে !” **(২)**

ছোট্ট একটি বিষয়, তবুও এর গভীরতা মর্মস্পর্শী, বেদনার্ত। হেঁশেলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে ‘মেয়ে'-কে নির্দেশিত করে দেওয়া হচ্ছে তাকে ঠিক কী কী করতে হবে। সেই সাথে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে কী কী করা তার অনুচিত। আমাদের সমাজেও ঠিক এভাবেই মেয়েদের সামনে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় code of conduct-এর বিধি নিষেধ। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদের এই বিধি নিষেধের বেড়াজাল এতটাই পুরু হয়ে উঠেছে যার নাগপাশ থেকে কোন নারীর বেরিয়ে আসা একটা যুদ্ধের সামিল। সাহিত্যিক তসলিমা নাসরিনের একটি মন্তব্য এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য, “পরিবার ও সমাজ তাদের সংসার খাঁচায় আটকে রাখে। মেয়েরা কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়া জয়ের সিংহাসনে বসলে এবং হাত-পা-মাথা ঢেকে ডেকোরেশন পিসের ভূমিকা পালন করলে মেয়েদের যত অপমান করা হয়, তত অপমান মেয়েদের চাবকে, ঠেঙিয়ে, গলা কেটে কিংবা ফাঁসিতে ঝুলিয়েও হয় না।” **(৩)** এ কেবল পুরুষতান্ত্রিকতার ভয়াবহরূপ নয়, এটি একটি সামাজিক ব্যাধি, যেখানে নারী কর্তৃক নারীও নিষ্পেষিত হচ্ছে।

প্রসঙ্গত লক্ষণীয়, কবিতায় উল্লেখিত ‘ও মেয়ে' শব্দটি তিনবার ব্যবহৃত হয়েছে, আর তিনবারই নববধূটির ত্রুটি ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। অতএব ‘ও মেয়ে' শব্দটি যে তাচ্ছিল্য ভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। এই সম্বোধন থেকে স্পষ্ট, বাড়ির বধূটিকে সেই বাড়িরই মা সম্বন্ধীয় কেউ দিচ্ছেন পিতৃতন্ত্রের পাঠ, যেন সে সামাজিক নিয়ম থেকে বিশৃঙ্খল না হতে পারে। কবিতার পরবর্তী স্তবকে দেখা যাচ্ছে, -

“ও মেয়ে,
তোমার মাছের এ পিঠ ভাজা হয়ে গেছে,

এবার উলটে ও পিঠ ভাজো !”(৪)

পুনরায় মনে করিয়ে দেন, -

“নুন দিতে ভুলো না,
মশলা পুড়িও না !” (৫)

বলাই বাহুল্য, এই ‘মেয়ে'কে এই সব খুঁটিনাটি হেঁশেলের পাঠ শেখাচ্ছেন সেই বাড়িরই এক মহিলা, সম্ভবত তারই শাশুড়ি। কবি কেতকী কুশারী ডাইসন এই কবিতার মাধ্যমে দেখাতে চেয়েছেন একটি নিষ্পেষিত ধারাবাহিকতাকে। অর্থাৎ যুগ যুগ ধরে চলে আসা বস্তাপচা কিছু নিয়ম বাহিত হয়ে চলেছে এবং পরবর্তী প্রজন্মে সেই নিয়ম ক্রমশ ছড়িয়ে চলেছে। যেন একটা ধারা, তার কোন অন্ত নেই। কোথাও কোন নিয়ম ভাঙার আলো নেই। চারিদিকেই কেবল প্রাচীর, সেই প্রাচীরকে ভেঙে ফেলারও কোন তাড়া নেই। একটা অভ্যাসে পরিণত করে দেওয়া হচ্ছে। নারীদের জন্য নির্ধারিত বিভিন্ন সামাজিক প্রথাগুলির কোন যে অবসান নেই তা ভালোভাবেই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন কবি কেতকী কুশারী ডাইসন। আর এই কারণেই নারীদের হয়ে তাঁর কলম ধরা। কবিতার পরবর্তী অংশে রয়েছে, -

“তেল-ঝোল-
আঁচল-বাচ্চা
সামলে-সুমলে
রান্না নামাবে !” (৬)

কবিতার এই অংশে লক্ষণীয় ‘আঁচল-বাচ্চা' কথাটি। একজন নারীকে সামলাতে হবে তার মর্যাদা, সেই সাথে মাতৃত্বের যাবতীয় ভার। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে এই ভাবনা পরিণত হওয়ার সাথে সাথে নারীদের সতীত্ব ভাবনা নিয়ে রক্ষণশীল হয়ে উঠে গোটা সমাজ।

নব বিবাহিত গৃহবধূরা যেন কেবলমাত্র সন্তানের জন্ম দেওয়ার মেশিন মাত্র। সন্তানের লালনপালন বা হেঁশেল সামলানো ছাড়া তাদেরও যে সমাজের কাছে কোন অবদান রাখার জায়গা রয়েছে তা সমাজ মনে করে না। এ প্রসঙ্গে মল্লিকা সেনগুপ্তের একটি কবিতার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে,-

“সেই শ্রমিক গৃহিণী
প্রতিদিন জল তোলে, ঘর মোছে, খাবার বানায়
হাড় ভাঙা খাটুনির শেষে রাত হলে
ছেলেকে পিট্টি দিয়ে বসে বসে কাঁদে
সেও কি শ্রমিক নয় !
আপনি বলুন, মার্কস, শ্রম কাকে বলে !

... ...

আপনি বলুন মার্কস, মেয়েরা কি বিপ্লবের সেবাদাসী হবে ?” (৭)

যদিও মল্লিকা সেনগুপ্তের মতো এত দৃঢ়, এত উচ্চ, এত প্রখর কণ্ঠস্বর কেতকী কুশারী ডাইসনের কবিতায় পাওয়া যায় না, তবে তিনি খুবই শান্ত গলায় নারীদের যন্ত্রণার্তিকে অসামান্য ভাবে তাঁর কবিতায় তুলে ধরেছেন। যদিও কেতকী কেবল যে সংস্কারের বিধিনিষেধের কথা বলেছেন তা নয়, কেতকীর কবিতায় দেখা যাচ্ছে আশাবাদ। তিনি আশা রেখেছেন, এই সময়টা একদিন ঠিক বদল হবে। যে সকাল রাতের চেয়েও অন্ধকার সেই সকালে একদিন সত্যিকারের সূর্যের উদয় হবে। আর ঠিক এই কারণেই কবিতার একেবারে শেষে তিনি প্রশ্ন রেখেছেন, -
"খেতে বসবে কখন ?" **(৮)**

নারীর প্রতি এই সচেতনতা ও দায়িত্ববোধের বার্তা আসলে কার? কবি এই ছোট্ট প্রশ্নের মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন, নারীদের নিজের পায়ের তলার মাটির দিকে দৃষ্টি দিতে। নজর দিতে তার চাহিদাগুলোর দিকে, যা সংসারের নাগপাশে মৃত্যু ঘটে দিনের পর দিন। তারও যে সময় মতো খেতে বসা উচিত অর্থাৎ তারও নিজস্ব একটা জীবন আছে, নিজেকে নিয়ে ভাববার অবকাশ আছে, এই চেতনাই কবি যেন ছড়িয়ে দিতে চান সমাজের প্রতিটি হেঁশেলে।

কবিতাটির বাচনভঙ্গি এককেন্দ্রিক। এক প্রশ্ন, 'খেতে বসবে কখন?' যেন প্রবল গভীরতর বোধকে স্পর্শ করে। কবিতাটির নামকরণ কেবল একটি প্রথা নয়, একটি তন্ত্রকেও নির্দেশ করে। বুঝিয়ে দেয়, "নারীকে ঘরে বসে থাকতে হয়, নারীর জন্য ঘরের দেওয়ালে ভেন্টিলেটরের ব্যবস্থা আছে, ওই ভেন্টিলেটর ফুঁড়ে যে আলো-হাওয়া তার গায়ে এসে লাগে, সেটাই কি যথেষ্ট নয় বেঁচে থাকবার জন্য?" **(৯)** কবিতাটিতে রয়েছে একজন বধূর প্রতি এক শাশুড়ির 'চিরকালীন' অভিযোগ। কবিতাটির একেবারে শেষ চরণে বধূর প্রতি কর্তব্যবোধ কী একপ্রকার পুরুষতান্ত্রিকতার বেড়াজাল টপকানোকে ইঙ্গিত করে না? কেবল হেঁশেলের বধূ নয়, সাহিত্য সমাজে মহিলা সাহিত্যিকদের, বিশেষ করে আশাপূর্ণা দেবী, মহাশ্বেতা দেবী, সুচিত্রা ভট্টাচার্য থেকে কেতকী কুশারী ডাইসন প্রমুখ সাহিত্যিকদের অনেক নিষেধ উপেক্ষা করে কলমকে ধরে রাখতে পেরেছেন স্রেফ মনের জোরে। কেতকী কুশারী তাঁর একটি প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গে বলেছেন, - "যেসব মেয়েরা ভালো করে লিখতে চান তাঁদের সব সমাজেই অনেক সাহস রাখতে হয়, - সৎসাহস তো বটেই, কিছু দুঃসাহসও, কারণ নিষেধের ব্যারিকেড টপকাতে হয়।" **(১০)** এই ব্যারিকেডই হেঁশেলের প্রতিটি নারীকে টপকাতে হবে। নববধূটির হেঁশেল সামলানো পাঠকের সামনে তুলে ধরে বহু প্রশ্ন। এই হেঁশেল গর্বের নয়, বরং একটা গতিকে আটকে রাখার ভয়ানক চাবিকাঠি। যা অঙ্গুলি নির্দেশ করে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সামাজিক কাঠামোকে। যেখানে সাহিত্য থেকে সমাজ – একই নাগপাশে বন্দী।

আকর গ্রন্থ :

১. কবিতা সমগ্র (১), কেতকী কুশারী ডাইসন, আনন্দ পাবলিশার্স, সেপ্টেম্বর ২০১৫, কলকাতা – ০৯

সহায়ক গ্রন্থ :

১. মেয়েদের কলম ঘরে বাইরে, সুদক্ষিণা ঘোষ, কারিগর, জানুয়ারি ২০১৮, কলকাতা - ০৯

২. আধুনিক বাংলা সাহিত্য : নানা বিষয়, নানা ভাবনায়, অভীক প্রধান (সম্পাদিত), শ্রীলিপি, জুন ২০১৮, মেদিনীপুর – ৭২১১০১

পত্র-পত্রিকা :

১. কোরক, বইমেলা সংখ্যা, ২০১৭, কলকাতা – ৫৯

তথ্যসূত্র :

১. কবিতা সমগ্র (১), কেতকী কুশারী ডাইসন, আনন্দ পাবলিশার্স, সেপ্টেম্বর ২০১৫, কলকাতা – ০৯, পৃষ্ঠা – ১৮৬

২. তদেব, পৃষ্ঠা – ১৮৬

৩. নষ্ট মেয়ের নষ্ট গদ্য, তসলিমা নাসরিন, আনন্দ পাবলিশার্স, আগস্ট ২০১০, কলকাতা – ০৯, পৃষ্ঠা - ১৮৬

৪. কবিতা সমগ্র (১), কেতকী কুশারী ডাইসন, আনন্দ পাবলিশার্স, সেপ্টেম্বর ২০১৫, কলকাতা – ০৯, পৃষ্ঠা - ১৮৬

৫. তদেব, পৃষ্ঠা - ১৮৬

৬. তদেব, পৃষ্ঠা - ১৮৬

৭. কবিতা সমগ্র, মল্লিকা সেনগুপ্ত, সম্পাদনা সুবোধ সরকার, আনন্দ পাবলিশার্স, ডিসেম্বর ২০১৮, কলকাতা – ০৯, পৃষ্ঠা - ১১৫

৮. কবিতা সমগ্র (১), কেতকী কুশারী ডাইসন, আনন্দ পাবলিশার্স, সেপ্টেম্বর ২০১৫, কলকাতা – ০৯, পৃষ্ঠা – ১৮৬

৯. নষ্ট মেয়ের নষ্ট গদ্য, তসলিমা নাসরিন, আনন্দ পাবলিশার্স, আগস্ট ২০১০, কলকাতা – ০৯, পৃষ্ঠা – ৯

১০. ভাবনার ভাস্কর্য, কেতকী কুশারী ডাইসন, বৈশাখ ১৩৯৫, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা – ৭৩, পৃষ্ঠা – ২১৮-২১৯

মধ্য-যুগের লিঙ্গ বিভাজিত সমাজ চিত্র : প্রসঙ্গ বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল কাব্য

চন্দ্রাণী মুখার্জী
সহকারী অধ্যাপক, বাণীপুর মহিলা মহাবিদ্যালয়

মূল শব্দ: পুরুষ, নারী, প্রথম লিঙ্গ, দ্বিতীয় লিঙ্গ, নারীর – আত্ম-প্রতিষ্ঠা

সারসংক্ষেপ : মধ্য যুগীয় বাংলা-সাহিত্য দৈববাদের ছত্রছায়ায় লালিত হলেও দৃষ্টি ভেদে সেখানেও চোখে পড়ে লিঙ্গ বিভাজিত সমাজে প্রথম লিঙ্গের শোষণে দ্বিতীয় লিঙ্গের শোষণে দ্বিতীয় লিঙ্গের সামাজিক অবস্থানের বাস্তব চিত্রটি। বিপরীতে শোষিত দ্বিতীয় লিঙ্গের প্রতিবাদ ও আত্মপ্রতিষ্ঠারপ্রয়াসও বর্তমান।কবি কালীদাস রায় দেবী মনসার মাহাত্ম্য-প্রচারক 'মনসামঙ্গল' কাব্যকে দৈবীশক্তি বনাম পৌরুষের দ্বন্দ্ব রূপে বিশ্লেষণ করলেন। দৈববাদের বৃত্ত ভেঙে মধ্য-যুগীয় সাহিত্যেও পড়ল আধুনিক বিশ্লেষণী দৃষ্টি। এই সূত্রেই বিজয় গুপ্তের লেখনীতেও মিলল নারী –স্বাধীনতা আন্দোলনের সুপ্ত বীজের সন্ধান।পুরুষতান্ত্রিক মধ্য যুগীয় সমাজে পুরুষের বেলাগাম কামলালসার ফসল মহাদেবের জারজ কন্যা মনসা স্বয়ং মহাদেবের কামলোলুপ প্রস্তাবের শিকার হলেও ঘটনাক্রমে মহাদেবের কাছ থেকে তিনি কন্যার স্বীকৃতি পান। কিন্তু এই ঘটনা শিবপত্নী চন্ডিকার জীবনে হয়ে ওঠে চরম বিপর্যয় স্বরূপ। ঘটনাক্রমে মহাতপা জরৎকারু ও মনসা বিবাহ হল কিন্তু মাতৃহীনা জারজ কন্যা একাকিনী মানুষ হয়ে উঠলেও কীভাবে পুরুষের আজ্ঞাবাহী সেবাদাসী হয়ে 'নারী' হয়ে উঠতে হয় সে শিক্ষা তার ছিল না। উপরন্তু তাঁর পিতৃসুত্রে প্রাপ্ত দৈবী শক্তি পুরুষের অহংকে আহত করল। ফলত মনসা স্বামী- পরিত্যক্তা হলেন। পরিত্যাগের পূর্বে স্বামী মনসাকে অষ্টনাগের জননী করে সমাজে বিধকন্যা রূপে প্রতিষ্ঠিত কবে পৌরুষের অহং তৃপ্ত করলেন।শুরু হল এককিনী নারীর আত্ম- প্রতিষ্ঠার লড়াই। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার মালিকও পুরুষ। স্বভাবতই পুরুষশ্রেষ্ঠ চাঁদ বণিকের কাছ থেকেই মনসাকে আদায় করতে হবে সে স্বীকৃতি। চাঁদ- মনসার দ্বন্দ্বে চাঁদ ছয়পুত্র এবং বাণিজ্যতরী হারালেও এককিনী নারীর প্রতিষ্ঠারবিরোধী। নারী প্রতিষ্ঠা পাবে, পুরুষের সঙ্গিনী রূপে। যেমন শিবের সঙ্গিনী রূপে চন্দ্রিকার প্রতিষ্ঠা। এমনকী তৎকালীন সমাজে স্বামীর অমতে নারীর নিজ ধর্ম নির্বাচনের স্বাধীনতাও ছিল না। শৈব চাঁদ সদাগর এবং মনসা-ভক্ত সোনেকার দাম্পত্যেও সেই চিত্র উঠেছে।ঘটনাসূত্রে মনসার পরিকল্পনানুসারে চাঁদের সপ্তম পুত্র লখিন্দরের বিবাহ বাসরে সর্পাঘাতে মৃত্যু হলে বেহুলা মৃত স্বামীসহ স্বর্গারোহণ করে নৃত্য-গীতে মহাদেবকে তুষ্ঠ করে মনসার আত্ম- প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করেন। স্বামী, ছয় ভাশুরসহ চাঁদের বানিজ্যতরী উদ্ধার করে আনলেও কৃতঘ্ন পুরুষ সমাজ বেহুলার

সতীত্বের পরীক্ষা চায়। অন্যদিকে শিব, বেহুলার প্রতি কামাবিষ্ট হলেও চন্ডিকা স্বামী চরিত্র সংশোধনের প্রয়াস করেন। বেহুলার সকরুণ অনুরোধে অনিচ্ছা সত্ত্বেও চাঁদ, মনসাকে প্রতিষ্ঠা দিতে বাধ্য হন।এভাবেই মানসা , চন্দ্রিকা, বেহুলা ও সোনেকার এককথায় যূথবব্ধ নারী – শক্তির প্রয়াসে মধ্যযুগীয় পুরুষতান্ত্রিক কারাগারেও নারী-স্বাধীনতার জয়ধ্বজা প্রতিষ্ঠিত হয়। আর দৈববাদের বৃত্ত চূর্ণ করে “মনসামঙ্গল’ কাব্যও হয়ে ওঠে একক নারীর আত্ম প্রতিষ্ঠার কাহিনি।

প্রাচীন - মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য মানেই এক ঘেঁয়ে দৈববাদের চর্বিতচর্বণ-এই বদ্ধমূল বিশ্বাসে কুঠারাঘাত হল আধুনিক কবির অভিনব দৃষ্টির বিচারে-

“মানুষই দেবতা গড়ে তাহার কৃপার পরে করে দেব মহিমা নির্ভর।”১

দৈববাদের ছত্রছায়ায় লালিত দেব-মাহাত্ম্য প্রচারক মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্য বিশ্লেষিত হল নবরূপে দুই জমিদারের শক্তির দ্বন্দ্ব। এমন দেবতা (দেবী) তাঁর উচ্চাসন পরিত্যাগ করে যখন সামান্য এক নরের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত, তখন তার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান অত্যাবশ্যক।

আলোচনার পরিসর সীমিত রাখবার জন্যই এখানে কেবল কবি বিজয় গুপ্তের কাব্যকেই যদিও অনুসরণ করা হবে, তবু এ সত্যও অনস্বীকার্য যে মধ্য যুগে যতজন কবি মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেছেন সেখানে সামান্য কিছু পার্থক্য ব্যতীত কাহিনিগত ভাবে তাদের প্রতিটি অভিন্ন।

এখন পূর্বোক্ত কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা যায় যে, দেবী মনসা, মহাদেবের জারজ সন্তান। পুরুষতান্ত্রিক মধ্যযুগীয় সমাজে পুরুষের স্বেচ্ছাচার এই প্রকার লাগামহীন ছিল যে কখন, কোথায় তার কোন সন্তানের জন্ম হচ্ছে তার কোনও হিসাব তার কাছে থাকত না। আলোচ্য কাব্যে স্বয়ং মহাদেবই এই প্রকার স্বেচ্ছাচারি পুরুষ চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। সুন্দরী, যুবতী দেবী মনসাকে দেখে বয়সের ফারাক ভুলে বুড়ো শিব কামাতুর হয়ে পড়েছেন-

“ কন্যার রূপ যৌবন অদ্ভুত হেন বাসি।
করিব গন্ধর্ব্ব বিয়া লইয়া যাব কাশী।”২

কবি বিজয় গুপ্তের বর্ণনাতেই দৈববাদের আবরণের অন্তরালে লিঙ্গ বিভাজিত মধ্যযুগীয় সমাজে প্রথম লিঙ্গের বেলাগাম স্বেচ্ছাচারিতা প্রকাশিত। শিব চরিত্রটি এখানে স্বেচ্ছাচারী পৌরুষের উত্তাপে এতোই উত্তপ্ত যে নিজ কন্যা মনসাকে তিনি চিনতেও পারছেন না। বিবাহিত পুরুষ হয়েও কন্যাসম নারীকে তিনি প্রস্তাব দিচ্ছেন-

“দেখিয়া তোমার ঠান,   কামে দহে মোর প্রাণ,
মদন অনলে প্রাণ দহিহে, উহার উপায় কি।” ৩

মধ্যযুগীয় দৈববাদ প্রধান সমাজের এ কোন কলঙ্কিত সত্য, যেখানে নারী জন্মদাতা পিতার কাছেও সুরক্ষিত না? ঘটনাক্রমে পিতাকে চিনতে পেরে মনসা সম্পর্কের সত্য প্রকাশ করলে অবশ্য শিব লজ্জিত হয়ে মনসাকে কন্যার স্বীকৃতি দেন। ঠিক এই ক্ষেত্রে

আবার আরও একটি বিষয় বিচার্য – পুরুষ যখন তাঁর জারজ কন্যাকে স্বীকৃতি দিয়ে আপন পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করছেন তখন প্রাথমিক ভাবে তাঁর শুভ বোধোদয়ের জন্য পাঠক তৃপ্ত হলেও যে যে দিকটি আমাদের পুনরায় আহত করে তা হল শিব-পত্নী দেবী চন্ডীকার অবস্থা। যে কোনো যুগেই দাম্পত্যে স্বামী প্রেমের একছত্র অধিকার ভোগের কামনা নারী মনের সহজাত প্রবৃত্তি স্বরূপ। স্বভাবতই সুদীর্ঘ দাম্পত্য জীবন অতিক্রম করতে করতে স্বামীর জারজ সন্তান আগমনের এমন আকস্মিক বার্তা নারী মনকে কী প্রকার ক্ষতবিক্ষত করতে পারে তা বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। বহুগামী পুরুষের কাছ থেকে আহত হতে হতে নারীও অবলা থেকে হয়ে ওঠে সবলা। সমাজকৃত লিঙ্গ বিভাজন নারীকে 'দ্বিতীয়' বলে চিহ্নিত করলেও প্রকৃতি তা করেনি। হয়তো বা সেই কারণেই সমাজের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে, নিষেধাজ্ঞাকে অমান্য করেও অনেক সময়ই প্রতিবাদে উদীপ্ত হয়ে উঠেছে নারী কণ্ঠ। এমন প্রতিবাদী সত্তা নিয়েই কবি বিজয় গুপ্তের কাব্যে শিব-পত্নী চন্ডীকা হাজির হয়েছেন-

"প্রেত শ্মশানে থাকে মাথায় ধরে নারী।
সবে বলে পাগল পাগল কত সইতে পারি।।"৪

এখন প্রশ্ন, মধ্যযুগীয় পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় এমন বিপরীত চিত্র আদৌ কতখানি সম্ভব? চণ্ডীকা দেবী বলেই হয়তো এমন চিত্রাঙ্কন সম্ভব। কোনও সাধারণ নারী চরিত্র নিয়ে এমন প্রতিবাদের চিত্রাঙ্কণ হয় তে বা সে যুগে অসম্ভব ছিল। এখন প্রশ্ন – সুতীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও কী দেবী চণ্ডিকা স্বামীর স্বেচ্ছাচারিতায় লাগাম দিতে সক্ষম হয়েছিলেন? উত্তর নিঃসন্দেহে নঞৰ্থক। তাই তো শিব দেবী সৃষ্ট উদ্যানে লুকিয়ে চলে গেলে চন্ডীকা ডোম নারীর ছদ্ম বেশে শিবকে খুঁজে ফেরেন। খেয়া পার হওয়ার সময় শিব যথারীতি সেই ডোমনীকে বলেন-

"আমার মনে লয় যদি তোমার মনে রোচে।
তোমার সঙ্গে গৃহবাসে মনের দুঃখ ঘোচে,,
কার্তিকের মাতা ঘরে আছে মহামায়া।
তাহা হইতে অধিক তোমারে করিব দয়া।।"৫

ডোমনী ছদ্মবেশী মহামায়া স্বামীর চরিত্র পরীক্ষা করতে এবার তার হাতে রাঁধা ভাত খাওয়ার প্রস্তাব দিলে ডোমনীর প্রেমে উন্মত্ত শিব নিজের ব্রাহ্মণত্ব বিসর্জন দিয়েও তাতে রাজি হয়ে গেলেন। তৎকালীন সমাজে প্রচলিত ছিল সুকঠোর বর্ণভেদ প্রথা পুরুষ চরিত্রের শৈথিল্য ও কামনা-বাসনা সেই সকল প্রথাকে দ্বিধাহীন চিত্তে অতিক্রম করে যেত।

ঘটনাক্রমে ডোমনীর প্রতি কামাবিষ্ট শিব-

" হাসিতে হাসিতে গেল ডোমনীর পাশে।"৬

নিজের স্বামীকে এইরূপ দ্বিধাহীন চিত্তে দাম্পত্যের শর্তভঙ্গ করতে দেখে ক্ষুব্ধা দেবী প্রতিবাদে ঝলসে ওঠেন-

" পরদার লোভে তুমি জাতি কর নাশ।"৭

ক্ষোভে, ক্রোধে, দুঃখে দেবী বলেন-

" সাধ নাই গৃহবাসে ছার আমি যাই।।
খল চরিত্রে সকল ভন্ডুল কার্য্যে ঠেকিলে এবে।
কহিয়া দিব সকল কথা শুনিয়া হাসিবে দেবে।।"৮

বাস্তবে এ ছিল কেবল মৌখিক ক্ষোভ। এরপরও আমরা দেবী চন্ডীকে নিজ গৃহেই ফিরতে দেখি এবং স্বামীর স্বেচ্ছাচারিতাও অপরের কাছে প্রকাশ না করেই সহ্য করেন। মধ্য-যুগীয় পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের স্বেচ্ছাচারের সঙ্গে আপোশ করে দাম্পত্য রক্ষার সম্পূর্ণ দায় ছিল স্ত্রীর কাঁধে। আর শাস্ত্রের বিধান-

" অধিবিন্না তু যা নারী নির্গচ্ছেদ্রুধিতা গৃহাৎ।
সা সদ্যঃ সন্নিরোদ্ধব্যা ত্যাজ্যা বা কুলসংন্নিধৌ।।"৯

যে অধিবিন্না নারী রাগ করে বাড়ী থেকে বেড়িয়ে যান, তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে (দড়ি প্রভৃতি দিয়ে) বেঁধে রাখা উচিত অথবা পিত্রাদির সমক্ষে তিনি পরিত্যাজ্যা। প্রসঙ্গত সুকুমারী ভট্টাচার্যের একটি সুন্দর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য-

> "মনুর ধর্মশাস্ত্রে স্ত্রীর মান বলে কিছু থাকতে পারে না। বিদ্বেষ থাকলেও মুক্তি অর্থাৎ বিবাহ বিচ্ছেদে অধিকার নেই। মনুসংহিতা বিবাহকে নারীর পক্ষে কারাগার করে তুলেছিল।"১০

মনসামঙ্গল কাব্যেও তাই দেবী চন্ডীকাকে, শিবের প্রতি ক্ষোভবশত বহুবার সংসার ত্যাগে উদ্যত হতে দেখেছি কিন্তু কোনও বারই বাস্তবে তিনি সংসার ত্যাগ করেননি।

পুরুষের বেলাগাম স্বেচ্ছাচারিতা স্ত্রীকে করে তুলেছিল সন্দেহ প্রবণ। শিব তাঁর জারজ কন্যাকে গৃহে আনলে স্বাভাবিক ভাবেই দেবী চন্ডীকা তাঁকে সপত্নী বলেই ভেবেছেন। পরবর্তীতে দেবী মনসার প্রকৃত পরিচয় জানতে পারলেও মানতে পারেননি দেবী চণ্ডীকা। কোনো নারীর পক্ষেই স্বামীর জারজ সন্তানকে গ্রহণ করা দুর্সাধ্য। কিন্তু পুরুষ-শাসিত মধ্যযুগীয় সমাজে পতিই নারীর পরম গতি। আর গৃহস্থালী তার পৃথিবী। সেই পৃথিবীতে পতি প্রভু আর নারী জায়া রূপে তার অধিনস্থ দাসী। পতিগৃহের অধিশ্বরী সে নয়, তার কাজ সন্তান উৎপাদন ও প্রতিপালন, পরিজনের সেবা এবং গৃহস্থালীর সব কাজ সম্পন্ন করা। বিনিময়ে তার বরাদ্দ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান। দাম্পত্যে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণই ছিল পত্নী-ধর্ম। স্বভাবতই দেবী চণ্ডীকাও সেই ধর্ম পালন করে স্বামীর জারজ কন্যাকে আপন পরিবারে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন।

পুরুষতান্ত্রিক মধ্য-যুগীয় সমাজে অবিবাহিত যুবতী কন্যা পিতৃগৃহের কলঙ্ক স্বরূপ বিবেচিত হত-

" সম্পূর্ণ যৌবন কন্যার রূপের নাহি সীমা।
ঘরে অবিবাহিত কন্যা বড়ই মহিমা।।"১১

অবশেষে নারদের মধ্যস্থ্যতায় মুনি জরৎকারুর সঙ্গে শিব-পুত্রী মনসার বিবাহ স্থির হল। কিন্তু এক্ষেত্রেও লিঙ্গ-ভিত্তিক সমাজের তথা পুরুষতন্ত্রের স্বেচ্ছাচারিতা, পৌরুষের দম্ভ, অহং সম্পর্ক গড়ে ওঠার পূর্বেই ভাঙনের সূচনা করল। বিবাহের প্রথম রাতেই দেবী মনসা, স্বামীর মুখে প্রেমের বাণী নয় বরং শুনলেন নির্মম বাণী-

" তুমি করহ যদি মোর ইচ্ছা ভঙ্গ।
আমি যাইব তোমা পরিহরি সঙ্গ।।
মুনির ঘরণী হইল দুঃখ মাত্র ধন।
আহার পান নিদ্রা ভোগ কিছুতেই নাহি মন।।"১২

প্রসঙ্গত বলা বাহুল্য যে, জরৎকারু মুনির উক্তির মধ্যেই মধ্য -যুগীয় সমাজে নারীর প্রকৃত স্থানটি ঠিক কতখানি নিম্নে ছিল সে সত্যটি আরও একবার সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। জরৎকারু তাঁর নববিবাহিতা স্ত্রীকে রাত্রি শেষ হতে না হতেই গঙ্গা তীর থেকে পুস্পচয়ন করে আনার নির্দেশ দেন। মাতৃহীনা মনসা দেবী কখনও সংসারের নিয়ম-রীতি শিখে বড় হননি।

মহাদেব-কন্যা হিসাবে তিনি কিছুটা ক্ষমতারও অধিকারিণী। স্বামীর আদেশ শীরোধার্য করা তাঁর অভ্যাসে না থাকায় স্বামীর আদেশের গুরুত্ব বা নিজ দাম্পত্য রক্ষার দায়িত্ব সম্পর্কে উদাসীন ভাবেই তিনি জানিয়ে দিয়েছেন-

"কোপ করহ তাপ করহ যেবা মনে লয়।
কোন কালে হেন কৰ্ম্ম আমা হইতে নয়।।"১৩

স্ত্রী, স্বামীর বশ্যতা মানতে নারাজ হলে কোপাবিষ্ট জরৎকারু মুনি বলেন-

" মুই জরৎকারু মুনি নানা তপে বলী।
মোর আগে দেখাও তোর বাপের ঠাকুরালী।।"১৪

অপর দিকে দেবী মনসার শৈশব ও যৌবন অতিবাহিত হয়েছে কামতাড়িত পুরুষতান্ত্রিক সমাজে। এমন সমাজে মাতৃহীনা জারজ কন্যার সসম্মানে টিঁকে থাকার সংগ্রামটাও হয়ে ওঠে ভয়ঙ্কর। স্বভাবতই এইরূপ পরিস্থিতিতে নারী পুরুষ-সমাজের উপর বিতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে। পিতৃসম্বোধন সহকারে অপমান সহ্য করতে না পেরে দেবী মনসা তাঁর রুদ্রতেজে স্বামীকে অচেতন করে দিয়ে আপন স্বরূপ বুঝিয়ে দেন। পিতার আদেশে দেবী স্বামীকে পুনর্জ্জীবিত করেন। কিন্তু মুনি জরৎকারু স্পষ্ট ভাষায় জানালেন-

" পদ্মা হেন স্ত্রীতে মুনির নাহি কাম।"১৫

যদিও মুনি জরৎকারু, স্ত্রী মনসাকে এই পরিত্যাগের কারণ হিসাবে বলেছিলেন-

"মুনি বলেন তুমি মোর করিলা ইচ্ছা ভঙ্গ।
হের আমি চলি যাই তোমা পরিহরি সঙ্গ।।"১৬

তবু এই পরিত্যাগের পশ্চাতে আরও সুগভীর এক কারণ নিহিত ছিল। মহাদেবের সম্মুখে জরৎকারুর বচনে সে সত্য উদ্ঘাটিত হয়-

“তোমার তনয়া পদ্মা পূজে সর্ব্ব রাজ্যে।
পদ্মা হেন ঘরণী মুনিরে নাহি সাজে।।”১৭

বস্তুতপক্ষে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষতন্ত্র নির্ধারিত বাঁধা ছকের বাইরে যখনই নারী এককদম অগ্রসর হয়েছে তখনই সে বিবিধ মিথ্যা অপবাদের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েছে। বিজয় গুপ্তথেকে আশাপূর্ণা দেবীর লেখনীতে বারংবার যুগে যুগে এই একই সত্য উঠে এসেছে। বিশেষত মধ্যযুগীয় পুরুষতান্ত্রিক সমাজে স্ত্রী, স্বামীর থেকে কোনও গুণে মহৎ হলে তা পুরুষতান্ত্রিক অহংকে আহত করত। হয় তো বা এই প্রকার আহত অহংধ বশতই দেবী মনসাকে পরিত্যাগের পূর্বে তাঁকে সর্পজননী বা বিষকন্যা রূপে প্রতিষ্ঠা দিয়ে যান মুনি জরৎকারু। যুগে যুগে এই ভাবেই একাকিনী নারী শক্তি কখনও বিষকন্যা, কখনও ডাইনি অপবাদে অবরুদ্ধ হয়েছে পুরুষতন্ত্র দ্বারা।

পুরুষ প্রধান লিঙ্গ-বিভাজিত সমাজের চিত্র বারবার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে বিজয় গুপ্তের কাব্যে। মনসামঙ্গল কাব্যের প্রধান পুরুষ চরিত্র বণিক শ্রেষ্ঠ চাঁদ এবং সোনেকার দাম্পত্যেও একই চিত্র বর্তমান। পুরুষ-সিংহ চাঁদ –সদাগর মহাদেবের পরম ভক্ত। কট্টর শৈব ধর্মাবলম্বী চাঁদের আরাধ্য কেবল শিব-দুর্গা। স্ত্রী ‘মনসার’ পূজা করতে তিনি নারাজ। লক্ষণীয় নারী হয়েও ‘দুর্গা’ (চন্ডীকা) পূজা পাচ্ছেন কিন্তু মনসা পাচ্ছেন না। স্বভাবতই এক্ষেত্রে মনে হয় পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী পুরুষের সঙ্গিনী রুপেই আরাধ্যা। যখনই নারী এককভাবে আত্ম-প্রতিষ্ঠার দাবি তুলবে ঠিক তখনই সে পরিণত হবে বিষ কন্যায়।

দাম্পত্যেও স্ত্রীর ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ ছিল মূল্যহীন, বলা ভালো নারীর ইচ্ছা-অনিচ্ছা প্রকাশের কোনও অধিকারই ছিল না। নারী, পুরুষের মর্জি চালিত পুতুল বলেই বিবেচিত হত। বিজয় গুপ্তের লেখনী অনুসারে সোনেকা আবাল্য দেবী মনসার পরম ভক্ত। কিন্তু একাকিনী নারী-শক্তির প্রতিষ্ঠার ঘোর বিরোধী সোনেকার স্বামী চাঁদ সদাগর। তাই স্বামীকে গোপন করেই মনসার আরাধনা করেন সোনেকা। কিন্তু মধ্য যুগীয় সমাজের রীতি-

“যাদৃগ্ গুণেন ভর্ত্রা স্ত্রী সংযুজ্যেত যথাবিধি।
তাদৃগ্ গুণন যা ভবতি সমুদ্রেণেব নিম্নগা।।”১৮

যে সমাজে বিবাহিতা নারীর স্বতন্ত্র কোনো সত্ত্বার অস্তিত্বকেই স্বীকৃতি দেয় না সেই সমাজ নারীর স্বতন্ত্র ধর্মমতকে শ্রদ্ধা জানাবে তা অলীক কল্পনামাত্র। স্বভাবতই সোনেকার গোপনে মনসা পূজার সংবাদে ক্রুদ্ধ চাঁদ-

“ হেতালের বাড়ি দিয়া ঘট করে গুড়ি।।
... ...
সোনেকার ধেয়ে যায় মারে কিল লাথি।।”১৯

মধ্য যুগীয় লিঙ্গ ভিত্তিক সমাজে পুরুষতন্ত্রের স্বেচ্ছাচার এবং নারী নির্যাতনের এমন সুস্পষ্ট ছবিই ধরা পড়েছে কবি বিজয় গুপ্তের লেখনীতে ছয় পুত্রের জননী সোনেকা দাম্পত্যের অলিখিত শর্ত রূপেই পুরুষের অত্যাচার নীরব অশ্রুপাতে মেনে নিতে বাধ্য হলেও ক্রমে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে।

পুরুষের বেলাগাম লাম্পট্যের ফসল মাতৃহীনা জারজ কন্যা মনসা দেবী। কখন পিতৃসম পুরুষের কাম দৃষ্টির সম্মুখীন হয়ে, কখনও স্বামী-পরিত্যক্ত হয়ে নারীর প্রকৃত সামাজিক অবস্থানটি ঠিক কোথায় হতে পারে তা জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে অনুভব করেছিলেন দেবী মনসা। পুরুষ সমাজ তাঁকে প্রতিষ্ঠা দেবে না, এমন কি নারী সমাজে তাঁর প্রতিষ্ঠা দেবেনা, এমন কি নারী সমাজে তাঁর প্রতিষ্ঠাকেও বিনষ্ট করতে চায়। ঠিক এই সময়ই শুরু হয় একাকিনী নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই। চাঁদ মনসার দ্বন্দ্ব যতখানি দৈবশক্তি বনাম পুরুষকারের দ্বন্দ্ব তার থেকে অনেক বেশি পুরুষতান্ত্রিক সমাজ বনাম একাকিনী নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্ব। লক্ষণীয় এই দ্বন্দ্বে মহাতপা মুনি জরৎকারু স্বামী হয়ে দেবী মনসার সঙ্গ দেন নি, এমনকি দেবকন্যা হয়েও পিতা দেবাদিদেব মহাদেবের কাছ থেকেও কোনও সহায়তা পাননি।

পুরুষের বেলাগাম কাম - বাসনায় যাঁর জন্ম, আবার প্রথম যৌবনেই যে নারী পিতৃসম পুরুষের সেই কামলোলুপতার শিকার এমন মাতৃহীনা জারজ কন্যা জানেন যে মধ্যযুগীয় বহুগামী পুরুষ চরিত্রের প্রকৃত দুর্বলাটি কোথায়। আর জীবন থেকে অর্জিত এই বাস্তব জ্ঞানের দ্বারাই দেবী মনসা সুন্দরী নটীর ছদ্মবেশে পুরুষ শ্রেষ্ঠ চাঁদ বণিককে কামবিষ্ট করে তাঁর মহাজ্ঞান হরণ করলেন। শুরু হল নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য মহারণ।

সুদীর্ঘ কাল ব্যাপি পুরুষের স্বেচ্ছাচারিতায় পদদলিত হতে হতে হিতাহিত জ্ঞানশূন্যা নারী (দেবী মনসা) এখন উন্মাদিনী। পুরুষকে পরাস্ত করতে মনসা, চাঁদের ছয়পুত্রকে কেড়ে নিয়েছেন। পুরুষ প্রধান মধ্যযুগীয় সমাজে পুত্রশোকের থেকেও পুরুষের কাছে তার অহংই ছিল অধিক মূল্যবান। পুত্রহারা জননী যখন পুত্রশোকে পাগল, তখন স্বামী হিসাবে তার পাশে থেকে তাকে সান্ত্বনা দেবার বদলে চাঁদ, সোনেকাকে গর্জন করে বলেছেন-

“ আর যদি শুনি আমি পূজহ কাণীরে।
আর না থুইব প্রাণ তোমার শরীরে।।”২০

বস্তুত পক্ষে শোষিতের আপন শক্তি সম্পর্কে অজ্ঞতা বা আস্থা-হীনতাই শোষকের শক্তি-বৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সমাজে লিঙ্গভেদ প্রথাও এই প্রকার। প্রকৃতি, অঙ্গসংস্থানগত কিছু পার্থক্য ছাড়া নারী-পুরুষের মধ্যে বিশেষ কোনো ভিন্নতা সৃষ্টি করেনি। কিন্তু সুদীর্ঘ কাল যাবৎ ‘অবলা’ তকমার ছত্রছায়ায় বাঁচতে বাঁচতে এবং সমাজ ও সংসারে পুরুষের দাসীবৃত্তি করতে করতে নারীও তার আপন শক্তি সম্পর্কে আস্থাহীন হয়ে পড়েছিল।

কিন্তু শোষক-শোষিতের সম্পর্কের আরও একটি শাশ্বত সত্য এই যে শোষণ যখন মাত্রাহীন পর্যায়ে পৌঁছায় তখন শোষিত যদি কখনও বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ করে ঠিক তখনই শোষকের প্রকৃত দুর্বলতা প্রকাশ পায়। এমনটাই হয়েছিল চাদ-সোনেকার দাম্পত্যে। মধ্য যুগীয় সমাজের রীতি অনুসারেই স্ত্রী হিসাবে এতদিন যাবৎ সোনেকা তার স্বামীর সকল স্বেচ্ছাচারিতা, অন্যায় শাসন নীরবে সহ্য করলেও আজ পুত্রহারা জননী সোনেকা নির্ভীক কণ্ঠে বলেছে-

"তুমি হেন স্বামী যার সে বাঁচে সে বাঁচে কেনে।
গৃহবাসে কাজ নাই চলিলাম বনে।।"২১

লক্ষণীয় স্ত্রীর এই সামান্যতম প্রতিবাদেই চাঁদ সদাগর কিছুটা পশ্চাদ্ পদ হয়েছেন। ঘটনাক্রমে দেবী মনসার পরিকল্পনা দেবী মনসার পরিকল্পনা অনুসারেই চাঁদ-সোনেকা তাঁদের সপ্তম পুত্র লখীন্দরকে লাভ করেন।

একাকিনী নারী-শক্তি কীভাবে পুরুষের অহংকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে সক্ষম চাঁদ তা অনুভব করলেন তাঁর বানিজ্য যাত্রায়। কিন্তু সুদীর্ঘ কাল প্রভুত্ব করার অভ্যাসে পুরুষ-অহং ভাঙে তবু মোচকায় না। বণিক শ্রেষ্ঠ চাঁদ তাঁর সকল বাণিজ্য সম্ভারসহ বাণিজ্যতরী খুইয়ে নিঃস্ব, রিক্ত হয়ে গৃহে ফেরে এবং ফিরেই পুরুষের সন্দিহান মন বালক লখীন্দরকে দেখে আপন স্ত্রীর চরিত্রকে কলঙ্কিত বলে ভাবতে শুরু করে-

"চান্দ বলে প্রিয়া তুমি শুনহ বচন।
ভিন্ন পুরুষ কেন তোমার সদন।।"২২

অতঃপর লখীন্দরের প্রকৃত পরিচয় জেনে তাকে স্বীকৃতি দেন চাঁদ।

কবি বিজয় গুপ্তের কাব্যে বেহুলা-লখীন্দরের দাম্পত্যেও মধ্যযুগীয় লিঙ্গ বিভাজিত সমাজে পুরুষতন্ত্রের দাপটের চিত্রখানি বেশ সুস্পষ্ট। সর্বজন বিদিত বেহুলা-লখীন্দরের কাহিনি অনুসারে চাদ-মনসার দ্বন্দ্বের ফল স্বরূপ বিবাহ বাসরে সর্পাঘাতে লখীন্দরের মৃত্যু ছিল পূর্ব নির্ধারিত। যথারীতি লখীন্দরের মৃত্যু হলে সতী বেহুলা শ্বশুরের নিষেধ, আপন ভাইয়ের নিষেধ ইত্যাদি উপেক্ষা করে, স্বামীর পুনরুজ্জীবনের প্রত্যাশায় স্বামীর মৃত-দেহ নিয়ে পাড়ি দিয়েছে স্বর্গের পথে। পথে হাজারও পুরুষের লালসা, বিবিধ বিপদ ও দুঃখকে অতিক্রম করে, অমরাপুরীতে পৌঁছে, আপন নৃত্য-গীতে মহাদেবকে তুষ্ঠ করে। তার ছয় ভাশুরসহ চাদ-সদাগরের চৌদ্দ-ডিঙা পুনরুদ্ধার করেছে। এমন নারীকে যে মধ্যযুগীয় পুরুষতান্ত্রিক সমাজ 'সতী-লক্ষ্মী'র শীরোপা দেবে তা বলাই বাহুল্য। অথচ এখানেও 'কিন্তু'; -শাস্ত্র অনুসারে বলা হয়-

" নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ যজ্ঞো না ব্রত্যং নাপ্যুপোষণম্।
পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে"।।২৩

অর্থাৎ (পতির থেকে) স্বতন্ত্র ভাবে স্ত্রীলোকের যজ্ঞ, ব্রত বা উপবাস নেই। তিনি যে পতি সেবা করেন, তাতেই স্বর্গে পূজিতা হন। সমাজ তথা শাস্ত্রের এই বিধান অনুসারে

বেহুলার মাথায় 'সতীলক্ষ্মী'র শিরোপা ওঠা উচিত। কিন্তু সেই সমাজ বা শাস্ত্রেরই আর এক বিধান-

" বালয়া বা যুবত্যা বৃদ্ধয়া বাপি যোষিতা।
ন স্বতন্ত্রেণ কর্তব্যং কিঞ্চিৎ কার্য গৃহেষ্বপি।।"২৪

অর্থাৎ বাড়িতেও বালিকা, যুবতী বা বৃদ্ধা নারী স্বাধীন ভাবে কিছু করবে না। কিম্বা-

" বাল্যে পিতুর্বশে তিষ্ঠেৎ পানিগ্রাহস্য যৌবনে।
পুত্রাণাং ভর্তরি প্রেতে না ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাম্।।"২৫

অর্থাৎ, বাল্যকালে পিতার, যৌবনে পতির ও পতিমৃত হলে পুত্রদের অধীনে স্ত্রীলোক থাকবেন। স্ত্রীলোক কখনও স্বাধীন ভাবে থাকবেন না। শাস্ত্রের এই বিধান অনুসারে বিচার করলে বেহুলা এই বিধানকে লঙ্ঘন করে শ্বশুর, ভ্রাতা বা পরিজনদের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দিনের পর দিন (স্বামীর গলিত শবসহ) একাকিনী কাটিয়েছে। বেহুলার জীবনের এই দিনগুলিতে এসেছে বহুগামী পুরুষের লালসাময় প্রস্তাব। পুরুষশাসিত সমাজে পুরুষের বহুগামী হওয়ার অবাধ স্বাধীনতা থাকলেও নারীর জীবন কঠোর একমুখী অনুশাসনে ছিল আবদ্ধ।

যখন সমাজের দোহাই দিয়ে লখীন্দর, বেহুলার কাছে সতীত্বের পরীক্ষা চেয়ে বলে-

"সতী পতিব্রতা হউক ধর্ম্মেতে তৎপর।
স্বতন্তর হইলে নারী ফলে অঘান্তর।।
... ...
সঙ্গতি দোসর নাই পথে নানা ভয়।
এতেক পাষন্ড কোথা স্ত্রী ধর্ম্ম রয়।।
মন সুখে একেশ্বর ভ্রমে ছয় মাস।
হেন নারী ঘরে নিলে লোকে করিবে উপহাস।।"২৬

তখন মধ্যযুগীয় পুরুষ সমাজকে কেবল স্বার্থলোভী, সুযোগ-সন্ধানী, স্বেচ্ছাচারী বলেই মনে হয় না, বরং কৃতঘ্ন বলেও মনে হয়। এই কৃতঘ্নতার পরিচয় কেবল বেহুলার স্বামী লখীন্দরই একা নয়, শ্বশুর চাঁদ - সদাগরও দিয়েছেন। যে নারী শক্তির জন্য পুরুষ শ্রেষ্ঠ চাঁদ তাঁর মৃত সাত পুত্রসহ ফিরে পেলেন তাঁর নিমজ্জিত বাণিজ্যতরী, সেই পুত্রবধূকেই তিনি সতীত্বের পরীক্ষা দিতে বলেন।

বস্তুতপক্ষে পুরুষ যখনই স্ত্রীশক্তির কাছে পরাজিত হয়েছে কিম্বা আপন বাহুবলের বদলে নারী শক্তির সহায়তায় সে কিছু অর্জন করেছে এক কথায় যখনই নারী শক্তিকে পুরুষ পদানত রাখতে ব্যর্থ হয়েছে ঠিক তখনই সে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে, পাছে নারী তার দাসীবৃত্তি ছেড়ে তার যোগ্য সম্মান দাবি করে আর সমাজে পুরুষ শাসনের যদি অবসান ঘটে। তাই কখনও নারীকে মিথ্যা অপবাদে কলঙ্কিত করে, কখনও তাকে সতীত্বের পরীক্ষার ভয় দেখিয়ে পদানত করে রাখতে চেয়েছে।

পুরুষ চরিত্রের লাম্পট্য কতখানি বেআব্রু স্তরে পৌঁছালে নারীর অসহায় অবস্থার সুযোগ সে গ্রহণ করতে চায়। তৎকালীন পুরুষ সমাজ যে give and take নীতিতে বিশ্বাসী ছিল তা বিজয় গুপ্তের বর্ণনায় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন বেহুলা তার মৃত স্বামীর পুনরুজ্জীবনের প্রার্থনা নিয়ে মহাদেবকে নৃত্য-গীতে তুষ্ট করার প্রচেষ্টা করছে, তখন একজন সদ্য স্বামীহারা নারীর সকরুণ আর্তির চেয়ে পুরুষের দৃষ্টিতে বড় হয়ে উঠেছে সেই সদ্য বিধবা নারীর প্রতি যৌবন লালসা। স্বয়ং মহাদেব কামাবিষ্ট হয়ে বলেছেন-

" যৌবন দান কর মোরে ভজ মোর ঠাঁই।।"২৭

নারী এরূপ পরিস্থিতিকে আপন ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিবলে কৌশলে এড়িয়ে গেছে-

" যে জনে সংসার করে, সে কি পর নারী হরে,
তুমি শিব সংসারের সার।।" ২৮

কবি বিজয় গুপ্ত তাঁর কাব্যে আর এক সামাজিক সত্য চিত্র অঙ্কন করেছেন- শোষিতের যূথবদ্ধতা শোষককে পশ্চাৎপদ হতে বাধ্য করে। লক্ষণীয় কাব্যের শেষাংশ- অমরাপুরীর নৃত্য-সভায় একদিকে দেবী চন্ডীকা স্বামীর চারিত্রিক ত্রুটিগুলি নির্দেশ ও সংশোধনের চেষ্টা করছেন। দেবী মনসা আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ আর বেহুলার প্রাণপণ প্রয়াস – নারী শক্তির এই ত্রিবেনী সংযোগে পুরুষ শত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আপন স্বেচ্ছাচারিতার মুখে লাগাম টেনে একাকিনী নারীকে প্রতিষ্ঠা দিতে বাধ্য হয়েছেন। তাই তো পুত্রবধূর সকরুন আর্তি উপেক্ষা করতে না পেরে চাঁদ-সদাগর অবশেষে মনসা পূজায় ব্রতী হয়েছেন।

আলোচনার অন্তিম লগ্নে পৌঁছে বলা যেতে পারে যে, পঞ্চদশ শতাব্দীর পুরুষ-শাসিত মধ্যযুগীয় সমাজেও দৈববাদের ছত্রছায়ায় কবি বিজয় গুপ্তের লেখনী অপূর্ব কৌশলে নারী স্বাধীনতা আন্দোলনের ফল্গু স্রোত প্রবাহিত করেছিলেন।

তথ্যসূত্র:

১. 'চাঁদসদাগর'; কালিদাস রায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা; (সম্পাদকীয়- গোরাসিংহরায়, ভারবি, কলকাতা; পৃষ্ঠা- ১০১।
২. 'পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল'; বিজয় গুপ্ত (সংকলক- বসন্ত কুমার ভট্টাচার্য), কলকাতা, পৃষ্ঠা- ৮।
৩. তদেব; পৃষ্ঠা-৯
৪. তদেব; পৃষ্ঠা-১০
৫. তদেব; পৃষ্ঠা-১২
৬. তদেব; পৃষ্ঠা-১৩
৭. তদেব; পৃষ্ঠা-১৩
৮. তদেব; পৃষ্ঠা-১৪
৯. মনুসংহিতা এবং নারী; কঙ্কর সিংহ, র‍্যাডিক্যাল, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৫১

১০. তদেব; পৃষ্ঠা-৩৮
১১. ‘পদ্মাপুরাণ’ বা মনসামঙ্গল; বিজয় গুপ্ত, পৃষ্ঠা- ২২৬
১২. তদেব; পৃষ্ঠা-২৭
১৩. তদেব; পৃষ্ঠা-২৭
১৪. তদেব; পৃষ্ঠা-২৭
১৫. তদেব; পৃষ্ঠা-২৯
১৬. তদেব; পৃষ্ঠা-২৯
১৭. তদেব; পৃষ্ঠা-২৯
১৮. মনুসংহিতা এবং নারী; কঙ্কর সিংহ, র‍্যাডিক্যাল, কলকাতা- পৃষ্ঠা-৫১।
১৯. ‘পদ্মাপুরাণ’ বা মনসামঙ্গল; বিজয় গুপ্ত, পৃষ্ঠা-৬৪
২০. তদেব; পৃষ্ঠা-১০১
২১. তদেব; পৃষ্ঠা-১০১
২২. তদেব; পৃষ্ঠা-১৬০
২৩. মনুসংহিতা এবং নারী; কঙ্কর সিংহ, পৃষ্ঠা-৩৭
২৪. তদেব; পৃষ্ঠা-৩৬
২৫. তদেব; পৃষ্ঠা-৩৬
২৬. ‘পদ্মাপুরাণ’ বা মনসামঙ্গল; বিজয় গুপ্ত, পৃষ্ঠা-২৪০
২৭. তদেব; পৃষ্ঠা-২২৬
২৮. তদেব; পৃষ্ঠা-২২৬

সহায়ক গ্রন্থ :

১. আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস।
২. আহমেদ শরীক; মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ।
৩. জহর সেন মজুমদার; মধ্যযুগের কাব্য; স্বর ও সংকট।
৪. শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে নারী চরিত্র।
৫. সুপর্ণা লাহিড়ী বড়ুয়া, নারীর পৃথিবী নারীর সংগ্রাম।
৬. বিজয় গুপ্ত; পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল।
৭. কঙ্কর সিংহ, মনুসংহিতা এবং নারী।

রবীন্দ্রনাথের ঔপনিষদিক চেতনা,ধর্ম ও জীবনদর্শন

দোলা রায়
গবেষক, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনদর্শন' বা 'Philosophy Of Life' এবং তাঁর 'বিশ্বদৃষ্টি' বা 'World View' অর্জন করেন পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে। রবীন্দ্রনাথের ধর্মভাবনাও প্রাথমিক ভাবে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঔপনিষদিক ধর্মচেতনার উপর প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের বাণীকে আত্মীকরণ করে তা রবীন্দ্রায়িত করেছেন। আসলে ঊনিশ শতকের ভারতবর্ষের রাজনৈতিক,সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণে সহায়তা করেছিল। রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের মধ্যে উপনিষদের ব্রহ্মবাদের মতোই দর্শনশাস্ত্রের যুক্তিবাদ,জীবন শিল্পীর কর্মবাদ,বৈষ্ণবের ভক্তিভাব,মানবতাবাদী গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মদর্শনের প্রভাব খুঁজে পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে উপনিষদের পরিচয় ঘটে সেই বাল্যকাল থেকেই। রবীন্দ্রনাথের কথায় -"বাল্যে উপনিষদের অনেক অংশ বার বার আবৃত্তি দ্বারা আমার কণ্ঠস্থ ছিল। সবকিছু গ্রহণ করতে পারিনি সকল মন দিয়ে। শ্রদ্ধা ছিল,শক্তি ছিল না হয়ত।"(১)রবীন্দ্রনাথের উপর উপনিষদের প্রভাব সম্পর্কে বলতে গিয়ে শ্রীশশীভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় বলেছেন-"রবীন্দ্রনাথের উপরে উপনিষদের প্রভাব সর্বজনবিদিত। এ সত্য স্বতঃপ্রকাশ,কোনো প্রমান প্রয়োগের অপেক্ষা রাখে না। একেবারে প্রথম যুগের কাব্য-কবিতা-সংগীত ও গদ্যরচনা হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বের লেখা পর্যন্ত সব লেখার মধ্যেই এই সত্যের পরিচয় আছে। কোথাও একটু গূঢ়,কোথাও ঈষৎ রূপান্তরিত,কোথাও একেবারে স্পষ্ট।"(২)

অধ্যাত্মবাদী পিতা দেবেন্দ্রনাথের প্রভাবে অল্প বয়সেই এক অস্পষ্ট অতীন্দ্রিয় জগতের সন্ধান পান রবীন্দ্রনাথ। কবে এবং কিভাবে তার মধ্যে এই ধর্মসাধনার উন্মেষ ঘটে সেকথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-"উপনয়নের সময় গায়ত্রীমন্ত্র দেয়া হয়েছিল। কেবলমাত্র মুখস্ত ভাবে না। বারংবার সুস্পষ্ট উচ্চারণ করে আবৃত্তি করেছি এবং পিতার কাছে গায়ত্রী মন্ত্রের ধ্যানের অর্থ পেয়েছি। তখন আমার বয়স বারো বৎসর হবে। এই মন্ত্র চিন্তা করতে করতে মনে হত,বিশ্বভুবনের অস্তিত্ব আর আমার অস্তিত্ব একাত্মক। ভূভুর্বঃস্বঃ -এই ভূলোক,অন্তরীক্ষ,আমি তারই সঙ্গে অখন্ড। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদি-অন্ত যিনি আছেন তিনিই আমাদের মনে চৈতন্য প্রেরণ করেছেন। চৈতন্য ও বিশ্ব বাহিরে ও অন্তরে সৃষ্টির এই দুই ধারা;একধারায় মিলছে। এমনি করে ধ্যানের দ্বারা যাকে উপলব্ধি করেছি,তিনি বিশ্বাত্মাকে আমার আত্মাতে চৈতন্যের যোগে যুক্ত। এইরকম চিন্তার আনন্দে আমার মনের মধ্যে একটা জ্যোতি এনে দিলে। এ

আমার সুস্পষ্ট মনে আছে।"(৩)বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে জীবনে প্রথমবার একাত্ম হয়ে কবি হৃদয়ের মধ্যে যে আবিষ্টতা অনুভব করেছিলেন,তাকেই রবীন্দ্রনাথ আধ্যাত্মিকতা বলে নাম দিয়েছেন। কবির মতে কবির এই আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা ফুটে উঠেছিল নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ কবিতায়। জগৎ ব্যাপি সৌন্দর্যের প্রকাশ ও মানবের বিচিত্র লীলা কবি সেদিন অন্তরে উপলব্ধি করেছিলেন। কবির এই আত্মদর্শন কিংবা বিশ্বের আনন্দ রূপকে দেখা কবির ঔপনিষদীয় বিশ্বাস থেকে উৎসারিত।

দেবেন্দ্রনাথ শঙ্করাচার্যের "ব্রহ্ম সত্য,জগৎ মিথ্যা" এই উপনিষদীয় দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন। উপনিষদের দীক্ষায় ও বিজ্ঞানের শিক্ষায় প্রাণিত রবীন্দ্রনাথ,'জগৎ মিথ্য' একথা মেনে নিতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের বাণী নতুনভাবে উপস্থাপনা করলেন। উপনিষদে বলা হয় ব্রহ্ম 'রসস্বরূপ'। রবীন্দ্রনাথ বললেন এই আনন্দ রসই অমৃত,জগতকে ত্যাগ করার অর্থ হবে সেই অমৃতকে ত্যাগ করা। রবীন্দ্রনাথ দীপ্ত কণ্ঠে দাবি করলেন পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করে জগতকে মিথ্যা বলে ত্যাগ করলে এই মহাবিশ্বের অন্তরসত্যকেই ত্যাগ করা হয়। তাঁর কথায়-

"ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন,সে নহে আমার।
যে-কিছু আনন্দ আছে দৃষ্টি গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।”(৪)

অনেকেই মনে করেন রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনদর্শন উপনিষদের উপর প্রতিষ্ঠিত। আসলে রবীন্দ্রনাথ সারা জীবনভর উপনিষদ থেকে ঋদ্ধ হয়েছেন,কিন্তু তা তাঁর মতো করে। 'পরমহংসের' মতোই তিনি উপনিষদের 'দুধটুকু খেয়ে জল টুকু ফেলে রেখেছেন'। রবীন্দ্রনাথের উপর উপনিষদের প্রভাব নিয়ে বলতে গিয়ে মণি ভৌমিক যথার্থই বলেছেন- "তিনি উপনিষদের সঠিক ব্যাখ্যা করে বারবার অনেকভাবে বললেন,ভারতবর্ষ আমাদের শেখায় না এ জগৎ কে মায়া ও মিথ্যা বলে পরিত্যাগ করতে। তিনি বললেন না,জগতের বন্ধন শুধুমাত্র মিথ্যা মায়ার বন্ধন। তিনি ঘোষণা করলেন প্রাচীন ঋষির অন্তরের গভীর বার্তা আধুনিক ভাষায়: “অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় / লভিব মুক্তির স্বাদ!” রবীন্দ্রনাথই প্রথম যিনি আমাদের শেখালেন জগতের অজস্র বন্ধনকে ত্যাগ না করে মেনে নেওয়ার মন্ত্র। শুধু ত্যাগ-ত্যাগ-ত্যাগের মধ্যেও পাওয়া যায় না মুক্তির উচ্ছ্বাস। সেই মুক্তি মহানন্দময়,বললেন রবীন্দ্রনাথ।"(৫)

আলোকের সন্তান,অমৃতের সন্তান রবীন্দ্রনাথ। সমগ্র জগৎ ব্যাপী তিনি উপলব্ধি করেছেন বিশ্বদেবতার উপস্থিতি। বিশ্বদেবতার অপার রহস্য অন্তরে অনুভব করেও রবীন্দ্রনাথ তৃপ্ত হতে পারেননি। যার অনুভবই এতো আনন্দের এত শান্তির তাকে প্রীতির সম্বন্ধে পেতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বিশ্বদেবতাকে জানার এই তীব্র আকুতির ফলেই রবীন্দ্রনাথ খুঁজে পেলেন তাঁর চিরআকাঙ্ক্ষিত "জীবনদেবতা" কে।

"জীবনদেবতা" সম্পর্কে বলতে গিয়ে মোহিতচন্দ্র সেনকে (৫ ফাগুন,১৩০৯) কবি লিখেছেন-"আমার নিগূঢ়তার মধ্যে যে একটি বৃহৎ অতি পুরাতন 'আমি' আছে -যে বিশেষ রূপে আমার জীবনের দেবতা-যাহার গভীর গোপন আবির্ভাবের দ্বারাই আমি বিশেষভাবে দেবতাত্মা-যে অতিজগতে বাস করিয়া আমাকে জগতে সঞ্চালন করিতেছে,নানা সুখদুঃখ অনুকূলতা- প্রতিকূলতার ভিতর আমাকে সার্থক করিয়া সার্থকতা লাভ করিবার জন্য যাহার অহরহ চেষ্টা -যে আমার মধ্যে কখনো বিফল কখনো সফল হইয়াও এক মুহূর্ত আমাকে পরিত্যাগ করিতেছে না,যাহার মধ্যস্থতায় ঈশ্বরের সহিত আমার যোগ-তাহার সহিত প্রেমের আনন্দে যুক্ত হইয়া পরস্পরকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারিলে তবেই অতিজগতের সহিত জগতের নিত্য প্রেমের সম্বন্ধ আপনার মধ্যেই বুঝিতে পারিব।"(৬)তিনি আরো বলেছেন-"সে আছে,সে আমাকে ভালোবাসে,তার ভালবাসার দ্বারাই ঈশ্বরের ভালোবাসা আমি লাভ করিতেছি। জগতে যেমন পিতাকে মাতাকে বন্ধুকে প্রিয়াকে পাইয়াছি-তাহারা যেমন জগতের দিক হইতে ঈশ্বরের দিকে আমাকে কল্যান সূত্রে বাঁধিতেছে তেমনি আমার জীবনের দেবতা আমার অতিজগতের সহচর একটি অপূর্ব নিত্য প্রেমের সূত্রে ঈশ্বরের সহিত আমার একটি পরম রহস্যময় আধ্যাত্মিক মিলনের সেতু রচনা করিতেছে।"(৭)

ভক্ত ও জীবনদেবতার মধ্যে এই লীলার প্রকৃতির দুটি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমত ভক্তের জীবনকে অবলম্বন করে উভয়ের পরস্পরের সহযোগিতায় জীবনদেবতার ইচ্ছাটি ভক্তের কাজের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হচ্ছে। দ্বিতীয়ত ভক্তের সহযোগিতা করা তার নিজের ইচ্ছাধীন। সুতরাং এই লীলা সাম্যের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত এবং উভয়ের প্রয়োজনেই এই সহযোগিতা। তাই রবীন্দ্রনাথের এই পরিকল্পনায় একটি দৃপ্ত ভাব ফুটে উঠেছে। ভক্ত অবজ্ঞার নয়,প্রীতির প্রকাশের জন্য ঈশ্বরের ও ভক্তকে প্রয়োজন আছে।সেই দৃপ্ত ভাব ভক্ত রবীন্দ্রনাথের লেখায় এসেছে বারবার-

"তাই তোমার আনন্দ আমার পর
তুমি তাই এসেছো নিচে-
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর,
তোমার প্রেম হত যে মিছে"।(৮)

এই সীমার মাঝে অসীমের লীলার মধুর প্রকাশকে রবীন্দ্রনাথ ভক্ত ও ভগবানের মধুর সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে দেখেছেন। ভক্তের জীবনের কর্মধারার মধ্যে দেবতারই ইচ্ছা তরঙ্গিত হচ্ছে।রবীন্দ্রনাথের ভাষায়-

"আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা,
আমার হিয়ায় চলছে রসের খেলা,
মোর জীবনে বিচিত্র রূপ ধরে
তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে"।(৯)

নিজের হৃদয়ে জীবনদেবতার অস্তিত্ব অনুভব করলেও কবি তাঁকে ধরতে,ছুঁতে বা সেবা করতে,কিছুই পারেন না। এক চরম অতৃপ্তি থেকেই জীবনের অন্তিম পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ মানুষের মধ্যে বিশ্বসত্তার স্বরূপকে খুঁজতে ও তাকে অনুভব করতে শুরু করেন। মানুষের মধ্যেই তিনি দেখেছিলেন ঈশ্বরের প্রকাশ। "মানুষের আপন সত্তার মধ্যেই বিশ্ব সত্তার প্রকাশ দেখেছেন তিনি। আর এই বিশ্বসত্তা বা ভাগবতসত্তাকে মানুষের অন্তরে উপলব্ধি করে "মানুষের ধর্ম্ম"গ্রন্থে তার নাম দিয়েছেন 'মানবব্রহ্ম'।"(১০) তাইতো মানব প্রেমমূলক ও ভক্তিমূলক উদার বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্ব হয়ে দাঁড়ায় রবীন্দ্রনাথের একটি আগ্রহের বিষয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-"মাতা যেমন একমাত্র মাতৃসম্বন্ধেই শিশুর সর্বপ্রেক্ষা নিকট, সর্বপ্রেক্ষা প্রত্যক্ষ,সংসারের সহিত তাঁহার অন্যান্য বিচিত্র সম্বন্ধ শিশুর নিকট অগোচর ও অব্যবহার্য। তেমনি ব্রহ্ম মানুষের নিকট একমাত্র মনুষ্যত্বের মধ্যেই সর্বাপেক্ষা সত্যরূপে, প্রত্যক্ষরূপে বিরাজমান-এই সম্বন্ধের মধ্য দিয়াই আমরা তাঁহাকে প্রীতি করি,তাঁহাকে কর্ম করি।"(১১)

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ধর্মমত সম্পর্কে বলেছেন- "সকল মানুষেরই "আমার ধর্ম "বলে একটা বিশেষ জিনিস আছে। কিন্তু সেইটিকেই সে স্পষ্ট করে জানেনা। সে জানে আমি খ্রীস্টান, আমি মুসলমান,আমি বৈষ্ণব,আমি শাক্ত ইত্যাদি।কিন্তু সে নিজেকে যে-ধর্মাবলম্বী বলে জন্মকাল থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত নিশ্চিত আছে সে হয়তো সত্য তা নয়। নাম গ্রহণেই এমন একটা আড়াল তৈরি করে দেয় যাতে নিজের ভিতরকার ধর্মটা তার নিজের চোখেও পড়ে না। কোন ধর্মটি তার?যে-ধর্ম মনের ভিতরে গোপনে থেকে তাকে সৃষ্টি করে তুলছে। মানুষের আর একটি প্রাণ আছে সেটা শরীরপ্রানের চেয়ে বড়ো-সেইটে তার মনুষ্যত্ব। এই প্রাণের ভিতরকার সৃজনী-শক্তিই হচ্ছে তার ধর্ম।"(১২)

রবীন্দ্রনাথের জীবন দর্শনে ধর্মের যে স্থান তাতে সাম্প্রদায়িক ভেদের একেবারেই স্থান নেই,তা সর্বজনীন। তাঁর মতে ধর্ম আসলে একটাই,তা মানবধর্ম। রবীন্দ্র জীবনদর্শন অনুযায়ী অহিংসা,জ্ঞান,করুণা,প্রেম,ত্যাগ,কর্ম, বিশ্বমৈত্রী,ঐক্য,সংহতি এবং সর্বমানবের সমতার মধ্যে দিয়েই মানুষের সার্বিক কল্যাণ সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ মানুষের মাঝে ঈশ্বরের সাধনা করেছেন। অবশেষে মানুষের মাঝে দেবতাকে খুঁজে পেয়েছেন তিনি। তাঁর কথায়-"আমার মন যে সাধনাকে স্বীকার করে তার কথাটা হচ্ছে এই যে,আপনাকে ত্যাগ না করে আপনার মধ্যেই সেই মহান পুরুষকে উপলব্ধি করবার ক্ষেত্র আছে,- তিনি নিখিল মানবের আত্মা।"(১৩)

রবীন্দ্রনাথ আমৃত্যু এই নিখিল মানবের আত্মাকে উপলব্ধি করার সাধনা করে গেছেন। 'চিত্রার' 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় শ্রেয়োবোধের উদ্দীপনকারী এই মহত্তর সত্তার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

"কে সে ? জানি না কে?চিনি নাই তারে
শুধু এইটুকু জানি -তারই লাগি রাত্রি অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে
ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তরপ্রদীপখানি।"(১৪)

রবীন্দ্রনাথের ধর্ম প্রথাগত কোনো ধর্ম নয়,তা তাঁর নিজের উদ্ভাবিত ধর্ম। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের ধর্ম সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন-"ধর্মজ্ঞান ভাষাজ্ঞানের ন্যায় মানুষ শিশুকাল হইতে কখন ও কিভাবে যে আয়ত্ত করে,তাহার ইতিহাস বলা কঠিন; রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য যাঁহারা গভীরভাবে অধ্যয়ন ও তাঁহার সংগীত স্তব্ধভাবে শ্রবণ করিবার অবকাশ পাইয়াছেন,তাঁহারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন যে,ঈশ্বরবিশ্বাস কবির আশৈশবের সংস্কার। তবে তিনি ঈশ্বরকে যেভাবে কল্পনা করিতেন,তাহা যে কেবল লৌকিক হিন্দুধর্ম হইতে পৃথক তাহা নহে তাহা ব্রাহ্মধর্মানুমোদিত ব্রহ্মজ্ঞান হইতেও অন্যরূপ।তাঁহার ধর্ম তাঁহার নিজেরই।"(১৫)

রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনে ধর্ম ও সত্য অভিন্ন। যে মানুষ সত্যিকারের ধর্মের সাধনা করে সে সত্যেরই সাধনা করে আবার যে সত্যের সাধনা করে সে ধর্ম পালনই করে। তাঁর জীবনদর্শন শুধু উপনিষদের শিক্ষা বা গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন নয়, বাংলার লোকসংস্কৃতি ও লোকায়ত দর্শনের প্রভাব ও তাঁর উপর গভীর ভাবে পড়েছিল।

জন্মসূত্রে একজন ব্রাহ্ম হিসাবে তিনি পিতার মতোই হিন্দু ধর্মের অবতারবাদ ও মূর্তি পুজায় বিশ্বাসী ছিলেন না। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ অদ্বৈত্যবাদের যে ব্যাখ্যা দিতেন তাতে রবীন্দ্রনাথ সন্তুষ্ট হতে পারেননি। "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা" এ কথার সাথে রবীন্দ্রনাথ একমত ছিলেন না। শুধু ত্যাগের মাধ্যমে মোক্ষলাভ সম্ভব-তাও তিনি বিশ্বাস করতেন না।রামানুজের বিশিষ্টা দ্বৈত মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।যদিও বৌদ্ধধর্মের প্রতীত্যাসম্যুৎপাত এবং ক্ষনিকত্ববাদে তাঁর আস্থা ছিল না। বৌদ্ধধর্মের ভ্রাতৃত্ববোধ,অহিংসা,করুণা, আনন্দ প্রভৃতি বিষয়ে বৌদ্ধ ধর্মে বুদ্ধের বাণীকে রবীন্দ্রনাথ গ্রহণীয় মনে করতেন। ইসলামী সুফিবাদ ছিল তাঁর একটি অত্যন্ত প্রিয় বিষয়।তিনি মরমী ও মানবতাবাদী ছিলেন বলেই বাংলার বাউল ও গ্রামীণ মরমী লোকজ শিল্পী লালন ফকির, হাসন রাজাকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করে তাদের সম্মান দিয়েছেন দেশে বিদেশে। বাউলদের মতো তিনিও মনের মানুষের সন্ধান করেছেন আজীবন। যদিও গুরুবাদে বিশ্বাস করতেন না বলে তিনি কারোকেই তাঁর আধ্যাত্মিক সাধন গুরু বলে মনে করতেন না।

রবীন্দ্রনাথ কোন একাডেমিক দার্শনিক নন। কিন্তু মানবজীবন,সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর যে নিজস্ব সুচিন্তিত,দূরদৃষ্টি সম্পন্ন গভীর চিন্তা ও মতামত,তাকেই আমরা বলব রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক চিন্তাধারা। রবীন্দ্রনাথের মানবিক দার্শনিক চিন্তাধারায় জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষ ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে

উপকৃত হয়েছে। আজও হয়ে চলেছে।যতদিন বাঙালি সমাজ ও বাঙালি সাহিত্য থাকবে,ততদিন বাঙালি সমাজ ও বাংলা সাহিত্য লাভবান হবে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে।

তথ্যসূত্র

১. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, মানুষের ধর্ম্ম-মানব সত্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,১৯৩৩, পৃষ্ঠা-১০১-১০২
২. দাশগুপ্ত শ্রীশশীভূষণ, উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রমানস,এ.মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লি,পৃষ্ঠা -১
৩. মকসুদ সৈয়দ আবুল, রবীন্দ্রনাথের ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন,প্রথমা প্রকাশন,পৃষ্ঠা-১২২
৪. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, সঞ্চয়িতা-নৈবেদ্য-মুক্তি, বিশ্বভারতী,পৃষ্ঠা-৪৩৭
৫. মণি ভৌমিক, অনুলিখন-রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়,ব্রক্ষ সত্য জগত সত্য-উপনিষদ বিজ্ঞান রবীন্দ্রনাথ, আনন্দ প্রকাশন, পৃষ্ঠা-৬২
৬. মুখোপাধ্যায় প্রভাত কুমার, রবীন্দ্রজীবনী দ্বিতীয় খন্ড,বিশ্বভারতী,পৃষ্ঠা-৯৮-৯৯
৭. তদেব
৮. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী,২য় খণ্ড,গীতাঞ্জলি,১২১ নং কবিতা,পৃষ্ঠা-২৬৭,পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত
৯. তদেব
১০. মজুমদার পম্পা, রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস ,জিজ্ঞাসা ,পৃষ্ঠা-৩৯৪
১১. হিরণ্ময় বন্দোপাধ্যায়, উপনিষদও রবীন্দ্রনাথ,নবপত্র প্রকাশন,পৃষ্ঠা-৩২
১২. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, আত্মপরিচয়, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় পাতা-৩৯
১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,মানুষের ধর্ম্ম -মানবসত্য,কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,১৯৩৩ ,পৃষ্ঠা-১১৮
১৪. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, চিত্রা,এবার ফিরাও মোরে',পৃষ্ঠা-১৭-২৪,কলিকাতা আদি ব্রাহ্ম সমাজযন্ত্রে কালিদাস চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত,ফাল্গুন ১৩০২
১৫. মুখোপাধ্যায় প্রভাত কুমার, রবীন্দ্রজীবনী দ্বিতীয় খণ্ড,বিশ্বভারতী ,পৃষ্ঠা-২৪২

ইতিহাস, মিথ ও বাস্তবতার সংলাপ : কয়েকটি আখ্যানের তুলনামূলক পাঠ

প্রবুদ্ধ ঘোষ
গবেষক
তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ
এই প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয়- ইতিহাসের সঙ্গে উপন্যাসের মেলবন্ধন কীভাবে ঘটে আখ্যানের কাল্পনিকতায়। ইতিহাসের ঘটনাবলী, মিথ ও বাস্তবতার মিথস্ক্রিয়া কীভাবে আখ্যানকে রাজনৈতিক প্রতিস্পর্ধী ক'রে তোলে।

'রহু চণ্ডালের হাড়' উপন্যাসের আখ্যানভিত্তি প্রায় দেড় শতক ধরে বিস্তৃত বাজিকর সম্প্রদায়ের ঘর-খোঁজার কাহিনী। আর, এই দেড়শো বছর ধরে তাদের যাত্রাপথে, তাদের অভিযোজনে ও তাদের আদানপ্রদানের স্বরে ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনাক্রম প্রতিফলিত হয়। সমাজের ক্ষমতাশালীদের সঙ্গে সংঘাতের পাশাপাশি ক্ষমতাহীন নিম্নবর্গের সঙ্গে বন্ধুতা-শত্রুতার সম্পর্কও তৈরি হয়- তাদের মুখফেরতা কাহিনী এবং প্রজন্মান্তরের বহমান বিশ্বাস-লৌকিকতা উপন্যাসের আঙ্গিক এবং বিষয়বস্তুর প্রথাগত কৌশলে বদল ঘটায়। শিক্ষিত-মধ্যবিত্ত-ভদ্রলোকের দৃষ্টিভঙ্গির পরিসর প্রত্যাখ্যান ক'রে আর্থ-সামাজিক সংস্কৃতির 'অপর'-এর চোখে অন্য 'অপর'-এর প্রতিরূপ দেখা যায়। মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাসগুলি বাবু ও উচ্চবর্গের বয়ানে লিখিত আধুনিকতার চেনা পরিসরগুলি প্রত্যাখ্যান করতে থাকে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'খোয়াবনামা' উপন্যাসে মিথ ও ইতিহাস একে অপরের পরিপূরক হয়ে ওঠে এবং শোষকের সঙ্গে শোষিতের বিরোধাভাস তৈরি হয় লিখিত আখ্যান ও মুখফেরতা আখ্যানের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কে।

ইতিহাস ও সাহিত্যের ভেদরেখা কী? ইতিহাস'নির্মাণে'র ধারণা কি আখ্যাননির্মাণের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ? মিথ্ ও মুখফেরতা কাহিনীর প্রতিরোধ ক্ষমতা কীভাবে শাসককথিত ইতিহাসের বয়ানকে এবং পূর্ববর্তী রাজনৈতিক উপন্যাসের বয়ানের বিরুদ্ধস্বর হয়ে উঠতে পারে? প্রচলিত ইতিহাসকথন আর শাসকের বয়ানকে প্রতিস্পর্ধা জানাতে নিম্নবর্গের বয়ানকে প্রাধান্য দিয়ে আখ্যাননির্মাণ কীভাবে করছেন ঔপন্যাসিকেরা? এগুলিই খুঁজে দেখার প্রয়াস এই নিবন্ধে।

সূচক শব্দ: মিথ, লোককথা, রাজনৈতিক আখ্যান, নিম্নবর্গ, অভিজিৎ সেন, মহাশ্বেতা দেবী, শ্রেণি, ইতিহাস, অন্তর্ঘাত

ইতিহাসের তথ্যাদি ও বাস্তবতার বাইরে উপন্যাসের আখ্যানে কুশীলবেদের যাপনে ঘিরে থাকে মিথ্। আখ্যান যেকোনও ইতিহাস-বয়ানের ঠিক-ভুল থেকে স্বতন্ত্র হয়ে যায় এখানেই, দেশজ বয়ান প্রাধান্য পায়। কোনও কুশীলবের চেতনালব্ধ উচ্চারণ থেকে মুখফেরতা কাহিনির বিশ্বাসে পরিণত হওয়ার যে আখ্যান, এতে ইউরোপীয় 'নভেল মডেল' নেই। আধুনিকতার যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানভিত্তিও নেই। 'রহু চণ্ডালের হাড় (১৯৮৫)' উপন্যাসে বাজিকর-কন্যা সালমার "হাজার হাজার নাগনাগিনী উড়ে আসছে। তাদের নিশ্বাসে বিষ। সেই বিষ-নিশ্বাসে সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে যাবে"[i] উচ্চারণে রাজমহল-ভাগলপুর অঞ্চলের নিম্নবর্গীয় মানুষের মনে বিশ্বাস প্রোথিত হয়। তার কাছে চিরযুবা হওয়ার জড়িবুটির আশায় হত্যে দিয়ে পড়ে থাকে বিত্তবান দয়ারাম ভকত। বাজিকরদের 'লাগ ভেল্কি লাগ্, চোখে মুখে লাগ, হামাক্ ছাড়ি সব্বাইকে লাগ্' উচ্চারণ দশকের পর দশক ধরে দর্শককে সম্মোহিত করে, তারা বিশ্বাস করে অলৌকিককে। কিন্তু, পাশ্চাত্য আর্থ-সামাজিক ভিত্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত 'নভেল'-র কাঠামো দিয়ে উপনিবেশের 'অপর'-এর মধ্যেও 'অপর' হয়ে থাকা মানুষদের আখ্যান ব্যাখ্যা কীভাবে হবে? দেবেশ রায় তাঁর 'উপন্যাসের নতুন ধরণের খোঁজে' প্রবন্ধে লিখছেন,

> ঘোষণার বিষয়টি যত মিথ্যেই হোক, ঘোষণার ভাষা তো সত্য। সে-ভাষায় এই মিথ্যেঘোষণাকেও তো সত্যের মতোই শোনাত। বাক্ আর অর্থের মধ্যে এক ঔপনিবেশিক শক্তির ঢুকে পড়ে তাদের বিচ্ছিন্নতা ঘুচিয়ে দিয়েছে। আমরা তখন থেকেই আমাদের নিজেদের কাহিনীকার হওয়ার পরিচয় হারাতে শুরু করি। আমরা ধরে নিলাম- ঐ ভাষা আর ঐ ঘোষণার নামই উপন্যাস। ঐ ভাষা আর ঐ ঘোষণার মাঝখানের ফাঁক দিয়ে 'অর্থ' গলে গেল।[ii]

দেবেশ রায় এই প্রবন্ধাংশে বলছেন কীভাবে ইউরোপদর্শিত পথে উপন্যাসের নির্মাণে নিজেদের দেশীয় কাহিনি, স্ব-উপাদানগুলোকে হারিয়ে ফেলেছিল ঔপন্যাসিকেরা। কিন্তু, অভিজিৎ সেন, মহাশ্বেতা দেবী, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস কিংবা দেবেশ রায় নিজেও এই দেশীয় উপাদানগুলোকে হারাতে চান না; বরং আখ্যানের স্বাভাবিক গতিপথ ওই উপাদানগুলোর বিবর্তনপথ ধরেই অগ্রসর হয়। 'রহু চণ্ডালের হাড়' কিংবা 'দেবাংশী'-র মতো আখ্যানে দেশীয় উপাদান, মিথ, মুখফেরতা আখ্যান নিম্নবর্গের মানুষদের ঘিরে আবর্তিত হয়, তাদেরই দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হয়। কিন্তু, এই লেখকেরা কেউই শুধুমাত্র 'কল্পনা' দিয়েই আখ্যান নির্মাণ করতে চাননা। গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্ক্যেজের উপন্যাস ও গল্পেও বাস্তবের কুহক এবং কুহকের বাস্তবতা মিশে থাকে। দনুর মতো, সামলা মতো, ইয়াসিন বা পীতেমের মতো হোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিয়াও তার স্বজন ও গোষ্ঠীর সবাইকে প্রতিশ্রুত ভূমিতে নিয়ে যায়। মিথ্-কাঠামো 'একশ বছরের নিঃসঙ্গতা' উপন্যাসের শিরদাঁড়া। "The non-rational elements of myth also serve to

expand the narrow dimensions of objective everyday reality and lend universal significance to the experience of characters.[iii] এই মিথ্‌কেন্দ্রিকতা তথাকথিত আধুনিকতার বাঁধন থেকে আখ্যানকে মুক্ত রাখে, যুক্তিবাদের পরিসরে ধরা পড়তে চায়না। অথচ, পাঠক আবিষ্কার ক'রে নিতে পারে যে, কল্পনার আবরণ সরাতে সরাতে বাস্তবের নিটোল অবয়ব ঠিকই উন্মোচিত হবে। সালমার ওই "সেই বিষ নিশ্বাসে সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে যাবে" বাক্য মিথ্‌ হয়ে লোকান্তরে লোকমুখে ছড়িয়ে গেলেও, আখ্যানের গতিতে পাঠক আবিষ্কার ক'রে নিতে পারেন যে, ওই 'ছারখার' হয়ে যাওয়া বাজিকর আর সাঁওতালদের জীবনে কতখানি বাস্তব। বস্তুতঃ ইংরেজশাসন আরও জাঁকিয়ে বসবে এরপরেই আর, নিম্নবর্গের সাধারণ মানুষের জীবন ছারখার হয়ে যাবে। "Myth in *Cien anos de soledad* frequently takes the form of exaggeration and embellishment, perhaps the result of generations of hyperactive imaginations"[iv] 'একশ বছরের নিঃসঙ্গতা' সম্বন্ধে ম্যাকমারের এই মন্তব্য 'রহু চণ্ডালের হাড়'-এর ক্ষেত্রেও তো প্রযোজ্য। উপন্যাস শুরু হয় শারিবা তার বৃদ্ধা ঠাকুমা লুবিনির কাছে বাজিকর সম্প্রদায়ের সুদীর্ঘ ইতিবৃত্ত শোনে, কয়েক শতকব্যাপী পরিযানের ইতিহাস-কল্পনা মেশানো আখ্যান।

> লুবিনি ধূসর চোখে পাতালু নদীর বাঁকের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকত জ্যোৎস্না রাতে। তারপর কাঁপা কাঁপা হাতে শারিবাকে অলীক সব দৃশ্য দেখাত... নমনকুড়িতে পীতেম বলত, হাঁই দেখ লুবিনি, হাঁই দেখ রহু... রাজমহলের গাছের নিচে দাঁড়িয়ে অশরীরী দনু বলত, হাঁই দেখ পীতেম, হাঁই দেখ রহু।[v]

গার্সিয়া মার্ক্যেজের উপন্যাসের ওই 'অতিসক্রিয় কল্পনা (hyperactive imagination)' অব্যাহত থাকে এই উপন্যাসেও। 'খোয়াবনামা' উপন্যাসে মুনসির ভূত পাকুড়গাছে থাকে আর তাঁকে একটিবার দেখার আশায় দুর্যোগের দিনের মেঘ তাড়াতে থাকে তমিজের বাপ। মিথ্‌ তো শেষ হয় না। বরং তা প্রজন্মান্তরে বহমান থাকে, ইতিহাসের শিরায় ধমনীতে বইতে থাকে। চেরাগ আলি, বৈকুণ্ঠ, তমিজের বাপ অন্য-ইতিহাসের আখ্যানে তথা মুখফেরতা কাহিনিতে বিশ্বাস রাখে। আধুনিক যুক্তিবাদী মনন একে প্রত্যাখ্যান করতে পারে, কিন্তু মিথের বহমানতা রোধ করতে পারে না। বারংবার রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাতে ও সামাজিক দ্বন্দ্বমুখরতায় বাজিকররা 'দেশ' পায়না, তবু, তারা এক দেশের সন্ধান ক'রে চলে। 'দেশ'-র ধারণাও কি তাদের কাছে অলীক, কুহকী বাস্তব নয়? "লুবিনি বলে এক অজ্ঞাত দেশের কথা। সি দ্যাশ হামি নিজেই দেখি নাই, তোক্‌ আর কি কমো। সি দ্যাশের ভাষা বাজিকর নিজের বিসরণ হই গিছে, তোক্‌ আর কি শিখামো"[vi] আখ্যানটি বাজিকরদের যাত্রাপথের সাক্ষী থাকে, বাজিকররা ইতিহাসের সাক্ষী থাকে। অসংখ্য কাহিনি, লোকায়ত সংস্পর্শ আর মুখফেরতা মিথ্‌ ঘুরে বেড়ায় বাজিকরদের মধ্যে এবং বাইরের দুনিয়ায় বাজিকরদের নিয়ে। "নানির বলা

অসংখ্য কথা সে একসময় আবিষ্ট হয়ে শুনত ও বিশ্বাস করত। অথচ এখন তো শারিবা লুবিনির অসংখ্য গল্পকথার মধ্যে অন্য অর্থ খুঁজে বের করবার চেষ্টা করে।”[vii] ম্যাকমারে গার্সিয়া মার্কেজের উপন্যাসে মিথ্ ও বাস্তবতায় খুঁজে পাচ্ছেন,

> Some of the characters achieve mythical stature due to colorful personality traits or extreme old age... frequently lend a humorous tone, at times satirical and occasionally macabre. Fernanda, the reserved, decorous girl from the interior, has illusions of grandeur (she grew up being constantly reminded that some day she would become la reina) stemming from her aristocratic family background, even though her father has to mortgage their home to purchase her trousseau. To her children she paints an idealized portrait of their grandfather, Don Fernando, creating in their minds the image of a legendary being.[viii]

রহুর মিথ্ও তো এভাবেই প্রজন্মান্তরে তৈরি ক'রে নেয় বাজিকররা। মুনসি আর ভবানী সেনাপতির মিথ বয়ে নিয়ে চলে বৈকুণ্ঠ, তমিজের বাপ। বিরসা হয়ে ওঠে ভগবান এবং মিথ-আখ্যানের বিষয়ীসত্তা। দনুর অশরীরী উপস্থিতি বাজিকরদের চলার ভরসা যোজায়, বারবার পালাতে পালাতেও স্থায়িত্ব খুঁজে পাওয়ার ভরসা দেয়। সালমা হয়ে ওঠে বয়সের গাছপাথরহীন, সময়ব্যাপী বিস্তৃত 'colorful personality', যে তার জড়িবুটি-মন্ত্র ইত্যাদির জন্যে 'mythical stature' লাভ করে। তারই বলা "হাজার হাজার নাগনাগিনী ছুটে আসছে, তাদের নিশ্বাসে বিষ" ভীষণবাক্য হয়ে ছড়িয়ে পড়ে লোকালয় জুড়ে। লুবিনীও সেই বর্ণময় চরিত্র হয়ে ওঠে কিংবা একদা-দলপতি পীতেম বা ইয়াসিনের মতোই। সাঁওতাল বিদ্রোহের বাস্তবতাতেও তার সবিস্তার উপস্থিতি এবং জমিদার-জোতদার-ব্রিটিশদের প্রবল ক্ষমতার বিরুদ্ধে তার সঙ্গে লক্ষণ সোরেনের বন্ধুত্ব এড়িয়ে যাওয়া যায় না কিছুতেই। নিম্নবর্গের বাজিকররা জীবদ্দশার প্রথম ও শেষ আমন্ত্রণ পায় আরেক নিম্নবর্গ সাঁওতালদের থেকে। বাজিকররা এড়িয়ে যেতে চাইলেও সাঁওতালদের ওপরে জোতদারের অর্থনৈতিক শোষণ, ঠকিয়ে নেওয়া দাদন ও জমি তাদের প্রতিবাদী করে তোলে। রাজনৈতিকভাবে 'অসচেতন (Political unconscious)' বাজিকরদের এখানেই সঙ্ঘবদ্ধ রূপান্তরের শুরু, প্রতিরোধের শুরু, যা পরে প্রবাহিত হবে প্রজন্মান্তরে। উপন্যাসের বাস্তবতায় বাজিকররা যেমন লক্ষ্মণ সোরেনের পাশে দাঁড়িয়ে দিকু ও জমিদারদের বিরুদ্ধে লড়াই করে, তেমনই ইতিহাসের বাস্তবতায় তিলকৌ মুর্মুর সহযোদ্ধা হন রাজমহলের পাহাড়িয়া সর্দাররা। ধীরেন্দ্রনাথ

বাস্কে তিলকৌ মাঝির ওপর বৃটিশদের অত্যাচারের যে বর্ণনা দিয়েছেন[ix], লক্ষণ সোরেনের অত্যাচারের[x] সঙ্গে তার সাদৃশ্য প্রচুর। 'রহু চণ্ডালের হাড়'-এ আখ্যানের কেন্দ্রে যে সামাজিক পরিসরের 'অপর' মানুষেরা, ঘরহীন-স্থায়িত্বহীন যাযাবর[xi] বাজিকর[xii] সম্প্রদায়, তারা শুধু এতদিন সাহিত্যে-সংস্কৃতিতে-সমাজে যারা 'আত্ম' ছিল তাদেরই প্রতিস্পর্ধা জানায় না, বরং অন্য 'অপর'দের সমাজ-সংস্কৃতিতেও মেশে এবং বোঝবার চেষ্টা করে। এই চেষ্টায় মিথ ও মুখফেরতা কাহিনি উপন্যাসের বাস্তবতা নির্মাণের তাৎপর্যপূর্ণ উপাদান। অভিজিৎ সেন লিখছেন,

> আমি 'দেবাংশী'র সারবান লোহার এবং দৈত্যারি মণ্ডলের আশ্চর্য সংলাপ পাশে বসে শুনতে চেয়েছি যেখানে বেলালি সতী (বেহুলা), মহাদেব, মনসা মামলা মোকদ্দমা জমিসম্পত্তি ইত্যাদির যাবতীয় নিষ্পত্তিতে হরদম হস্তক্ষেপ করে। মিথ এবং লোককথার মধ্যে একটা গোটা সমাজের ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে খুঁজলে পাওয়া যাবে বলে আমার বিশ্বাস।[xiii]

অভিজিৎ সেন এই প্রবন্ধেই উল্লেখ করছেন লোকায়ত ও মিথে ফিরে যাওয়ার উপন্যাসপদ্ধতির কথা। আর, আরেক বিতর্কের ইঙ্গিতও দিয়েছেন যে, "তারাশঙ্কর মিথ ব্যবহার করেছেন আখ্যান হিসেবে। আখ্যান হিসেবে মিথের ব্যবহার খুবই সরল এবং একমাত্রিক।"[xiv] অর্থাৎ, প্রত্যক্ষ ভূত বা অলৌকিক কাহিনিনির্মাণের সঙ্গে লোককথার ভূত ও মিথের তফাৎ রয়েছে। উপন্যাসের হঠাৎ-দেখা ভূতের সঙ্গে লোককথা ও মিথের গুণগত পার্থক্য রয়েছে। 'ভৌতিক গল্প (Horror Story)' নয়, ভূত বা মিথ বিশ্বাসের মধ্যে, মুখফেরতা গল্পে গল্পে প্রজন্মান্তরে কোনও এক সংস্কৃতির বাহক। ইতিহাসের ফাঁকফোকরগুলো বুজে যায় সেই মিথপ্রবাহে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'খোয়াবনামা (১৯৯৬)'-র মুনসির ভূতসহ আস্ত পাকুড়গাছ লোপাট হয়ে যাওয়া সাম্প্রদায়িক বিপন্নতার দ্যোতক। চেরাগ আলির পাওনা-শোলোক ও মুনসির ভূত ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের (১৭৬৩-১৭৯০) ইতিহাস চিরজাগরূক রাখে। মহাশ্বেতা দেবীর 'টেরোড্যাকটিল, পূরণ সহায় ও পিরথা' উপন্যাসে প্রাগৈতিকহাসিক মিথের সচেতন ব্যবহার রাজনৈতিক উপন্যাস হিসেবে একে প্রতিষ্ঠা দেয়। বহুমাত্রিক মিথের ব্যবহার উপন্যাসের রাজনীতিকে অনন্য দৃষ্টিকোণ থেকে পাঠকের সামনে হাজির করে।

ইতিহাস, মিথ ও বাস্তবতার আদানপ্রদান

ইতিহাসের উপাদানের সঙ্গে নিছক কল্পনা ও নির্দিষ্ট মতাদর্শের সামঞ্জস্য রাখলে তা 'ঐতিহাসিক আখ্যান' হিসেবে উত্তীর্ণ হতে পারে। কিন্তু, 'রাজনৈতিক আখ্যান' হয়ে উঠতে গেলে মিথ ও মুখফেরতা আখ্যানের প্রতিরোধ-ক্ষমতা প্রয়োজন। কুশীলবদের নির্মাণে বাস্তবের আর্থ-রাজনৈতিক উপাদানসমূহের ভিত্তি প্রয়োজন। তাই, মহাশ্বেতা দেবীর 'অপারেশন? বসাই টুডু (১৯৭৭)'-তে ক্ষেতমজুরদের শোষণের সরকারি নথির উল্লেখ থাকে। নবারুণ ভট্টাচার্য সময়ের তথ্যায়ন (documentation) করেন আখ্যানে।[xv] 'কাঙাল মালসাট' উপন্যাসে দণ্ডবায়স এবং কথক বিস্মৃত অতীতের নথি,

তথ্য ও ঘটনাবলী সঘোষে হাজির করে পাঠকের সামনে। 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসে বীরসা মুণ্ডা সম্পর্কিত মিথ্প্রবাহের পাশাপাশি সরকারি ভাষ্যের উল্লেখ থাকে। আর, অভিজিৎ সেন বাজিরকরদের যে পেশা ও পেশাবদলের উল্লেখ করেন, তা মিলে যায় সামাজিক গবেষণাপত্রের সঙ্গে। মিলিন্দ বকিল যাযাবর সম্প্রদায়ের সামাজিক স্বীকৃতি বিষয়ক প্রবন্ধে বাজিকরদের যে বৃত্তিগুলোর উল্লেখ করছেন[xvi] তার প্রত্যেকটা বৃত্তির সঙ্গে বাজিকরদের বৃত্তি মিলে যায়। এমনকি, যে বাজিকরদের জাত নেই বলে হিন্দু-মুসলমান দুই ধর্মের লোকেদের কাছেই অচ্ছুৎ ছিল, তারা ধর্মীয় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় ক্ষমতা হস্তান্তরোত্তর কালে। আর, বাজিকরদের জাত-ধর্মহীনতার বয়ান মিলে যায় বাওয়ারিয়া সম্প্রদায়ের সঙ্গে, যাঁরা সুদূর পূর্ব রাজস্থানের যাযাবর সম্প্রদায়। "The Bawarias have an intricate system of rituals that distinguish them from other local communities. They worship Kali, Shed Devi and Thakarji (Singh 1992) and pray to the goddess (devi) from Nagarkot"[xvii] বাজিকরদের ছিল লোকায়ত উপাস্য; ধরতিমাঈ, ওলামাঈ, বিগামাঈ আর তেলসিঁদুরে মাখানো রহুর হাড়। এই বিগামাঈ আর ওলামাঈ-র হদিশ হিন্দু বা মুসলমান কোনও ধর্মীয় ক্ষমতাবানই পায়নি। লেখক অভিজিৎ বাজিকরদের জীবন প্রত্যক্ষ করেন কর্মসূত্রে এবং এই প্রসঙ্গে লেখেন যে, বাজিকরদের কোনও নিজস্ব ধর্মবিশ্বাস তিনি দেখেননি। তারা পথচলতি অবস্থায় সমাজের গৃহস্থদের লৌকিক ধর্মবিশ্বাসের কোনও লৌকিক দেবদেবীকে আশ্রয় করে।

> 'বিগামাই', 'ওলামাই'- এরকম দু-একটি মাতৃশক্তির খুবই অস্বচ্ছ ধারণার কথা তারা আমাকে বলেছিল... দুই প্রবল ধর্মবিশ্বাসী সমাজের মধ্যে সততই নিষ্পিষ্ট বাজিকরেরা কেমন যেন অপ্রস্তুত তাদের অস্তিত্ব নিয়ে, এমনই তাদের মনে হয়েছিল আমার।[xviii]

অভিজিৎ এই ধর্মবিশ্বাসের রাজনীতির উল্লেখ করেন এবং ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী বর্ণবৈষম্য ও শ্রেণিবৈষম্যের বিরুদ্ধে বাজিকরদের সংগ্রাম। 'দেবাংশী' গল্পেও বর্গা-বিষয়ক অর্থনৈতিক আখ্যানের পাশাপাশি নিম্নবর্গের ধর্মবোধের জটিলতা, ন্যায়নীতির বোধও স্বাভাবিকতায় ঢুকে পড়ে। 'দেবাংশী' আখ্যান সম্পর্কে "ধর্মাশ্রয়ী শ্রেণীসংগ্রামের এক এক বিশেষ রূপও দেখানো হয়েছে"[xix] বলে মন্তব্য করেছেন অভিজিৎ সেন। ভূমি সম্পর্কের সঙ্গে ধর্মীয় শোষণ একটা সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোকে কীভাবে টিঁকিয়ে রাখে এবং বাজিকর বা নিম্নবর্গের প্রতিনিধি দেবাংশী কীভাবে সেই শ্রেণি-কাঠামোর বিরুদ্ধে প্রতিস্পর্ধা জারি রাখে, সেই আখ্যানই উপন্যাস-গল্পগুলোকে রাজনৈতিক ক'রে তোলে। ইলিয়াসের 'খোয়াবনামা' উপন্যাস এই নির্মাণবিন্দু থেকে রাজনৈতিক হয়ে ওঠে। 'খোয়াবনামা' আখ্যানের নির্মাণকল্পে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'-এর বিরুদ্ধপ্রস্তাব উত্থাপন হয় এবং কুশীলবদের সংলাপে উচ্চবর্গের 'আনন্দমঠ' পাঠরীতির বিরুদ্ধে ভবানী পাঠক

আর মুনসির মিথ হাজির হয়। নায়েববাবু ও ভদ্রলোক উচ্চবর্গ 'আনন্দমঠ'কে প্রামাণ্য ইতিহাস বলে সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ তৈরি করতে চাইলে বৈকুণ্ঠ ও দশরথের মতো নিম্নবর্গীয় হিন্দুরা ভবানী পাঠকের মুখফেরতা কাহিনী দিয়ে তা প্রতিহত করে[xx]। ফকিরের পাওনা-শোলোক প্রবহমান মিথের ধারক হয়ে ক্ষমতাকাঠামোকে প্রত্যাহ্বান জানায়।

বাস্তব, মিথ ও প্রতিস্পর্ধী স্বর

যে ইউরোপ-অনুসারী আধুনিকতার অনুশীলন ঊনিশ শতক থেকে বাঙালি সমাজে শুরু হয়েছে, তার নিরিখে বাজিকরদের গোষ্ঠীযাপন 'প্রাগাধুনিক' বলে বিবেচিত হয়ে এসেছে। ইউরোপীয় তত্ত্বচর্চার আদলে যা 'আধুনিক' ছাঁচে পড়ে না, তাকেই লোকায়ত (folk)[xxi] বলে 'অন্য'-আলোচনার আওতায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেই লোকায়তের আলোচনায় আধুনিকতার (Modernity) সঙ্গে চিরাচরিতের (Tradition) বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেওয়া হয়, বাইনারি তৈরি ক'রে দেওয়া হয়। সাহিত্যের ভাষা ও আঙ্গিক এমনভাবে নির্মাণ ক'রে নেওয়া হয় যাতে নিম্নবর্গের প্রবেশাধিকার না থাকে এবং বাজিকর ও অন্যান্য নিম্নবর্গকে 'প্রান্তিক' বলে দাগিয়ে দেওয়া যায়। মুখফেরতা কাহিনী, প্রজন্মান্তরে বহমান আখ্যান ও কথোপকথনে নির্মিত পুনর্কথনের উপাদান সাহিত্যপরিসর থেকে ছেঁটে ফেলা হল আধুনিক সাহিত্য নির্মাণের প্রক্রিয়ায়[xxii]। বাজিকরদের ভাষা বিভিন্ন বুলির সংমিশ্রণ, নির্দিষ্ট ভাষাবয়ব তাতে নেই, মার্জিত-শীলিত অবয়ব তো একেবারেই নেই। বসাই টুডুর ভাষার সচেতন প্রয়োগ মান্যভাষার পরিসর এবং ভদ্রলোকীয় আধিপত্যের প্রতর্ককে প্রতিস্পর্ধা জানাতে থাকে। 'খোয়াবনামা'র কুশীলবেরা যে ভাষায় শিক্ষিত-ভদ্রলোকের ইতিহাসব্যাখ্যার বিরুদ্ধব্যাখ্যা উপস্থাপন করে, তাতে 'নবজাগরিত' বাঙালি প্রতর্ক ধাক্কা খায়। উল্লেখ্য যে, ভারতীয় তথা বাংলার সমাজব্যবস্থায় 'আধুনিকতা'-র চেতনা চিরাচরিতের সঙ্গে অম্লমধুর দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের পথেই এগিয়েছে। অ-লিখিত ইতিহাসের নিরুদ্দিষ্ট সূত্র (মিসিং লিঙ্ক) হয়ে থেকেছে মুখফেরতা কাহিনি; কিছু ঔপন্যাসিক তাকে উপন্যাসের শিরদাঁড়া ক'রে তুলেছেন। আর, 'রহু চণ্ডালের হাড়' বা 'অপারেশন? বসাই টুডু' ভারতীয় আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার ভিতে নির্মিত উপন্যাস। বাজিকরদের মতো সংখ্যালঘু অথচ নির্দিষ্ট পেশাহীন জনগোষ্ঠীকে কোন আধুনিক পাশ্চাত্য তত্ত্ব দিয়ে বিচার করা যায়? বাজিকরদের গোষ্ঠীজীবন, ভূমি-সম্পর্কের অনিশ্চয়তা এবং বারবার ভেঙ্গে-জুড়ে যাওয়ার গতিময় যাপন প্রবহমান থাকে 'আধুনিকতার' সঙ্গে সংঘাতে, প্রাতিষ্ঠানিক সমাজবিধি ও অর্থনৈতিক বন্দোবস্তের সঙ্গে দ্বান্দ্বিক পরিচয়ে। বাজিকররা জানত যে, রহু চণ্ডালের হাড় আসলে এক বুজরুকি তবু তারা স্বপ্ন দেখত আর বিশ্বাস রাখত এই হাড়ের অস্তিত্বে। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের আধুনিক আর্থ-রাজনীতিতে যত পৌঁছেছে, ততই তারা বুঝেছে 'ঐন্দ্রজালিক, বুজরুকি'র মাহাত্ম্য এবং ততই তারা রহুর হাড় লুকিয়ে রাখা ভূখণ্ডের খোঁজ পেতে চেয়েছে। "সেই স্থানটি খুঁজে বের করবার জন্যই বাজিকরের এই ভূ-পরিক্রমণ। তার সমস্ত স্থিতি,

স্থায়িত্ব, স্বস্তি ও শান্তি হবে সেই ভূ-খণ্ডে।"[xxiii] বিশ্বাস-অবিশ্বাস, মিথ-বাস্তবের এই বিরোধাভাস উপন্যাসের আখ্যানপ্রবাহকে ধারণ করে। বাজিকর না-হিন্দু, না-মুসলমান, না-শিল্পক্ষেত্রের শ্রমিক, না-স্থায়ী কৃষিজীবী, না-মধ্যবিত্ত, না-উচ্চবর্গ; আর, এই প্রতিটা নঞর্থক বাঁধন খুলতে খুলতে 'রহু চণ্ডালের হাড়' এগোতে থাকে। ঠিক যেমন 'মফস্বলি বৃত্তান্ত'-র চ্যারকেটু, 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'-র বাঘারুর অস্তিত্ব অনেক 'না' দিয়ে প্রতিভাত হয়। আধুনিক আর্থ-রাজনীতি, সামাজিক ক্ষমতাকাঠামো, রাজনৈতিক ঝাণ্ডা কোনওকিছু দিয়েই তাদের অস্তিত্ব মাপা যায় না। চ্যারকেটু, বাঘারু, কেলু ('সময় অসময়ের বৃত্তান্ত') প্রচলিত নির্দেশগুলি প্রত্যাখ্যান করে। এও তো এক সামাজিক ও রাজনৈতিক আবিষ্কার! এই যাত্রাপথে 'লোককথার বাস্তবতা' বারবার সংযুক্ত হয়ে যায় উপন্যাসে। অভিজিৎ সেন 'মিথ ও লোককথার সম্ভাবনা' প্রবন্ধে এই সংযুক্তির কথাই বলছেন,

> রূপকথার গল্প নয়, লোককথাও নয়, কিন্তু লোককথার বাস্তবতা (যদি এমন কিছু বলা যায়) শক্তিশালী মাধ্যম দক্ষিণ আমেরিকার সাহিত্যে এক নয়া আধুনিকতা এনেছে। সেই আধুনিকতায় যুক্ত হয়ে আছে অপরিচিত এক রহস্যের সৌন্দর্য। ইউরোপীয় বুদ্ধি এবং মনস্তত্ত্ব চর্চার সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতমের ক্লান্তিকর কসরতের অনুসরণের বদলে আমাদের সাহিত্যিক মুক্তি বোধহয় ওই পথেই সম্ভব হতে পারে।[xxiv]

ইতিহাসের ফাঁকফোকরগুলো বুজিয়ে নিতে ঐতিহাসিক কল্পনার আশ্রয় নেন, ঠিক তেমনই ঔপন্যাসিকও আখ্যান রচনায় ইতিহাসের 'প্রকৃত' তথ্যপ্রমাণাদির সঙ্গে বহু না-বলা কথার নিস্তব্ধতা জুড়ে নেন। হেডেন হোয়াইট তাঁর 'দ্য প্র্যাকটিক্যাল পাস্ট (২০১৪)' গ্রন্থে ইতিহাস-অনুসন্ধানী সাহিত্যের প্রসঙ্গ আনেন। এখানেই উল্লেখ করেন 'ঐতিহাসিক অতীত' ও 'বাস্তবিক অতীত'-এর[xxv]। বাস্তবিক অতীত জনগণের ইতিহাস-প্রকরণ হয়ে ওঠে। এই পর্যায়ে বাস্তব-অনুশীলনের জন্যে ইতিহাস নির্মিত হয়। জনগণ সেই ইতিহাসকে নির্মাণ ও ব্যবহার করে। শাসকের অনুশাসন যেমন তা নিয়ন্ত্রণ করে, তেমনই শাসিতের নিজস্ব নির্মাণও থাকে। আর, কোনও উপন্যাসে মিথ ও লোককথা জুড়ে যায় আখ্যানে। তাতে ইতিহাসবিদের ভ্রূ-কুঞ্চন হতে পারে, কিন্তু সাহিত্যের নতুন ভাবনাপথ খুলে যায়। "অতীত থেকে, বর্তমান থেকে, ভাষা থেকে, গান থেকে, শ্লোক থেকে ও পুরাণ থেকে, বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব থেকে মানুষ অবিরাম শক্তিসঞ্চয় করে চলেছে।"[xxvi]- এই অনুভব মহাশ্বেতা পাঠকের কাছে পৌঁছে দেন বিরসার ভগবানত্ব প্রাপ্তি ও কিংবদন্তীর নায়ক হয়ে ওঠার আখ্যানে। ইতিহাসের সত্য এবং উপন্যসের সত্যের দ্বান্দ্বিক বিচার থেকেই মহাশ্বেতার আখ্যানের সত্য নির্মিত হয়। মহাশ্বেতা ঐ উভয় সত্যকেই ভাঙ্গেন ও গড়েন; এবং ঐ দু'ই সত্যের দ্বান্দ্বিক ক্রিয়ার জন্যেই 'অরণ্যের অধিকার', 'চোট্টি মুণ্ডা ও তার তীর' কিংবা 'ঝাঁসির রাণী'-র নায়করা মহাকাব্যিক মাত্রা অর্জন করে।[xxvii] আখতারুজ্জামান ইলিয়াস চেরাগ আলি, মুনসি আর

ভবানী পাঠকের মুখফেরতা আখ্যান, শোলোক ও লোকায়ত ভাষ্যকে তুলে আনেন দেশভাগের কালস্থানিকতায়। মিথ ও লোকায়তে মিশে ইতিহাসের উপাদান ছুঁয়ে যে আখ্যান নির্মিত হয়, তাতে নিম্নতলের স্বর উপরিতলের প্রতিষ্ঠিত স্বরে অন্তর্ঘাত ঘটিয়ে দেয়। 'রহু চণ্ডালের হাড়', 'অরণ্যের অধিকার' বা 'অপারেশন? বসাই টুডু'-র মতো উপন্যাসে অপরের চোখ দিয়ে অপরকে পাঠকসম্মুখে হাজির করার সাহিত্যপদ্ধতি কি অন্তর্ঘাতী বাচনকৌশল নয়? হোসে ম্যানুয়েল গোয়া মিথ্ ও অন্তর্ঘাতের আলোচনা প্রসঙ্গে[xxviii] বাচনের অন্তর্ঘাত, অবয়বের অন্তর্ঘাত এবং 'ট্রান্সেডেন্টাল অন্তর্ঘাতের' উল্লেখ করছেন। নিম্নতল থেকে উঠে আসা সাহিত্যের ইতিহাসে এই বয়ানগুলোই প্রতিস্পর্ধী বয়ানে পৌঁছাতে সাহায্য করে। ইতিহাসের দীর্ঘপথ পেরিয়ে বাজিকররা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে জমি-স্থিতি পায় বটে, কিন্তু সামাজিক স্বীকৃতি পায় নি। তাদের লোকায়ত আচার আর প্রজন্মান্তরের মিথ-বিশ্বাসই মূলধারার সমাজকাঠামোর সঙ্গে ব্যবধান ঘোচাতে দিল না? শারিবা একমাত্র বাজিকর যে ঊনিশশো ষাটের দশকের শেষে মেহনতী শ্রমিকে পরিণত হল, বাজিকরদের শ্রমের আধুনিকায়ন হল। কিন্তু, "শারিবা লুবিনির অসংখ্য গল্পকথার মধ্যে অন্য অর্থ খুঁজে বের করবার চেষ্টা করে। সমাজ তাকে কেন ত্যাগ করল? কেন এখনো গ্রহণ করে না। এখন এসব চিন্তা সে সূত্রবদ্ধ করার চেষ্টা করে।"[xxix] তার এই এই সূত্রবদ্ধ করার আকাঙ্খায় রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস অঙ্গাঙ্গী। মুখফেরতা কাহিনীর প্রবহমানতা তার অন্যতম প্রধান উপাদান। এর মধ্যেই মানুষের মুক্তির আকাঙ্খা ও প্রতিরোধের ভাষা রয়েছে। সব্যসাচী ভট্টাচার্য নিম্নতলের ইতিহাস অনুসন্ধানের প্রশ্নে বহুধাবিভক্ত ভারতীয় সমাজের শ্রমের প্রশ্নকে মূলে রেখে বিভিন্ন নিপীড়িত সত্তাকে আলোচনার পরিসরে আনতে চেয়েছেন[xxx]। তিনি শোষিতের ইতিহাসলেখর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন; আর, গার্সিয়া মার্ক্যেজ, মহাশ্বেতা দেবী, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ও অভিজিৎ সেন সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে নির্বিত্তের ও নিম্নবর্গের অনুসন্ধান করেন। ইউরোপীয় নভেলায়নের অনুকরণ না ক'রে মিথ-লোককথা-ইতিহাস-রাজনীতির সামঞ্জস্যে উপন্যাসের নবায়ন ঘটান। শাসকশ্রেণি তার প্রতিষ্ঠানসমূহ দিয়ে নিজস্ব মতাদর্শসিদ্ধ ইতিহাসের বয়ান প্রতিষ্ঠা দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যায় এবং উপরিউক্ত উপন্যাসগুলি প্রত্যাহ্বানের প্রতিস্পর্ধী দ্রোহস্বর জাগিয়ে রাখে।

তথ্যপঞ্জি:

---

[i] অভিজিৎ সেন, রহু চণ্ডালের হাড়, জে এন চক্রবর্তী অ্যান্ড কোং, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১০, ২৫।

[ii] দেবেশ রায়, বাংলা উপন্যাসের নতুন ধরণের খোঁজে, দে'জ, কলকাতা, ২০০৬, ১৬

---

iii George R. McMurray, Gabriel Garcia Marquez, Frederick Ungar Publishers Inc., New York, 1977, 74

iv George R. McMurray, Reality and Myth in García Márquez' "Cien años de soledad", The Bulletin of the Rocky Mountain Modern Language Association , Dec., 1969, Vol. 23, No. 4 (Dec., 1969), pp. 175-181

v অভিজিৎ সেন, প্রাগুক্ত, ২৬৩

vi রহু চণ্ডালের হাড়, প্রথম অধ্যায়। প্রজন্মান্তরে এই গল্পগুলো বাজিকরদের মধ্যে প্রবাহিত হতে থাকে। লুবিনি শারিবাকে আখ্যান বলে আর, এই শারিবার উত্তরণ দিয়েই উপন্যাস শেষ হয়।

vii সেন, প্রাগুক্ত, ২৬৪।

viii ম্যাকমারে, প্রাগুক্ত, ১৭৭-৭৮

ix ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস, পার্ল পাবলিশার্স, ১৯৬০, ১২-১৩

x সেন, প্রাগুক্ত, ৫৭-৫৮

xi ভারতে সমস্ত যাযাবর সম্প্রদায়ের মোট জনসংখ্যা প্রায় ৬০ মিলিয়ন এবং প্রায় প্রতিটি রাজ্যেই এঁদের উপস্থিতি। Krätli, S. and Dyer, C. Mobile Pastoralism and Education: Strategic options International Institute for Environment Development, Education for Nomads Working Papers 1, UK: IIED

xii ভারতীয় যাযাবরদের তালিকা অনুযায়ী বাজিকর সম্প্রদায় মূলতঃ ওড়িশাকে কেন্দ্র ক'রে থাকেন। South Asian Nomads - A Literature Review, Anita Sharma, January 2011, pp- 74 যদিও লেখক অভিজিৎ সেন বাজিকরদের সংস্পর্শে আসেন পশ্চিমবঙ্গের বালুরঘাটে ১৯৭৩-৭৪ সাল নাগাদ।

xiii অভিজিৎ সেন, মিথ ও লোককথার সম্ভাবনা, মিথ সাহিত্য সংস্কৃতি, ভাষাবন্ধন, ২০১৩, ১৫০

xiv তদেব, ১৪৫।

xv নবারুণ ভট্টাচার্যের সাক্ষাৎকার দেবেশ রায়, অক্ষরেখা, সম্পা. নীলকমল সরকার, ফেব্রুয়ারি ২০০৮, ২৫৪

xvi Milind Bokil, De-Notified and Nomadic Tribes: A perspective, Economic and Political Weekly, 2002. Jstor

xvii Bahar Dutt, Livelihood Strategies of a Nomadic Hunting Community of Eastern Rajasthan, Nomadic Peoples, 2004, New Series, Vol. 8, No. 2, Special Issue: Whither South Asian Pastoralism? (2004), pp. 260-273, Jstor

xviii অভিজিৎ সেন, যেভাবে লেখা হলো রহু চণ্ডালের হাড়, গল্পপাঠ, ২০১৫, https://www.galpopath.com/2015/10/blog-post_42.html

[xix] অভিজিৎ সেন, কী লিখি, কেন লিখি, কোরক, সম্পা. তাপস ভৌমিক, শারদীয়া, ১৩৯৭, ৬১।

[xx] আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, খোয়াবনামা, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ১৯৯৮, ২০৬-২১২

[xxi] In the subculture the connection between actual belief in the superstition and its persistence in folk literature is closer. In the true "primitive" culture (though one without acculturation from neighbor or colonial is nowadays hard to find) folk literature is probably a more integral part of the isolated ethnic pattern; it reflects reality and integral wish rather than cultural lag in a way which it cannot in our "alienated" modern societies- Francis Lee Utley, An Operational Definition, The Journal of American Folklore , Jul. - Sep., 1961, Vol. 74, No. 293 (Jul. - Sep., 1961), 193-206

[xxii] Tithi Bhattacharya, The Sentinels of Culture: Class, Education, and the Colonial Intellectual of Bengal, Oxford University Press, New Delhi, 2005, 117-122

[xxiii] সেন, প্রাগুক্ত, ২১৭

[xxiv] সেন, মিথ ও লোককথার সম্ভাবনা, ১৪৪-৪৫

[xxv] Hayden White, The Practical Past, Illinois Northwestern University Press, Illinois, 2014

[xxvi] ইলিয়াস, প্রাগুক্ত, ১৪৪।

[xxvii] পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা দেবীঃ ব্যক্তি ও ইতিহাসের মেলবন্ধন, এবং মুশায়েরা উপন্যাস বিষয়ক বিশেষ সংখ্যা, সম্পা. সুবল সামন্ত, তৃতীয় বর্ষ ৩য়-৪র্থ সংখ্যা, অক্টো-দিসে ১৯৯৬ ও জানু-মার্চ ১৯৯৭, ৪২-৫৬

[xxviii] José Manuel Losada Goya and Marta Guirao Ochoa Edited. Myth and Subversion in the Contemporary Novel, Cambridge Scholar Publishing, Newcastle Upon Type, 2012, 4-8

[xxix] সেন, প্রাগুক্ত, ২৬৪।

[xxx] “In addition, there are in the colonial societies, sub-class loyalties arising out of primordial communal/tribal/caste ties, as well as supra-class loyalties arising out of the process of anti-imperialist struggle. Perhaps the outcome is a class of "low classness", and the boundaries are fuzzy.” Sabyasachi Bhattacharya, 'History from Below', Social Scientist , Apr., 1983, Vol. 11, No. 4 (Apr., 1983), pp. 3-20

শান্তিনিকেতনের স্থাপত্যশিল্প: পরিবেশভাবনা ও শিল্পকলার সমন্বয়

রাজদীপ দত্ত
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নিউ আলিপুর কলেজ, কলকাতা

সূচক শব্দ: ভিক্টোরীয় স্থাপত্য, পরিবেশবান্ধব স্থাপত্য, Sustainable Devolopment, লোকজস্থাপত্য, প্রকৃতি-পুনর্গঠন, Transit Village, উদ্যানবাটিকা, আলোক স্থাপত্য, স্থাপত্যকলায় পরিমিতি নিরলংকৃতি ও সৌন্দর্যবোধ, তলবিভাজন ও Work Station নির্মাণ, Mud Architecture, স্থাপত্যরীতিতে 'বিরলতার অবকাশ', রবীন্দ্রভাবনায় প্রকৃতিবান্ধব নির্মাণশিল্প]

রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ অবদানে বাঙালির জীবনে সংস্কৃতি ও শিল্পের যে নতুন নতুন ক্ষেত্র জেগে উঠেছিল, গৃহস্থাপত্য ও বাস্তুবিদ্যাও তার বাইরে নয়। বাংলার নবজাগৃতির এও এক বিশিষ্ট দিক। ঔপনিবেশিক সময়ে যখন ভিক্টোরীয় স্থাপত্যরীতিকেই একমাত্রিক মনে করে তারই অনুশীলন চলেছিল, তখন শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে এক বিকল্পধারার স্থাপত্য-সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। যা তার প্রয়োগবৈচিত্র্যের শ্রেষ্ঠতায় আজও আমাদের পথ দেখিয়ে চলেছে। উপযোগিতা, পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতা—রবীন্দ্রভাবনার স্থাপত্যশিল্পের এই মুখ্য তিন বিশেষত্ব। এর সঙ্গে অবশ্যই জুড়ে রয়েছে প্রকৃতি ও পরিবেশ। প্রকৃতিকে সঙ্গে নিয়ে বিদ্যাশিক্ষার যে পরিবেশ রবীন্দ্রনাথ গড়ে তুলেছিলেন সেই আদর্শের বিশিষ্ট দিক শান্তিনিকেতনের স্থাপত্য-পরিবেশ। আজ সার্বিক পরিবেশ-দূষণের কবলে জর্জরিত নাগরিক সমাজের কাছে পরিবেশমুখী গৃহস্থাপত্য, সবুজের প্রায়োগিক ব্যবহার এই সবের গুরুত্ব অপরিসীম। পরিবেশসম্মত স্থাপত্যচর্চার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব যথেষ্টরূপেই দেখা দিয়েছে। একদিকে যেমন লক্ষ্য সুলভে গৃহনির্মাণ, তেমনই প্রয়োজন চারপাশকে মানিয়ে নিয়ে স্থাপত্য-পরিবেশ ঐতিহ্যকে গড়ে তোলা। এমন পরিস্থিতিতে স্থানীয় উপাদান, নির্মাণশৈলী ও পারিপার্শ্বিক অবস্থানগুলিকে সমন্বিত করেই নির্মিত অবয়বের সৃষ্টি করতে হয়। যে ব্যাপারে শান্তিনিকেতন পথপ্রদর্শক। শান্তিনিকেতনের গৃহস্থাপত্য ও ক্যাম্পাস-স্থাপত্যগুলি নিদারুণ আর্থিক সংকটের মধ্যেই রচিত হয়েছিল। তবুও এগুলির চমৎকারিত্ব নজর কাড়ে। এই স্থাপত্য রীতির প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এগুলি স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার করে স্থানীয় শিল্পীদের হাতে তৈরি হয়ে উঠেছিল। দ্বিতীয়ত পরিবেশ ও স্থানীয় প্রকৃতির সঙ্গে এইসব নির্মাণগুলি সম্পূর্ণ ভারসাম্য বজায় রেখেছিল। মানুষের হাতে নির্মিত হয়েও এই শিল্প প্রকৃতির সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্ম হতে পেরেছিল। আজকের অর্থনৈতিক ভূগোলে Sustainable Devolopment বলে যে কথাটি বহুলভাবে

স্বীকৃতিলাভ করেছে, রবীন্দ্রসৃষ্ট শান্তিনিকেতনের স্থাপত্যরীতি আজ থেকে এত বছর আগেও সেই ধারণাকে সম্পূর্ণ অনুসরণ করে তৈরি হয়েছিল।

শান্তিনিকেতন: আশ্রমিক স্থাপত্যের শুরুর কথা

বীরভূমের একদা রুক্ষ, ধূসর মাটিতে 'আত্মার আনন্দরূপ' শান্তিনিকেতনকে আবিষ্কার করা এবং তাকে ভাবীকালের আধ্যাত্মিক ও বৌদ্ধিক চর্চার কেন্দ্ররূপে গড়ে তোলার প্রাথমিক পরিকল্পনাটি করেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দেবেন্দ্রনাথের এই আশ্রম পরিকল্পনাকে পরবর্তী চল্লিশ বছর ধরে আরও বিস্তৃত আকারে জ্ঞানচর্চার এক মুক্ত ক্ষেত্র রূপে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপ দেন রবীন্দ্রনাথ। তৈরি হয় বিশ্বভারতীর নিজস্ব ভাবনায় মোড়া অনুপম স্থাপত্য-সংস্কৃতির। কিন্তু তার আগে আমাদের জেনে নেওয়া উচিত শান্তিনিকেতন সৃষ্টির আদি-ইতিহাস এবং সেইসঙ্গে তার আদি স্থাপত্যের রূপটি।

রবীন্দ্রনাথের জন্মসময় আর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠা প্রায় একই সময়ে। অর্থাৎ ১৮৬০-৬১ সালে। এই সময়ে বীরভূমের রায়পুরের সিংহ পরিবারের সঙ্গে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সখ্য এক ঘনিষ্ঠ রূপ নিয়েছিল। সেই বন্ধুতার সূত্রেই একবার সিংহবাড়িতে নিমন্ত্রণরক্ষার কারণে যাতায়াতের পথে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, বর্তমান শান্তিনিকেতনের তৃণশূন্য প্রান্তরে, কিছু সময়ের জন্য বিশ্রাম নিয়েছিলেন। রুক্ষ, ধূসর অসীম প্রান্তরের মাঝে দুটিমাত্র ছাতিম গাছের শীতল ছায়ায় মহর্ষির ক্ষণকালের বিশ্রাম, তাঁর মনে এনে দিয়েছিল নির্মল প্রশান্তি। এখানেই তিনি অনুভব করেছিলেন জগৎপ্রসবিতা ব্রহ্মকে, অনুভব করেছিলেন 'তিনি আমার প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি'। এই স্থানটিকে তাঁর সাধনার উপযুক্ত ক্ষেত্ররূপে নির্বাচন করেছিলেন মহর্ষি। মাঝে মাঝে তাবু ফেলে এখানে বাস করতেন তিনি। এখানেই স্থায়ীভাবে আশ্রম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রায়পুরের প্রতাপনারায়ণ সিংহদের কাছ থেকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কুড়ি বিঘা জমি নিয়েছিলেন। ১২৬৯ বঙ্গাব্দে জমির পাট্টা হস্তান্তরিত হয়। এবং সেই সময় থেকেই শান্তিনিকেতন আশ্রম পত্তনের সূত্রপাত। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' বইতে লিখেছেন,

"একদা এই দুটিমাত্র ছাতিম গাছের ছায়া লক্ষ্য করে দূর পথযাত্রী পথিকেরা বিশ্রামের আশায় আসত। আমার পিতৃদেবও রায়পুরের ভুবনমোহন সিংহদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ সেরে পালকি করে যখন একদিন ফিরছিলেন, তখন মাঠের মাঝখানে এই দুটি গাছের আহ্বান তাঁর মনে এসে পৌঁছেছিল। এইখানে শান্তির প্রত্যাশায় রায়পুরের সিংহদের কাছ থেকে এই জমি তিনি দান গ্রহণ করেছিলেন। একখানি একতলা বাড়ির পত্তন করে এবং রুক্ষ, রিক্ত ভূমিতে অনেকগুলি গাছ রোপণ করে সাধনার জন্য এখানে তিনি মাঝে মাঝে আশ্রয় গ্রহণ করতেন।"[১]

জমি পাওয়ার পরেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগ নিয়ে এই রুক্ষ প্রান্তরকে সবুজায়িত করার পরিকল্পনা করেন। বর্ধমান থেকে নদীমাটি এনে তাকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল প্রাথমিক ভূমি গঠনে। শান্তিনিকেতন আশ্রম যে সময়ে তৈরি

হয়ে উঠছে, তার কিছুটা আগে থেকেই রেল লাইন পাতাকে কেন্দ্র করে গোটা বীরভূম জেলাতেই শুরু হয়েছিল সামূহিক ভূমিক্ষয়। এবং সেই সঙ্গে নির্বিচারে বৃক্ষচ্ছেদন। শুধু বীরভূমেই নয় গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে অর্থনৈতিক মুনাফার লোভে ভারতীয় বণিকেরা ইংরেজ শাসকদের সাহায্যে বিপুল পরিমাণে কাঠ চালান করতে থাকে। শাল সেগুন, গামার, পাকুরের বনভূমি যথেচ্ছভাবে ধ্বংস করা হয়। দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত 'রেইন ফরেস্ট আর হিমালয় অঞ্চল ও গাড়োয়াল অঞ্চলের প্রাচীন বনভূমি বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। অবস্থাবিপর্যয় এমন একটি স্তরে পৌঁছেছিল যে ব্রিটিশ পার্লামেন্টেও এই প্রসঙ্গ ওঠে। যা থেকে পরবর্তীকালে ফরেস্ট আইন শুরু হয়। ফলে একদিকে যেমন ব্রিটিশ মদতপুষ্ট বেনিয়ারাজ সবুজ লুণ্ঠন করে ভঙ্গুর ভূমির সৃষ্টি করছে, সেই সময়েই দেবেন্দ্রনাথ রুক্ষ খোয়াইকে সবুজের চাদরে মুড়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেন। আজ একবিংশ শতাব্দীতে বাস্তুতান্ত্রিক পরিবেশ-সমাজ গড়ে তুলতে ভারাক্রান্ত শহর ছাড়িয়ে গ্রামের কোলে দূষণমুক্ত পরিবেশ-সখ্য বাসভূমি গড়ে তোলা হচ্ছে, যাকে বলা হচ্ছে '21st Cencury Transit Village'। দেবেন্দ্রনাথ বহু বছর আগেই ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিবেশ পুনর্গঠনের কাজটি সম্পন্ন করেছিলেন। স্থানীয় পরিবেশ পুনর্গঠনের মূল কাজটাই ছিল মাটির উর্বরতা শক্তিকে বাড়ানো। আগেই বলেছি, বর্ধমান থেকে নদীর পলিমাটি এনে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, প্রাথমিক ভূমিগঠনে। আনীত পলিমাটি ও সেইসঙ্গে স্থানীয় ল্যাটেরাইট মাটি—এই দুই ধরণের মাটি মিলেমিশে অন্যরকম এক উর্বরতার জন্ম দিয়েছিল, যা থেকে গাছের সারি, লতা,গুল্ম, ফুল ও ফলের বাহার ছড়িয়ে পড়েছিল আশ্রম-পরিবেশে। এই কাজে মহর্ষিকে প্রধানভাবে যিনি সহায়তা করেছিলেন, শান্তিনিকেতন গড়ে ওঠার ইতিহাসে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখা উচিত। তিনি রামদাস। রামমোহন রায়ের এককালের পাচক, বর্ধমান মহারাজার দক্ষ মালি রামদাসের সাহায্যেই এই অঞ্চলের মৃত্তিকা-পুনর্গঠন সম্ভবপর হয়েছিল। এরই ওপরে গড়ে উঠতে লাগল স্থাপত্যের নানান তল।

সাধনবেদিতলা

ছাতিমগাছকে ঘিরে গড়ে ওঠা সাধনবেদিতলাই আশ্রমের আদি-স্থাপত্য। ছাতিম গাছকে ঘিরে পরিসরবিন্যাস ও সবুজের সমারোহ এই স্থাপত্যকে এক অদ্ভুত মহিমা দিয়েছে। উপাসনাবেদি, মঞ্চ, কাছের খোয়াইমাটির পরিসর ও আলোছায়ার সবুজ দেহের সম্মিলিতরূপ এই ছাতিমতলা। গোটা পরিবেশটাই যেন মূর্তিমান ধ্যানমন্ত্রে বিশ্ববাসীকে আহ্বান জানাচ্ছে। ছাতিমতলার আর্চ আর্কিটেকচারে খোদাই করা তিনটি লাইন—"তিনি আমার প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি"মহর্ষির সাধন উপলব্ধিকেই যথার্থভাবে প্রকাশ করছে। এই ছাতিমতলার প্রার্থনাভাবময় বিন্যাস যেন শান্তিনিকেতনেরই প্রথম প্রকাশ।

শান্তিনিকেতন-গৃহ

শান্তিনিকেতন গৃহই এই স্থানে গড়ে ওঠা প্রথম গৃহ-স্থাপত্য। প্রথমে বাড়িটি ছিল একতলা। পরে দোতলা হয়। শান্তিনিকেতন গৃহ তখনকার ইউরোপীয়ান ধাঁচের কাঠের কড়ি-বরগা, পেটাই ছাদ, ইট-চুন-সুরকির গাঁথনি দেওয়ালযুক্ত কোঠাবাড়ি। এই ধরণের গৃহস্থাপত্য কলকাতায় তখন বেশ প্রচলিত ছিল। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িও এই নির্মাণশৈলীতেই তৈরি। বাড়িটির গঠন ও আকৃতির বিস্তার দেখলে মনে হয়, অধিকাংশ নির্মাণসামগ্রীই কলকাতা থেকে আনানো হয়েছিল। আগে, এই শান্তিনিকেতন-গৃহকে বলা হত উদ্যানবাটিকা। ইটের সঙ্গে চুন-সুরকির গাঁথনি দিয়ে, ভারবহনকারী থাম, দেওয়াল, গৃহ-আস্তরণ প্রভৃতি নিয়ে ঘর-দোর গড়ে উঠেছিল। সঙ্গে বারান্দা, ব্যালকনি, সিঁড়ি, স্নানের লাগোয়া ঘর, চাতাল। ছাদ নির্মাণে সেগুন কাঠের বিম, চুন সুরকির কংক্রিট, কাঠের কড়ি-বরগার ভারসাম্য পরিলক্ষিত হয়। কাঠের ভেন্টিলেটর, খড়খড়ি দেওয়া বড়ো জানালা, কাঠের প্যানেল দরজা—আসবাবে কাঠের আধিক্য বেশ নজরে পড়ে।

উত্তরমুখী ফটকের মাথায় লোহার খিলান-ধাঁচের স্থাপত্যে আশ্রমের মূল কথাটি স্থাপিত হয়েছে—'আনন্দরূপম্ অমৃতং যদ্বিভাতি'— লোহার ফ্রেমে এই কটি ইস্পাত অক্ষর দিগন্তের দিকে মাথা উঁচু করে আছে। আনন্দরূপ জগতে নিত্য প্রবহমান আনন্দ-রসের উৎসটিকেই শান্তিনিকেতন আশ্রমের মূল শক্তি বলা যায়। বাড়িটিকে ঘিরে নানা গাছের কুঞ্জ নির্মিত হয়েছিল। এর অল্প দূরে আম্রকুঞ্জ, ওদিকে শালবীথি আর কাছেই অন্যান্য গাছপালা। সব মিলিয়ে ফুল, প্রজাপতি আর পাখির মেলা বাড়ির চারপাশে প্রকৃতির এক মুক্তাঙ্গন নির্মাণ করেছিল।

উপাসনা-মন্দির: আলো-স্থাপত্যের অভিনব মাত্রা

'তমসো মা জ্যোতির্গময়'—উপনিষদের মহামন্ত্র। জ্যোতি বা আলোই স্বয়ং ব্রহ্মের প্রকাশ। ব্রহ্মসাধক মহর্ষি তাই সকাল-সন্ধ্যায় সূর্যালোকে আকাশে আলোর নানা খেলার মধ্যে সেই ব্রহ্মের অস্তিত্ব অনুভব করতেন। উপাসনাবেদিতে শেষ বিকেলের হেমন্তের আলো, যাওয়ার আগে নানা রঙের উপহার দিয়ে যেত সাধককে। তাই ব্রহ্ম-উপাসনামন্দির নির্মাণে এই আলোক-স্থাপত্যকে রক্ষা করার কল্পনা এসেছিল দেবেন্দ্রনাথের মনে। সেকারণেই উপাসনা গৃহের দরজা-জানালা-দেওয়াল সবকিছুই নানা বর্ণের কাচের আভরণ দিয়ে নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন, যাতে প্রকৃতির আলো কোনওমতেই বাধাপ্রাপ্ত না হয়, বরং বিভিন্ন রঙের ছটায় সজীব ও পূর্ণ হয়ে ওঠে। তাই রঙিন কাচের আভরণে, ঢালাই-লোহাকে স্থাপত্যশিল্পরসে মিলিয়ে নিয়ে গড়ে উঠল উপাসনাগৃহ বা মন্দির। নিরাকার ব্রহ্ম সাধকের অন্তরে ধরা দিলেন আলো-স্থাপত্যের অনুভবে। মহর্ষির দার্শনিক ভাবনা ও উদ্দেশ্যকে কেন্দ্রে রেখে স্থাপত্য নির্মাণ আদর্শের নিদর্শন এই উপাসনা-গৃহ। ভূমিতল থেকে একটু উঁচুতে অবস্থিত, লোহা-কাচের ভালোবাসায় জড়ানো এই আশ্চর্য আলোক-স্থাপত্য।

এই উপাসনা-গৃহে জানালা-দরজা বলে আলাদা কিছু রইল না। সবটাই রঙিন কাচের আভরণ। ছাদের কাছ থেকে নীচের শ্বেতপাথরের মেঝে পর্যন্ত যার বিস্তার। স্থবির দেওয়াল বলেও আর কিছু রইল না। বাইরের আকাশ-আলোক মন্দিরের মধ্যে উন্মুক্ত হল। পৌষ উৎসবে বা খ্রিস্ট উৎসবের সন্ধ্যায় যখন উপাসনা-গৃহের অন্দর-বাহির আলোকিত হয়, তখন আলোকময় পরিবেশ, স্থাপত্যের অঙ্গে অঙ্গে ছড়িয়ে যেন আলো-আঁধারির ভাস্কর্যে রূপান্তরিত হয়। ১৮৯৪ সালে রবীন্দ্রনাথ 'ছিন্নপত্রাবলী'তে বলেছেন, "আমি আলো ও আকাশ এত ভালোবাসি। বোধ হয় আমার নামের সার্থকতার জন্য। গেটে মরবার সময় বলেছিলেন: More Light! আমার যদি সে সময় কোনও ইচ্ছা প্রকাশ করবার থাকে তো আমি বলি: More Light and More Space!..."[২] রবীন্দ্রনাথের এই আকাঙ্ক্ষা উত্তরায়ণ প্রাঙ্গনে শান্তিনিকেতনের পরবর্তী নির্মাণগুলির মধ্যেও ক্রমশ সম্প্রসারিত হতে দেখা যায়।

উত্তরায়ণ কমপ্লেক্স: গৃহস্থাপত্যের ব্যতিক্রমী ভাবনা

১৯১৬ সালে 'জাপান-যাত্রী' রবীন্দ্রনাথ জাপানের গৃহ-স্থাপত্য, শহর ও পরিবেশ নির্মাণশিল্পে মুগ্ধ হয়ে স্থাপত্য নিয়ে তাঁর নিজের ভাবনা-চিন্তাগুলিকে আরও বিস্তৃত করেছিলেন। নিরলংকৃতি ও পরিমিতি আর পাঁচটা শিল্পের মতো বাস্তুশিল্পেরও গোড়ার কথা। "এদের বাড়ি জিনিসটা অত্যন্ত অধিক নয়। দেওয়াল, কড়ি-বরগা, জানালা, দরজা যতদূর পরিমিত হতে পারে তাই। অর্থাৎ বাড়িটা মানুষকে ছাড়িয়ে যায়নি, সম্পূর্ণটা তার আয়ত্তের মধ্যে। একে মাজা, ঘষা, ধোয়া, পোঁছা দুঃসাধ্য নয়।"[৩] ঘরের অন্দরে আসবাবপত্র, চৌকি, টেবিলগুলো যেন বাধার সৃষ্টি না করে। এমনকি ফুল দিয়ে ঘর সাজানোর কথায় বলেছেন, "ফুলের সঙ্গে ব্যবহারে এদের না আছে দরাদরি, না আছে ঠেলাঠেলি, না আছে হট্টগোল।"[৪] অর্থাৎ গৃহস্থাপত্যের মধ্যে কোথাও যেন অনাবশ্যকতা না থাকে, আবার অনাদরও না থাকে। মানুষের জীবনযাত্রারূপ রচনাটিকে সৌন্দর্য প্রকাশের অভিনবত্বে নিয়ে যাওয়াই হল বাস্তুশিল্পের আদর্শ। বাস্তুশিল্পের এই আদর্শটিকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর আশ্রমের আবাস পরিকল্পনার সঙ্গে মিলিয়ে নিলেন। গৃহ-পরিকল্পনায় ঘেঁষাঘেঁষি, চাপাচাপিকে একেবারেই পছন্দ করেননি রবীন্দ্রনাথ। 'জাপানযাত্রী' বইতে তাঁর একটি সুন্দর কথা আছে—

"সৌন্দর্যবোধ একটা সাধনা, একটা প্রবল শক্তি। যে জিনিস যথার্থ সুন্দর তার চারিদিকে মস্ত একটি বিরলতার অবকাশ থাকা চাই। ভাল জিনিসগুলিকে ঘেঁষাঘেঁষি করে রাখা তাদের অপমান করা।...স্তব্ধতা ও নিঃশব্দতার দ্বারা মনের ক্ষুধাকে জাগ্রত করে তুলে, তার পরে এই রকম দুটি- একটি ভালো জিনিস দেখালে সে যে কী উজ্জ্বল হয়ে ওঠে..."[৫]

'বিরলতার অবকাশ' মানে মুক্ততা। একরকম খোলা পরিসর। এই খোলা পরিসরেই সৌন্দর্যবোধ যথার্থ ফুটে ওঠে। মানুষ তার দৈর্ঘ্যের মাপে মাপে দরজা-জানলা

বানায় না। কিছু মুক্ত পরিসর প্রয়োজন। নচেৎ তা কুৎসিত হয়ে উঠবে। বিষয়টি অন্যত্র আরও স্পষ্ট করে বলেছেন রবীন্দ্রনাথ—

"Life is perpetually creative because it contains in itself that surplus which ever overflows the boundaries of the immediate time and spaces, restlessly pursuing its adventure of expression in the varied forms of self realisation."[৬]

১৯১৯ সাল থেকে 'উত্তরায়ণ' প্রাঙ্গণে রবীন্দ্রনাথের সময়ে নির্মিত স্থাপত্য-সমষ্টি যেন এই চিন্তা-চেতনাতেই প্রকাশিত। উদয়ন, শ্যামলী, পুনশ্চ, উদীচি প্রভৃতি বাড়িগুলি গৃহবিন্যাসের অভিনবত্বে ও 'বিরলতার অবকাশে' নানান বৈচিত্র্য এনে দিয়েছিল। বাড়িগুলির আপাত বৈপরীত্যের মাঝেও স্থাপত্যের শিল্পরস ও পরিকল্পনার বিন্যাসে এগুলির মধ্যে একটা মূলগত ঐক্য আছে। প্রতিটি বাড়িতেই প্রাচ্যের স্থাপত্যকলার রূপ ও রসের সঙ্গে, পাশ্চাত্য বাস্তুবিদ্যার ব্যবহারিক কর্মপদ্ধতির একটা সমন্বয় আদর্শ গড়ে উঠেছিল। শান্তিনিকেতনের প্রখর গ্রীষ্ম আবার শীতের দাপট, দক্ষিণ-পশ্চিম আবার কখনও বা উত্তর-পূর্ব কোণ থেকে ভেসে আসা বাতাস এবং পাঁচজনে মিলিতভাবে আলাপ-আলোচনার জন্য প্রাচ্যের বৈঠকি মেজাজকে মনে রেখে বাড়ির সঙ্গে লাগোয়া বারান্দা ও বিভিন্ন ধরণের Work Station এর ব্যবহার। এই ধরণের নির্মিতি গৃহের অন্দরভাগের সঙ্গে বাইরের একটা পরিবেশ-উপযোগী সমন্বয় গড়ে তুলেছিল।

কোণার্ক

উত্তরায়ণ প্রাঙ্গণে ১৯২১-২২ সাল নাগাদ কোণার্ক বাড়ির সৃষ্টি সম্পূর্ণ হয়। স্থাপত্যশিল্পের দিক থেকে নানা কারণে বাড়িটি গুরুত্বপূর্ণ। বাড়িটির উঁচু প্লিনথের তলবিভাজন উচ্চতার তারতম্যের কারণে গৃহের সম্মুখভাগ ও অন্দরের মধ্যে একটি ছন্দবৈচিত্র্য হাজির করেছে। মূল ঘরের ভিতরের উচ্চতা প্রায় দু ফুটেরও বেশি। সামনের লাগোয়া বারান্দা-ঘরের মেঝের উচ্চতা প্রায় নয় ইঞ্চি। এরও বাইরে দোরগোড়ায় কাঁকড় মাটির বিন্যাস যেন আরও একটি তল তৈরি করে দিয়েছে।

তলবিন্যাসের এই উচ্চাবচতা গৃহবিন্যাসে একটি উপভোগ্য Performing Stage এর রূপ তৈরি করেছিল। রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য 'নটীর পূজা' একবার এখানেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রথমদিকে রবীন্দ্রনাথ দিগন্তকে যেন দেখা যায়, এমনি উচ্চধাপবিশিষ্ট ঘরের কথা ভেবেছিলেন। সেইমতো উঁচু ভিতের উপরভাগে শুধু থামযুক্ত উঁচু ঘর তৈরি হয়। পূর্বদিকে দুই ধাপ নীচে সারি সারি থামের সঙ্গে গড়ে উঠেছিল কোণার্কের বিখ্যাত লাল বারান্দা। কোণার্ক বাড়িতেই একসময় রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত কাঠের আসবাবগুলিকে বাতিল করে দিয়ে কংক্রিটের খাট, পড়ার টেবিল, তাক, ছোটো বসার জায়গা প্রভৃতি সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর বৈচিত্র্যসন্ধানী মনের এটিও এক প্রকাশভঙ্গি।

উদয়ন

স্থাপত্য নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সবচেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 'উদয়ন' বাড়িটি। দীর্ঘ আঠারো-উনিশ বছর ধরে নানা বৈচিত্র্যের রূপ ও বিন্যাসে শোভিত হয়ে, স্থাপত্য শিল্পের এক ব্যতিক্রমী রূপ প্রকাশে সমর্থ হয়েছে উদয়ন বাড়িটি। ১৯১৯-২০ সালে এই বাড়ি তৈরির কাজ শুরু হয় এবং বিভিন্ন সময়ে তা সম্প্রসারিত হতে হতে আজকের রূপটি সম্পূর্ণ হয় ১৯৩৮ সাল নাগাদ। আজকের ভাষায় যাকে Architectural elasticity বলা হয় তার সার্থক প্রয়োগক্ষেত্র এই উদয়ন। বাড়ি নিয়ে ভাঙা-গড়া ও পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে রবীন্দ্রনাথ শিল্পের একটি বিশেষ মাত্রা বলে মনে করতেন। সমকালীন স্থাপত্যশিল্পের চেয়ে অনেকখানি এগিয়ে আছে এই বাড়ির পরিকল্পনার সৌন্দর্য। এর অন্দরের বিভিন্ন অংশের উচ্চতার তারতম্যের প্রয়োগবৈচিত্র্য সবচেয়ে নজর কাড়ে। কোনো অংশ প্রায় তিনতলার কাছাকাছি। বাড়িটি প্রধানত কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথের ডিজাইন পরিকল্পনায় গড়ে উঠেছে। বাড়ির দোতলার বারান্দায় জয়পুর ঘরানার কংক্রিটের জালির কাজ রয়েছে। ঘরের অভ্যন্তরীণ সজ্জাও পরিকল্পনাপ্রসূত। শীতলপাটি ও কাঠের প্যানেল দিয়ে দেয়াল, কাঠের কারুকাজের সিলিং, নীচু বেদিতে বসার ব্যবস্থা সব মিলিয়ে এই বাড়ির ডিজাইন ভাবনা অত্যন্ত আধুনিক। Institutional Architecture এ যেমন বিভিন্ন Work Station গুলির মধ্যে একটা সমন্বয় দেখা যায়, ঠিক তেমনি উদয়ন বাড়িকেও বিভিন্ন Work Station হিসেবে ব্যবহার করার পরিকল্পনা করেছিলেন রথীন্দ্রনাথ। বাসস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই তা একাধারে অফিসঘর, রিহার্সাল স্থান, স্টুডিও, মিটিং হল, কমিটি রুম নানাভাবে ব্যবহৃত হয়।

এই বাড়ির অন্দর-সজ্জায় সুরেন্দ্রনাথ ও রথীন্দ্রনাথ নানা ধাঁচের প্রাচ্য স্থাপত্য-ডিজাইনের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন। ১৯২৭ সালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ জাভা-সুমাত্রাসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপরাষ্ট্রগুলি পরিভ্রমণ করেছিলেন। সেই অভিজ্ঞতাগুলিও এক্ষেত্রে কাজে এসেছিল। জাভা দেশের স্থাপত্যশিল্পের ছোঁয়া লেগেছিল এই বাড়ির বিন্যাসে। উদয়নকে পাশ থেকে দেখলে একে এক ত্রিমাত্রিক ভাস্কর্যরূপে পাওয়া যায়। এর শিল্পস্থাপত্য অভিজ্ঞতা আজকের প্রাতিষ্ঠানিক স্থাপত্যবিন্যাসের এক অনুপম আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত।

শ্যামলী

পরিকল্পনার অভিনবত্বের সঙ্গে বাড়ি তৈরির উপকরণ নিয়ে অসামান্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল হল 'শ্যামলী। 'শ্যামলী মাটির বাড়ি। ১৯৩৫ সালের জন্মদিনে এই বাড়িতে প্রবেশ করলেন রবীন্দ্রনাথ। এই বাড়ির মাটির দেওয়াল, মাটির ঢালু ছাদ। কবি লিখেছেন, 'শ্যামলী মাটির বাড়ি, এ আমার শ্যামলী, আমার শেষ আশ্রয়...ঘরে চৌকাঠ বলে কিছু থাকবে না, সিঁড়িও নয়, পথ আর ঘরের তফাতই বোঝা যাবে না। পথ আপনি এসে ঢুকবে ঘরে।'

Mud Architecture এর এক অভিনব দৃষ্টান্ত শ্যামলী। মাটির সঙ্গে গোবর, আলকাতরা আর বেনা গাছের টুকরো মিশিয়ে প্রায় স্টেবিলাইজড আর্থ ব্লকের মতো করে মাটির হাঁড়ির সেটিং তৈরি করে দেওয়াল করা হয়েছিল। সেইসঙ্গে দেওয়ালে আলকাতরার প্রলেপ দেওয়া হয়েছিল পোকা-মাকড়দের আক্রমণ ঠেকানোর জন্য। বহুকাল আগে রবীন্দ্রনাথ চন্দননগরে এমন প্রক্রিয়ায় নির্মিত একটি মাটির বাড়ি দেখেছিলেন। সেই অভিজ্ঞতা তাঁর স্মরণে ছিল। শান্তিনিকেতনের আবহাওয়ায় গ্রীষ্মকালে ঘর গরম হয়ে যায় আবার শীতকালে বেশি ঠাণ্ডা। তাই ঘরের চারিদিকে মাটির হাঁড়ি সাজিয়ে তার উপর চুন-বালির আস্তর দিয়ে দিলে দেওয়ালের ভিতরে হাওয়া আটকে থাকার দরুন ভিতরটা আরামদায়ক হয়। স্থাপত্যে স্থানীয় আবহাওয়ার এমন এক অসাধারণ প্রয়োগ হয়েছিল 'শ্যামলী'তে।

পুনশ্চ

'শ্যামলী'তে Mud Architecture নিয়ে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয় 'পুনশ্চ' তার পরের ধাপ। শ্যামলীর মাটির ছাদ নির্মাণের দ্বিতীয় বছরেই প্রবল ঝড় ও বর্ষণে ভেঙে পড়ে। এবার তাই ছাদ নির্মাণে কংক্রিটের সাহায্য নেওয়া হল। আজকের আধুনিক মৃত্তিকাস্থাপত্যে মাটির দেওয়ালের ওপর ছাদ তৈরিতে যেভাবে কংক্রিটের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে 'পুনশ্চ' ঠিক তেমনভাবেই প্রস্তুত। পোড়া মাটি, ইটের তৈরি থাম এবং দেওয়ালের ওপর ইস্পাতের বিম সংলগ্ন সমতল টালির ব্যবহারে পুনশ্চর স্থাপত্য এক নতুন পথের নির্মাণ করেছে।

'পুনশ্চ' বাড়িতে ঘরের আসবাবপত্রেরও ব্যাপক পরিবর্তন আনলেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯৩৬ সালে যখন তিনি এখানে থাকতেন, তখন বহু উপযোগী কাঠের বাক্সগুলোকে একাধারে Storage ও বসার জায়গা হিসেবে ব্যবহার করতেন। আবার কাঠের বাক্সগুলোকে একত্রিত করে, শয্যা এবং বিছানাপত্রের স্থান করে নেওয়া হয়েছিল। আসবাবপত্রের পরিকল্পনা, প্রয়োজনীয়তা, উপভোগ্যতা ও পরিমিতিবোধের সহজ-সরল রূপের মেলবন্ধন চেয়েছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের মতে ঘরে আসবাবপত্রের সংস্থান এমন হওয়া উচিত, যাতে 'চোখকে মিছিমিছি কোনো জিনিস আঘাত'না করে। "মন নিজেকে যতখানি ছড়াতে চায় ততখানি ছড়াতে পারে, পদে পদে জিনিসপত্রের উপর ঠোকর খেয়ে পড়ে না।"[৭] আধুনিক 'ডিজাইন ফার্নিচার' আর অন্দরসজ্জার এটাই হল মূল কথা, যা রবীন্দ্রনাথের চিন্তাপ্রসূত।

উদীচী

১৯৩৮ সালে 'উদীচী'বাড়ির নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবদ্দশায় এই বাড়িতেই শেষ থেকেছেন। পূর্বদিকে অবস্থান, তাই নাম উদীচী। এটি দোতলা বাড়ি। আশ্রমজীবনের প্রথমে রবীন্দ্রনাথ দোতলা 'দেহলী'বাড়ি তৈরি করেছিলেন। জীবনপ্রান্তে এসেও তিনি থাকলেন দোতলা বাড়িতেই। প্রথম জীবনের শিলাইদহের কুঠিবাড়ির দোতলার ঘরটি অথবা সুরুলকুঠির ছাদঘরটিই যেন উদীচির মধ্যে নতুন করে জেগে

উঠল। প্রথমে একতলাটা ছিল ফাঁকা। শুধুই কয়েকটি থামের ওপর দোতলার অংশটি ছিল, নীচে চারদিক খোলা। গাছেদের সবুজ বিন্যাসকে বাড়ির আরও কাছাকাছি নিয়ে আসা হল। পরে অবশ্য নীচের থামগুলোকে ঘিরে উপরের মতো ঘর গড়ে উঠেছিল। আধুনিক গৃহনির্মাণবিন্যাসে যাকে Duplex Housing বলে উদীচী ঠিক সেভাবেই গড়ে উঠেছে। উপরতলা ও একতলার সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহার ও গঠন-সংমিশ্রণে এই বাড়ি একটা সরল ব্যবহারিক রূপের সৃষ্টি করেছে। বসার ঘরের লাগোয়া ঝোলানো বারান্দা, মেঝের তলা পর্যন্ত লম্বা জানালা প্রভৃতিতে উত্তর-ভারতীয় স্থাপত্য-শৈলীর ছাপ স্পষ্ট। সঙ্গে মুঘল স্থাপত্যরীতির ধাঁচে জানলার উপরিভাগকে বিন্যস্ত করা হয়েছে। সঙ্গের চাতাল, বারান্দা, প্রকৃতির বিন্যাস—এই সবই মিলেমিশে ভারতীয় স্থাপত্যরীতির অনবদ্য বৈশিষ্ট্যগুলিকে মেলে ধরেছে। সব মিলিয়ে সৌন্দর্য ও উপভোগ্যতার একটি সার্থক মিলনক্ষেত্র হল রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশার শেষ আবাস 'উদীচী'।

শেষের কথা

আমাদের মনে রাখতে হবে, নানা অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে দিয়েই এই-সব গৃহস্থাপত্যগুলি নির্মিত হয়েছিল। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্মাণে বাহ্যিক বাহুল্যকে পরিত্যাগ করতে হয়েছে। ভাবনা-চিন্তা করতে হয়েছে কীভাবে খরচ কমিয়েও বাড়িগুলো সামগ্রিক বিশিষ্টতা নিয়ে আশ্রমের সামগ্রিক আদর্শের সঙ্গে যুক্ত হয়। শান্তিনিকেতনের নির্মাণ স্থাপত্য ভারতবর্ষের স্থাপত্য পরিকল্পনায় এক নতুন দেশজ চিন্তার অভিনবত্বকেই ফিরিয়ে নিয়ে এল। এই ধরণের প্রাতিষ্ঠানিক ক্যাম্পাস নির্মাণ আর কোথাও দেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথের ভাবনা ও দর্শনের সঙ্গে এই নির্মাণ সবসময় সংগতি রেখেছে। বাড়িগুলির গড়ে ওঠা উন্মুক্ত প্রকৃতি ও পরিবেশের বিস্তারকে কখনও আঘাত হানেনি। দিগন্তের রেখাকে আবৃত করে নয়, বরং তাকে সঙ্গে নিয়েই গড়ে উঠেছিল এইসব পরিকল্পনা। নিজের অস্তিত্বের চিৎকৃত রূপকে পরিহার করে পরিবেশের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠতা, এই সবই রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক প্রকৃতি-ভাবনার প্রকাশরূপ।

তথ্যসূত্র :

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ',বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ৭ই পৌষ ১৩৫৮, পৃষ্ঠা-৫৪।

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ছিন্নপত্রাবলী', ১৫৪ সংখ্যক পত্র, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৯৬০, পৃষ্ঠা-৩৩৬।

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'জাপানযাত্রী', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, জৈষ্ঠ্য ১৩৬৯, পৃষ্ঠা-৮৪।

৪. তদেব, পৃষ্ঠা-৮৫।

৫. তদেব, পৃষ্ঠা-৭৯।

৬. Rabindranath Tagore, The Meaning of Art, The Visva-Bharati quarterly, April, 1926.

৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'জাপানযাত্রী', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৮৪।

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আশ্রমের রূপ ও বিকাশ, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, পৌষ ১৩৫৮।

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জাপানযাত্রী, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, শ্রাবণ ১৩২৬।

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ছিন্নপত্রাবলী, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৭০।

৪. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবন কথা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ভাদ্র ১৩৬৬।

৫. অরুণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিনিকেতন স্থাপত্য পরিবেশ ও রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, জানুয়ারি ২০০০।

৬. অরুণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুবাতা ঋতায়তে, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, জানুয়ারি ২০০৫।

৭. সুরঞ্জনা ভট্টাচার্য, কবির আবাস, আনন্দ পাবলিশার্স, জানুয়ারি, ২০১৫।

৮. Samit Das, Architecture Of Santiniketan, Niyogi books, New Delhi, 2013.

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "বৈকুণ্ঠের উইল" উপন্যাসে পারিবারিক সম্পর্কের চালচিত্র

ফিরোজ আলি মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ
আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

সারসংক্ষেপ: "বৈকুণ্ঠের উইল" উপন্যাসে পরিবারের অভ্যন্তরীণ জীবনচিত্র এবং সেই পারিবারিক পরিমণ্ডলে বিরাজমান স্নেহ, ভালবাসা, পিতৃ-মাতৃ স্নেহ, পতিভক্তি, ভ্রাতৃপ্রীতি, ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব, দাম্পত্য সুখ কিংবা কলহ, বাৎসল্য প্রীতি, যথাযথভাবে প্রাধান্য পেয়েছে। পারিবারিক সম্পর্কের উত্থান-পতন এই উপন্যাসে লক্ষ করা যায়। এই উপন্যাসে পিতার এক পুত্রের প্রতি নির্ভরশীলতা ও বিশ্বাস, অন্য পুত্রকে অবিশ্বাস, পতিভক্তির প্রাবল্যে জননীর নিজ গর্ভজাত সন্তানকে সম্পত্তির অধিকারচ্যুত করে সতীনপুত্রকে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং সেই হেতু যন্ত্রণাদগ্ধ হওয়া, ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব থেকে ভ্রাতৃসম্প্রীতিতে উত্তরণ, বিমাতা ও বৈমাত্রেয় ভাইয়ের প্রতি শ্রদ্ধা, স্নেহ, মান-অভিমান বিভিন্ন দিকগুলি প্রাধান্য পেয়েছে।

মূলশব্দ: সম্পর্ক, স্নেহ-ভালবাসা, বিশ্বাস, নির্ভরশীলতা, অবিশ্বাস, আশাভঙ্গ, মান-অভিমান, পতিভক্তি, মাতৃস্নেহ, দ্বন্দ্ব, মিলন।

মূল আলোচনা: পরিবার একটি মৌলিক সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এই পরিবারের মধ্যে জন্মগ্রহণ, লালিত-পালিত হওয়া ও মৃত্যুবরণ করা। পরিবারের মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আত্মজনদের মধ্যে গড়ে ওঠা সম্পর্কের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে পরিবারের মধ্যে আদর্শময় পরিবেশ বজায় থাকা বা না থাকার বিষয়টি। এই সম্পর্কের গতি-প্রকৃতি শুধুমাত্র একরৈখিক ধারায় স্নেহ-ভালবাসা-শ্রদ্ধার পথ ধরে অগ্রসর হয় না; নানা দ্বন্দ্ব-সংঘাত-বিভেদ-বিচ্ছেদ-ঈর্ষা-হিংসাও সম্পর্কের মাধুর্যকে নষ্ট করে দেয়। সম্পর্কের এই উভয়মুখী ধারা শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন পারিবারিক উপন্যাসগুলিতে লক্ষ করা যায়। তেমনই একটি পারিবারিক উপন্যাস হল "বৈকুণ্ঠের উইল"। উপন্যাসটির প্রকাশকাল ১৯১৬।

আলোচ্য উপন্যাসে যে পারিবারিক সম্পর্কগুলি প্রত্যক্ষ করা যায় সেগুলি হল-

১) জননী ও পুত্রের সম্পর্ক

২) পিতা ও পুত্রের সম্পর্ক

৩) দাম্পত্য সম্পর্ক

৪) ভ্রাতৃদ্বয়ের সম্পর্ক

৫) শাশুড়ী ও পুত্রবধূর সম্পর্ক

১) **জননী ও পুত্রের সম্পর্ক:**

আলোচ্য উপন্যাসে জননী ও পুত্রের সম্পর্ক বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। সাধারণত সতীনপুত্রের প্রতি বিমাতার যে বিরূপ মনোভাব লক্ষ করা যায় তা এই উপন্যাসে প্রাধান্য পায়নি। ভবানী মাতৃহৃদয়ের উদারতা নিয়ে নিজ গর্ভজাত আত্মজ বিনোদ ও সতীনপুত্র গোকুলের প্রতি যথেষ্ট স্নেহ-ভালবাসা বর্ষণ করেছেন। গোকুলের প্রতি ভবানী কখনই ঈর্ষান্বিত হননি। তার মাতৃসত্ত্বা সংকীর্ণতায় পর্যবসিত হয়নি। স্কুলের পরীক্ষায় ডবল প্রমোশন পাওয়ায় পুত্র বিনোদকে ভবানী- "কোলে টানিয়া লইলেন এবং পুলকিত চিত্তে অসংখ্য আশীর্বাদ করলেন।"(১) অন্যদিকে গোকুল কমমেধাসম্পন্ন হওয়ায় পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে ম্লানমুখে বিমাতার সম্মুখে অশ্রুমোচন করতে থাকলে ভবানী মাতৃহৃদয়ের দরদী ভাষায় গোকুলকে প্রবোধ বাণী শোনান- "গোকুল, বেঁচে থাকতে গেলে এমন একশত দুঃখ সইতে হয় বাবা! মনের কষ্ট যে ছেলে হাসিমুখে সহ্য করে আবার চেষ্টা করে, সে-ই তো ছেলের মত ছেলে। কেঁদ না বাবা, আবার মন দিয়ে পড়, আসছে বছর পাশ হবে।"(২) এই কথার মধ্য দিয়ে গোকুলের প্রতি ভবানীর আশীর্বাদ বর্ষিত হয়েছে। পতিভক্তির আদর্শে ভবানী স্বামীর মতের বিরোধিতা না করে সম্পত্তির উপর গোকুলের অধিকারকে মেনে নেন। সম্পত্তি থেকে বিনোদ অধিকারচ্যুত হওয়ায় ভবানী বেদনাদগ্ধ হয়েছেন। ভবানীর এই হৃদয়বেদনা আবেগদরদী ভাষায় ঔপন্যাসিক ব্যক্ত করেছেন- "সে মন্দ হোক, যা হোক তিনি ত মা? সে তাঁহারই সন্তান? সেই দুর্ভাগ্য সন্তানের অন্ধকার-ভবিষ্যত চোখের উপর সুস্পষ্ট দেখিয়া তাঁহার মাতৃহৃদয় এইবার মাথা কুটিয়া কুটিয়া কাঁদিতে লাগিল।"(৩) গোকুল স্ত্রীর কথায় প্ররোচিত হয়ে স্নেহময়ী বিমাতাকে ভর্ৎসনা করলেও বিমাতার প্রতি তার আন্তরিক শ্রদ্ধা কখনোই বিলুপ্ত হয়নি। পুত্রবধূর কুমন্তব্য সহ্য করতে না পেরে ভবানী বিনোদের সঙ্গে নতুন ভাড়া বাড়িতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে গোকুল অতিসহজে তা মেনে নেয়নি। গোকুল স্নেহময়ী মাতাকে ত্যাগ করতে চায়নি। ভবানী অভিমানপূর্ণ অভিসন্তপ্ত হৃদয়ে গৃহত্যাগ করলে গোকুল ব্যথিত হৃদয়ে মাকে উদ্দেশ্য করে বলে- "ফেলে চলে গেলে মা! আমি কি তোমার ছেলে নয়? আমাকে কি তোমার মানুষ করতে হয়নি?"(৪) ভবানী গোকুলকে অপ্রমেয় স্নেহ করতেন। তিনি ভেবেছিলেন গোকুলের সংসারে সুখে শান্তিতে দিনযাপন করতে পারবেন। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। গোকুলের ভর্ৎসনা, তার স্ত্রীর কটু মন্তব্য ভবানীর অন্তরকে ক্ষত-বিক্ষত করেছিল। তাই এই পরিবার থেকে দূরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। অন্যদিকে বিনোদ সম্পত্তি না পাওয়ার জন্য কোনো উগ্র আচরণ করেনি। বরং এই দ্বন্দ্ব বিধ্বস্ত পরিবার থেকে মাকে মুক্তি দেওয়ার জন্য মায়ের সঙ্গে ভাড়া বাড়িতে চলে যায়। ভবানী আশা করেছিলেন যে, বিনোদের কাছে বসবাস করে তিনি সুখ পাবেন। কিন্তু মদ্যপ পুত্রের উৎকেন্দ্রিক, অসংগত জীবন-যাপন প্রত্যক্ষ করে ভবানীর আশা সম্পূর্ণ ভঙ্গ হয়। গোকুলের প্রতি ভবানীর অভিমান থাকলেও গোকুলের শ্রদ্ধা-ভালবাসা তার হৃদয়কে আনন্দে পরিপূর্ণ করে তুলেছিল। গোকুল কোনো

অভিমানকে গুরুত্ব না দিয়ে বৈশাখী সংক্রান্তির দিন ব্রাহ্মণ ভোজনার্থে যাবতীয় প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে ভবানীর কাছে আসে। গোকুলের এই স্বতঃস্ফূর্ত কর্ম-তৎপরতা প্রত্যক্ষ করে ভবানী অত্যন্ত আনন্দিত হন। গোকুলের কাছে ভবানীই হয়ে উঠেছে প্রকৃত উইল বা প্রধান সম্পত্তি। গোকুলের মাতৃপ্রীতি তার কথার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে- "কলিকাল-আর কি ধর্ম-কর্ম আছে? বাবা মরবার সময় মাকে আমাকে দিয়ে বললেন, বাবা গোকুল,এই নাও তোমার মা! আমি ভালোমানুষ-নইলে বেন্দার বাপের সাধ্যি কি, সে মাকে জোর করে নিয়ে আসে? কেন আমি ছেলে নই? ইচ্ছে করে যদি, এখনি জোর করে নিয়ে যেতে পারেনি? বাবার এই হ'লো আসল উইল.....শুধু দু'কলম লিখে দিলেই উইল হয় না।"(৫) জননী ও সন্তানের সম্পর্ক স্নেহ-ভালবাসা, মান-অভিমানে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে এবং এই সম্পর্ক বিচ্ছেদে পর্যবসিত হয়নি। গোকুল চাইলে স্বার্থপরের মত বিমাতাকে ভুলে জীবন কাটাতে পারত। গোকুল তা করেনি। ভবানীর স্নেহ-ভালবাসাকে সে কখনই ভুলে থাকতে পারেনি।

২) পিতা ও পুত্রের সম্পর্ক:

বৈকুণ্ঠ মজুমদার তার দুই পুত্র গোকুল ও বিনোদকে সমান চোখে দেখেননি। তিনি গোকুলকে যেমন বিশ্বাস করেছেন তেমন বিশ্বাস বিনোদকে করেননি। পুত্রদের প্রতি বৈকুণ্ঠের এই পৃথক মনোভাব মূলত ভবিষ্যতের কথা ভেবে। বৈকুণ্ঠ গোকুলের সরলতা, নিষ্কপট স্বভাব বৈশিষ্ট্যকে সমীহ করেছেন। অধিক শিক্ষিত না হলেও গোকুল নিজ স্বভাবগুণে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে এবং গোকুলের উপর ভাবানী ভবিষ্যতে নির্ভরশীল হতে পারবেন সে ঐকান্তিক বিশ্বাস বৈকুণ্ঠের ছিল। তাই বৈকুণ্ঠ স্ত্রী ভবানীকে বলেন- "ছোটছেলে তোমার কখনও জজিয়তি পাবে কিনা, বাঁড়ুয্যে মশায়ের মত সে ভরসা তোমাকে দিতে পারলুম না; কিন্তু আমার অবর্তমানে গোকুলের ওপর যে তোমরা নির্ভয়ে ভর দিতে পারবে, সে তোমাকে আমি নিশ্চয় বলে দিচ্চি।"(৬) কলকাতায় বিনোদের অসংযত জীবনযাপন বৈকুণ্ঠ সহ্য করতে পারেননি। তাই ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে সম্পত্তির উইল গোকুলের নামে করে দেন। গোকুলও পিতার বিশ্বাস বজায় রাখতে পেরেছিল। পিতা হিসাবে বৈকুণ্ঠ যথেষ্ট বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। পুত্রদের গুণাগুণকে তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। প্রথাগত শিক্ষার নিরিখে নয় বরং স্বভাব বৈশিষ্ট্যের দ্বারা পুত্রদের যাচাই করেছেন। যোগ্য পুত্রই পিতার সম্পত্তি রক্ষা করতে পারে। সেই যোগ্যতা বৈকুণ্ঠ গোকুলের মধ্যেই লক্ষ করেছিলেন। অসংযত জীবনযাপনে অভ্যস্ত বিনোদ কখনই সম্পত্তি রক্ষা করতে পারবে না এ কথা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বৈকুণ্ঠ। তার অবর্তমানে পরিবারে সমৃদ্ধি যাতে বজায় থাকে সেজন্যই জ্যেষ্ঠ যোগ্য পুত্র গোকুলকে সম্পত্তি প্রদান করে নিশ্চিন্তে মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

৩) **দাম্পত্য সম্পর্ক:**

দাম্পত্য সম্পর্ক

(বৈকুণ্ঠ ও ভবানী) (গোকুল ও মনোরমা)

ক) **বৈকুণ্ঠ ও ভবানীর দাম্পত্য সম্পর্ক:**
প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর বৈকুণ্ঠ সংসার পরিচালনা ও গোকুলের যত্ন ও লালন পালনের কথা ভেবে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। দ্বিতীয়া পত্নী ভবানী ছিলেন সংস্কারশীলা, দ্বায়িত্বশীলা নারী। ভবানী স্বামীর কাছে যেমন ভালবাসা পেয়েছে, তেমনই স্বামীর প্রতি ছিল তার অতলান্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি। পতিভক্তির প্রাবল্যে ভবানী স্বামীর মনোবাসনাকে সর্বাগ্রে গুরত্ব দিয়েছেন। স্বামীর বিরুদ্ধাচারণ তিনি কখনই করেননি। স্বামীর কষ্ট তিনি সহ্য করতে পারেননি। মৃত্যুশয্যায় শায়িত স্বামীর কষ্ট নিরসনের জন্য সম্পত্তির উপর গোকুলের একচ্ছত্র অধিকারকে অবিসংবাদে মেনে নেন। স্বামীর প্রতি অনুগতপ্রাণা ভবানীর ভূমিকা সত্যই প্রশংসনীয়।

খ) **গোকুল ও মনোরমার দাম্পত্য সম্পর্ক:**
মনোরমা সর্বদাই বৈষয়িক স্বার্থ বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়ে স্বামী গোকুলকে বশে রাখবার প্রয়াস করেছে। মনোরমা যখনই সুযোগ পেয়েছে তখনই স্বামীকে কুপরামর্শ দিয়ে ভবানী ও বিনোদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করবার চেষ্টা করেছে। স্ত্রীর কথায় গোকুল প্রভাবিত হলেও সেই প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। বরং গোকুল স্ত্রীর বিরোধিতা করে বিমাতা ও বৈমাত্রেয় ভাইকে শ্রদ্ধা ও স্নেহের প্রাবল্যে নিবিড়ভাবে আপন করে নিয়েছে। ভবানীর মধ্যে যে ত্যাগের মাধুর্য ও উদারতা প্রাধান্য পেয়েছে তার বিন্দুমাত্র মনোরমার মধ্যে লক্ষ করা যায়না। ভবানী কখনই নিজের স্বার্থপূরণের জন্য স্বামীকে কুপরামর্শ দেননি, বরং নিঃস্বার্থ চিত্তে স্বামীর অনুগত হয়েই থেকেছেন। কিন্তু মনোরমা সর্বদাই নিজের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে স্বামীকে কুপরামর্শ প্রদান করে সংকীর্ণ মনেরই পরিচয় দিয়েছে।

৪) **ভ্রাতৃদ্বয়ের সম্পর্ক:**
বৈমাত্রেয় ভাই বিনোদের প্রতি ছিল গোকুলের অধিক স্নেহ ও ভালবাসা। ভাই বিনোদকে দেখে গোকুল কখনই ঈর্ষান্বিত হয়নি। স্ত্রীর কথায় প্রভাবিত হয়ে গোকুল মাঝে মাঝে বিনোদের বিরোধিতা করলেও ভ্রাতৃপ্রীতিতে কোনো ভাঙন ধরেনি। তবে বিনোদ প্রথম থেকেই গোকুলের থেকে দূরত্ব বজায় রাখত। দীর্ঘদিন পর বিনোদ কলকাতা থেকে বাড়ি ফিরে এসে যতটা সম্ভব গোকুলকে উপেক্ষা করে চলেছে। গোকুল বিনোদকে সংসারের কাজে নিযুক্ত করতে চেয়েছিল। তাই পিতৃশ্রাদ্ধে পণ্ডিতদের খরচের হিসাব করার জন্য সিন্দুকের চাবি ও কাগজপত্র গোকুল বিনোদকে দিলে

বিনোদ তা প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে- “..........তাছাড়া এসব টাকাকড়ির ব্যাপার। আমি দীন-দুঃখী, হিসাব মিলিয়ে দিতে না পারলে চোর বলে তখন আপনিই হয়ত আমাকে পুলিশের হাতে দিয়ে জেল খাটিয়ে ছাড়বেন।”(৭) পিতৃসম্পত্তিতে কোনো অধিকার না থাকার তীব্র আক্ষেপ বিনোদের এই কথার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু দাদা গোকুলের প্রতি বিনোদের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে। গোকুলের দ্বায়িত্ববোধ ও যত্নশীলতা বিনোদের হৃদয়কে নমনীয় করে তোলে। বাঁড়ুয্যেমশাই প্রকাশ্যে গোকুলের নামে কুকথা বললে বিনোদ বিব্রত বোধ করে। বিনোদ গোকুলের উদারতা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। শেষে বিনোদ গোকুলের কাছে ক্ষমা ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করে- “আমি মদ খাই-আর যাই খাই দাদা, তোমাকে চিনি। তোমার পা ছুঁয়ে তোমাকেই যদি জোচ্চর বলি দাদা, ডান হাত আমার এখানেই খসে পড়ে যাবে। সে আমি বলতে পারব না; কিন্তু আজ এই পা ছুঁয়েই দিব্যি করে বলচি, মদ আর আমি ছোঁব না। আশীর্বাদ কর দাদা, তোমার ছোটভাই বলে আজ থেকে যেন পরিচয় দিতে পারি।...........”(৮) বিনোদ দাদা গোকুলের থেকে যে দূরত্ব সৃষ্টি করেছিল সেই দূরত্বের অবসান ঘটে এই ক্ষমা প্রার্থনার মধ্য দিয়ে। এই দুই ভাইয়ের সম্পর্ক ইতিবাচকতার আলোয় দেদীপ্যমান হয়ে ওঠে।

৫) **শাশুড়ী ও পুত্রবধূর সম্পর্ক:**

শাশুড়ী ও পুত্রবধূ রূপে ভবানী ও মনোরমার সম্পর্ক নেতিবাচকতায় পরিণত হয়েছে। এই নেতিবাচক মনোভাব মনোরমার মধ্যে লক্ষ করা যায়। ভবানী কখনই মনোরমাকে কটু কথা বলেননি, বরং মনোরমা যখনই সুযোগ পেয়েছে ভবানীর বিরুদ্ধাচারণ করেছে, তীব্র অপমানও করতে পিছপা হয়নি। পুত্রবধূ ও তার পিতার দ্বারা নিত্যদিন অপমানিত হতে হতে ভবানীর হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়। শাশুড়ী ও পুত্রবধূর সম্পর্কে কোনো বিবর্তন লক্ষ করা যায়নি। সংকীর্ণ মনোভাব মনোরমার মানবিকতাবোধকে নষ্ট করে দিয়েছিল। ভবানীর সুখী সংসারে অশান্তির অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেছিল মনোরমা। প্রবল স্বার্থপরতা, বিচ্ছেদের মানসিকতার দ্বারাই মনোরমা সর্বদা পরিচালিত হয়েছে। মাতৃসমা ভবানীকে সে কখনই সম্মান করেনি। পুত্রবধূর হীন ও নীচ আচরণ সহ্য করতে না পেরে ভবানী গৃহত্যাগ করেন।

পারিবারিক পরিমণ্ডলে এই পারিবারিক বিভিন্ন সম্পর্কগুলি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই উপন্যাসে সম্পর্কগুলি একই মাত্রা ধরে অগ্রসর হয়নি। তবে বলা যেতে পারে যে পরিবারের মধ্যে মৌলিক সম্পর্কগুলির মধ্যে মান-অভিমান, দ্বন্দ্ব, দূরত্ব প্রাধান্য পেলেও তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। পরিবারের মধ্যে বসবাসকারী সদস্যরা যতই আত্মিক বা রক্তের সম্পর্কে আবদ্ধ থাকুক না কেন মানসিকতার ভিন্নতার কারণে সম্পর্কের গতি প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়। এই উপন্যাসে পারিবারিক সম্পর্কের চালচিত্র যথাযথভাবে প্রতিভাত হয়ে উঠেছে।

তথ্যসূত্র:

১. চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র। বৈকুণ্ঠের উইল। শরৎ রচনাবলী(প্রথম খণ্ড)। কলকাতা, ভারত: শুভম্ প্রকাশনী, ২০০৯। পৃষ্ঠা-১৫২

২. তদেব, পৃষ্ঠা-১৫২

৩. তদেব, পৃষ্ঠা-১৫৬

৪. তদেব, পৃষ্ঠা-১৮১

৫. তদেব, পৃষ্ঠা-১৮৪

৬. তদেব, পৃষ্ঠা-১৫৪

৭. তদেব, পৃষ্ঠা-১৬৯

৮. তদেব, পৃষ্ঠা-১৮৬

সুভাষচন্দ্র ও জাতীয়তাবাদ

মহঃ আমিরুল ইসলাম
গবেষক ও প্রাবন্ধিক

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন আপাদমস্তক সংগ্রামশীল ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতা। তাঁর জাতীয়তাবাদী ধারণা ছিল নির্ভেজাল আপোষহীন সুদৃঢ় সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদ। সুভাষচন্দ্র সর্বদা সাহসিকতার সঙ্গে জাতীয়তাবাদের প্রচার ও লড়াই করেছিলেন। সবচেয়ে বড় কথা হল সুভাষচন্দ্রের বিশুদ্ধ জাতীয়তাবাদে সাম্প্রদায়িকতার কোনো স্থান ছিল না । জাতীয়তাবাদের তাত্ত্বিক আলোচনায় নেতাজির তেমন কোনো অবদান না থাকলেও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ তাঁরই গতিময় এবং সক্রিয় কার্যকর নেতৃত্বে দেশ ও বিদেশের মাটিতে এক সংগ্রামী প্রাণ খুঁজে পেয়েছিল। সুভাষচন্দ্র বসুর অবদানকে জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট সূচির মধ্যে আবদ্ধ রাখা সম্ভব নয়। সুভাষচন্দ্র বসুর অভিমত অনুসারে ইউরোপীয় জাতিগুলি অধিকতর উন্নত, এরকম একটি দৃঢ়মূল মনোভাবের জন্য ভারতীয়দের পরাধীনতার গ্লানি সহ্য করতে হচ্ছে। ত্রিশ কোটি ভারতীয় মুষ্টিমেয় ইংরেজদের দ্বারা শোষিত হচ্ছে। এর থেকে বিস্ময়কর ব্যাপার আর কি হতে পারে। অথচ ভারতবাসীর অতীত অতি গৌরবময়, কিন্তু ভারতীয়রা তাদের অতীত সম্পর্কে আজ বিস্মৃত। অতীত গৌরবের এই বিস্মৃতি আজ আমাদের অধঃপতন ডেকে এনেছে। আমরা যদি মহিমান্বিত অতীতকে স্মরণ করি তাহলে আমাদের আত্মবিশ্বাস জাগ্রত হবে। ছাত্রাবস্থা থেকেই সুভাষচন্দ্রের মধ্যে জাতীয়তাবাদের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। তাঁর জীবনে জাতীয়তাবাদের প্রথম সূত্রপাত কটকের প্রোটেস্ট্যান্ট ইউরোপিয়ান স্কুলে ও পরবর্তীকালে রেভেন্স'শ স্কুলে। প্রোটেস্ট্যান্ট ইউরোপিয়ান স্কুলে সুভাষচন্দ্র শিক্ষকগণ ও অধিকাংশ শিক্ষার্থী বন্ধুদের নিকট অতি প্রিয় ছিলেন। কিন্তু গুটিকতক ইউরোপিয়ান ছাত্র বন্ধুর আচার আচরণ তথা জাতিগত ও বর্ণগত ঔদ্ধত্য তাঁর শিশুমনকে পীড়া দিয়েছিল। শিশু হলেও তাঁর বোধ ও উপলব্ধি এত প্রখর ছিল যে , তিনি তাঁর ইউরোপিয়ান বন্ধুদের জাতিগত ও বর্ণগত ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের কারণে পরবর্তীকালে প্রতিবাদ করেছিলেন ও ঘৃণার চোখে দেখেছিলেন। কার্যত শৈশবকাল থেকেই সুভাষচন্দ্র ব্রিটিশজাতিকে ঘৃণা করতে শিখেছিলেন তাদের উদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের জন্য। এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত গবেষক কালিচরণ ঘোষ মহাশয়ের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য - "Subhash Chandra was dear to most of his schoolmates but the racial arrogance of some of them made him from that age a hater of the nation to which the boys claimed their origin." [১]

পরবর্তীকালে প্রেসিডেন্সি কলেজে স্নাতকস্তরে সাম্মানিক বিভাগে পাঠরত অবস্থায় এবং ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে আই সি এস পরীক্ষায় কৃতিত্ব সহকারে উত্তীর্ণ হওয়র পর পুনরায় জাতীয়তাবাদের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল সুভাষচন্দ্রের জীবনে। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক এফ সি ওটেন(F C Oten) ভারতীয়দের সম্বন্ধে অশালীন মন্তব্য করলে তরুণ ছাত্র সুভাষচন্দ্র শিক্ষক ওটেন সাহেবকে অপদস্থ করতে ছাড়েননি।

সুভাষচন্দ্র মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন সুযোগ সুবিধার স্বার্থে কৌশলের নীতি অনুসরণ করলে জাতি গঠন করা যাবে না। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য জাতির মধ্যে ব্যাপকভবে মানসিক প্রস্তুতি আবশ্যক। জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র স্বামী বিবেকানন্দের বাণীর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সুভাষচন্দ্র রাজনৈতক স্বাধীনতা লাভের জন্য চূড়ান্ত আত্মত্যাগের অপরিহার্যতার কথা বলেছেন। 'The Indian Struggle' গ্রন্থে সুভাষচন্দ্র বলেছেন যে, দেশব্যাপী জনসাধারণ যখন প্রচন্ড উন্মাদনায় উজ্জীবিত, তখন সকলে আশা করেছিলেন যে, জাতীয় কংগ্রেস সাহসের সঙ্গে উপযুক্ত ভূমিকা পালন করবে। জনসাধারণ যখন তৈরি ছিল, কংগ্রেস এবং নেতারা তখন প্রস্তুত ছিলেন না। অথচ সুভাষচন্দ্র মনে করতেন যে কংগ্রেসকেই বিকল্প সরকারের ভূমিকা পালন করতে হবে। তিনি কংগ্রেসের চিন্তা ভাবনাকে অধিকতর মৌলিক ও গঠনমূলক করতে চেয়েছিলেন।

ব্রিটিশদের দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পেতে হলে দৃঢ়সংকল্পতার মরণপণ সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। ব্রিটিশ দ্রব্য বয়কট করে, চরকা কেটে বা আইন সভায় যোগ দিয়ে সম্পূর্ণ স্বরাজ পাওয়া যাবে না। জাতীয় আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি গান্ধীজীর উপায় পদ্ধতিকে সমর্থন করেননি। পরিস্থিতি মোকাবিলায় গান্ধীজীর সহজ-সরল খোলামেলা আচরণ সুভাষচন্দ্রের মধ্যে অস্থিরতার সৃষ্টি করেছিল। সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতার দৃঢ়তা ও উজ্জীবিত ভূমিকা আশা করেছিলেন। তাঁর 'The Indian struggle' শীর্ষক গ্রন্থে সুভাষচন্দ্র বলেছেন: "if the Mahatma had spoken in the language of dictator Stalin of duce musolini or Fuhrer Hitler, Jhon Bull would have understood and bowed his head in respect".

ভারতীয়দের প্রতি ব্রিটিশদের ঘৃণা ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ সুভাষচন্দ্রের জাতীয়তাবোধকে এতই ভয়ঙ্কর করে তুলেছিল যে, তিনি তাঁর এক বন্ধুকে পত্র দ্বারা লিখেছিলেন: "I feel most joyful when the white skins serve me and polish my shoes".[২] অর্থাৎ আমি অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করব, যখন দেখব সাদা চামড়ার ব্যক্তি আমার সেবা করছে এবং আমার জুতা পালিশ করছে।

১৯১৯ সালের অক্টোবর মাসে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তালিম নিয়ে মাত্র আট মাসের মধ্যে আই সি এস পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান লাভ করে সুভাষচন্দ্র সাদা চামড়ার মানুষদের বুঝিয়ে দিতে পেরেছিলেন যে, কালো চামড়ার মানুষদের মেধাশক্তি তাদের থেকে কোন অংশে কম নয়। আবার তিনি চাকুরীতে যোগদান না করে অহংকারী ব্রিটিশদের বুঝিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, কালো চামড়ার ভারতীয়রা যোগ্য হওয়ার সত্ত্বেও তাদের দেওয়া উচ্চপদস্থ চাকুরী কে ভারতীয়রা ঘৃণা করেন। অন্যত্র এর প্রমাণ পাওয়া যায় ভারতের জন্য নিযুক্ত আন্ডার সেক্রেটারিকে লেখা এক পত্র হতে: "I don't think one can be loyal to the British Raj and at the same time serve one'own country honestly"[৩] অর্থাৎ আমি মনে করি না যে কেউ ব্রিটিশরাজের প্রতি অনুগত থেকে একি সাথে নিজে দেশের সৎভাবে সেবা করতে পারে। এটা অসম্ভব। তাই আমি ব্রিটিশরাজ প্রদত্ত চাকুরী স্বেচ্ছায় ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলাম। ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে সুভাষচন্দ্রের জাতীয়তাবাদী ধ্যান ধারণার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। ১৯২০-১৯৪৫ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ পঁচিশ বছরের সেই সংগ্রাম জাতীয়তাবাদ বা militant nationalism অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠেছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামের আপোষহীন সৈনিক সুভাষচন্দ্রের নিকট জাতীয় মুক্তি বা স্বাধীনতা ছিল সবচেয়ে কাঙ্খিত বিষয়। কলকাতায় প্রদত্ত এক বক্তৃতায় তিনি উল্লেখ করেন:- "পরাধীন দেশে যদি কোন 'ism' সর্বান্তকরণে গ্রহণ করতে হয়, তা হল 'nationalism' সুতরাং সর্বাগ্রে আমাদের স্বাধীনতা লাভ করতে হবে"।[৪] আবার বহু ভাষা-ভাষী -জাতি- ধর্ম- বর্ণ -সম্প্রদায় অধ্যুষিত এই সুবিশাল ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা যে সহজসাধ্য ব্যাপার নয়, সে বিষয়ে সুভাষচন্দ্র সচেতন ছিলেন। সেই কারণে তিনি ভারতবর্ষের মূলগত ঐক্যের কথা জাতিকে স্মরণ করিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন এবং বলেছেন:- "ভারতীয় সমাজের অন্তর্নিহিত ঐক্য এবং ভারতীয় সভ্যতার প্রবাহমানতা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে সচেতন হতে হবে। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, বাংলা থেকে গুজরাট একটি সভ্যতা"।[৫] স্বামী বিবেকানন্দের মতো সুভাষচন্দ্র স্বাধীনতাকে ইহজীবনের অমৃত সুধা এবং আত্মার সংগীত হিসাবে গণ্য করেছেন। সুভাষের কাছে স্বাধীনতা হল এক সীমাহীন সম্পদ, মানব জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য। আত্মার স্বাধীনতাকে তিনি মানবদেহের জন্য অক্সিজেনের মতোই অপরিহার্য বলে মনে করতেন। সুভাষচন্দ্র আশা পোষণ করতেন যে, খুব অল্প সময়ের মধ্যে ভারতবাসী তাদের হারানো গৌরব ফিরে পাবে এবং জাতীয় পতাকা ও সামরিক বাহিনীর অধিকারী হবে। পৃথিবীর সকল স্বাধীনদেশের রাজধানীতে ভারত রাষ্ট্রদূত পাঠাবে।

নির্ভেজাল জাতীয়তাবাদী সুভাষচন্দ্রকে ব্রিটিশ গোয়েন্দা গৃহবন্দী করে রাখতে পারে নাই। সকলের চোখে ধুলো দিয়ে প্রখ্যাত এই জাতীয়তাবাদী নেতা জার্মান পলায়ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। একজন ব্যক্তির দেশের প্রতি কতটা অদম্য প্রেম থাকলে

এই সকল কাজ করা সম্ভব তা কেবলমাত্র অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করা যেতে পারে। স্বদেশবাসীর স্বাধীনতার স্বার্থে সুভাষ দেশত্যাগ করেছেন এবং বিদেশের মাটিতে ভারতের স্বাধীনতার জন্য এক বিপ্লবী আজাদহিন্দ বাহিনী গঠন করেছেন। এ হল স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকার বা বিপ্লবী সরকার। এই বাহিনীর মাধ্যমে বা অস্থায়ী সরকারের মাধ্যমে সুভাষচন্দ্রের জাতীয়তাবাদী প্রকৃতির চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটেছে।

সুভাষচন্দ্র বসুর কিছু সাংগঠনিক গুণাবলী তাঁকে সর্বোত্তম জাতীয়তাবাদী হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। এ প্রসঙ্গে তাঁর কিছু কাজকর্ম উল্লেখযোগ্য। সুভাষচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রনেতা হিসাবে ইংরেজ শিক্ষকের ঔদ্ধত্যপূর্ণ উন্নাসিক ও আপত্তিকর আচরণের প্রতিবাদ করেছিলেন। ভারতীয় স্বাধীনতা লীগ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর গঠনমূলক ভূমিকা; স্বরাজ পার্টির কর্তাব্যক্তি হিসাবে তিনি আমূল সংস্কার মূলক ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়নে কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছিলেন। এমনকি প্রিন্স অব ওয়েলসের সারা ভারত ভ্রমণের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন।

সুভাষচন্দ্র বসু মনে করতেন সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে কেবলমাত্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না, এই আন্দোলনকে পশ্চিমী সাংস্কৃতিক আধিপত্যের বিরুদ্ধেও সংগঠিত করতে হবে। এর কারণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন-ব্রিটিশরা কেবলমাত্র ভারতবর্ষে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেই ক্ষ্যান্ত থাকেনি বরং তারা ভারতীয়দের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন ধারাতেও হস্তক্ষেপ করেছে। সুভাষচন্দ্র মনে করতেন ভারত ও ভারতবাসীদের বিদেশী মতাদর্শ ও পন্থা -পদ্ধতির প্রভাব থেকে সর্বপ্রকার মুক্তি আবশ্যক। তিনি সম্পূর্ণভাবে স্বদেশী আন্দোলনের কথা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন। তিনি স্বামীজীর মত বিশ্বাস করতেন যে, সমস্ত জগতের জন্য একটি মহান বাণী আছে, যার জন্য জগৎ প্রতীক্ষা করছে। স্বামীজি বলেছিলেন:- "আমাদের একটা জাতীয় ভাব আছে, যেটা জগতের জন্য এখনও আবশ্যক।----- আমাদের এখনও জগতের সভ্যতা ভান্ডারে কিছু দেবার আছে।তাই,আমরা বেঁচে আছি"।[৬]

স্বামীজি তাঁর দিব্য দৃষ্টিতে পরিষ্কারভাবে দেখতে পেয়েছিলেন যে, ভারতবর্ষ ক্রমশ সেই পরম গৌরবময় ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছে এবং তার সার্থক রূপায়ণ নির্ভর করছে ভারতের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উপর। স্বামীজীর সেই সার্থক ভবিষ্যৎ বাণীর সার্থক প্রতিনিধি হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী র প্রতিধ্বনি করে সুভাষচন্দ্র পরবর্তীকালে বলেছিলেন:-"ভারতীয় জাতি একাধিকবার মরেছে-কিন্তু মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাভ করেছে। তার কারণ এই যে, ভারতের অস্তিত্বের সার্থকতা ছিল এবং এখনও আছে। ভারতের একটা বাণী আছে যেটা জগতসভায় শোনাতে হবে। ভারতের শিক্ষার মধ্যে এমন কিছু আছে যা

বিশ্বমানবের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় এবং যা গ্রহণ না করলে বিশ্বসভ্যতার প্রকৃত উন্মেষ হবে না।------দেশান্তরে কারাবাসে মাসের পর মাস যখন কাটিয়েছি তখন প্রায়ই এই প্রশ্ন আমার মনে উঠতো--'কিসের জন্য' 'কিসের উদ্দীপনায় আমরা কারাবাসের চাপে ভগ্নপ্রায় না হয়ে আরো শক্তিমান হয়ে উঠেছি'? নিজের অন্তরে যে উত্তর পেতাম তার মর্ম এই যে, ভারতের একটা শুভব্রত বা mission আছে, একটা গৌরবময় ভবিষ্যৎ আছে : সেই ভবিষ্যৎ ভারতের উত্তরাধিকারী আমরাই। নুতন ভারতের মুক্তির ইতিহাস আমরাই রচনা করছি বা করব"।[৭] পরবর্তীকালে সুভাষচন্দ্র টোকিওতে ঘোষণা করেছিলেন যে, ভারতের সনাতন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে এক নতুন ধর্মবীর জাতি গঠনে তাঁর জীবনের লক্ষ্য। সুভাষচন্দ্রের স্বদেশ প্রেমের উৎস প্রসঙ্গে তাঁর বন্ধু দিলীপ কুমার রায় লিখেছেন:- "স্বামীজীর দেশ ভক্তির এই দিব্য আদর্শ যে সুভাষকেও আকৈশোর অনুপ্রাণিত করেছিল এ আমার কথার কথা নয়। বিনিদ্র রাতে কত দিনই তার সঙ্গে এ আলোচনা হয়েছে আমার, শুধু এদেশে নয় বিলেতেও। তাই আমি এ কথা অকুতো ভয়েই বলতে পারি যে, যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের তপশক্তিতেই বিবেকানন্দের প্রসূতি, তেমনি বিবেকানন্দের তেজশক্তিই নেতাজির দেশাত্মবোধের জনয়িত্রী তথা ধারয়িত্রী ছিল প্রথম থেকেই"।[৮]

সুভাষচন্দ্রের জাতীয়তাবাদ ছিল প্রগতিশীল প্রকৃতির। যেখানে সংকীর্ণতার লেশমাত্র নেই, আছে কেবল সেবা ও ত্যাগের আদর্শ। সুভাষচন্দ্র জাতি গঠনের উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাঁর জাতীয়তাবাদ কখনো জঙ্গি প্রকৃতির ছিল না। ন্যায়-সাম্য ও স্বাধীনতার পথে তিনি জাতির জীবনকে পরিচালনা করতে চেয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্রের প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদ আন্তর্জাতিকতাবাদের পরিপন্থী নয় বরং অনুপন্থী। স্বাভাবিক কারণে তাঁর জাতীয়তাবাদ হলো আন্তর্জাতিকতাবাদের পূর্ব শর্ত এবং আন্তর্জাতিকতাবাদে উপনীত হবার উপযুক্ত উপায়। এই কারণেই সুভাষচন্দ্র বসু ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামকে সংকীর্ণতা, ঘৃণা ও বিদ্বেষের হাত থেকে রক্ষা করার উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

'তরুণের স্বপ্ন' গ্রন্থে সুভাষচন্দ্রের ভাবনাগুলি জাতীয়ভাবে সমুজ্জ্বল। তিনি কত সহজেই বলেন:- 'আমরাই দেশে দেশে মুক্তির ইতিহাস রচনা করিয়া থাকি। আমরা শান্তির জল ছিটাইতে এখানে আসি নাই। বিবাদ সৃষ্টি করিতে, সংগ্রামের সংবাদ দিতে, প্রলয়ের সূচনা করিতে আমরা আসিয়া থাকি। যেখানে বন্ধন, যেখানে গোড়ামী, যেখানে কুসংস্কার, যেখানে সংকীর্ণতা-সেখানেই আমরা কুঠার হস্তে উপস্থিত হই '।

সুভাষচন্দ্রের এই ডাক, এই বাণী যেন বিবেকানন্দেরই শাশ্বত বাণী। তিনি দেশের তরুণ সম্প্রদায়কে নিয়ে আত্মবিশ্বাসী কর্মী সংগঠন গঠনের মাধ্যমে দেশের মুক্তি চাইছিলেন। তাঁর সংগ্রাম ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে ও সংহতির পক্ষে, তিনি তরুণের অগ্রদূত হয়ে কংগ্রেসের মধ্যে তাঁর সংশোধনের আন্দোলন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন।

তরুণের প্রতিনিধি হিসাবে বিদেশের মাটিতে আজাদহিন্দ বাহিনী গঠন তাঁকে ইতিহাসে চিরস্মরণীয় করে রাখবে।

তথ্যপঞ্জি:

১. Kali Charan Ghosh : 'A Saint Turns Patriot' page 468

২. Kali Charan Ghosh:''A Saint Turns Patriot' in V.Grover's political thinkers of Modern India.page ,-466

৩. 'Kali Charan Ghosh:'A Saint Turns Patriot'

৪. শ্রী সুভাষচন্দ্র বসু, সমগ্র রচনাবলী (তৃতীয় খন্ড) পৃঃ-১৬৩

৫. ঐ

৬. স্বামী বিবেকানন্দ,:- বাণী ও রচনাবলী; ষষ্ঠ খন্ড,

৭. সুভাষচন্দ্র বসু :- 'তরুণ এর স্বপ্ন' পৃষ্ঠা ১১

৮. 'বিশ্ব বিবেক ' পৃষ্ঠ-২৩৪

গ্রন্থপঞ্জি/গ্রন্থ নির্দেশনা:

১. 'ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাস:- ডক্টর সুভাষচন্দ্র সোম (দ্বিতীয় খন্ড) ক্যালকাটা বুক হাউস

২. 'ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শন':- অনাদিকুমার মহাপাত্র ও প্রদ্যুম্ন বন্দ্যোপাধ্যায় সুহৃদ পাবলিকেশন

৩ ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার ধারা:- দেবাশীষ চক্রবর্তী, সেন্ট্রাল বুক পাবলিকেশন

আধুনিক বাংলা কবিতায় মরিচঝাঁপি প্রসঙ্গ

ইন্দ্রজিৎ ঘোষ

গবেষক ও প্রাবন্ধিক

সারসংক্ষেপ: মরিচঝাঁপি। অনেকের কাছে নামটিই একটি মূর্তিমান আতঙ্ক। অনেকের কাছে পদ হারানোর ভয়। আবার অনেকের কাছে নিজের লোকের দ্বারা সৃষ্ট হওয়া সামান্য একটু ভুল; যেটি নিয়ে নিন্দুকেরা বাড়াবাড়ি করছে। এহেন একটি ঘটনা যে বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাবে তা অস্বাভাবিক নয়। সেই সঙ্গে ভারতের মত একটি জাতপাত বিচার করা দেশে নিম্নবর্ণের মানুষেরা চিরকাল অবহেলিত। ইতিহাস সেভাবে স্থান না দিলেও সাহিত্য নিম্নবর্গের মানুষদের আলাদা পরিচিত দেয়। কিন্তু মরিচঝাঁপি ঘটনা ব্যতিক্রমী হয়ে দাঁড়াল। উদ্বাস্তু মানুষগুলি দেশভাগের পর ইতিহাস ও সাহিত্যের বেশি অংশ দখল করে রাখলেও ত্রিশ বছরের ব্যবধানে উভয় (ইতিহাস ও সাহিত্য) স্থান থেকেই প্রায় মুছে গেল। হাতে গোনা কয়েকটি ইতিহাস কেন্দ্রিক গ্রন্থ ও গোটা কয়েক উপন্যাস, ছোটগল্প ও কমবেশি দশটির মত কবিতায় মরিচঝাঁপি উদ্বাস্তু মানুষেরা জায়গা দখল করল। কিন্তু কেন এই পরিণতি, সাহিত্য হয়ে ওঠার সমস্ত উপাদান মজুত থাকলেও, তা হল না কেন? আর যেটুকু মরিচঝাঁপির ঘটনা সাহিত্যে স্থান পেল, সেটা বাংলা সাহিত্যে কতটা প্রভাব ফেলেছে?

সূচক শব্দ: মরিচঝাঁপি, আধুনিক বাংলা কবিতা, কবিতায় রাজনৈতিক প্রসঙ্গ, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পটভূমিকায় উদ্বাস্তুদের ভূমিকা।

মূল আলোচনা:

অনালোচিত নয়, কম আলোচিত রাষ্ট্র কর্তৃক হত্যার কাহিনি হল ‘মরিচঝাঁপি’। রটনা ও ঘটনার বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে যাওয়া নিপীড়িত মানুষের আর্তনাদের ইতিহাস ‘মরিচঝাঁপি’, কিছু অতিসচেতন মানুষের চেষ্টায় হাতে গোনা কয়েকটি সংবাদপত্রে প্রকাশ পেলে সাধারণের গোচরে আসে। কিন্তু তৎকালীন সরকারের বাদান্যতায় অচিরেই তা সাধারণের মন থেকে হারিয়ে যায়। তবে সাহিত্য পাঠের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বলতে পারি, উৎপীড়ত মানুষের জীবন সংগ্রাম সাহিত্যে স্থান পায়। কিন্তু কোন এক অজানা কারণে সাহিত্যও মরিচঝাঁপি সম্পর্কে নীরব। যেখানে দেশভাগের পর বাংলা সাহিত্যের মূল বিষয় হয়ে ওঠে উদ্বাস্তু জীবন সেখানে ১৯৭৮/৭৯-তে সেই মানুষগুলির জীবনই সাহিত্যে স্থান পেল চার থেকে পাঁচটি উপন্যাস, হাতে গোনা কিছু ছোটগল্প ও গোটা কয়েক কবিতায়। বামফ্রন্টের শরিক দল আর. এস. পি. নেতা প্রফুল্ল মণ্ডলের মরিচঝাঁপিকে ‘জালিয়ানওয়ালাবাগ’ বলে উল্লেখ করা ঘটনাটির কী কোন

উপাদান ছিল না সাহিত্য হয়ে হয়ে ওঠার মত, নাকি মরিচঝাঁপির সাহিত্যে উল্লিখিত না হওয়ার অন্য কোন কারণ ছিল। বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়ার আগে প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে মরিচঝাঁপির ভূগোল ও ইতিহাস সম্পর্কে পরিচয় নেওয়ার।

২

সুন্দরবনের এক অখ্যাত দ্বীপ অঞ্চল মরিচঝাঁপি। ১৯৭৯ সালে হটাৎ-ই মরিচঝাঁপির ঘটনা ক্রমশ উন্মোচিত হতে থাকে। তবে মরিচঝাঁপির ঘটনা শুধুমাত্র ১৯৭৮- ১৯৭৯ সময়কালেই সীমাবদ্ধ ছিল না; এর বিস্তৃতি ছড়ানো ছিল ১৯৫৭ সালে দণ্ডকারণ্য পুনর্বাসন প্রকল্প গৃহীত হওয়া থেকে।

১৯৫২ সালের পরবর্তীতে পশ্চিমবঙ্গে আগত উদ্বাস্তুদের (যাদের বেশিরভাগই ছিল নমঃশূদ্র সম্প্রদায়) এরাজ্যের পরিবর্তে ওড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের অনুন্নত পাথুরে জমির প্রায় ২৫০০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার। অন্যান্য পেশায় নিযুক্ত উদ্বাস্তু মানুষগুলি এই পুনর্বাসন মেনে নিলেও কৃষিকার্যে নিযুক্ত মানুষগুলি পাথুরে জমিতে কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতে না পেরে পশ্চিম বাংলার জমিতে ফিরতে চায়। তাদের ভাবনায় ইন্ধন জোগায় তৎকালীন বিরোধী বামদলগুলি। ১৯৫৭ সালে দণ্ডকারণ্য প্রকল্পের শুরু থেকে বামদলগুলি বলে আসছিল পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসন সম্ভব এবং তারা পশ্চিমবঙ্গের বাইরে পুনর্বাসনে বিধানচন্দ্র রায়ের (তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী) বিরোধিতা করেন। ১৯৬৩ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু আগমন শুরু হলেও ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এলে দণ্ডকবাসী উদ্বাস্তুদের মনে আশার সঞ্চার হয়। ১৯৭৮ সালের প্রথম থেকে বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে আসতে থাকে। ১৯৭৮-এর ২৬ এপ্রিল আনন্দবাজার পত্রিকা তাদের প্রতিবেদনে উদ্বাস্তু আগমনের এক খতিয়ান তুলে ধরে।

হাসনাবাদে উদ্বাস্তু সংখ্যা ১১,১০৬

চর হাসনাবাদে উদ্বাস্তু সংখ্যা ১৬৯২৯

কুমিরমারী ও বাগনায় উদ্বাস্তু সংখ্যা ৫০০০ [১]

তবে উক্ত সময়ের কয়েকদিন আগে থেকেই মরিচঝাঁপিতে উদ্বাস্তুরা বসবাস শুরু করে করেছিল। “১৯৭৮ সালের ১৮ এপ্রিল দশ হাজার উদ্বাস্তু কুমিরমারী পার হয়ে মরিচঝাঁপি আশ্রয় নেয়।”[২] সকল উদ্বাস্তুদের সরকারের কাছে দাবি ছিল- কোন ডোল বা সাহায্য নয়; বসবাসের জন্য এক টুকরো জমি।

মানুষের জন্য কাজ করে যাওয়া ও দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হওয়া একটি রাজনৈতিক দলের মানুষের সঙ্গ পরিত্যাগ করে প্রকৃত শাসক হয়ে উঠতে সময় লাগল মাত্র দুই বছরের মত সময়। ১৯৭৭-এর জুন থেকে ১৬ মে ১৯৭৯। ১৯৭৭-এর বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্টের বিপুল জনসমর্থনের মধ্যে দিয়ে বাংলার মসনদ দখল করে। ক্ষমতায় আসীন হয়ে উদ্বাস্তু নিয়ে বামফ্রন্টের মনোভাবে বদল

আসে। তারা সমগ্র উদ্বাস্তু আগমনকে বিরোধীদের চক্রান্ত বলে চিহ্নিত করে এবং উদ্বাস্তুদের দণ্ডকে ফিরে যেতে বলে। ১৯৭৮-এর মার্চ-এপ্রিল থেকে দন্ডক ফেরত মানুষগুলি মরিচঝাঁপিতে থাকতে শুরু করে এবং ঐ বছর ডিসেম্বরের মধ্যে নিজেদের উদ্যোগে কুঁড়েঘর, প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাজার প্রভৃতি তৈরি করে, সরকারি চোখ রাঙানি ও মিথ্যা প্রলোভন উপেক্ষা করে নিজেদের জীবনযাপন স্বাভাবিক করার চেষ্টা করে। সরকার মরিচঝাঁপি ফাঁকা করার জন্য উদ্বাস্তুদের বারংবার বলতে থাকে এবং প্রচার চালায় মরিচঝাঁপি সুন্দরবনের সংরক্ষিত অঞ্চল। তবে বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায় মরিচঝাঁপি ব্যাঘ্র সংরক্ষিত এলাকার আওতায় ছিল না। ইউ.সি.আর.সি. ১৯৫৭ সালে তৎকালীন রাজ্য সরকারকে যে পুনর্বাসন যোগ্য জমির তালিকা দিয়েছিল তাতে মরিচঝাঁপির নাম ছিল। এ ব্যাপারে উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক রাইহরণ বাড়ৈ লেখেন - "মরিচঝাঁপি এলাকা মূল সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে দুইটি বড় বড় নদী, ঝিলে ও গাড়াল নদীর সংযোগ ছাড়া সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। তিনদিকেই নদীর অপর পারেই ঘন লোক বসতি, শুধুমাত্র একদিকেই ঝিলে নদীর অপর পারে খোলা জায়গা। মরিচঝাঁপি বন সম্পদ রহিত সম্পূর্ণ মনুষ্যবাস উপোযোগী স্থান।"[৩]

কিন্তু উদ্বাস্তু দরদী বাম সরকার কী কারণে উদ্বাস্তুদের মরিচঝাঁপি ছাড়া করেন চাইছেন। এর উত্তর পাওয়া যায় 'মরিচঝাঁপি ও সি.পি.এমের রাজনীতি শীর্ষক একটি লেখাতে - "ত্রিপুরা ও আসামের বিধানসভা নির্বাচনের পর সি.পি.এম. নেতৃত্ব ভেবেছিল, অন্যান্য রাজ্যের বাঙালীদের সাহায্যে ঐ সব রাজ্যে তাঁরা তাঁদের দলীয় সংগঠন গড়ে তুলবেন। সম্ভবত দণ্ডকারণ্যের ভোটে মধ্যপ্রদেশ ও ওড়িশা বিধানসভায় সি.পি.এম. কয়েকটি আসন দখলের স্বপ্ন দেখতে থাকেন। কিন্তু দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি ইউ.সি.আর.সি-তে বা সি.পি.এম.-এ যোগ দিতে আস্বীকার করেন। তাতেই এই সর্বহারা নেতাদের গোসা হয়। সর্বহারা নীতি হয়ে উঠলো তাদের পরিচালনায় সর্বনাশা বা বিনাশকারী।"[৪]

যাইহোক, সরকারের সর্ববিনাশী নীতি কার্যকর করতে সরকার উদ্বাস্তুদের প্রতি মরিচঝাঁপি ত্যাগের ঘোষণা করে এবং সরকারের তরফে বলা হয় মে মাসের মধ্যে যে কোন মূল্যে মরিচঝাঁপি ফাঁকা করা হবে।

সেই মত, ১৯৭৯ সালের ২৪ জানুয়ারি মরিচঝাঁপি দ্বীপ ব্লকেড শুরু হয়। পানীয় জল, ওষুধ, পাউরুটি তৈরির কারখানা, বিড়ি কারখানার মালপত্র সবই কুমিরমারী ও অন্যদ্বীপ থেকে যেত। মরিচঝাঁপি দ্বীপে কুমিরমারী থেকে খাদ্য ও পানীয় জল বন্ধ করে সরকার উদ্বাস্তুদের অনাহারে এবং অখাদ্য খেয়ে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু মুখে ঠেলে দেন। ৩১ জানুয়ারি মরিচঝাঁপি দ্বীপে গুলি চলে। ১ ফেব্রুয়ারি তারিখে আনন্দবাজার পত্রিকায় শিরোনাম হয়- "মরিচঝাঁপিতে গুলি: নিহত ৬, আহত ৫"।[৫]

এরপর মরিচঝাঁপির দুই যুবক (যাদের একজন নাম জানা যায়- সফল হালদার) মরিচঝাঁপির ১৪৪ ধারা জারির বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে কেস করেন। ৮ ফেব্রুয়ারি কলকাতা হাইকোর্ট ১৪৪ ধারা বাতিল করে দ্বীপবাসীদের পানীয় জল ও খাদ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে কোনো বাধা সৃষ্টি না করার আদেশ দেন।[৬] কিন্তু পরিস্থিতিতে কোন বদল আসেনি।

এরপর সরকার মরিচঝাঁপি উদ্বাস্তু শূন্য করতে কাজে লেগে যায়। উদ্বাস্তুদের ছোট ডিঙি ভেঙ্গে দেওয়া থেকে শুরু করে ঝুপরি পুড়িয়ে দেওয়া, মহিলা ধর্ষণ সবই চলতে থাকে। অত্যাচারের মাত্রা কোন পর্যায়ে পৌঁছেছিল তার বিররণ পাওয়া যায় ১৯৭৯ সালের ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি 'কালান্তর' পত্রিকায়- "...ওখানকার মানুষরা চৌদ্দ দিন এপারে (কুমিরমারী) আসেনি। জলও খেতে পায়নি। পুলিশ ঘিরে রেখেছে দ্বীপ। প্রথম প্রথম ২-৩ দিন বেশি শব্দ হয়নি। এরপর কান্না শোনা যেত রোজ। কুমির আর কামট ভরা নদী পার হয়ে কিছু লোক লুকিয়ে আসত রাতে - চাল ইত্যাদির খোঁজে। জলের খোঁজে। এরপর তাও বন্ধ হল। জালিপাতা আর যদু পালং খেয়ে থেকেছে ওরা, মরেছেও অনেক। ওদের কান্না এখান থেকে রোজই শুনতে পাই।"[৭]

এরপর মরিচঝাঁপির বেঁচে যাওয়া মানুষগুলিকে লরি করে প্রথমে হাসনাবাদ ও পরে খড়গপুর সহ বাংলা সীমান্ত অঞ্চলে চালান করা হয়, দণ্ডকে প্রেরণের উদ্দেশ্যে। তবে যে সংখ্যক উদ্বাস্তু মরিচঝাঁপিতে এসেছিল, সেই সংখ্যক উদ্বাস্তুকে পরে খুঁজে পাওয়া যায়নি (মৃত ও আহত সহ); তার অন্যতম কারণ ছিল যে সমস্ত উদ্বাস্তু মানুষ কর্মসূত্রে মরিচঝাঁপির বাইরে থাকত তারা ধীরে ধীরে তাদের পরিবারবর্গ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে; তাদের জীবনযাপনের ব্যবস্থা করে।

১৯৭৯ সালের ১৮ মে আনন্দবাজার পত্রিকায় 'উদ্বাস্তু নেই শিরোনামে প্রকাশিত হল - "বৃহস্পতিবার মহাকরণে তথ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সাংবাদিকদের কাছে বলেন, শেষ তিনশো পাঁচটি উদ্বাস্তু পরিবার এদিনই সুন্দরবনের ওই দ্বীপ ত্যাগ করে হাসনাবাদের পথে রওনা দিয়েছেন। এই নিয়ে এ পর্যন্ত মোট ২৭১৩ টি পরিবার মরিচঝাঁপি ছেড়ে চলে গিয়েছেন বলে তিনি জানান। বলেন, ওখানে আর কোনও উদ্বাস্তু নেই।"[৮]

৩

"রাষ্ট্রিক উৎখাত আর সাহিত্যিক নীরবতা একই মুদ্রার দুই পিঠ। যতদিন রাষ্ট্রিক ক্ষমতা উচ্চবর্ণের হাতে থাকবে, ততদিন নিম্নবর্গীয়-নিম্নবর্ণীয় মানুষ রাষ্টীয় উৎপীড়নের শিকার হবে। অথচ উৎপীড়ত মানুষের কথা বলাটা শিল্পের সাহিত্যের দায়। শিল্প হবে ক্ষমতার প্রতিপক্ষ। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, অনেক সময় শিল্প আর শিল্পী হারিয়ে ফেলে তার দায়বদ্ধতা।"[৯]

মরিচঝাঁপির ঘটনার ক্ষেত্রে ঠিক এ ব্যাপারটিই হয়েছিল। কিন্তু কেন শিল্পী তাঁর দায়বদ্ধতা হারালেন? কেন সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় মরিচঝাঁপির কাহিনি বড় হয়ে দেখা দিল না? কারণ অনুসন্ধানে বড় হয়ে দেখা দেয় উচ্চবর্ণ হিন্দুদের ঔদ্ধত্য। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় একবার বলেছিলেন, "তাঁদের মধ্যে একজনও ঘোষ-বোস-মিত্তির-চ্যাটার্জি-ব্যানার্জি-গাঙ্গুলি নেই। সেই জন্য জন্য কি তাদের এত অবজ্ঞা।"[১০] সত্যিই নিম্নবর্গের নমশূদ্র মানুষগুলি ১৯৭৮ সালে এসেও তাদের উদ্বাস্তু তকমা ঘোচাতে পারল না, সেখানে ১৯৬০-৬৫ সালের মধ্যেই উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা তাদের উদ্বাস্তু জীবনকে বিদায় জানায়। উদাহরণ বেলঘরিয়া, দমদম কিংবা যাদবপুরে জবরদখলকারী মানুষগুলি। একটু খেয়াল করলে দেখা যাবে ১৯৬০ বা ১৯৬৫ সালের পরের সাহিত্য তথা কবিতায় উদ্বাস্তু প্রসঙ্গ কমতে শুরু করে কিংবা তা বন্ধ হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা প্রয়োজন যে, আমরা ৭০ পরবর্তী সাহিত্যে যত উদ্বাস্তু কেন্দ্রিক সাহিত্য রয়েছে তার সবটাই ঐ ১৯৪৭ থেকে ১৯৬০-এর মধ্যেকার সময় নিয়ে লেখা। যেখানে শুধুমাত্র উচ্চবর্ণ হিন্দু কিংবা বড়লোক উদ্বাস্তুদের গুরুত্ব রয়েছে এবং তারা মূলত পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসন পায় বা নেয়। কিন্তু দণ্ডক কিংবা আন্দামান প্রভৃতি স্থানে পুনর্বাসিত হওয়া উদ্বাস্তু মানুষগুলি যারা মূলত নমশূদ্র বা গরিব, তাদের সাহিত্যে সেভাবে দেখা মেলে না। ব্যতিক্রম প্রফুল্ল রায়ের কিছু ছোটগল্প ও 'নোনাজল মিঠেমাটি' উপন্যাস; নারায়ণ সান্যালের 'অরণ্যদণ্ডক' উপন্যাস, শক্তিপদ রাজগুরুর 'দণ্ডক থেকে মরিচঝাঁপি' এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পূর্ব-পশ্চিম' উপন্যাসে (দ্বিতীয় খণ্ড) মরিচঝাঁপি ঘটনা ছুঁয়ে যাওয়ার মত আখ্যান। তবে আমাদের মূল আলোচনা আবদ্ধ থাকবে বাংলা কবিতায় মরিচঝাঁপি প্রসঙ্গে।

শৈবাল কুমার গুপ্ত 'কিছু স্মৃতি কিছু কথা' গ্রন্থে বলেছিলেন 'ক্ষমতা পেলে কংগ্রেস বা কমিউনিস্ট দলে কোনও কোন তফাৎ থাকে না'- ঠিক যেন এ কথার সূত্র ধরে শঙ্খ ঘোষ লিখলেন তাঁর 'তুমি আর নেই যে তুমি' শীর্ষক কবিতা। কবিতাটিতে নতুন বাম সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন শঙ্খ। কবিতার বিষয় হিসাবে কিছুটা ব্যাঙ্গাত্মক ভাবে বামফ্রন্টের জনদরদী ইমেজকে রাখলেন। সামান্য কয়েক বছরের ব্যবধানে বামদলগুলির কথনে যে পরিবর্তন এসেছে, সেই পাল্টে যাওয়া একটি রাজনৈতিক গোষ্ঠীর কর্মকাণ্ডকেই ভাষা দিলেন কবি শঙ্খ ঘোষ। ১৯৭৭ -এর আগে উদ্বাস্তু মানুষগুলির হয়ে গলা ফাটানো, রক্তাক্ত আন্দোলন পরিচালনা করে আসছিল তৎকালীন বামদলগুলি। কিন্তু ৭৭-এ ক্ষমতা দখলের পর সেই উদ্বাস্তু মানুষগুলির হয়ে যারা কথা বলছিলেন তাদেরকে আক্রমণের লক্ষ্য বানিয়ে নেয় বাম সরকার। তাইতো কবি লেখেন "তুমি বললে মানবতা/ আমি বললে পাপ/... তুমি বললে বাঁচার দাবি/ আমি বললে ছুতো/... আমি বললে সেপাই দিয়ে/ উপড়ে নেব গলা।" ('তুমি আর নেই সে তুমি', "বন্ধুরা মাতি তরজায়", "শঙ্খ ঘোষের কবিতা সংগ্রহ ১") মরিচঝাঁপিতে

উদ্বাস্তু আগমনের ঘটনায় বাম দলগুলির সবচেয়ে বড় শরিক সি.পি.আই.এম. চক্রান্ত তত্ত্বের দাবি করে। তারা বলে যে, নবগঠিত বাম সরকারকে বিপদে ফেলতেই দণ্ডক থেকে উদ্বাস্তুদের নিয়ে আসা হচ্ছে। কিন্তু ১৯৫৭ সালে দণ্ডকারণ্য প্রকল্পের শুরু থেকে বামদলগুলি বলে আসছিল পশ্চিমবঙ্গেই উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সম্ভব। এবং তখন থেকেই বিরোধী দলের নেতা বলতে শুরু করেন যে, তারা ক্ষমতায় এলে পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসিত করা হবে। কবি শঙ্খের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না উক্ত ঘটনাটি। তিনি এ প্রসঙ্গে লিখলেন-

"তুমি বললে দণ্ডকে নয়
আপন ভূমিই চাই
আমি বললে ভণ্ড, কেবল
লোক খেপাবার চাঁই।
চোখের সামনে ধুঁকলে মানুষ
উড়িয়ে দেবে টিয়া
তুমি বললে বিপ্লব, আর
আমি প্রতিক্রিয়া।"

('তুমি আর নেই সে তুমি', "বন্ধুরা মাতি তরজায়", "শঙ্খ ঘোষের কবিতা সংগ্রহ ১")
১৯৭৮-এ যখন দণ্ডক থেকে বহু সংখ্যক উদ্বাস্তু আগমন শুরু হয়েছে এবং তা নিয়ে যখন কিছু সংখ্যক মানুষ মুখ খুলেছেন সে সময়ের লেখা কবিতাটিতে কবি নতুন বাম সরকারকে আক্রমণ করলেন, অবশ্যই কাব্যিক উপায়ে। শঙ্খ ঘোষ 'মরিচঝাঁপি' নিয়ে তাঁর পরবর্তী কবিতা 'উলটোরথ' লিখলেন ১৯৭৯ সালে। আগের কবিতা সাথে মিলিয়ে দেখতে গেলে বোঝা যায় দুটি কবিতার মূল সেই একই বিষয়। তবে এখানে তিনি সরকারের বদলে মানুষের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন।

দণ্ডকারণ্যে বসবাসকারী উদ্বাস্তুরা ট্রেন যোগে পশ্চিমবঙ্গে আসতে চাইলে বর্ধমান স্টেশনে তাদের বাধা দেওয়ার প্রক্রিয়া চলতে থাকে। উদ্বাস্তু মানুষদেরকে সেখান থেকেই দণ্ডকারণ্যে ফিরিয়ে দেওয়ার একটি পরিকল্পনা সরকারের তরফে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু যে মানুষগুলো নিজেদের জন্মভূমিতে নতুন করে জীবিকা নির্বাহ করতে চেয়েছিল বা নতুন করে তাদের বেঁচে থাকার রসদ যোগাতে চেয়েছিল সেখান থেকে ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করা হলে তাদের মনে কি ধরনের ক্ষোভ ডানা বাঁধতে পারে তার খোঁজ কেউ রাখে নি। শঙ্খ ঘোষ তাঁর 'উলটোরথ' কবিতায় বর্ধমান স্টেশন থেকে দণ্ডকারণ্যে ফিরিয়ে দেওয়া উদ্বাস্তু মানুষগুলোর মনোভঙ্গি ব্যক্ত করেন। 'কবিতার মুহূর্ত' গ্রন্থে 'উলটোরথ' কবিতা সম্পর্কে তিনি বলেন- "শুরু হয়েছে পশ্চিমবাংলার প্রগতিশীল শাসন। দণ্ডকারণ্যের বিচ্ছিন্ন নিরুপায়তা থেকে হয়তো-বা ফিরে যাওয়া যাবে দেশে, ভেবেছিল তারা অনেকে, কিংবা হয়তো ভাবানো হয়েছিল তাদের। বড়ো বড়ো ক্ষমতার

দ্বন্দ্বে তারা তো শুধু খড়, অবোধভাবে এপথে ওপথে উড়ে চলে যায়। হাজার হাজার মানুষ এবার তাই উঠতে লাগল দেশের মুখে, যেন তাদের স্বরাজ এল এতকাল পরে! নিজের দেশে নিজের ঘর হবে বলে কোথায় কোন্ উড়ো খবর পেল তারা! কিন্তু সবকিছু নিয়ে এখানে পৌঁছে তারা দেখে, তাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে শুধু পুলিশের লাঠি। নতুন তাণ্ডবে নতুন করে উৎখাত হলো সবাই, প্রতিহত প্রত্যাখ্যাত হলো, আবার তাদের ধরতে হবে ফেরার পথ। ... মনে পড়ে কদিন আগে ওইরকমই এক বিরাট দলের ফিরে যাওয়ার সময়ে অবুঝ একজন কিছুতেই আর ফিরতে চায়নি বলে ঝাঁপ দিয়েছিল ট্রেনের দরজা থেকে। লাইনে নুড়িপাথরের পাশে ছুটন্ত খাসজমির ফালি দেখতে দেখতে মনে হলো একবার, পড়বার পর বুকের খুব কাছে এই মাটির একটুখানি ছোঁয়া তো সে তবে পেয়েইছিল।”[১১]

দণ্ডকারণ্যের উদ্দেশ্যে পুনঃরায় যাত্রা করা একদল মানুষের কথা মনে রেখে শঙ্খ ঘোষ লিখলেন তাঁর বিখ্যাত ‘উলটোরথ’ কবিতাটি। তিনি লিখলেন-

“উলটোরথের ভিখিরি দেশ খুঁজে বেড়ায়
গলায় পাথর বুকের নীচে বৃহস্পতি।”

(‘উলটোরথ’, “প্রহর জোড়া ত্রিতাল”, “শঙ্খ ঘোষের কবিতা সংগ্রহ ২”)

সুভাষ মুখোপাধ্যায় মরিচঝাঁপি ঘটনার প্রেক্ষিতে উদ্বাস্তু জীবনের সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরলেন ‘ঠাকুরমার ঝুলি’ কবিতায়। ১৯৭৮-তে দাঁড়িয়ে মরিচঝাঁপির ঘটনা যতটা না রাজনৈতিক তার চেয়ে অনেক বেশি মানবিক অবক্ষয়ের বিষয়। উদ্বাস্তুদের জীবন যে মনুষ্যেতর প্রাণীর পর্যায়ে পৌঁছেছে সেটা বোঝাতে কবিতায় তিনি ‘দূর-দূর, ছেই-ছেই’ বিশেষণ প্রয়োগ করলেন। আমরা এবারে দেখে নেব ‘ঠাকুরমার ঝুলি’ কবিতায় সুভাষ মুখোপাধ্যায় কীভাবে রাজনৈতিক বকলমে মানবিকতার অবক্ষয়ের চিহ্ন তুলে ধরলেন-

“এ-দুয়োরে যায় দূর দূর!
ও-দুয়োরে যায় ছেই ছেই!
সুয়োরানী লো সুয়োরানী তোর
রাজ্যে দিল হানা
পাথরচাপা কপাল যার সেই
ঘুঁটে কুড়ুনির ছানা
ঘেন্নায় মরি, ছি!
মন্ত্রী বলল দেখছি
কোটাল বলল, দেখছি
ঢোল ডগরে পড়ে কাঠি
রক্তে হয় রাঙা মাটি

কাড়ে না কেউ রা
ভালোমানুষের ছাঁ
সাতটি চাঁপা সাতটি গাছে
পারুল বোন রইল কাছে
দণ্ডকে যায় ধর্মরাজার
কলের ডুলি
এই গল্পে ভর্তি ক'রে
ঠাকুরমার ঝুলি।"

('ঠাকুমার ঝুলি', "একটু পা চালিয়ে ভাই")

অন্যদিকে, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'মরিচঝাঁপি : শিশুবর্ষ' কবিতায় সুন্দরবনের মরিচঝাঁপিকে বাঘের সংরক্ষিত এলাকা বলে উল্লেখ করা বাম নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিলেন। তাঁর বিবেচনায় মানুষের চেয়ে বাঘ বেশি গুরুত্বপূর্ণ হতেই পারে না। এই সুরটিই ধরা পড়ল ব্যঙ্গের সুরে-

"যা মানুষের বাচ্চারা, দূরে যা!
এখানে বাঘের বাচ্চারা খাবে মায়ের দুধ,
এখানে বাঘের বাচ্চারা খাবে বাঘের দুধ।
তাদের হিংসা করিস না।
যেই বন থেকে এসেছিলি তোরা, সে-বনে যা।
তোরা মানুষের ছা। বাঘকে হিংসা করিস না।"

('মরিচঝাঁপি: শিশুবর্ষ')

মরিচঝাঁপি প্রসঙ্গ নিয়ে লেখা 'বাস্তহারা ১৯৭৮' কবিতায় সরোজলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বাধীনতার সময় থেকে মরিচঝাঁপি পর্যন্ত উদ্বাস্তুদের একটি গতিবিধি তুলে ধরার চেষ্টা করলেন। কবি বামপন্থী আন্দোলনের পুরানো দিনগুলো কিংবা ভিয়েতনাম বা চিনের স্বাধীনতা যুদ্ধ বা নকশালদের গেরিলা যুদ্ধের মতো কোন লড়াই সংগঠিত করে উদ্বাস্তুরা বাঁচার চেষ্টা করবে বলে আশা প্রকাশ করেন কবি। কিন্তু কোথাও কোনো কূলকিনারা না পেয়ে কবি নিজের মধ্যেই এক ধরনের দোদুল্যমানতায় ভুগেছেন। একই সাথে উদ্বাস্তুদের রাজনৈতিক আন্দোলন সংগঠিত করার জন্য নেতার অভাব রয়েছে বলেও উল্লেখ করলেন।

আবার কবি মণীন্দ্র গুপ্ত অতীত স্মৃতিচারণায় তুলে ধরলেন মরিচঝাঁপি প্রসঙ্গ। যেখানে তিনি মরিচঝাঁপির শতকরা নব্বইভাগ নিরক্ষর মানুষের জীবনসংগ্রামের প্রসঙ্গ নিয়ে এলেন। সুন্দরবনের কাছাকাছি থাকা এবং সরকারের বিরুদ্ধতা করে মরিচঝাঁপি অঞ্চলে বসবাসের কারণে প্রান্তিক মানুষগুলির স্বাভাবিক জীবন কীভাবে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে, এসবই এ কবিতার বিষয়। কবি লিখলেন-

“বনবাসী জগতের মধ্যে কত লুকোচুরি,
কত বৈকালিক বিষণ্নতা! ভাঙা ভাঙা ভাষা!”

(‘মরিচঝাঁপি’)

মরিচঝাঁপি নিয়ে আরও কিছু কবিতা থাকলেও আমাদের সীমিত পরিসরে প্রতিনিধিস্থানীয় কয়েকটি কবিতা আমরা উপস্থাপন করলাম বক্তব্য বিষয় স্পষ্ট করার উদ্দেশ্যে। উপরিউক্ত কবিতাগুলি থেকে আমরা সহজেই একটি বিষয়ে আন্দাজ করে নিতে পারি যে, উপাদান সম্পূর্ণ মজুত থাকার পরেও নকশাল ব্যতীত রক্তাক্ত কবিতা আরও কোথাও চোখে পড়ে না। শুধুমাত্র বিষয়ের প্রভাব বর্ণনা করেই বাংলার কবি ও কবিতা দায়মুক্তির শ্লাঘা অনুভব করেছে। বাংলা কবিতায় রক্তের অনুপস্থিতির কারণ হিসাবে অনেকেই বাঙালি মননকে দায়ী করবেন সেটা জানি। আমরাও সেই যুক্তিটা কতকটা মেনে নিচ্ছি। এখানে আবার অনেকে ৭০-এর নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লেখা কবিতার প্রসঙ্গ টানবেন। সেখানে এমন বহু কবিতা লেখা হয়েছে যেখানে সরাসরি রক্তের প্রসঙ্গ বিরাজমান। নকশালের পরে ঘটা মরিচঝাঁপির ঘটনা যদি বাংলা কবিতার মূলে পরিবর্তন ঘটাতো তবে আমরা বাঙালি মননের স্বাভাবিক পরিবর্তনের যুক্তি মেনে নিতাম। কিন্তু একবার এগিয়ে আবার পূর্ববর্তী অবস্থানে ফিরে যাওয়াকে সাধারণ জীবনে আমরা ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্ত হিসাবেই গণ্য করি।

তবে যাইহোক মরিচঝাঁপি বাংলা কবিতার পরম্পরাকে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিল। প্রশ্ন হল কিভাবে? স্বাধীনতার অব্যবহিত কাল থেকে চলে আসা শাসক বিরোধী কবিতা রচনা (যদিও সে ধারা নিতান্তই হাতে গোনা), সেই সাথে মন্দের ভাল মানবতার ধ্বজা ধরে, বাংলা কবিতা তার পূর্বজদের ঐতিহ্য বাঁচিয়ে রাখল।

তথ্যসূত্র :

১. আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৬ এপ্রিল ১৯৭৮।

২. ‘দণ্ডকের উদ্বাস্তু কথা কে ভেবেছি’, বরুণ সেনগুপ্ত, “মরিচঝাঁপি”, সম্পাদনা মধুময় পাল, গাঙচিল, কলকাতা, নভেম্বর ২০১৯, পৃ. ৫২-৫৩।

৩. ‘মরিচঝাঁপি ও সি.পি.এমের রাজনীতি’, “মরিচঝাঁপি”, জগদীশচন্দ্র মণ্ডল, পরিবেশক পিপলস্ বুক সোসাইটি, প্রথম প্রকাশ ২০০২, পৃ. ৫৫।

৪. ঐ, পৃ. ৫২।

৫. আনন্দবাজার পত্রিকা, ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯।

৬. ‘মরিচঝাঁপি ও সি.পি.এমের রাজনীতি’, “মরিচঝাঁপি”, জগদীশচন্দ্র মণ্ডল, পরিবেশক পিপলস্ বুক সোসাইটি, প্রথম প্রকাশ ২০০২, পৃ. ৫৫-৫৬।

৭. ‘লজ্জা ও ঘৃণার কালো ইতিহাস’, ঝিনুক চক্রবর্তী, সম্পাদনা মধুময় পাল, গাঙচিল, কলকাতা, নভেম্বর ২০১৯, পৃ. ৩৪৬।

৮. আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৮ মে ১৯৭৯।

৯. ‘মরিচঝাঁপি: বাংলা আখ্যানের নীরবতা’, অশ্রুকুমার সিকদার, সম্পাদনা মধুময় পাল, গাঙচিল, কলকাতা, নভেম্বর ২০১৯, পৃ. ২৬৫।

১০. ঐ, পৃ. ২৫৯।

১১. ‘কবিতার মূহূর্ত’, শঙ্খ ঘোষ, অনুষ্টুপ, কলকাতা, সপ্তম মুদ্রণ ডিসেম্বর ২০১৪, পৃ.৭৫-৭৬।

নিবেদন রসপর্যায় অথচ বৈষ্ণব পদাবলী ও রসশাস্ত্রে উপেক্ষিত

সুনীলকুমার রায়
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, গুরুদাস কলেজ, কলকাতা

সংক্ষিপ্তসার :-
নিবেদন রসপর্যায় অথচ বৈষ্ণবরসশাস্ত্রে উপেক্ষিত।নিবেদনকে কোন বৈষ্ণবদার্শনিক বা পদাবলী সংকলক বা সম্পাদক কোনো রস বা পালা পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করেননি । অথচ এটি মধুররস পর্যায়ের বিপ্রলম্ভের-সম্ভোগের অন্তর্ভুক্ত এবং কলহান্তরিতা নায়িকা প্রকরণের পর অবস্থিত এবং স্বাধীনভর্তৃকার পূর্বে অবস্থিত পৃথক এবং মানের পর নিবেদন রসপর্যায় হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে এবং রসপর্যায়ে অন্তর্ভুক্তি আবশ্যিক । এর কাব্যিক ও শাস্ত্রীয় আবেদন কম নয়।এখন নিবেদন মূলক পদ লিখেছেন চৈতন্য পরবর্তী কবিরা। নিবেদন বলতে বোঝায়, ভগবৎ প্রেমের গভীরতায় কৃষ্ণকে নিত্য জেনে ভগবৎ পায়ে আত্মসমর্পণ। যে আত্মসমর্পণে মোক্ষ কামনা নেই, বরং প্রেমলীলারস আস্বাদন মুখ্য। আক্ষরিক ভাবে, নিবেদন শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল, বিনীত উক্তি; আবেদন; জ্ঞাপন (সবিনয় নিবেদন); উৎসর্গ (দেবতাকে নিবেদন); সমর্পণ (আত্মনিবেদন) বা নিবেদন করা অথবা . আবেদন করা;বিনীতভাবে জানানো; সমর্পণ করা।বৈষ্ণব মহাজনেরা ভক্ত ও সাধক, রসশাস্ত্রে বিদগ্ধ পণ্ডিত, নিবেদনে মিলনের একাত্ম সুর, দ্বাপরে দুই , কলিতে আবার এক হলেন ভাববৈকুণ্ঠ্য বা ভাববৃন্দাবনে,এই লীলার তো শেষ নেই , শুরুও নেই । অনন্ত কাল ধরে চলে আসছে , চলতে থাকবে । অর্থাৎ ছিল , আছে ও থাকবে,-- এ কথা পুরাণে বা ভাগবতে বারংবার বলা হয়েছে। পুনশ্চ, নিবেদন বিপ্রলম্ভের মানের পরে যেমন স্থান পেতে পারে(কেননা, পূর্বে সম্মিলিত নায়ক-নায়িকার মিলনজাত উল্লাসময় চিত্র পূর্বরাগের পর থেকেই পাওয়া যায়।), তেমনি, নায়িকা প্রকরণে কলহান্তরিতার পর অবস্থিত হবার সবরকম আনুকূল্য রাখে।

মূল আলোচনা :
নিবেদন রসপর্যায় অথচ বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে উপেক্ষিত।নিবেদনকে কোন বৈষ্ণবদার্শনিক বা পদাবলী সংকলক বা সম্পাদক কোনো রস বা পালা পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করেননি। অথচ এটি মধুররস পর্যায়ের বিপ্রলম্ভের-সম্ভোগের অন্তর্ভুক্ত এবং কলহান্তরিতা নায়িকা প্রকরণের পর অবস্থিত এবং স্বাধীনভর্তৃকার পূর্বে অবস্থিত পৃথক এবং মানের পর নিবেদন রসপর্যায় হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে এবং রসপর্যায়ে অন্তর্ভুক্তি আবশ্যিক । এর কাব্যিক ও শাস্ত্রীয় আবেদন কম নয়।

রূপগোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধু , উজ্জ্বলনীলমনি ইত্যাদি গ্রন্থে ভক্তিরসকে যে তাত্ত্বিক উচ্চতায় নিয়ে গেছেন এবং নেতি নেতি করে শেষ পর্যন্ত বৈষ্ণবীয় পঞ্চরস বলতে –শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং উজ্জ্বল বা মধুর রস বুঝিয়েছেন। বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামীর অন্যতম রূপ গোস্বামী অবশ্য এই পাঁচটি রসকে স্বীকৃতি দিলেও তাঁর অভিমত , রস আসলে একটাই, এবং সেটা হল 'ভক্তিরস'। শ্রবণ কীর্তনাদির সাহায্যে ভক্তদের হৃদয়ে বিভাব অনুভাবাদি দ্বারা আস্বাদ্যতা আনীত হলে মনে জাগে 'কৃষ্ণরতি' এবং এর স্থায়ীভাব হল 'ভক্তিরস'। পুর্ব কথিত পঞ্চরসের কোনো রসসিক্ত বৈষ্ণবপদ যদি শ্রবণকীর্তনাদির সহায়তায় বিভাবাদি ভাবের দ্বারা ভক্তহৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেমের উদ্বোধন ঘটিয়ে দিতে পারে । বস্তুত , বৈষ্ণব পদাবলীর রসভিত্তি বৈষ্ণবীয় পঞ্চরস।

'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থটিই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নিকট রসশাস্ত্র-বিষয়ক আকর গ্রন্থ-রূপে বিবেচিত হয়। তিনি পঞ্চরসের মধ্যে মধুর/উজ্জ্বল রসকেই প্রাধান্য দিয়ে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন , বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ। এরপর বিপ্রলম্ভের আবার চতুর্থ বিভাগ কল্পনা করেছেন : পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত ও প্রবাস । সম্ভোগের দুটি ভাগ , মুখ্য সম্ভোগ ও গৌণ সম্ভোগ বা স্বপ্নসম্ভোগ।

নায়িকা ভেদে, বৈষ্ণব রসশাস্ত্র 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে নায়িকার মনোভাব এবং আচরণ অবলম্বনে, অষ্টবিধ অবস্থা অভিসারিকা, বাসকসজ্জিকা, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে। বৈষ্ণব কবিগণ এই সমস্ত বিষয়কেও তাদের পদের অঙ্গীভূত করেছেন।আবার রাধিকার মনোভাব ও আচরণকে অবলম্বন করে পদগুলোকে আটটি বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। এদের প্রত্যেকটি পর্যায়ের আবার আটটি করে অবস্থা আছে। ফলত এই আট পর্যায়ের নায়িকার চৌষট্টি প্রকার ভেদ বৈষ্ণব পদাবলীতে রূপায়িত হয়েছে।

(১) অভিসারিকা : প্রিয়মিলনের উদ্দেশ্যে নায়িকা সঙ্কেত কুঞ্জাভিমুখে যাত্রা করেন। এর অষ্টবিধ অবস্থা—জ্যোৎস্নাভিসারিকা, তামসাভিসারিকা, বর্ষাভিসারিকা, দিবাভিসারিকা, কুজ্ঝটিকাভিসারিকা, তীর্থযাত্রাভিসারিকা (দেবদর্শনাদি হলে), উন্মত্তাভিসারিকা (বংশীধ্বনি শ্রবণে), অসমঞ্জসাভিসারিকা (অসম্বৃত বেশবাসে)।

(২) বাসকসজ্জা: প্রিয়মিলনের উদ্দেশ্যে নায়িকা স্বদেহ ও কুঞ্জ সাজিয়ে প্রতীক্ষমাণা। এর অষ্টবিধ অবস্থা—মোহিনী, জাগ্রতিকা, রোদিতা, মধ্যোক্তিকা (কান্ত প্রিয়বাক্য বলবে—এরূপ চিন্তা ও আলাপমগ্না), সুপ্তিকা (কপটনিদ্রাযুক্তা), চকিতা, সুরসা, উদ্দেশ্য (দূতীপ্রেরণকারিণী)।

(৩) উৎকণ্ঠিতা: নায়কের আগমনে বিলম্ব দেখে উৎকণ্ঠাযুক্তা নায়িকা নায়কের জন্যে উৎসুকভাবে অপেক্ষমাণা। এর আটটি অবস্থা — দুর্মতি (খলের বাক্যে বিশ্বাসের চিন্তায় অনুতপ্তা), বিকলা (অনুতাপযুক্তা), স্তব্ধা, উচ্চকিতা, অচেতনা, সুখোৎকণ্ঠিতা (কৃষ্ণধ্যানমুগ্ধা), মুখরা (দুতীর সঙ্গে কলহরতা), নির্বন্ধা (নায়িকার কর্মদোষেই নায়ক আসছেন না, এরূপ খেদযুক্তা)।

(৪) বিপ্রলব্ধা: প্রতিশ্রুতি দিয়েও নায়ক না আসায় নায়িকা বঞ্চিতা বা প্রতারিতা। এর অষ্টবিধ অবস্থা! — বিকলা (কান্ত না আসায় ব্যর্থতা বোধ), প্রেমমত্তা (নায়ক অন্য রমণীতে আসক্ত, এরূপ দুশ্চিন্তা), ক্লেশা, বিনীতা (বিলাপযুক্তা), নির্দয়া, প্রখরা (বেশভূষণাদি অগ্নিতে বা যমুনায় বিসর্জনে সঙ্কল্পবদ্ধা), দূত্যাদরা (দুতীর প্রতি আদরপরায়ণা), ভীতা (প্রভাত আগমনে)।

(৫) খণ্ডিতা: নায়ককে প্রতিনায়িকার নিকট থেকে প্রত্যাবৃত্ত দেখে রুষ্টা। আটপ্রকার অবস্থা— নিন্দা, ক্রোধা, ভয়ানকা, প্রগলভা (কলহকারিণী), মধ্যা (অপর নায়িকায় সম্ভোগচিহ্নদর্শনে লজ্জান্বিতা), মুগ্ধা (রোষবাষ্পমৌনা), কম্পিতা, সন্তপ্তা।

(৬) কলহান্তরিতা: নায়ককে প্রত্যাখ্যান করবার পর অনুতাপযুক্তা। অষ্টবিধ অবস্থা— আগ্রহা, ক্ষুব্ধা, ধীরা, অধীরা, কুপিতা, সুমা (কান্তের একা দোষ নয়, সকলের দোষেই এরূপ ঘটেছে এই ভাবযুক্তা), মৃদুলা, বিধুরা।

(৭) প্রোষিতভর্তৃকা: নায়কের বিদেশ (মথুরা) গমনে বিরহজীবনযাপনরতা। এর অষ্টবিধ রূপ—ভাবী (ভবিষৎ বিরহ), ভবন (বর্তমান বিরহ), ভূত, দদদশা (চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, কৃশতা, জড়তা, ব্যাধি, উন্মত্ততা, মোহ, মৃত্যু), দূতসংবাদ, বিলাপা, সখ্যুক্তিতা, ভাবোল্লাসা।

(৮) স্বাধীনভর্তৃকা: নায়ককে নিকটে আপন অধিকারের মধ্যে লাভকারিণী। নায়কের সঙ্গে নায়িকার খণ্ড মিলনের ব্যঞ্জনাযুক্ত আটপ্রকার রূপ কোপনা, মানিনী, মুগ্ধা, মধ্যা (নায়ক যার নিকট কৃতজ্ঞ), সমুক্তিকা, সোল্লাসা, অনুকূলা, অভিষিক্তা।১

এখন নিবেদন মুলক পদ লিখেছেন চৈতন্য পরবর্তী কবিরা। নিবেদন বলতে বোঝায়, ভগবৎ প্রেমের গভীরতায় কৃষ্ণকে নিত্য জেনে ভগবৎ পায়ে আত্মসমর্পণ। যে আত্মসমর্পণে মোক্ষ কামনা নেই, বরং প্রেমলীলারস আস্বাদন মুখ্য।

আক্ষরিক ভাবে, নিবেদন শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল, বিনীত উক্তি; আবেদন; জ্ঞাপন (সবিনয় নিবেদন); উৎসর্গ (দেবতাকে নিবেদন); সমর্পণ (আতত্মনিবেদন) বা নিবেদন করা অথবা . আবেদন করা;বিনীতভাবে জানানো; সমর্পণ করা।

এ প্রসঙ্গে আসে, গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে সমস্ত জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের কথা বলেছেন । কয়েকটি অধিবচন স্মরণ করা যেতে পারে।

১। সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।। ১৮/৬৬।।

অনুবাদঃ সর্ব প্রকার ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। তুমি শোক করো না।

২। সত্ত্বানুরূপা সর্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।

শ্রদ্ধাময়োহয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ।।১৭/৩।।

অনুবাদঃ হে ভারত! সকলের শ্রদ্ধা নিজ-নিজ অন্তঃকরণের অনুরূপ হয়। যে যেই রকম গুণের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত, সে সেই রকম শ্রদ্ধাবান।

৩। অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ।।১৭/১১।।

অনুবাদঃ ফলের আকাঙ্ক্ষা রহিত ব্যক্তিগণ কর্তৃক শাস্ত্রের বিধি অনুসারে, অনুষ্ঠান করা কর্তব্য এভাবেই মনকে একাগ্র করে যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তা সাত্ত্বিক যজ্ঞ ।

৪। অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতং চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ।।১৭/২৮।।

অনুবাদঃ হে পার্থ! অশ্রদ্ধা সহকারে হোম, দান বা তপস্যা যা কিছু অনুষ্ঠিত হয়, তাকে বলা হয় 'অসৎ'। সেই সমস্ত ক্রিয়া ইহলোকে ও পরলোকে ফলদায়ক হয় না।

৫। যে ত সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে।।১২/৬।।
তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্।।১২/৭।।

অনুবাদঃ যারা সমস্ত কর্ম আমাতে সমর্পণ করে, মৎপরায়ণ হয়ে অনন্য ভক্তিযোগের দ্বারা আমার ধ্যান করে উপাসনা করেন, হে পার্থ! আমাতে আবিষ্টচিত্ত সেই সমস্ত ভক্তদের আমি মৃত্যুময় সংসার-সাগর থেকে অচিরেই উদ্ধার করি।

৬। অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী।।১২/১৩।।
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ।।১২/১৪।।

অনুবাদঃ যিনি সমস্ত জীবের প্রতি দ্বেষশূন্য, বন্ধু-ভাবাপন্ন, কৃপালু, মমত্ববুদ্ধিশূন্য, নিরহঙ্কার, সুখে ও দুঃখে সম ভাবাপন্ন, ক্ষমাশীল, সর্বদা সন্তুষ্ট, সর্বদা ভক্তিযোগে যুক্ত, সংযত স্বভাব, দৃঢ় সংকল্পযুক্ত এবং যাঁর মন ও বুদ্ধি সর্বদা আমাতে অর্পিত, তিনি আমার প্রিয় ভক্ত।

৭। যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভুতেজ্যা যান্তি মদযাজিনোহপি মাম্।।৯/২৫।।

অনুবাদঃ দেবতাদের উপাসকেরা দেবলোক প্রাপ্ত হবেন; পিতৃপুরুষদের উপাসকেরা পিতৃলোক লাভ করেন; ভুত- প্রেত আদির উপাসকেরা ভূতলোক লাভ করেন; এবং আমার উপাসকেরা আমাকেই লাভ করেন।

৮। পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ।।৯/২৬।।

অনুবাদঃ যে বিশুদ্ধচিত্ত নিষ্কাম ভক্ত ভক্তি সহকারে আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল ও জল অর্পণ করেন, আমি তাঁর সেই ভক্তিপ্লুত উপহার প্রীতি সহকারে গ্রহণ করি।

৯। যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্।।৯/২৭।।

অনুবাদঃ হে কৌন্তেয়! তুমি যা অনুষ্ঠান কর, যা আহার কর, যা হোম কর, যা দান কর এবং যে তপস্যা কর, সেই সমস্তই আমাকে সমর্পণ কর।

১০। শুভাশুভ ফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি।।৯/২৮।।

অনুবাদঃ এভাবেই আমাতে সমস্ত কর্ম অর্পণ দ্বারা শুভ ও অশুভ ফলবিশিষ্ট কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হবে। এভাবেই সন্ন্যাস যোগে যুক্ত হয়ে তুমি মুক্ত হবে এবং আমাকেই প্রাপ্ত হবে।২

এই ভাবে যদি দেখা যায় , গীতার সারাৎসার যেন নিবেদন পর্বে লোকায়ত জীবন ভাবনায় জারিত হয়ে বহুমাত্রিক দিক স্পর্শ কৃরেছে ।নিবেদনে যে সমর্পণের সুর , তা কখনো মাটির টান ছিন্ন করে নয় ।প্রথমে আসে জড়ের সীমা অতিক্রম করে পরমচৈতন্যময় সত্তা কৃষ্ণের জন্য সর্বসমর্পন ।কৃষ্ণের অখণ্ড সত্তার প্রতি প্রীতিময় অভিসার যেন নিবেদন মূলক পর্যায় । যেমন , চণ্ডীদাস যখন বলেন, রাধার জবানীতে, --

বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ!
দেহ মন আদি, তোহারে সঁপেছি,
কুল শীল জাতি মান।।
অখিলের নাথ, তুমি হে কালিয়া,
যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপ গোয়ালিনী, হাম অতি হীনা,
না জানি ভজন পূজন।।
পিরীতি রসেতে, ঢালি মোর গতি,
মন নাহি আন ভায়।।
কলঙ্কী বলিয়া, ডাকে সব লোকে,
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া, কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ।।
সতী বা অসতী, তোমাতে বিদিত,
ভাল মন্দ নাহি জানি।

কহে চণ্ডীদাস, পাপ পূন্য সম,
তোহারি চরণখানি।।

তখন তা চণ্ডীদাস ও চণ্ডীদাসের রাধিকা বহু সময়ই একাত্ম, রাধার নিবেদন তাই চণ্ডীদাসেরও নিবেদন। তাই চণ্ডীদাসের আত্মনিবেদন 'ভক্তিস্তোত্র'।এখন এই ঝে নিবেদন , তা অকস্মাৎ হতে পারে না । বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে এবং একজন বৈষ্ণব কখনো মোক্ষ চান না ।তাঁদের কাছে শাস্ত্রে নির্দেশিত , চতুর্বর্গ ফল অর্থাৎ ধর্ম,অর্থ, কাম ও মোক্ষ আকাঙ্ক্ষিত নয়।পঞ্চম বর্গ ফল প্রেমভক্তি কাম্য । এ প্রসঙ্গে আসে , প্রেমভক্তি বা ভক্তির পঞ্চবিধ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য' এবং 'উজ্জ্বল' বা 'মধুর রসের মধ্যে মধুরকে শ্রেষ্ঠ বা সর্বসাধ্যসার বলে অভিহিত করেছেন। সমস্ত। মধুররতিতে শান্ত-সখ্য-দাস্য-বাৎসল্যের সমস্ত গুণ, অধিকন্ত প্রেমের একাত্মতা-বন্ধন। মধুররতি উৎকর্ষ লাভ করতে করতে ভাব, মহাভাব পর্যস্ত অবস্থায় উত্তীর্ণ হতে পারে(রতি বা ভাব বর্ধিত হয়ে ক্রমে প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ এবং পরিণামে ভাব ও মহাভাব হয়)। অবশ্য এই মহাভাব-সম্পদে একমাত্র শ্রীরাধার অধিকার।কিন্তু,শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অন, বন্দন, দাস্য প্রভৃতি এবং আরও বহু বিধিনিদিষ্ট বৈষ্ণবাচারই হল সাধনভক্তির অঙ্গ। রাগানুগা ভক্তিরও এসব সাধন রয়েছে। "রাগানুগা' হল বৃন্দাবনের গোপাবৃন্দ, নন্দ-যশোদা, শ্রীদাম-সুদাম, উদ্ধবাদির অনুগামী যে ভক্তি। 'রাগাত্মিকা'র অনুগত বলে রাগানুগা। গোপীদের কাছে কৃষ্ণ কাম বা প্রেমের বশীভূত। অন্যত্র পুত্র, সখা, প্রভু প্রভৃতি সম্বন্ধের বশীভূত। এজন্য রাগাত্মিক শ্রীতির বৃন্দাবনে দুই রূপ। মানুষও নিজ প্রবৃত্তি ও রুচি অনুযায়ী এ দুয়ের কোনো একটা ভাব অনুসরণ করে ভক্তসাধনে রত হতে পারে। রাগাত্মিকে ঈশ্বরে এশ্বর্যবোধ বা পূজনীয়তাবোধ নেই---

মোর পুত্র, মোর সখা মোর প্রাণপতি।
এইভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধ রতি॥
আপনারে বড় মানে, আমারে সম হীন।
সেইভাবে হই আমি তাহার অধীন ॥
এবং ব্রজের নির্মল রাগ শুনি ভক্তগণ।
রাগমার্গে ভজে যৈছে ছাড়ি ধর্ম কর্ম ।

আর রাগাত্মিক-রাগানুগা ভক্তিতে কৃষ্ণসেবার অকারণ লোভই হল বড় কথা। শাস্ত্র এবং যুক্তিতর্ক এখানে মূল্যহীন। অথচ বৈধমার্গের ভক্ত শাস্ত্রাদি অবহেলা করেন না। বৈধী ভক্তি অনুসরণ করতে করতে যখন ভাবের উদয় ঘটে তখন ভক্ত রাগানুগ-মার্গের অধিকারী হয়ে পড়েন। শাস্ত্রাদির নির্দেশ মানার প্রয়োজন তখন আর থাকে না। তবু তিনি যে কর্মে লিপ্ত থাকেন সে হল কৃষ্ণসেবার প্রয়োজনীয় কর্ম। বৈদিক-লৌকিক কর্ম নয়। আর, শ্রবণ কীর্তনাদি যা বৈধীতে বিহিত তা রাগানুগারও অঙ্গ। এইভাবে ভক্ত কৃষ্ণাসক্তি বশতই অনায়াসে এ সবের প্রতি আকৃষ্ট হন। শ্রীরূপ রাগের লক্ষণ স্থাপনে বলেছেন, "ইষ্টে স্বারসিকী পরমাবিষ্টতা"। লালসাই যার আবির্ভাবের একমাত্র কারণ,

অন্য কোনো কারণ বা উদ্দেশ্য যার মূলে নেই। এই আশ্চর্য শ্রীতি ওঁপপত্যভাবাপন্ন গোপীদের। ভিন্নভাবে যশোদাদিরও। তার অনুগামী মর্ত্যবাসীদের যে ভজন-পদ্ধতি তা-ই রাগানুগা। রাগানুগভাবেও ভজন-সাধন প্রয়োজন। সেইহেতু শ্রবণ-কীর্তনাদি রাগানুগারও অঙ্গ।"৩

এই প্রসঙ্গে আসে , জীবের সিদ্ধির কথা।নিত্য বৃন্দাবনধাম বৈকুন্ঠ্যলোক। তারা বা জীব বা মানুষদেহী বৈষ্ণব গোপীভাব অঙ্গীকার করে রাধাকৃষ্ণের লীলায় অংশগ্রহন করতে চায় বৈকুন্ঠ্যলোক। কিন্তু জীবের সঙ্গে কৃষ্ণের মিলন হতে পারে না।জীব যেহেতু তটস্থাশক্তির অংশ। রাগাত্মিক ভজনবলে গোপীভাব অঙ্গীকার করে গোপীদের অনুগতা হয়ে অর্থাৎ মঞ্জরীভাব অঙ্গীকার করে,সেবাবাসনা মূলকথা।জীব মঞ্জরীভাব অঙ্গীকার করলেও যেহেতু তার সাথে মিলন সম্ভব নয়, তাই লীলাবিস্তারে বা বৈচিত্র্য-বিলাসে উপস্থিত থাকতে পারে ।কোন গোপী উপস্থিত থাকতে পারে না । এই জন্য বৈষ্ণবমহাজন কবিরা মঞ্জরীভাবে ভণিতা দিয়েছেন।

গোপীদের এই প্রেমে আত্মসুখ নয় , কৃষ্ণ সুখের জন্য নিজেদের সমর্পণ করে। : রাধার তো কথাই নাই, গোপীদের প্রণয়ও উচ্চপর্যায়ের, কৃষ্ণের নিজপ্রণয় তার কাছেও যেতে পারে না। গোপীপ্রেম যেমন সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ তেমনি একান্ত সীমাহীন। প্রেমবিষয়ে গোপীরা কৃষ্ণের গুরু। এই গোপীদের মধ্যে আবার সব বিষয়ে রাধার শ্রেষ্ঠতা। তিনি মহাভাবের অধিকারিণী।কৃষ্ণকীর্তনাদির ভিত্তিভূমিরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধাদির গোপীচিত্র পরকীয়া নায়িকার এবং কৃষ্ণের চিত্র উপপতির। ভাগবতের নানা স্থানে তীব্র আকর্ষণ এবং অপরিমেয় ত্যাগের দিক লক্ষ্য করে গোপীদের পরকীয়াত্বের গুণকীর্তন করা হয়েছে। গোপীদের আশ্চর্য প্রেমের কাছে নিজ প্রেম নিষ্প্রভ বোঝাতে গিয়ে কৃষ্ণ বলছেন :-

ন পারয়েহহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥"

অর্থাৎ "শুদ্ধাত্মা তোমরা, আমার সঙ্গে মিলন কামনায় তোমরা যে দুশ্চর তপস্যা করেছ তার প্রতিদান দিতে পারি সে সাধ্য আমার নেই। অতি দুশ্ছেদ্য সংসারবন্ধন তোমরা ছিন্ন করেছ, এর প্রতিদান তোমরা তোমাদের ত্যাগময় আশ্চর্য প্রেমের দ্বারাই লাভ করো।" অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষে এতদূর সম্ভব ছিল না। কৃষ্ণপ্রেমের এক অলৌকিক কার্যকারিতা হল এই যে, গোপীরা আত্মসুখ না চাইলেও কোটিগুণ আনন্দ অনুভব করে থাকেন। কারণ, কৃষ্ণসুখেই গোপীসুখের শেষ পর্যবসান। এ যেন, "গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়"। ৪

সংসার এবং পাতিব্রত্য নিঃশেষে ত্যাগ এবং কৃষ্ণের আরাধনায় প্রাপ্ত গুরুদুঃখেও সুখানুভব এই মহাভাবের লক্ষণ। রাধিকার চিত্তেন্দ্রিয়কায় কৃষ্ণপ্রেমভাবিত, তার সমস্ত বোধই কৃষ্ণপ্রীতিবোধ, তাই বিরহে অথবা স্বজন তাড়নাদিতে বাইরে কালকৃট-বিষজ্বালা অনুভূত হ'লেও অন্তরে সুধানিস্যন্দবিশেষ স্বাদিত হয়, এজন্যই রাধাপ্রেম তুলনাহীন।প্রেমের এই পরাকাষ্ঠা অন্য গোপীদের স্বভাবে অনুভূত হয় না। এতখানি কৃষ্ণতন্ময়তা এবং এত তীব্র বিরহদুঃখও তাদের ক্ষেত্রে সম্ভব হয়নি।কৃষ্ণের অলৌকিক পরকীয়ারসলীলা মুখ্যভাবে রাধারই সঙ্গে। তিনিই গোপীশ্রেষ্ঠা এবং হ্লাদিনীর সারভূতা। অন্য গোপীদের প্রেম গাঢ়তা প্রাপ্ত হয়ে “ভাব' পর্যন্ত পৌছাতে পারে। কেবল রাধিকাই “মহাভাবে'র অধিকারিণী।অন্তরঙ্গা শক্তির বিলাসস্থল হলেও দ্বারকা-মণুরায় প্রেমের এই চরম প্রকাশ নেই, সেখানে কৃষ্ণ এশ্বধময়! তিনি সত্যভামা, রুক্মিণী এবং আরও বহু মহিবীর পবম-গুরুপতি। সেখানে কৃষ্ণ পরিহাস করলেও সত্যভামা ভীত হয়ে পড়েন। মানে রুষ্ট হতেই পারেন না। নারায়ণশক্তি লক্ষ্মী গোপকৃষ্ণকে পাবার জন্য তপস্যা করেও পাননি। অথচ শ্রীরাধা কৃষ্ণের চতুর্ভূজ মূর্তির সমাদরই করেন না। কৃষ্ণের নিমেষমাত্র ওঁদাসীন্য দেখলে বত্রভাব অবলম্বন করে কঠোর কথা শুনিয়ে দিতে দ্বিধা করেন না। আবার, মানিনী রাধিকার মানভঙ্গ করতে নিজের সমস্ত গৌরব বিসর্জন দিয়ে পদতলে লুটিয়ে পড়তেও কৃষ্ণের বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। এই পরকীয়া শ্রীতিতে গোপীরাই সমস্ত প্রেমের আশ্রয়, তারাই গুরু, কৃষ্ণ শিক্ষানবীশ মাত্রঅঙ্গ।”৫

প্রেমের সর্বোচ্চ পরিণতি নতি স্বীকার। এই প্রৌঢ় প্রেমের জন্য রাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বলেছে মানভঞ্জনের জন্য (যা নিবেদনের গৌরচন্দ্রিকা বলা যেতে পারে), এখানে তা স্মরণীয়—

স্মর-গরল-খণ্ডনং মম শিরসিমণ্ডনম্ দেহি পদপল্লবমুদারম্ |
জ্বলতি ময়ি দারুণো মদনকদনানলো হরতু তদুপাহিতবিকারম্ ||১০/৮||৬

অর্থাৎ রাধার পদ্ম-চরণ দুটি কৃষ্ণের মাথার ওপর রাখুক এবং কৃষ্ণের কাম-গরল দূরীভূত করুক। তার হৃদয়ে সদা মদন-বেদানলে জ্বলছে, সদয় হয়ে এই বিকার দূর করুক।

এক্ষেত্রে আসে,নববিধা ভক্তির কথা। নববিধা ভক্তি হল ,শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ এবং অন্যান্য ভক্তিশাস্ত্রে উল্লেখ থাকা নয় ধরনের ভক্তি('ভক্তি' শব্দের সাধারণ অর্থ ঈশ্বর সেবা। আধাত্মিক ক্ষেত্রে ঈশ্বরর বা ভজনীয় দেবতার প্রতি গভীর অনুরাগ এবং প্রীতি ভক্তিকে বোঝায়।ভক্তির স্তর তিনটি শ্রদ্ধা, রতি এবং ভক্তি।)।শংকরদেবের একটি শ্লোকে এই নয় ধরনের ভক্তির উল্লেখ আছে-

"শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদ সেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।।"

এই নববিধা ভক্তি হচ্ছে-

১. শ্রবণ (সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ: পরীক্ষিত),

২.	কীর্তন,(সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ:মীরাবাঈ),
৩.	স্মরণ (সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ: প্রহ্লাদ),
৪.	অর্চন (সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ: পৃথু),
৫.	পদসেবন (সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ: লক্ষ্মী দেবী),
৬.	দাস (সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ: হনুমান),
৭.	সখাত্ব (সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ: অর্জুন),
৮.	বন্দন (সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ: অক্রূর) এবং
৯.	আত্মনিবেদন (সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ: বলি)।

আত্মনিবেদন বা নিবেদন মূলক রসপর্যায়ে দাস্য ও মধুর রসের মিশ্রণ রয়েছে।এমনকি শ্রীকৃষ্ণের আত্মনিবেদনে ধ্বনিত হয়েছে সমর্পিত প্রেমের সর্বোচ্চ ভাব নতি স্বীকার।

তুয়া অনুরাগে হাম নিমগন হইলাম।
তুয়া অনুরাগে হাম গোলোক ছাড়িলাম।।
তুয়া অনুরাগে হাম কাননে ধাই।
তুয়া অনুরাগে হাম ধবলী চরাই।।
তুয়া অনুরাগে হাম পরি নীল শাড়ী।
তুয়া অনুরাগে হাম পীতাম্বর-ধারী।।
তুয়া অনুরাগে হাম হইনু কলঙ্কিনী।
তুয়া অনুরাগে নন্দের বাধা বইনু আমি।।
তুয়া অনুরাগে হাম তুয়াময় দেখি।
তুয়া অনুরাগে মোর বাঁকা হইল আঁখি।।
তুয়া অনুরাগে হাম কিছু নাহি জান।
চন্দ্রাবলী ভজ জ্ঞানদাসের গান।।

কলহান্তরিতা অবস্থায় খণ্ডিতার রোষ, নীরবতা ইত্যাদির ভাব একেবারে দূর হয় না বরং তা অনুতাপের আবরণে জড়িত থাকে এবং সেই অবমানিতের মরম বেদনা ঝরে পড়ে নিবেদনে এসে।

প্রেমের ঋণ ,বৈকুন্ঠ্যলীলার যে পিপাসা দ্বাপরে নিয়ে আবির্ভূত হয়ে অবশেষে কলিকালে নবদ্বীপে আভির্ভূত। রাধা ভাবের প্রগাঢ়তা চৈত্যদেবের মধ্যে থাকলেও , কৃষ্ণ ভাবের প্রকাশ কখনো কখনো থাকলেও তার পরিমাণ সমগ্র সন্ন্যাস পর্বের তুলনায় কিছু নয়।যদিও সময়ের ধারা অনুসরণ করা 'প্রেমবিলাস বিবর্ত'' অর্থাৎ প্রেমের প্রগাঢ় অবস্থা পরিপক্কতা লাভ করেছে।

''রাধা ছাড়া কৃষ্ণও অপূর্ণ, দীন ॥ ''রাধার সঙ্গে অবস্থিত কৃষ্ণ মদনমোহন । নতুবা স্বয়ং মদনমোহিত। রাধার জন্যই কৃষ্ণের নটবর বেশ, পীতবসন, মুরলী-ধারণ

এবং “চড়ার টালনি বামে”। রাধাপ্রেমের অংশলাভের সৌভাগ্যও লক্ষ্মীর ঘটেনি। কৃষ্ণদাস বলছেন :

না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল।
যে বলে আমারে করে সর্বদা বিহ্বল॥
রাধিকার প্রেম গুরু, আমি শিষ্য নট।
সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট ॥

ললিতা, বিশাখা এমনকি চন্দ্রাবলীর মত কৃষ্ণপ্রিয়াও কৃষ্ণের এই বিস্ময়মিশ্রিত শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারেননি । মহাজন গোবিন্দদাস কবিরাজ একটি পদে সুকৌশলে গোপীদের সঙ্গে শ্রীরাধার প্রেম-অনুভবের পার্থক্য এবং রাধিকার উৎকর্ষ খ্যাপন করেছেন :-

আধক-আধ- আধ দিঠি-অঞ্চলে
যব ধরি পেখলুঁ কান।...
রহত কি যাত পরাণ ॥

অর্ধেকের অর্ধেক, তারও অর্ধেক দৃষ্টিতে যখন থেকে কৃষ্ণকে দেখেছি তখন থেকে কত শতকোটি মদনবাণে জর্জরিত হয়ে প্রাণ যাবার মত হয়েছে।

সুনয়নী কহত কানু ঘনশ্যামর
মোহে বিজুরি-সম-লাগি।
রসবতী তাক পরশ-রসে ভাসত
হমার হৃদয়ে জ্বলু আগি।

যে গোপী বলে কৃষ্ণ স্নিগ্ধ ঘনশ্যাম, দেখলে "চোখ জুড়িয়ে যায়, সে সুনয়নী। আহা, তার নয়ন ভালো। আমার কিন্তু দেখামাত্রই বিদ্যুতের মত চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, জ্বালা করে। আর কৃষ্ণের স্পর্শলাভে যে ধন্য হয়, বিহ্বল হয়ে পড়ে, সে রসবতী ; তার জয় হোক। কিন্ত সে স্পর্শ আমার দেহমনে অগ্নিময় হয়ে ওঠে, আমি এমনিই মন্দভাগ্য!

প্রেমবতী প্রেম লাগি জীউ তেজত
চপল জীবনে মঝু সাধ।

প্রেমিকা প্রেমের জন্য আত্মদান করে আর ভাগ্যহত আমি এই চপল জীবনে বেঁচে থাকতেই চাই! বলা বাহুল্য, শ্রীমতীর অন্তরে কেন বিষজ্বালা হয়, কেন তিনি প্রাণত্যাগ করতে চান না--তার কারণ রসিক ভক্তকে বুঝিয়ে বলতে হবে না। আর এর মধ্যে রাধাপ্রেম-প্রদর্শ মহাপ্রভুই আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়েছেন সেও ভারা ইঙ্গিতেই বুঝবেন। গোপীপ্রেম থেকে রীধাপ্রেমের উৎকর্ষ দ্যোতনা করতে চরিতামৃতে বলা হয়েছে:

মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরানী।
সর্বগুণখনি সর্বকান্তামণি।।

রাগাত্মিক প্রীতিরসের প্রথমাবস্থাকে যদি "রতি" বলা যায়, পরবর্তী অবস্থাকে বলা যায় "প্রেম'। রতির গাঢ়তাই প্রেমে ঘনীভূত, আরো ঘনীভূত হতে হতে ক্রমান্বয়ে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ এবং ভাবে গিয়ে পৌঁছায়। সাধারণভাবে গোপীদের প্রেম এই "ভাব"-অবস্থা পর্যন্ত যেতে পারে। কিন্তু ভাবই এর সান্দ্রতম শেষ প্রকাশ নয়। ভাবের উপরে যে অলৌকিক অপরিমেয় মানসিক অনুভব রয়েছে তা হ'ল মহাভাব এবং এই অবস্থার অধিকারিণী হলেন শ্রীমতী স্বয়ং। সংসার এবং পাতিব্রত্য নিঃশেষে ত্যাগ এবং কৃষ্ণের আরাধনায় প্রাপ্ত গুরুদুঃখেও সুখানুভব এই মহাভাবের লক্ষণ।"৭

বিরহে কৃষ্ণস্ফূর্তি এবং প্রলাপাদি যেমন এক প্রেমপরাকাষ্ঠা, তেমনি মিলনে সম্পূর্ণ আত্মবিলোপ এবং ভাবে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়া এও প্রেমের এক পরিপাকাবস্থা। তবু স্বরূপ-বর্ণনায় একে বিবর্ত বলা হয়েছে এইজন্য যে যথার্থই তো আর নায়ক-নায়িকা স্বাতন্ত্র্য ত্যাগ ক'রে এক হয়ে যাচ্ছে না। প্রেমের বিষয় এবং আশ্রয় দুয়েরই এ রকম মনে হয় ব'লে। মোহন অবস্থায় দিব্যোন্মাদ বা বিরহোন্মাদেও একম ভ্রান্তি। মহাপ্রভুর নীলাচল-লীলায় এই ভাবাবস্থা ভক্তেরা পুনঃপুন স্বচক্ষে দেখেছিলেন। এ থেকেই ব্রজলীলায় রাধার অনুরূপ ভাবাবস্থা তাঁরা কল্পনা করে নিয়েছেন। মোহন হল প্রেমের বিরহাশ্রিত একত্বের সীমা, আর মাদন হ'ল মিলনগত একীভাবের ঘনীভূত অবস্থা।

মোহন-মহাভাব বিশেষ দশার আশ্রয়ে বিরহোন্মাদের আবির্ভাব ঘটায়। শ্রীমতী মথুরা থেকে কৃষ্ণপ্রেরিত উদ্ধবদর্শনে বিশেষত ভ্রমরকে লক্ষ্য করে উন্মত্তের ন্যায় বিলাপ, রোদন, ক্রোধ, মান প্রভৃতি প্রদর্শন করেছিলেন। উদ্ঘূর্ণা, প্রলাপ, চিত্রজল্প প্রভৃতি হল দিব্যোন্মদের কার্য। চরিতামৃতা বলছেন :-

উন্মাদের লক্ষণ করায় কৃষ্ণ স্মরণ,
ভাবাবেশে উঠে প্রণয় মান।
সোল্লুন্ত বচনরীতি, মদ গর্ব ব্যাজস্তুতি
কভু নিন্দা কভু বা সম্মান॥

এই অবস্থায় প্রবল মানস-বিকৃতি দেহেরও বিকৃতি নিয়ে আসে। মহাপ্রভুতে লক্ষিত এই অলৌকিক ভাবাবেশের বর্ণনায় চৈতন্যচরিতামৃত বলছেন :

নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ-উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা প্রলাপময় বাদ।
রোমকূপে রক্তোদ্গাম দন্ত সব হালে।
ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয় ক্ষণে অঙ্গ ফুলে ॥
গম্ভীরা-ভিতরে রাত্রে নিদ্রা নাহি লব।
ভিত্তে মুখ শির ঘসে ক্ষত হয় সব॥
তিন দ্বারে কপাট প্রভু যায়েন বাহিরে।

কভু সিংহদ্বারে পড়ে কভু সিন্ধুনীরে ॥
চটক পর্বত দেখি গোবর্ধন ভ্রমে।
ধাঞা চলে আর্তনাদ করিয়া ক্রন্দনে॥
উপবনোদ্যান দেখি বৃন্দাবনজ্ঞান।
তাহা যাই নাচে গায় ক্ষণে মুর্ছা যান॥
কাহা নাহি শুনি যেই ভাবের বিকার।
সেই ভাব হয় প্রভুর শরীরে প্রচার ॥

এই পরমাশ্চর্য ভাবাবস্থা এবং 'কোথা কৃষ্ণ' ব'লে অহরহ রোদন এক মহাপ্রভুর লীলায় দৃষ্ট সুতরাং রাধাপ্রেমে অনুমিত হয়েছে। এইজন্যই রাধিকা হলেন ব্রজকান্তাগণের শিরোমণি। তার পক্ষে এ স্বাভাবিক, কারণ রাধা কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি, এক আত্মা - দুই দেহ, আর ব্রজগোপীরা তার স্বাংশ নিয়ে গঠিত অনন্ত বিলাসমূর্তি মাত্র। রাধাকৃষ্ণ যুগলপ্রণয়ের যে মিলনরসাস্বাদ, তার আর এক উল্লেখযোগা বৈশিষ্ট্য হ'ল উভয়ের ব্যক্তিস্বাতন্ত্য বিলীন করে শুধু ভাবসারাবস্থায় উপনীত করা। তখন কৃষ্ণের পুরুষ-ব্যক্তিত্ব এবং রাধার নারী-ব্যক্তিত্বের বিলোপ ঘটে। আস্বাদক এবং আস্বাদ্যেরও ভেদ থাকে না। উভয়ে প্রেমাত্মা-রূপে প্রেমসমুদ্রে ভাসমান হয়। চরিতামৃতে রামানন্দমুখে একে প্রেমবিলাস-বিবর্ত বলেছেন। বিবর্ত শব্দের অর্থ ভ্রান্তি বা অন্যথাবুদ্ধি। পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ তখন বিলাসবিবর্ত নিজেকে নায়ক আর শ্রীমতী তখন নিজেকে নায়িকা বলে মনে করে না। এরকম বিহ্বতা ঘটতে পারে মহাভাবের মিলন-পরিপাকাবস্থায়, মাদনাবস্থায়। বিরহে কৃষ্ণস্ফূর্তি এবং প্রলাপাদি যেমন এক প্রেমপরাকাষ্ঠা, তেমনি মিলনে সম্পূর্ণ আত্মবিলোপ এবং ভাবে রূপান্তরিত হয়ে যাওয়া এও প্রেমের এক পরিপাকাবস্থা। তবু স্বরূপ-বর্ণনায় একে বিবর্ত বা ভ্রমাভা বলা হয়েছে এইজন্য যে যথার্থই তো আর নায়ক-নায়িকা স্বাতন্ত্র্য ত্যাগ করে এক হয়ে যাচ্ছে না। প্রেমের বিষয় এবং আশ্রয় দুয়েরই ঐ রকম মনে হয় বলে। ৮

সুতরাং নিবেদনের মতো পদে 'রাধার মহিমা ও প্রেমরস সীমা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে পদ-পর্যায়ে ,তাকে এভাবে বৈষ্ণব দর্শনে ও রসশাস্ত্রে গোত্রভুক্ত না করাটা , প্রেভক্তিরসের মাধুর্যে শ্রেণীকরণের ত্রুটি ফুটে ওঠে। আবার বৈষ্ণব পদাবলীর ক্রমবিকাশে জয়দেব থেকে চণ্ডীদাস ,জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বৈষ্ণবদাস, দীনবন্ধুদাস প্রমুখ মহাজন রাধাপ্রেমের স্বরূপকে যে উন্নীত পর্যায় নিয়েগেছেন, যে প্রেম অপার্থিব হয়েও পার্থিব,যে প্রেম পার্থিব হয়েও অপার্থিব, প্রেম আধ্যঅত্মিক ও পূজা হয়ে উঠেছে ।

বৈষ্ণব মহাজনেরা ভক্ত ও সাধক, রসশাস্ত্রে বিদগ্ধ পণ্ডিত, নিবেদনে মিলনের একাত্ম সুর। দ্বাপরে দুই , কলিতে আবার এক হলেন ভাববৈকুণ্ঠ্য বা ভাববৃন্দাবনে, কৃষ্ণ এই লীলার তো শেষ নেই , শুরুও নেই । অনন্ত কাল ধরে চলে আসছে , চলতে থাকবে । অর্থাৎ ছিল , আছে ও থাকবে,-- এ কথা পুরাণে বা ভাগবতে বারংবার বলা তাই-ই হয়েছে। পুনশ্চ, নিবেদন বিপ্রলম্ভের মানের পরে যেমন স্থান পেতে পারে(

কেননা, পূর্বে সম্মিলিত নায়ক-নায়িকার মিলনজাত উল্লাসময় চিত্র পূর্বরাগের পর থেকেই পাওয়া যায়।) তেমনি ,নায়িকা প্রকরণে কলহান্তরিতার পর অবস্থিত হবার সবরকম আনুকূল্য রাখে।

উল্লেখপঞ্জী:

১. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, পদাবলী-পরিচয়,দেজপাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ ,১৯৯৮,পৃ.৪৬-৪৮।

২. জয়দয়াল গোয়েন্দকা ,শ্রীমদ্ভগবতগীতা,গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর, ২০১৮, পৃ.১-৪৮৪ ।

৩. ক্ষুদিরামদাস, বৈষব-রস-প্রকাশ, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১৩, পৃ.১৮৪ ।

৪. তদেব,১৫১।

৫. তদেব,পৃ. ১৩৩ ।

৬. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ, দেজপাবলিশিং, কলকাতা, ১৪২৭,পৃ. ২৪৫ ।

৭. তদেব, পৃ.১৩৮ ।

৮. তদেব, পৃ. ১৪২ ।

সহায়ক গ্রন্থ :--

১. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), বৈষ্ণব পদাবলী, ২০০০, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা ।

২. সত্য গিরি(সম্পাদিত), বৈষ্ণব পদাবলী ,২০১৫,রত্নাবলী,কলকাতা।

৩. সনাতন গোস্বামী, বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয় , ২০০২, শম্পা বুক হোম,কলকাতা।

৪. দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,বৈষ্ণব কবি প্রসঙ্গে,২০০৬,রত্নাবলী,কলকাতা।

বাংলা ছোটোগল্পে বেহুলার নবনির্মাণ : নারীর অবস্থান ও সমাজবদলের পদচিহ্ন

শ্রেয়া রায়
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, দুর্গাপুর সরকারি মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ:
বাংলা সাহিত্যে মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনি ও চরিত্রদের নিয়ে আধুনিক সময়ে বিভিন্ন ধরণের সাহিত্য রচিত হয়েছে। বিভিন্ন সাহিত্যিক মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনি নিয়ে কবিতা,নাটক,উপন্যাস রচনা করেছেন তেমনি মঙ্গলকাব্যের নবনির্মাণ ঘটেছে বাংলা ছোটোগল্পেও। মঙ্গলকাব্যের বেহুলা চরিত্রকে কেন্দ্র করে একাধিক ছোটোগল্পকার ছোটোগল্প রচনা করেছেন যেমন – মহাশ্বেতা দেবীর 'বেহুলা', সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'সতত বেহুলা', জাকির তালুকদারের 'বেহুলার দ্বিতীয় বাসর', বাণী বসুর 'বেহুলার ভেলা'ও মতি নন্দীর 'বেহুলার ভেলা'। এই গল্পগুলিতে বেহুলা চরিত্রকে কেন্দ্র করে মঙ্গলকাব্যের যেমন নবরূপায়ণ ঘটেছে তেমনি ফুটে উঠেছে নারীর অবস্থান ও সমাজ বদলের পদচিহ্ন। আলোচ্য প্রবন্ধে সেই দিকটিকে তুলে ধরা উদ্দেশ্য। এই প্রবন্ধের জন্য নির্বাচিত মহাশ্বেতা দেবীর 'বেহুলা' ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে 'প্রমা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই গল্পের বেহুলা, লখিন্দর, মনসা কেউই একক ব্যক্তি মানুষ হয়ে আসেনি। বেহুলা নদীর তীরবর্তী বেহুলা গ্রামের অধিবাসীরা একত্রিত হয়ে লখিন্দর হয়ে ওঠে উঠেছে। প্রশাসন মানুষকে শুধুমাত্র ভোটার হিসেবে গণ্য করে কীভাবে তাদের জীবনকে অন্ধকারের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে এবং একজন শিক্ষিত ব্যক্তির সহায়তায় মানুষ একত্রিত হয়ে সেই অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছে সেই কথাই লেখিকা তার লেখনীতে তুলে ধরেছেন। মনসাদেবী এই গল্পে কখনো শুভ কখনো অশুভ শক্তির প্রতীক হয়ে এসেছেন। একইসঙ্গে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বেহুলার আখ্যানকে নিজেদের মতো করে নিজেদের জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে গড়ে নিয়েছে। ফলে ভিন্ন ধরনের আখ্যানের সন্ধান এ গল্পের মধ্যে পাওয়া যায়। মানুষ নিজেরা নিজেদের রক্ষার্থে নিজেদের জীবনে বেহুলার সমধর্মী হয়ে উঠেছে। বেহুলা এভাবেই গল্পে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'সতত বেহুলা' গল্পটি 'পরিকথা' পত্রিকায় ২০05 খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই গল্পের শান্তিনাথ বৃদ্ধাবস্থায় একান্ত স্বাধীনতা পেতে চেয়েছে। তার একাকীত্ব, পরাধীনতা, অসহায়তায় সে বেহুলার সমধর্মী হয়ে ওঠে এবং স্বাধীনতা পাওয়ার লক্ষ্যে নিজের মনোজগতে অমরার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয়।

মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনি যেখানে শেষ সেখানে শুরু হয় জাকির তালুকদারের 'বেহুলার দ্বিতীয় বাসর' গল্পটি। গল্পটি 'বেহুলার দ্বিতীয় বাসর' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত। মৃত

লখিন্দরকে বেহুলা বাঁচিয়ে ফিরিয়ে আনার পরে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ অন্যের সামনে বাধ্য হয়ে নৃত্য পরিবেশনকারী নারীকে কীভাবে গ্রহণ করতে পারে, সেই সম্ভাবনার একটি ছবি লেখক এই গল্পে তুলে ধরেছেন। বেহুলা তার সবকিছু ত্যাগ করে লখিন্দরকে বাঁচালেও সমাজের চোখে সে 'অসতী'। ব্যক্তি মানুষ হিসেবে, শিল্পী হিসেবে সমাজ তাকে কোনো মর্যাদা দেয়নি। বরং সে পেয়েছে অপমান। মধ্যযুগের নারীর মধ্যে দিয়ে আধুনিক যুগে নারীর অবস্থানকে লেখক এভাবে দেখালেন এই গল্পে। তবে উল্লেখ্য বেহুলা একজন নারী হিসেবে পুরুষের কাছে মাথা নত করেনি। বরং সে দৃপ্ত কণ্ঠে জানিয়েছে তার কৃতকর্মের জন্যে সে অনুতপ্ত নয় এবং তার শিল্পীসত্তার প্রতি সম্মান, মর্যাদা সে নিজে নিজেকে দিয়েছে। অন্যের অপমান অবজ্ঞা তার আত্মমর্যাদা, আত্মসম্মান তথা ব্যক্তিত্বকে ধুলিসাৎ করতে পারেনি।

বাণী বসুর 'বেহুলার ভেলা' গল্পটি ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। গল্পে সাতের দশকের নকশাল আন্দোলনের ভয়াবহ ফলকে একক ব্যক্তিমানুষের সাপেক্ষে লেখিকা দেখিয়েছেন। তরুণ ছাত্র সমাজ রক্তের তেজে রক্তের বিনিময়ে সমাজের আমূল পরিবর্তন করতে গিয়ে তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারের মধ্যে পতিত হয়। সেখানে অমিতেশের মতো মেধাবী ছাত্র পঙ্গু হয়ে বিছানায় পড়ে থাকে এবং মাতৃত্বের স্বাদ থেকে বঞ্চিতা সংহিতা দত্তগুপ্ত স্বামীর প্রতি ভালোবাসায়-নিষ্ঠায়, সংসারের দায়িত্ব পালন করে চলে। ক্যাবারে নর্তকী হয়ে বেহুলার মতো লোলুপ পুরুষের চোখের সামনে নৃত্য পরিবেশন করতে বাধ্য হয়। সতীত্বের পরীক্ষায় স্বামীর জন্য আত্মত্যাগে সে বেহুলা হয়ে ওঠে।

মতি নন্দীর 'বেহুলার ভেলা' গল্পটি শারদীয়া 'পরিচয়' পত্রিকায় ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই গল্পে লেখক অর্থনৈতিক দোলাচলতায় সম্পর্কের টানাপোড়েনকে তুলে ধরেছেন। অর্থের অভাবে সম্পর্কের তিক্ততা, দুর্বলতা সম্পর্কগুলোকে বেহুলার ভেলার মতো নড়বড়ে করে তুলেছে। এইভাবে প্রত্যেকটি সাহিত্যিকের লেখনীতে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বেহুলা নতুন নতুন রূপে সেজে উঠেছে এবং তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

সূচক শব্দ: মনসামঙ্গল কাব্য, বেহুলা, নকশাল আন্দোলন, সতীত্ব, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ, নারীবাদ, মানবতাবাদ, ডিকন্সট্রাকশন

বাংলা ছোটোগল্পে বেহুলার নবনির্মাণ : নারীর অবস্থান ও সমাজবদলের পদচিহ্ন

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে একটি টেক্সট বিভিন্ন পাঠকের কাছে একাধিক তাৎপর্য বহন করে। এরফলেই একটি টেক্সট বি-নির্মিত হয়। সেখানে টেক্সটির কোন অর্থটি বেশি যুক্তিসম্মত তা প্রমান করা উদ্দেশ্য থাকে না, দেখানো হয় তার বহুমাত্রিকতা। অর্থাৎ কোনো একটি টেক্সট পাঠ করতে করতে তার একাধিক অর্থ উন্মোচিত হতে থাকে এবং কোনো অর্থই যেমন চূড়ান্ত নয় তেমনি কোনো অর্থই একে অপরের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। একটি টেক্সটকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার এই

রীতিকে ডি-কন্সট্রাকশন বা বিনির্মাণবাদ বলা হয়। একটি টেক্সটের একাধিক ব্যাখ্যা সম্ভব হলে কোন ব্যাখ্যাটি ঠিক এবং কোনটি ঠিক নয় এই সংশয় পাঠকের মধ্যে তৈরি করা ডিকন্সট্রাকশন এর লক্ষ্য। ডিকন্সট্রাকশন বা নবরূপায়ণ একটি টেক্সটকে পাঠকের সামনে হিরের মতো করে তুলে ধরে। ফলে বিভিন্ন দিক থেকে আলো বিচ্ছুরিত হয়ে টেক্সটি একটি নতুন রূপ লাভ করে। যার ফলে পাঠক নতুন করে ভাবতে বাধ্য হয়। মধ্যযুগের কাহিনি, চরিত্রের উপরে আধুনিক যুগের সাহিত্যিকেরা এইভাবে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলো ফেলেছেন। ফলে অজস্র বিনির্মিত টেক্সটের জন্ম হয়েছে। আধুনিক সাহিত্যের সাহিত্যিকেরা মঙ্গলকাব্যের দেব মাহাত্ম্যের মোড়ক সরিয়ে দিয়ে তাকে আধুনিক জীবনের দৃষ্টিকোণ থেকে নানাভাবে দেখার চেষ্টা করেছেন। যেমন মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনি-চরিত্রকে অবলম্বন করে কবিতা লিখেছেন— কালিদাস রায় -‘চাঁদ সদাগর’, জীবনানন্দ দাশ - ‘রূপসী বাংলা’, অরুণ মিত্র - ‘ও বেহুলা’, শঙ্খ ঘোষ - ‘হেতালের লাঠি’ ইত্যাদি। নাটক রচনা করেছেন— শম্ভু মিত্র - ‘চাঁদ বণিকের পালা’, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় - ‘সওদাগরের নৌকা’, শেখর দেবরায় - ‘মনসাকথা’ ইত্যাদি। উপন্যাস লিখেছেন— অমিয়ভূষণ মজুমদার – ‘চাঁদবেনে’, সেলিনা হোসেন - ‘চাঁদবেনে’ ইত্যাদি। গল্প লিখেছেন — বিমল কর - ‘বেহুলা’, মহাশ্বেতা দেবী– ‘বেহুলা’, শওকত আলি - ‘শুন হে লখিন্দর’, বাণী বসু - ‘বেহুলার ভেলা’, মতি নন্দী - ‘বেহুলার ভেলা’, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় - ‘বেহুলা’ ইত্যাদি।

একটি অবিচ্ছিন্ন কালপ্রবাহকে নিজেদের সুবিধার্থে প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ, আধুনিকযুগ হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও আসলে প্রত্যেক যুগেই সাহিত্য বলেছে মানুষের কথা। ‘মঙ্গলকাব্যের দেবতাদের জয় আসলে মানুষেরই মঙ্গলচিন্তার জয়লাভ।’[১] মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণকে দেববাদ থেকে মানবতাবাদে উত্তরণ বলা হলেও এই যুক্তি পরম্পরায় শৃঙ্খলিত আধুনিক জীবনের সমস্যাকে পাঠকের কাছে স্পষ্ট ভাবে বোধগম্য ও প্রাণবন্ত করে তুলতে আধুনিক যুগের সাহিত্যিকেরা অনেক সময় প্রাচীন, মধ্যযুগের সাহিত্যের কাছে আশ্রয় নিয়েছেন। এই কারণে এই সময়ে দাঁড়িয়েও সেইসব সাহিত্য প্রাসঙ্গিকতার দাবি রাখে। আলোচ্য প্রবন্ধে মনসামঙ্গল আখ্যানের নবনির্মাণ আধুনিক ছোটোগল্পে কীভাবে ঘটেছে এবং বেহুলা চরিত্রেকে কেন্দ্র করে নারীর অবস্থান ও সমাজ বদলের পদচিহ্ন কীভাবে ঘটেছে তা দেখানো হয়েছে।

মধ্যযুগের বেহুলা এমন এক চরিত্র যে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে সকলের অবিশ্বাস, সন্দেহের চোখের সামনে দৃপ্তকন্ঠে বলেছে সে তার মৃত স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনবে। সকলের বিপরীতে গিয়ে অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারার, এই আত্মবিশ্বাস যুক্ত দৃপ্ত কণ্ঠের উচ্চারণ বুঝিয়ে দেয় মধ্যযুগের বেহুলা আধুনিক যুগের ব্যক্তিত্বকে ধারণ করে। নির্বাচিত গল্পগুলির মধ্যে মহাশ্বেতা দেবীর ‘বেহুলা’ গল্পে বেহুলা শুধু নারী নয়, জনসাধারণের সমষ্টিগত সত্তা হয়ে উঠেছে। সাধন চট্টোপাধ্যায়ের ‘সতত বেহুলা’ গল্পে একজন পুরুষের অন্তঃসত্ত্বার রূপ বেহুলার রূপকে ফুটে উঠেছে। এখানে

বেহুলা শুধু নারী নয়, একজন ব্যক্তি মানুষের অন্তঃসত্ত্বা। সেই ব্যক্তি বাস্তব জীবনে নারী বা পুরুষ যে কেউ হতে পারে। জাকির তালুকদারের 'বেহুলার দ্বিতীয় বাসর' গল্পে বেহুলা আধুনিক জীবনের নারীবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ। বাণী বসুর 'বেহুলার ভেলা' গল্পে বেহুলার মধ্যে দিয়ে কর্মরত নারীর পরিবার ও জীবনের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য-ভালোবাসার রূপকে লেখিকা তুলে ধরেছেন। মতি নন্দী 'বেহুলার ভেলা'য় অর্থনৈতিক চাপে নারী-পুরুষের সম্পর্কের ভিত্তিহীনতাকে দেখিয়েছেন। অর্থাৎ এখানে ঠিক বেহুলা নয়, বেহুলার ভেলার দুর্বলতা পচনশীল অবস্থার রূপ প্রাধান্য পায়। এইভাবে প্রত্যেকটি গল্পে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বেহুলা বিশেষ হয়ে ওঠে।

স্বপ্নের রাজ্য পরিত্যাগ করে বাস্তবের রুক্ষ ভূমিতে পদচারণা করে যখন কোনো সাহিত্যিক উচ্চবর্ণ, উচ্চস্থান এককথায় সমাজের তথাকথিত উচ্চ পদমর্যাদা ত্যাগ করে শোষিত, বঞ্চিত, ব্রাত্য মানুষের ঘরের মানুষ হয়ে ওঠে; তখনই পাঠক দেখতে পায় মহাশ্বেতা দেবীর মতো সাহিত্যিকদের। মহাশ্বেতা দেবীর লেখায় যেমন অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের জীবন, সংসার, দৈনন্দিন যাপন, তাদের উপর উচ্চ শ্রেণির অত্যাচার ইত্যাদি চিত্ররূপ লাভ করেছে, তেমনি পুরাকথা, পৌরাণিক চরিত্র ও ঘটনাকে বর্তমানের প্রেক্ষিতে এনে তিনি ব্যবহার করেছেন। ফলে অতীতের বিষয় নতুন রূপে তাঁর সাহিত্যে প্রকাশিত হয়েছে। যেমন মধ্যযুগের সাহিত্য মনসামঙ্গলের কাহিনি মহাশ্বেতা দেবীর 'বেহুলা' গল্পে নতুন দৃষ্টিকোণে ফুটে ওঠে।

'বেহুলা' গল্পটি ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে 'প্রমা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বেহুলা নামক নদীর পাড়ে বেহুলা গ্রামের পটভূমিতে এই গল্পের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। 'মহাশ্বেতা দেবী সেই গ্রাম ঘিরেই যেন রচনা করেন বেহুলার 'নয়া বাসর'-এর গল্প। যেন গোটা গ্রামই এক লৌহ বাসর, সেখানে অজস্র ছিদ্রপথে ঢুকে আছে কালাজ সাপের বেশে নিপীড়ন আর শোষণ !'[২] লেখিকার ভাষায় নদী বেহুলা হলে স্ত্রী-পুরুষকে তো লখিন্দর হতেই হবে। মনসামঙ্গল কাব্যে লখিন্দর শক্তিশালী পিতার পুত্র ও পতিব্রতা স্ত্রীর স্বামী। তার নিজের পরিচয় যেন সে নয়। 'লখিন্দর নিজে এক 'প্যাসিভ' চরিত্র হয়েই থেকে যান।...মহাশ্বেতা দেবীর 'বেহুলা' গল্পের বেহুলা গ্রামের বাসিন্দারাও লখিন্দরের মতো ভাবে নিজেদের।'[৩] যখন বেহুলা নামক নদী ও ভূমির লখিন্দরকে বাঁচাতে আসা সম্ভব নয় তখন এই গ্রামের মানুষেরা অর্থাৎ লখিন্দরেরা নিজেরা নিজেদের বাঁচানোর জন্য একটা সময় তৎপর হয়ে উঠেছে। মঙ্গলকাব্যের বেহুলা যেমন শক্তিশালী শক্তির সামনে অসহায় ছিল, অথচ হার মানেনি তেমনি এই গল্পের বেহুলা গ্রামের অধিবাসীরা তাদের উপর হওয়া দীর্ঘদিনের শোষণ, অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল। উচ্চস্থানে অবস্থানকারী রাজনৈতিক, সামাজিক শক্তি তাদের সমবেত শক্তিকে দমিয়ে রাখতে পারেনি।

এই গল্প আসলে শোষক শ্রেণির বিরুদ্ধে শোষিত শ্রেণির দীর্ঘদিনের ক্ষোভ প্রকাশের গল্প। এই গল্পের রন্ধ্রে রন্ধ্রে রয়েছে প্রতিবাদ ও সমাজের প্রতি কটাক্ষ। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে কলকাতার নিকটবর্তী গ্রামে চলে চিকিৎসার নামে প্রহসন। বেহুলা গ্রামের মানুষেরা এস.ডি.ওর কাছে বনফুলের 'ভোটার সাবিত্রীবালা' গল্পের সাবিত্রীবালার মতো একজন ভোটার মাত্র। ভোটারদের পরিচয় তারা ভোটার। ভোটপ্রার্থী তথা ক্ষমতাশীল শ্রেণির কাজে তারা শুধু স্বার্থের জন্য ব্যবহৃত হয়। বেহুলার উপাখ্যানে বেহুলা ও লখিন্দর মনসার পূজা প্রচারের জন্য মর্ত্যে আসতে বাধ্য হয়েছিল। দেবতাদের চোখে আমরা যেমন সাধারণ, তাদের যেমন খুশি ব্যবহার করা যায়, তেমনি রাষ্ট্রশক্তির কাছে সাধারণ মানুষ গণতন্ত্রের তন্ত্র চালানোর গুটিমাত্র। পাওয়ার স্ট্রাকচার বা তন্ত্র গণের দ্বারা পরিচালিত হয় না, বরং গণকে পরিচালনা করে।

বসন্ত ও শ্রীপদর মানবিক সম্পর্ক হেদো নস্কর ভালো চোখে দেখেনি। মেধা থাকা সত্ত্বেও টাকার অভাবে শ্রীপদ পড়তে পারেনি। এই রকম কত শ্রীপদ পূর্বেও অর্থবান সমাজ-রাষ্ট্রের কাছে নিজের স্বপ্ন জলাঞ্জলি দিয়েছে, আজও দিচ্ছে। এই গল্পের বেহুলা কোন একক সত্তা নয়। বেহুলা যেন এই বেহুলা গ্রামের অধিবাসীদের সমষ্টিগত সত্তা। যারা অসহায়ভাবে নিজেদের দুরবস্থা দেখে। বসন্ত এইসব মানুষদের পাশে দাঁড়ায়। বসন্তের সহায়তায় শ্রীপদ ইনজেকশন দেওয়া শেখে। রোগীকে বাঁচানোর প্রক্রিয়াতে মনসাকে ঘিরে গ্রামের মানুষের সংস্কার, বিশ্বাস ও বসন্তর বিজ্ঞানের মেলবন্ধন ঘটে। বেহুলা যেমন চাঁদ সওদাগর ও মনসার মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করেছিল শ্রীপদও তেমনি সংস্কার ও বিজ্ঞানের মেলবন্ধনের আধার হয়ে ওঠে।

মনসা গানের মধ্যে পাওয়া যায় মনসার আখ্যানের আঞ্চলিক রূপ। এই আখ্যান অনুযায়ী লখিন্দর বাড়ি ফিরে আসার পরে বেহুলা-লখিন্দর মর্ত্যে সুখের সংসার করতে থাকে। কিন্তু শেষপর্যন্ত লখিন্দর স্বর্গে ফিরে গেলেও বেহুলা মর্ত্যে থেকে যায়। কারণ দেবসভায় সে যে নৃত্য দেখিয়েছিল সেই পাপে এই কলিযুগে বেহুলাকে নদীরূপে বয়ে যেতে হয়। আর সর্পদংশনের মৃতদেহ বেহুলার জলে ভেসে যাবে, এই ছিল বেহুলার ভবিতব্য। মৃতদেহ বয়ে বেহুলার মুক্তি সম্ভব। কিন্তু সেই দিন কবে আসবে তা কেউ জানে না। এই অঞ্চলের মানুষ মনসামঙ্গলের কাহিনিকে নিজেদের জীবনযাত্রার সঙ্গে মিশিয়ে নিজের মতো করে গড়ে নিয়েছে। এইভাবে লেখিকা বেহুলার কাহিনির পুনঃনির্মাণ করেছেন।

মনসামঙ্গলের বেহুলা যেমন নিজের জীবন উৎসর্গ করে স্বামী, ভাসুর, শ্বশুরকুলকে রক্ষা করে তেমনি এই বেহুলা নদী নিজে মজে গিয়েও মৃতদেহ বয়ে নিয়ে গিয়ে মানুষকে দায়মুক্ত করে। গ্রামবাসীরা মৃতদেহ পোড়ানোর ব্যয়ভার থেকে রক্ষা পেয়ে যায়। মহাশ্বেতা দেবী তার নিজস্ব গুণে গল্পের সঙ্গে তথ্যের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে বলেছেন, ওষুধ কোম্পানি সাপের কামড়ের প্রতিষেধক তৈরি করতে চায় না। কারণ

তাতে ব্যবসাদার বা রাষ্ট্রের কোনো আর্থিক লাভ হয় না। এই গল্পে রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতি বিদ্রুপ বর্ষিত হয়েছে।

লেখিকা বোঝাতে চেয়েছেন মানুষ শুধু পরিসংখ্যান নয়। তাদের ভয় দূর করা এবং সহায়তা প্রয়োজন। সেই কারণেই লেখিকার লেখনীতে বসন্তর হাত ধরে গ্রামবাসী সাপের রাজ্য হেদো নস্করের ইটের পাঁজায় আগুন লাগায়। হেদো নস্কর ক্ষমতার অধিকারী হয়েও ভয়ে কাঁপে। বেহুলার মতো জনগণও প্রতিকূলতার সামনে মাথা নত করেনি। দীর্ঘদিনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানুষ প্রতিবাদ করে। গ্রামবাসী বেহুলাকে তার অভিশাপ থেকে মুক্তি দেয়। তাকে আর বইতে হয় না সাপে কামড়ানো মৃতদেহ। সমালোচক প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য লিখেছেন, 'লেখিকা শ্রীপদর মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে কাহিনির গতিপথকে রুদ্ধ করেন না। বরং প্রতিরোধের আগুন জ্বালিয়ে প্রাচীন গ্রামকে বর্তমান কালের সমস্যাদীর্ণ অধ্যায়ের মুখোমুখি দাঁড় করান। শ্রীপদর মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে নাটকীয়ভাবে কাহিনিকে প্রতিবাদের কেন্দ্রে স্থাপন করেন।'[৪]

এই গল্পে মনসাদেবী প্রসঙ্গে দু-টি দিক উন্মোচিত হয়। একদিকে মানুষ বেঁচে উঠলে মনসা পুজো করা হয়। মনসার গান হয়। মনসা মা রূপে মানুষের হৃদয়ে অবস্থান করে। এমনকি ইনজেকশন দেওয়ার সময় শ্রীপদ মনসার স্তুতি করে। ফলে মনসা হিংস্র নয়, কল্যাণময়ী রূপে মানুষের কাছে অবস্থান করে। আবার গল্পে দেখা যায় সাপের আড়তকে গ্রামবাসী মনসাপুরী বলে। এখানে মনসাদেবী অশুভ শক্তির প্রতীক। আবার একইসঙ্গে মনসাদেবীর হিংস্রতা, ভয়াবহতা রাষ্ট্রশক্তিকে প্রকাশ করে। যে হিংস্রতার অন্যায়ের প্রতিবাদ গ্রামবাসীরা করেছে। মনসা আখ্যানের সঙ্গে লোকজ বিশ্বাস, সংস্কার, বিজ্ঞান ও প্রতিবাদের ভাষার সংমিশ্রণে লেখিকা এই গল্পের নবরূপায়ণ করেছেন। বেহুলা মানুষের প্রতিবাদের ভাষা হয়ে উঠেছে।

মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনিকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যবহার করে সেই কাহিনির নবরূপায়ণ ঘটিয়েছেন সাধন চট্টোপাধ্যায় 'সতত বেহুলা' গল্পে। মধ্যযুগের কাহিনিকে বর্তমান সময়-পরিস্থিতিতে ব্যবহার করে তিনি মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের আত্মসংকট ও মনের নানা স্তরকে তাঁর এই গল্পের মধ্যে দেখিয়েছেন। এই গল্পের প্রধান চরিত্র শান্তিনাথ জীবনে শান্তি খুঁজে চলে। সেই শান্তির অপর নাম 'একান্ত স্বাধীনতা'। পঁচাত্তর বছরের শান্তিনাথ স্ত্রী-পুত্র-পুত্রবধূ-নাতি-নাতনি সবার মধ্যে থেকেও একা। এই গল্পে বৃদ্ধাবস্থায় একাকিত্বের বিশেষ রূপকে দেখানো হয়েছে।

গল্পে সমান্তরালভাবে শান্তিনাথের দু-টি সত্তাকে দেখানো হয়েছে। বাইরের সত্তা সারাদিন খুব ব্যস্ত। সেই সত্তা পরিবারের প্রত্যেকটি মানুষকে নিয়ে চিন্তা করে, নিজস্ব মতামত দান করে, পরামর্শ দেয়, সকলের সাথে মিষ্ট বার্তালাপ করে। নিজের বিরক্তিকে লুকিয়ে রেখে সকলের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে। কিন্তু তার ভিতরের সত্তা সবার মাঝে নিজেকে তথা নিজের পরিচয় খুঁজে নিতে চায়। এই সত্তা স্ত্রীর প্রতি ক্ষুব্ধ

হয়। যে শব্দ বা বাক্য কারো সামনে উচ্চারণ করার যোগ্য নয় সেই শব্দগুচ্ছ স্ত্রীর উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে। বয়ঃজ্যেষ্ঠ হওয়ার কারণে অন্যের কাছে সম্মান, বিশেষ প্রাধান্য প্রত্যাশা করে। এই শান্তিনাথ কোনো একক সত্তা নয়। প্রায় প্রতিটি বয়স্ক সেইসব মানুষের প্রতিনিধি যারা দীর্ঘ বছর ধরে পরিবারের দায়িত্ব নেওয়ার পরে একসময় পরিবারের বোঝা হয়ে যায়। তাদের নিজেদের কোনো ঘর থাকে না। ভাগের ঘর, ভাগের মনোরঞ্জনে তাদের সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করতে হয়। কিন্তু শান্তিনাথেরা তাদের নিজস্বতা, ভালোলাগা, খারাপলাগাগুলিকে ত্যাগ করে জীবনে শান্তি খুঁজে পায় না। তখন সকলের চোখের আড়ালে গভীর রাতে একা টি.ভি দেখার মধ্য দিয়ে তারা নিজস্বতাকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। সমবয়সীদের সঙ্গে সামনাসামনি কথা বলে তারা নিজেদের দিনগুলোকে স্মৃতির আঙিনায় মনে করতে চায়। কিন্তু যখন পরিবার বা বন্ধুদের কারো কাছেই সাহচর্য মেলে না তখন শান্তিনাথ "চরম নিঃসঙ্গ এই বিপন্ন জীবনে গভীর রাত্রে দরজা বন্ধ করে টিভি চালিয়ে নিজের কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করেন। আসলে শান্তিনাথের জীবনে রাত্রির জগতে পৌঁছনোর আকাঙ্ক্ষাই যেন 'অমরা'। সতত বেহুলার মতো মৃত বাসনাগুলিকে বয়ে নিয়ে তিনি চলেছেন সেই অমরার দিকে। একসময় 'একান্ত স্বাধীনতা' নামক দেবতার কাছে উপনীত হয়ে বাসনার নৃত্যলাস্য শুরু করতে চান।"[৫]

বেহুলা যেমন কোনোভাবেই নিজের বিশ্বাস, স্বপ্ন, ইচ্ছের মৃত্যু ঘটতে দেয়নি মৃত স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনার অসম্ভব স্বপ্নকে পূরণ করতে পিছপা হয়নি তেমনি শান্তিনাথ নিজের স্বপ্ন, ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষাকে বয়ে নিয়ে চলে। দিনের বেলা বাসনার লাশ সে নিজের মধ্যে বহন করে। বাইরের পরিবেশ-পরিস্থিতির পরিবর্তন, নিজের দৈহিক অবনতি তাকে দুর্বল করার চেষ্টা করে। কিন্তু রাত্রিতে সে সাহস সঞ্চয় করে। পুত্রের মৃত্যুতে বজ্রাহত অর্ধেন্দু তাকে শুনিয়ে যায় জীবনের দর্শন, 'জী-ব-ন থেমে থা-কে-না'। পথিকের পথ চলাই জীবন। তাই শান্তিনাথ পথ চলে। সেই চলার পথে দেহ বলে সঠিক সময়ে ঘুমিয়ে পড়তে কিন্তু মন চায় নিজস্ব জগৎ। তাই গভীর রাতে টি.ভি চালিয়ে 'পরিবারের আড়ালে, ছোট্ট স্পেসে, বিছানায় একাকী তিনি নিজের কাছে আপন।'[৬] বেহুলার মতো শান্তিনাথও পরিবেশ-পরিস্থিতির কাছে হার স্বীকার করেনা। বরং 'একান্ত স্বাধীনতা'র দেবতার কাছে নিজেকে উৎসর্গ করার জন্য রাত্রির অমরায় পাড়ি দেয়। 'জী-ব-ন থেমে থা-কে-না' অর্থাৎ বাল্য, যৌবন পেরিয়ে বৃদ্ধাবস্থায় এসে সে অনুভব করে সময় শেষ হয়ে আসছে। কিন্তু দেহের সাথে সে নিজের অন্তঃসত্ত্বাকে বৃদ্ধ হতে দেয়নি। শক্তি চট্টোপাধ্যায় মনে করতেন মানুষের মনের একটা সত্তা সামাজিক, অন্যটি সমাজবিরুদ্ধ। এই গল্পে শান্তিনাথের সমাজবিরুদ্ধ সত্তা হল বেহুলা সত্তা। শান্তিনাথের এই সত্তা একাকিত্বের প্রতিকূলতার মাঝে স্বাধীনতার অমরায় পাড়ি দেওয়ার সাহস রাখে। বেহুলা এই গল্পে মানুষের অন্তসত্তার প্রতিরূপ হয়ে ওঠে।

মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনি যেখানে শেষ সেখানেই শুরু জাকির তালুকদারের 'বেহুলার দ্বিতীয় বাসর'। এই গল্পে লেখক পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবস্থানকে দেখালেন। বেহুলা নিজের সবকিছু স্বামীর প্রাণের বিনিময়ে উৎসর্গ করে যখন স্বামী, ভাসুর সকলকে বাঁচিয়ে বাড়িতে নিয়ে এসেছিল; তারপরে বেহুলার দাম্পত্য জীবন কেমন হয়েছিল, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে তার স্বামী তাকে কেমন করে গ্রহণ করেছিল—সেই সমস্ত কিছু বাংলাদেশের কথাসাহিত্যিক জাকির তালুকদার তার কল্পনার বিস্তারের দক্ষতায় 'বেহুলার দ্বিতীয় বাসর' গল্পে ফুটিয়ে তুলেছেন। মধ্যযুগের নারী বেহুলাকে অবলম্বন করে খুব স্পষ্টভাবে এই গল্পে মধ্যযুগ তথা আধুনিক যুগের সমাজে নারীর অবস্থান পরিস্ফুট হয়।

বর্তমান সময়ে নারী বিভিন্নভাবে নিজেদের প্রকাশ করার সুযোগ পাচ্ছে। সরস্বতী রূপে হয়তো অনেক ক্ষেত্রেই নারী মর্যাদা পাচ্ছে। কিন্তু লক্ষ্মীরূপে রূপবতী নারীকে সমাজ ভুলতে পারে না। বাহ্যিক সৌন্দর্য যেন মেয়েদের তাড়া করে চলে। এই কারণেই বেহুলা-লখিন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে আনার পরেও তাকে নিজের দেহের প্রতি 'পরীক্ষকের' দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হচ্ছে। বেহুলা নিজেকে সুন্দরী জেনেও লখিন্দরের চোখ দিয়ে নিজের সৌন্দর্যের ত্রুটি খোঁজার চেষ্টা করছে। অনেক ছোটো বয়স থেকে মেয়েদের মনে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় সে যতই সুন্দরী হোক স্বামীর প্রশংসা বাক্য না পেলে সেই সৌন্দর্য মূল্যহীন। বেহুলা এখানে সেই নারীর পরিচয় বহন করছে।

সকল বাধা বিপত্তি পার করে স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনা, স্বামীর চোখে বেহুলার সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ নয়। সকল আত্মত্যাগের বিনিময়ে সে পুরস্কার পেয়েছে 'অসতী' শব্দ। কারণ বেহুলা ইন্দ্রের সামনে নৃত্য পরিবেশন করেছিল। ইন্দ্র বেহুলাকে চোখ দিয়ে লেহন করেছে। এই কারণে স্বামী নামক পুরুষের চোখে বেহুলা অসতী। কিন্তু বেহুলা নাচতে বাধ্য হয়েছিল স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনার জন্য। এই কারণ লখিন্দরের কাছে তুচ্ছ। বেহুলা দৃপ্ত কণ্ঠে জানিয়েছে—'স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনা ছিল আমার প্রধান কাজ। তারজন্য যা কিছু করতে হয়েছে, তা আমি করেছি। যা করেছি তার জন্য আমি অনুতপ্ত নই।'[৭] এই কণ্ঠস্বর আধুনিক নারীর কণ্ঠস্বর। এই নারী শুধু আত্মত্যাগ করতে জানে না, আত্মত্যাগের সম্মান-মর্যাদা নিজেকে দিতে জানে। কিন্তু সমাজের চোখে দোষ নারীর।

বেহুলা নিজের শিল্পীসত্তাকে সম্মান করে বলেই লখিন্দরের অপমানে-আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়েও লখিন্দরের প্রশ্নের ঝড়ে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বলতে পেরেছে—'নৃত্যের সময় তোমার কথাও আমার মনে ছিল না। জেগে ছিল কেবলমাত্র শিল্পীসত্তা। ... কিন্তু আমি যা কিছু করেছি, তা তো তোমার জন্যই।'[৮] লেখকের কল্পনার বিস্তারে লখিন্দরের মনে যে সন্দেহের বীজ রোপিত হয়েছে তা তো বর্তমান সময়ের নারী-পুরুষের সম্পর্কের ছবি। মানুষ বাইরের প্রতিকূলতার থেকেও সম্পর্কের অন্তর্দ্বন্দ্বে

বেশি ক্ষতবিক্ষত হয়। সন্দেহের বিষ সম্পর্কের অস্তিত্বের সংকট তৈরি করে। বেহুলার মতো তো কত নর-নারী বাইরের পরীক্ষায় সফল হয়েও আত্মত্যাগের পরেও ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ভালোবাসা পায় না। তারা নিজের ভালোবাসা দিয়ে গড়ে তোলা সম্পর্কের মৃত্যু অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে দেখে। পান থেকে চুন খসলেই 'পুরুষের চোখ' নামক দৃষ্টি দেখে, 'সকল নারীই চায় যে তাকে লেহন করুক অসংখ্য পুরুষের মুগ্ধ দৃষ্টি।'[৯] এই যুক্তি সকল নারীর ক্ষেত্রে যদি লখিন্দর নামক পুরুষ ব্যবহার করতে পারে তবে এই একই যুক্তি সকল পুরুষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সতীনাথ ভাদুড়ীর 'বৈয়াকরণ' গল্পে 'ওরা' সর্বনামের মধ্যে সকল পুরুষ এসে যায়। কারণ কোনো এক পর্যায়ে গিয়ে নারীর দেহই পুরুষের কাম্য হয়ে ওঠে। তবে একথাও স্বীকার্য যে সকল মানুষকে একই মাপকাঠিতে মাপা সম্ভব নয় কিন্তু সাদৃশ্য অবশ্যই রয়েছে।

এই গল্পে লখিন্দর বলেছে, 'নিজের প্রাণের জন্য কোন সত্যিকারের পুরুষ কখনো স্ত্রীকে বা প্রিয়তমাকে অন্যের দৃষ্টি লালসার শিকার হতে দেয়না।'[১০] পুরুষ হিসেবে লখিন্দরের কথা সত্য। কিন্তু যে নারীর জীবনের কেন্দ্রবিন্দু স্বামী, সেই স্বামীর প্রাণের চেয়ে মূল্যবান তার জীবনে আর কিছু থাকতে পারে না। লখিন্দরের উক্তিতে বেহুলার মান-সম্ভ্রম বাঁচানোর ইচ্ছা প্রকাশিত হলেও 'অসতী' বলে বেহুলাকে সবথেকে বড়ো অসম্মান লখিন্দরই করেছে। এই একইভাবে অসম্মানিত 'রামায়ণ'-এ সীতাদেবীও হয়েছেন। যে নারীকে উদ্ধারের জন্য এত চেষ্টা, যুদ্ধ, সেই নারীই স্বামীর দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েছেন। মনের পবিত্রতাকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ যোগ্য সম্মান দেয়নি। বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনির মধ্য দিয়ে আসলে লেখক পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবস্থানকে চিহ্নিত করলেন।

মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনি, চরিত্রগুলিকে একেবারে আধুনিক দৃষ্টিকোণে সাতের দশকের সময়-পরিস্থিতিতে সাজিয়ে বাণী বসু সৃষ্টি করলেন 'বেহুলার ভেলা'। এই গল্পে লেখিকা নারীর জীবন সংগ্রামকে চিত্ররূপ দিয়েছেন। বেহুলা, লখিন্দরকে আধুনিক জীবনের মানসিক টানাপোড়েন, দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে সাজিয়ে তিনি আধুনিক মানুষকে মধ্যযুগের কাহিনি, চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম করে দিয়েছেন। সাতের দশক মানে এক বিক্ষুব্ধ সময়। অনেক লড়াই-সংগ্রামের পরে ইংরেজদের শাসন-শোষণ-দাসত্ব থেকে ভারতবাসী মুক্তি পেলেও সাধারণ মানুষ তথা কৃষক শ্রেণির সুখ-স্বপ্নের উড়ান নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনি। স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থা খাজনা নির্দিষ্টকরণ, মধ্যস্বত্ব ও জমিদারিবিলোপ, জমিরসর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেওয়া, উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীন ও দরিদ্র চাষিদের মধ্যে বন্টন, সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা ইত্যাদি ওজনদার কথা বললেও কৃষি কাঠামোর কোনো মৌলিক সংস্কার ঘটাতে পারেনি। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়িতে জমিদারের অত্যাচারে একজন কৃষক মারা গেলে দীর্ঘদিনের অত্যাচারে শোষিত কৃষক সম্প্রদায় একত্রিত হয়ে সশস্ত্র আন্দোলন শুরু করে। ১৯৬৭-এর আগে থেকেই সি.পি.আই.এম কর্মীরা নকশালবাড়িতে সশস্ত্র বিদ্রোহের বীজ বপন করেছিল।

কৃষকদের এই আন্দোলনে ধীরে ধীরে বিশাল ছাত্রসমাজ, মধ্যবিত্তশ্রেণি এসে যোগ দেয়। এই নকশালবাড়ি আন্দোলন ছিল ক্ষমতাবান শ্রেণির বিরুদ্ধে। এই আন্দোলনে ছাত্রদের উদ্দেশ্য, তাদের আত্মত্যাগ খাঁটি হলেও তাদের পরিকল্পনা, সংগ্রাম পরিচালনার দর্শনে কিছু ভুল ত্রুটির কারণে আন্দোলন সফল হয়নি। আন্দোলনকারী ও সরকারপক্ষ দু-জনেই চোখের বদলে চোখ নিতে যাওয়ার কারণে মানুষ দেখেছিল নির্মম হত্যালীলা। এরফলে যে ছাত্র সমাজ তাদের মেধা, অধ্যবসায় দিয়ে সমাজের উন্নতি ঘটাতে পারত তারা রক্তের স্রোতে হারিয়ে যায়। বিকলাঙ্গ হয়ে পরিবারের বোঝা হয়। যাদের দায়িত্ব নেওয়ার কথা ছিল সমাজ-পরিস্থিতি-ভুল পদক্ষেপের বিষবাষ্পে লখিন্দরের মতো তাদেরকে জীবনের ভেলায় শুয়ে থাকতে হয়। তখন তাদের স্ত্রী বা বিশেষ কেউ বেহুলার মতো বয়ে নিয়ে যায় তাদের পরিবার। 'বেহুলার ভেলা' গল্পে সেইরকমই দু-টি চরিত্র হল অমিতেশ ও সংহিতা। নকশালবাড়ি আন্দোলনের পরবর্তী সময়ে আন্দোলনকারী ও তার স্ত্রীর জীবনের ছবি মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনির মধ্য দিয়ে বাণী বসু নতুন রূপে পাঠকের সামনে তুলে ধরলেন।

মনসামঙ্গল কাব্যের আখ্যানে চাঁদ সওদাগর ও মনসার দ্বন্দ্বের মাঝে পড়ে লখিন্দর সহ তার আরো অনেক ভাইদের মরতে হয়েছিল, তেমনি নকশালবাড়ি আন্দোলনে 'বেহুলার ভেলা' গল্পের অধ্যাপক রজতের ভাষায় 'শেষপর্যন্ত গদির লড়াই'-এর মধ্যে থেকে স্বার্থের বলি হয়েছিল ছাত্রসমাজ। ভ্রষ্ট সিস্টেমকে ভাঙার উদ্দেশ্য ছাত্রদের থাকলেও ছাত্রদের পরিচালন শক্তি, প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতার অভাব ছিল। ছাত্ররা লখিন্দরের মতো সর্পদংশনে প্রাণ দিয়ে আত্মহত্যা করতে চেয়েছে। তারা ভেবেছে তারা মানুষের কল্যাণে কিছু করে গেল। তারা সংগ্রামের সামনে দাঁড়িয়ে বলেছে 'চলছে, চলবে, লড়াকু ছাত্র লড়ছে, লড়বে।'[১১] আর 'আস্তিনের পেছনে যারা হাসবার তারাও হাসছে হাসবে। কত বিজ্ঞানী, শিল্পী, সাহিত্যিক, রাষ্ট্রনায়ক, সমাজতাত্ত্বিক, চিকিৎসক কত প্রতিভাধর এমনি করে বোকা বনে অপঘাত লুঠছে'।[১২] মনসামঙ্গল কাব্যের লখিন্দর, বেহুলাও ছিল স্বর্গের সাধারণ নর্তক-নর্তকী। মনসার পূজা প্রচারের জন্য তারাও মর্ত্যে আসতে বাধ্য হয়। উপরতলা এইভাবেই নিচুতলার সত্তাগুলোকে শুধু ব্যবহার করে আসছে। এ যেন সমরেশ বসুর 'আদাব' গল্পের সুতা মজুরের সেই মর্মভেদী কথাকেই মনে করিয়ে দেয়,—'ন্যাতারা হেই সাততলার উপুড় পায়ের উপুড় পা দিয়া হুকুম জারী কইরা বইয়া রইল আর হালার মরতে মরলাম আমরাই।'[১৩]

মনসামঙ্গলের বেহুলার মতো এই গল্পের সংহিতাও কোনো প্রতিকূলতার সামনে হার মানেনি। সময়ের সর্পদংশন তার স্বামীকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিলেও সে প্রাণপণে সেই প্রাণ রক্ষা করার চেষ্টা করেছে। সংহিতা যথেষ্ট মেধাবী, সুন্দরী, সাহসী, আত্মতেজে বলিয়ান একটি চরিত্র। লখিন্দরের মৃত্যু যেমন বেহুলাকে মাতৃত্বের স্বাদ থেকে বঞ্চিত করে ঠিক তেমনি অমিতেশ নিজেকে পুলিশের চোখের আড়াল করলে

পুলিশের অত্যাচারে সংহিতা শিশুকে হারায়। বেহুলা ও সংহিতা দু-জনকেই পরিস্থিতির শিকার হতে হয়। কিন্তু দু-জনেই প্রতিকূলতাকে ভয় পায়নি। স্বামীর জীবন ফিরিয়ে দেওয়ার বিনিময়ে দেবতারা বেহুলাকে দেবসভায় নাচতে বাধ্য করে। একজন নারীর অসহায়তার সুযোগ সেদিন যেমন নেওয়া হয়েছিল তেমনি আধুনিক যুগে দাঁড়িয়ে স্বামীকে সুস্থ করে তোলার জন্য থিয়েটারে শরীরের অঙ্গ ভঙ্গি দেখিয়ে সংহিতা নাচতে বাধ্য হয়েছে। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত একশ্রেণির মানুষ নারীর লাস্যময়ী ভঙ্গিতে শুধু চোখ পরিতৃপ্ত করে রেখেছে। মধ্যযুগের বেহুলাও স্বামীকে বাঁচানোর জন্য পরীক্ষা দিয়েছে। সাতের দশকের সংহিতাও সেই একই কাজ করেছে। জীবনসংগ্রামে পর-পুরুষের লোলুপ চোখের সামনে নিজেদের তুলে ধরতে বাধ্য হয়েছে। দু-জনেই পদে পদে সতীত্বের পরীক্ষা দিয়েছে এবং নিজের বিশ্বাস আত্মত্যাগে জয়ী হয়েছে। বেহুলাও দুর্গম নদীপথে ভেলা ভাসিয়ে নিয়ে চলেছিল, সংহিতাও অজিতেশের জীবনের তথা পরিবারের ভেলা এগিয়ে নিয়ে চলেছে। অথচ মৃত লখিন্দর বা রুগ্ন-বিকলাঙ্গ অমিতেশ কেউই জানেনা কীভাবে কত কষ্টে বেহুলারা ভেলা ভাসিয়ে নিয়ে চলে। তাদের কাছে স্বামী, পরিবারের জন্য আত্মত্যাগ করা তো মেয়েদের দায়িত্ব-কর্তব্য। অমিতেশের ভাষায়,—'একটা মহৎ স্বপ্ন সত্য করতে গেলে ওরকম অনেক মেয়ের আত্মত্যাগের দরকার হয়'[১৪]। এইভাবেই আত্মত্যাগী বেহুলারা জীবন পণ করে অন্যের জীবনের ভেলা ভাসিয়ে নিয়ে চলে। সংহিতা দত্তগুপ্ত মুমূর্ষু স্বামীর দেহ ও আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা, ভালোবাসাতে বেহুলা হয়ে ওঠে। ভালোবাসা ও আত্মত্যাগে এই গল্প উজ্জ্বল হয়ে যায়। বেহুলারা একমাত্র ভালোবাসার জোরেই ভেলা ভাসিয়ে নিয়ে চলে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালো ধোঁয়ায় আচ্ছাদিত হয়ে পঞ্চাশের দশকের শুরু। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালে বিয়াল্লিশের আন্দোলন, তেতাল্লিশের প্রথমদিকে ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ, একইসঙ্গে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে যুদ্ধে নিয়োজিত কর্মীদের জন্য খাদ্য সরবরাহ, মুনাফাখোর মজুতদারদের আবির্ভাব, কালোবাজারি, বিপুল পরিমাণে খাদ্য মজুত ইত্যাদি কারণে খাদ্যসংকটে দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব হয়। এরপরেই ছেচল্লিশের দাঙ্গা, বাস্তুহারাদের আগমন হয়। সমস্ত কিছু মিলিয়ে সাধারণ মানুষের অস্তিত্বের বিপন্নতা, মানবিক সম্পর্কের অবক্ষয়, অর্থের সংকট ইত্যাদি পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে রচিত হয়েছে মতি নন্দীর 'বেহুলার ভেলা' (১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ) গল্পটি। দুর্বল নড়বড়ে বেহুলার ভেলার মতো এই গল্পে মধ্যবিত্ত মানুষের সংসার ভেলার এগিয়ে চলা যেন দুষ্কর। অর্থনৈতিক চাপ তাদের সহজে সামনে এগোতে দেয় না। 'বেহুলার ভেলা' গল্পে আধুনিক সময়ে নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনের রূপ প্রকাশিত হয়েছে।

মানুষ সবসময় দুঃখে-কষ্টে থাকতে পারে না। দুঃখের মধ্যে থেকে খুশি, অন্ধকারের মধ্যে থেকে আলো খুঁজে নেওয়া বা খোঁজার চেষ্টা করা মানুষের প্রবৃত্তি। 'বেহুলার ভেলা' গল্পে সংসারের কর্তা প্রমথ অর্থের টানাটানি অনুভব করা সত্ত্বেও কিছু টাকা সঞ্চয় করে পরিবারের সকলে মিলে একটু মাংস খাওয়ার আনন্দ পেতে

চেয়েছিল। কিন্তু সেই মাংসকে কেন্দ্র করেই তাদের সম্পর্ক বীভৎস রূপ লাভ করে। শেষপর্যন্ত সে স্ত্রীকে বলে 'এখন একটা মড়া আগলে বসে থাকা ছাড়া আর আমাদের কাজ নেই।'[১৫]

যুদ্ধবিধ্বস্ত সমাজের মৃতপ্রায় অবস্থার নানারূপ 'বেহুলার ভেলা' গল্পের স্তরে স্তরে ফুটে উঠেছে। যে সময়ের কথা এই গল্পে বলা হয়েছে সেই সময় অর্থনৈতিক সংকটে মানুষ নিজের খাদ্য কোনোভাবেই অন্যের সাথে ভাগ করে নিতে চাইত না। কিন্তু প্রমথর মেয়ে পুতুল সতেরো-আঠারো বছর বয়সের স্বাভাবিক উত্তেজনায় বাবুদার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মাংস খাওয়ার নেমন্তন্ন করে। বাবু ও পুতুলকে কেন্দ্র করে অমিয়া ও প্রমথর সম্পর্কের বীভৎসতা প্রকাশিত হয়। একটা সময় যাওয়ার পরে প্রমথ অনুভব করে অর্থনৈতিক সংকটে তাদের সম্পর্কের ভিত্তি নড়ে গিয়েছে। বেহুলা যেমন পচা-গলা লখিন্দরের দেহ বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তেমনি এই গল্পে সকল চরিত্রগুলি একে-অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় শুধু নিজেদের বয়ে নিয়ে যায়। এই কারণেই রাধুর মতো তেইশ বছরের যুবক চাকরি খুঁজতে খুঁজতে জীবনের বিপন্নতায় মানসিক দিক থেকে বৃদ্ধ হয়ে যায়। চাঁদু খেতে ভালবাসলেও পেট ভরে খাবার সে পায় না। প্রমথর মতো চাঁদু ভালো ফুটবল খেলে কিন্তু তাদের জীবনে ফুটবল খেলা বিলাসিতা মাত্র। প্রমথর স্মৃতিতে যুদ্ধ পূর্ববর্তী সময়ের চিত্র ফুটে ওঠে। আর বর্তমানে দাঁড়িয়ে দেখে যুদ্ধ সমসাময়িক সময়। এই বৈপরীত্যে মানুষের জীবনের পরিবর্তন স্পষ্ট বোঝা যায়। প্রমথর চিন্তাভাবনা, স্মৃতির মধ্য দিয়ে তার পরিবর্তিত জীবনের রূপ, জরাজীর্ণতার চিত্র ফুটে ওঠে।

খাদ্য সংকটের সামনে পড়ে কীভাবে একান্নবর্তী পরিবারগুলি ভেঙে ভেঙে টুকরো হয়, যার ফলে জন্ম নেয় প্রমথর মতো ছোটো ছোটো পরিবারগুলি; তা এই গল্পে দেখানো হয়েছে। অর্থনৈতিক দুরবস্থা মানুষের সম্পর্ককে এমন আলগা করে দেয় যেখানে গৌরী বাবুর মতো বৃদ্ধরা সংসারের বোঝা হয়ে ওঠে। একটা সময় মানুষ নিজে নিজের জন্য বাঁচে। এই গল্পে লখিন্দরের মতো মৃতপ্রায় বা মৃত মানুষগুলো আদিম প্রবৃত্তিতে শুধু নিজেকে নিয়ে ভাবে। যার ফলে সম্পর্কগুলো হয়ে যায় বেহুলার ভেলার মতো নড়বড়ে দুর্বল।

সম্পর্কের বীভৎসতার রূপ অমিয়া ও প্রমথর সম্পর্কের মধ্যে স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। অমিয়া প্রমথর সম্পর্ক, পরিবারের বন্ধন যেন বেহুলার ভেলার মতো দুর্বল। দীর্ঘদিনের পথ চলায়, অসহায়তায় পচতে পচতে শেষ না হওয়ার অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। প্রমথ মাংস কেনার খুশির মুহূর্তে দেখে মাংস বিক্রির খুশিতে দোকানদারের মুখ চকচক করছে। আবার অমিয়া যখন বাবুর সঙ্গে পুতুলকে সন্ধ্যেবেলা একসঙ্গে বের হতে দেয়নি তখন প্রমথ লক্ষ্য করে 'অমিয়ার চাউনি কসাইয়ের ছুরির মতো শান দিচ্ছে'[১৬] । গল্পের প্রথমদিকে চাঁদু মাংস খেতে পাওয়ার খুশিতে বলেছিল, 'যেই রাঁধো বাবা, জবাফুলের রঙের মতো রঙ হওয়া চাই কিন্তু।'[১৭] খুশির সেই মাংসের ঝোল

সম্পর্কের দ্বন্দ্বের মুখে মনে হয় 'থকথক করছে যেন রক্ত।'[১৮] একই বিষয় দু-টি বিপরীত সময়ে একেবারে ভিন্ন তাৎপর্য বহন করেছে। খুশির বিপরীত দিকে বীভৎসতা প্রকাশ পেয়েছে। রাত্রির শান্ত পরিবেশে আকাশের নিচে মুক্ত স্থানে বসে প্রমথ ও অমিয়া একে অপরকে বোঝার চেষ্টা করে। প্রমথ বোঝে অমিয়া অর্থনীতির চাপেই তার সমস্ত খুশি জলাঞ্জলি দিয়েছে। আমিয়া ওকে ভালভাবে কথা বলে। কিন্তু প্রমথ বলে, 'মনে হচ্ছে আমি আর ভালোবাসি না, বোধহয় তুমিও বাসনা।'[১৯] এমনকি অমিয়ার পিঠে হাত দিলে প্রমথর মনে হয় 'খসখসে চামড়া, মাংসগুলো ঝুলে পড়েছে আলগা হয়ে, মেরুদন্ডের গিঁটগুলো হাতে আটকাচ্ছে।'[২০] এই কঙ্কালসার বীভৎস সময়ের পরিহাস মানুষকে গ্রাস করেছিল। তা সত্ত্বেও বেহুলা যেমন আশা ত্যাগ করেনি ভেবেছিল লখিন্দরের দেহ আবার প্রাণ ফিরে পাবে তেমনই প্রমথ নিজেকে তথা অমিয়া সহ সকল মানুষকে বলেছে 'কেঁদো না, মরে গেলেই মানুষ কাঁদে, আমি কি মরে গেছি।'[২১] আশার সঙ্গে এক ব্যঙ্গ এই বাক্যটি বহন করে। দেহের মরণ চোখে দেখা যায় কিন্তু মনের দিক থেকে যখন মানুষ মরে যায় তখন তার সন্ধান সহজে পাওয়া যায় না। প্রমথ, অমিয়ার মতো মানুষেরা সংসার, সময়, পরিস্থিতির চাপে মরতে মরতে বারবার বাঁচার চেষ্টা করে; বাঁচানোর চেষ্টা করে মনুষ্যত্ববোধ, মানবিকতা, ভালোবাসা। নীরবতাই তখন তাদের জীবনের অর্থ বহন করে। বেহুলার ভেলাকে রূপক হিসেবে ব্যবহার করে অর্থনৈতিক দোলাচলতায় সম্পর্কের টানাপোড়েনকে লেখক যেভাবে দেখালেন তাতে গল্পটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

আলোচ্য গল্পগুলিতে গল্পকারেরা মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনি, চরিত্রকে মধ্যযুগীয় মোড়ক থেকে বের করে নিয়ে এসে নতুন রূপে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেছেন। মহাশ্বেতা দেবীর লেখনীতে মনসা প্রাতিষ্ঠানিক আগ্রাসীশক্তি এবং স্নেহশীলা মা রূপ ধারণ করেছে। বেহুলা গ্রামের অধিবাসীরা একত্রিত হয়ে রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সাহস দেখিয়েছে। সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'সতত বেহুলা' গল্পে বেহুলা মানুষের একাকীত্বের রূপকে একান্ত স্বাধীনতার দেবতার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছে। জাকির তালুকদার 'বেহুলার দ্বিতীয় বাসর' গল্পে বেহুলা-লখিন্দরের মধ্য দিয়ে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবস্থানকে চিহ্নিত করলেন। বাণী বসু 'বেহুলার ভেলা' গল্পে বেহুলাকে সাতের দশকের নকশাল আন্দোলনের পটভূমিতে অধিষ্ঠিত করে নারীর জীবনের লড়াই, আত্মত্যাগকে পাঠকের সামনে তুলে ধরলেন এবং মতি নন্দী তাঁর 'বেহুলার ভেলা'য় যুদ্ধের পরিস্থিতিতে মধ্যবিত্ত মানুষের দারিদ্রতা, দুর্বল সম্পর্ক, জটিল মনস্তত্ত্বকে নতুন রূপ দান করেছেন। এইভাবে প্রত্যেকটি গল্পে বেহুলা-লখিন্দর-মনসা ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্য বহন করেছে। সাহিত্যকেরা এইভাবে যেন মধ্যযুগীয় সাহিত্যকে আধুনিক যুগের সাহিত্যের কাঠামোয় সংরক্ষণ করার চেষ্টা করেছেন, নবরূপায়ণ ঘটিয়েছেন নতুন নতুন দৃষ্টিকোণের মধ্য দিয়ে।

তথ্যসূত্র:

১. প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য, 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আধুনিক রূপান্তর', 'মঙ্গলকাব্য ও আধুনিক বাংলা কবিতা', কলকাতা, বাকপ্রতিমা, জুলাই ২০১২, পৃ ১৮০
২. ফারজানাসিদ্দিকা, ''মহাশ্বেতা 'বেহুলা': সদগতির সন্ধানে'', 'মননরেখা' (বেহুলা সংখ্যা), বর্ষ ৫, সংখ্যা ৯, বেহুলা সংখ্যা, পৌষ ১৪২৮, ডিসেম্বর ২০২১, পৃ ৩৬৭
৩. ফারজানাসিদ্দিকা, ''মহাশ্বেতা 'বেহুলা': সদগতির সন্ধানে'', প্রাগুক্ত, পৃ ৩৬৭-৬৮
৪. প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য, 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আধুনিক রূপান্তর', 'বাংলা ছোটগল্পে : মঙ্গলকাব্য', প্রাগুক্ত, পৃ ২৫৭
৫. তদেব পৃ ২৬২
৬. সাধন চট্টোপাধ্যায়,''বাছাই ৪৯', কলকাতা, একুশ শতক, জানুয়ারি ২০১৫, পৃ ২৫৬
৭. জাকির তালুকদার, ''বেহুলার দ্বিতীয় বাসর'', 'মননরেখা'(বেহুলা সংখ্যা), প্রাগুক্ত, পৃ ৩৪১
৮. তদেব পৃ ৩৪১
৯. তদেব পৃ ৩৪১
১০. তদেব পৃ ৩৪১
১১. বাণী, বসু, 'মুহূর্ত কথা বাণী বসুর নির্বাচিত গল্প সংগ্রহ', কলকাতা, পারুল প্রকাশনী, পৃ ৭
১২. তদেব পৃ ৭
১৩. সমরেশ, বসু, 'আদাব', https://www.ebanglalibrary.com/14981/%E0%A6%86%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%AC/
১৪. বাণী বসু, 'মুহূর্ত কথা বাণী বসুর নির্বাচিত গল্প সংগ্রহ', প্রাগুক্ত পৃ ১০
১৫. মতি নন্দী, 'মতি নন্দীর গল্পসংগ্রহ', কলকাতা, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ১৩৭২ জ্যৈষ্ঠ, পৃ ২৯৯
১৬. তদেব পৃ ২৯৭
১৭. তদেব পৃ ২৭৮
১৮. তদেব পৃ ২৯৭
১৯. তদেব পৃ ২৯৯
২০. তদেব পৃ ২৯৯
২১. তদেব পৃ ২৯৯

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ

১. জাকির তালুকদার। "বেহুলার দ্বিতীয় বাসর"। 'মননরেখা'(বেহুলা সংখ্যা)। বর্ষ ৫। সংখ্যা ৯। পৌষ ১৪২৮। ডিসেম্বর ২০২১।

২. বাণী বসু। 'মুহূর্ত কথা বাণী বসুর নির্বাচিত গল্প সংগ্রহ'। কলকাতা। পারুল প্রকাশনী ।

৩. মতি নন্দী। 'মতি নন্দীর গল্পসংগ্রহ'। কলকাতা। বিশ্ববাণী প্রকাশনী। ১৩৭২ জ্যৈষ্ঠ।

৪. মহাশ্বেতা দেবী। 'মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প সংকলন(লেখিকা কর্তৃক নির্বাচিত)'। নয়াদিল্লি। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ইন্ডিয়া। ১৯৯৩।

৫. সাধন চট্টোপাধ্যায়। 'বাছাই ৪৯'। কলকাতা। একুশ শতক। জানুয়ারি ২০১৫।

সহায়ক গ্রন্থ:

অমর ভট্টাচার্য। 'লাল তমসুক নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রামাণ্য তথ্য-সংকলন'। কলকাতা। গাঙচিল। ২০১৩।

অচিন্ত্য বিশ্বাস (সম্পাদক)। 'বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গল'। কলকাতা। রত্নাবলী। ২০০২।

আশুতোষ ভট্টাচার্য। 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস'। দ্বাদশ সং। কলকাতা। এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড। সেপ্টেম্বর ২০০০।

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার(সম্পাদক)। 'গল্পচর্চা'। তৃতীয় সং। কলকাতা। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ। ২০১৮।

ড. দূর্গাশংকর মুখোপাধ্যায়। 'সাহিত্যতত্ত্ব সাহিত্যপ্রসঙ্গ ও সমালোচনা-বিচিত্রা। কলকাতা। করুণা প্রকাশনী। ১৪১৪, ১লা বৈশাখ।

প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য। 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আধুনিক রূপান্তর'। কলকাতা। বাকপ্রতিমা। জুলাই ২০১২ ।

বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়। সাহিত্য-বিচার : তত্ত্ব ও প্রয়োগ'। দ্বিতীয় সং। কলকাতা। দে'জ পাবলিশিং। ২০০৬।

সনৎকুমার নস্কর। 'প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য : পরিপ্রশ্ন ও পুনর্বিবেচনা'। কলকাতা। দিয়া পাবলিকেশন। ২০১২।

পত্রিকা

মিজানুর রহমান নাসিম(সম্পাদক)। 'মননরেখা' (বেহুলা সংখ্যা)। বর্ষ ৫। সংখ্যা ৯। পৌষ ১৪২৮। ডিসেম্বর ২০২১।

গবেষণাপত্র

মাগফেরা বেগম। 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মনসাকথার-নবনির্মাণ : ভাবনায় ও প্রকরণে'। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। নভেম্বর ২০১৯।

https://ir.nbu.ac.in/bitstream/123456789/4045/19/Full%20Thesis%20of%20Magfera%20Begum.pdf
নারায়ণচন্দ্র বসুনীয়া। 'নকশালবাড়ি আন্দোলন ও বাংলা উপন্যাস'। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। ২০১৩।
http://hdl.handle.net/10603/169237

‘শেষের কবিতা’ উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের প্রেমভাবনা

রিমি বাছাড়
গবেষক ও প্রাবন্ধিক

সারসংক্ষেপ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *শেষের কবিতা* (১৩৩৬ বঙ্গাব্দ) ভালোবাসার এক অসমাপ্ত কাহিনি। এই উপন্যাসের নায়ক অমিত শিলং পাহাড়ের নির্জন-স্নিগ্ধ বনভূমির পথে দেখা পেয়েছে লাবণ্যর। শুরু হয়েছে তারপর প্রেমের উচ্ছ্বাস। কিন্তু শেষপর্যন্ত লাবণ্য অমিতকে ভালোবেসেও বিয়ে করেছে শোভনলালকে। আর লাবণ্যকে ভালোবেসে অমিত ফিরে এসেছে কেতকীর কাছে। উপন্যাসটির প্রেম সরলরৈখিক নয়। বরং তা অনেকটা চতুর্ভূজাকৃতির। অর্থাৎ অমিত আর কেতকীর মধ্যেকার যে প্রেম, সে প্রেম থেকে আলাদা লাবণ্য ও অমিতের প্রেম। আবার ওদিকে শোভনলালের সঙ্গে লাবণ্যের যোগসূত্রের কথাও ভাবা যেতে পারে। প্রেমতত্ত্ব এখানে দুটি ভিন্ন ধারায় পরিবেশিত। মূল প্রেমের একাংশ অমিত আর বাকি অর্ধাংশ হল লাবণ্য আর কেতকীর হৃদয়বোধের যোগফল। রবীন্দ্রনাথের প্রেম সম্পর্কিত ধারণার অভিনব ও পূর্ণায়ত প্রকাশ *শেষের কবিতা* । স্বল্প পরিসরের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের এই প্রেমভাবনা সম্পর্কে আলোকপাত করা হল বর্তমান প্রবন্ধে।

সূচক শব্দ — লাবণ্য, অমিত, কেতকী, শোভনলাল, মিলন, বিরহ, বিচ্ছেদ, বেদনা, মুক্তি, প্রেম মনস্তত্ত্ব, প্রেমের দার্শনিক ব্যঞ্জনা, গতিবাদ, চিরন্তন প্রেম, *যোগাযোগ*, *শেষের কবিতা*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মূল আলোচনা

রবীন্দ্রনাথ *শেষের কবিতা* উপন্যাসে প্রেম সম্পর্কে এক অভিনব তত্ত্বকথা তুলে ধরেছেন। যেখানে নায়ক-নায়িকার মিলনের পূর্বেই ঘটে যায় বিচ্ছেদ। তবে সে বিচ্ছেদে বেদনার মালিন্য নেই। আছে মুক্তির উদারতা। সুকুমার সেন বলেছেন- ‘বৈষ্ণব-সাধনার “পরকীয়া-তত্ত্ব” রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় উপন্যাস শিল্পে যেভাবে রূপপ্রাপ্ত *শেষের কবিতা* -য় তাহারই ব্যক্ত পরিচয়’। [১] এই উপন্যাসে প্রেমের চিরন্তন তথা সম্পূর্ণ এক রূপের উপস্থাপন করেছেন লেখক।

যৌবনের প্রারম্ভে কবি য়েট্স্, মড গনের এক দুরন্ত প্রেমে পড়েছিলেন। কবি প্রেমিকা প্রতিবারই তাঁকে নিয়ে নীড় বাঁধার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। এবং শেষে কবির সঙ্গে প্রেমের ভরা জোয়ারে কবি প্রেমিকা বিয়ে করলেন অন্যত্র, হলেন মাদাম ম্যাকব্রাইড। এবং কবিকে জানালেন- “Marriage would be such a dull affair. Poets should never marry.” [২]

শেষের কবিতা র নায়িকা লাবণ্যর সঙ্গে য়েট্স্ প্রেমিকার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। প্রত্যহের ম্লান স্পর্শে প্রেমের অপমৃত্যু ঘটার আশঙ্কায় অমিতের কাছ থেকে লাবণ্য

বিদায় নিয়েছে এবং বিবাহ করেছে শোভনলালকে। একই আশঙ্কা করেই বহু শতাব্দী আগে মনু চতুর্থ অধ্যায়ে বিধান দিয়ে গিয়েছিলেন যে-
'... হাঁচিতেছে, হাই তুলিতেছে বা যথাসুখে অসংযতভাবে বসিয়া আছে—এমন সময়েও ভার্য্যাকে দেখিবে না। নেত্রদ্বয়ে কজ্জল প্রদান করিতেছে, অনাবৃত হইয়া তৈলমক্ষণ করিতেছে ... এমন সময়েও ভার্য্যাকে অবলোকন করিবে না'।

রবীন্দ্রনাথ *মানসী*-তে বলেছিলেন, "মিলনে প্রেম ম্লান হয়"। হয়ত তিনি প্রেমকে ম্লান করতে চাননি বলেই অমিত ও লাবণ্যর প্রেমকে বিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে অম্লান করে রেখেছেন। *শেষের কবিতা* উপন্যাসের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর যৌবনকালের ব্যক্তিমানসের চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা, দর্শন এবং তাঁর রোমান্টিক সৌন্দর্যচেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। সমস্ত উপন্যাস জুড়েই নানা আদলে জীবন্ত রবীন্দ্রনাথই যেন আমাদের কাছে ধরা দেন।

"দোহাই তোদের একটু চুপ কর। ভালোবাসিবারে দে আমারে অবসর।"

এক বিরামহীন ভালোবাসার গান এ উপন্যাস। *শেষের কবিতা* উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ দেখালেন সেই বিরামহীন সুরটাকেই কাব্যিক সুরে বেঁধে। এই সুরের একদিকে থাকে সীমাহীন বিস্তৃত প্রেম, নিজেকেই যাতে হারিয়ে ফেলা যায়। এ প্রেমের তল পাওয়া যায় না। আকণ্ঠ নিমজ্জনে শুধু সাঁতরে বেড়ানো যায়। উপন্যাসটিতে প্রেম এক দার্শনিক ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। অমিত-লাবণ্যের প্রেম ইন্দ্রিয়াসক্ত নয়। এই উপন্যাসের দার্শনিকতায় সক্রিয় হয়েছে *বলাকা*-র গতিবাদ ও পরিবর্তনশীলতার দর্শন। প্রেম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিক আদর্শ লক্ষ্য করা যায় এই উপন্যাসে। *শেষের কবিতা* প্রকাশিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে *মহুয়া* কাব্যগ্রন্থ। ভাবানুষঙ্গের কারণে এই উপন্যাসের দশটি কবিতা *মহুয়া* কাব্যগ্রন্থে গৃহীত হয়েছে। প্রেমের এক পরিণত পর্যায়ে পৌঁছে লাবণ্য, অমিত এবং যোগমায়ার কাছে তার প্রেম ভাবনার সংশয় প্রকাশ করেছে। অমিতকে সে বলেছে-
"মিতা তোমার রুচি, তোমার বুদ্ধি আমার অনেক উপরে। তোমার সঙ্গে একত্র পথ চলতে গিয়ে একদিন তোমার থেকে বহুদূর পিছিয়ে পড়ব, তখন আর তুমি আমাকে ফিরে ডাকবে না"। [৩]

লাবণ্য যোগমায়াকে বলেছে-

> "কিন্তু উনি তো আমাকে চান না। যে আমি সাধারণ মানুষ, ঘরের মেয়ে, তাকে উনি দেখতে পেয়েছেন বলে মনেই করি নে"। [৪]

বোঝা যায়, দূরদর্শী লাবণ্য অমিতের প্রেমকে যেমন উপলব্ধি করেছে, তেমনি এই প্রেমের ভবিষ্যৎ পরিণতি সম্পর্কেও একটা ধারণা তৈরি হয়ে গেছে। প্রতিদিনের বাসনায় অমিতকে বাঁধতে চায়নি লাবণ্য। *পূরবী* -র একটি কবিতায় এই ভাবনাই প্রত্যক্ষ করা যায়-

"চাইনা তোমায় ধরতে আমি মোর বাসনায় ঢেকে, আকাশ থেকেই গান গেয়ে যাও — নয় খাঁচাটার থেকে।" [৫]

আসলে লাবণ্য তাঁর প্রেমের দ্বন্দ্বে উপলব্ধি করতে পেরেছিল, অমিত যে লাবণ্যকে ভালোবাসে সে লাবণ্য তার মানসসৃষ্টি। বাস্তবের লাবণ্যর সঙ্গে তার কোনো মিল নেই। বৈষ্ণব শাস্ত্রের ভাষায় বলা যেতে পারে, লাবণ্য হল অমিতের অনুরাগের আলম্বন ও উদ্দীপন একাধারে।[৬] লাবণ্যর ভাষায়-

"...কথা দিয়ে উনি কেবলই আমাকে গড়ে তুলেছেন। ওঁর মন যদি ক্লান্ত হয়, কথা যদি ফুরোয়, তবে সেই নিঃশব্দের ভিতরে ধরা পড়বে এই নিতান্ত সাধারণ মেয়ে, যে মেয়ে ওঁর নিজের সৃষ্টি নয়।"[৭]

তখনই ঘটবে প্রেমের অপমৃত্যু। হয়ত তখনই অমিতের কণ্ঠে শোনা যাবে-

"কেন তুমি মূর্তি হয়ে এলে, রহিলে না ধ্যানধারণার।" [৮]

সুতরাং অমিত ভালোবাসার যে ধন সযত্নে আঁকড়ে ধরেছে লাবণ্য তাকে ভুলুণ্ঠিত করতে চায়নি। সে জানে বিবাহ বন্ধনে যাকে পাওয়া বলে,

"...সে আর কিছু নয়, হাতকড়া হাতকে যেয়কম পায় সেই আর-কি।" [৯]

লাবণ্য যা চায়, তা একদিন স্পষ্ট করেই বলেছিল- "মিতা, ত্বমসি মম জীবনং, ত্বমসি মম ভূষণং, ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্।" [১০]

অমিত যেখানে কল্পনার স্বপ্ন দিয়ে ভরিয়ে রাখত, লাবণ্য সেখানে চাইত বাস্তব। রমণীর অন্তরের ক্ষুধা প্রধানত বাস্তব বিলাসী। H.G. Wells বলেছেন- "A woman must see and touch, women are more immediate. What they want is a tangible reality. For them images are necessity." [১১] অমিতের জীবনদীপ চাইত জগতে শুধু উৎসব সভা সাজাতে। লাবণ্যের জীবনদীপ জীবনের কাজের জন্যই।

ভালোবাসার ট্র্যাজেডি সেখানেই ঘটে, যেখানে পরস্পরকে স্বতন্ত্র জেনে মানুষ সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। নিজের ইচ্ছা অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়ার জুলুম করে। নিজের মনের মত করে বদলিয়ে অন্যকে সৃষ্টি করে। বিয়ের ফাঁদে জড়িয়ে পড়ে স্ত্রী-পুরুষ বড় বেশি কাছাকাছি এসে পড়ে। মাঝে ফাঁক থাকে না। তখন একেবারে গোটা মানুষকে নিয়ে কারবার করতে হয় নিতান্ত নিকটে থেকে। কোনো একটা অংশ ঢাকা রাখবার জো থাকে না। মেয়েরা তাদের ভালো লাগার জিনিসকে আপন অন্দর মহলে একলা নিজেরই করে রাখে। ভিড়ের লোকের কোনো খবরই সে রাখে না। সে যত দাম দিতে পারে, তার সব দিয়ে ফেলে। অন্য পাঁচজনের সঙ্গে মিলিয়ে বাজার যাচাই করতে তার মন নেই।

অমিতের দৃষ্টি কেবল নিজের দিকেই। সে যা চাইছিল তা পায়নি, তাই কৃচ্ছ্রসাধন করেছে। পুরুষ বড় স্বার্থপর, বিশেষত ভালোবাসার রাজ্যে। লাবণ্যর দিক

থেকে কিছু না পাওয়ার অভিযোগ আছে কিনা অমিত একবারও ভাবেনি। লেখক এখানে পুরুষ চরিত্রের এক অতি বড় সত্যের পরিচয় দিয়েছেন। কৃচ্ছ্রসাধনের মাধ্যমে অমিত নিজের অহংকে ত্যাগ স্বীকারের দ্বারা আরো মহিমান্বিত করে, যাতে লাবণ্যর চিত্ত আকৃষ্ট না হয়ে থাকতে পারে না। H.G. Wells স্পষ্টতই বলেছেন- "Man is and will remain incurably egotist ... Even when he devotes himself wholly to the service of the species, it is that he seeks to realise his individual difference to the full in order to add it the undying experience of his kind." [১২]

নারীর চিত্ত এত egotist নয়, তাই সহজেই সে আপনাকে অপরের মধ্যে বিলিয়ে দিতে পারে। অন্যদিকে শোভনলাল প্রেমের উপহার নিয়ে লাবণ্যর দ্বারে উপস্থিত হতে পারেনি। যদিও অমিতের প্রেমের ছোঁয়ায় লাবণ্য শোভনলালের প্রেমকে উপলব্ধি করেছিল। আবার কেটি অমিতের ভালোবাসায় কেতকী থেকে কেয়া হয়ে উঠতে পেরেছিল। সুতরাং একদিকে অমিত-লাবণ্যর প্রেম যখন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চলেছে তখনই রবীনদ্রনাথ তাঁর প্রেম সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটালেন, একদিকে লাবণ্য-শোভনলালের প্রেমকে স্বীকৃতি দিয়ে। অন্যদিকে অমিত-কেতকীর ভালোবাসার পুনর্জন্ম ঘটিয়ে।

একসময় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন- "যাকে তোমরা ভালোবাসা বলো, সেরকম করে আমি কাউকে কোনোদিন ভালোবাসিনি।

কোনো বন্ধনই আমার শিকল হয়ে বাঁধেনি কোনোদিন।" [১৩]

প্রেমের এই পরিণতিই সমালোচিত হল। *শেষের কবিতা* -য় তিনি দেখালেন প্রেমের দুটি রূপ – একটি 'দিঘি', অন্যটি 'ঘড়ায় তোলা জল'। বাংলা সাহিত্যে যা অভিনব। এই উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ পুনরায় রবীন্দ্রযুগ প্রতিষ্ঠা করেছেন। সেই সময়ে তাঁর বিরুদ্ধে করা সমালোচনার জবাব হল *শেষের কবিতা* । কল্লোল গোষ্ঠীর তরুণ কবিদের সমালোচনার প্রতিক্রিয়ায় প্রায় আশি বছর বয়সে আত্মসমালোচনায় কবির স্বকীয় উদ্যোগ গ্রহণ এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে। তার প্রমাণ পাওয়া যায় অমিতের মুখে রবি ঠাকুরের সঙ্গে নিবারণ চক্রবর্তীর তুলনায়। *যোগাযোগ* (১৩৩৬ বঃ) উপন্যাসের পর রবীন্দ্রনাথের এভাবে লাবণ্য-অমিতের রোমান্স নিয়ে ফিরে আসা হতবাক করার মতই। রবীন্দ্রনাথ দেখিয়ে দিলেন তিনি চির আধুনিক। চির প্রাসঙ্গিক। লাবণ্য-অমিতের প্রেম আসলে বন্ধন নয়, মুক্তি। অমিত, লাবণ্যের মধ্যে পেয়েছে সমস্ত ডানা মেলে ওড়ার আকাশ। আর কেতকীর মধ্যে পেয়েছে ছোট্ট বাসা, যেখানে সে ডানা গুটিয়ে বসতে পেরেছে। অমিত, যতিশংকরকে বলেছে-

"কেতকীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ভালোবাসারই; কিন্তু সে যেন ঘড়ায়-তোলা জল, প্রতিদিন তুলব, প্রতিদিন ব্যবহার করব। আর লাবণ্যর সঙ্গে আমার যে ভালবাসা সে রইল দিঘি; সে ঘরে আনবার নয়, আমার মন তাতে সাঁতার দেবে।" [১৪]

শেষের কবিতা উপন্যাসে বিভিন্ন পরিচ্ছেদের মধ্যে দিয়ে স্তর পরম্পরায় লাবণ্য-অমিতের প্রেম পরিণতিতে উপনীত হয়েছে। যেমন- *সংঘাত* (২), *আলাপের আরম্ভ* (৫), *নূতন পরিচয়* (৬) পরিচ্ছেদগুলি 'প্রেমের সঞ্চার' পর্বে থাকতে পারে। 'প্রেমের দ্বন্দ্ব' পর্বে আছে *ঘটকালি* (৭) ও *লাবণ্য তর্ক* (৮) পরিচ্ছেদ দুটি। এরপর 'প্রেমের সাধনা'-য় যুক্ত হয়েছে *দ্বিতীয় সাধনা* (১০) ও *মিলন তত্ত্ব* (১১)। আরও একবার ফিরে এসেছে 'প্রেমের দ্বন্দ্ব'। এখানে যে পরিচ্ছেদগুলি আছে তা হল – *শেষ সন্ধ্যা* (১২), *আশঙ্কা* (১৩), *ব্যাঘাত* (১৫)। শেষে 'প্রেমের পরিণতি'-তে এসে মিলে গেছে *মুক্তি* (১৬) ও *শেষের কবিতা* (১৭) পরিচ্ছেদ দুটি।

'মুহূর্তের মুষ্টিই নিত্যকালের ভাণ্ডার। – এই তত্ত্বের উপর *শেষের কবিতা* - র প্রতিষ্ঠা। ধূলার দুলাল রঙিন নিমেষের চকিত স্ফুরণে যে প্রেম পরাণে আবির গুলাল ছড়াইয়া দেয়, যে প্রেমের হঠাৎ আলোর ঝলকানি লাগিলে চিত্ত ঝলমল করিয়া উঠে, যে প্রেম মুহূর্তের অথচ চিরকালের, সে প্রেম ক্ষীণদীপ্ত এবং অদ্বিতীয়।

"গঙ্গার ওপারে ঐ নতুন চাঁদ, আর এপারে তুমি আর আমি, এমন সমাবেশটি অনন্তকালের মধ্যে কোনোদিনই আর হবে না।" কাব্যে এই যে ক্ষণভঙ্গবাদ ইহা রবীন্দ্রনাথের জীবন ভাবনার একটি বিশেষ রূপ।' [১৫]

শেষের কবিতা - র প্রেম ভাবনা রবীন্দ্রনাথের প্রেম দর্শনের স্বরূপকেই ফুটিয়ে তোলে। *রাজা ও রানী* নাটকে যে আত্মসংহত প্রেম ও চিরন্তন প্রেমের রূপ দেখিয়েছেন, সেটাই ভিন্ন আঙ্গিকে, উন্নত ভাবনায় *শেষের কবিতা* - য় উপস্থাপিত হয়েছে। তিনি প্রেমের শান্ত, স্নিগ্ধ, কল্যাণময়, শাশ্বত রূপকে চিত্রিত করতে চেয়েছেন, যেখানে প্রধান হয়ে উঠেছে ত্যাগের আদর্শ।

তথ্যসূত্র: —

১. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* , চতুর্থ খণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ – ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ, প্রথম আনন্দ সংস্করণ – জানুয়ারি ১৯৯৬, পৃষ্ঠা – ৩৭৩।

২. Maud Gonne Mac Bride, *A Servant of the Queen* , Page - 328.

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *শেষের কবিতা* , সপ্তম পরিচ্ছেদ -*ঘটকালি* , বিশ্বভারতী, নূতন সংস্করণ আষাঢ় ১৩৭৬ বঃ, পৃষ্ঠা – ৮০।

৪. তদেব, অষ্টম পরিচ্ছেদ –*লাবণ্য তর্ক*, পৃঃ – ৮৯।

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবিতা -*বিপাশা* , কাব্যগ্রন্থ –*পূরবী* , *রবীন্দ্র-রচনাবলী* , সপ্তম খণ্ড, বিশ্বভারতী, আশ্বিন ১৩৯৫ বঃ, পৃঃ – ১৭৪।

৬. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* , চতুর্থ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ – ৩৭৫।

৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *শেষের কবিতা* , ৮ম পরিচ্ছেদ –*লাবণ্য তর্ক*, পূর্বোক্ত, পৃঃ – ৮৯।

৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবিতা –*পুরুষের উক্তি* , কাব্যগ্রন্থ –*মানসী* , *সঞ্চয়িতা* , বিশ্বভারতী, পৌষ ১৩৩৮ বঃ, পৃঃ – ৭৪।

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *শেষের কবিতা* , ৮ম পরিচ্ছেদ –*লাবণ্য তর্ক*, পূর্বোক্ত, পৃঃ – ৮৯।

১০. তদেব, একাদশ পরিচ্ছেদ –*মিলন তত্ত্ব* , পৃঃ – ১১৪।

১১. H.G. Wells, *The World of William Clissold* .

১২. তদেব।

১৩. মৈত্রেয়ী দেবী, *মংপুতে রবীন্দ্রনাথ* , পৃঃ – ১৫১-১৫২।

১৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *শেষের কবিতা* , সপ্তদশ অধ্যায় –*শেষের কবিতা* , পূর্বোক্ত, পৃঃ – ১৭৯।

১৫. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস* , চতুর্থ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃঃ – ৩৭৬।

পণপ্রথা : একটি সমীক্ষা

সমীর মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ময়না কলেজ

প্রাগৈতিহাসিক যুগের ভারতবর্ষে নারীকে একটি অস্থাবর সম্পত্তি হিসাবে গণ্য করা হত বলে বর পক্ষকেই কনের পিতাকে কন্যাপন দিতে হত। বরপণের কথা ভাবাই যেত না। তাছাড়া বিয়ের পর মেয়েদের সমস্ত কায়িক শ্রমের অধিকারী হত তার শ্বশুরবাড়ি। **'পণরক্ষা'** গল্পে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেখিয়েছেন যে **ভাইঝির** বিয়ের পণ জোগাড় করতে বংশী দিনরাত হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করছে। তবে পিতৃতান্ত্রিক ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় পণ কিন্তু কনের পিতা পাত্রপক্ষকে প্রদান করে। পাত্রীপক্ষকে বিবাহের সময় পাত্রপক্ষকে অর্থ, অলঙ্কার, নগদ টাকা, বিভিন্ন ধরনের আসবাবপত্র, বৈদ্যুতিন বিলাস সামগ্রী, জমিজমা আশীর্বাদ স্বরূপ যৌতুক হিসেবে প্রদান করতে দেখা যায়। প্রাচীনকাল থেকেই নারী-পুরুষের মধ্যে অসম সামাজিক মর্যাদার সুযোগ এই পণপ্রথা আমাদের সমাজে ধীরে ধীরে শিকড় গেড়ে বসে পড়েছে।

ঋকবেদে উল্লেখ আছে যে রাজা বিদর্ভ তার ভগ্নি ইন্দুমতির বিবাহ অনুষ্ঠানে প্রচুর ধন পণ হিসাবে দিয়েছিলেন। তাছাড়া ঋগ্বেদে কন্যার শরীরে ক্ষত বা ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলে বেশ কয়েকবার পণ দেওয়ার কথা জানা যায়। অথর্ববেদ থেকে জানা যায় রাজকন্যাদের বিবাহের সময় শত শত গাভি কন্যাপণ হিসাবে শ্বশুরবাড়িতে পাঠানো হত। মহাভারতের যুগে দ্রৌপদী, সুভদ্রা,উত্তরা প্রমুখা খ্যাতনামা নারীরাও বিবাহের পণ হিসাবে হাতি ঘোড়া, মনি মুক্তা, মূল্যবান অলংকার, শ্বশুরবাড়ি নিয়ে গিয়েছিলেন। বৌদ্ধ জাতক থেকে জানা যায় যে সাকেত শ্রেষ্ঠী ধনজয় তার কন্যা বিশাখার বিবাহ উপলক্ষে অনেক মূল্যবান ধন সম্পদ যৌতুক হিসাবে শশুরবাড়ি পাঠিয়েছিলেন। স্মৃতিশাস্ত্রে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে পিতা তার সাধ্যমত শাড়ি, অর্থ, অলংকারে সুসজ্জিত করে কন্যাকে শ্বশুরবাড়ি পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন। বর্তমানে হিন্দু কন্যাকে মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে বরের হাতে দান করার সাথে সাথে কিছু ছোট খাটো - বড় জিনিসও দান করা হয়। প্রাচীন সাহিত্যে ব্রাহ্মণ্য সমাজে সহানুভূতির ছদ্মবেশে পণপ্রথার উল্লেখ থাকলেও সরাসরি পণ প্রদানের উল্লেখ পাওয়া যায় না। আবার বৌধায়ন ধর্মসূত্রে বলা হয়েছে ধর্ষিতা নারীকে ধর্ষণকারী বিবাহে রাজি হলে শাস্ত্র মতে বিনা পণে তার বিবাহ হতে পারে। সুতরাং এ সময়ে সাধারণ মেয়ের বিয়েতে পণ দেওয়াই একটা রীতি ছিল। সুকুমারী ভট্টাচার্য তার 'প্রাচীন ভারতের সমাজ ও সাহিত্যে' ঋকবেদে কন্যা শরীরে ত্রুটি থাকলে বেশ কয়েকবার পণ দেওয়ার কথা আছে। তবে কোনটা পণ আর কোনটা স্বতঃস্ফূর্ত দান তা বলা কঠিন। তবে এটা ঠিক যে পণপ্রথা তখন ছিল তার

বাল্যকালে, প্রাপ্তবয়স্কতা অর্জন করতে তার অনেক সময় লেগেছিল। সময়ের সাথে সাথে পণের জন্য দেওয়া দ্রব্যদিরও পরিবর্তন ঘটেছে।

বাংলার সেন বংশীয় রাজা বল্লাল সেন কৌলিন্য প্রথা প্রবর্তন করেছিলেন। এই প্রথাটি পরবর্তীকালে একসময় বিয়েকে ব্যবসার পর্যায়ে নামিয়ে এনেছিল। একজন কুলীন যে কতগুলি বিয়ে করতেন তার কোন ইয়াত্তা ছিল না। আজ থেকে দুশো বছর আগের কথা। নিস্তারিণী দেবী ছিলেন একজন কুলীন কন্যা। তার প্রঠাকুরদা ১০৮ টি, ঠাকুরদা ৫৪ টি বিবাহ করেছিলেন। তার পিতা দুটি বিবাহ করেন; হয়ত পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব তার উপর পড়েছিল। নিস্তারিণী দেবীর বিবাহ হয়েছিল ঈশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। কুলীনদের মেয়েদের বিবাহ করে অর্থ উপার্জন করে নিজের ভরণপোষণ করাই ছিল তার জীবিকা। প্রচুর অর্থ পণ দিয়ে ঈশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের সাথে নিস্তারিণীর বিবাহ হলেও তার স্বামী তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। যদিও এর আগে ঈশ্বর ৩০-৪০ টি বিবাহ করে ফেলে ছিলেন। সেকালে জামাইরা শ্বশুরবাড়িতে পরিমান ভোজন, দক্ষিণা, নমস্কারি না পেলে সেখানে দিন যাপন করতেন না। তারা সংসার চালানোর জন্য বিবাহ করতেন বলে স্ত্রীর কোন দায় দায়িত্ব তারা নিতেন না। মনে হয় এই কারণেই কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে গ্রামে গ্রামে কান্নার রোল পড়ে যেত।

মধ্যযুগের ভারতে রাজপুতনায় রাজকীয় অভিজাত পরিবারের মধ্যে পণপ্রথা তীব্র রূপ ধারণ করেছিল। দক্ষ, যোগ্য ও যোদ্ধা রাজপুত বীর যুবকদের নিয়ে কন্যার পিতাদের মধ্যে রেষারেষি তীব্রাকার ধারণ করেছিল। পণপ্রথা অভিশাপের আকার ধারণ করেছিল। উনবিংশ শতকে বংশগত কুলীন পাত্রের কূল ভঙ্গ করাকে বলা হত কুলীন প্রথা। পাবনা জেলায় দুর্গাদাস চৌধুরীর জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রসন্নময়ী এই কুপ্রথার বলি হয়েছিলেন। করণপ্রথা ছিল পণপ্রথার আরেক রূপ। পাবনা জেলার গুসাইগাছা গ্রামের অতি দরিদ্র কুলীন সন্তান কৃষ্ণকুমার বাগচী প্রচুর অর্থের বিনিময়ে অকুলীন বংশীয় প্রসন্নময়ীকে বিবাহ করেছিলেন যার পরিণাম মোটেই সুখকর ছিল না।

অনেক সময় কুলীন পাত্রের বিরাট পণের বোঝা বহন করতে না পেরে অনেক মেয়েরাই গণিকালয়ে আশ্রয় নিত। জনৈক গণিকা ত্রৈলোক্যর গরীব পিতা অনেক পণ দিয়ে এক বৃদ্ধের সঙ্গে বিবাহ দিয়েও কয়েক বছর পর তাকে পরিত্যাগ করলে ত্রৈলোক্যকে গণিকালয়ে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। ১৮৪৮ সালে ৯ই আগস্ট সে রাজকুমারী নামক আরেক গণিকাকে খুন করেছিল। ফাঁসির সাজা প্রাপ্ত আসামী হিসাবে মৃত্যুকালিন জবানবন্দী থেকে বোঝা যায় তৎকালীন সময়ের পণপ্রথা কৌলিন্যপ্রথা করণপ্রথা কিভাবে তার মত মেয়েদের বেশ্যাবৃত্তির দিকে ঠেলে দিয়েছিল। বিবাহের পর কন্যার পিতারা জামাইকে ঘরে আনার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে অর্থ যোগাড় করতেন। কিন্তু এভাবে কি কন্যাসুখ ক্রয় করা যায়? আসলে সে সময় একশ্রেণীর অকর্মণ্য,

অপদার্থ অলস যুবসম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়েছিল যারা বিবাহকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে জীবন যাপনের উপায় হিসেবে দেখেছিলেন।

ব্রিটিশ শাসনারম্ভে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন, মধ্যবিত্ত শ্রেণী সরকারী চাকুরি লাভের প্রচেষ্টা, বিদেশ যাত্রা এই সব বিষয়গুলো বিবাহের বাজারে তাদের দাম অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছিল। ইংরেজী শিক্ষিত যুবসম্প্রদায় বিয়ের বাজারে একটা দামামা বাজিয়ে দিয়েছিল। যদিও পাশ্চাত্য শিক্ষার এই দমকা হাওয়া অনেক কিছু খুলে দিয়েছিল। নানান প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও কাদম্বরী গাঙ্গুলী, তরুদত্ত, সরলাদেবী, জ্ঞানদানন্দিনী-র মত মেয়েরা এগিয়ে যাচ্ছিলেন, পা ফেলছিলেন সদা সতর্ক ভাবে আর অন্য দিকে বাঙালির আপামর নারী সমাজ কিন্তু পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত ছিল।

১৮৫৬ সালে পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রচেষ্টায় ২৬ শে জুলাই বিধবাবিবাহ আইন সিদ্ধ হয়েছিল, যা উনবিংশ শতকের অন্যতম সমাজসংস্কার বলা যায়। প্রারম্ভিক পর্বে বিদ্যাসাগর নিজ উদ্যোগে বিধবাবিবাহ দিতে গিয়ে পাত্রপক্ষকে বিশাল পণ দিয়েছিলেন। এমনকি বিবাহের আনুষ্ঠানিক ব্যয়ভারও বহন করেছিলেন। মতিলাল শীল, কালীপ্রসন্ন সিংহরা ঘোষণা করেছিলেন কোন হিন্দু ভদ্রলোক যদি বিধবাকে বিবাহ করতে চান তাহলে তাকে আর্থিক ভাবে পুরস্কৃত করা হবে। প্রথম বিধবা বিবাহে (১৮৫৬, ৭ই ডিসেম্বর সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন এবং কালীমতি দেবী) বিদ্যাসাগর একাই প্রায় ১০ হাজার টাকা ব্যয়ভার বহন করেছিলেন। যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের বিধবা বিবাহের উদ্যোগেকে সাধুবাদ জানিয়ে বিদ্যাসাগর তার বিবাহে প্রচুর যৌতুক দিয়েছিলেন। ১৮৫৬ - ১৮৬৭ সালের মধ্যে বিদ্যাসাগর প্রায় ৬০ টি বিধবাবিবাহ দিতে গিয়ে প্রায় ৮২ হাজার টাকা ব্যয় করে প্রচুর দেনার দায়ে জড়িয়ে পড়েছিলেন। বিধবা বিবাহ দিতে এই বিপুল পরিমাণ দেনার দায় মাথায় নেওয়ার সত্যি কি কোন যৌক্তিকতা ছিল? যেখানে অধিকাংশ পাত্রই টাকার লোভে বিবাহ করছেন। গ্রামে নিজ স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও শহরে গিয়ে অর্থের লোভে বিবাহ করছেন। অর্থ আদায় বা নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার পর তারা নতুন বউকে ছেড়ে আবার গ্রামের প্রত্যাবর্তন করছেন। সুতরাং বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ যে খুব একটা সার্থকতা লাভ করেছিল তা হয়ত বলা যায় না তবে একথা ঠিক যে এর ফলে নারীদের অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দশার মধ্যে পড়তে হয়েছিল। বিধবা বিবাহ দিতে গিয়ে তিনি হয়তো পণপ্রথার পৃষ্ঠপোষক হয়ে উঠেছিলেন। একটা সময় বিদ্যাসাগর নিজেও এই পণ দিয়ে বিবাহ দেবার মধ্যে এক ব্যর্থতা খুঁজে পেয়েছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় আলোকপ্রাপ্ত একটি পরিবার ছিল জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির পরিবার। ঠাকুরবাড়ি পণপ্রথা নিয়ে কি ধরনের মানসিকতার পরিচয় দিয়েছিল তা দেখা যাক। পিরারী ব্রাহ্মণ হওয়ার কারণে এই ঠাকুরবাড়ির পরিবারটি হিন্দু ব্রাহ্মণ্য সমাজে কিছুটা একঘরে ছিল বলা যায়। তাছাড়া দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন বলে তৎকালীন হিন্দু সমাজের সঙ্গেও পরিবারটির তেমন

কোনো সংশ্রব ছিল না। ফলে ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের জন্য উচ্চশিক্ষিত সৎ বংশজাত সৎ চরিত্রের পাত্র পাওয়া বড়ই কঠিন ছিল। তাছাড়া এই পরিবারের মেয়েদের বিবাহ করলে অনেক সময় সমাজচ্যুত হওয়ার ভয়ও ছিল। হয়তো সে কারণেই এই পরিবারের জামাইদের ঘর-জামাই করে রাখার একটা রীতি ছিল। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় দেবেন্দনাথের কন্যারা সৌদামিনী, সুকুমারী, শরৎকুমারী, বর্ণকুমারী, কাদম্বিনী, কুমুদিনী-র পতিরা (সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, যদুকমল মুখোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, যোগেশপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, নীলকমল মুখোপাধ্যায়) এরা সবাই কিন্তু ঠাকুরবাড়ির ঘরজামাই ছিলেন। ব্যতিক্রমী ছিলেন একমাত্র স্বর্ণকুমারী দেবীর স্বামী জানকীনাথ ঘোষাল। এই সকল জামাই তাদের পরিবারের খাওয়া-দাওয়া, থাকা, বিলাসব্যসন প্রভৃতির খরচ কিন্তু সারা জীবন ধরে ঠাকুরবাড়ির তহবিল থেকেই মিটেছে। যদিও পরবর্তীকালে ঘরজামাই প্রথা অনেকটা কমে গিয়েছিল। যাই হোক বিষয়টি পণপ্রথার উদাহরণ হিসেবেই দেখা যেতে পারে।

ক্ষিতেন্দ্রনাথের (হেমেন্দ্রনাথের পুত্র) একটি অপ্রকাশিত ডাইরী ‘মহর্ষি পরিবার’ থেকে জানা যায় যে মহর্ষী তার নাতনীদের বিবাহ অনুষ্ঠানের জন্য তিন হাজার টাকা করে যৌতুক দিতেন। মহর্ষির জীবদ্দশায় ঠাকুর পরিবারের বিয়ের সব খরচা কিন্তু পারিবারিক তহবিল থেকে মেটানো হত। হয়ত সে কারণেই রবীন্দ্রনাথ তার জীবনকালই তিন কন্যার বিবাহ সেরে ফেলার ব্যবস্থা করেছিলেন। মাধুরীলতা, রেনুকা, মীরা প্রত্যেকেরই কিন্তু অকাল বিবাহ হয়েছিল। এই অকাল বিবাহ এবং অর্থ দিয়ে জামাই কেনা এই ব্যাপার দুটি কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও কন্যাদের জীবনে খারাপ পরিণতি বহন করে এনেছিল।

কবি মাধুরীলতার জন্য পাত্র হিসেবে শরৎকুমার চক্রবর্তীকে পছন্দ করেছিলেন। পাত্রপক্ষ কিন্তু ২০ হাজার টাকা পণ চেয়েছিল। দরকষাকষির শেষে ১০ হাজার টাকা ঠিক হয়েছিল। পরে পাত্রপক্ষ কিন্তু বর ও বরযাত্রীর খরচ বাবদ আরও এক হাজার টাকা চেয়েছিল বিবাহের পূর্বেই। এই পণ সমস্যা সমাধানে জন্য রবীন্দ্রনাথ ভাবি জামাই শরৎকুমারকে সরাসরি পত্র পাঠিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন – “আমাদের পারিবারিক প্রথা অনুসারে বিবাহের দুই একদিন পূর্বে জামাতাকে ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। সেদিন অবিনাশ যখন প্রিয় বাবুর বাড়িতে প্রস্তাব করলেন যে দীক্ষার দিনেই বিবাহের পূর্বে যৌতুক দিতে হইবে তখন আমি কোন চিন্তা না করিয়া সম্মতি দিয়াছিলাম। সেই রাত্রে পিতৃদেবকে যখন সে কথা জ্ঞাপন করিলাম তখন তিনি অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিলেন – “বরকন্যাকে আশীর্বাদ স্বরুপেই যৌতুক দিতে হয় - কিন্তু বিবাহের পূর্বেই যৌতুক চাহিবার কি কারণ? আমার প্রতি কি বিশ্বাস নাই? তাহার নিকট কোন সদুত্তর দিতে পারলাম না এবং এই প্রস্তাবের মধ্যে আমার পিতার

প্রতি যে একটি অশ্রদ্ধা ও অসম্মান আছে তাহা তৎক্ষণাৎ আমার মনে প্রতিভাত হইল।“

প্রত্যুত্তরে শিক্ষিত বিনয়ীর মতো শরৎকুমার জানিয়েছিলেন যে তিনি পণপ্রথা সমর্থন করেন না কিন্তু মা, ভাইদের বিপক্ষে যাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। যাই হোক শেষ পর্যন্ত একটা আপস মীমাংসা হয়েছিল। ১লা আষাঢ় মাধুরীলতার বিবাহ হয়। পরের মাসে ২২ শে শ্রাবণ সত্যেন্দ্র ভট্টাচার্যের সঙ্গে দ্বিতীয় কন্যা রেনুকার বিবাহ হয়েছিল। রফা হয়েছিল সত্যেন্দ্রের বিলেতে পড়াশোনার যাবতীয় খরচ বহন করবেন কবি। পরে সত্যেন্দ্র কিন্তু ঘরজামাই হিসেবে ঠাকুরবাড়িতেই আশ্রয় নেন এবং ঔষধের দোকান খোলার জন্য কবির কাছে দুহাজার টাকা নেন। কিন্তু দুঃখের কথা রেনুকা কিন্তু দাম্পত্য সুখ পায়নি এবং অকালে হারিয়ে গিয়েছিল। কনিষ্ঠা কন্যা মীরার সম্বন্ধ ঠিক হয়েছিল নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর সঙ্গে। আমেরিকায় নগেন্দ্রনাথের উচ্চ শিক্ষার লাভে যাবতীয় খরচ বহন করার দায়িত্ব কবিকেই নিতে হয়েছিল। বিবাহের পণ হিসাবে বিলেতে PH.D. করতে যে খরচ হয়েছিল তাও কবি বহন করেছিলেন। পরে মীরার সঙ্গে নগেন্দ্রনাথের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছিল। এত যৌতুক এত পণ এত কিছুর সত্বেও কবি কিন্তু তার কন্যাদের জন্য সুখ ক্রয় করতে পারেননি।

তৎকালীন সমাজ চিত্রে ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-নিরক্ষর কোন পরিবারই মনে হয় এই অভিশপ্ত পণপ্রথার ভয়ংকর পরিণতি থেকে দূরে সরে থাকতে পারেনি। সমগ্র সমাজকেই তা প্রায় গিলে ফেলেছিল। যদিও স্নেহলতা ও অমিয়বালা ছিলেন বিরল দৃষ্টান্ত। স্নেহলতা মুখোপাধ্যায় পণপ্রথার ভয়াবহ রূপ ও পরিণতির হাত থেকে পিতা ও পরিবারকে বাঁচাতে অগ্নিতে আত্মহত্যা করেছিলেন (১৪ বছর বয়সে), ১৯১৪ সালের ৩০ শে জানুয়ারি। স্নেহলতার মৃত্যু কিন্তু পণপ্রথার বিরুদ্ধে এক ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ১৫ বছর বয়সে অমিয়বালার সঙ্গে এক জমিদার সন্তানের বিয়ে হয়। পরবর্তী দেড় বছরের মধ্যে তাকে নানান অভিযোগে অভিযুক্ত করে তার স্বামী তাকে ত্যাগ করেন। আসলে কারণটি ছিল বাড়তি ৩০০০ টাকা পণের দাবি। অমিয়বালা জানতেন তার পিতা সর্বস্ব দিয়ে তার বিবাহের ব্যবস্থা করেছিলেন তাই এই অতিরিক্ত তিন হাজার টাকা পণের দাবির বিরোধিতা করে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিলেন অমিয়বালা নিজেই। ইতিহাসের আদিপর্ব থেকে নারীরা যে পণপ্রথার কারণে যে অপমান সহ্য করে এসেছে অমিয়বালার প্রতিবাদ যেন তাদেরই কণ্ঠস্বর। অমিয়বালা যেন রবীন্দ্রনাথের ‘দেনাপাওনা’-র নিরুপমার মতই বলেছিল – “আমি কি কেবলই একটা টাকার থলি, যতক্ষণ টাকা আছে ততক্ষণ আমার দাম।“

যুগ বদলাচ্ছে সময় এগিয়ে যাচ্ছে। তাই পণপ্রথাও পথ ও রুপ বদলাচ্ছে। তবে আজও কিন্তু সমাজে এই পণপ্রথা প্রচলিত আছে ভয়ঙ্কর ভাবে। মণিকুন্তলা সেন খ্যাতনামা বামপন্থী একজন নেত্রী তার ‘The Struggle Against Dowry’ গ্রন্থে এই

পণপ্রথার ব্যপ্তি ও কুফল সম্পর্কে বিশদে আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন – '......কত কৃষক পরিবার, নিম্ন, মধ্য ও উচ্চবিত্ত পরিবার- গুলোর মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে কি পরিমান জমি অর্থ সম্পদ হারাতে হত, কত পরিবার এই ভাবেই সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছিল। শুধু তারা সাহস সঞ্চয় করে বলতে পারত না, 'না আমরা পণ দেব না। এর কারণ হলো যেন তেন প্রকারেণ মেয়ের বিয়ে দিতেই হবে। মেয়েদের অবস্থা বড়ই করুন তা তারা যতই শিক্ষিতা ও গৃহকর্মে নিপুনা হোক না কেন। সমাজের চোখে তাদের কোন দাম নেই। তাদের মূল্য নির্ধারণের একমাত্র মাপকাঠি হলো বিয়ের সময় কত, কি পরিমান গয়নাগাটি, টাকাকড়ি, জমিজমা তারা পণ হিসাবে পাবে।'

মেয়েদের নিরাপত্তা প্রদান করতে বিয়ের সময় আশীর্বাদস্বরূপ প্রয়াস হিসাবে পণপ্রথার প্রবর্তন হলেও আজ তা নারীদের মৃত্যুবান হিসাবে মরণাস্ত্রের রূপ পরিগ্রহণ করেছে। পণপ্রথার বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলে, বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে (রেডিও, টিভি) গ্রামে গঞ্জে শহরে নগরে পথসভা, নাগরিক সভা, পথনাটিকা আয়োজন করে, পণপ্রথা বিলোপ আইন কঠোর ভাবে বলবত করে, নারী-পুরুষের অসম সামাজিক মর্যাদার বিলোপ ঘটিয়ে সমাজ থেকে একে নির্মূল করার চেষ্টা করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে উত্তর বাঁকুড়ার 'পণপ্রথা বিলোপ সমিতি'-র কথা উদাহরণ হিসাবে বলা যায়। সমিতির সদস্যরা বাঁকুড়ার বিভিন্ন গ্রামে গঞ্জে পণপ্রথার নির্যাতন, জুলুম ও করুণ পরিণতির কথা প্রচার আন্দোলনের ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিতে পণপ্রথার তীব্রতা দারুণভাবে হ্রাস পেয়েছে। (আনন্দবাজার পত্রিকা ৩০ আগস্ট ২০০৩)। তাই বলা যায় সংগঠিত শিক্ষিত সচেতন সাধারণ নাগরিকদের সমবেত অংশগ্রহণ পণ বা যৌতুকপ্রথার ন্যায় সামাজিক সমস্যাকে সমাজ থেকে দূরীভূত করতে পারে।

তথ্য সূত্র:

১. রবিজীবনী - প্রভাতকুমার পাল
২. পণপ্রথাঃ শাস্ত্রে ও সমাজে - সুব্রতা সেন
৩. গল্পগুচ্ছ - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৪. অশ্রুত কণ্ঠস্বর - সুমন্ত বন্দোপাধ্যায়
৫. অন্তঃপুরের আত্মকথা - চিত্রা দেব
৬. প্রাচীন ভারতের সমাজ ও সাহিত্য – সুকুমারী ভট্টাচার্য
৭. অন্দরে অন্তরে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি ভদ্রমহিলা – সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী
৮. 'The Struggle Against Dowry' - মনিকুন্তলা সেন

৯. ভারতের সামাজিক সমস্যা – ডঃ অরবিন্দ চৌধুরী
ডঃ কৃষ্ণদাস চট্টোপাধ্যায়
ডঃ শান্তনু ঘোষ

১০. ভারতীয় সমাজ, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ১৯৯৬ – এস. সি. দুবে

১১. ভারতের সমাজ প্রসঙ্গে, চ্যাটার্জী পাবলিশার্স, ২০০০

১২. আনন্দবাজার পত্রিকা - ৩০ আগস্ট ২০০৩

১৩. ‘স্নেহলতার মৃত্যু’ - একটি আন্দোলনের জন্ম, চতুরঙ্গ, জানুয়ারি, ১৯৮৮ - সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

সুন্দরবনের ধারণার বিবর্তন

(ঔপনিবেশিক যুগ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত)

উজ্জ্বল বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ

বিষয় সংক্ষেপ: জল-জঙ্গল ঘেরা ও অজস্র বন্যপ্রানী সমৃদ্ধ সুন্দরবনের যে চিত্র আমরা দেখি, সে চিত্র সচেতন ভাবে সরকার কর্তৃক নির্মিত। ঔপনিবেশিক যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত সরকারী প্রয়োজনে সুন্দরবনকে বিভিন্ন ভাবে দেখা হয়েছে। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমলে সুন্দরবন ছিল সরকারের wasteland বা অনাবাদী জমি। অর্থাৎ জঙ্গল কেটে কৃষির প্রসার ঘটানোই ছিল সরকারের লক্ষ্য। দ্বিতীয় পর্যায়ে জঙ্গল কাটা নয়, বরং তার সংরক্ষণের উপর বেশী জোর দেওয়া হল। উদ্দেশ্য বনজ সম্পদের যোগানে যেন কোন ছেদ না পড়ে। স্বাধীন ভারতেও বন ও বন্যপ্রানী সংরক্ষণ বিশেষ গুরুত্ব পেল। সুন্দরবন World Heritage Site এর মর্যাদা পেল। কিন্তু সুন্দরবনের অধিবাসীরা ধরার মধ্যে আসল না। ফলে আজও তারা প্রান্তিক।

সূচক শব্দ অনাবাদী জমি, Civilizing Sundarban, Sustainable Development, সংরক্ষিত বনাঞ্চল, বিশ্ব উষ্ণায়ণ, জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট, মরিচঝাঁপি

১৯৮৭ সালে UNESCO কর্তৃক সুন্দরবন World Heritage Site হিসাবে ঘোষিত হয়। এই বিশেষ তকমার কারণে সুন্দরবন বিশ্ববাসীর কাছে পরিচিত হয়ে ওঠে। পরিচিতির কারণ সুন্দরবনের জীব বৈচিত্র ও ম্যানগ্রোভ অরণ্য। বহু দেশীয় ও আন্তজার্তিক NGO এখানে কাজের জন্য চলে আসে। সুন্দরবন সংরক্ষণের জন্য ভারতের উপর আন্তজার্তিক চাপ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং এ ব্যাপারে আমাদের দেশও কতটা ওয়াকিবহাল তা প্রমাণের দায়ভার সরকারের উপর এসে পড়ে। আমরা সকলেই জানি, সুন্দরবনের প্রথম ও প্রধান আকর্ষন এখানকার বাঘ। সুন্দরবনই হল পৃথিবীর একমাত্র ম্যানগ্রোভ অরণ্য যেখানে বাঘ পাওয়া যায়। পাশাপাশি বহু সংখ্যক হরিণ, বিষধর সাপ, কুমির, ডলফিন, কচ্ছপ প্রভৃতি অজস্র জলজ ও স্থলজ প্রাণীর বাসস্থান এই জল-জঙ্গল ঘেরা সুন্দরবন। বর্তমানে বিশ্ব উষ্ণায়ণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অরণ্য ও অরণ্যচারী প্রাণীর সংখ্যা কমতে শুরু করেছে। তাই উদ্ভিদবিদ, প্রাণীবিদ, পরিবেশবিদ, রাষ্ট্রনীতিবিদ প্রমুখ সকলের কাছেই এই ঘটনা যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু যেটা নিয়ে আমরা ভাবি না, তা হল সুন্দরবন পশুপাখি ও ম্যানগ্রোভ ছাড়াও প্রায় ৫০ লক্ষ মানুষের বাসস্থান, যারা অর্থনৈতিক ও জাতিগত উভয় দিক থেকে প্রান্তিক, তারা বহুক্ষেত্রেই অনালোচিত থেকে যান। কারণ সুন্দরবনের মানুষ দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। এখানে এলিট পরিচয় পায় বাঘ। যত আইনকানুন বাদাবন ও তার প্রানী সংরক্ষণের জন্য তৈরী হয়। এই দুরধিগম্য পরিবেশে মানুষকে যথেষ্ট দুঃচিন্তা ও

অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাতে হয়। সুতরাং সুন্দরবন হল পশু-পাখিদের জায়গা, মানুষ সেখানে গৌন । এই চিত্র রাষ্ট্র কর্তৃক নির্মিত। শিবরামকৃষ্ণান আধুনিক বনবিভাগ গঠনে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের ভূমিকা নিয়ে আলোকপাত করেছেন। দেখিয়েছেন স্থানীয় স্তরে বিভিন্ন দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র কিভাবে কোনো এলাকার চিত্র নির্মান করে।[1] তাই সুন্দরবনের নির্মান (Representation) কে বুঝতে হলে আমাদের কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে,যথা- রাষ্ট্রের ভূমিকা (ঔপনিবেশিক ও বর্তমান), বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারী সংকলনের উদ্দেশ্য, স্থানীয় স্তরে রাষ্ট্র ও সমাজের নানাবিধ দ্বন্দ্ব, আন্তজার্তিকতাবাদ ইত্যাদি। সুন্দরবনের World heritage site এ উত্তরণ একদিনে হয়নি, বিভিন্ন জটিল ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়ে আজ তা পরিণত। এই ইতিহাসই আজকের আলোচ্য।

সুন্দরবনের ইকোলজিতে প্রথম উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে মুসলিম শাসকদের রাজত্বকালে (১২০৬-১৫৭৫খ্রীঃ) । যেসব মুসলিম পীরসাধক যেমন- খান জাহান আলী, মোবারক গাজী প্রমুখরা সুন্দরবনে এসেছিলেন, তারা ইসলাম ধর্ম প্রচারের পাশাপাশি জলসিক্ত ধান চাষে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা নেন।[2] এরফলে বন সংলগ্ন বাস্তুতন্ত্রে গুরুত্বপূর্ন পরিবর্তন আসে। এতদিন যে সমস্ত নিম্নবর্নের হিন্দুরা (যেমন- পোদ, চণ্ডাল) এখানে বসবাস করতেন, তারা মূলত মাছ ধরেই জীবিকা নির্বাহ করতেন।[3] কিন্তু ইসলামের আগমনের ফলে একই সঙ্গে বন কেটে বসতি বিস্তার ও চাষবাসের কাজ চলতে লাগল। মৎস্যজীবী হিন্দুরা পেশার পরিবর্তন ঘটায়। মাছ ধরার পরিবর্তে কৃষিকাজে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। জেমস ওয়াইজ দেখেছেন, মুসলিমরা মাছ ধরাকে নীচু কাজ হিসাবে দেখতো, যেহেতু এর সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে হিন্দুদের যোগ ছিল।[4] চাষবাসের সুবিধা হল উৎপাদিত শস্য সহজে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায় এবং তা থেকে সরকারকে কর দেওয়া যায়। কিন্তু মাছধরা জীবিকা এসব ব্যাপারে সুবিধাজনক নয়।

তবে একথা ঠিক যে, সুন্দরবনে কৃষিকাজের বিস্তার ব্রিটিশদের আগমনের পর আরও গতি পায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ হল বাংলায় ব্রিটিশদের ভূমিরাজস্ব নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাল। অবশেষে ১৭৯৩ খ্রীঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রতিষ্ঠা হলে তার অবসান ঘটে। মনে রাখতে হবে সুন্দরবন কিন্তু এই বন্দোবস্তের বাইরে ছিল। স্বভাবতই সুন্দরবন থেকে কি করে বেশি রাজস্ব আদায় করা যায়, সে চিন্তায় তারা ব্যাপৃত ছিল। ইতিমধ্যে জেমস রেনল সুন্দরবনের নির্ভরযোগ্য মানচিত্র তৈরী করেন। যশোরের ম্যাজিস্ট্রেট টিলম্যান হেঙ্কেল গর্ভনর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের অনুমতিক্রমে ১৭৮৪ খ্রীঃ হিঙ্গলগঞ্জ, চাঁদখালি, কচুয়া প্রভৃতি স্থানে চাষাবাদের কাজ শুরু করেন। হেঙ্কেলের সবচেয়ে বড় বাধা এসেছিল জমিদারদের কাছ থেকে। সীমানা সম্পর্কে সঠিক চিহ্নকরণ না থাকায়, বঙ্গীয় জমিদাররা নিজ নিজ এলাকা বাড়ানোর চেষ্টা করত। সুন্দরবনে সরকারী নিয়ন্ত্রণ বাড়ানোর জন্য ১৮১৬ খ্রীঃ সুন্দরবন কমিশনার নিযুক্ত হন।

এখন প্রশ্ন হল, সুন্দরবন একটি জল-জঙ্গলময় এলাকা। এখানে চাষাবাদ কষ্টসাধ্য। তা বিভারিজের লেখাতেই স্পষ্ট। তা সত্ত্বেও এখানে চাষের ব্যাপারে কোম্পানির এত উদ্যোগের কারণ কি? সহজ উত্তর, বেশি পরিমান রাজস্ব সংগ্রহের চেষ্টা। বিষয়টি আরও ব্যাখ্যার প্রয়োজন। আসলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হওয়ার পর কোম্পানীর কর্তা ব্যক্তিদের কাছে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায় এই বন্দোবস্তে একটা বড়সড় ভুল হয়ে গেছে। এর থেকে বের হওয়ার উপায় অনাবাদী জমি বা wasteland গুলিকে চাষের আওতায় এনে এই ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়া। সুতরাং সুন্দরবন হয়ে উঠল কোম্পানীর wasteland, স্বভাবতই এখানে সরকারের নজর ছিল বেশী।[5]

বিষয়টি পরিষ্কার হয়, ১৮২৮ সালের রেগুলেশানের মাধ্যমে। যেখানে সুন্দরবন সহ সমস্ত অনাবাদী জমি সরকারের সম্পত্তি বলে ঘোষিত হয়। এভাবে জমিদারদের সমস্ত দাবী জোরের সঙ্গে নস্যাৎ করা হয়। ১৮৩২-১৮৩৩ খ্রীঃ ডাম্পিয়ার- হজেস সুন্দরবনের সীমানা নির্ধারণ করেন। ১৮২৯ থেকে ১৮৭০এর দশক পর্যন্ত সুন্দরবনের জমি ছোট ছোট লটে ভাগ করে লীজহোল্ডারদের দেওয়া হয়। যাতে দ্রুত চাষবাসের প্রসার ঘটে সেজন্য প্রাথমিক ভাবে ভূমিরাজস্বে যথেষ্ঠ ছাড় থাকে। ১৮১৯,১৮৩০,১৮৫৩ সালে সুন্দরবনে জমি উদ্ধারের জন্য যেসব লীজ দেওয়া হত, তার নিয়মকানুনে বদল ঘটেছে। দেখা যাবে আইনগুলি পর্যায়ক্রমিক ভাবে খাজনা প্রদানের ব্যাপারে আরও উদার হয়েছে।[6] জঙ্গল কেটে কৃষির প্রসারের জন্য ছোটনাগপুর, রাঁচি, ময়ুরভঞ্জ ইত্যাদি এলাকা থেকে সাঁওতাল, ওরাও, মুন্ডা, ভূমিজ প্রভৃতি উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষকে ডেকে আনা হল। এদেরই উত্তরপুরুষ (মাহাতো, পুরান ইত্যাদি) বর্তমানে সুন্দরবনের বাসিন্দা।[7] সুন্দরবন এতদিন ছিল দুর্ভেদ্য জঙ্গল, যা মনুষ্য প্রবেশের অসাধ্য, আজ তা কৃষিক্ষেত্রে রূপান্তরিত।

মুসলিম শাসকদের সময় সুন্দরবনে যেসব জমি চাষের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছিল, তা অধিকাংশই ছিল পরিণত ব-দ্বীপ অর্থাৎ সেখানে ব-দ্বীপ গঠনের কাজ শেষ হয়েছে। অন্যদিকে ইংরেজ আমলে দ্রুত চাষের প্রসারের জন্য, রাজস্ব আদায়ের তাগিদে জায়মান বা সক্রিয় ব-দ্বীপ গুলিকেও উদ্ধার করা হয়।[8] নোনা জলের হাত থেকে ফসলকে বাঁচানোর জন্য তৈরী হয় বাঁধ নির্মানের কাজ। এভাবে ঔপনিবেশিক বিজ্ঞান সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটায়। জমি উদ্ধারের পাশাপাশি চলল, এই প্রচেষ্টাকে যুক্তিসঙ্গত করার উদ্যোগ। যেমন দেখা যায়, সুন্দরবন সম্পর্কে এক প্রত্যক্ষদর্শীর উক্তি। "It is pleasing to reflect that what was once only a den of wild beasts is now made to yield to not a few their 'daily bread'..." [9] অর্থাৎ 'আধুনিকীকরণের ঝোঁক' এখানে স্পষ্ট। ১৮৭৫ খ্রীঃ উইলিয়াম হান্টার সুন্দরবন প্লানকে 'বড় জয়' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। এভাবে তৈরী হয় "Civilizing Sundarban" এর ধারণা। যে দুর্ভেদ্য জঙ্গল হিংস্র শ্বাপদে পরিপূর্ণ,

জঙ্গল পরিষ্কার করেই সে জায়গার উন্নতি বিধান সম্ভব।[10] ভারতে দীর্ঘদিন টিকে থাকতে গেলে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রয়োজন ছিল ভারতীয় মননে উপনিবেশের বিস্তার। এজন্য জেরেমি বেন্থাম, জেমস মিলের উপযোগবাদ তত্ত্বকে গেলানো হয়। দেখানো হয়, যা কিছু হচ্ছে সবই ভারতীয়দের আধুনিকীকরণের স্বার্থে। সুন্দরবনে জমি উদ্ধারের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক শক্তির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাফল্য লাভ করে। একদিকে ব্রিটিশদের রাজনৈতিক শক্তি দেশের কোনায় কোনায় পৌঁছে যায়, অন্যদিকে রাজস্ব সংগ্রহের উদ্দেশ্য সাফল্য লাভ করে।[11] এটাই হল সুন্দরবনের প্রথম পর্বের নির্মান। জঙ্গল বা বন হয়ে উঠল wasteland বা অনাবাদী জমি, যেখানে চাষাবাদ করাই সরকারের 'নোবেল প্রজেক্ট'।

দ্বিতীয় পর্ব:

আকর্ষনীয় স্কিমে সুন্দরবনের জমি লীজহোল্ডারকে দেওয়ায় দ্রুত বহু জমিতে চাষাবাদ শুরু হয়। বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সুন্দরবন অঞ্চলে চলে আসে। তাদের কাছে দুটি আকর্ষন ছিল। প্রথমত, সহজ শর্তে কৃষিকাজ করা সম্ভব হচ্ছিল। দ্বিতীয়ত, যে সময় চাষাবাদ সম্ভব নয় সেসময় তারা বনজ (কাঠ, মধু, বন্যপ্রাণী) ও জলজ (মাছ, কাঁকড়া) সম্পদ সংগ্রহ করে দিন অতিবাহিত করতে পারত। ফলে সুন্দরবন হয়ে উঠল প্রান্তিক মানুষের কাছে সম্পদ সংগ্রহের অফুরন্ত ভাণ্ডার।[12] আর নব্য আগত সাঁওতাল, ওরাও, মুন্ডা প্রভৃতি উপজাতির মানুষরা প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে জীবন ও জীবিকা নির্বাহে বেশী উৎসাহী। স্থায়ী বসতি ও স্থায়ী কৃষিকাজে তারা সেভাবে অভ্যস্থ নয়।[13]

দেশীয় লোকজন(Indigenous People) যারা জঙ্গল কেটে আবাদ শুরু করেছিল, তাদেরকে পার্শ্ববর্তী জঙ্গল থেকে প্রয়োজনীয় সম্পদ আহরণের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল।[14] হ্যামিল্টন বুচানন, যিনি চিটাগাং পাহাড়ে ভ্রমণে গিয়েছিলেন, তিনি দেখেন, জঙ্গলের কাঠ কারো সম্পত্তি নয়, যেকোনো ব্যক্তি প্রয়োজন অনুযায়ী কাঠ সংগ্রহ করতে পারত।[15] আসলে সরকার এসব প্রচেষ্টায় কখনওই বাধা দিত না, তার মূল লক্ষ্য ছিল চাষের প্রসার ও কর সংগ্রহ। একইভাবে জলের মাছ ধরাও ছিল সবার জন্য উন্মুক্ত, কোন ট্যাক্সের প্রচলন ছিল না। ১৮৬৬ সালে প্রথম পোর্ট ক্যানিং কোম্পানীকে সুন্দরবনের সমস্ত নদী ইজারা দেওয়া হয় মাছ ধরার জন্য। কিন্তু দুবছরের মধ্যেই তা বাতিল করা হয়, কেননা এর ফলে স্থানীয় জেলেদের সঙ্গে পোর্ট ক্যানিং কোম্পানীর বিবাদ বাঁধে। একইভাবে সুন্দরবনের জঙ্গল ওই একই কোম্পানীকে ইজারা দিয়েও তা মেয়াদ উর্ত্তীন হওয়ার আগেই ফেরত নেওয়া হয়।[16] অর্থাৎ জঙ্গল থেকে যে রাজস্ব আদায় সম্ভব তা পরিষ্কার হয়ে যায়।

মনে রাখতে হবে, এদেশ শাসন করার জন্য ব্রিটিশদের উপনিবেশ সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞানার্জনের দরকার ছিল। এ প্রয়োজনেই ভারতের অতীত নিয়ে নাড়াছাড়া শুরু করেছিলেন প্রাচ্যবিদরা। যাইহোক ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের পর একটি বিষয় পরিষ্কার হয় যায় যে, উপনিবেশ সম্পর্কে ব্রিটিশদের জ্ঞান যথেষ্ট ছিল না। তাই বিদ্রোহের আঁচ ধরা যায় নি।[17] এবার শুরু হল পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে জেলা অনুযায়ী গেজেটিয়ার তৈরী ও তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা। ব্রিটিশ সিভিল সার্ভেন্ট উইলিয়াম হান্টার ১৮৭৫ খ্রীঃ লেখেন Statistical Account of Bengal, যার প্রথম খণ্ডে ছিল ২৪ পরগনা ও সুন্দরবনের বিবরণ। হান্টার সুন্দরবন প্রসঙ্গে 'drowned land', 'sodden wasteland' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেন। রামচন্দ্র গুহ লিখেছেন, এইভাবে ঔপনিবেশিক নীতিনির্ধারকরা সুন্দরবনকে wasteland হিসাবে চিহ্নিত করে এর উপর থেকে দেশীয় মানুষের অধিকারের রাস্তা বন্ধ করেন, যাতে যথেচ্ছ পরিমানে জঙ্গল থেকে শোষন করা যায়।[18] লক্ষ্যনীয় যে, হান্টার সমস্ত জেলার বিবরণ পৃথক পৃথক ভাবে দিলেও সুন্দরবনের বিবরণ একত্রে দিয়েছেন, যা ২৪ পরগনা, যশোর ও বাখরগঞ্জের মধ্যে পড়ে। অর্থাৎ সুন্দরবন যে পৃথক ভৌগোলিক স্থান তা তার লেখায় প্রতিভাত।[19]

পাশাপাশি হান্টারের লেখাতে আছে, সুন্দরবনে বসবাসকারী মানুষ সবাই প্রায় অভিবাসী (migrated) ধরনের এবং এখানের প্রকৃত বাসিন্দা (aboriginals) হল বাঘ, কুমির, সাপ, মাছ ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের পশুপাখী।[20] সুন্দরবনের জমির প্রকৃতি সম্পর্কে হান্টার লেখেন, এখানকার জমি খারাপ ভাবে উর্ব্বর(evil fertility) অর্থাৎ কৃষির জন্য উদ্ধার করা জমি এক বছর ফেলে রাখলেই তা জঙ্গলে পরিণত হয়ে যায়।[21] পাশাপাশি আছে প্রাকৃতিক শক্তির প্রচণ্ডতার বর্ণনা। বন্যা, ঝড় প্রায়শই বহু ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সেইসঙ্গে আছে হিংস্র বাঘের আক্রমণ, এই ভয়ে অনেক সময় গ্রাম ফাঁকা হয়ে যায়, সে এলাকা আবার জঙ্গলে পরিণত হয়।[22] অর্থাৎ সুন্দরবন মানুষের বসবাসের জন্য উপযুক্ত নয়, এটি জীবজন্তুদেরই স্থান। ভবিষ্যতে এই এলাকা যে world heritage site এ পরিণত হবে তার ইঙ্গিত হান্টারের লেখাতেই পরিস্ফুট।

ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ব্রিটিশ ভারতে তৈরী হয় Scientific forest management এর ধারণা । ব্রাণ্ডিস, স্লিচ প্রমুখরা বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মত প্রকাশ করেন। এর আড়ালে ঔপনিবেশিক সরকারের আরও একটি উদ্দেশ্য কাজ করছিল, তা হল বনজ সম্পদ শোষণের পথ সুগম করা। সুন্দরবনের জ্বালানী কাঠ, মোটা ঘাস এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে স্লিচ মন্তব্য করেন, সুন্দরবনের পশ্চিম অংশ, যা কলকাতার নিকটবর্তী, তা কাঠুরিয়াদের দৌরাত্ম্যে প্রায় পরিষ্কার। অবশিষ্ট অংশ যদি সংরক্ষণ করা না হয়, তবে এখান থেকে সম্পদ আহরণ ভবিষ্যতে ব্যাহত হবে।[23] বাংলার তৎকালীন গর্ভনর রিচার্ড টেম্পেল এই মর্মার্থ উপলব্ধি

করতে সক্ষম হন। টেম্পেল বলেন, সুন্দরবনের জমি উদ্ধারের পরিবর্তে জঙ্গল সংরক্ষণ বেশি গুরুত্বপূর্ন, কারণ এই বিশেষ ক্ষেত্রে জঙ্গল অনেক বেশি কিছু উৎপন্ন করেছে, যা ধানের তুলনায় মূল্যবান।[24] স্বাভাবিক ফলশ্রুতি ১৮৭৮ খ্রীঃ সুন্দরবন 'সংরক্ষিত' (Reserved) অরন্য হিসাবে ঘোষিত হয়। পাশাপাশি এই অরণ্যের কিছু এলাকা 'সুরক্ষিত' (Protected) হিসাবে চিহ্নিত থাকে, যেখানে বন দপ্তরের অনুমতি সাপেক্ষে জমি আবাদ করার কাজ চালানো যাবে। ১৮৯০ সালে সুন্দরবনের ৪০৯৫ বর্গকিমি অরণ্য ছিল 'Reserved, আর ৪৪৮০ বর্গকিমি ছিল 'Protected' হিসাবে চিহ্নিত।[25] এভাবে সুন্দরবন সরকারের একচেটিয়া কারবারের (monopoly) একটি উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। বিগত শতাব্দী ধরে বন দপ্তর সরাসরি অথবা লাইসেন্স দিয়ে প্রচুর পরিমাণে কাঠ, বাঁশ ও অন্যান্য বনজ সম্পদ সংগ্রহ ও বিক্রির ব্যবস্থা করেছে।[26] সুতরাং সুন্দরবনে দুই ধরণের শক্তি কাজ করেছে। একদিকে আছে waste land কে আবাদী জমিতে পরিণত করার চেষ্টা, অন্যদিকে জঙ্গলের কাঠের সরবরাহ সুনিশ্চিত করা।[27] আর ব্রিটিশ রাজত্বের দ্বিতীয়ার্ধে শেষেরটি বেশি গুরুত্বপূর্ন হয়ে ওঠে।

তৃতীয় পর্ব:

এভাবে বন আইনের মাধ্যমে সুন্দরবনের সমস্ত জঙ্গলের উপর মানুষের অবাধ বিচরণ ও জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী গ্রহণ নিষিদ্ধ হয়। এই আইনই উত্তরাধিকার সূত্রে স্বাধীন ভারতে গৃহিত হচ্ছে। এর মধ্য দিয়েই সুন্দরবনের মানুষের প্রান্তিকতার কারণ অনুসন্ধান করা যায়। Scientific forest এর নামে বনজ সম্পদ ও জীব বৈচিত্র সংরক্ষণ মান্যতা পায়, কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে বনকে যারা জীবন ধারণের উপায় হিসাবে দেখেছিল, তাদের অধিকার অধরাই থেকে যায়। শিবরামকৃষ্ণান, রামচন্দ্র গুহ, শাহাবুদ্দিন প্রমুখ, যারা পরিবেশের ইতিহাস নিয়ে চর্চা করেন , তারা Scientific forest management এর বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিবাদ প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

১৯৭০ ও ৮০এর দশক স্বাধীন ভারতের সংরক্ষণ আন্দোলনের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ন সময়। ১৯৭২ সালে Indian Wildlife Protection Act চালু হয়। এই আইনের নিমিত্ত ভারত ১৯৭৪ সালে 'CITES' (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) এর সদস্য মনোনীত হয়। ১৯৭৩ সালে সুন্দরবন Tiger Reserve বলে ঘোষিত হয়। ১৯৮৪ তে National Park। ১৯৮০র দশকে World Wildlife Fund (WWF) রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার সংরক্ষণের জন্য অর্থ সাহায্যের কথা ঘোষণা করে। অবশেষে এখানকার জীব বৈচিত্রের কারণে ১৯৮৭ সালে 'world heritage site' হিসাবে সুন্দরবনের মাথায় 'নতুন পালক' যুক্ত হয়।

ইতিমধ্যে বিশ্ব উষ্ণায়ণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সুন্দরবন শক্তি রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ন জায়গা হয়ে উঠেছে।[28] ধারণা করা হচ্ছে উষ্ণায়ণের কারণে ম্যানগ্রোভের পরিমান কমবে, বাঘের বসতির পরিমান কমবে, বহু রকমের জলজ ও স্থলজ প্রাণীর সংখ্যা হ্রাস পাবে। অন্যদিকে দেখা গেছে ম্যানগ্রোভ কার্বন শোষণে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে। তাই বর্তমানে ম্যানগ্রোভ সংরক্ষণের বহর বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি অবহেলিত হয়েছে সুন্দরবনের অধিবাসীদের নূন্যতম অধিকার। পরিসংখ্যাণ বলেছে, এখানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ ইত্যাদির উপস্থিতি বাংলার যেকোন অঞ্চলের তুলনায় অনেক কম।[29] ২০১৪ সালে ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক একই সঙ্গে জীব-বৈচিত্র সংরক্ষণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কথা বলে। কিন্তু দুটি পরস্পর বিরোধী ধারণাকে কিভাবে জোড়া দেওয়া হবে তার ব্যাখ্যা হয়নি। তাই জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট এর মাধ্যমে বিকল্প অর্থ উপার্জনের (শুকর পালন, মাস্রুম চাষ) কিছু চেষ্টা হলেও, তাতে কাজের কাজ কিছু হয়নি।

পরিবেশ রক্ষায় Sustainable Development বর্তমানে অত্যন্ত জনপ্রিয় ধারণা। এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে Brundtland Report বলেছে, “Sustainable Development is such a development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs”.[30] কিন্তু এই ধারণা সুন্দরবনে প্রয়োগ করতে গিয়ে তৈরী হচ্ছে দ্বন্দ্ব। এতে পরিবেশ সংরক্ষণ গুরুত্ব পাচ্ছে, তাতেই বেশী অর্থ বিনিয়োগ হচ্ছে। এর উপযোগিতা অস্বীকার করার নয়। কিন্তু টেকসই উন্নয়নের কথা বলতে গিয়ে সরকার বাহ্যিক ভাবে কিছু নিয়ন্ত্রণ তো অবশ্যই করে থাকে। ওয়াটস Sustainable Development কে এক ধরণের Ecological Colonization বলে মনে করেন[31]।

উপগ্রহ চিত্র থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার যে, নিমজ্জন বা ভূমিক্ষয়ের ফলে ম্যানগ্রোভের পরিমানের বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয়নি, বনচ্ছেদের পরিমাণও এমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়।[32] তা সত্ত্বেও বনবিভাগ উচ্চ পর্যায়ের সুরক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করে, নিজেদের সুপ্রিম প্রমান করতে। ফলশ্রুতিতে চলে দ্বন্দ্ব। বনবিভাগের সুরক্ষা কর্মী (patrol babu) জঙ্গল থেকে ধরা মাছ, কাঁকড়া, মধু কেড়ে নেয়। অনেকের বোট হারানোর অভিজ্ঞতাও আছে। বনদপ্তরের কর্মীদের বক্তব্য তারা বন সুরক্ষার কাজ করেছে। অন্যদিকে অধিবাসীদের বক্তব্য তাদের বেচে থাকার অধিকারের উপর সরকার হস্তক্ষেপ করেছে। অমিতাভ ঘোষের ‘Hungry Tide’ উপন্যাসে এই দ্বন্দ্বের ছবি প্রতিফলিত।

কিন্তু বনদপ্তরের যথেষ্ট সক্রিয়তা সত্ত্বেও বাঘের সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসেনি, বরং বর্তমান চিত্র যথেষ্ট ভয়ের কারণ। যেমন ২০১০ সালে ভারতীয় সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা ছিল ২৭০। কিন্তু ২০১২ তার পরিমান কমে দাঁড়ায় ৭৬।

২০১৫ তে এই সংখ্যা পৌচেছে ১০৩ এ[33]। আসলে বাঘ ও ম্যানগ্রোভ হ্রাসের মূল কারণ জলবায়ু পরিবর্তন, সমুদ্রতলের উচ্চতা বৃদ্ধি ও ভূমিক্ষয়[34]। এখানে বসবাসকারী মানুষ বাঘের মৃত্যুর জন্য দায়ী নয়, যা বনদপ্তর মনে করে। যদি কোন মানুষের মৃত্যু হয় বাঘের আক্রমনে, তাহলে মানুষ সেখানে অনুপ্রবেশকারী। অন্যদিকে যদি কোন গ্রামে বাঘ ঢোকে এবং মানুষের আক্রমনে সে প্রাণ হারায়, তবে মানুষ অন্যায়কারী।

বিগত শতাব্দীর শেষের দিকে সরকারী ও ব্যক্তিগত স্তরে লেখালিখির ক্ষেত্রে সুন্দরবনের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন, সুন্দরবনের ইতিহাস সংক্রান্ত লেখাতে আছে, ব্রিটিশ আমলে জমি উদ্ধারের চেষ্টা, সুন্দরবনে বসবাসকারী উপজাতি সম্প্রদায়, প্রত্নতাত্ত্বিক বিবরণ, এখানকার লৌকিক সংস্কৃতি ইত্যাদির বর্ননা। সুন্দরবনের বসতির ধরন, জনসংখ্যার প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন ভূগোলবিদরা। একইভাবে সুন্দরবনের জীব-বৈচিত্র, প্রাকৃতিক সম্পদের বর্ননা, সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা, পর্যটনের সম্ভবনা ইত্যাদি বিষয়ে গবেষকরা দৃষ্টি আর্কষন করেছেন। এ অঞ্চলের মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়েও আলোচনা হয়েছে। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই সুন্দরবনে মানুষের স্থান জীব-জন্তুর নিচে, যেটা স্বাভাবিক বলে লেখকরা ধরে নিয়েছেন।[35] বিভিন্ন লেখাতে ফুটে উঠেছে এখানকার পশু-পাখি বিপন্ন, বাঘ বিপন্ন, আর এই বিপন্নতার কারণ মানুষ, যারা অনুপ্রবেশকারী, মানুষের এই উপদ্রব থাকলে অদূর ভবিষ্যতে বাঘ নিশ্চিন্ন হয়ে যাবে। এসব কারণে সরকারের হাত আরও শক্ত হয়েছে।

সুন্দরবনে সংরক্ষণের তৎপরতা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায় মরিচঝাঁপিতে। ১৯৭৮-৭৯ সালে দণ্ডকারণ্য থেকে আগত উদ্বাস্তুরা মরিচঝাঁপিতে বসবাস শুরু করলে একদা সহানুভূতিশীল বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে তাদের উপর চূড়ান্ত নিপীড়ন শুরু করে। উবাস্তুদের অপরাধ ছিল তারা সুরক্ষিত অরণ্য থেকে জীবন ধারণের উপায় খুঁজে ছিল। বাম সরকারের পুলিশ মরিচঝাঁপি অবরোধ করে, উদ্বাস্তুদের বসতি ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে নাগরিক প্রতিবাদ তেমন হয়নি বললেই চলে। অপ্রতিবাদের পিছনে বিভিন্ন কারণের পাশাপাশি আরও একটি কারণ ছিল, তা হল বাঙালী সমাজ ততদিনে বুঝে গেছে, বা বোঝানো হয়েছে সুন্দরবন বাঘের জায়গা,মানুষের নয়[36]। সুন্দরবন বলতে আমরা এই নির্মিত চিত্রই দেখি, শুধু তাই নয় সারা বিশ্ব দেখে।

সূত্রনির্দেশ:

1. Kabita Sivaramakrishnan, *Modern Forest: Statemaking and Environmental Change in Colonial Eastern India*, New Delhi, OUP,1999, p-4

2. Richard M. Eaton, *Human settlement and colonization in the Sundarbans 1200-1750*, Agriculture and Human Values; Spring 1990, pp-6-16
3. Anamitra Anurag Danda, *Surviving in the Sundarbans: threats and responses*, PhD thesis, University of Twente, 2007, p-29
4. *ibid*
5. Iftekhar Iqbal, *The Bengal Delta: ecology, state and social change 1840-1943*, Basingstoke, Palgrave Macmillian, 2010, pp-18-26
6. *ibid* , pp- 26-30
7. Amal Kumar Das(ed), *A focus on Sundarban*, Calcutta, Editions Indian, 1981, pp- 58-59
8. S.C. Chakraborty, *The Sundarbans: Terrain, Legends, Gods & Myths*, Geographical Review of India, 2005, p-4
9. J.F. Richards and E.P. Flint, *Long-term transformations in the Sundarbans Wetlands forest of Bengals*, Agriculture and Human Values, spring1990, p-17
10. *ibid*, p-19
11. Aditya Ghosh, *Sustainability conflicts in costal India*, Advance in Asian Human-Environmental Research, Springer International Publishing, 2018, pp-73-74
12. *ibid*
13. *ibid*
14. Amites Mukhopadhyay, Living with Disasters, Delhi, CUP, 2016, pp-78-80
15. Anamitra Anurag Danda, *ibid*, p-31
16. *ibid*
17. C.A. Bayly, *Empire and Information: Intelligence Gathering and social Communication in India* 1780-1870, Cambridge, CUP, 1996, PP- 45-46
18. Ramchandra Guha, An Early Envermental Debate, Indian Economic and Social History Review 27, 1990, pp-65-84

19. P. Greenough- *Hunter's Drowned Land: An Environmental Fantasy of the Victorian Sundarbans*, in Nature and the Orient edited by R.H. Grove, Delhi, OUP, 1998, P-240
20. *ibid* ,p- 247
21. W.W.Hunter, *Statistical Account of Bengal* vol-1, WB Dist. Gazetteers, reprint 1998, p-52
22. *ibid*, p-33
23. Sutapa Chatterjee Sarkar *, The Sundarbans : Folk Deities , Monsters and Mortals* Delhi, Orient BlackSwan , 2010, p-88
24. *ibid*
25. *ibid,* p-89
26. Anamitra Anurag Danda, *ibid*, p-34
27. Sutapa Chatterjee Sarkar, *ibid*, pp-86-87
28. Ghosh Aditya, *ibid*, p-78
29. *ibid*
30. *https://www.iisd.org/topic/sustainable development*
31 Aditya Ghosh, *ibid*, p-80
32. Aditya Ghosh*, ibid*, p-79
33. *https://timesofindia.indiatimes.com*
34. Aditya Ghosh, *ibid*, pp-79
35. Amites Mukhopadhyay, *ibid*, p-36
36. *ibid*, p-42

বাণী বসুর ছোটগল্পে নারীর প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর

রীণা মজুমদার
অধ্যাপক, যতীন্দ্র রাজেন্দ্র মহাবিদ্যালয়
আমতলা, মুর্শিদাবাদ

সারসংক্ষেপ:
আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের ধারাকে যেসব ছোট গল্পকার তাঁদের লেখনী দিয়ে সমৃদ্ধ করে চলেছেন তাঁদের মধ্যে বাণী বসু অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পকার। সমকালীন রাজনৈতিক- সামাজিক- অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটকে অবলম্বন করে রচিত বাণী বসুর ছোটগল্পের মধ্যে তাঁর একক কণ্ঠস্বর পাঠকের কাছে পৃথক আবেদন রেখে চলেছে। যে তিনটি ছোট গল্পকে এখানে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রাখা হয়েছে তার মধ্যে দিয়ে একালের নারীর প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়েছে। সমকালীন সময়ের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে নারীর প্রতিবাদের ধরণেও সময়ের ছাপ প্রতিফলিত হয়েছে। এই নারী আর ভাগ্যের পরিহাসের জন্য আত্মধিক্কার দেয় না। বরং নিজের মত করে আত্মরক্ষার বলয় তৈরি করে। **'সংগ্রহ'** **'চুপি মাকড়সার জাল'** এবং **'শৃগাল কাহিনী'**তে আমরা আপন চেতনায় দীপ্ত এবং দৃপ্ত সেই নারীদের পাই যারা পাঠকের দরবারে বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে।

সূচক শব্দ: (১) কণ্ঠস্বর (২) সাযুজ্য (৩) আত্মধিক্কার (৪) দরবার

মূল আলোচনা:
ছোটগল্প সৃজ্যমান বাংলা সাহিত্যের এক উজ্জ্বল অধ্যায়। আমাদের যাপিত জীবনের দৈনন্দিন একেবারে তুচ্ছ ঘটনা বা মুহূর্তটিও ছোট গল্পকারের লেখনীতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। ছোট গল্পে একদিকে যেমন থাকে জীবনের চিরন্তন পাঠ, আর একদিকে থাকে সমকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক নানা ঘটনার অভিঘাত। বস্তুতপক্ষে, চিরায়ত বিষয়ের সঙ্গে পরিপার্শ্বের পরিবর্তিত পরিস্থিতির বীক্ষণই ছোট গল্পকে সজীব প্রাণবন্ত করে রেখেছে। এবং সেই কারণেই পাঠক ছোট গল্পের মধ্যে নিজের এবং কখনো বা তার অতি পরিচিত মানুষটির আবরণ উন্মোচিত হতে দেখে। এই আলো-আঁধারি রূপের জন্যই ছোট গল্প বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে চলেছে।

আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের ধারায় যারা বিশিষ্টতার পরিচয় দিয়েছেন, তাদের মধ্যে বাণী বসু অন্যতম। বাণী বসুর গল্পে একদিকে যেমন মানব প্রকৃতির চিরায়ত রূপটি ধরা পড়েছে, আরেকদিকে তেমনি সমকালীন বিভিন্ন বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে। এখানে বাণী বসুর যে তিনটি গল্পকে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রাখা হয়েছে, সেই গল্পগুলিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় প্রত্যেকটি গল্পের মুখ্য চরিত্র নারী। এবং এই নারী সমকালীন সময়ের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে থাকা নারী। নারীর প্রতি ঔদাসীন্য, তাকে

প্রবঞ্চিত করে অন্য নারীর সঙ্গে দিন যাপন-- এসব সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত নতুন বিষয় নয়। কিন্তু, বাণী বসুর গল্পে আমরা লক্ষ্য করি, একালের নারীর প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। এই নারী আতশ কাচের তলায় রেখে নিজেকে এবং তার পুরুষ সঙ্গীটিকে দেখে। এবং অসঙ্গতি দেখলে সে নিজেই পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়। বাণী বসুর নারী কোথাও বা পুরুষের ঔদাসীন্য নিয়ে সোচ্চার প্রতিবাদ না করে একটি আত্মবলয় তৈরি করে। আবার কোথাও বারুদ গর্ভ তেজে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নিজের প্রাপ্যটুকু আদায় করে নিতে দ্বিধা করে না। সমকালীন নারীর এই প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরই এই তিনটি গল্পের মূল ঐকতান।

'সংবাহ'- বাণী বসুর 'সংবাহ' গল্পে আর্থসামাজিক দিক থেকে ভিন্ন মেরুতে অবস্থানকারী দুই মহিলার মধ্যে সেতুবন্ধনের চিত্রটি অননুকরণীয় ভঙ্গিতে তুলে ধরা হয়েছে। এই গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে দুটি নারী চরিত্র- শোভা অগ্রবাল আর রেণু রজক দাস। শোভা অগ্রবাল বিত্তবান ঘরের মহিলা আর রেণু রজক দাস দক্ষিণ ২৪ পরগণার বউ। দুজনের প্রেক্ষাপট আলাদা। কিন্তু দু জনের দু'রকম সংকট তাদের এক প্ল্যাটফর্মে সামিল করেছে। শোভা অগ্রবালের ধনসম্পত্তি টাকা-পয়সার অভাব না থাকলেও কর্মব্যস্ত স্বামীর তার দিকে নজর দেবার সময় নেই। অন্যদিকে রেণু নিজের পছন্দে যাকে বিয়ে করেছে, সে অলস প্রকৃতির হারু। সংসারের হাল ফেরাতে, বেঁচে থাকার তাগিদে সে কলকাতায় এসে আয়া সেন্টারে যোগ দেয়। শোভা অগ্রবাল অসুস্থ হলে রেণু আয়ার কাজ নিয়ে এই বাড়িতে আসে।

রেণু গ্রাম থেকে আসলেও তার জীবন বোধ এবং পর্যবেক্ষণ শক্তি তীক্ষ্ণ। এক সময় সে ভাবতো আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যই বোধহয় সুখে থাকার জীয়ন কাঠি। কিন্তু, জীবন জীবিকা তার চোখের আগল খুলে দিয়েছে--

"....... প্রফেশনে ঢুকে সে সমঝেছে, টাকা পয়সা থাকলেও দুঃখ ঠিক কোনও না কোনও খোঁদল খুঁজে নেয়। একেক সময় তা অভাবের দুঃখকেও ছাড়িয়ে যায়।"[১]

রেণু তাই বোঝে শোভা অগ্রবালের দুঃখটা ঠিক কোথায়। অসুস্থ, শয্যাশায়ী মহিলাকে সে তার নরম পেলব হাতের স্পর্শ আর সেবা যত্ন দিয়ে সুস্থ করে। রেণুর ছুটি হয়ে যায়। কিন্তু শোভা অগ্রবাল রেণুকে ভুলতে পারেন না। কারণ, রেণু তাকে নিজের মত করে বেঁচে থাকার অর্থ খুঁজে দিয়েছে। আর রেণুও স্বাধীনভাবে অর্থ উপার্জনের মধ্যে মুক্তির স্বাদ পেয়েছে। একদিন শোভা অগ্রবালের সঙ্গে রেণুর সম্পর্ক ছিল শুধুই কাজের। কিন্তু, ক্রমে কাজের জগতের বাইরে তাদের মধ্যে ভালোবাসার সেতুবন্ধ গড়ে ওঠে। দুজনেই দুরকম ভাবে স্বামীর ঔদাসীন্য পেয়েছে--আজ আর তাতে আসে যায় না। শোভা অগ্রবালের বাড়িতে রেণু আবার বহাল হয়। এবার শুধু শারীরিক সুস্থতা লাভের জন্য নয়, মানসিক সান্নিধ্য লাভের জন্য রেণুকে ডাকা হয়। গল্পের সমাপ্তিতে লক্ষ্য করি--

> "সর বেসম আর মধু মিশিয়ে শোভার শোবার ঘরে ঢোকে রেণু। ...... সে মালিশ করতে থাকে।..... স্নায়ু কোষগুলি পরস্পরকে রূপের, রঙের, রসের বার্তা পাঠাতে থাকে। অচেনা হর্ষে হিল্লোলিত হতে থাকে রেণুও। বেগম এবং বাঁদী। ঘুমকাতুরে হারু বা কাজ কাতুরে অগ্রবাল সাব তার খবর পান না।"[২]

'চুপি মাকড়সার জাল'- এই গল্পে বাণী বসু আপাত দৃষ্টিতে সর্বার্থে সুখী একটি দাম্পত্য জীবনের ভারসাম্য কিভাবে নষ্ট হয়েছে তার চিত্র তুলে ধরেছেন। একটি পুত্র ও একটি কন্যা সন্তান নিয়ে রমেন-রুশতীর দাম্পত্য জীবন কানায় কানায় পূর্ণ। একটি সুন্দর ফ্ল্যাট, তার রুচিসম্মত সাজসজ্জা, পুত্র-কন্যার সঠিকভাবে পঠন পাঠন, সর্বোপরি ডাক্তার স্বামী রমেনকে নিয়ে রুশতীর এক স্বর্গীয় পরিতৃপ্তি। রুশতীর ছেলে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে। রুশতী নিজে গৃহসজ্জায় পটু ও পরিতৃপ্ত থাকলেও সে কিন্তু মেয়েকে নিজের পায়ে দাঁড় করাতে চায়। কারণ, সে বোঝে ঘরের কাজে প্রভূত শ্রম থাকা সত্ত্বেও তার যথার্থ মূল্যায়ণ হয় না। কারণ, তার সঙ্গে অর্থ প্রাপ্তির হিসেব-নিকেশ থাকে না। আমাদের সমাজে সংসারের কাজে না আছে অর্থ, না আছে সম্মান। তাই—

> "এই নিজের পায়ে দাঁড়ানোটা পরের প্রজন্মের মেয়েদের ভবিতব্য বলে সে চিনতে পারছে। .... পোস্ট অফিস, ব্যাঙ্ক দোকান-বাজার, বেড়ানো, নানান কেতার সামাজিকতা -- এ নিয়ে কত তর্ক-বিতর্ক, হাসি তামাশা কিন্তু শেষ বিচারে এই সমস্ত শ্রম, দক্ষতা, সময় দান সবই নাকি নন প্রডাক্টিভ এলেবেলে।"[৩]

রুশতীর এই বিশ্লেষণ, এই মূল্যায়ণ নিঃসন্দেহে কালোচিত এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু, গল্পের মূল নিশানা অন্যত্র। সেই নিশানা একেবারে অব্যর্থ রুশতী-রমেনের পারস্পরিক বিশ্বাস-নির্ভরতার দিকে। এরই অনুষঙ্গে গল্পকার একটি মাকড়সার বৃত্তান্ত দিয়েছেন- যে মাকড়সাটি আড়াল থেকে জাল বিস্তার করে চলেছে, অথচ রুশতী তাকে কিছুতেই ধরতে পারছে না। রুশতী মাকড়সাটির নাম দিয়েছে চুপি। গল্পের শেষ বুনোটে বোঝা যায়, চুপি মাকড়সার জালে ধরা পড়বে গৃহকর্তা রমেন।

যে রুশতী বুক ভরা বিপুল বিশ্বাস নিয়ে স্বামীর পছন্দ সই রান্না করে, স্বামীর ঘরের ফুলদানিতে ফুল রাখে, একদিন দ্বিপ্রহরে তার কাছেই ফোন আসে--

> "....... বৌদি, আপনার হাজব্যান্ড কি করে বেড়াচ্ছে খোঁজ রাখেন? ওটির সিস্টার মনিমালার সঙ্গে কি বিশ্রী সিন!"[৪]

স্বামীর প্রতি এমনই অগাধ বিশ্বাস আর আস্থা যে রুশতী ভাবতেই পারে না রমেন কোন খারাপ কাজ করতে পারে। ওপারের অপরিচিত নারী কণ্ঠ তাকে সতর্ক করে এই বলে –

> "থাক, আমি ওয়ার্নিং বেল বাজিয়ে আমার কর্তব্য করলুম। এখন যা ভালো বোঝেন।"[৫]

অপরিচিত নারী কণ্ঠের এই শেষ উক্তি রুশতীকে নাড়া দেয়। যে রমেনকে নিয়ে সে স্বপ্ননীড় রচনা করেছে, তিলে তিলে সাজিয়েছে, লোকশিল্পের আঙ্গিকে সোনার সংসার, সব-স-অ-ব তছনছ হয়ে যায়। তার মানসিক ভরকেন্দ্রের বিচলন ঘটে। সারাদিনের দুশ্চিন্তা, ক্লান্তি আর অবসাদে সে ঘুমিয়ে পড়ে। রাত এগারটায় রমেন যখন ফিরে এসে ডাকে তখনও সে মানসিকভাবে বিধ্বস্ত। যে রমেনকে সে এতদিন ধরে চিনে এসেছে, তাকে যেন অপরিচিত লাগে।

> "চারিদিক চোখ গোল গোল করে চায়, যেন এক্ষুনি জিজ্ঞেস করবে--আমি কোথায়? যেন সে এক্ষুনি বলে উঠবে--কে আপনি? চেনা চেনা লাগছে কিন্তু ঠিক প্লেস করতে পারছি না তো?"[৬]

রুশতী মানসিকভাবে এতটাই ভেঙ্গে পড়ে যে, রমেনকে ঠিকঠাকভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে খেতে দিতে পারে না। তার মনের মধ্যে একটাই প্রশ্ন মণিমালা কে? রমেনকে সেই প্রশ্ন করতে রমেন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু রুশতী সুপারের কাছ থেকে ইত্যবসরে জেনে গেছে মণিমালার সঙ্গে রমেনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা। রুশতীর কাছে ধরা পড়ে যায় রমেন। চুপি মাকড়সাটা রমেনের পাতে পড়ে দৃষ্টি দিয়ে গেঁথে ফেলে রমেনকে। রমেনের আর পালানোর পথ নেই। গল্পের উপান্তে এসে মনে হয়, মাকড়সাটা এতদিন ধরে যে নিঃশব্দে জাল বিস্তার করেছিল, সেই জাল বুঝিবা রমেনকে ধরে ফেলার জন্যই। রমেন যদি মণিমালার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেও, তবুও কি কোনদিন সে আর রুশতীর আস্থা অর্জন করতে পারবে? বা রুশতী যে পরমযত্নে, যে ঐকান্তিকতায় এতকাল ধরে সংসার সাজিয়েছে আর কি তার আগ্রহ থাকবে অবিশ্বাসের ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা এমন সংসারকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকার। এসব প্রশ্ন পাঠকের কাছে উঠে আসে-- নির্ভুল উত্তরও আসে প্রশ্নের অনুগামী হয়ে।

'শৃগাল কাহিনী'- এই গল্পে গল্পকার বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের এক বিবাহিত মহিলার প্রতারিত হওয়া এবং অন্যের সাহায্যে স্বামীকে শ্রীঘরে পাঠানোর কাহিনী তুলে ধরেছেন। যাকে কেন্দ্র করে গল্পের সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত আবর্তিত হয়েছে তার নাম রাধা। প্রায় ৪২/৪৩ বছর স্বামী প্রণবের সঙ্গে দাম্পত্য জীবন কাটিয়ে, স্বামীর সমস্ত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করে, শ্বশুরবাড়ির প্রতি দায়িত্ব পালন করে শেষ পর্যন্ত সে উপলব্ধি করে, যাকে সে এত দিন স্বামী বলে জেনে এসেছে, সে আসলে এক ধূর্ত মানুষ যার ধূর্ততা শিয়াল সদৃশ।

গল্পের সূচনাতেই সেই জন্য শিয়ালের প্রসঙ্গ আসে এবং নামকরণেও তারই ইঙ্গিত। ধূর্ত মানুষ আর শিয়ালের আচরণের মধ্যে তফাৎ দেখে না রাধা। বাঘের গায়ের দুর্গন্ধের জন্য শিকার সাবধানী হয়।

> "কিন্তু শেয়ালের এসব কিছু নেই। নেই ওই ভীষণতা, বিশালত্ব, বা অমন শ্বাসরোধী গন্ধ। তার আসা-যাওয়ার খেয়াল রাখতে পাখ-পাখালি, কুকুর বাঁদর কেউ নেই। সে শুধু আর চোখে খুঁজে নেবে কোথায় তোমার মুরগি ঘরের ঝাঁপে সামান্য ফাঁক হয়ে রয়েছে, কোনখানে তোমার দুর্বল গোড়ালি, কোন জায়গাটায় তুমি অরক্ষিত।"[৭]

রাধা অল্প বয়সে স্বামীকে হারায়। আট বছরের সন্তান অর্ণবকে নিয়ে সে জীবন যুদ্ধে নামে। সেখানেই প্রণবের সঙ্গে আলাপ এবং বিয়ে। প্রণব চাকরিতে উন্নতি করতে করতে শেষ পর্যন্ত একটি বহুজাতিক সংস্থার ভাইস প্রেসিডেন্ট হয় এবং বর্তমানে বিদেশেই থাকে। সে মাঝে মাঝে দেশে ফিরলে রাধাকে নিয়ে বেড়াতে যায়। আবার রাধা বিদেশে গেলে সেখানেও বেড়ায়। ইদানিং কাজের চাপে তার দেশে ফেরা হয়নি তিন বছর। এ পর্য্যন্ত ঠিকই আছে। কিন্তু প্রণবের মতো ব্যস্ত মানুষ যখন জানায় ফোন না নিয়ে সে মেক্সিকো হলিডে কাটাতে গিয়েছিল তখন রাধা যেন কোথায় ধূর্ত শেয়ালের গন্ধ পায়-সে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে তার সাজানো সংসারের জন্য।

> "আমি ভোর সকালে উঠে পাগলের মত ছুটে যাই, আমার মুরগি ঘর ঠিকঠাক আছে তো? ওরা কেন অমন গা মোড়ামুড়ি দিচ্ছে? কিসের অস্বস্তি ওদের? রাতে শুতে যাবার আগে আর একবার দেখি সব ঠিকঠাক আছে তো? কেমন যেন মনে হচ্ছে, যতই সাবধান হই একটা কাঁনাচ আলগা হয়ে গেছে, পচে গেছে ওদিকের তারগুলো। কী হবে? এখন কী হবে?"[৮]

হ্যাঁ, সত্যিই রাধার মুরগিঘর আলগা হয়েছে। প্রণব দেশে ফিরে জানায়, সে ডিভোর্স চায়। কারণ, প্রণব তাঁর সেক্রেটারি শ্যারন রবিনসনকে নিয়ে চার বছর ধরে থাকছে। শ্যারন সন্তান সম্ভবা। এখন কোর্টের বাইরে প্রণব মিউচুয়াল ডিভোর্স চায় আর রাধাকে মাসোহারা বাবদ দিতে চায় কুড়ি হাজার টাকা। প্রণব তার এই সিদ্ধান্তকে যুক্তিগ্রাহ্য করতে বলে--

> "এখন সাফল্যের ঠিক কোন চূড়ায় আমি উঠেছি তুমি কল্পনাতেই আনতে পারবে না। এই সমস্ত সময়টা আমি আস্তে আস্তে বদলেছি, কাজটা, সাফল্যটা তার নিজের প্রয়োজনমতো আমায় বদলে নিয়েছে। তুমি কিন্তু থেকে গেছো সেই একই জায়গায়। একটা সেভেনস্টার রিসোর্টের নিজস্ব বিচে বা লাউঞ্জে তোমায় আর মানাবে না।"[৯]

না, প্রণব রাধাকে বঞ্চিত করে শ্যারণকে বিয়ে করতে পারেনি। প্রোমোটার সমীরণ বাবুর বুদ্ধিমত্তায় ই-মেইলে শ্যারণের যে চিঠি আসে তাতেই প্রমাণিত হয়ে যায় প্রণব প্রতারক। এছাড়াও মানসিক নির্যাতনের অভিযোগে ৪৯৮ ধারায় প্রণব জেলে যায়- তার পাসপোর্ট ভিসা সব বাজেয়াপ্ত হয়। প্রণবকে রাধা আর কোনদিনই স্বামী

হিসেবে মেনে নিতে পারবে না। এতে তার অস্বস্তি থাকলেও অশান্তি নেই। কারণ, প্রতারিত হবার ভয় তাকে আর পিছু তাড়া করে না।

'শৃগাল কাহিনী' আদ্যন্ত এক বাস্তবতার কাহিনী। পরিশ্রম আর বুদ্ধিমত্তা দিয়ে রাধা তার নিজের জায়গা তৈরি করে নিয়েছে। শুধুমাত্র খোরপোস হিসেবে প্রণবের কুড়ি হাজার টাকার অনুকম্পা সে নিতে চায় না। বরং নিজের পায়ে নিজের মত করে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়। তবে প্রোমোটার সমীরণবাবু এবং অন্যদের সহযোগিতায় প্রণবের জেল হওয়ায় তাকে নিষ্ফলভাবে মাথা কুটতে হয়নি। তার অসম্মানিত আত্মমর্যাদা কিছুটা হলেও স্বস্তি পেয়েছে।

বাণী বসুর যে গল্প ত্রয়ী নিয়ে এখানে আলোচনা করা হ'ল তার মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন এই কালের নারীর প্রতিবাদী কন্ঠস্বর ধ্বনিত হয়েছে, আরেকদিকে তেমনি ছোট গল্পকার বাণী বসুর লিখন শৈলীর বলিষ্ঠতাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একজন নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে নারীর সমস্যার চিত্রায়ণ এবং পরিস্থিতির সম্ভাব্য নিয়ন্ত্রণ বাণী বসু যেভাবে দেখিয়েছেন তাতে গল্পগুলি এক নতুন মাত্রা পেয়েছে। একালের নারীর মধ্যে সমঝোতার পরিবর্তে প্রতিবাদের বলিষ্ঠতা শুধুমাত্র গল্পগুলিকে নয় পাঠককেও মানসিকভাবে দৃঢ় চেতনায় প্রদীপ্ত করতে সহায়ক হবে।

তথ্যসূত্র:

১. সংবাহ, গল্প সমগ্র, ৪র্থ খন্ড, বাণী বসু, পৃষ্ঠা ২৬৫
২. তদেব, পৃষ্ঠা ২৭৪
৩. চুপি মাকড়সার জাল, গল্পসমগ্র,৪র্থ খন্ড, বাণী বসু, পৃষ্ঠা ২৪১
৪. তদেব, পৃষ্ঠা ২৪৩
৫.তদেব, পৃষ্ঠা ২৪৩
৬. তদেব, পৃষ্ঠা ২৪৪
৭. শৃগাল কাহিনী, গল্প সমগ্র,৪র্থ খন্ড, বাণী বসু, পৃষ্ঠা ৩৩৪
৮. তদেব, পৃষ্ঠা ৩৪১
৯. তদেব, পৃষ্ঠা ৩৪৩

বৌদ্ধ দুঃখ মুক্তিমার্গ : একটি দার্শনিক বিশ্লেষণ

উজ্জ্বল হালদার
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
রামানন্দ সেন্টিনারী কলেজ, পুরুলিয়া,পশ্চিমবঙ্গ

সারসংক্ষেপ: গৌতমবুদ্ধ ছিলেন নীতি ধর্মের প্রবর্তক এবং সংস্কারক। মানুষের জরা, মরণ, দুঃখ,কষ্ট থেকে নিবৃত্তি দেওয়াই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। তিনি তত্ত্বালোচনার বিরোধী ছিলেন। বৌদ্ধ দর্শনে মানুষের দুঃখ জর্জরিত অবস্থা থেকে মুক্তি লাভই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। দুঃখ থেকে মুক্তির জন্য বৌদ্ধ দর্শনে চারটি আর্যসত্যের কথা বলা হয়েছে। এই চারটি আর্যসত্য সম্পর্কে জ্ঞানলাভ হলে মানুষ জগৎ ও জীবন সম্পর্কে সম্যক্ জ্ঞানলাভ করবে এবং দুঃখ থেকে নিবৃত্তি পাবে। এই চারটি আর্য সত্যের মধ্যেই বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শনের মূল কথা লুকিয়ে আছে। মানুষের চারটি আর্য সত্যের জ্ঞান না থাকায় মানুষ চক্রাকারে আবর্তীত হয়ে জন্মের পর মৃত্যু আবার মৃত্যুর পর পুনঃরায় জন্ম গ্রহন করে জীবনে অশেষ দুঃখভোগ করছে। চার্বাক ব্যতীত অন্যান্য সকল দর্শন সম্প্রদায় দুঃখ এবং তার প্রকার নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং সেই দিক গুলিও এই প্রবন্ধে অলোচিত হয়েছে।

মূল শব্দ: অবিদ্যা, দুঃখ, আর্যসত্য, দ্বাদশ নিদান, নির্বাণ, অষ্টাঙ্গিক মার্গ।

গৌতমবুদ্ধের বাণী ও উপদেশের উপর ভিত্তি করে যে মতবাদ গড়ে উঠেছে, তাই হল বৌদ্ধ দর্শন। গৌতম বুদ্ধের জন্ম খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ট শতাব্দীতে হিমালয়ের পাদদেশে কপিলাবস্তু নগরের রাজপরিবারে। তাঁর আদি নাম ছিল গৌমত বা সিদ্ধার্থ। রাজকীয় ঐশ্বর্যের মধ্যে লালিত পালিত হলেও ছোট থেকেই তিনি ছিলেন চিন্তাশীল এবং বৈরাগ্যভাবাপন্ন। মানব জীবনে জরা, মরণ, ব্যাধি দেখে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন এই মানব জীবন দুঃখভরা। দুঃখের কারণ নির্ণয় এবং দুঃখের নিবৃত্তির উপায় অন্বেষণে অধীর হয়ে উঠেছিলেন। তিনি তাঁর রাজকীয় জীবন-যাপন, স্ত্রী, পুত্র ছেড়ে সন্ন্যাস গ্রহন করেছিলেন। সন্ন্যাস জীবনের প্রথম অবস্থায় অনেক ধর্মপ্রবণ ব্যক্তির কাছে শরণাপন্ন হন কিন্তু তাঁকে কেউ দুঃখ নির্বাণের সঠিক পথ দেখাতে পারিনি। অবশেষে তিনি নিজে আত্মশক্তির উপর ভর করে বোধি বৃক্ষতলে তপস্যা করেন এবং অবশেষে জগতে দুঃখের রহস্য এবং তার স্বরূপ সম্পর্কে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করেন।

গৌতমবুদ্ধ তত্ত্বচর্চার বিরোধী ছিলেন। এ জগৎ নিত্য না অনিত্য, পরম সত্ত্বা কি? সৃষ্টি কর্তা বলে কেউ আছেন কিনা প্রভৃতি তত্ত্বালোচনা মানুষের দৈনন্দিন জীবন সমস্যার সমাধানে সেইভাবে কাজে লাগে না। গৌতমবুদ্ধের জীবনে চরম ও পরম লক্ষ্য ছিল মানুষের জীবনের দুঃখ দুর্দশা মোচন করা। তিনি একটি উদাহরণের সাহায্যে

বলেন, শরবিদ্ধ ব্যক্তির দেহ থেকে শরটিকে তুলে না নিয়ে, তার জায়গায় যদি ঐ শরটি কোথা থেকে এল, কে নিক্ষেপ করলো – এই রকম চিন্তা করা হয় তাহলে ঐ ব্যক্তির যন্ত্রণা দূর হবে না। তাই এক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তির দেহ থেকে শর মুক্ত না করে শরতত্ত্ব বিচার করা অত্যন্ত মূর্খতার পরিচয় হবে, ঠিক সেইভাবে মানব জীবনের মূল যে সমস্যা তার নিরসন না করে তত্ত্বালোচনা বোকামির পরিচয় হবে। গৌতমবুদ্ধ তাঁর কঠোর সাধনার দ্বারা যে চারটি সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন তা আর্য সত্য নামে খ্যাত। এই চারটি আর্য সত্য হল, মানব জীবনে – (ক) দুঃখ আছে, (খ) দুঃখের কারণ আছে, (গ) দুঃখের নিবৃত্তি আছে এবং (ঘ) দুঃখ নিবৃত্তির পথও আছে।

জগৎ ও জীবন যে দুঃখময় ভারতীয় সকল দার্শনিক সম্প্রদায় তা অস্বীকার করেন না। ভারতীয় সকল দর্শন সম্প্রদায়ই দুঃখের অস্তিত্ব স্বীকার করেন এবং দুঃখের প্রকার নিয়ে আলোচনা করেছেন। উপনিষদে সৎ-চিৎ-আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্ম ব্যতীত সবই দুঃখময়। আবার ভগবত গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জগৎকে দুঃখের আলয় বলেছেন।[১] সাংখ্য দর্শনে বলা হয়েছে- "অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ[২] অর্থাৎ ত্রিবিধ দুঃখের যে অত্যন্ত নিবৃত্তি, তাহাই অত্যন্ত অর্থাৎ পরম পুরুষার্থ নামে অভিহিত হয়ে থাকে। এই ত্রিবিধ দুঃখ হল আধ্যাত্মিক , আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক । আধ্যাত্মিক দুঃখ বলতে নিজের দেহ মন থেকে যে দুঃখ আসে যথা- বায়ু, পিত্তাদি কূপিত হলে বা কাম, ক্রোধ, লোভ, আসক্তি ইত্যাদির দ্বারা তাড়িত হলে আমরা যেসব দুঃখ ভোগ করি সেইগুলিকে বোঝানো হয়েছে। আধিভৌতিক দুঃখ বলতে বহিরাগত দুঃখকে বোঝানো হয়েছে। মানব, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ এবং জড়বস্তু থেকে যে দুঃখ পাওয়া হয় তাই হল আধিভৌতিক দুঃখ। আধিদৈবিক দুঃখও বহিরাগত। ভূত, প্রেত, ভূমিকম্প প্রভৃতি অলৌকিক কারণ জাত যে দুঃখ তাই হল আধিদৈবিক দুঃখ। মানুষ এ জীবনে যে দুঃখভোগ করে তা এই ত্রিবিধ দুঃখের মধ্যে কোন না কোন একটি দুঃখ থাকবে।

পাতঞ্জল যোগ দর্শনেও দুঃখের কারণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- "পরিণামতাপসংস্কার দুঃখৈর্গুণবৃত্ত্যবিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ"[৩] অর্থাৎ পরিণাম দুঃখ, তাপদুঃখ, সংস্কার দুঃখের দ্বারা সম্পৃক্ত বলে ও ত্রিগুণের বৃত্তি সর্বত্র থাকায় বিবেকী ব্যক্তিগণ সকল বস্তুকেই দুঃখময় বলে মনে করেন। সুখভোগের পর যে অবসাদ আসে তা হল পরিণাম দুঃখ। সুখভোগকালে নিজের সুখের থেকে অপরের সুখ বেশি, এরূপ উপলব্ধিই হল তাপ দুঃখ। সুখভোগের পর সংস্কার থেকে যায়, আর এই সংস্কারের জন্য আবার পুনঃরায় সুখলাভ করবার জন্য চেষ্টা করলেই তা পাওয়া যায় না, আর এটাই হল সংস্কার দুঃখ। সকল সুখকর অবস্থাতেই সত্ত্ব, রজঃ, ও তমো – এই তিনগুণের বৃত্তি রয়েছে। সত্ত্বরূপ সুখের সঙ্গে রজোরূপী দুঃখ ও তমোধর্ম মোহ মিশ্রিত রয়েছে বলে সব কিছু দুঃখময়।

ন্যায় দর্শনে দুঃখের লক্ষণে বলা হয়েছে- "বাধনালক্ষণং দুঃখম্"[৪] (ন্যায়সূত্র ১/১/২১) অর্থাৎ বাধনা বলতে পীড়া বা তাপকে বোঝায়। অর্থাৎ ন্যায় মতে, দুঃখের অনুষঙ্গরূপে যা আছে তাই হল দুঃখ। যেখানে সুখ আছে সেখানে দুঃখও থাকে – এভাবে সুখমাত্রে দুঃখের অবিনাভাব বা ব্যাপ্তিরূপ সম্বন্ধই দুঃখানুসঙ্গ । একুশ প্রকার দুঃখের কথা বলেছেন উদ্দ্যোতকর। এগুলি হল- শরীর, ছয় প্রকার ইন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জ্বিহা, ত্বক এবং মন), ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ছয় প্রকার বিষয় (রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ ও যোগ্য আত্মগুণ), ছয় প্রকার বিষয়ের ছয় প্রকার প্রত্যক্ষ, সুখ এবং মুখ্য দুঃখ। জীবের শরীর তার সমস্ত দুঃখের অধিষ্ঠান হওয়ায় সমস্ত দুঃখের নিমিত্ততারূপ দুঃখানুসঙ্গ শরীরে থাকে। আবার দুঃখের সাধন ইন্দ্রিয় সমূহে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহে এবং এইসব বিষয়ক জ্ঞানসমূহে দুঃখের সাধনত্বরূপ দুঃখানুসঙ্গ থাকায় এগুলিও দুঃখরূপে গণ্য করা হয়। যেখানেই সুখ থাকে সেখানেই দুঃখ থাকে। সুতরাং এই সুখও একপ্রকার দুঃখ।[৫]

বৈশেষিক দর্শনে দুঃখের লক্ষণে বলা হয়েছে- "উপঘাত লক্ষণং দুঃখম্"[৬]। এখানে উপঘাত বলতে দুঃখানুভূতিকে বোঝান হয় । তাই দুঃখ হল উপঘাত লক্ষণ। আগেই বলা হয়েছে, দুঃখ পীড়া জনক, তাই মানুষের পক্ষে তা অনুকূল নয়। ভারতীয় দর্শনে চার্বাক ব্যতীত সকল সম্প্রদায়ই জগতে জীবের বদ্ধাবস্থা স্বীকার করেছেন এবং জগতে দুঃখের অবস্থাও স্বীকার করেছেন। বদ্ধাবস্থায় জীবের অনাবিল সুখ শান্তি সম্ভব নয়। জন্মজনিত জীবের নানা রকম দুঃখ কষ্টভোগকেই বন্ধন বলা হয়। জৈন মতে, জীবের বা আত্মার বন্ধন বলতে বোঝায় কর্মের বন্ধন । কর্মের জন্যই আত্মার বদ্ধ অবস্থা সূচিত হয়। আত্মায় যখন কর্ম প্রবেশ করে, তখন তারই প্রয়াসে বিভিন্ন প্রকার কামনা বাসনার উৎপন্ন হয় এবং জীবের বদ্ধাবস্থা শুরু হয়। মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শনেও আবিদ্যা জনিত জীবনকে দুঃখময় বলা হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধের শব্দ সংখ্যার কথা স্মরণে রেখে দুঃখ সম্পর্কে অন্যান্য ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ের মত বিস্তারিত আলোচনা না করে মূল বিষয়ের আলোচনা করা হল। বৌদ্ধ দর্শনে দুঃখ মুক্তিমার্গে চারটি আর্য সত্যের কথা বলা হয়েছে।

প্রথম আর্যসত্য – দুঃখঃ গৌতমবুদ্ধের মতে জগৎ ও জীবন দুঃখময়। জন্ম, জরা, রোগ, শোক, ব্যাধি এবং মৃত্যু মানব জীবনের নিত্য সঙ্গী। মানুষের জীবন জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দুঃখে পরিপূর্ণ। বৌদ্ধ দর্শনে বলা হয়েছে –

"দুঃখং সংসারিণঃ স্কন্ধাস্তে চ পঞ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ ।
বিজ্ঞানং বেদনা সংজ্ঞা সংস্কারো রূপমেব চ।।"[৭]

অর্থাৎ সাংসারিগণের দুঃখই স্কন্ধ। এই স্কন্ধ পঞ্চবিধ বলিয়া পবিকীর্ত্তিত আছে। যথা- বিজ্ঞানস্কন্ধ, বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ ও রূপস্কন্ধ। এই স্কন্ধগুলি কি জেনে

নেওয়া যাক্ –(ক) রূপস্কন্ধঃ পৃথিবী, জল, বায়ু এবং অগ্নি – এই চারটি মহাভূত রূপউপাদানস্কন্ধ। (খ) বেদনাস্কন্ধঃ আমরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু এবং তার বিচারের সংস্পর্শে আসার পর যে সুখ দুঃখ বা অ-সুখ-দুঃখ অনুভব করি তাকেই বেদনাস্কন্ধ বলে। (গ) সংজ্ঞাস্কন্ধঃ বেদনার পরে আমাদের মস্তিষ্কে আগে থেকেই অঙ্কিত সংস্কারের দ্বারা আমরা যা কিছু জানতে বা চিনতে পারি তাকেই সংজ্ঞাস্কন্ধঃ বলে। (ঘ) সংস্কারস্কন্ধঃ রূপ, বেদনা ও সংজ্ঞা প্রভৃতি মানসিক বৃত্তির যে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা আমাদের মস্তিষ্কের উপর রেখাপাত করে ও যা আমাদের ভবিষ্যৎ জ্ঞানের সহায়ক হয় তাই সংস্কারস্কন্ধ। (ঙ)বিজ্ঞানস্কন্ধঃ চেতনা বা মনকে বিজ্ঞানস্কন্ধ বলে। এই পঞ্চস্কন্ধ যখন তৃষ্ণার বিষয় হয়ে ব্যক্তির সান্নিধ্যে আসে তখন তাদের উপাদানস্কন্ধ বলে। বুদ্ধ এই পাঁচটি স্কন্ধকে দুঃখরূপ বলেছেন।[৮]

দ্বিতীয় আর্যসত্য- দুঃখ সমুদয়ঃ গৌতমবুদ্ধ সংসারে দুঃখ আছে প্রথম সত্য আলোচনার পর দ্বিতীয় আর্যসত্য দুঃখের কারণ প্রসঙ্গে বলেন, এ সংসারে কোনকিছু বিনাকারণে ঘটে না, সবকিছুই কোন না কোন কারণের উপর নির্ভর করে। তাই দুঃখ যখন আছে তখন সেই দুঃখের কারণও থাকবে। গৌতমবুদ্ধ যে স্বাভাবিক কার্য-কারণ নিয়মে বিশ্বাসী সেই নিয়মকে তিনি ‘প্রতীত্যসমুৎপাদ’ বলতেন। এই প্রতীত্যসমুৎপাদ নিয়ম অনুসারেই তিনি দুঃখের কারণ নির্ণয় করেছেন। দুঃখের কারণ নির্ণয় প্রসঙ্গে গৌতমবুদ্ধ একটি কার্য-কারণ নিয়ম শৃঙ্খলের কথা বলেছেন। এই কার্য-কারণ নিয়ম শৃঙ্খল পরস্পর সম্বন্ধ যুক্ত। এই কার্য-কারণ নিয়ম শৃঙ্খল হল-(ক) অবিদ্যা হতে উদ্ভুত হয়, (খ) সংস্কার (শুভ–অশুভ কর্ম প্রবণতা); সংস্কার হতে, (গ) বিজ্ঞান (মাতৃগর্ভস্থিত প্রাথমিক চেতন); বিজ্ঞান হতে, (ঘ) নাম-রূপ বা দেহমন; নাম-রূপ হতে, (ঙ) ষড়ায়তন (ছটি ইন্দ্রিয়); ষড়ায়তন হতে, (চ) স্পর্শ (ইন্দ্রিয় বিষয় সংযোগ); স্পর্শ হতে, (ছ) বেদনা (ইন্দ্রিয় বিষয় সংযোগের ফলে উৎপন্ন সুখ-দুঃখের অনুভূতি); বেদনা হতে, (জ) তৃষ্ণা; তৃষ্ণা হতে, (ঝ) উপাদান (আসক্তি); উপাদান হতে, (ঞ) ভব (জন্মের আকাঙ্খা); ভব হতে, (ট) জাতি (জন্ম); জাতি হতে এবং (ঠ) জরামরণাদি দুঃখ । এই কার্য-কারণ শৃঙ্খলে দ্বাদশ অঙ্গ থাকায় একে ‘দ্বাদশ নিদান’ বলা হয়। এই দ্বাদশ নিদান কার্য-কারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে চক্রাকারে মানুষের জীবনে জন্ম-মৃত্যু-জন্মান্তর আবর্তীত হয়ে চলছে বলে একে ‘ভবচক্র’ বলা হয়।[৯]

বৌদ্ধগণ দ্বাদশ নিদান বা ভবচক্রকে ত্রিকাল হিসাবে ভাগ করেন। মানুষের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ জীবন কার্য-কারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ। বর্তমান জীবন অতীত জীবনের ফল এবং ভবিষ্যৎ জীবন বর্তমান জীবনের ফল। এই দ্বাদশ নিদানে অতীত জীবনে ছিল অবিদ্যা এবং সংস্কার। বর্তমান জীবনে থাকে বিজ্ঞান, নাম-রূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান এবং ভব। ভবিষ্যৎ জীবনে থাকবে জাতি ও জরামরণ।[১০]

তৃতীয় আর্যসত্য- দুঃখ নিরোধঃ বৌদ্ধ মতে দুঃখের নিবৃত্তি সম্ভব। বৌদ্ধমতে দুঃখ যদি কারণ জন্য হয় তাহলে কারণের উচ্ছেদ করলে কার্যেরও উচ্ছেদ হয়। বৌদ্ধ দর্শনে দুঃখের মূল কারণ হল অবিদ্যা। তাই অবিদ্যাকে দূর করতে পারলে দুঃখের নিবৃত্তি করা যাবে। আর্যসত্যের অবিরত চিন্তার দ্বারা তৃষ্ণা বা বাসনাকে জয় করা যায়। ভোগবাসনা নিবৃত্ত হলে সংসার বন্ধন শিথিল হয়, ফলে পুনঃজন্মের প্রবণতা বিলুপ্ত হয়, ফলে দুঃখের নিবৃত্তি হয়। বুদ্ধদেবের মতে 'নির্বাণ' হল অবিদ্যা বিনাশে দুঃখ মুক্তির অবস্থা। বৌদ্ধ দর্শনে নির্বাণ প্রাপ্ত ব্যক্তিকে 'অহৎ' বলা হয়। নির্বাণ সম্পর্কে বৌদ্ধ দর্শনে চারটি অভিমত পাওয়া যায়। এই চারটি অভিমত হল- (ক) নির্বাণ হল অবলুপ্তি, (খ) নির্বাণ হল শাশ্বত আনন্দময় অবস্থা, (গ) নির্বাণ হল অনির্বচনীয় অবস্থা এবং (ঘ) নির্বাণ হল শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয় অবস্থা।[১১] তবে এই চারটির মধ্যে গৌতমবুদ্ধ তৃতীয় অভিমতটিকেই যুক্তি যুক্ত বলেছেন, কেননা শিষ্যরা নির্বাণ সম্পর্কে বুদ্ধদেবকে কোন প্রশ্ন করলে তিনি সম্পূর্ণ নিরব থেকেছেন। অর্থাৎ নির্বাণ হল এমন এক অবস্থা যা বুদ্ধিগম্য নয়, জাগতিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে, জাগতিক ভাষার মাধ্যমে, বুদ্ধি-অগম্য নির্বাণের স্বরূপ ব্যাখ্যা করা যায় না। নির্বাণ এক তুরীয় অবস্থা, যাকে সৎ অথবা অসৎ কিছুই বলা যায় না। নির্বাণ হল অবর্ণনীয়।

চতুর্থ আর্যসত্য - দুঃখ নিরোধমার্গঃ বৌদ্ধ দর্শনে দুঃখ মুক্তির উপায়রূপে অষ্টাঙ্গিক মার্গের কথা বলা হয়েছে। এই অষ্টাঙ্গিক মার্গ অসংযতভোগবিলাস এবং কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যবর্তী পন্থা। এই অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলনের মাধ্যমে সন্ন্যাসীদের ন্যায় সাধারণ মানুষও দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারবে। এই অষ্টাঙ্গিক মার্গের মধ্যেই বৌদ্ধ নীতিতত্ত্ব নিহিত আছে। এই অষ্টাঙ্গিক মার্গ নিম্নে আলোচনা করা হল –

(ক) সম্যক্ দৃষ্টিঃ চারটি আর্যসত্য সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান হল সম্যক্ দৃষ্টি। অবিদ্যা হল যাবতীয় দুঃখের কারণ। সম্যক্ দৃষ্টির মাধ্যমে অবিদ্যাকে দূর করে জগৎ ও জীবনের স্বরূপ উপলব্ধি হয়।

(খ) সম্যক্ সঙ্কল্পঃ রাগ, দ্বেষ, প্রতিহিংসাবিহীন সঙ্কল্পকেই সম্যক্ সঙ্কল্প বলা হয়। সম্যক্ দৃষ্টি কেবলমাত্র জীবকে দুঃখ থেকে মুক্তি দিতে পারে না। মুক্তিকামী ব্যক্তিকে ভোগ-তৃষ্ণা পরিহার করতে হবে, অন্যের প্রতি বিদ্বেষ বর্জন করতে হবে এবং অন্যের ক্ষতি সাধন থেকে বিরত থাকতে হবে।

(গ) সম্যক্ বাক্ঃ সম্যক্ সঙ্কল্পের জন্য বাক্ সংযম দরকার। মিথ্যা কথা, কটু কথা, অসার কথা, পরনিন্দা প্রভৃতি বর্জন করাই হল সম্যক্ বাক্।

(ঘ) সম্যক্ কর্মান্তঃ কেবল বাক্য সংযত থাকলেই হবে না, সংযত আচরণেরও প্রয়োজন। অহিংসা, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, সত্য ও মাদক দ্রব্য বর্জন – এই পঞ্চশীল সম্যক্ কর্মান্তের অন্তর্গত।

(ঙ) সম্যক্ আজীবঃ সৎ ভাবে জীবন যাপন করাই হল সম্যক্ আজীব। মিথ্যা ভাষণ ও অন্যায় আচরণ বর্জন করে সৎভাবে জীবন যাপন করাই হল সম্যক্ আজীব।

(চ) সম্যক্ ব্যায়ামঃ মন থকে কুচিন্তা বর্জন করে সুচিন্তার আগমন ঘটানো হল সম্যক্ ব্যায়াম। এই সম্যক্ ব্যায়াম চার প্রকার। যথা- কুচিন্তার বিনাশ সাধন করা, কুচিন্তার উৎপত্তির নিবারণ করা, সদ্ চিন্তার সংরক্ষণ ও সংবর্ধন করা এবং সদ্ চিন্তার উৎপাদনের জন্য সচেষ্ট হওয়া।[১২]

(ছ) সম্যক স্মৃতিঃ সম্যক্ স্মৃতি বলতে বৌদ্ধ দর্শনে বোঝায় জগৎ ও জীবনের অনিত্যতা, দেহ ও মনের অনিত্যতা, আত্মা বলে কোন সত্তা নেই – এগুলিকে স্মরণে রাখায় হল সম্যক্ স্মৃতি।

(জ) সম্যক্ সমাধিঃ সাধক উপরিউক্ত সাতটি কর্মবিধি সঠিকভাবে অনুসরণ করলে সবরকম অসদ্ ভাবনা বা কুচিন্তা থেকে নিজেকে মুক্ত করবে, ফলে আচরণ সংযত হবে, ইন্দ্রিয়াদি বশীভূত হবে। সমাধির মাধ্যমে নির্বাণ লাভের মধ্যে দিয়ে সাধকের দুঃখের চিরনিবৃত্তি ঘটবে। তাই বৌদ্ধ দর্শনে বলা হয়-“সমাহিতো যতাভূতং পজানাতি”[১৩] অর্থাৎ সমাধিপরায়ণের যতার্থ জ্ঞানের উদয় হয়। ধ্যান দ্বারা প্রজ্ঞার পূর্ণতা সাধিত হয়। সমাধি মানসিক বিক্ষেপ ও চঞ্চল্যকে অপসারিত করে।

সমাধির চারটি স্তর থাকে । প্রথমস্তরে চারটি আর্যসত্যের মর্মটিকে সাধক উপলব্ধি করেন। এই আর্য সত্যের বিচার বিশ্লেষণের ফলে সাধক আনন্দানুভূতির অধিকারী হন। দ্বিতীয়স্তরে বিচার বিতর্কের কোন স্থান থাকে না, এই স্তরে সাধকের আনন্দানুভূতি আরো গভীর হয়। তৃতীয়স্তরে সাধকের আত্ম চেতনা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়না, কিন্তু এই স্তরে সুখানুভূতি ও আনন্দের প্রতি ঔদাসিন্য দেখা যায়। চতুর্থস্তরে সাধকের কোন সুখ-দুঃখের অনুভূতি থাকে না। এই স্তরে সাধক পূর্ণ শান্তি ও সমতার অধিকারী হন। সাধক এখানে পূর্ণ প্রজ্ঞার অধিকারী হয়।

এই মার্গগুলিকে শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা – এই তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়। অষ্টাঙ্গিক মার্গের সম্যক্ দৃষ্টি ও সম্যক্ স্মৃতি প্রজ্ঞা অর্থাৎ যতার্থ জ্ঞানের অন্তর্গত। সম্যক্ সমাধি ধ্যানের অন্তর্গত। আর বাকি অঙ্গগুলি শীল অর্থাৎ সদাচরণের অন্তর্গত।

আলোচ্য প্রবন্ধের শেষপ্রান্তে এসে বলা যায়, গৌতমবুদ্ধ তাঁর বাণী ও উপদেশাবলীর মাধ্যমে মানুষের ব্যবহারিক জীবনে নিদারুণ দুঃখের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য অক্লান্ত চেষ্টা করেছেন। সংসারী মানুষও নিজ চেষ্টায় দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারবে। গৌতমবুদ্ধ অষ্টাঙ্গিক মার্গে মধ্যমপন্থার উপদেশ দিয়েছেন। কঠোরভাবে আত্মনিয়ন্ত্রণ যেমন কষ্টের, তেমনি চূরান্ত সম্ভোগও কষ্টের। তাই এই দুয়ের মধ্যবর্তী পথ বেছে নিতে হবে। ব্যক্তি যেমন নিজের দুঃখের জন্য নিজেই দায়ী, তাই নিজেকেই দুঃখ মুক্তির জন্য সচেষ্ট হতে হবে। দুঃখ মুক্তির জন্য ঈশ্বরের কৃপা প্রার্থনা করা

অর্থহীন। দুঃখ মুক্তির জন্য সাধকের তাই দৃঢ় সঙ্কল্প এবং সাধনা দরকার। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে অনন্তসূর্যশক্তি। বৌদ্ধ দর্শনে তাই বলা হয়েছে- 'আত্মদীপোভবঃ' অর্থাৎ তুমি আপন দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হও। এই আশার বাণীর মাধ্যমে গৌতমবুদ্ধ সারা বিশ্বে মানুষকে আত্ম শক্তির জাগরণ ঘটিয়েছিলেন।

তথ্যসূত্র:

১. চৌধুরী, অর্জুনবিকাশ, ভারতীয় দর্শন, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা, ১৯৯৭, পৃঃ১১

২. মহর্ষি কপিল, সাংখ্য দর্শন(সাংখ্য প্রবচন-সূত্র), অনুবাদকঃ উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বসুমতি সাহিত্য মন্দির, কোলকাতা, ১৯৯৭, পৃঃ ১

৩. চক্রবর্তী, সত্যজ্যোতি, সায়ণ মাধবীয় সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ, (দ্বিতীয় খন্ড), সাহিত্যশ্রী, কোলকাতা, ১৪২২, পৃঃ ১৪০

৪. মহর্ষি গৌতম, ন্যায় দর্শন, (প্রথম খন্ড), অনুবাদকঃ ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, বঙ্গিয়-সাহিত্য-পরষৎ, কোলকাতা, ১৩২৪, পৃঃ ১৯১

৫. শ্রীকেশবমিশ্র, তর্কভাষা, অনুবাদকঃ ড. গঙ্গাধর কর ন্যায়াচার্য, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কোলকাতা, ২০০৯, পৃঃ ৪৬৬

৬. প্রসস্তপাদাচার্যা, প্রসাস্তপাদভাষ্য, (দ্বিতীয় খন্ড), অনুবাদকঃ দন্ডিস্বামী দামোদরাশ্রম, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কোলকাতা, পৃঃ ৪৩১

৭. চক্রবর্তী, সত্যজ্যোতি, সায়ণ মাধবীয় সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ, (প্রথম খন্ড), সাহিত্যশ্রী, কোলকাতা, ১৪২১, পৃঃ ৬৯

৮. রাহুল সাংকৃত্যায়ন, বৌদ্ধ দর্শন, অনুবাদকঃ শ্রীধর্ম্মাধার মহাস্থবির, বৌদ্ধ ধর্ম্মাঙ্কুর বিহার, কোলকাতা, ১৩৬৩, পৃঃ ০৬

৯. বাগচী, দীপক কুমার, ভারতীয় দর্শন, প্রগতিশীল প্রকাশক, কোলকাতা, ২০১০, পৃঃ ৮৬

১০. চট্টোপাধ্যায়, শ্রী সতীশচন্দ্র, ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কোলকাতা, ১৯৬৩, পৃঃ ৪৯

১১. ভট্টাচার্য, ড.সমরেন্দ্র, ভারতীয় দর্শন, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা, ২০১৮, পৃঃ ১৩৩

১২. ঘোষ, পীযুষকান্তি এবং সেনগুপ্ত, প্রমোদবন্ধু, নীতিবিদ্যা, ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কোলকাতা, ২০০৯-১০, পৃঃ ৩৯

১৩. পন্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির, বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন, সম্পাদনঃ ডঃ সুকোমল চৌধুরী, ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, কোলকাতা, ১৪০৪, পৃঃ ৬৭

চৈতন্যোত্তর গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের অনুসারী বৈষ্ণব ধর্মসম্প্রদায়: শান্তিপুর গোষ্ঠী

অসীম বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, সুবর্ণরেখা মহাবিদ্যালয়,
গোপীবল্লভপুর, ঝাড়গ্রাম

সারসংক্ষেপ : পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব বাংলা তথা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়ের সূচনা করে। শ্রীচৈতন্য সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণি এবং নারীর অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে সাধারণ মানুষের মুক্তির পথ দেখিয়েছিলেন। সমাজের অবহেলিত, নিষ্পেষিত, শোষিত,উৎপীড়িত ও অত্যাচারিত মানুষের বন্ধন মুক্তির রক্ষাকর্তা হিসাবে তিনি মানুষকে সচেতন করেছিলেন। আর সেই সচেতনতার পথ ধরেই মানুষের স্বাধীনতার নতুন সোপান রচিত হয়েছিল। কিন্তু শ্রীচৈতন্য জীবিত থাকাকালীন সময়ে ষোড়শ শতকের শুরু থেকেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে নানা বিভেদ ও অন্তঃরায়ের বাতাবরণ তৈরি হতে শুরু করেছিল। নেতৃত্বের প্রশ্ন এবং ধর্মকে পরিচালিত করার পন্থাকে কেন্দ্র করে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মধ্যে সম্পর্কে টানাপড়েনে ফাটল ধরতে থাকে। এরফলে অভিন্ন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের কেন্দ্রীয় চরিত্র বিঘ্নিত হতে থাকে।তার স্থলে ক্ষুদ্র-বৃহৎ-মাঝারি বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সমান্তরালে অনুসারী ধর্মগোষ্ঠী হিসাবে। চৈতন্যের তিরোধানের পরবর্তীতে, তাঁর বর্তমান থাকাকালীনসময়ে থেকেই নেতৃত্ব এবং পরবর্তীকালের নেতৃত্বের মধ্যে বিভেদ ও সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ে এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের অভ্যন্তরেই নেতৃত্ব ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কারণে অসংখ্য দল-উপদল, গোষ্ঠী-উপগোষ্ঠী, শাখা-উপশাখা এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়-উপসম্প্রদায় গড়ে ওঠে। এই সময়ে গড়ে ওঠা একটি অন্যতম বৈষ্ণব সম্প্রদায় হল অদ্বৈত আচার্যের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা শান্তিপুর গোষ্ঠী। অবিভক্ত নদিয়ার শান্তিপুর, মালদার তেওতা, জঙ্গলিটোলা প্রভৃতি অঞ্চলকে কেন্দ্র করে নদিয়া নাগর অদ্বৈত আচার্য এবং তাঁর স্ত্রী সীতাদেবী ও পুত্র অচ্যুতানন্দের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা শান্তিপুর গোষ্ঠী পরবর্তীকালে বৈষ্ণব সমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করে। পৃথক গোষ্ঠী হিসাবে খড়দহ গোষ্ঠী বা নিত্যানন্দ সম্প্রদায়ের সঙ্গে শান্তিপুর গোষ্ঠী বা অদ্বৈত আচার্যের গোষ্ঠীর সঙ্গে বিরোধ একসময়ে তুঙ্গে ওঠে। শুরু হয় উভয় দলের মধ্যে তুমুল তরজা। এর ফলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং শ্রীচৈতন্যধর্ম বিভিন্ন অঞ্চল, তীর্থ, শ্রীপাটকে কেন্দ্র করে পরবর্তী কয়েক শতক আবর্তিত হতে থাকে।এতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের কেন্দ্রীয় শক্তি ও ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে। আমি

আমার গবেষণাপত্রের মাধ্যমে চৈতন্য পরবর্তীকালে বাংলার অন্যতম গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের অনুসারী বৈষ্ণব গোষ্ঠী শান্তিপুর গোষ্ঠী সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি।

সূচকশব্দ: গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম, অনুসারী, সমান্তরাল, শান্তিপুর গোষ্ঠী, অদ্বৈত আচার্য, সীতাবেবী, অচ্যুতানন্দ, বড় গোস্বামী, চাকফেরা গোষ্ঠী, বড় গোস্বামী শাখা।

মূল আলোচনা

আজ থেকে প্রায় ছ'শো বছর আগেকার কথা। গৌড়ে তখন সুলতানি শাসন। সেসময় শাসক আর স্মার্ত ব্রাহ্মণের অত্যাচারে বাংলার বৈষ্ণব সমাজ একেবারেই কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল। বৈষ্ণব সাধনার ছোট্ট শিখাটি শুধু টিমটিম করে জ্বলছিল নবদ্বীপ আর শান্তিপুরে। এরকম একটি সময়ে বৈষ্ণব সমাজের হাল ধরলেন কমলাক্ষ। জ্যোতিষ, ষড়দর্শন, বেদ-পুরাণে অগাধ পাণ্ডিত্য নিয়ে উচ্চমার্গের সাধনা করতে লাগলেন কমলাক্ষ। হলেন তিনি অদ্বৈত আচার্য। অদ্বৈত আচার্য বা অদ্বৈতাচার্য গোস্বামী (১৪৩৪-১৫৫৯খ্রি:) ছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশের একজন অন্যতম বিশিষ্ট বৈষ্ণব দার্শনিক এবং ধর্মবিশারদ। তাঁর পিতৃ প্রদত্ত নাম ছিল কমলাক্ষ মিশ্র। একদা পুরীর রথযাত্রার দিনে অসংখ্য লোকের সমাবেশে তিনি শ্রীচৈতন্যদেবকে অবতার বলে ঘোষণা করেন।

বৈষ্ণবধর্মে পঞ্চতত্ত্বের অন্যতম তত্ত্ব এক এবং অদ্বিতীয় তত্ত্ব অদ্বৈত আচার্য ছিলেন বৈষ্ণব ধর্মের অন্যতম প্রাণপুরুষ। শ্রীচৈতন্যের পার্ষদদের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ অদ্বৈত আচার্য বৈষ্ণব সমাজে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী। বৈষ্ণব সমাজের সংকটময় পরিস্থিতিতে যুগের দাবি তাঁর কণ্ঠস্বরের মধ্য দিয়েই প্রথম প্রকাশ পেয়েছিল এবং তাঁর আহ্বানেই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কলিযুগে শ্রীচৈতন্য রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে অদ্বৈত আচার্যের আহ্বান ছিল একটি মুখ্য কারণ। এমনকি মহাপ্রভু লীলা সংবরণও করেছিলেন অদ্বৈত আচার্যের প্রেরিত এক তরজার প্রেক্ষিতে বলে চৈতন্য জীবনী থেকে জানা যায়। ফলে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে,তাঁর জীবনে অদ্বৈত আচার্যের ভূমিকা কি ভীষণ পরিমাণে ছিল। বৈষ্ণব সমাজের শ্রীচৈতন্যের মতোই অদ্বৈত আচার্যকেও দেবত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করে তাঁকে মহাসৃষ্টির অবতার রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। চৈতন্য ভক্তিবাদ ও তত্ত্বকথা অদ্বৈত আচার্যের সহযোগিতায় জনসমাজে বিশেষভাবে প্রসার লাভ করে। শ্রীচৈতন্য স্বয়ং পরম শ্রদ্ধা করতেন এই বয়োজ্যেষ্ঠ ভক্তকে। তিনি বর্তমানে বাংলাদেশের শ্রীহট্ট জেলার (বর্তমান নাম তাহিরপুর, সিলেট জেলা) নবগ্রাম-লাউড় গ্রামের এক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। দিনটি ছিল মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথি। তাঁর পিতা ছিলেন বিখ্যাত পন্ডিত কুবের আচার্য এবং মাতা ছিলেন লাভাদেবী। কুবের পণ্ডিত দীর্ঘকাল অপুত্রক ছিলেন। প্রায় বৃদ্ধ বয়সে তিনি পুত্র লাভ করেন। জন্মের সময় তাঁর পারিবারিক নাম ছিল কমলাক্ষ। বাল্যকালে তাঁর অনেকটা সময় কাটে সিলেটেই। মহাপ্রভুর আবির্ভাব কালে অদ্বৈত আচার্যের ৫২ বছর বয়স ছিল বলে জানা যায়। আর শ্রীচৈতন্যের জন্ম ১৪২৭ শকাব্দের হওয়ায়

অদ্বৈত প্রভু ১৩৫৫ শকাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিল বলে ধরে নেওয়া হয়। কুবের পণ্ডিত সর্বসুলক্ষণযুক্ত পুত্রের নামকরণ করেন 'কমলাক্ষ' এবং 'মঙ্গল'।[১] কমলাক্ষ ছোটো থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ও বুদ্ধিমান ছাত্র ছিল। পিতার কাছেই তাঁর প্রথম শিক্ষার হাতে খড়ি। অল্প বয়সেই পিতা যজ্ঞোপবীত দেন প্রিয় পুত্রের। কমলাক্ষ লাউড়ে ব্যাকরণ, সাহিত্য, অভিধান, অলংকার ও জ্যোতিষ অধ্যয়ন শেষ করে শান্তিপুরে পরবর্তী শিক্ষালাভের জন্য চলে আসেন। তারপর তিনি নদিয়া জেলার শান্তিপুরের গঙ্গাতটে, বর্তমানে মতিগঞ্জ চলে আসেন। এবং সেখানে তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। শান্তিপুরে এসেষড়দর্শন ও অন্যান্য শাস্ত্র অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি পাঠ করেন। এবং এখানেই তিনি স্থায়ীভাবে থেকে যান। পরবর্তীকালে তাঁর পিতা মাতাও লাউড় ত্যাগ করে শান্তিপুরে চলে আসেন। কমলাক্ষ পূর্ণবাটী গ্রামে দ্বিজবর বেদান্তবাগীশের কাছে চতুর্বেদ পাঠ সমাপ্ত করেন অল্প বয়সেই। শিষ্যের পান্ডিত্যেগুরু খুবই আনন্দিত হন এবং শিষ্যকে ' বেদ পঞ্চানন' উপাধিতে ভূষিত করেন। শিক্ষান্তে কমলাক্ষ পিতা-মাতার কাছে ফিরে আসেন।কিন্তু পিতা মাতার সান্নিধ্যে দীর্ঘদিন থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। কিছুকালের মধ্যে তাঁর পিতৃমাতৃ বিয়োগ ঘটে। শান্তিপুরে পিতা-মাতার শেষকৃত্য করে কমলাক্ষ পিণ্ডদানের উদ্দেশ্যে গয়াধামে গমন করেন। সেখান থেকে নাভিগয়ার কার্য সমাপ্ত করে ক্ষেত্রপথে রওনা হন। এই সময় তিনি ভারতের নানা তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করেন। পথে তাঁর সঙ্গে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ ভক্ত মাধবেন্দ্রপুরীর সাক্ষাৎ হয়। শান্তিপুরে ফিরে তিনি মাধবেন্দ্রপুরীর কাছেই দীক্ষা নেন। বৈষ্ণব দীক্ষার জগতে তাঁর গুরু ছিলেন মাধবেন্দ্রপুরী। ভক্তিমার্গেদীক্ষা লাভের পর তিনি 'অদ্বৈত' উপাধি লাভ করেন। এবং বৈষ্ণব সমাজে কমলাক্ষ হয়ে উঠলেন অদ্বৈত আচার্য। তাঁরগুরু মাধবেন্দ্রপুরী শ্রীচৈতন্যদেবেরও পরমগুরু ছিলেন।শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বেই অদ্বৈত আচার্য প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন বৈষ্ণব জগতে। নবদ্বীপের ভক্তদের কাছে তিনি একজন অন্যতম পথপ্রদর্শনকারী ছিলেন। নিত্যানন্দ ১৩৯৫ শকে বা ১৪৭৩ খ্রিস্টাব্দে যে বছর জন্মগ্রহণ করেন এবং সেই বছরই শান্তিপুরে মাধবেন্দ্র পুরীর কাছে দীক্ষিত হয়েছিলেন কমলাক্ষ। নিরাকারবাদী ও ব্রহ্মজ্ঞানী শ্যামদাস নামক এক বিখ্যাত পন্ডিতকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করেন অদ্বৈত। ফলে তাঁর জনপ্রিয়তা সাধারণ মানুষের কাছে ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। জনসাধারণের কাছে তিনি হরি ও হরের অভিন্ন সত্ত্বা হিসেবে প্রতিপন্ন হন। সর্বলোকের মুখে তিনি অদ্বৈত আচার্য রূপেবন্দিত হন। যথা সময়ে অদ্বৈত আচার্য শ্রীনৃসিংহ ভাদুড়ীর দুই কন্যা শ্রীদেবী ও সীতাদেবীকে বিবাহ করেন। সীতাদেবীর গর্ভে অচ্যুতানন্দ, বলরাম, গোপাল, জগদীশ ও স্বরূপ- এই পাঁচ পুত্র এবং শ্রীদেবীর গর্ভে কৃষ্ণদাসের জন্ম হয়।[২] অদ্বৈত আচার্যের সকল সন্তানের মধ্যে অচ্যুতানন্দ পরবর্তী বৈষ্ণব সমাজের নিকট সর্বাপেক্ষা প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। এরপর অদ্বৈত আচার্য নবদ্বীপে টোল স্থাপন করে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হন। তিনি সর্বদা লোকাচার

অপেক্ষা ভক্তিবাদকে প্রাধান্য দিতেন। বার্ধক্যের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হয়ে তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সংস্পর্শে আসেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রভাবে সমগ্র গৌড়বঙ্গে যে ভাব তন্ময়তার ধারা প্রবাহিত হয়েছিল তাতে অদ্বৈত আচার্যও শামিল হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে শ্রীচৈতন্য নীলাচলে চলে গেলেও অদ্বৈত আচার্যের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অটুট ছিল। পরস্পর পরস্পরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন ও ভালবাসতেন। প্রতিবছর অদ্বৈত আচার্য নীলাচলে যেতেন শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

অদ্বৈত আচার্যের বংশধরগণ:

- গৌতম>বিভাকর>প্রভাকর>বিষ্ণুমিশ্র>কাকুস্থ>গোপীনাথ >গুণাকর>আকাই>নারায়ণ>অগ্নিহোত্রী>পৃথ্বীধর>শরভ>মাতঙ্গ>জৈমনী>ভাস্কর> সায়ন>অরুণি>যদুনাথ>শ্রীপতি>কুলপতি>ঈশান>বিভাকর>প্রভাকর>নরসিংহ
- নরসিংহ-এর সাত পুত্র: ১)কন্দর্প, ২) সারঙ্গ, ৩) বিদ্যাধর, ৪)মহাদেব, ৫)নারায়ণ, ৬) পুরন্দর এবং ৭) গদাধর
- বিদ্যাধর -এর এক পুত্র>ছ'কড়ি। ছ'কড়ির দুই পুত্র- কুবের এবং নীলাম্বর আচার্য। কুবেরএর পুত্রকমলাক্ষ বা অদ্বৈত আচার্য।
- অদ্বৈত আচার্যের ছ'পুত্র: ১) অচ্যুতানন্দ, ২) গোপাল, ৩) বলরাম, ৪) স্বরূপ, ৫) জগদীশএবং ৬) কৃষ্ণদাস।
- বলরামের ছয় পুত্র: ১) মধুসূদন (গোস্বামী ভট্টাচার্য শাখা), ২) গোপীবর, ৩) বসুদেব, ৪) কামদেব, ৫) মথুরেশ (বড় গোস্বামীর উৎপত্তি), ৬) দেবকীনন্দন (আতাবুনিয়া শাখা)।
- মথুরেশের পুত্র ঘনশ্যাম গোস্বামী (হাটখোলা গোস্বামী শাখারউৎপত্তি)
- অদ্বৈতের অন্যান্য প্রপৌত্রগণ: ১) রাঘবেন্দ্র, ২) কুমদানন্দ (পাগলা গোস্বামীশাখা, ৩) পূর্বানন্দ, ৪) নিত্যানন্দ, ৬) রামেশ্বর গোস্বামী (চাকফেরা গোস্বামী শাখা), ৭) রামকৃষ্ণ, ৮) হরিদেব,৯) গোপাল, ১০) কেশব এবং ১১) সন্তোষ (বাঁশবুনিয়া শাখা)।[৩]

বৈষ্ণব মতবাদের অন্যতম প্রবর্তক ছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব। অদ্বৈত আচার্য নিত্যানন্দের সঙ্গী হিসেবে এই মতবাদ প্রচারে আত্মমগ্ন হন। আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি প্রথমবারের মতো নিমাইকে স্বয়ং ভগবান বলে স্বীকার করেন। পুরীতে এক রথযাত্রার অনুষ্ঠানে লক্ষ লোকের সমাগমের মধ্যে তিনি চৈতন্যদেবকে একজন অবতার বলে ঘোষণা করেছিলেন। আবার তিনি সর্বপ্রথম ভগবান রুপে সচন্দন-তুলসী সহ বৈদিক মন্ত্রে মহাপ্রভুকে আরাধনা করেন। শ্রীচৈতন্য নীলাচলে চলে গেলে নবদ্বীপের ভক্তদের প্রধান আশ্রয় হয়ে ওঠেন তিনি। ১৫১৩ সালে শ্রীচৈতন্য শান্তিপুরে আসলে তিনি বিদ্যাপতির পদ গিয়ে তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্য নেপালেরগন্ডকী নদীর থেকে নারায়ণশিলা প্রাপ্ত হন যা আজও বড় গোস্বামী বাড়িতে নিত্য পূজিত হয়ে আসছেন। মদনগোপাল নামক চিত্রপট প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর দুই সহধর্মিনীর নাম

শ্রীদেবী ও সীতাদেবী তাঁর সর্বক্ষণের ধর্মাচরণের সঙ্গী ছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তাঁরই এক বংশধর। মহাপ্রভুর নবদ্বীপে থাকাকালীন সমস্ত কার্যে সহযোগী রূপে ছিলেন অদ্বৈত আচার্য।

বাংলার বৈষ্ণব সমাজের প্রতি অত্যাচারের বিরুদ্ধে একদিন তিনি যেমন সুলতানের দরবারে গিয়ে সাওয়াল করেছিলেন, অন্যদিকে তেমনি জাতপাত নির্বিশেষে সকলকে বুকে টেনে নিয়ে তাঁর আরাধ্য বিষ্ণুর চরণে ভাগ্যহীন মানুষদের আশ্রয় দিয়েছিলেন। যেমনটা ঘটেছে যবন হরিদাসের ক্ষেত্রে। যবন জেনেও, হরিদাসের প্রার্থনায় অদ্বৈত আচার্য সাড়া দিতে দ্বিধা করেননি। তাঁকে তিলক-তুলসীমালা, কৌপীন দিয়ে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছেন, আশ্রয় দিয়েছেন, নাম দিয়েছেন,'ব্রহ্ম হরিদাস'। এজন্য অদ্বৈত আচার্যকে ব্রাহ্মণ সমাজের কাছে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে। এমনকি সমাজচ্যুত করার হুমকিও শুনতে হয়েছে তাঁকে। একজন গৃহস্থ বৈষ্ণব হয়েও সেই হুমকি ও অত্যাচারের কাছে তিনি মাথা নত করেননি। বরং যে হরিদাসকে ব্রাহ্মণেরা ম্লেচ্ছ, তুচ্ছ, অচ্ছুৎ বলে দূরে সরিয়ে দিত, তাঁর সঙ্গে এক পঙক্তিতে বসে ভোজন করেছেন।

এসবের জন্য তিনি বাংলায় কৃষ্ণভক্তির গঙ্গা বয়ে দেওয়ার জন্য একজন ভগীরথের সন্ধান করছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, ভাগবত গীতায় ভগবান 'সম্ভবামি যুগে যুগে'বলে যে অবতার নেবার আশ্বাস দিয়েছিলেন, সেই আশ্বাস পূরণের কাল উপস্থিত হয়েছে। গুরু মাধবেন্দ্র পুরীও 'অনন্ত-সংহিতা'-র কথা উল্লেখ করে ভবিষ্যৎবাণী করেছেন, অচিরেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নবদ্বীপে অবতার নেবেন, নবদ্বীপ হয়ে উঠবে নবদ্বীপধাম। বিষ্ণুপাদপদ্ম আর ঈশ্বর পুরীর সংস্পর্শে ধন্য হয়ে বিশ্বম্ভর নিমাই যখন হৃদয়ে ভক্তির ঢেউ নিয়ে গয়া থেকে ফিরলেন, তখন সত্তর পেরনো অদ্বৈত আচার্য তাঁর মধ্যে সেই 'ভগীরথের' সন্ধান পেলেন, সন্ধান পেলেন সেই অবতারের। যাকে তিনি এতদিন হৃদয় হাতড়ে খুঁজছিলেন। যোগ্য লোকের তিনি হাতে একটু একটু করে ছেড়ে দিতে লাগলেন বৈষ্ণব সমাজের দায়িত্বভার। ভারমুক্ত হয়ে আশ্রয় চাইলেন বিষম্ভররূপী শ্রীবিষ্ণুর চরণে। শ্রীপদযুগল মাথায় তুলে নিলেন, হয়ে উঠলেন প্রভুর আদেশের 'ন্যাড়াবো ' ন্যাড়াবুড়ো'।[৪] এভাবেই অদ্বৈত আচার্য ধীরে ধীরে নেতা থেকে সেবক হয়ে উঠলেন। পরবর্তীকালে নগর কীর্তনের মধ্য দিয়ে শ্রীধরের মতো নিম্নবর্গের মানুষকে বুকে টেনে নিয়ে, দবির খাস আর সাকর মল্লিককে উদ্ধার করে রুপ আর সনাতন নাম দিয়ে বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে যে উদারতার ধারা, মানবতার ধারা, করুণার ধারা, প্রেম ভক্তির ধারা একটি স্রোতে মহাপ্রভুর চরণ ছুঁয়ে বয়ে গেল, সেই ধারাপথ কিন্তু অদ্বৈত আচার্যই সারাটি জীবন ধরে একটু একটু করে তৈরি করে রেখেছিলেন। চৈতন্যপূর্ব বৈষ্ণব ধর্মের এই মহান কান্ডারীর আবির্ভাব ঘটেছিল ১৪৩৪ সালে। তাঁর দর্শন ভক্তিযোগ ও অচিন্ত্য-ভেদ-অভেদ তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। অদ্বৈত আচার্য প্রথম

শ্রীচৈতন্যদেবকে অবতার রূপে স্বীকৃতি দেন। তিনি বহু মানুষকে বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত করে শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করেন। তাঁর বিশাল শিষ্য মন্ডলী তৈরি হয় যা বাংলায় বৈষ্ণবধর্ম বিকাশে বিশেষ ভূমিকা নেয়। তাঁর শিষ্যমণ্ডলীতে ছিলেন- ভাগবত আচার্য, বিষ্ণুদাস আচার্য, চক্রপাণি আচার্য, অনন্ত আচার্য, দুর্লভ বিশ্বাস, বনমালী দাস, জগন্নাথ কর, ভোলানাথ কর, হৃদয়ানন্দ সেন, ভোলানাথ দাস, যাদব দাস, বিজয় দাস, জনার্দ্দন দাস, অনন্ত দাস, নারায়ণ দাস, বনমালী কবিচন্দ্র, বৈদ্যনাথ, লোকনাথ পন্ডিত, মুরারি পন্ডিত, ধনঞ্জয় প্রমুখ ব্যক্তিত্বরা।[৫]

শান্তিপুর গোষ্ঠীর অন্যান্য শিষ্য-প্রশিষ্যগণ:

(১) পাবনা জেলার আংড়াইল শ্রীপাটের দ্বিজ শুভানন্দ।

(২) বর্ধমান জেলার বৈতা শ্রীপাটের শ্যামদাস আচার্য।

(৩) পাবনা জেলার ভুঁইখালি শ্রীপাট কেন্দ্রের শিষ্য বললাম ঠাকুর।

(৪) হুগলি জেলার সপ্তগ্রামের নিকট চাঁদপুরের যদুনন্দন আচার্য।

(৫) হুগলির দশঘড়ার কমলাকান্ত বিশ্বাস।

(৬) মালদা জেলার গোপীনাথপুর এলাকার ব্যাগরার নন্দিনী(সীতাদেবীর শিষ্যা)।

(৭) নদিয়া জেলার হরিহরপুরের হরিপ্রিয়া(সীতাদেবীর শিষ্য)।

(৮) সিলেট জেলার হুশিয়ারপুরের নরহরি(কায়স্থ শিষ্য)।

(৯) মালদার জঙ্গলীটোলার জঙ্গলী(সীতাদেবীর শিষ্যা)।

(১০) ঢাকা জেলার ঝকপাল অঞ্চলের ঈশান নাগর।

(১১) নদিয়ার কান্দিখালির বিষ্ণুদাস আচার্য।

(১২) বর্ধমান জেলার কেশবপুরের বিষ্ণুদাস আচার্য।

(১৩) নদিয়া জেলার কুলিয়ার অচ্যুতানন্দ গোস্বামী।

(১৪) নদিয়ার জেলার মানিক্যদীঘি শ্রীপাটের মানিক্য।

(১৫) বর্ধমান জেলার নবগ্রামের শ্যামদাস আচার্য।

(১৬) ঢাকা জেলার সিজলদি শ্রীপাটের কিছু শিষ্য।

(১৭) বর্ধমান জেলার সিঙ্গারকোণ শ্রীপাটের মহানন্দ আচার্য।

(১৮) ঢাকা জেলার উৎহুলি ও তেওতা শ্রীপাটের জগদানন্দ (সীতাদেবীর শিষ্য)প্রমুখ।[৫ক]

অদ্বৈত আচার্য দীর্ঘজীবী ছিলেন। ঈশান নাগরের ‘অদ্বৈতপ্রকাশ’ অনুসারে তিনি প্রায় ১২৫ বছর জীবিত ছিলেন। অদ্বৈত আচার্যের তিরোধানের পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র অচ্যুতানন্দ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব দেন। অচ্যুতানন্দ শ্রীচৈতন্যের ভাবরসে প্লাবিত হন এবং মনেপ্রাণে সেই আদর্শ গ্রহণ করেন। অদ্বৈত-পত্নী সীতাদেবীও বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে বিশেষগুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। অচ্যুতানন্দ ও সীতাদেবীর এক বিশাল শিষ্য সম্প্রদায় গড়ে ওঠেগৌড় বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে। পরবর্তীকালে অদ্বৈত শাখার বৈষ্ণবেরা ব্রাহ্মণ্য কর্মকাণ্ডের প্রতি অধিক মনোযোগ দেওয়ায় এবং শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যে কোনোরূপ প্রভেদ না করায় গৌড়বঙ্গের অন্যান্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সঙ্গে

তত্ত্বগত দিক থেকে তাদের সঙ্গে একটা প্রচ্ছন্ন বিরোধ গড়ে ওঠে। এবং বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের পরিবেশ তৈরি হয়।।অদ্বৈতের তিরোধানের পরে তাঁর অনুগামী বৈষ্ণবগণ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। অদ্বৈত আচার্যের এক পরিকর কামদেব নাগর চৈতন্যের ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস স্থাপন করেননি। অদ্বৈত আচার্য যেমন শ্রীচৈতন্যের মধ্যে ঈশ্বরতত্ত্ব অনুভব করেন, তেমনি তাঁর শিষ্য কামদেব সেই তথ্য নস্যাৎ করে দেন। তিনি শ্রীচৈতন্যের মধ্যে কোনো ঈশ্বরত্ব খুঁজে পাননি। ফলে বাংলার গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে এতদিন যে ধারণা ছিল যে, শ্রীচৈতন্য ঈশ্বরের অবতার, এই তত্ত্ব অদ্বৈত পন্থী বা শান্তিপুর গোষ্ঠীর বৈষ্ণবরা অস্বীকার করতে শুরু করে। এর ফলে বাংলার গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সমান্তরালে বিভেদ ও বিরোধের ফলশ্রুতি হিসাবে বিভিন্ন বৈষ্ণবধর্মীয় গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। অদ্বৈত শাখার ভক্তেরা পাবনা, বগুড়া, ঢাকা, বর্ধমান, মালদা, নদিয়া, হুগলি ও শ্রীহট্টে সক্রিয় ছিলেন। পরবর্তীকালে অদ্বৈত শাখার বৈষ্ণবগণ ব্রাহ্মণ্য কর্মকাণ্ডের সমর্থক হয়ে ওঠেন।[৬] অদ্বৈতপন্থী শান্তিপুর গোষ্ঠীর বৈষ্ণবরা তাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের তথা চৈতন্য ধর্মের তত্ত্বকে বিসর্জন দিয়ে ব্রাহ্মণ ধর্মের তত্ত্বকে অধিক প্রাধান্য দিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ্য আচার-বিচার গ্রহণের পক্ষপাতী হয়ে পড়ে। এর ফলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে নেতাকে কেন্দ্র করে বা তীর্থ কেন্দ্রকে অভিকেন্দ্র করে মূলধারার বৈষ্ণবদের সঙ্গে বিরোধের নতুন ক্ষেত্র তৈরি হয়। শান্তিপুরের গোস্বামী উপাধিধারী বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণ এবং চৈতন্যের মধ্যে কোনো পার্থক্য বিচার করতেন না। তাঁদের এই ধারণা নবদ্বীপের বৈষ্ণবেরা সমর্থন করেননি। তাই দেখা যায় অচিরেই বিভিন্ন বিশিষ্ট্য অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতি অধিক আস্থাশীল হওয়ার ফলে শান্তিপুর গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্যান্য বৈষ্ণব গোষ্ঠীর মনোমালিন্য দেখা দেয়।

নদিয়া জেলার ঐতিহ্যশালী অঞ্চল শান্তিপুর। অদ্বৈত আচার্যের শ্রীপাট শান্তিপুর। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের নিকট পরম পবিত্র ভূমি শান্তিপুর। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের পঞ্চধামের মধ্যে শান্তিপুর অন্যতম একটি প্রধান ধাম। বাকিগুলো যথাক্রমে- নবদ্বীপ, কাটোয়া, একচক্রা এবং খড়দহ। অদ্বৈত আচার্যের আগমনের পূর্বে শান্তিপুর সুপ্রসিদ্ধ ছিল সংস্কৃত-চর্চার পীঠস্থান রূপে। শ্রীরামপুরের পাদ্রী উইলিয়াম ওয়ার্ড সাহেব পশ্চিমবঙ্গে যে প্রধান সাতটি বিদ্যাস্থানের উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে শান্তিপুর একটি। শান্তিপুর প্রাচীন জনপদ। গঙ্গা ও তার শাখা নদী তিন দিক দিয়ে এই অঞ্চলে প্রবাহিত হত বলে বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখ আছে। অদ্বৈত আচার্যের বংশধরেরা বর্তমানে শান্তিপুরের নানা স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করছেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবারও ভাগ হয়েছে। বর্তমানে বড়বাড়ি, মধ্যবাড়ি, ছোটবাড়ি বলে নানাভাবে বংশধরেরা বিভক্ত হয়ে আছেন। বড়বাড়ির আদিপুরুষ রাঘবেন্দ্র, মধ্যবাড়ির আদিপুরুষ ঘনশ্যাম, ছোটোবাড়ির আদিপুরুষ রামেশ্বর। অদ্বৈত আচার্য পূজিত নরসিংহ শিলা এবং শ্রীমদনগোপাল মূর্তি বড় বাড়িতে সযত্নে রক্ষিত আছে। শ্রীমদনগোপাল অদ্বৈত আচার্যের স্বপ্নাদিষ্ট কাঠের নির্মিত বিগ্রহ।

রাঘবেন্দ্রের পুত্র বিষ্ণুদেব রামভক্ত হওয়ায় রঘুনাথ-এর মূর্তিও প্রতিষ্ঠা করেন। শান্তিপুরে রাস উৎসবের প্রবর্তন করেন অদ্বৈত আচার্যের প্রপৌত্র মধুরেশ গোস্বামী। বর্তমানেও বিশাল করে রাস উৎসব পালন করা হয় শান্তিপুরে। কেবলমাত্র বৈষ্ণবেরা নয়, বহু সাধারণ মানুষ এই উৎসবে যোগদান করেন। রাসের ক'দিন আলোর মোড়কে সেজে ওঠে শান্তিপুর। মেলা বসে রাসকে কেন্দ্র করে। নানা দেবদেবীর মূর্তিকে এই রাসে পূজা করা হয়। বৈষ্ণব এবং শাক্ত দেবদেবী একত্রে পূজিত হয়। একই সঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অদ্বৈত আচার্যের আগমনের পূর্বে শান্তিপুর তন্ত্রপ্রধান অঞ্চল ছিল। অদ্বৈত আচার্যের আগমনের পরে বৈষ্ণব ভাবধারা এখানে প্রসারিত হয় এবং ক্রমে তন্ত্রের স্থানে বৈষ্ণবীয়পরিমণ্ডল প্রতিষ্ঠা পায়। রাস উৎসবে এখনো সেই প্রাচীন তন্ত্রক্ত দেবদেবী এবং বৈষ্ণবীয় ভাবধারার দেব-দেবী একত্র সহবস্তান করে মিশ্র সংস্কৃতির একটা ছবি তুলে ধরে। শান্তিপুরে দর্শনীয় স্থানগুলি তারই প্রমাণ বহন করে আসছে যুগ যুগ ধরে। জলেশ্বর মন্দির, শ্রীশ্যামচাঁদ মন্দির, পঞ্চরত্ন মন্দির, শ্রীকালাচাঁদ মন্দির, শ্রীগোকুলচাঁদ মন্দির, অদ্বৈত আচার্যের বংশধর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী জন্মস্থান ইত্যাদি বৈষ্ণবীয় এবং শাক্ত স্মৃতির এক মিশ্র সংস্কৃতির নিদর্শন।

নদিয়ার শান্তিপুরে, বর্ধমানের কোনো কোনো গ্রামে, মালদহের গোয়ালন্দ, তেওতা প্রভৃতিস্থানে এবং শ্রীহট্টের লাউড় নামক স্থানে এই সম্প্রদায় আজও সক্রিয় আছে। অদ্বৈত আচার্যের 'জ্ঞানভক্তিতত্ত্ব' জনপ্রিয় হয়েছিল এই অঞ্চলে। অদ্বৈত আচার্য এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র অচ্যুতানন্দ ও সীতাদেবীর নেতৃত্বে অদ্বৈত পরিকরগণ বা সহচরগণ একদা বৈষ্ণব সমাজে বেশ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পূর্বে অদ্বৈত আচার্য জ্ঞানমার্গী ও শংকরপন্থী বৈদান্তিক ছিলেন বলে তিনি অদ্বৈত নামে পরিচিত হয়েছিলেন। মহাপ্রভুর ব্যক্তিগত প্রভাব ও চরিত্র মাহাত্ম্যের প্রভাবে অদ্বৈত আচার্য প্রেমধর্ম গ্রহণ করলেও অদ্বৈতবাদ ও জ্ঞানমার্গের প্রতি আকর্ষণ পুরোপুরি ত্যাগ করতে পারেননি। শ্রীচৈতন্য পুরীধামে বসবাসকালে নেতৃত্বের অভাবে গৌড়ে, প্রেমধর্মের প্রভাব দুর্বল হয়ে পড়লে অদ্বৈত আচার্য তখন নেতৃত্ব দেন। এতে চৈতন্য হতাশ হয়ে নিত্যানন্দকে গৌড়ের ধর্ম রক্ষার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, শান্তিপুর গোষ্ঠীর সঙ্গে খড়দহ গোষ্ঠীর তত্ত্বগত প্রচ্ছন্ন বিরোধ ছিল, যা অদ্বৈত-নিত্যানন্দের জীবিতকালেই বোঝা গিয়েছিল। জাতিহীন নিত্যানন্দকে অদ্বৈত ব্যঙ্গ করতেন। এক্ষেত্রে এই দুই সম্প্রদায়ই বৈষ্ণব সমাজের নেতা ও গুরু বলে পরিগণিত হয়েছিল এবং এর ফলে উভয়ের মধ্যে বিবাদ ও মতান্তর দেখা দিয়েছিল। চৈতন্যলীলার শেষ পর্যায়ে একটি তরজা লিখে নীলাচলে পাঠিয়েছিলেন অদ্বৈতআচার্য। তরজার অর্থ শ্রীচৈতন্যদেব জানলেও চুপ ছিলেন। তবে তরজারঅর্থ বুঝেও স্বাভাবিক কারণে শ্রীচৈতন্য নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছিলেন। অদ্বৈত আচার্য তরজায় কি লিখে পাঠিয়েছিলেন তা নিশ্চয়ই পন্ডিত মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য বুঝতে পেরেছিলেন। অদ্বৈতের এই তরজা পত্র পাওয়ার পর থেকেই শ্রীকৃষ্ণের বিরহে শ্রীচৈতন্যের আকুতি দ্বিগুণ পরিমাণে

বৃদ্ধি পায় এবং স্বল্পকালের মধ্যেই তিনি নরলীলা সাঙ্গ করেন। অর্থাৎ এই তরজার অর্থ হয়তো এমন ছিল যে, নিত্যানন্দ এবং অদ্বৈত আচার্যের সংঘাত অনিবার্যভাবে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল।এই মতবিরোধে প্রমাণ মেলে নিত্যানন্দ-পুত্র দীক্ষা গ্রহণের জন্য শান্তিপুরেঅদ্বৈত আচার্যের শরণাপন্ন হলে। জাহ্নবাদেবী প্রথমে অপ্রাপ্তবয়স্ক বীরচন্দ্রকে দীক্ষাদিতে অসম্মত হলে তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে শান্তিপুরে গিয়ে অদ্বৈত আচার্যের কাছে দীক্ষা নেওয়ার জন্য নৌকাযোগে যাত্রা শুরু করেছিলেন। খড়দহে নিত্যানন্দ সম্প্রদায় এই ঘটনায় অসম্মান বোধ করলেন। তখন তাঁরা বীরচন্দ্রকে অনুরোধ-উপরোধ করে ফিরিয়ে নিয়েযান এবং জাহ্নবাদেবী তাঁকে যথারীতি দীক্ষা দান করেন। অদ্বৈত আচার্যের তিরোধানের পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র অচ্যুতানন্দ শান্তিপুর গোষ্ঠীর নেতৃত্ব দেন। তিনি মহাপ্রভুর আহবানে নীলাচলে গিয়ে কিছুদিন তাঁর সান্নিধ্যে ছিলেন। 'অদ্বৈতপ্রকাশ' গ্রন্থের ষোড়শ অধ্যায়ে ঈশান নাগর 'সখীভাবে' তাঁর নৃত্যগীতের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি মহাপ্রভুর ভাবরসে প্লাবিত হতেন এবং মনে প্রাণে সেই আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন। অচ্যুতানন্দ কাশীধামের এক চৈতন্য বিমুখ সন্ন্যাসীর সঙ্গে শাস্ত্র আলোচনায় তাঁকে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করেছিলেন। তাঁর নির্দেশে সেই সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যদেবকে দর্শন করে মহানন্দে ভক্তিধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। বর্তমানেও শান্তিপুরও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে নদিয়ার বিভিন্ন স্থানে এই সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদের দেখা মেলে।শান্তিপুর-নবদ্বীপবাসী বৈষ্ণবরা ক্রমশ সংঘটিত হতে থাকেন এবং বেশ কিছু ব্রাহ্মণও তাঁদের দলে যোগ দিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য এবং কায়স্থদের সংখ্যা থেকে বোঝা যায় নবদ্বীপ এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ব্রাহ্মণসমাজে রক্ষণশীলতার সঙ্গে উদারতার লড়াই শুরু হয়েছিল এবং তাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ফাটল ধরেছিল। বৈষ্ণবরা এই সময় খোলাখুলি ভাবে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ও জীবনধারার কোনোরকম বিকল্প উপস্থাপিত করতে পারেননি, তাই ভক্তির মতবাদ তাঁরা মেনে নিয়েছিলেন।[৭] পাশাপাশি এই সময় শ্রীচৈতন্যকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের অনুসারী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা প্রতীক বা মাধ্যমিক হিসেবে ব্যবহার করেন। বাস্তবে তাঁর আধ্যাত্ম্য দর্শনকে ততটা গুরুত্ব না দিয়েই খানিকটা স্বতন্ত্রভাবে তাঁরা ধর্ম প্রচার করেছেন।এতে মূলধারার গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে তার কেন্দ্রীয় শক্তি হারিয়ে ফেলে। তাই দেখা যায় চৈতন্য পরবর্তী কালে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের অভ্যন্তরে এবং তার বাইরে বিভিন্ন শাখা সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। এটা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ক্ষেত্রে ফলপ্রসু হয়নি।

শ্রীচৈতন্য জাতপাতের উর্ধ্বে সকল মানুষকে একই ছত্রের নিচে এনে উপস্থিত করেছিলেন। কৃষ্ণমন্ত্রে মুখরিত হয়েছিল সমগ্র দেশ, এমনকি সমগ্র মানব সমাজ। সেই কৃষ্ণ প্রেমাদর্শকে পাথেয় করেই এগিয়ে চলেছিল বৈষ্ণবধর্ম আন্দোলন এবং সেই আন্দোলনের একটি বিশেষ দৃঢ় স্তম্ভ অবশ্যই অদ্বৈত আচার্য। শ্রীচৈতন্য নীলাচলে চলে গেলে বাংলায় বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের মুখ্য দায়িত্ব নিয়েছিলেন অদ্বৈত আচার্য। বৈষ্ণব ধর্ম

আন্দোলনে অদ্বৈত আচার্যের অবদান যে কি পরিমাণে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সর্বতভাবে তিনি সর্বসাধারণের অবিসংবাদিত বৈষ্ণব নেতায় পরিণত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর এই জনপ্রিয়তা বৈষ্ণব ধর্মীয় অনুশাসন অনুসরণ করার পরিবর্তে, ব্রাহ্মণ ধর্মের প্রতি অনুরাগেরই প্রতিফলন বলে মনে হয়। কারণ পরবর্তীকালে শান্তিপুর গোষ্ঠী তথা গোস্বামী পরিবার বা অদ্বৈত আচার্যের বংশধররা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুকূলেই তাঁদের ধর্ম পরিচালিত করার নীতি গ্রহণ করেছিলেন।তাই এখানে দেখা যায় যে, চৈতন্য পরবর্তী কালে বৈষ্ণবরা শ্রীচৈতন্যকে শুধুমাত্র একটি প্রতীকবা মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন,বাস্তবক্ষেত্রে তার চিন্তাধারা ও আধ্যাত্মদ দর্শনকে সেভাবে তারা গ্রহণ করেনি।এর ফলে বাংলায় মূলধারার গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের অনুসারী নানাশাখা ও গোষ্ঠী গড়ে ওঠে এই পর্বে।

সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যেমন নদীর গতিধারা পরিবর্তিত হয়েছে বিভিন্ন ধারা উপধারায়। তেমনি বৈষ্ণব সমাজেরও নানা ক্ষেত্রে পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। বর্তমানে শান্তিপুরের পশ্চিম দিক দিয়ে গঙ্গা নদী প্রবাহিত। শান্তিপুর নামের উৎপত্তি প্রসঙ্গে তিনটি মতবাদ প্রচলিত আছে। প্রাচীনকালে শান্তিমুনি নামে কোনো এক ঋষি এই অঞ্চলে বসবাস করতেন।তাঁর নামানুসারে এই অঞ্চলের নাম হয়েছে শান্তিপুর। দ্বিতীয় মতটি হল-এই জনপদে শান্তিপ্রিয় মানুষের বসবাস অধিক পরিমাণে ছিল তাই শান্তিপুর নামকরণ হয়েছে। তৃতীয় আরেকটি মত সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এ মতটি হলো, মৃত্যুকালে মুমূর্ষু রোগীদের সজ্ঞানে এই স্থানে গঙ্গাতীরে আনা হতো এবং দৈবাত রোগ মুক্ত হলে তারা সংসারে ফিরে না গিয়ে এই স্থানেই শান্তিতে বসবাস করত। তাই এই স্থানের নাম শান্তিপুর।[৮]শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের পিতামহ শ্রীনরসিং আড়িয়াল আনুমানিক ১৩৫৯ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ এসে বসবাস শুরু করেন। তিনি শান্তিপুর থেকে শ্রীহট্টের লাউড়ে গিয়ে অবস্থান করতেন এবং মাঝে মাঝে শান্তিপুর ফিরে আসতেন। কোথায় শ্রীহট্ট? আর কোথায় শান্তিপুর? বিধাতার অপার মহিমা।শ্রীহট্ট আর শান্তিপুরকে একই মিলনসূত্রে বেঁধে দিয়েছেন। তাইতো বৈষ্ণব আন্দোলন বাংলার গন্ডি অতিক্রম করে বাংলার বাইরে এমনকি বিশ্বজনীন ধর্মে পরিণত হতে পেরেছে। সেই থেকে শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের পূর্বপুরুষদের বাস গৃহ ছিল। অদ্বৈত আচার্যের মাতা লাভাদেবী শান্তিপুর অবস্থানকালেই সন্তানসম্ভবা হন। তারপর লাউড়ে চলে যান এবং সেখানে অদ্বৈত আচার্যের জন্ম হয়। অদ্বৈত আচার্যের বয়স যখন ১২ বছর তখন তিনি প্রথম শান্তিপুর আসেন এবং পরবর্তী জীবনের শান্তিপুরেই অতিবাহিত করেন।বিদ্যা অর্জনের জন্য শ্রীচৈতন্য স্বয়ং শান্তিপুরে আসতেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর বৃন্দাবন রওনার উদ্দেশ্যে যাত্রা কালে বা ফেরার পথে শ্রীচৈতন্যদেব শান্তিপুরে আসতেন। শ্রীচৈতন্যের প্রায় সকল পার্ষদই কোনও না কোনও সময় শান্তিপুরে এসেছেন। বিশিষ্ট বৈষ্ণব মহাজনের পদধূলি ধন্য শান্তিপূর্ণ সমগ্র বৈষ্ণব সমাজের নিকট পরম পবিত্র এবং শ্রদ্ধার স্থান।

যদিওআমরা জানি, অদ্বৈত আচার্যের সাধনপীঠ বাবলা নামে প্রসিদ্ধ। শান্তিপুর রেলস্টেশন থেকে এক মাইল দূরে এই বাবলা অবস্থিত। শান্তিপুর শ্রীপাট বাবলা বৈষ্ণব সমাজের নিকট পরম পূজনীয় ক্ষেত্র। অদ্বৈত আচার্যের বংশধর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এই স্থানে নাম সংকীর্তন করতেনএবং এখানে খনন কার্যের ফলে কমলাক্ষ নামাঙ্কিত দু'টি পাদুকা ও কমন্ডলু পাওয়া গিয়েছে। যা বর্তমানে অদ্বৈত সাধনপীঠে গড়ে ওঠা মন্দিরের আসনে রাখা আছে। সীতানাথ দাস নামক এক শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব ভিক্ষা থেকে পাওয়া অর্থে শ্রীপাটে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিত্যপূজার ব্যবস্থা করেন। বাবলা পাটে মূল মন্দিরে অদ্বৈত আচার্যের দারু বিগ্রহ, শ্রীরাধাকৃষ্ণ মূর্তি, গোপালমূর্তি এবং শালগ্রাম শিলা প্রতিষ্ঠিত আছে। নিত্য এই মূর্তি গণের স্নান, শৃঙ্গার, আরতি, ভোগদান, পূজা হয়ে থাকে। নিত্যপূজা ছাড়াও এই শ্রীপাটের নিজস্ব কিছু উৎসব পালিত হয়। যেমন- শুক্লা সপ্তমী তিথিতে অদ্বৈত আচার্যের জন্মোৎসব, দোল পূর্ণিমার পর সপ্তমী তিথিতে অদ্বৈত আচার্যের দোল, মাধবেন্দ্রপুরী স্মরণোৎসব ইত্যাদি হয়ে থাকে। এছাড়া অন্যান্য শ্রীপাটের মতোই শ্রীকৃষ্ণকেন্দ্রিক উৎসব রাস, ঝুলন, জন্মাষ্টমী বিশেষ সমারোহে পালিত হয়। দোল উৎসবের সময় অদ্বৈত আচার্যের দারু বিগ্রহ গর্ভ মন্দিরের বাইরে আনা হয়। প্রতিটি উৎসবে শ্রীপাটে ভক্ত সমাগম হয় এবং নামগান, নামযজ্ঞ, কীর্তন, বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থ পাঠ ইত্যাদি হয়ে থাকে। শ্রীপাটেরচারিদিকে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়েআম-কাঁঠালের বাগান এবং অদ্ভুত এক শান্ত পরিবেশ। সমগ্র শান্তিপুরবাসীর নিকট এই বাবলা শ্রীপাট অত্যন্ত গৌরবের এক পবিত্র স্থান। উৎসবের দিনগুলোতে শ্রীপাটকেকেন্দ্র করে চারপাশের অঞ্চল নামগানে মুখরিত হয়ে ওঠে। সে এক অপরূপ স্বর্গীয় দৃশ্য। এ দৃশ্য অন্য কোনোধর্মীয়পরিমন্ডলে পাওয়া যাবে না।[৯]

শান্তিপুরে যে সকল প্রখ্যাত বৈষ্ণব আজও গৌরবে বসবাস করছেন তাঁরা সকলেই অদ্বৈত আচার্যের বংশধর।তাঁরাবৈষ্ণবীয় ভাবধারাকে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আজও ধরে রেখেছেন। এই বংশের নেতৃত্বে বিভিন্ন বৈষ্ণব গোষ্ঠী ও শাখা গড়ে ওঠে অদ্বৈত আচার্যের পরবর্তীকালে। এই বংশের শাখাগুলি শান্তিপুরের বিভিন্ন স্থানে স্বগৌরবে তাঁদের কর্মকান্ড আজও পালন করে চলেছে। যে সকল বংশ পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং যাদের নেতৃত্বে পৃথক পৃথক বৈষ্ণব গোষ্ঠী বা শাখা গড়ে ওঠে সেগুলি হল যথাক্রমে- ১) বড় গোস্বামীবাড়ি,২) হাটখোলা বা মধ্যম গোস্বামী বাড়ি,৩) মদন গোপাল গোস্বামী বাড়ি, ৪) বাঁশবুনিয়া গোস্বামী বাড়ি, ৫) পাগলা গোস্বামী বাড়ি, ৬) আতাবুনিয়া গোস্বামী বাড়ি, ৭)চাকফেরাগোস্বামী শাখা,৮) গোস্বামী ভট্টাচার্য শাখা। অদ্বৈত আচার্যের ছয়পুত্র এবংপ্রপৌত্রদের থেকেই গোস্বামী শাখার উৎপত্তি। তাঁর পুত্ররা হলেন-অচ্যুতানন্দ,কৃষ্ণমিশ্র বা কৃষ্ণদাস, গোপাল, বলরাম, রূপ বা স্বরূপ এবং জগদীশ।[১০]

বড় গোস্বামী শাখা: অদ্বৈত আচার্যের চতুর্থ পুত্র বলরাম। বলরামের পুত্র মধুরেশ গোস্বামী থেকেই বড় গোস্বামী শাখার উৎপত্তি হয়। শান্তিপুর সহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এই শাখার শিষ্য-প্রশিষ্য বৈষ্ণবীয় রীতি পালনে এই গোষ্ঠীর আচার-বিচার মেনে চলেথাকেন। যশোর জেলার রায়গড়ের বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী বসন্ত রায় ছিলেন মথুরেশ গোস্বামীর শিষ্য। একদা বসন্ত রায় আশঙ্কা করেন যে,তাঁরভ্রাতুষ্পুত্র শাক্ত মতাবলম্বী প্রতাপাদিত্য রায়গড় আক্রমণ করবেন। এই আশঙ্কায় তিনি গুরুদেব মথুরেশ গোস্বামীকে তাঁর গৃহে আমন্ত্রণ জানান। গুরুদেব সেখানে উপস্থিত হলে সকলের অনুরোধে তাঁদের গৃহদেবতা গোবিন্দদেবকে মথুরেশ গোস্বামীর হাতে তুলে দেন। শ্রীগোস্বামী কৃষ্ণ বিগ্রহকে নিজ গৃহে অর্থাৎ বড় গোস্বামী বাড়িতে নিয়ে আসেন। তাঁকে রাঁধারমন নামে প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিগ্রহ পূর্বে উড়িষ্যারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন পুরীধামেদোলগোবিন্দ নামে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

হাটখোলা গোস্বামী শাখা: অদ্বৈত আচার্যের প্রপৌত্র অর্থাৎ মথুরেশ গোস্বামীর পুত্র ঘনশ্যামের সময় থেকে হাটখোলা বা মধ্যম গোস্বামী শাখার উৎপত্তি হয়েছিল। এই শাখা মধ্য গোস্বামী বাড়ি নামেও পরিচিত। এদের পূজিত বিগ্রহ শ্রীশ্রীগোকুলচাঁদ জীউ। এছাড়া গৃহে আছেন গৃহদেবতা শ্রীশ্রীরাঁধাবিনোদ। এই গোষ্ঠীটিও শান্তিপুর ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে আছে। এদেরও কিছু নিজস্ব রীতিনীতি প্রচলিত আছে বহুকাল ধরে। যদিও উনিশ এবং বিশ শতকের প্রেক্ষাপটে তার নানা পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বর্তমানে বৈষ্ণব ধর্মের এই শাখাটি শুধুমাত্র বৈষ্ণবীয় আচার-পালনে অভ্যস্ত না থেকে, ব্রাহ্মণ্য আচারও পালন করে থাকে। ফলে নদিয়া সহ বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের অবৈষ্ণব মানুষের কাছেও এই শাখাটি যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছে।

মদনগোপাল গোস্বামী শাখা: অদ্বৈত আচার্যের শান্তিপুর গোষ্ঠীর অভ্যন্তরেই বিভিন্ন গোস্বামী শাখার উদ্ভব হয়েছিল তাঁর তিরোধানের পরবর্তীকালে। অদ্বৈত আচার্যের অপর এক প্রপৌত্র যাদবেন্দ্র গোস্বামীর সময় থেকে মদনগোপাল গোস্বামী শাখার উদ্ভব হয়েছে। এই শাখার গৃহ বিগ্রহ ও দেবতা শ্রীশ্রীমদনগোপাল জীউ। এই শাখার কুল দেবতার নামে এই শাখাটিও বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল তৎকালীন শান্তিপুর অঞ্চলে। বর্তমানকালেও এই শাখাটি বেশ জনপ্রিয় শাখা হিসাবে তাদের ধর্মীয় রীতিনীতি পালন করে থাকে।

বাঁশবুনিয়া গোস্বামী শাখা: অদ্বৈত আচার্যের আরেক প্রপৌত্র সন্তোষ গোস্বামীর সময় থেকে একটি নতুন শাখার উৎপত্তি হয়। এই শাখাটির নাম বাঁশবুনিয়া গোস্বামী শাখা। এই শাখার কুল বিগ্রহ হলো- শ্রীশ্রীঁশ্যামচাঁদজীউ। এই শাখাটি শান্তিপুরে যথেষ্ট প্রভাবশালী শাখা হিসেবে আজও তাদের কর্মকাণ্ড অব্যাহত রেখেছে।

আতাবুনিয়া গোস্বামী শাখা: অদ্বৈত আচার্যের পৌত্র দেবকীনন্দন গোস্বামীর সময় থেকে আতাবুনিয়া শাখার উদ্ভব হয়েছে। শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এই বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তাঁর কার্যকলাপের মাধ্যমে বাংলার

সমাজ সংস্কৃতি ও ধর্মীয় ইতিহাসে যথেষ্ট সম্মান অর্জন করেছিলেন। তিনি অদ্বৈত আচার্যের অধঃস্তন দশম পুরুষ ছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ ছিলেন আনন্দ কিশোরের পুত্র। এই শাখার বিগ্রহ হল- শ্রীশ্রীশ্যাঁমসুন্দর জীউ।

পাগলা গোস্বামী শাখা: অদ্বৈত আচার্যের পৌত্র মধুরেশ গোস্বামীর অপর ভ্রাতা কুমুদানন্দ থেকে পাগলা গোস্বামী শাখার উৎপত্তি। 'পাগলা' গোস্বামী নামের সঙ্গে একটি কাহিনীও যুক্ত আছে। একদা নদিয়ার মহারাজ বহু ব্রাহ্মণদের সম্পত্তি দান করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কুমুদানন্দ অন্যতম ছিলেন। তিনি মহাসাধক ব্যক্তি। তাঁর বিষয় সম্পত্তির ওপর কোনো আগ্রহ ছিল না। তিনি নির্লোভ মানুষ ছিলেন। তাঁর কাছে বিষয় ছিল বিষ স্বরূপ। মহারাজের দানপত্র তাঁর হাতে আসামাত্র তিনি তা আগুনে পুড়িয়ে ফেলেন। এই ঘটনার পর থেকেই তিনি 'পাগলা গোস্বামী' নামে খ্যাত হলেন। এই শাখার কুলদেবতা এবং বিগ্রহ হল -শ্রীশ্রীকৃঁষ্ণরায় ও কেঁশব রায়।

চাকফেরা গোস্বামী শাখা: অদ্বৈতের বংশধর প্রপৌত্র রামেশ্বর গোস্বামী এই শাখার সূচনা করেন। রাসের সময় এই শাখার বিগ্রহ চতুর্দিকে গোপ-গোপিনীদের পরস্পরের হাত ধরে চক্রাকারে একটি কাষ্ঠচক্রে ঘোরে বা ঘোরানো হয় বলে এই গোস্বামী শাখা চাকফেরা গোস্বামী শাখা নামে পরিচিত। রাসের সময় এই শাখার অভিনবত্ব জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে। এঁদের বিগ্রহ - শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ জীউ।

গোস্বামী ভট্টাচার্য শাখা: শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর পৌত্র মধুসূদন গোস্বামী সময় থেকে গোস্বামী ভট্টাচার্য শাখার উদ্ভব হয়েছে। এই শাখা শান্তিপুর ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে বেশ সমাদর অর্জন করেছে। এই শাখার বিগ্রহ শ্রীশ্রীবিঁশ্বমোহন জীউ এবং কুলবিগ্রহ শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ চন্দ্র।[১১]

এভাবেই অদ্বৈত আচার্যের পরবর্তীকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের অনুসারী বৈষ্ণবধর্ম সম্প্রদায় শান্তিপুর গোষ্ঠীর মধ্যেও বিভাজন তৈরি হয়। এর ফলে অদ্বৈত আচার্যের পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে দেখা যায় বিভেদ ও বিভাজন। আর এর সূত্র ধরেই শান্তিপুর গোষ্ঠীর অভ্যন্তরে বিভিন্ন বংশধরকে কেন্দ্র করে প্রায় আটটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। যা প্রধানত গোস্বামী শাখা নামে পরিচিতি লাভ করে। পরবর্তীকালে এই শাখাগুলিই শান্তিপুর সহ নদিয়ার বৈষ্ণবধর্মকে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। যা সপ্তদশ শতকের শেষ দিক থেকে শুরু করে উনিশ-বিশ শতক এমনকি একুশ শতকেও প্রবাহমান ধারায় অব্যাহত রয়েছে।যেখানে শ্রীচৈতন্যদেব শুধুমাত্রপ্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়েছে, তাঁর আধ্যাত্ম্যদর্শন ততটা গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেনি।

তথ্যসূত্র:

১. দাস, শ্রীহরিদাস, শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান, ২য়খন্ড (২য়, ৩য়ও ৪র্থখন্ড একত্রে), সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ১ম সং, ১৪২১, পৃ. ১১৪৫-১১৪৭।

২. মজুমদার, বিমানবিহারী, চৈতন্যচরিতের উপাদান, ২য় সং, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৫৯, পৃ.৩৬।

৩. ভট্টাচার্য, কালীকৃষ্ণ, শান্তিপুর পরিচয়, ২য়ভাগ, গ্রন্থকার, ভবানীপুর, কলকাতা, ১৯৩৭, নূতন সং, ১৯৪২, শান্তিপুর পৌরসভা, নদিয়া, ১৯৮৬, পৃ.৩৮৪৫।

৪. দাস, শ্রীহরিদাস, শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন, অখন্ড সং, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা,১৪২২, পৃ.২৫০।

৫. Chakraborty, Ramakanta, Vaisnavism in Bengal:1486-1900 (VIB),Sanskrit Pustak Bhandar, Calcutta, October, 1985, pp.129-130.

৫ক. Ibid.

৬. Kennedy, M.T, The Chaitanya Movement: A Study of Vaishnavism in Bengal, Aruna Prakashan, 1st Edn, 1st December, Calcutta,1924, Kolkata, 2013, pp.205-210.

৭. মাইতি, রবীন্দ্রনাথ, চৈতন্য পরিকর, বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৬২, পৃ.৩৪-৩৬।

৮. Sen, Dinesh Chandra, Chaitanya and his Companion's, 1st Aruna Prakashan, Kolkata, 2011, pp.18-21; মজুমদার, ভবেশ, ও সাহা,কবিরঞ্জন, নদিয়ার শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১মপ্রকাশ, ২০২০, পৃ.১৪।

৯. সেনগুপ্ত, অচিন্তকুমার, গৌরাঙ্গ-পরিজন, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১মপ্রকাশ, ১৩৭৫, পৃ.১৬-২১।

১০. নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ স্মারকগ্রন্থ, ৪র্থও ৫ম সংখ্যা, নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ, নবদ্বীপ, নদিয়া, ২০০০-২০০১, পৃ.৫০।

১১. তদেব,পৃ.৫১।

সোহারাব-সাহিত্য : গ্রামীণ সংখ্যালঘু মুসলমান সমাজ

দীপঙ্কর আরশ
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
বিধান চন্দ্র কলেজ, আসানসোল

সারসংক্ষেপ: স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা লক্ষ্যে নয়ের দশকের যে ক'জন কথাশিল্পী লেখনীকে শানিত করে তুলতে চেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম সোহারাব হোসেন। একাধারে তিনি কবি, কথাকার, গবেষক, প্রাবন্ধিক এবং শিশু সাহিত্য রচয়িতা। এগুলির মধ্যে কথাসাহিত্যে তাঁর প্রতিভার সর্বাধিক প্রকাশ ঘটেছে এবং বিবিধমুখী স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় তিনি রেখেছেন। সেই বিবিধ পরিচয়ের একটি: গ্রামীণ সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বরূপ উদ্ঘাটন। 'মহারণ', 'সরম আলির ভুবন', 'মাঠ জাদু জানে' (প্রথম খন্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড) উপন্যাস; দোজখের ফেরেস্তা, মাঠ-মিছিলের দুঃখসুখ, আকাল যাযাবর, নূরবক্সের গাঁজাগাছ ও একটা প্রজাপতির গল্প, হাসপাখিদের গল্প, বোবাযুদ্ধ প্রভৃতি গল্পে উত্তর চব্বিশ পরগণার বসিরহাট সংলগ্ন বিস্তীর্ণ অঞ্চলের সংখ্যালঘু লোকায়ত জীবন বহুকৌণিক আলোকে আলোকিত। তাদের জীবিকা, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, সংস্কার-কুসংস্কার, সুখ-দুঃখ, প্রবঞ্চনা, বেঁচে থাকার নানা কিসিমের কৌশল, চেতন-অবচেতন বহুবিধ বিষয় স্থান অধিকার করে আছে গল্প-উপন্যাসগুলিতে। মূল আলোচনায় সোহারাব সাহিত্য ঘেঁটে সেই সব বিষয় উপস্থাপনের মাধ্যমে সৃজকের স্বাতন্ত্র্য অন্বেষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

সূচক শব্দ: সংখ্যালঘু, দারিদ্র্য, জীবিকা, সংস্কার, উৎসব-অনুষ্ঠান।

মূল আলোচনা:

দেশভাগ পরবর্তী এপার বাংলার সাহিত্যে সংখ্যালঘু সমাজ-জীবনের স্বরূপ অন্বেষণের বিশেষ তাৎপর্য আছে। স্বাধীনতার পর দীর্ঘ সময়কালে বাংলা কথাসাহিত্যে যে বিপুল বিস্তারে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের পরিচয় উদ্ঘাটিত, সংখ্যালঘু মুসলমান জনজীবন প্রসঙ্গে তা প্রযোজ্য নয়। অথচ জনসংখ্যার বিচারে পরের স্থানটি অধিকার করে আছে মুসলিমরা। মাতৃভূমি বিভাজিত হয়ে স্বতন্ত্র 'ভারতভূমি' গড়ে উঠলেও হিন্দু ও মুসলমান দীর্ঘদিন ধরেই পাশাপাশি বসবাস করে আসছে। অখণ্ড বাঙালি সত্তা বলতে হিন্দু-মুসলমান মিলিত সত্তা। সেখানে সাহিত্যে একটি শ্রেণির পরিচয় যথাযথ উঠে আসবে না, এমনটা বাঞ্ছনীয় নয়। বাঙালি জীবনের পূর্ণ প্রতিবিম্বন সেক্ষেত্রে অধরা রয়ে যাবে। ক্ষেত্র গুপ্ত বলেছেন—

> "বাঙালি এক জাতি—ধর্মনিরপেক্ষ এই বাঙালি সত্তাকে খোঁজাই ঔপন্যাসিকের সঠিক কাজ—এমন যুক্তি দেওয়া চলবে না। এক জাতি হওয়া সত্ত্বেও আচারে, পারিবারিক গঠনে, ধর্মীয় বিশ্বাসে ঐতিহ্যে

> হিন্দুতে ও মুসলমানে এমন কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে, কথাসাহিত্যে যার প্রতিফলন অপেক্ষিত।"[১]

তাঁর বক্তব্য যথার্থ। এক্ষেত্রে গৌরকিশোর ঘোষ ও সাম্প্রতিককালের কতিপয় কথাকার উল্লেখযোগ্য হলেও বড় ভূমিকা পালন করেছেন প্রতিভাবান কিছু মুসলমান কথাকার। তাঁদের রচনায় অন্য ভুবনের বিশদ পরিচয় মিলেছে। সর্বপ্রথম যাঁর নামোল্লেখ করতে হয়, তিনি সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। এরপর আফসার আমেদ, আবুল বাশার। এই ধারাতেই নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে যুক্ত হয়েছেন সোহারাব হোসেন (১৯৬৬-২০১৮)। তাঁর কথাসাহিত্যে বিশেষ একটি অঞ্চলের মুসলমান জনজীবন মূর্ত হয়ে উঠেছে বিশ্বস্ততার সঙ্গে। প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক অমর মিত্রের বক্তব্যেও এই স্বীকৃতি মেলে—

> "আমি সোহারাবকে চিনি অনেক বছর। তাঁর বাড়ি আমি গিয়েওছি। মেটে-আড়বেলে। আর একটু দূরে বসিরহাটের লাগোয়া দন্ডীরহাট গ্রামে আমার শৈশবের অনেকটা কেটেছে। এ ব্যতীত আমার চাকরিক্ষেত্রের কয়েকটা বছর ঐ অঞ্চলে কেটেছে। এই অঞ্চলের দরিদ্র, হতদরিদ্র বাঙালি মুসলমানের জীবন আমি যা দেখেছি শৈশব থেকে, তা প্রতিফলিত সোহারাবের লেখায়। উত্তর চব্বিশ পরগণার এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের চাষি-বাসী মানুষের জীবন সোহারাবের লেখায় যেভাবে এসেছে, তা আমি আগে পড়িনি।"[২]

যে সংখ্যালঘু মুসলমান জনজীবনের কথা কথাশিল্পীর লেখনীতে উঠে এসেছে তারা যে মূলত দরিদ্র হতদরিদ্র একথা সত্য। তাঁর কথাসাহিত্যে প্রধানত নিম্নবিত্ত সম্প্রদায়ের ভিড়। তাদের ভিন্ন ভিন্ন পেশা, দারিদ্র, রাজনৈতিক জাঁতাকলে পিষ্ট জীবন, জীবনকে টিকিয়ে রাখার সংগ্রাম, মাটির সঙ্গে যোগ, ধর্মবোধ, বিশ্বাস-সংস্কার, আচার-অনুষ্ঠান, সুখ-দুঃখ, ভিতর পরত ইত্যাদির উপর কথাকারের দৃষ্টি পিনদ্ধ। তাঁর প্রাথমিক পর্যায়ের সাহিত্য-সাধনা অন্তত সেই পথেই অগ্রসর হয়েছিল। 'মহারণ' (২০০৩), 'সরম আলির ভুবন' (২০০৪), 'মাঠ জাদু জানে' (প্রথম খন্ড-২০০৪, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে ২০১১) উপন্যাস; দোজখের ফেরেস্তা, মাঠ-মিছিলের দুঃখসুখ, আকাল যাযাবর, নূরবক্সের গাঁজাগাছ ও একটা প্রজাপতির গল্প, হাসপাখিদের গল্প, বোবাযুদ্ধ প্রভৃতি গল্প সেই সাধনারই ফসল। সর্বক্ষেত্রেই দেখা যায় সেই জীবনের যে ছবি তিনি নির্মাণ করেন, তা কেবল ছবিমাত্র নয়। সমাজ ও ব্যক্তির একেবারে নিগূঢ় প্রদেশে প্রবেশ করে তার 'হৃৎ' শব্দটিকে টেনে বের করে আনেন।

প্রাথমিকভাবে উল্লেখ্য 'মাঠ মিছিলের দুঃখসুখ' গল্পটি। গল্পে রয়েছে দারিদ্র্যের সঙ্গে পুরো পরিবারটির লড়াই। ছাফের আলি বাঘের ভয় উপেক্ষা করে সুন্দরবনের বাদা থেকে মধু সংগ্রহ করে। স্ত্রী ছমিরোন ধানের মরসুমে ইঁদুরের চালা খুঁড়ে সংগ্রহ করে সঞ্চিত ধান। খাল-বিল সেচে মাছ ধরে। এছাড়া রয়েছে গরু-ছাগল লালন-পালন। মায়ের কাজে সহযোগীর ভূমিকা নেয় কিশোরী মেয়ে জায়তুন ও ছেলে নেয়ামত। বাদা

থেকে ফিরে ছাফেরও তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়। জীবনের লড়াইয়ে গোটা পরিবারটা যেন মিছিল। বহির্বাস্তবতায় জীবনসংগ্রামের ছবি এইটুকু। লেখক অন্তর্দৃষ্টির গুণে উড়ান দেন অন্য ভূমিতে, ভিতরতন্ত্রীতে। সেখানে দেখা যায় ছমিরোন গর্তের মুখের মাটি শুঁকে বলে দিতে পারে ভিতরে ইঁদুর ধান্যভান্ডার জমা করেছে কিনা, সেই গর্তে সাপ আস্তানা গেড়েছে কিনা। তারপর কোদাল-শাবল নিয়ে চলে উদ্ধার কাজ। লেখকের বিবরণে—

> "ধান ওঠার মরশুমে মরশুমে চালার গন্ধ শুঁকে বেড়ায় ছমিরোন। সে চালার নাড়ি-নক্ষত্র জানে শুলুক-শালুক জানে। মনের মতো চালা পেলেই সেখানে বসে পড়ে শাবল-কোদাল নিয়ে। তারপর চলে একের পর এক চালার সয়াল ধরে মাটি খুঁড়ে চলা। অনেক খোঁড়াখুঁড়ির পর তবে মেলে ধান্যভান্ডার। কোথাও অল্প। কয়েক গোছামাত্র। কোথাও আবার বরাতজোরে আধ চুবড়ি—এক চুবড়ি।"[৩]

লেখকের জীবনাভিজ্ঞতা ও আত্মোপলব্ধির পাঠ-সম্মিলনের সার্থক ছবি। একই অনুভব-গভীরতা থেকে কৃষক-জীবনে মাঠের জাদুকে অন্তর্বাস্তবতায় রূপ দেন স্রষ্টা।

তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'মাঠ জাদু জানে'। উপন্যাসটির আঞ্চলিক পটভূমি মাঝেরদাঁড়ি নামক বিস্তৃত মাঠ এবং মাঠ-সংলগ্ন সাংবেড়িয়া (লেখকের জন্মস্থান), পূর্ব সাংবেড়িয়া, শ্রীনগর, মাটিয়া গ্রাম। নুরো মিয়া, কংগ্রেস নেতা পুরানো পঞ্চায়েত প্রধান জিয়াউল হক, মেম্বার প্রধান নাসের আলির মতো হাতে গোনা কয়েকজনকে বাদ দিলে এখানকার আপামর বাঙালি সংখ্যালঘু মানুষগুলির নিত্য সঙ্গী দারিদ্র্য। এই দরিদ্র মানুষগুলির একটি বৃহৎ অংশ ভাগচাষি। নিজস্ব জমি তাদের নেই। জমির মালিকানা মূলত নুরো মিয়ার মতো মুষ্ঠিমেয় কিছুজনের। কিন্তু জমির সঙ্গে আত্মার যোগ এই ভাগচাষিদেরই। কথাশিল্পী সেই নিবিড় যোগসূত্র বোঝাতে লেখেন,

> "মাঠের নাম মাঝেরদাঁড়ি। ইয়াব্বড়ো মাঠ। যেদিকে নজর ফেল না কেন সবুজে সবুজ। তিন-ফসলি সোনাফলা মাঠ। পয়মন্ত। তোমার দুঃখ হয়েছে? মাঝেরদাঁড়ির যে-কোনো বন্দের বুকের ওপর বসে পড় সব দুঃখ মাঠ-মা শুষে নেবে। মনে অশান্তি? ফসলময় মাঝেরদাঁড়ির যে-কোনো প্রান্তে শুয়ে গড়াগড়ি খাও তৃপ্তি পাবে। জীবনে বৈরাগ্য এসেছে? মাঝেরদাঁড়ির সোনাগভ্ভা ধানের গাছে ক'বার হাত বোলাও নতুন করে বাঁচার তাগিদ পাবে। দেহমনে যৌবন আসার গন্ধ—তার রি-রি উত্তাপ? একটাবার যুবতি মাঝেরদাঁড়ির যে-কোনো পটলখেতের মদ্দাফুলের সঙ্গে মেয়েফুলের মিল-মেলাও ঘটিয়ে দাও মনপ্রাণ জুড়িয়ে যাবে...এ মাঠ জাদু জানে। জাদু করে।"[৪]

এই যোগ নারীদেরও। সাবেরা তার জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত। মা আখেরাতুনের চোখেও কওছার দেখেছিল জমির জন্য আকুতি। বুঝেছিল,

"জমি বড়ো মহব্বতের বস্তু। চাষাবাসার বউ-ঝিরাও ওর মহব্বতের টান ছাড়তে পারে না।"[৫]

জমি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে লেখক যখন তেভাগা আন্দোলনে চলে যান সেখানেও মুসলিম নারীদের বিশেষ যোগসূত্রটিকে তুলে ধরেন।

উত্তর-চব্বিশ পরগণার বসিরহাট সংলগ্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যে সমাজবাস্তবতাকে লেখক আত্মানুভবে বিম্বিত করেন সেখানে অন্যান্য বৃত্তির মানুষেরাও শৈল্পিক-রূপমূর্তি লাভ করেছে তাঁর গল্প-উপন্যাসে। জমিকেন্দ্রিক উপন্যাস হলেও 'মাঠ জাদু জানে'তে এসেছে পকমিলের শ্রমিকদের কথা। 'মহারণ' উপন্যাসে বেশ কিছু ভিন্ন বৃত্তির পরিচয় মেলে। এরা সকলেই প্রায় ভূমিহীন এবং ভিন্ন ভিন্ন জীবিকার সঙ্গে যুক্ত। বিড়িবাঁধা (রহিমবক্স, হেরাসতুল্লো, কেয়ামত), মাছধরা (খাদেম জেলে, হেকমত), রাখালিয়া (জবের), পাখিধরা (জবের), ভ্যান রিক্সা চালানো (কওছার) ইত্যাদির মাধ্যমে এরা জীবিকা নির্বাহ করে কষ্টেসৃষ্টে। কেউ কেউ বসিরহাট সংলগ্ন বিশাল জলকর এলাকার স্বল্প বেতনের চাপরাশি (হয়াত)। রাখালিয়া, পাখিমারা, মাছধরা জীবিকার কিছু পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণও রয়েছে কাহিনির মধ্যে। 'সরম আলির ভুবনে'র সরম আমবাগানের পাহারাদার। পাশাপাশি 'দোজখের ফেরেস্তা' গল্পের সাহেবালির মতো সেও কবরখননের কাজ করে বংশ-পরম্পরায়। সরমের কাহিনির সূত্র ধরে কথাকার ওই সমাজের মৃতদেহ সংস্কার, কবরখননের বিশেষত্ব ও মৃতদেহ কবরস্থ করার নিয়মকানুনের সম্যক পরিচয় দিয়েছেন। অন্য সম্প্রদায়ের কাছে স্বতন্ত্র একটি দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। সরমের সংসারে স্ত্রী ইমানতনেরও ভূমিকা আছে। জমিলা, আলিমোন, আখতারীর মতো সেও সংসারের হাল ধরতে আর্থিক দৈন্যের সঙ্গে লড়াই করে। প্রতিপালন করে গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি। এই অবলাগুলিকে নিয়ে তার পরিশ্রম দিবারাত্র। সে নিত্য চলে আসে 'কুনির পাড়ে'। শুধু সে নয়, জমিলা, আলিমোন, আখতারিরাও। দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই তাদের। বাবলা গাছের ছায়ায় বসে গরু-ছাগল দেখভাল, কাঁথা বোনা বা চ্যাটাই বোনা তাদের প্রতিদিনের রোজনামচা। এরই ফাঁকে পারস্পরিক রঙ্গ-তামাসা, সুখ-দুঃখের কথা, কেচ্ছা-কাহিনির আলোচনা। স্বামী-স্ত্রীর যৌথ পরিশ্রমে ও চেষ্টাতে সচ্ছল জীবনের অধিকারী তারা নয়। ভালো-মন্দ খেতে পাওয়া বা বিলাসিতা তাদের জীবনে বাহুল্য। লক্ষণীয়, অবৈধ যৌন-আলিঙ্গনের মুহূর্তেও আধাআধি বখরার হিসাব-নিকাশ সরমের মাথায় ঘুরপাক খায়। ফজলীর নরম দেহকে বুকে আশ্রয় দিয়েও তাকে বলতে শুনি—

"মনে থাকে যেন- আধাআধি। কতো দিন যে বালবাচ্ছাগুনোর মুখি এট্-টু পোলোয়া-আলোয়া, গোস্তো-গরমি ধরতি পারি নিকো। মনে থাকে যেন- আধাআধি।"[৬]

এই দারিদ্র্যের চরম নিদর্শন তার গো-মাংস ক্রয়ের ঘটনা। রবিবারের গরুর মাংসের হাট। সরম ও তার মতো দরিদ্র মানুষেরা সন্ধ্যা নামলে ঢোকে সেই হাটে। দোকানের

আশপাশে ঘুরঘুর করে। তীক্ষ্ণ নজরে দেখে নেয় কোথায় সঞ্চিত আছে সারাদিনের বাসি-টক মাংস। দামদস্তুর করে সস্তায় কিছুটা মাংস কিনে নিতে পারা।

মুসলমান সমাজে শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের পরিচয়-বিশিষ্টতায় কতিপয় মানুষ কসাই, গরু জবাই করে। যেমন, 'আকাল যাযাবর' গল্পের ফরিদ। প্রায় ২৩জন কসাইয়ের গরু জবাই করে সে। গর-হাটের দিন একটি গরু এবং হাটবারে তিন-চারটি। গরু পিছু পারিশ্রমিক তিনটাকা, উপরি পাওনা মাংসের 'ছাট' ও 'গাওট'। কিন্তু তার এই জীবিকা সংকটের মুখে পড়ল হজ করে আসা জিনাত আলির কারণে। তারই এক সময়ে সাকরেদ জিনাত, হাজি হওয়ার পর মুসলমান জনসাধারণের কাছে তার জবাই করা মাংসই পবিত্র; ফরিদের মাংস না-পাক, অপবিত্র, হারাম। সকল খরিদ্দারের বক্তব্য—

"মোছলমানের বাচ্চা তো, হারামের জবাই মুখি তুলতি পারব না।"[৭]

ধর্ম ফরিদকে অস্তিস্ত্ব-সংকটের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিল। শুধু পায়রা ও কুকুরের খাদ্য জোগান নয়, বিবাহযোগ্যা দুই কন্যার দায়ও তারই উপর। তার তিন ছেলে যথাক্রমে জনমজুর, ডাব-ব্যাপারী ও কলার দোকানদার। তারা ভার নিতে রাজি নয়। মূল শিল্প-সার্থকতা অন্যত্র নিহিত হলেও সংখ্যালঘু শ্রমজীবী মানুষের অস্তিত্ব-সংকটের বহির্বাস্তবতাতে এই গল্পের মূল্যমানতা কম নয়।

একেবারেই হতদরিদ্র মানুষ সাহেবালি। বৃত্তি—কবরখনন। দু-চালা ঘর, ছেঁড়া মাদুরের টুকরো, পরনের ছেঁড়া-খোড়া লুঙ্গি-পাঞ্জাবি তার দারিদ্রতার স্মারক। একসময় জনমজুরি খাটলেও শরীর ভেঙে যাওয়ায় সেই কাজ করার ক্ষমতা আর তার নেই। গৃহস্থরা তার কাছে কম কাজ পায় বলে, কাজে নেয় না। কবর খুঁড়ে জোটে শুধু পেটভাতা ও কুনখালির দিন অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি মারা যাওয়ার চতুর্থ দিনে যে গরীব ভোজন হয় সেদিনের খাওয়া-দাওয়া। সকলের লাশ থেকে দোজখের গন্ধ পাওয়ার কারণে যৎসামান্য বরাদ্দ মজুরিটুকু সে পায় না। প্রয়োজনে তাকে অন্যের কাছে ভিক্ষার হাত পাততে হয়। স্ত্রীকে পাঠাতে হয় অন্যের বাড়ি ঝি-গিরি করতে। কলিজা ভেঙে গেলেও তার অবৈধ সম্পর্কে মুখে কুলুপ আঁটতে হয়। নাহলে,

"সোংসারডা ছারেখারে যায়। প্যাটটা সবার খালি থাকে একবেলা।"[৮]

মুসলমান সমাজের প্রান্তিক মানুষের অনবদ্য জীবনালেখ্য।

মুসলমান জনজীবনের অন্তর্গত রঙ-মিস্ত্রির দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকার চিত্র উঠে এসেছে নূরবক্স চরিত্রের মধ্যে দিয়ে। ইচ্ছা করলেই কাজ জোটে না তার। কখনো কখনো মাসাধিক কাল কর্মহীন থাকতে হয়। তখন ভরসা বে-আইনি তিনটি গাঁজা গাছ। সারা বছর পেট ভরে খেতে পাওয়া তার সংসারে বাহুল্য। প্রতিদিন ভাতের বন্দোবস্তটুকু করার ক্ষমতা নেই নূরবক্সের। বহুদিন পর মালিকের বাড়িতে ভাত খেতে বসে সন্তান হেলাতালি তাই মাপ ঠিক রাখতে পারে না। টিকে থাকতে কৌশল

অবলম্বন করতে হয় নূরবক্সকে। আর্থিক-স্বচ্ছল পার্টি পেলে কথার মারপ্যাঁচে সাধারণ চুনের পরিবর্তে কলিচুন দিয়ে রঙ করানো, দেওয়ালে দর্পনের মতো প্রতিবিম্ব পড়ার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ও ছলনার দ্বারা পার্টিকে বোকা বানানো—সবই জীবিকার কৌশল। ছেলেকে সঙ্গী করার পিছনেও রয়েছে খেতে না পাওয়া মানুষের হিসাববুদ্ধি—

> "মালিক মজুরি দিক আর না-দিক, দুপুরের খাবারটাতো দেয়। বাড়িতে তো তাও পাবে না।"[৯]

কী চরম দারিদ্র্যে বসিরহাট সংলগ্ন মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলের কিছু পরিবার বসবাস করে, জীবন অভিজ্ঞতার সেই পাঠে স্রষ্টার কোনো ত্রুটি ছিল না। এদের মধ্যে অনেকেই জীবনযুদ্ধে পরাজিত মানুষ। যেমন, 'মহারণ' উপন্যাসের নেয়ামত গাজীর মতো মানুষের ক্ষমতা নেই সন্তান-প্রসবকারী স্ত্রীর সম্মান রক্ষার। ঘরের দাওয়ার একদিকে পাতলা কাপড়কে পর্দা করে তৈরি করতে হয় আঁতুড় ঘর। লেখক জানান,

> "গরিবের সংসারে আলাদা ঘরের আড়াল তো দূরের কথা এর বেশি পর্দা করার ক্ষমতা নেই নেয়ামতের।"[১০]

উল্লেখ করতে হয় 'সরম আলির ভুবন' উপন্যাসের লেকজান বুড়ি ও দিদার বক্সো মণ্ডলের কথা। লেকজান বুড়ির ঘরের কঙ্কালসার চিত্র ও যৎসামান্য আহারের ব্যবস্থা স্তম্ভিত করার মতো। সামান্য কেরোসিনের আলো জ্বালাতে পারার মতো সামর্থ্যটুকু নেই দিদার বক্সোর পরিবারটির। এই পরিবারে আলো চাওয়ার অর্থ মোচ্ছব।

সংখ্যালঘু গ্রামীণ সমাজের স্বরূপ-পরিচয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় পরিমন্ডলটি বা আচার-সংস্কারের স্বাতন্ত্র্য। বিষয়টি অন্য সম্প্রদায়ের চোখে আবিষ্কারের সামিল। এর সর্বাধিক এবং বিস্তৃত পরিচয় মেলে 'সরম আলির ভুবন' উপন্যাসে। ধর্মীয় সংস্কারজনিত কারণে এই উপন্যাসের নকিবের কণ্ঠে শোনা যায় ওই সমাজে প্রচলিত পাপ-পুণ্যের হিসাব। সে সাচ্চা মুসলমান। তার ইচ্ছা সারাজীবন দাড়িতে নাপিতের ক্ষুর লাগাবে না। ধর্মের পথ ধরে চলবে। সে বিশ্বাস করে পার্থিব জীবনে যৌন-ব্যভিচার, পাপকাজ, চুরি-চামারি করলে আল্লাতালা তাকে কঠিন শাস্তি দেন। দোজখের যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। নকিবের কথায়, পুণ্যবান ব্যক্তি মরণোত্তরকালে পোলাও, কোপ্তা-কাবাব, গোস্ত, মন্ডা-মিঠাই ইত্যাদির অধিকারী হয়। কিন্তু পাপী ব্যক্তি তার বদলে পায় পচা-লাশের পোকা ধরা 'গোস্ত'। 'কালিয়া-কোপ্তা'র বদলে জোটে পাকা ফোঁড়ার ঘিনঘিনে পুঁজ। মাছের দাগার পরিবর্তে মানুষ বা শুকরের মল, ডিমের কালিয়ার বদলে জোঁক আর কেঁচোর দলা। স্নান, প্রস্রাব-পায়খানাতে জলের পরিবর্তে থাকে মানুষের মরা-পচা রসে 'টই-টুম্বুর পুকুর'। পাপী বা অপরাধী মানুষের শাস্তি সংক্রান্ত ধারণা সংযুক্ত হয়েছে 'মাঠ জাদু জানে' উপন্যাসেও।

ধর্মীয় সংস্কারের অঙ্গীভূত এ সমাজের নারীরাও। এর একটি বাস্তব রূপচিত্রণ মেলে 'সরম আলির ভুবন' উপন্যাসে বয়স্কা আখতারীর মাধ্যমে। সে কলমা-কালাম (ইষ্ট-মন্ত্র) জপ করে, রোজা রাখে, নামাজ পড়ে। পাড়ার মেয়ে বউদের ধর্মকথা

শোনায়। ধর্মকে কেন্দ্র করে এই সমাজে জন্ম নানা উপাখ্যানের। যেমন, নলকুড়ের সোবান মৌলবির কণ্ঠে শোনা গেছে ওলি-আল্লার আকর্ষণীয় ধর্মোপাখ্যান। পাখিদের কাঁকড় বৃষ্টির মাধ্যমে 'কাবা ঘর' রক্ষায় অলৌকিক কাহিনি উঠে এসেছে কেয়ামতের বিবরণে। সরমের অতীত কথনে 'খাসা কুঁড়ে'র ইতিকথা। ধর্মের মোড়কে গড়ে ওঠা উপকথা-লোককথার ও ইতিকথার ঝুলি উজাড় করে দেয় আখতারি।

কথাশিল্পী আট-নয় দশকের মুসলমান জনমানসের যে প্রতিবম্বন ফুটিয়ে তোলেন তার আঁতের সঙ্গে জড়িত বিশ্বাস-সংস্কারকেন্দ্রিক দেশজ-লোকজ উপাদানগুলি। এগুলির যথার্থ সম্পৃক্তকরণের গুণেই তাঁর প্রথম পর্যায়ের রচনাগুলি মুসলমান জনজীবনের সার্থক ছবি হতে পেরেছে। 'মাঠ জাদু জানে' উপন্যাসে লক্ষণীয় তাদের জীবনের পরতে পরতে জড়িয়ে জিন-পরীর সংস্কার। তারা বিশ্বাস করে ঠাকুর বটতলায় এক প্রকান্ড জিনের অবস্থানকে। মাঠের উর্বরতার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারে জিন-পরীর মিলনকে। জামির আলির মৃত্যু ও রাতারাতি মাঝেরদাঁড়ি মাঠের সমস্ত আমগাছের কর্তনের সঙ্গে জিনের ভূমিকাকে জুড়ে নিতে এদের বাধা নেই। পরীকেন্দ্রিক সংস্কার সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায় মাঠপরীর ছদ্মবেশে জামির আলির রাত-অভিসারের ঘটনায়। রাত্রে মাঠপরীর আবির্ভাবে শিহরিত হয়ে ওঠে সকল মানুষ। এ তাদের কাছে অমঙ্গলসূচক। তাদের ধারণা গ্রামে অনাচার হলে আবির্ভাব ঘটে মাঠপরীর। তাতে উজাড় হয়ে যায় গ্রাম। ক্ষতির সীমা-পরিসীমা থাকে না। সেই কুপ্রভাব ঠেকাতে তারা গ্রামবন্ধনে বেলেঘাটার মৌলবি সাহেবের দ্বারস্থ হওয়ার সংকল্প করে এবং বাড়ি বাড়ি চাল, পয়সা তোলা শুরু করে। 'সরম আলির ভুবনে'র আমবাগানের পাহারাদার সরম জনমানসের এই অন্ধবিশ্বাসকে কাজে লাগিয়েই তার সুবিধাবাদী উদ্দেশ্য সাধন করেছে। প্রয়োজনে ফজলীকে নকল পরী সাজিয়েছে। সেই পথেই মৃত্যু ঘটেছে তরিকুলের। সরমের কাহিনীর মধ্যে দিয়ে এই সমাজে প্রচলিত পরীর আবির্ভাব ও রূপযৌবন সংক্রান্ত ধারণাটিকেও স্পষ্ট করেছেন ঔপন্যাসিক। 'আতুসি' কেন্দ্রিক ভৌতিক ভীতির পরিচয় মেলে 'মহারণ' উপন্যাসের জবেরের মাধ্যমে।

এই সমাজের ধর্মীয় বাতাবরণে জড়িয়ে রয়েছে বহু ফেরেস্তা নাম। তিনি আল্লার নির্দেশানুসারে মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে আসেন। কৃতকর্ম অনুযায়ী শাস্তি বিধান করেন। পুণ্যবান মানুষের কাছে তিনি পবিত্ররূপে হাজির হন এবং পাপীর কাছে ভয়ঙ্কর রূপে। কেতামিন-কারেমিন নামক দুই ফেরেস্তা নাকি জীবন্ত মানুষের দুই কাঁধে চড়াও হয়ে হিসাব রাখেন পাপ-পুণ্যের। এই ফেরেস্তাভীতি লক্ষ্য করা গেছে 'সরম আলির ভুবনে'র রহমান মিস্ত্রির মধ্যে, যখন সে বড় মেম্বারকে তরিকুলের মৃত্যুর খবর দিতে যাচ্ছিল। এই অঞ্চলের বা মুসলমান সমাজের লোকবিশ্বাসে জুম্মাবারে মৃত্যু পবিত্র বলে বিবেচিত, বেহেস্তের নিশ্চিত ঠিকানা। অলৌকিক বিবরণে সরমের বেহেস্তবাসী চাচা তোরাপদির মাধ্যমে লেখক জনমানসে বেহেস্ত ধারণা সম্বন্ধে জানান, সেখানে কোনো কালো নেই,

পাপ নেই। বেহেস্তের রঙ সাদা। বেহেস্তে গেলে সব সাদা হয়ে যায়। এমনকি চামড়ার রঙও। নিজস্ব সংস্কারে আচ্ছন্ন, টোটকা-তাবিজ-পানিপড়া-নলচালা-চালক করা প্রভৃতিতে আস্থাবান বসিরহাট সংলগ্ন মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলের এইসব মানুষগুলি। নগুরে দর্শনে এদের ধরা অসম্ভব। নাগরিকতায় তাদের কিছু বিশ্বাস-সংস্কার হয়তো হাস্যকরও। কিন্তু তাদের জীবনযাপনে এগুলি যুক্তিবাদের বাইরে অবস্থান করেই সত্যমূর্তিতে প্রতিষ্ঠিত। সেই বিশ্বাসের জমি থেকে সন্তান লাভের আশায় সাবেরা পালন করেছিল অদ্ভুত এক গ্রামীণ টোটকা—

> "অমাবস্যার রাতে, নিশুতি রাতে, একা উলঙ্গ হয়ে ঘরের ঠিক মধ্যিখানে একটা নতুন কেনা মেটে হাঁড়িতে সরা চাপা দিয়ে, একটা বকসাদা মোরগের বাচ্চা পুঁতে দিয়েছে। দিয়ে তার ওপরই বিছানা পেতে তো শুচ্ছে স্বামী-স্ত্রীতে...একই নিয়মে তিনমাস স্বামী-সহবাস করতে হবে এই বিছানায়। তবেই খোদাতালার আরশ থেকে ফেরেশতার মতোন পবিত্র শিশু এসে তার গর্ভে জাঁকিয়ে বসবে।"[১১]

যে-কোনো সমাজের বাস্তবতায় থাকে উৎসব-অনুষ্ঠানের চিত্র, যা সমাজের অন্দরমহলটিকে আরো স্পষ্ট করে। 'মাঠ জাদু জানে' উপন্যাসে কওছার ও সাত্তারের বিবাহানুষ্ঠানের বিবরণে সেই কার্য কিছুটা সিদ্ধ করেছেন ঔপন্যাসিক। দুই বিবাহের বিবরণে মুসলিম সমাজের বিবাহ বিষয়ক বেশ কিছু রীতি-রেওয়াজের পরিচয় মেলে। বিবাহের একদিন পূর্বে আইবুড়ো ভাতের দিন ঘরের মেয়ে-বউরা পুরুষদের ব্রাত্য রেখে কীভাবে নিজস্ব নাচ-গানের আসর জমায় তার একটি উজ্জ্বল চিত্র ধরা পড়েছে সাত্তারের বিবাহে। বিবাহানুষ্ঠানে বরপক্ষ-কন্যাপক্ষের বুদ্ধি-বাটাবাটির খেলা, বরপক্ষের পরাজয়, কন্যাপক্ষের অর্থদাবি, ভুল বোঝাবুঝিতে হাতাহাতি, শেষে মিলমিশ ইত্যাদি বহু বিষয়ের অবতারণা রয়েছে এই গ্রন্থে। সরমের কাহিনিতে বরযাত্রী প্রসঙ্গে তোরাপদির আচরণ ও ঘটনার যে বিবরণ রয়েছে তা যথেষ্ঠ হাস্যোদ্রেককারী কিন্তু সমাজের রূপবিম্বনে তা বাহুল্য নয়। সবটা মিলিয়েই সমাজ। লেখকের এই অনুভবে কোথাও কোনো ঘাটতি নেই।

বাংলা সাহিত্য কেন কথাশিল্পী সোহারাব হোসেনকে মনে রাখতে বাধ্য, তার একাধিক কারণ। কিন্তু সর্বাধিক বলিষ্ঠ কারণ সংখ্যালঘু সমাজ-জীবনের স্বরূপ উদ্ঘাটন। লেখক বারবার বলতে চান বাইরে থেকে তাঁর সমাজকে এক রঙা সাদামাটা মনে হতে পারে। কিন্তু এর ভিতরে অনেক পরত। এর ভিতরতন্ত্রীতে আছে অনেক অচেনা সত্তা। আবরণ ভেদ করে সেই সত্তাগুলি চিনতে পারলে তবেই সেই সমাজ ও সমাজের মানুষগুলিকে চেনা যায়। লেখক তাঁর সাহিত্য-সৃজনের মধ্যে দিয়ে এই কাজটিই সুনিপুণভাবে করেছেন, নিঃসন্দেহে বলতে পারি। নির্দিষ্ট অভিমুখী এই অন্বেষণে তার বেশ কিছুটা পরিচয় মেলে।

সূত্র-নির্দেশ:

১. ক্ষেত্র গুপ্ত, বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (দ্বিতীয় খন্ড); গ্রন্থ নিলয়, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২রা ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪, পৃ. ১২৭।

২. অমর মিত্র, সোহারাব আমার প্রিয় লেখক; এমদাদুল হক (সম্পা:), স্মারক-৫০শে পা- সোহারাব হোসেন, গতি, কলকাতা, ২৫ নভেম্বর, পৃ. ১২৭।

৩. সোহারাব হোসেন, মাঠ-মিছিলের দুঃখসুখ, শ্রেষ্ঠ গল্প; করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা-২০১০, পৃ. ৪৫।

৪. সোহারাব হোসেন, মাঠ জাদু জানে; করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম অখন্ড সংস্করণ, কলকাতা বইমেলা, ২০১১, দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুন ২০১৯, পৃ. ১৬-১৭।

৫. তদেব, পৃ. ৭১।

৬. সোহারাব হোসেন, সরম আলির ভুবন; করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা-২০০৪, পৃ. ৮২।

৭. সোহারাব হোসেন, আকাল যাযাবর, দোজখের ফেরেস্তা; রত্নাবলী, কলকাতা; প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা-১৯৯৬, পৃ. ২০।

৮. সোহারাব হোসেন, দোজখের ফেরেস্তা; তদেব, পৃ. ৮৭।

৯. সোহারাব হোসেন, নূরবক্সের গাঁজাগাছ ও একটা প্রজাপতির গল্প, আয়না যুদ্ধ; করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ২০০৫, পৃ. ২৬৬।

১০. সোহারাব হোসেন, মহারণ; করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা-২০০৩, পৃ. ১৫৮।

১১. সোহারাব হোসেন, মাঠ জাদু জানে; তদেব, পৃ. ১৪৪।

‘গাছটা বলেছিল’ : ছোটগল্পে যাদু-বাস্তবতার প্রয়োগ

নকুলচন্দ্র বাইন
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
দ্বিজেন্দ্রলাল কলেজ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া

সারসংক্ষেপ: শুধু প্রকৃতির কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়া নয়, প্রকৃতির মধ্যে জৈবি সত্তা উপলব্ধি করেছেন সাহিত্যিক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। এই উপলব্ধির প্রকাশ ঘটেছে তাঁর ‘গাছটা বলেছিল’ গল্পে। সিরাজের বহু রচনার মতো এই গল্পেও আছে ম্যাজিক রিয়্যালিজম বা যাদু বাস্তবতার ছোঁয়া। যাদু বাস্তবতা হলো এমন এক শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গি, যেখানে প্রতিদিনের চেনা জীবনের রহস্যময় দিকে আলোকপাত করা হয়। মানুষ ‘হ্যাঁ’ আর ‘না’ এর সংশয়ে আন্দোলিত হ’তে থাকে। সিরাজ তাঁর উপলব্ধির প্রকাশ ঘটিয়ে দেখিয়েছেন যে, প্রকৃতি ভালোবাসার পাশাপাশি লালন করে চলেছে হনন করার তীব্র লালসা। গল্পের গাছটিও সে ভূমিকা পালন করছে। গাছটি যাকে ‘মর্ মর্ মর্’ বলে, সে-ই মরে যায়। অলৌকিকতায় বিশ্বাসী কিছু মানুষ গাছটির এই জৈবি সত্তায় বিশ্বাস করেছে। এমন কি যারা গাছটির প্রাণ থাকার কথা অস্বীকার করে গাছটিকে কেটে ফেলতে চেয়েছিল, তারাও মারামারি করে মরেছে।
সূচক শব্দ: সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, প্রকৃতি, গাছ, ম্যাজিক রিয়ালিজম, বুড়ি, নোলেদা, ডাক্তার, নো-ম্যান্স-ল্যান্ড।

মূল আলোচনা :

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ একজন কথাসাহিত্যিক, বহুভাষাবিদ, সৃজনশীল, মার্জিত ব্যক্তিত্ব। বহুপাঠের গুণে তিনি জীবন ও জগতকে চিনেছেন, বিশ্লেষণ করেছেন এবং নিজের মত করে গ্রহণ করেছেন। জীবনকে তিনি যতভাবে এবং যেভাবে দেখেছেন সেই দেখা দুটি পর্যায়ে বিভক্ত। একটি হলো গ্রামীণ প্রকৃতি ও মানুষকে দেখা, অন্যটি হলো কলকাতার নাগরিক পরিবেশে ব্যস্ত জীবনকে দেখা। এই দু’য়ের মধ্যে অপূর্ব ভারসাম্য ঘটিয়েছেন তিনি।

সিরাজের গল্পের মধ্যে মাটির গন্ধ পাওয়া যায়। এই বৈশিষ্ট্যের কারণে তাঁকে অনেকে কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমগোত্রীয় লেখক মনে করেন। এর প্রধান কারণ হলো, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের মিল। তারাশঙ্কর যে মাটি ও মানুষকে দেখেছেন, সিরাজও প্রায় সেই মাটি ও মানুষকে দেখেছেন। তবে উভয়ের পর্যবেক্ষণ ও উপস্থাপনের ভঙ্গি স্বতন্ত্র। যৌবনের বেশ কিছুদিন লোকনাট্য আলকাপ-এর দলে যুক্ত থেকে ভিন্নতর এক অনুভবে সমৃদ্ধ হয়েছে সুশিক্ষিত সিরাজের ‘লোকশিল্পী সত্তা’। তাঁর ছোটগল্পে জীবনের যে খণ্ড খণ্ড মুহূর্তগুলি মহাসত্যের আভাস দেয় সেগুলির অধিকাংশই তাঁর অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত।

তিনি যে অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং যে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বড় হয়েছেন, সেখানে সবধরনের মুক্ত চিন্তার অবকাশ তাঁর মানস গঠনে সহায়তা করেছে। গ্রামের মানুষ হিসেবে প্রকৃতির সঙ্গে গভীর অন্তরঙ্গতা ছিল তাঁর; আজীবন ব্যাকুল হয়েছেন সেই প্রকৃতির কাছাকাছি থাকতে। সংসারী মানুষ হলেও তিনি বাল্যকাল থেকেই মানসিকতায় ছিলেন একাকী; এই একাকীত্ব তাঁকে প্রকৃতির দিকে আকর্ষণ করেছে। তাঁর বৃক্ষপ্রীতি চোখে পড়ার মতো। জীবনের একটি স্মরণীয় স্মৃতির উল্লেখ করে তিনি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, "নদী আমাদের গ্রাম থেকে প্রায় দু মাইল। তো ওখানে একটা বটগাছ ছিলো। বিশাল মাঠ, তার মাঝে একটা বটগাছ। ওই বটগাছের দিকে হেঁটে যেতাম। ... ... এই স্মৃতিটা আমার সবথেকে প্রিয়। এখনো আমি সেখানে পৌঁছাতে চাই।"[১]

সাহিত্যে একাধিক অনুষঙ্গে 'নেচার' বা প্রকৃতির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়, তা সত্ত্বেও সেই প্রসঙ্গ কখনও পুরনো বা 'মলিন' হয়ে যায় না। মানুষ কখনও প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে কখনও বা মিত্রতা করে নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে; তার অস্তিত্ব সহাবস্থানের প্রতিশ্রুতিতে মান্যতা পেয়েছে। প্রকৃতির মধ্যে মানুষ খুঁজে পেয়েছ দেবত্ব ও সৌন্দর্য। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ এর পাশাপাশি প্রকৃতির আরও এক অমোঘ শক্তি অনুভব করেছেন। "জীবন ও মৃত্যুর সব রহস্যের উৎস প্রকৃতি—অথচ জীবনের জন্যে যেন তার কোন করুণা নেই, মৃত্যুর জন্যে নেই কোন শোক। তার কাছে মানুষ কী অসহায়! সে-নিজে দ্বন্দ্বহীনা—অথচ মানুষের সব দ্বন্দ্বের কারণ সে। কী অদ্ভূত!"[২]

প্রকৃতির কাছাকাছি শুধু পৌঁছে যাওয়া নয়, প্রকৃতির মধ্যে জৈবি সত্তাকে উপলব্ধি করেছেন তিনি। এই উপলব্ধির প্রকাশে তাঁর ছোটগল্পের ধারায় এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন হয়ে উঠেছে 'গাছটা বলেছিল' গল্প। তাঁর বহু গল্পের মতো এই গল্পেও প্রধান চরিত্র হয়ে উঠেছে প্রকৃতি; আরও নির্দিষ্ট করে বলা যায় একটি গাছ। হিন্দু ও মুসলমান পাড়ার মধ্যে একটু উঁচু নো-ম্যানস্ ল্যাণ্ড-এ দাঁড়িয়ে থাকা একটি ফুল-ফলহীন নাম না জানা পুরনো গাছ এই গল্পে কখনও একটি বক্তব্যের প্রতীক, কখনও বা সময়ের নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠেছে। গল্পের অধিকাংশ চরিত্র যেন এই গাছটির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; তাদের কেউ কেউ গাছটির জৈবিক সত্তার কথা বিশ্বাস ক'রে তার মৃত্যুবরণের নির্দেশের কাছে নতিস্বীকার করেছে।

আধুনিক যুগের জটিল ভাবনার পাশাপাশি বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি বোধ ও জীবনবোধের সমন্বয়ে এই গল্পে সিরাজ এক অভিনব 'দর্শন' এর প্রকাশ ঘটিয়েছেন। লৌকিকতার মধ্যে অলৌকিকতার বিশ্বাস এই গল্পে যেন গণ সম্মোহনের বিস্তার ঘটিয়েছে। গল্পে জানানো হয়েছে, "গাছেরা কথা বলে। গাছেরা বাতাস থেকে ভাষা শেখে। ... কোনও কোনও গাছও মানুষের ভাষা শেখে।"[৩]

গল্পের গাছটির বিচিত্র গুণ—মানুষের ভাষায় কথা বলা। তার কথা সবাই শুনতে পায় না; কেউ কেউ শুনতে পায়। যে শুনতে পায়, গাছটা তাকে 'মর্ মর্ মর্' বলছে, সে-ই ম'রে যায়। এমন বিচিত্র বিষয় ও ভাবনার গল্পকে আরও রহস্যময় ক'রে তোলার জন্য গল্পকার গাছের মধ্যে কিছু 'মানসিক গুণ' আরোপ ক'রে জানিয়েছেন, "এ যাবৎ বেশ কয়েকটি গাছের গল্প বলেছি। সেই গাছগুলি জৈব চরিত্রের। তাদের কেউ কেউ ভয়াল কি নিষ্ঠুর হলেও কেউ কেউ ছিল দয়ালু, সহৃদয়। কেউ জীবন আর পৃথিবীর একটা চমৎকার মানেও বুঝিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তাদের নিজস্ব ভাষা ছিল। এই গাছটার মতো তারা কেউ-ই মানুষের ভাষায় কথা বলেনি।"[৪]

বৈজ্ঞানিক আলোচনার ছোঁয়া দিয়ে লেখক জানিয়েছেন যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সব কিছু যেমন জোড়ায় জোড়ায় আছে, তেমনি আছে শব্দ ও শব্দহীনতা। এই শব্দ 'অসমানুপাতিক'। মৌনের প্রতীক গাছদের মৌনতা এমনই 'অসমানুপাতিক'। এই সূত্রেই গল্পের গাছটি সম্পর্কে লেখক জানিয়েছেন, "এই গাছটা, যার মৌন ছিল না শুধু তা-ই নয়, মানুষের ভাষা নকল করার ক্ষমতাও ছিল। কী বিপজ্জনক আর কী চিন্তাযোগ্য উদ্ভিদ, বলার নয়।"[৫]

এই বয়ানের বুনোটে পাঠককে জড়িয়ে নিয়ে লেখক গাছটির যে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন, তা থেকে গাছটির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে—

ক) গাছটি মারক জৈব উদ্ভিদ।

খ) ফুল-ফলহীন বন্ধ্যা গাছটি যেন 'বৃহন্নলা'।

গ) বৈশিষ্ট্যের কারণে গাছটি ছিল ফালতু, অনাথ, জাত-গোত্রহীন, হ্যাংলা আতুর ও নিঃসঙ্গ ।

ঘ) গাছটির কিছু হারাবার ভয় ছিল না। কারণ, সে ছিল 'যথার্থ প্রোলেটারিয়েট' বা সর্বহারা।

আকন্দ-ফণিমনসা ও আরো কিছু আগাছায় ঢাকা কাছিমের পিঠের মত এক টুকরো মাটির উপরের মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা সংহত উন্নত গাছটি যেন মানুষের নিদান হাঁকত। এই ছিল তাঁর 'অনিবার্য বিপ্লব'। বসন্তের এক নির্জন দুপুরে তার তলায় পাতা কুড়োতে আসা এক পাতাকুড়নি বুড়িকে গাছটি বলেছে, 'মর্ মর্ মর্!' একথা শুনে বুড়ি বাড়িতে এসে তার ছেলের বউয়ের কাছে এক গ্লাস জল খেতে চেয়ে বলেছে, "ও বউ, আমি তবে মরি, কোন না মুখপোড়া গাছটা আমাকে বলল মর্ মর্ মর্।"[৬] এরপর বুড়ির হাত থেকে জলের গ্লাস পড়ে যায় এবং সে হেঁচকি তুলে মারা যায়।

গল্পে গাছটির নিদান শুনে প্রথম মরে যাওয়া এই বৃদ্ধার মৃত্যু যে রহস্যময়, অলৌকিক মনে হলেও সত্যি, তা বুঝাতে গিয়ে তার ছেলের বউ অনেকবার 'শপথবাক্য' উচ্চারণ করেছে। অর্থাৎ, লেখক জানিয়ে দিলেন যে গ্রামের মানুষের মনে গাছটির অলৌকিক ক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত ধারণার সৃষ্টি করেছে বৃদ্ধার ছেলের বউ। গ্রামের নিস্তরঙ্গ জীবনে এমন একটি ঘটনা স্বাভাবিক কারণেই শোরগোল ফেলেছে। বিশ্বাস-

অবিশ্বাসের দোলায় দুলতে থাকে গ্রামবাসীর মন। যারা অবিশ্বাস করে বা করতে পারে তাদের মধ্যে পাড়ার 'গাঁজাখোর' নোলেদা, তদন্ত করতে আসা থানার দারোগা, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের তরুণ ডাক্তার অসীম বোস গাছটির মারণ-নির্দেশের শিকার হয়েছে বলেই অধিকাংশ মানুষের বিশ্বাস।

'সিনিক' বা নিন্দুক, চির অবিশ্বাসী প্রৌঢ় নোলেদা তার আজন্ম লালিত অবিশ্বাস আহত হওয়ায় সে গাছটির এই শক্তিকে 'চ্যালেঞ্জ' করে বলেছিল, "যদি তোর সাহস থাকে, আমাকে একবার বল্, মর্ মর্ মর্।" এরপর তিনি শুনতে পেলেন, গাছটা যেন তাঁকে 'শনশনিয়ে সত্যিই বলল, মর্ মর্ মর্'। গাছটার গুড়িতে লাথি মারতে গিয়ে তিনি পড়ে গেলেন, আর উঠলেন না।

কথা-বলা গাছটিকে নিয়ে গ্রামের মানুষ দ্বিধা বিভক্ত। স্কুল শিক্ষক মনজুর হোসেন অনেককেই বুঝিয়েছিলেন যে, গাছের এমন বিচিত্র শক্তির কথা প্রকৃতপক্ষে গুজব। কেউ কেউ রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য এমন অপপ্রচার করেছে। কিন্তু তাঁর কথা কেউ শোনেনি।

সিরাজের বহু রচনার মধ্যে আছে ম্যাজিক রিয়্যালিজম বা যাদু বাস্তবতার ছোঁয়া। যাদু বাস্তবতা হলো এমন এক শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গি, যেখানে প্রতিদিনের চেনা জীবনের রহস্যময় দিকে আলোকপাত করা হয়। মানুষ 'হ্যাঁ' আর 'না' এর সংশয়ে আন্দোলিত হ'তে থাকে। সিরাজ তাঁর উপলব্ধির প্রকাশ ঘটিয়ে দেখিয়েছেন যে, প্রকৃতি ভালোবাসার পাশাপাশি লালন করে চলেছে হনন করার তীব্র লালসা। গল্পের গাছটিও সে ভূমিকা পালন করছে।

আধুনিক ছোটগল্পের অধিকাংশ বৈশিষ্ট্য বজায় রয়েছে 'গাছটা বলেছিল' গল্পের মধ্যে। ছোটগল্প সাহিত্য জগতের কনিষ্ঠতম ও অভিনব সৃষ্টি। বৈশিষ্ট্যের বিচারে ছোটগল্প আকারে ছোট হয় এবং তার মধ্যে একটি গল্প বা কাহিনীও থাকে। এই কাহিনী স্বল্প পরিসরে জীবনের কোন মহাসত্যকে উদ্ভাসিত করে দেয়। যে কোন বিষয় নিয়ে ছোটগল্প রচিত হতে পারে; তাই সাহিত্যের জগতে ইতিহাস নির্ভর, রাজনৈতিক, সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক ইত্যাদি নানা ধরনের ছোটগল্প রচিত হয়েছে। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'গাছটা বলেছিল' মনস্তাত্ত্বিক ও রহস্যময় গল্পের ধারায় অন্যতম সার্থক সংযোজন।

'গাছটা বলেছিল' গল্পের আয়তন ছোটগল্পের নির্দিষ্ট সীমা কে লঙ্ঘন করে নি। ছোটগল্পে যেমন স্বল্প কয়েকটি চরিত্র থাকে, আলোচ্য গল্পেও তেমনি কয়েকটি মাত্র চরিত্র রয়েছে যেমন, কথক, পাতা কুড়োনি বুড়ি, অলৌকিকতায় অবিশ্বাসী নেলোদা, চোর পাঁচু, থানার দারোগা, ডাক্তারবাবু প্রমুখ।

ছোটগল্পে কখনো কখনো এক ধরনের রহস্যময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করে পাঠকদের আকৃষ্ট করে রাখা হয়। উপযুক্ত বর্ণনার কৌশলে 'গাছটি বলেছিল' গল্পেও

এমন আকর্ষণের সৃষ্টি হয়েছে। ছোট গল্পের মতই প্রথম বাক্য থেকে এক ধরনের টানটান উত্তেজনা সঞ্চারিত হয়েছে পাঠকের মনে। পাঠক প্রথমেই যে রহস্যের সন্ধান পেয়েছেন ,সেই রহস্য উন্মোচনের জন্য এক নিঃশ্বাসে গল্পটি পড়ে যান। এখানেই ছোট গল্পকার হিসেবে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

ছোটগল্পে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির রেখে গল্পকার গল্পের কাহিনী দ্রুতগতিতে পরিণতি বা সমাপ্তির দিকে এগিয়ে নিয়ে যান। 'গাছটি বলেছিল' গল্পে লেখক তাঁর লক্ষ্য স্থির রেখেছেন। এই লক্ষ্য হলো, মানুষের উপরে নেচার বা প্রকৃতির প্রভাব এবং প্রকৃতিকে প্রাণময় জৈবিক সত্তা রূপে প্রদর্শন করা। একটির পর একটি আকস্মিক ঘটনা এমন ভাবে সংস্থাপিত হয়েছে যে, গল্পের কাহিনি গতি সম্পন্ন হয়ে উঠেছে। প্রথমে গাছের কাছ থেকে 'মর মর মর' নির্দেশ শুনতে পেয়ে একপাতা কুড়নো বুড়ি বাড়িতে ফিরে সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়। গ্রামের সবাই এই অলৌকিক ঘটনায় বিস্মিত হয়। কেউ কেউ গাছের এমন কথা বলা শক্তিতে অবিশ্বাস করে। কিন্তু এক অতি বৃদ্ধ বলেছিলেন যে, কোন কোন গাছ কথা বলে। কোন কোন গাছ রানী, কুচুটে , আর নিষ্ঠুর হয়। গাছ নাকি বাতাসের ভাষায় কথা বলে। গ্রামের ডাক্তার স্বাভাবিক কারণেই একথা বিশ্বাস করেননি। আর এক গাঁজাখোর নেলোদা গাছের এই অলৌকিক ক্ষমতা কে চ্যালেঞ্জ তার গুঁড়িতে লাথি মারতে গিয়ে মরে যায়।

ছোট গল্পের মধ্যে যেমন, সামান্য বিষয়কে কেন্দ্র করে ভিন্ন চিন্তা ভাবনার জগৎ গড়ে তোলা হয়, আলোচ্য গল্প তেমনি গাছের স্বভাব নিয়ে নানা কথা বলা হয়েছে। কিছু কিছু গাছ থাকে জৈব চরিত্রের; কেউ দয়ালু কেউবা সহৃদয়, কিন্তু এমন কথা বলা গাছ খুব বেশি দেখা যায় না। গল্পের কথকও গাছটির তলায় আচ্ছন্ন হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলে্ কিন্তু গাছটি তাকে মরতে বলেনি। রূপকের আড়াল তৈরি করে বলা হয়েছে ফুল ফল হীন এই গাছটি যেন 'বৃহন্নলা'। সে অন্যের মৃত্যুর নিদান হাঁকে। এভাবেই পাতা কুড়ুনি বুড়ি, পাঁচু চোর, থানার দারোগা মারা যায়। সবশেষে ডাক্তার অসীম বাবু আত্মহত্যা করেন। গল্পের শেষে গাছ কাটা নিয়ে এবং জায়গা দখলের লড়াইয়ে দু'পক্ষের বেশকিছু মানুষ প্রাণ হারায়।

ছোট গল্পের মধ্যে যে ইঙ্গিতময়তা বা ব্যঞ্জনা থাকে আলোচ্য গল্পেও তা যথেষ্ট পরিমাণে আছে। লেখক ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, মানুষের মধ্যে মৃত্যু নিয়ে নানা ধরনের চিন্তাভাবনা কাজ করলেও প্রকৃতি নির্বিকার। যার যখন সময় হবে, তখন তাকে চলে যেতেই হবে। গল্পের শেষে এই ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তুলে লেখক বলেছেন, "গাছটা বারবার বলে থাকবে, মর্ মর্ মর্। কারণ লোকগুলি বারবার মরছিল। চাপ চাপ রক্ত। নো-ম্যান্স-ল্যান্ড রক্তে লাল হচ্ছিল। প্রকৃতিতে তখন বসন্তকাল। এ সময় মৃত্যুও রক্তিম সৌন্দর্য হয়।"[৭]

ছোটগল্পের ভাষাশৈলী হয় অনাড়ম্বর ও 'মেদ বর্জিত'। 'গাছটি বলেছিল' গল্পের ভাষাশৈলীতেও একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ যে একজন ভাষা সচেতন শিল্পী ছিলেন তার প্রমাণ এই গল্পটি।

'গাছটা বলেছিল' গল্পে ভিন্নতর এক বিশ্বাসের কথা বলেছেন লেখক। ডাক্তার বিজ্ঞানের ছাত্র; তিনি গাছের এমন অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস করতেন না। তাঁর কথায় বুড়ি ও নোলেদা মারা গেছে হার্ট অ্যাটাকে আর টিবি রোগি পাঁচু চোর মারা গেছে লাংস্ ব্লাস্ট করে। অর্থাৎ এদের মৃত্যুর কারণ কোনো অলৌকিক ঘটনা নয়। দারোগাবাবুর মৃত্যু রহস্যময় এবং ডাক্তারবাবুর মৃত্যু স্বেচ্ছাকৃত। এরপর হিন্দু ও মুসলমান পাড়ার মাঝামাঝি থাকা নো ম্যানস্ ল্যাণ্ড দখল করার লড়াই বাধে। একদল চায় গাছটিকে পুজো করতে অন্যদল চায় গাছটকে কেটে জায়গাটা দখল করতে। দুই পক্ষ সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। শেষ বোমাবাজি শুরু হয়; প্রচুর মানুষ মারা যায়। লেখকের মনে হয় গাছটা সবাইকে 'মর্ মর্' বলেছিল, তাই সবাই নিজেরদের মধ্যে গণ্ডগোল করে মারা যেতে থাকে।

গাছের কথা বলাকে এখানে অনেকটা রূপকের ছলে দেখানো হয়েছে। আমরা জানি প্রকৃতি তার নিজস্ব ছন্দে চলে। ঠিকমত জীবন যাপন না করলে প্রকৃতি তার প্রতিশোধ নেয়। হৃদরোগ জীবনশৈলী-নির্ভর রোগ। বুড়ি মারা গিয়েছিল বয়সের কারণে, নেলোদা মারা গেছে অতিরিক্ত গাঁজার নেশা করার জন্য; দরিদ্র ও চোর পাঁচু সম্ভবতঃ পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে টিবি রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। কিন্তু কোনও মৃত্যুই মানুষ সহজভাবে মেনে নিতে পারে না; সবাই এর পশ্চাতে রহস্যময় বা অস্বাভাবিক কারণ সন্ধান করে। এখানেও লেখক মানুষের সেই রহস্য-সন্ধানী মনের কথা বলেছেন।

এদের সবার মধ্যে ডাক্তার বাবুর 'অস্বাভাবিক' মৃত্যুই একমাত্র স্বাভাবিক। তিনি প্রেমিক মানুষ। তাঁর প্রেমিকা টিনি গ্রামে এসে থাকবে না। সে ডাক্তার অসীমকে শহরে গিয়ে থাকতে বলে; কিন্তু সরকারী বণ্ডে সই করার পর নির্দিষ্ট সময় গ্রামে থেকে চাকরি না করলে ডাক্তারি পড়ানোর খরচ সরকার ফেরত নেয়। সুতরাং টিনি'র জেদি আবদারে অসীমবাবু অসহায় বোধ করেন। গ্রাম প্রথমে তাঁর কাছে অস্বস্তিকর মনে হলেও পরে ভালো লেগেছে। প্রকৃতি তাকে গ্রামের আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নিতে সাহায্য করেছে। গ্রামে দলাদলি, পলিটিক্স, খুনোখুনি যা লেগে থাকে তাও 'নেচারে'র জন্য। ডাক্তার বলেছেন, "দেখুন, হিয়ার ইজ দ্যা নেচার্স ল। নেচার ডাজনট কেয়ার অ্যা বাউট এনিথিং। একটা মানুষ খুন হল, কি মরল, কি যন্ত্রণা পেল। সো হোয়াট?"[৮]

ডাক্তারের এই উপলব্ধির মধ্যেই রয়েছে গল্পের কেন্দ্রীয় সত্য। কে কখন মারা যায় তা নিয়ে প্রকৃতির মাথা ব্যথা নেই। তার কাছে এটা নিয়মের অধীন। মৃত্যু মানুষকে শোকে কাতর করে প্রকৃতিকে নয়। একজন, দু'জন, হাজার জন বা লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা গেলেও প্রকৃতি যেমন ছিল তেমনিই থাকে; ঋতুতে ঋতুতে চলে তার বৈচিত্র্যের

খেলা। 'দ্যা নেচার নোজ দ্যা মিনিং অব লাইফ' অর্থাৎ একমাত্র প্রকৃতিই জানে জীবনের অর্থ।

প্রেমিকা প্রত্যাখান করলে ডাক্তার প্রায় উন্মাদের মতো গাছটির কাছে প্রতিস্পর্ধার প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। গাছটি নাকি তাঁকেও বলেছে, 'মর্ মর্ মর্'। তবে গাছের কথায় তার মৃত্যু হয়নি; তিনি প্রেমে ব্যর্থ হয়ে সাইনাইড খেয়ে জীবন থেকে বিদায় নিয়েছেন।

এতগুলো মৃত্যুর বিবরণ গল্পটিকে অদ্ভুত রসের গল্পে পরিণত করেছে। অলৌকিকতায় বিশ্বাসী কিছু মানুষ গাছটির জৈবি সত্তায় বিশ্বাস করেছে। গল্পকার দেখিয়েছেন যে, যারাই গাছটির জৈবি সত্তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছে, তারাই মরেছে। এমন কি যারা গাছটির প্রাণ থাকার কথা অস্বীকার করে গাছটিকে কেটে ফেলতে চেয়েছিল, তারাও মারামারি করে মরেছে।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ তাঁর প্রতিভার যাদুতে এই গল্পটির মধ্যে কিছুটা রহস্যময় ও ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টি করে পাঠকের মনে অতিলৌকিক অনুভূতি সঞ্চারের চেষ্টা করেছেন। একটি গাছকে কেন্দ্র করে তিনি মানুষের অন্তর্নিহিত লালসা ও স্বার্থের চিত্রও স্পষ্ট করে দিয়েছেন। "মৃত্যুবাণী, তার সাথে আশ্চর্যজনক ভাবে কিছু মৃত্যুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, দুর্দান্ত রহস্য আর অসংখ্য প্রশ্নের জন্ম দিয়ে গাছটা যখন কিংবদন্তী এবং ভয়াল, তখনই দেখা যায় গল্পের প্রকৃত বাঁক, গাছটি নিয়ে বাণিজ্য শুরু হয়। ... ... নির্বাক গাছ মানুষের মতো কথা বলে এই অবিশ্বাস্য অলৌকিকতা নিয়ে বুদ্ধিমান মানুষেরা দাঙ্গা বাঁধায়, বোমা ফাটে।"[৯]

তথ্যসূত্র :

১) 'সাক্ষাৎকার—সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ'- অরুণ চক্রবর্তী, 'বিনির্মাণ ১২': স্মরণে সিরাজ, জানুয়ারি২০১৩, পৃষ্ঠা-৭-৮

২) 'নির্বাসিত বৃক্ষে ফুটে আছি' : সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, 'ঐক্য', সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ সংখ্যা, সম্পাদক- গৌরীশঙ্কর সরকার, অক্টোবর ২০১৩, পৃষ্ঠা-৩৫)

৩) সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ – গল্প সমগ্র (১ম খণ্ড), করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৯, ১লা বৈশাখ, ১৪২১, পৃষ্ঠা- ১৪৩

৪) তদেব, পৃষ্ঠা- ১৪৪

৫) তদেব, পৃষ্ঠা- ১৪৫

৬) তদেব, পৃষ্ঠা- ১৪৪

৭) তদেব, পৃষ্ঠা- ১৫৩

৮) তদেব, পৃষ্ঠা- ১৫১

৯) সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের গল্প : রাঢ় বাংলার প্রকৃতি ও মানুষের চিত্রকল্প – নূর কামরুন নাহার, 'ঐক্য', সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ সংখ্যা, সম্পাদক- গৌরীশঙ্কর সরকার, অক্টোবর ২০১৩, পৃষ্ঠা-৪০৭)

শ্রীমদ্ভগবদগীতার প্রেক্ষাপটে আত্মার স্বরূপ

সৌমিক পাল
সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ
টুরকু হাঁসদা লপসা হেমরম মহাবিদ্যালয়
মল্লারপুর, বীরভূম

সারসংক্ষেপঃশ্রীমদ্ভগবদগীতায় ক্ষত্রিয় বংশজাত অর্জুন তাঁর হনুমানচিহ্নিত পতাকা সুসজ্জিত রথে উপবিষ্ট হয়ে সারথি কৃষ্ণের সহিত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের রণপ্রাঙ্গনে রথটি স্থাপন করার পর উভয়পক্ষের সৈন্যদের মধ্যে ভীষ্ম প্রভৃতি আত্মীয়বর্গকে দেখে মোহবশে অত্যন্ত বিষন্ন হয়ে পড়েছিলেন ।এই বিষন্নতা ও কাপুরুষতা দূরীকরণের জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণস্বয়ং অর্জুনকে আত্মতত্ত্ব বিষয়ে বিভিন্ন উপদেশ প্রদান করে তিনি বলেছেন প্রতিটি জীবইহল একটি স্বতন্ত্র আত্মা।আত্মা হল পরমাণুসদৃশ, তাই গুণগতভাবে পরমাত্মার পরমাণুসদৃশ জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে কোন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না।আত্মাঅতিক্ষুদ্র এবং সংখ্যায় অনেক, এই ক্ষুদ্রতার কারণবশত আত্মাকে দর্শনও কোন শত্রু পক্ষের দ্বারা হত্যা করা যায়না।এমনকি আত্মাকে অস্ত্রের দ্বারা ছেদন করা যায়না,আগুনে পোড়ানো যায় না,বায়ুর দ্বারা শুষ্ক করা যায় না প্রভৃতিতাই আত্মাকে নিত্য শাশ্বত ও পুরাণ বলা হয়েছে। তার জন্ম ও মৃত্যু হয়না তাই আত্মাকেঅপরিবর্তনশীল, অবিনাশী, চিরস্থায়ী, সর্বোপরিব্যাপ্ত, অচল ও সনাতন বলা হয়েছে। এই অপরিবর্তনশীলতার জন্য আত্মাকে‘কূটস্থ’ এই শব্দের দ্বারা অভিহিত করা হয়েছে।তদ্রুপ বিভিন্ন দার্শনিক গ্রন্থ যেমন কঠোপনিষদে‘বিপশ্চিত’ এই শব্দটি ব্যবহার করে আত্মাকে পূর্ণজ্ঞানের সহিত তুলনা করা হয়েছে। ব্রহ্মসূত্রেআত্মাকে ‘জ্ঞানের আলোক’ রূপে অভিহিত করা হয়েছে। এমনকি বৃহদারণ্যক উপনিষদে তাকে ‘তৃণজলজুঁকা’ নামে চিহ্নিতকরেছেন। এছাড়াও আত্মা সম্পর্কে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আরও বলেছেন- অনেকে এই আত্মাকে আশ্চর্যের ন্যায় দর্শণ,শ্রবণ ও বর্ণনা করেন ।আবার কেউবা শুনেও তাকে বুঝতে পারেনা ।এখন প্রশ্ন হল যে, আত্মাযদিচিন্ময় বস্তু হয়, তাহলে জড়দেহে প্রবেশ করলো কীভাবে? এই প্রশ্নের নিরসন করে বলেছেন জীব যখন এই জগতে আসে তখন তার মধ্যে মন, বুদ্ধি ও অহংকার থাকে এর মাধ্যমে এই জগতে এসে স্থূল শরীরে প্রবেশ করে।স্থূল শরীরে থাকে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎও ব্যোম অর্থাৎ মানুষ পশু-পাখি প্রভৃতি তা যেকোনো শরীরে হতে পারে।জন্ম, বৃদ্ধি,ক্ষয় প্রভৃতি এইছয়টিক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে,আত্মাজড়দেহ ধারণ করেছে আরআত্মাযে জড়দেহে বর্তমান তা চেতনার দ্বারাইউপলব্ধ। আবার চেতনা নেই মানে জড়দেহেআত্মাও নেই। সেই মুহূর্তে জড়দেহের বিনাশ ও পচন শুরু হতে থাকে ।তাই চেতনাকেই আত্মার লক্ষণ বলা হয়েছেসুতরাং দেহ নশ্বর, আত্মা অবিনশ্বর।

সূচকশব্দঃ-শ্রীমদ্ভগবদগীতা, শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন, কঠোপনিষদ, বৃহদারণ্যকোপনিষদ, মুণ্ডকোপনিষদ, শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ, শ্রীমদ্ভাগবত, ব্রহ্মা, ব্রহ্মসূত্র, শিব, পার্বতী. ব্রহ্মসংহিতা. কূটস্থ, বিপশ্চিত, ঠাকুর হরিদাস, শ্রীরামকৃষ্ণ, কথামৃত।

মূল আলোচনা:

পাণ্ডুপুত্র তথা ক্ষত্রিয় বংশজাত অর্জুন তাঁরহনুমানচিহ্নিত পতাকাসুসজ্জিত রথে উপবিষ্ট হয়ে সারথি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরসহিতকুরুক্ষেত্র যুদ্ধের রণপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হওয়ার পর তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বললেন- হে অচ্যুত এখন তুমি উভয় প্রকার সৈন্যদের মধ্যে আমার এই সুসজ্জিত রথটি স্থাপন কর।তারপর তিনি সর নিক্ষেপ করতে প্রস্তুত হলে তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখতে পেলেন রণক্ষেত্রে যুদ্ধাভিলাষী প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁর নিকটতম সৈন্যবর্গছিলেন আচার্য,পিতৃব্য, ভ্রাতা, মাতুল, পৌত্র, পুত্র,শ্বশুর এবং শুভাকাঙ্ক্ষীগণ প্রভৃতি। তাই এ প্রসঙ্গে গীতায় বলা হয়েছে-

" তত্রাপশ্যাৎস্থিতানপার্থঃপিতৄনথপিতামহান্।
আচার্যান্মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্পৌত্রান্সমীংস্তথা।
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি।।"[১]

তিনি রণক্ষেত্রে নিকটবর্তী স্বজনবর্গকে যুদ্ধাভিলাষী দেখে অত্যন্ত কৃপাবিষ্টএবং বিষন্ন হয়ে বললেন- হে!প্রিয়বরকৃষ্ণ আমার অঙ্গসমূহ অবশ এবং মুখমন্ডল শুষ্ক হয়ে যাচ্ছে-

"দৃষ্টেম্নংস্বজনংকৃষ্ণযুযুৎসুং সংসমুস্থিতম্
সীদন্তিমম গাত্রাণি মুখংচ পরিশুষ্যতি।।"[২]

তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বললেন- হে!কেশব আমার হৃদয়াঙ্গ কম্পিত এবং রোমাঞ্চিত হচ্ছে। এই কম্পিত ও রোমাঞ্চিত হওয়ার দুটিকারণ আছে- এক চিন্ময় আনন্দ দুই ভয়। কিন্তু এখানে অর্জুনের শরীর কম্পিত ও রোমাঞ্চিত হবার মুখ্য কারণ হলজড়-জাগতিক ভয় ও প্রাণ হত্যার আশঙ্কা। এমনকি গাত্রদহনএবং হাত থেকে গান্ডীবঅর্থাৎধনুকখসেযাওয়ার মূল কারণটিহল এই জড়-জাগতিক ভয় ।তাই এই প্রসঙ্গে গীতায় বলা হয়েছে-

"বেপথুশ্চশরীরেমেরোমহর্ষশ্চজায়তে।
গান্ডীবংস্রংসতেহস্তাৎ ত্বকচৈবপরিদহ্যতে।।"[৩]

মানসিকদুর্বলতা ও অধৈর্যের কারণবশত অর্জুনের মন বিচলিত এবং চিত্ত উৎভ্রান্ত হচ্ছিল। এর ফলে তিনি যুদ্ধ করতে অসম্মতি প্রকাশ করেছিলেন। তাই অজ্ঞানতাবশত জড়-জাগতিক মায়ারজালেআবদ্ধ হয়ে এবং বিষয়ের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তির ফলে অর্জুন তথা সকল মানুষইমোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।তাই ভাগবতে বলা হয়েছে- "ভয়ংদ্বিতীয়াভিনিবেশতঃস্যাৎ"।[৪]এইধরনের ভীতির মূলহেতু হলজড়বস্তুর প্রতি অত্যাধিক আসক্তি। ঠিক তেমনই অর্জুনের এই রকম দুর্বলতা ও কাপুরুষতার মূল কারণ হল জড়বস্তুর প্রতি আসক্তি লাভ তাই তিনি বারংবার বলেছেন- হে ! মধুসূদন

আমি যাঁদেরকে হত্যা ও নিহত করতে উদ্যত হচ্ছি তাঁরা হলেন আমার আত্মীয়বর্গ। হে! গোবিন্দ আমি তাঁদের হত্যা করতে পারবনা কারণ এটি আমার কাছে শ্রেয়স্কর কর্ম নহে। তাদের পরাজিতও অমঙ্গল কামনা করে আমি সুখ ও আনন্দ উপভোগ করতে অনিচ্ছুক। এমনকি রাজ্য লাভেও বিন্দুমাত্র আসক্তি ও কামনা-বাসনা করি না। অতএব তাঁর এইরকম মোহাচ্ছন্নেরমূল কারণ হল জড়পদার্থের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি।তিনি কেবলমাত্রযুদ্ধক্ষেত্রের করুণ পরিণতি দর্শণ করেছিলেন। সেই প্রসঙ্গে গীতায় বলা হয়েছে-

" নচশ্রেয়োঽনুপশ্যামিহত্বাস্বজনমাহবে।
নকাঙ্ক্ষেবিজয়ংকৃষ্ণনচরাজ্যংসুখানিচ।।"[৫]

কুন্তীপুত্র অর্জুনের এরকম ক্লীবতা ও দূর্বলতারমুখ্যহেতুহল অজ্ঞান অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের অভাব ।এই অজ্ঞানতারহেতুবশতঃ ভগবানের সম্মুখে আত্মীয়স্বজনের প্রতি অর্থাৎ জড়বস্তুর জন্য তাঁর এরকম শোক প্রকাশ করা অত্যন্ত অশোভনীয় বা নিন্দনীয় ।শ্রীকৃষ্ণইযে আত্মজ্ঞানী আদিপুরুষ পরমেশ্বর ভগবান এবিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।কারণ স্বয়ংব্রহ্মাব্রহ্মসংহিতাতে শ্রীকৃষ্ণকে আদিপুরুষ বা গোবিন্দ নামে অভিহিত করেছেন।অর্থাৎ পরিজ্ঞাত ভগবান এবং তিনি সমস্ত জগৎ কারণের পরম হেতু-

"ঈশ্বরঃপরমঃকৃষ্ণঃসচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃসর্বকারণকারণম্।।"

"ভগবানের গুণাবলীর অধিকারী বহু পুরুষ আছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমপুরুষ; কারণ তাঁর ঊর্ধ্বে আর কেউ নেই। তিনি পরমেশ্বর এবং তাঁরশ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দময়। তিনি অনাদির আদিপুরুষ গোবিন্দ এবং তিনিই সর্ব কারণের কারণ।"[৬] শ্রীকৃষ্ণ এবং ভগবানের মধ্যে কোনো ভেদ লক্ষ্য করা যায়না। সমগ্র গীতাতে শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান রূপে ভূষিত করা হয়েছে।ভগবান হলেন পরম আত্মতত্ত্বের চরম শিখন্ডী। এই পরমতত্ত্ব অর্থাৎ আত্মোপলব্ধি করার তিনটি স্তর লক্ষ্য করা যায়-ব্রহ্মাঅর্থাৎ নির্বিশেষ পরিব্যাপ্ত সত্ত্বা, পরমাত্মা অর্থাৎ প্রত্যেকটি জীবের হৃদয়মণ্ডলে অবস্থিত পরমেশ্বরের প্রকাশ এবং ভগবান অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে পরমতত্ত্বের সম্পর্কে বলা হয়েছে-

"বদন্তিতত্ত্ববিদস্তত্ত্বংযজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতিপরমাত্মেতিভগবানিতিশব্দ্যতে।।"[৭]

এছাড়াওশ্রীমদ্ভাগবতেআমরাদেখতে পাই যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের থেকে অনেক অবতারেরসৃষ্টি হয়েছে।

"এতেচাংশকলাঃপুংসঃকৃষ্ণস্তুভগবান্ স্বয়ম্
ইন্দ্রারিব্যাকুলংলোকংমৃড়য়ান্তিযুগেযুগে।।"[৮]

ভগবান পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ‘কুতঃশব্দটিকে প্রয়োগ করে বারংবার বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন –হে! কৌন্তেয়কোথা থেকে তোমার মধ্যে এরকম কলুষিত আচরণের উদ্ভব ঘটেছে।সুসভ্য আর্যের নিকট থেকে কখনই তা আশা করিনা। ‘আর্য’ শব্দটি এখানে সেই ব্যাক্তির জন্য প্রযোজ্য যে, জীবনের মূল্যবোধ ও আত্মোপলব্ধিতে সাফল্য লাভ করেছে।দেহাত্মবুদ্ধিদ্বারা পরিচালিত মানুষেরা কখনোই জীবনের পরমতত্ত্ব অর্থাৎ আত্মতত্ত্বকে জানতে পারে না।এরকম জগতের মায়ার বন্ধন থেকে যারা নিজেকে মুক্তিলাভ ঘটাতে পারেনা তারাই হলেন অনার্য।আর মুক্তি বলতে কী বোঝায়?আর মুক্তি বলতে বোঝায় সম্যক আত্মজ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তি এবং ভগবান তত্ত্ব।তাই এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভগবতগীতায় বলা হয়েছে-

“কুতস্ত্বাকশ্মলমিদংবিষমেসমুপস্থিতম্।
অনার্যষুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্তিকরমর্জুন।।”[৯]

অর্জুন ছিলেন ক্ষত্রিয় বংশজাত সন্তান তাই তার স্বধর্ম ছিল যুদ্ধ করা। কিন্তু জড়-জাগতিক কার্যকলাপেমোহাচ্ছন্নহয়ে তিনি যুদ্ধ করতে অস্বীকার করেছিলেন। ফলে তিনি নামেই কেবল ক্ষত্রিয়বংশজাত সন্তান ।আবার ব্রাহ্মণকুলেজাত সন্তান যদি নাস্তিক অর্থাৎ অধার্মিকহয় তাহলে সেই ব্রাহ্মণ অবশ্যই নামেই ব্রাহ্মণ সন্তান রূপে সমাজে বিবেচিত হবেন, সুতরাং তাঁরা উভয়ে পিতার অযোগ্যসন্তান হিসাবে পরিচিতি লাভ করবেন।সারথি শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ বন্ধু অর্জুনের সমস্ত রকম সুযোগসুবিধাথাকার সত্তেও মহান উদারতার দ্বারা আত্মীয়স্বজনের সহিতহৃদয়দুর্বলতা ও ক্লীবতাবশত যুদ্ধ করতে অসম্মতি প্রকাশ করেন ।তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনেরএরকম উদারনৈতিক মনোভাবকে কখনোই অনুমোদন করেন না।-

“কৈব্যংমাস্মগমঃপার্থনৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রংহৃদয়দৌর্বল্যংত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠপরন্তপ।।”[১০]

যার মধ্যে বিন্দুমাত্র ভগবান চিন্তা অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের অভাব আছে সেই ব্যক্তি সর্বদা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মিথ্যা বিষয়ের প্রতি চিন্তা করার ফলে তার হৃদয়ের মধ্যেমোহবশেজড়বাসনার উদয় হয়। এইজড়বিষয়ের আসক্তি থেকেকামেরউৎপত্তি হয়,কাম থেকেই ক্রোধের জন্ম হয়,ক্রোধথেকে সম্মোহের উদয় হয়, সম্মোহেরথেকে স্মৃতিভ্রম হয়আর স্মৃতিভ্রম থেকে বুদ্ধির বিনাশঘটে।তাই গীতায় বলা হয়েছে-

“ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙগস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।।
ক্রোধাদ্ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।।”[১১]

ঠিক তেমনই অর্জুনেরও কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে জড়-জাগতিক কার্যকলাপের দ্বারামোহাচ্ছন্নহয়ে বুদ্ধির বিনাশঘটেছিল।কারণ সেই সময় অর্জুন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মিথ্যা বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করার ফলে তাঁর মনে এই রকম জড়বাসনার উদয় হয়। আর

জড়বাসনা উদয়ের ফলে ভীষ্ম প্রভৃতি আত্মীয়বর্গের জন্য জ্ঞানের অভাব বিরাজ করে ।তাঁরা অবশ্যই জড়-জগতের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়েরদ্বারা প্রভাবিত হয়।এমনকি শিব ও ব্রহ্মাতথা স্বর্গের দেব-দেবীরা এরকম জড়-জাগতিক কামনা- বাসনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, শিব ও পার্বতী এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েউভয়ের সঙ্গমের ফলে কার্তিকের জন্ম হয়।তাই শীলরূপ গোস্বামী এই প্রসঙ্গে বলেছেন-

“প্রাপঞ্চিকতয়াবুদ্ধ্যাহরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃপরিত্যাগোবৈরাগ্যংফল্গুকথ্যতে।।”[১২]

এমতাবস্তায় অর্জুন কার্পণ্যজনিত কারণবশতঃ কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা উপলব্ধি করে বলেছেন- হে! পরমেশ্বরএখন আমার কি করা উচিত তা তুমি আমার সম্মুখে ব্যক্ত করো। যেহেতু আমারআত্মজ্ঞানের অভাবজনিত কারণের দ্বারামোহাচ্ছন্ন হয়ে আমি জড় বিষয়বস্তুর জন্য শোকাহত হয়ে পড়েছিএই মর্মে আমার কাছে কোনটিশ্রেয়স্করতাআমি বুঝতে পারছি না।এখন প্রশ্ন হল যে,কারা বাকে জড়-জগতেরমোহের দ্বারা আচ্ছন্ন? এর উত্তরে বলা হয়েছে যাঁরা বাযে মানুষেরা নিজের সমস্যাগুলির কারণবা তত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত নন, তারাই জড়-জগতের মোহেরদ্বারা আচ্ছন্ন। এমনকি জীবের বর্ণনা করতে গিয়ে বৃহদারণ্যকোপনিষদে বলা হয়েছে-“যোবা এতদক্ষরংগার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ পৈতি সকৃপনঃ।”অর্থাৎ “যে মানুষ তার মনুষ্যজীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধানকরে না এবং আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি না করে কুকুর-বিড়ালের মত এই জগৎ থেকে বিদায় নেয় সে কৃপণ” ।[১৩]

অজ্ঞানতাকেবর্জন করে আত্মজ্ঞানের উপলব্ধির জন্য অর্জুন বললেন ,আমি এখনসত্যদ্রষ্টা সৎগুরুর আশ্রয় গ্রহণ করতে চাই। কারণ তার শরণাপন্নে আমার তথা সকল জীবের হৃদয় কপটতা দূরীভূত হয়ে আত্মস্বরূপতারউদয় ঘটবে, অর্থাৎ আত্মোপলব্ধিতে সচেষ্ট লাভ করবে।তাই চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন-

“কিবাবিপ্র, কিবান্যাসী, শূদ্রকেনেনয়।
যেইকৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই ‘গুরু’ হয়।।”[১৪]

মোহাচ্ছনঅর্জুনের কি করা উচিত এই প্রশ্নের উত্তরে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন, যা অনিত্য অর্থাৎ জড়বস্তু তার জন্য কখনো দুঃখ, কষ্ট এবং শোক করা উচিত নয়। একথা বলতে গিয়ে তিনি আরও বললেন- হে! পার্থতুমি যাঁদের জন্য মিথ্যা শোক প্রকাশ করছো তাদের বিনাশ অবশ্যই ঘটবে তা আজি হোক বা একশো বছর পরেই হোক না কেন। এছাড়াও আচার্যের ভূমিকা পালন করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবিলম্বে মহামূর্খ অর্জুনকে শাসন করে বলেছেন-" তুমি প্রাজ্ঞের মত কথা বলছো,কিন্তু তুমি জানো না যে, প্রকৃত জ্ঞানী যিনি জানেন দেহ কি ও আত্মাকি- কোন অবস্থাতেই জীবিত তথা মৃতদেহের জন্য শোক করেন না।”[১৫]

আত্মার মূল স্বরূপ বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন হে!পুরুর্ষভ তুমি মোহাচ্ছন্নবর্জন করে আত্মার স্বরূপ বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করো। কারণ জড়দেহের বিনাশঘটলেও আত্মার কখনো বিনাশ হয় না যেহেতু প্রতিটিজীবই হল স্বতন্ত্র আত্মাতাই প্রতিমুহূর্তে তাদের দেহের পরিবর্তন ঘটছেকখনও শৈশব হিসাবে কখনো আবার যুবকরূপে, আবার কখনো বৃদ্ধ রূপে।মাতৃগর্ভে জন্ম, বৃদ্ধি, স্থায়ীভাব, ফলপ্রাপ্তি,ক্ষয়প্রাপ্তি ও বিনাশ এই ছয় রকম পরিবর্তন জড়দেহের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় । কিন্তু জীবের প্রকৃত সত্ত্বা অর্থাৎ আত্মার কখনো পরিবর্তন হয় না। মৃত্যুর পর এই জীবমাত্মা দেহত্যাগ করে কৃতকর্ম ও ফল অনুযায়ী নতুন দেহ ধারণ করে।পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জীবদেহের হৃদয় মন্ডলে পরমাত্মারূপে বিরাজ করেন। এই ধরনের জীবনচক্রে আবদ্ধে রজন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন হে! সখাভীষ্ম , দ্রোণাচার্য প্রভৃতি আত্মীয়বর্গের জন্য তোমার শোক করা উচিত নয়। কারণ তাদের মৃত্যু ঘটলে কেবলমাত্র তাদের জড়দেহেরই বিনাশঘটবে, নচেৎ আত্মারবিনাশ।"আমরা যেমন পুরানো বস্ত্র ত্যাগ করে নতুন বস্ত্র ধারণ করি দেহীও তেমনি জীর্ণদেহ ত্যাগ করে নতুন দেহ ধারণ করে"।[১৬] কারণ জ্ঞানী ব্যক্তিরা কখনো জড়দেহের জন্য মোহগ্রস্ত হয়না।আর এই ধরনের মহান ব্যক্তিরা জীবদেহের অন্তরে ও বাহিরে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করে নির্মল, শাশ্বত, পূর্ণশান্তি লাভ করেন।

"নিত্যোনিত্যানাংচেতনশ্চেতনানাম্একোবহুনাংযোবিদধাতি কামান্
তমাত্মস্থং যোনুঃপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃশাশ্বতী নেতরেষাম্ ।।"

"যিনিনিত্যের মধ্যে পরম নিত্য, চেতনার মধ্যে পরম চেতন এবং যিনি এক হয়েও সকলের কামনা পূরণ করেন তাঁকে যথার্থ ধীর ব্যক্তি অন্তরের অন্তরালে সর্বদাই দর্শন করেন এবংশাশ্বত শান্তি অনুভব করেন। কিন্তু যারা তাঁর ভজন করেন না তারা কখনই তা লাভ করতে পারেন না"।[১৭]ভগবান শ্রীকৃষ্ণআত্মার স্বরূপ সম্পর্কে শ্রীমদ্ভাগবতগীতাতেবলেছেন -

" অবিনাশিতুতদ্ধিদ্ধিযেনসর্বমিদংততমং।
বিনাশমব্যয়স্যাস্যনকশ্চিৎকর্তুমর্হতি।। "[১৮]

অর্থাৎ আত্মা নিত্য।নিত্যআমরা তাকেই বলবযার কখনো জন্ম ও মৃত্যু হয়না। তাই তিনি আত্মাকে অবিনাশী বলেছেন।আর আবিনাশী আমরা তাকেই বলবো যার কখনো বিনাশ বা ধ্বংস হয় না। সুতরাং প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র জীবাত্মা হলো একটি চিৎকণা। এই কণার আয়তন পরমাণুর থেকেও অনেক ক্ষুদ্র এবং জীবাত্মা বা চিৎকণা সংখ্যায় অনেক তাই তিনি বলেছেনজড়দেহের মূল তত্ত্ব হল চিৎকণা বা জীবাত্মা।যেমন ঔষধ খাওয়ার পর ঔষধের কার্যকারিতা দেহের সর্বত্র অংশে ছড়িয়ে পড়ে তেমনি এই চিৎকণারপ্রভাবও সমগ্রদেহে পরিব্যাপ্ত থাকে। তখন দেহের মধ্যে যে চেতনার অনুভূতি উদয় হয় তা হলআত্মা। অর্থাৎ চেতনাই হল পূর্ণ আত্মা।তাই আমরা বুঝতে পারি যে জড়দেহের চেতনা থাকা মানে আত্মার উপস্থিতি আর জড়দেহের চেতনা নাথাকলে তখন তা

মৃতদেহ রূপে বিবেচিত হয়। তখন কোন রকম মিথ্যা প্রচেষ্টার দ্বারা তার দেহের চেতনাকে জাগ্রত করা যায় না। তাই জড়বস্তুর সংমিশ্রনের ফলে চেতনার উদ্ভব হয় না, তা হয় কেবলমাত্র আত্মার থেকে। তাই চেতনাকে আত্মার লক্ষণ বলা হয়েছে।এই আত্মারআয়তন বিষয়ে মুণ্ডকোপনিষদেপ্রতিপালন করা হয়েছে-

"এষোঽণুরাত্মাচেতসাবেদিতব্যেযস্মিন্ প্রাণঃপাঞ্চধাসংবিবেশ।
প্রাণৈশ্চিত্তংসর্বমোতংপ্রাজ্ঞানাং যস্মিন্ বিশুদ্ধেবিভবত্যেষআত্মা।।"[১৯]

অনুরূপভাবে আবার পরমাণুসদৃশ আত্মার আয়তন সম্পর্কে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে বলা হয়েছে-

"বালাগ্রশতভাগস্যশতধাকল্পিতস্যচ।
ভাগোজীবঃসবিজ্ঞেয়ঃস চানন্তায়কল্পতে।।"[২০]

অর্থাৎ "কেশাগ্রহকে শতভাগে ভাগ করে তার একটি ভাগকে আবার শতভাগে ভাগ করলে যে আয়তন হয়, আত্মার আয়তনও ততখানি"। অনুরূপভাবে আরো একটিমন্ত্রে বলা হয়েছে-

"কেশাগ্রশতভাগস্যশতাংশঃ সাদৃশাত্মকঃ
জীবঃসুখস্বরুপোঽয়ংসংখ্যাতীতোহিচিৎকণঃ।।"[২১]

আবার জড়দেহ হল অনিত্য তাই তার ধর্ম হল অবিনাশী অর্থাৎ জড়দেহের বিনাশপ্রাপ্ত ধর্ম বর্তমান থাকার জন্য জড়দেহকে কোন উপায়েরদ্বারাও অনির্দিষ্টকালের জন্য টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়না।আত্মা এত সূক্ষ্ম বা ক্ষুদ্র হওয়ার জন্য কোন শত্রুপক্ষ তাকে দর্শণ করতে পারে না এবং কোন জাগতিক অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারাও আঘাত করতে পারে না। আর সুক্ষতার কারণবশতঃ তার পরিমাপ করাও অসম্ভব। বেদান্তসূত্রে আত্মাকে 'আলোক' রূপে অভিহিত করেছেন কারণ সে হলো পরম আলোকের অংশবিশেষ। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডযেমন সূর্যের আলোকের দ্বারা প্রতিপালিত হয় ঠিক তেমনই জড়দেহকে প্রতিপালন করে আত্মার আলোক। তাইভগবান শ্রীকৃষ্ণবলেছেন আত্মা যে মুহূর্তে জড়দেহপরিত্যাগ করে ঠিক সেই সময় থেকেই জড়দেহের পচন শুরু হয়। অর্থাৎ সেই সময় দেহের আর কোনো গুরুত্ব থাকেনা। এই প্রসঙ্গে তিনি শ্রীমদ্ভাগবতগীতাতে বলেছেন-

" অন্তবন্তইমেদেহানিত্যস্যোক্তাঃশরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্যতস্মাদ্ যুধ্যস্বভারত।। "[২২]

এছাড়াও আত্মার স্বরূপ প্রসঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আরওবলেছেন-

"নজায়তেম্রিয়তেবাকদাচিন্
নায়ংভুত্বাভবিতাবান ভূয়ঃ।
অজোনিত্যঃশাশ্বতোঽয়ংপুরাণো
নহন্যতেহন্যমানেশরীরে।।"[২৩]

গুনগতভাবে পরমাত্মা ও জীবাত্মার মধ্যে কোন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। জড়দেহের জন্ম, বৃদ্ধি প্রভৃতি ছয় প্রকার পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেলেও সেখানে আত্মার কোনো পরিবর্তন হয় না।তাই আত্মাকে‘কূটস্থ’ বলা হয়েছে। আত্মার কখনো জন্ম হয় না, মৃত্যও হয় না। যেহেতু আত্মাজড়দেহটি ধারণ করে তাই জড়দেহটির জন্ম হয় কিন্তু জড়দেহে সেইআত্মারজন্ম হয় না। তাই আমরা জানি যে, যার জন্ম হয় তার মৃত্যুও নিশ্চিত । আত্মার জন্ম হয় না বলেই আত্মার অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ বলে কিছুই নেই। আত্মা হলো নিত্য, শাশ্বত ওপুরাণ অর্থাৎ কবে যে আত্মার উদয় হয়েছিল এই বিষয়ে কোন ঐতিহাসিক তথ্য লক্ষ্য করা যায় না।আত্মাযে নিত্য,শাশ্বতও পুরাণ এ বিষয়ে কঠোপনিষদে একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে-

“নজায়তেম্রিয়তেবাবিপশ্চিন্নায়ংকুতশ্চিন্নবভূব কশ্চিৎ।
অজোনিত্যঃশাশ্বতোঽয়ংপুরাণোন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।।”[২৪]

এই মন্ত্রটিতে ‘বিপশ্চিত’ এই অর্থপূর্ণ শব্দটির ব্যবহার করেছেন, যার প্রকৃত অর্থ হল জ্ঞানী ব্যক্তি বা জ্ঞানের সহিত। অতএব আত্মাহলপূর্ণ্য জ্ঞানময়।অনু-আত্মা ও পরমাত্মা ভেদে আত্মাযে দুই প্রকার তার প্রমাণ কঠোপনিষদে প্রতিপন্ন হয়েছে-

“অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়ান্ আত্মস্য জন্তোনির্হিতোগুহায়াম্।
তমক্রুতুঃ পশ্যতিবীতশোকোধাতুঃপ্রসাদান্মহিমানমাত্মন।। ”

“পরমাত্মা ও জীবাত্মা উভয়েইবৃক্ষসদৃশ্যজীবদেহের হৃদয়ে অবস্থিত। যিনি সব রকমজড়বাসনা ও সবরকম শোক থেকে মুক্ত হতে পেরেছেন,তিনিই কেবল ভগবানের কৃপার ফলে আত্মারমহিমা উপলব্ধি করতে পারেন”।[২৫]পরমাত্মার পরমাণু সদৃশ জীবাত্মা যেহেতু অতিসুক্ষ্ম ও ক্ষুদ্র তাই এই আত্মা অব্যক্ত অর্থাৎ যা ব্যক্তকরা যায়না, অচিন্ত্যে অর্থাৎ চিন্তার অতীত, অধিকারী, অর্থাৎ অপরিবর্তনশীল,বিভু অর্থাৎসর্বোপরিব্যাপ্ত, অচল ও সনাতন। তাই অতিক্ষুদ্রতারকারণবশতঃ আত্মাকে কখনো কোন অস্ত্রের দ্বারা ছেদন করা যায়না, আগুনে পোড়ানো যায় না, জল দিয়ে ভেজানো যায় না ও বায়ু দ্বারা শুষ্ক করা যায় না। কারণ এই আত্মা হচ্ছে নিত্য, তাই নিত্যবস্তুকে ধ্বংস ও বিনাশ করা যায় না। এই প্রসঙ্গে গীতায় বলা হয়েছে -

“ নৈনংছিন্দন্তিশাস্ত্রাণি নৈনংদহতিপাবকঃ।
নচৈনংক্লেদয়ন্ত্যাপোনশোষয়তিমারুতঃ।। ”[২৬]

আত্মার স্বরূপতাবিষয়ে কঠোপনিষদে বলা হয়েছে “এই আত্মাকে বহুবেদ আয়ত্ত করার ফলে, অথবা ধারণাশক্তিসহায়ে, কিংবা বহুশাস্ত্র শ্রবণের দ্বারাওজানা যায় না। যাহার প্রতি তিনি অনুগ্রহ করেন, তিনি ইহাকে লাভ করেন, তাঁহারই সকাশেএইআত্মা স্বীয়রূপপ্রকটিত করে।।”[২৭] এছাড়াও আত্মত্তত্ব প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব কথামৃতেবলেছেন-“ ব্রহ্ম যে কি, মুখে বলা যায় না। সব জিনিস উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে। বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, ষড় দর্শণ - সব এঁটো হয়ে গেছে! মুখে পড়া হয়েছে, মুখে উচ্চারণ হয়েছে- তাই এঁটো হয়েছে। কিন্তু একটি জিনিস কেবল উচ্ছিষ্ট হয় নাই, সে জিনিসটি

ব্রহ্ম। ব্রহ্ম যে কি, তা আজ পর্যন্তকেউ মুখে বলতে পারে নাই।” [২৮]এছাড়াও মুণ্ডকোপনিষদে অঙ্গিরা শৌনককে দুটি বিদ্যার কথা বলেছেন। প্রথমটি হলো পরাবিদ্যা অর্থাৎ আত্মোপলব্ধিজনিত বিদ্যা আর দ্বিতীয়টি হলো অপরাবিদ্যা অর্থাৎ বেদাদিবিদ্যার কথা বলা হয়েছে-“দ্বেবিদ্যেবেদিতব্যেইতিহস্মযাব্রহ্মবিদোবদন্তিপরাচৈবাপরাচ।” [২৯]

তথ্যসূচীঃ-

১) শ্রীমদ্ভগবতগীতা (১/২৬)
২) শ্রীমদ্ভগবতগীতা (১/ ২৮)
৩) শ্রীমদ্ভগবতগীতা (১/২৯)
৪) শ্রীমদ্ভাগবত (১১/২/৩৭)
৫) শ্রীমদ্ভগবতগীতা (১/৩১)
৬) ব্রহ্মসংহিতা (৫/১)
৭) শ্রীমদ্ভাগবত (১/২/১১)
৮) শ্রীমদ্ভাগবত (১/৩/২৮)
৯) শ্রীমদ্ভাগবতগীতা(২/২)
১০) শ্রীমদ্ভাগবতগীতা(২/৩)
১১) শ্রীমদ্ভাগবতগীতা(২/৬২,৬৩)
১২) ভঃ,রঃ,সি (১/২/২৫৮)
১৩) বৃহদারণ্যকোপনিষদ(৩/৮/১০)
১৪) চৈঃ, চঃ, মধ্য(৮/১২৮)
১৫) গীতা (২/১১)
১৬) শ্রীমদ্ভাগবতগীতা (২/২২)
১৭) শ্রীমদ্ভাগবতগীতা (২/১৭)
১৮) কঠোপনিষদ (২/২/১৩)
১৯) মুণ্ডকোপনিষদ (৩/১/৯)
২০) শেতাশ্বতরউপনিষদ (৫/৯)
২১) শেতাশ্বতরউপনিষদ (৫/২৫)
২২) শ্রীমদ্ভাগবতগীতা (২/১৮)
২৩) শ্রীমদ্ভাগবতগীতা (২/২৩)
২৪) কঠোপনিষদ (১/২/১৮)
২৫) কঠোপনিষদ (১/২/২০)
২৬) শ্রীমদ্ভাগবতগীতা (২/২৩)
২৭) কঠোপনিষদ (১/২/২৩)

২৮)   শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, প্রথম খণ্ড, ৪৯ পৃষ্ঠা

২৯)   মুণ্ডকোপনিষদ (১/১/৪)

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জীঃ-

১.   রামসুখদাস, স্বামী, শ্রীমদ্ভগবদগীতা, সাধক-সঞ্জীবনী, গীতাপ্রেস, গোরক্ষপুর - ২৭৩০০৫ (ইন্ডিয়া) , ISBN 81-293-0053-2, পুনর্মুদ্রণ - ২০০৮

২.   স্বামী, শ্রীমৎ ভক্তিচারু, শ্রীমদ্ভগবদগীতা যথাযথ, দা ভক্তিবেদান্ত বুক্ ট্রাস্ট, ISBN: 978-93-85986-22-2

৩.   শ্রীমদ্ভগবদগীতা, শ্লোকার্থসহ গীতাপ্রেস, গোরক্ষপুর, ISBN 81-293-0439-2 , পুনর্মুদ্রণ - ২০০৯ ।

৪.   জগদীশ্বরানন্দ, স্বামী, শ্রীমদ্ভগবদগীতা, উদ্বোধন কার্যালয়, কোলকাতা - ৭০০০০৩

৫.   জুষ্টানন্দ,স্বামী, কঠোপনিষৎ, উদ্বোধন কার্যালয়, কোলকাতা – ৭০০০০৩, ১৯৯৭,ISBN81-8040-221-5

৬.   সাহা, ঐশানি , শ্রীমাকথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, আদ্যাশক্তি প্রিন্টার্স, কলকাতা - ৬, পরিমার্জিত সংস্করণ - ২০১১

৭.   ভূতোশনন্দ, স্বামী, কঠোপনিষদ্, উদ্বোধন কার্যালয়, কোলকাতা – ৭০০০০৩, December, 2017,ISBN 81-8040-227-4

৮.   গম্ভীরানন্দ, স্বামী,উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী, (তৃতীয়ভাগ), উদ্বোধন কার্যালয়, কোলকাতা – ৭০০০০৩, ২০ তম পুণমুর্দ্রণ, June 2014, ISBN 81-8040-236-3

৯.   গম্ভীরানন্দ, স্বামী,উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী, (প্রথমভাগ), উদ্বোধন কার্যালয়, কোলকাতা – ৭০০০০৩, ৩৮ তম পুণমুর্দ্রণ, May 2014, ISBN 8140-234-7

১০.   শ্রীমাকথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, /উদ্বোধন কার্যালয়, কোলকাতা – ৭০০০০৩, ৩১ তম পুণমুর্দ্রণ, November 2010 ISBN 81-8040-040-9

১১.   প্রভুপাদ, স্বামী, শ্রীমদ্ভাগবত, (প্রথমভাগ) ভক্তিবেদান্ত বুক্ ট্রাস্ট, নদীয়া-৭৪১৩১৩ ISBN 978-93-85986-85-7

গীতাঞ্জলি : 'না' শব্দের ভাষা সমীক্ষণ ও সদর্থক অভিব্যক্তি

সুজিতকুমার পাল
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিম মেদিনীপুর

সংক্ষিপ্তসার: রবীন্দ্রনাথ 'গীতাঞ্জলি' কাব্যে প্রচুর 'না' শব্দের প্রয়োগ করেছেন। 'না' এখানে নঞর্থক নয়। অস্তিত্বেরই সদর্থক প্রকাশ এই 'না'। বাক্যের 'Deep Structure' এ সুরের অসীমতায় মিশে গেছে 'না'। আর বাক্যের 'Surface Structure' এ কখনো কখনো 'না' কিন্তু নঞর্থকও। তবে উভয়ে মিলে অনন্ত ব্যাপ্তিরই দ্যোতনা এখানে।

সূচক শব্দ: রবীন্দ্রনাথ, গীতাঞ্জলি, না, নঞর্থক, সদর্থক, উত্তম পুরুষ, আমি, তুমি, তোমার, অস্তিত্ব, Deep Structure, Surface Structure, অসীমতা।

মূল আলোচনা: কবিতার ভাষা ও মুখের ভাষার মধ্যে বেশ ফারাক থেকেই যায়। যদিও কথ্যভাষাতেও কবিতা বা গান লেখা হয়। কথ্যভাষার সেই মর্যাদা এখনও তেমনভাবে দেওয়া হয় না। অথচ কথ্যভাষার অস্তিত্ব নিয়েই মান্য ভাষার সৃষ্টি। তবুও শিক্ষিত নাগরিক মানুষ কথ্যভাষার কদর ঠিকভাবে করে বলে মনে হয় না। তাই মান্য ভাষার কবিতা বা গান দুইই আমাদের কাছে কদর পায়। আমাদের আলোচ্য 'গীতাঞ্জলি'ও মান্যভাষাতেই লেখা। এর ভাষা কবিতা না গানের – এ নিয়ে বেশ সুন্দর আলোচনা করাই যায়। কবির বক্তব্য ও 'গীতাঞ্জলি' নামের মধ্য দিয়ে বলা যায় এটি গানেরই সংকলন – "এই গ্রন্থের প্রথম কয়েকটি গান পূর্বে অন্য দুই-একটি পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু অল্প সময়ের ব্যবধানে যে-সমস্ত গান পরে পরে রচিত হইয়াছে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একটি ভাবের ঐক্য থাকা সম্ভবপর মনে করিয়া, তাহাদের সকলগুলিই এই পুস্তকে একত্রে বাহির করা হইল।"[১] কাজেই 'গীতাঞ্জলি' যে গানেরই সংকলন এ নিয়ে মতভেদ থাকার কথা নয়।

কবিতা বা গান ভাষার ব্যাকরণ মেনে হয় না। কারণ কথা বলার ভাষা আর কবিতা বা গানের ভাষায় বিস্তর ফারাক। কবিতার ক্ষেত্রে ক্রিয়ার ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ, গানের ক্ষেত্রেও একই বিষয় প্রযোজ্য হয়ে থাকে। মান্য ব্যাকরণে মূলত ক্রিয়া – সমাপিকা, অসমাপিকা, যৌগিক, মৌলিক ছাড়াও ক্ষেত্র বিশেষে ক্রিয়ার রূপভেদ থাকে। 'গীতাঞ্জলি'র গানগুলিতে ক্রিয়ার ব্যবহার কবিতার মতোই। তাই এই কাব্যে মূলত ভাবমূলক ব্যঞ্জনা প্রকাশ পেয়েছে। এখানে ঈশ্বরের কাছে নিজেকে নিবেদনের ভাবনা কবির প্রায় সব গানেই রয়েছে। শব্দের জটিল আবর্তন এখানে নেই বললেই চলে। গানগুলি পাঠ করলে এক ধরনের উপলব্ধি, গানগুলি শুনলে এক ধরনের

উপলব্ধি আবার গাইলে আর এক ধরনের উপলব্ধি। আর গানগুলি যখন গাওয়া হয় তখন উপলব্ধির স্তরে আত্মনিবেদনের মহৎ ভাবনা উন্মোচিত হয়।

তবে এক্ষত্রে আমি 'না' শব্দ নিয়ে আলোচনা করবো। 'না' একটি নঞর্থক বাচক অব্যয়। নঞর্থক ভাব বোঝাতে এই কাব্যে 'নাহি', 'নাই', 'নয়', 'নই', 'নহে', 'নহি' 'নি' শব্দের প্রচুর প্রয়োগ আছে। এগুলি মূলত ক্রিয়া, বিশেষণ, সর্বনাম, পুরুষ বাচক শব্দ বা পদের অনুসারী। তাই 'গীতাঞ্জলি'তে 'না' এমনভাবে প্রয়োগ হয়েছে যেখানে সদর্থক ভাবনাই প্রাধান্য পেয়েছে। এই ভাবনা অর্থের দিক থেকে আবার শব্দের দিক থেকেও বিচার করা যেতে পারে। এইভাবে 'গীতাঞ্জলি'র কয়েকটি গানের প্রসঙ্গ এখানে তুলে ধরা যেতে পারে –

আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই,
বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে।
এ কৃপা কঠোর সঞ্চিত মোর
জীবন ভ'রে।
না চাহিতে মোরে যা করেছ দান,
আকাশ আলোক তনু মন প্রাণ,
দিনে দিনে তুমি নিতেছ আমায়
সে মহাদানেরই যোগ্য করে
অতি-ইচ্ছার সংকট হতে
বাঁচায়ে মোরে।[২]

এখানে '**না** চাহিতে মোরে যা করেছ দান' কবিতার বা গানের ভাষা যাই বলা যাক না কেন, ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে 'না' শব্দটির প্রয়োগ যথাযথ। 'চাহিতে', 'মোরে' শব্দ দুটি গানের ভাষার ব্যবহার।

একটু অন্যভাবে 'না' শব্দটির প্রয়োগ করলে অর্থগত দিকটি পাল্টে যেতে পারে। যেটা ভাষাতত্ত্বের বিচারে 'Deep structure' এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। তারফলে অর্থও পাল্টে যায়। যদি এইভাবে বলা হয় - না চাহিতে মোরে যা করেছ দান > চাহিতে না মোরে যা করেছ দান > চাহিতে মোরে না যা করেছ দান > চাহিতে মোরে যা না করেছ দান > চাহিতে মোরে যা করেছ না দান > চাহিতে মোরে যা করেছ দান না। দেখা যাচ্ছে শেষ বাক্যে 'না' শব্দটির স্থান পরিবর্তনে বাক্যটির অর্থ পুরোপুরি পাল্টে যাচ্ছে। 'Surface structure' –এ 'না চাহিতে মোরে যা করেছ দান' তাই সঠিক প্রয়োগ। সদর্থক ভাবনার প্রতিফলন হিসেবে বাক্যের প্রথমেই একটি 'না' শব্দের প্রয়োগে ইতিবাচক ভাবনা এসে পড়েছে। গানটিতে একটিমাত্র 'না' শব্দকে কখনোই মনে হয় না এটি নঞর্থক বাচক শব্দ। এক্ষেত্রে অর্থগত ভাবনাই প্রাধান্য পেয়েছে। আবার এটাও ঠিক যে কবি গানের ভাষার ব্যাপারে স্বাভাবিক প্রবণতাকেই গুরুত্ব দিয়েছেন, তাই ব্যাকরণের দিক থেকে বিচার ঠিকও নয়, হয়তো করাও যায় না।

"কবিতার ভাষা, ছন্দ ও অলংকরণ প্রকরণে রবীন্দ্রনাথ যতরকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন গানের ভাষায় ততটা তিনি সম্পাদন করতেও পারেননি।"[৩]

আর একটি গানের মধ্যে একবারই 'না' শব্দের প্রয়োগ রয়েছে। এটি 'গীতাঞ্জলি'র প্রথম গান। এখানেও আত্মনিবেদনই প্রধান। এককথায় 'গীতাঞ্জলি'র অধিকাংশ গানেই আত্মনিবেদনের আকুতি প্রকাশ পেয়েছে। যেমন -

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণ ধূলার তলে।[৪]

এই গানের সঞ্চারী অংশেই 'না' শব্দের প্রয়োগ রয়েছে -

আমারে *না* যেন করি প্রচার
আমার আপন কাজে –
তোমারি ইচ্ছা করো হে পূর্ণ
আমার জীবনমাঝে।

এখানে 'না' শব্দের ব্যবহারটি বেশ মধুর। উত্তম পুরুষের (আমারে) কাছের শব্দ হিসেবে 'না' শব্দটির প্রয়োগ হয়েছে। 'না' শব্দটিকে যদি 'আমারে যেন না করি প্রচার' বলি তাহলেও চলে। কিন্তু 'Deep structure' –এ অর্থের প্রভেদ অবশ্যই ধরা পড়ে। প্রথমক্ষেত্রে 'না' শব্দটি আমার (আমারে) সঙ্গে আর দ্বিতীয়ক্ষেত্রে প্রচারের (প্রচার) সঙ্গে অধিকমাত্রায় যুক্ত। অর্থাৎ 'আমারে না' বলতে নিজের অস্তিত্বের অস্বীকার বা বলা যায় অহংবোধের বিলোপ, তাই এখানে আত্মনিবেদনের সদর্থক অনুভূতি দিব্যজীবনের ভাবনায় উত্তরিত হয়েছে। অথচ 'আমারে যেন না' বললে ভাবনার দিক থেকে এবং শব্দ ব্যবহারের দিক থেকে 'যেন' শব্দের জন্য 'আমারে' থেকে 'না' বহু দূরে চলে যায়। তাই 'না' নঞর্থক থেকে যায়। কিন্তু 'আমারে না' –এর 'না' সদর্থক হয়ে যায়।

প্রকৃতিকে নিজের মতো করে বা বলা যায় একান্তভাবে আপনার করে নেওয়া গানের মধ্যেও 'না' –এর সদর্থক ভূমিকা রয়েছে। এমনই একটি গান -

মেঘের পরে মেঘ জমেছে,
আঁধার করে আসে –
আমায় কেন বসিয়ে রাখ
একা দ্বারের পাশে।[৫]

সঞ্চারী অংশে 'না' এর প্রসঙ্গ এসেছে -

তুমি যদি *না* দেখা দাও
কর আমায় হেলা,
কেমন করে কাটে আমার
এমন বাদল-বেলা।

এখানে 'তুমি যদি না দেখা দাও' বাক্যে 'না' দেখা দেওয়া প্রধানভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। 'তুমি'র থেকেও তোমার না দেখা দেওয়া অধিকভাবে গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে। তাই 'না' শব্দটি 'দেখা দাও' বহু কাছের হয়েছে। 'না' শব্দটি 'তুমি'র থেকে দূরে অবস্থান করেছে। এমন প্রয়োগে 'তোমার' (যেটাকে ঈশ্বরের বলা যায়) অস্তিত্বের প্রকাশ সদর্থক হয়েছে।

গানের মধ্যে একাধিকবার 'না' শব্দের প্রয়োগেও সদর্থক ভাবনার প্রকাশ রয়েছে। এই ভাবনার গান হল –

বিপদে মোরে রক্ষা করো
এ নহে মোর প্রার্থনা,
বিপদে আমি ***না*** যেন করি ভয়।[৬]

গানটির স্থায়ী অংশে এমন ভাবনার প্রকাশ সচরাচর দেখা যায় না। প্রার্থনার মূল উদ্দেশ্য নিজের কাছে নিজেকে জয় করা। তাই কবি 'বিপদে আমি না যেন করি ভয়' বলেছেন, 'বিপদে আমি যেন না করি ভয়' বলেননি। এখানেও দেখা যাচ্ছে 'না' শব্দটি আমি উত্তম পুরুষের কাছের। অর্থাৎ 'আমি' নামক সত্তাকে কোনো উদ্দীপকের মধ্যে রাখতে চান না। এখানে 'না' নঞর্থক বাচক শব্দ প্রয়োগে 'আমি'র একক সত্তা 'আমি'র চিরন্তন সত্তাতে উত্তরণ ঘটেছে। 'আমি না' যেন ভাষার কারুকার্য অতিক্রম করে 'না আমি'র দিব্যজগতে প্রবেশ করেছে।

এই গানেরই অন্তরা অংশে 'না' শব্দটির একাধিকবার প্রয়োগ রয়েছে –

সহায় মোর ***না*** যদি জুটে
নিজের বল ***না*** যেন টুটে,
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি
লভিলে শুধু বঞ্চনা
নিজের মনে ***না*** যেন মানি ক্ষয়।

এখানেও উত্তম পুরুষের পরে 'না' শব্দের ব্যবহার এবং উত্তম পুরুষের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত শব্দের পরে 'না' শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। 'সহায় মোর না', 'নিজের বল না', 'নিজের মনে না'- সবই উত্তম পুরুষ এবং উত্তম পুরুষের অনুষঙ্গ। কবি বারবার নিজেকে 'না'-এর মধ্যে ডুবিয়ে দিলেও সদর্থক ভাবনার নিবেদন কোনোভাবেই ক্ষুণ্ণ হয়নি। এখানে যেন নিজেকে ঈশ্বরের কাছে নিবেদনের মধ্যেই 'আমি না' বা 'মোর না' প্রয়োগে তোমারই (ঈশ্বরের) শক্তির অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেওয়া। এর প্রমাণ স্বরূপ আভোগ অংশেও 'না' শব্দের প্রয়োগে 'তোমার' (ঈশ্বরের) অস্তিত্বকেই জানিয়ে দেয় –

নম্রশিরে সুখের দিনে
তোমারি মুখ লইব চিনে,
দুখের রাতে নিখিল ধরা
যেদিন করে বঞ্চনা

তোমারে যেন <u>***না***</u> করি সংশয়।

এখানে 'তোমারে'-এর পরে 'না' প্রয়োগ হয়নি। 'তোমারে যেন না'-এর স্থানে 'তোমারে না যেন' 'Surface Structure'-এ অর্থের হেরফের হয় না, কিন্তু 'Deep Structure'-এর ক্ষেত্রে অর্থের পরিবর্তন হতেই পারে, সেজন্য 'তোমারে'-এর পরে 'না' শব্দের প্রয়োগ হয়নি। তাই 'না করি সংশয়' বাক্যাংশটি উত্তম পুরুষের অনুষঙ্গের অনুসারী, যা তোমার (ঈশ্বরের) অস্তিত্বের সদর্থক ভূমিকার প্রকাশক হিসেবে এসেছে।

কবি প্রকৃতিকে যেমন আপন করে নিয়েছেন তেমনি প্রকৃতিও কবিকে আপন করে নিয়েছে – এমন ভাবনার একটি গানে 'না' শব্দের ব্যবহার ভিন্ন ধরনের -

আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায়
লুকোচুরি খেলা।[৭]

এই গানের সঞ্চারী অংশে 'না' ভিন্নভাবে এসেছে -

ওরে যাব <u>***না***</u> আজ ঘরে রে ভাই,
যাব <u>***না***</u> আজ ঘরে।
ওরে আকাশ ভেঙে বাহিরকে আজ
নেব রে লুঠ করে।

নিজেকে প্রকাশ করার দুর্বার আবেগ উত্তম পুরুষের ক্রিয়ার অনুষঙ্গে 'না' শব্দ পরপর দুটি বাক্যে এসেছে। প্রকৃতির সঙ্গে খেলা করার উদ্যমে 'ঘর', 'আকাশ', 'বাহির' যেন আলাদা কোনো বিষয় হয়নি, একই সত্তার প্রকাশরূপে প্রতীয়মান হয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে 'না' শব্দটি একই রূপ নিয়ে দুটি বাক্যে আবর্তনের ফলে।

প্রকৃতি পর্যায়ের আর একটি গানে 'না' শব্দের ব্যবহার অন্যরকম। এই ধরনের গানে দেখা যায় নঞর্থক বাচক শব্দটি সমাপিকা ক্রিয়ার অনুসারী হয়। যেমন -

আজ বারি ঝরে ঝরঝর
ভরা বাদরে।
আকাশ-ভাঙা আকুল ধারা
কোথাও <u>***না***</u> ধরে।[৮]

এই গানে মাত্র একটিবার 'না' শব্দের ব্যবহার আছে, সেটা স্থায়ী অংশেই। 'কোথাও না ধরে' যদি 'কোথাও ধরে না' বলা হয়, তাহলে সাধারণত বাহ্যিক অর্থের পরিবর্তন হবে না। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে পার্থক্য অবশ্যই লক্ষিত হয়। 'কোথাও না ধরে' বাক্যে 'না' শব্দটির উপর অর্থটি গুরুত্ব পায়, কিন্তু 'কোথাও ধরে না' বললে 'ধরে' শব্দটি গুরুত্ব পেয়েও যেন মনে ঠাঁই নিতে পারে না। কারণ গানের ক্ষেত্রে শব্দ বা কথার যেমন প্রাধান্য রয়েছে তেমনি সুরেরও সম গুরুত্ব রয়েছে। তাই কথার সঙ্গে সুরের মিলন এক অসাধারণ শিল্পভাবনা। ". . . সহজে বিশেষ কোনো মনোভাবকে ব্যক্ত করা যদি কোনো আর্টের উদ্দেশ্য হয়, তা হলে সহজে বোধগম্য কোনো উপায়ের

সাহায্য নিতে হয়। সংগীতের ক্ষেত্রে এই উপায়টি হল – কথা। কথার সাহায্য নেওয়াতে বিপদ আছে, কেননা কথার মূল্য আলাদা, তার নিজের রীতি-নীতি, টেকনিক আলাদা। অতএব কথার সঙ্গে সুরের একটা বোঝাপড়া করা চাই। কথা যদি ভাবকে সাহায্য করে, তাহলে তাকে মিত্র বলে গ্রহণ করতেই হবে; কেননা এই মিত্র সংগীতের সম্পদবৃদ্ধি করতে পারে। কিন্তু কথা যখন স্বাধীন হয়ে উঠল, তখন তাকে বর্জন করতে হয়। সুরের সঙ্গে কথার সন্ধি শর্তগুলি ভালো করে draft করা চাই, না হলে alliance ভেঙে যায়। আদত কথা মনের ঐক্য''।[৯] যেটা 'না' শব্দের ব্যবহারে এই গানে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়ে যায়।

কোনো কোনো গানে আত্মনিবেদনের থেকেও বড়ো হয়ে ওঠে সমত্ব। তাই 'আমার' ও 'তোমার' মধ্যে কোনো প্রভেদ থাকে না। এই ধরনের একটি গান হল -

আমার খেলা যখন ছিল তোমার সনে
তখন কে তুমি তা কে জানত।
তখন ছিল ***না*** ভয়, ছিল ***না*** লাজ মনে,
জীবন বহে যেত অশান্ত।
তুমি ভোরের বেলা ডাক দিয়েছ কত
যেন আমার আপন সখার মতো,
হেসে তোমার সাথে ফিরেছিলেম ছুটে
সেদিন কত-***না*** বন-বনান্ত।[১০]

এখানে স্থায়ী ও অন্তরা অংশে 'না' শব্দের প্রয়োগ রয়েছে। স্থায়ী অংশে 'ছিল না ভয়, ছিল না লাজ' অতীতকালের নঞর্থক বাচক শব্দ হিসেবে 'না' শব্দটি অস্তিত্বের ব্যঞ্জনা প্রকাশ করেছে। আবার অন্তরা অংশে 'সেদিন কত-না বন-বনান্ত' বাক্যে 'না' শব্দটি অসীম ভাবনার দ্যোতনা এনে দিয়েছে।

আবার কবি যখন নিজের সঙ্গে বিশ্বযোগের কথা বলেন তখনও 'না' শব্দের সদর্থক ব্যঞ্জনা গানের মধ্যে অন্যমাত্রা এনে দেয়। এই ধরনের একটি গান হল-

বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহার'
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।[১১]

এই গানের আভোগ অংশে 'না' শব্দটি এসেছে -

গোপনে প্রেম রয় ***না*** ঘরে,
আলোর মতো ছড়িয়ে পড়ে-
সবার তুমি আনন্দধন হে প্রিয়,
আনন্দ সেই আমারো।

এখানে 'না' শব্দের মধ্য দিয়ে সদর্থক ভাবনারই দ্যোতনা এসে পড়েছে। 'গোপনে প্রেম রয় না ঘরে' স্থানে 'গোপনে প্রেম না রয় ঘরে' বললে 'না রয়' গুরুত্ব পায়, কিন্তু

'গোপনে প্রেম রয় না ঘরে' বললে ' না ঘর' গুরুত্ব পায় অর্থাৎ প্রেমের অস্তিত্বই প্রকাশ পাচ্ছে।

আর একটি গানে 'না' শব্দটি অন্য ভাবনার রূপকে প্রয়োগ হয়েছে। যেমন –

দয়া দিয়ে হবে গো মোর
জীবন ধুতে।
নইলে কি আর পারব তোমার
চরণ ছুঁতে।
তোমায় দিতে পূজার ডালি
বেরিয়ে পড়ে সকল কালি,
পরান আমার পারি নে তাই
পায়ে থুতে।
এতদিন তো ছিল *না* মোর
কোনো ব্যথা,
সর্ব অঙ্গে মাখা ছিল
মলিনতা।
আজ ওই শুভ্র কোলের তরে
ব্যাকুল হৃদয় কেঁদে মরে,
দিয়ো *না* গো দিয়ো *না* আর
ধূলায় শুতে।[১২]

এখানে 'এতদিন তো ছিল না মোর/ কোনো ব্যথা ' অংশে 'না' শব্দটি ব্যথার অনুসারী। আবার গানের শেষে 'দিয়ো না গো দিয়ো না' মধ্যম পুরুষের (তুমি) ক্রিয়ার অনুসারী। তাই এখানে সদর্থক ভাবনা গভীরভাবে প্রার্থনার আকুতিতে ভরে উঠেছে।

শেষে একটি গানের প্রসঙ্গ তুলতে চাই যে গানের মধ্য দিয়ে প্রশ্নবোধক ভাবনা এলেও ব্যাকরণের গণ্ডি পেরিয়ে অসীম ভাবনার আলোকে আলোকিত হয়ে উঠেছে। গানটি হল -

উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদি রথে
ওই-যে তিনি ওই যে বাহির পথে।[১৩]

গানের আভোগ অংশে তিনটি বাক্যে তিনটি 'না'-এর ব্যবহার আছে —

ওই যে –চাকা ঘুরছে ঝনঝনি,
বুকের মাঝে শুনছ কি সেই ধ্বনি।
রক্তে তোমার দুলছে *না* কি প্রাণ।
গাইছে *না* মন মরণজয়ী গান?
আকাঙ্ক্ষা তোর বন্যাবেগের মতো

ছুটছে ***না*** কি বিপুল ভবিষ্যতে।

এখানে 'রক্তে তোমার দুলছে ***না*** কি প্রাণ।' অংশে প্রশ্নবোধক চিহ্নের (?) প্রয়োগ নেই , অথচ আমাদের মন সুরের ভাবনার জন্য এটাকে অস্বীকার করেনি। আবার 'গাইছে ***না*** মন মরণজয়ী গান?' অংশে 'না' শব্দ প্রশ্নবোধক চিহ্নের (?) প্রয়োগে সদর্থক ভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে। গানের শেষে 'ছুটছে ***না*** কি বিপুল ভবিষ্যতে।' -অংশেও প্রশ্নবোধক চিহ্ন নেই। সুর যেন 'না' শব্দকেও সদর্থকরূপে প্রতিপন্ন করেছে। তার কারণ "গানের কথা বা বাণী অংশ আধখানা সৃষ্টিমাত্র, তার বাকি আধখানা সুর। যেহেতু সুরের বাহনেই সেই কবিতা আমাদের কাছে আসছে সেহেতু, কথার আত্মস্বতন্ত্র ভূমিকা আর থাকছে নাম, তা অন্য মিডিয়ামের অংশ হয়ে পড়ছে। সেই কারণেই উচ্চারিত কথার ধ্বনি ও রূপগত নানা সম্ভাবনা – যা কবিতায় বহুভাবে অন্বেষণ করে দেখার সুযোগ আছে – গানের বাঁধনে বাঁধতে গিয়ে তার অন্তত কয়েকটিকে অপূরিত রেখে দিতে হচ্ছে।"[১৪]

উপসংহার: পরিশেষে বলি 'না' নঞর্থক অব্যয় হলেও অস্তিত্বের ব্যঞ্জনা এনে দিয়েছে 'গীতাঞ্জলি'র গানগুলিতে। 'না' কেবল ভাষার শব্দ বা অব্যয় হিসেবেই থেমে থাকেনি। গানগুলির ভাবনায় কালের ব্যবধানকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে। তাই কবি বলতে পারেন 'প্রভু, আজি তোমার দক্ষিণ হাত/ রেখো ***না*** ঢাকি।/এসেছি তোমারে, হে নাথ,/ পরাতে রাখী।' আবার 'একা আমি ফিরব ***না*** আর/ এমন করে-/ নিজের মনে কোণে কোণে/ মোহের ঘোরে।'[১৫] যখন ক্রিয়ার পরে 'না' বলা হচ্ছে তখন সেই ক্রিয়া উত্তম পুরুষের এবং মধ্যম পুরুষের অনুসারী হিসেবে প্রতিপন্ন হচ্ছে। তবুও গান বা কবিতায় এমনভাবে তো ব্যাকরণ মেনে চলা যায় না, ব্যতিক্রম থেকে যেতেই পারে। কিন্তু একথা জোর দিয়েই বলা যায় 'গীতাঞ্জলির' 'না' সদর্থক ভাবনারই অনন্ত ব্যঞ্জনা।

তথ্যপঞ্জি :

১) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গীতাঞ্জলি, শতবর্ষ পূর্তি সুলভ সংস্করণ, ১৩৬৭, বিজ্ঞাপন অংশ
২) তদেব, পৃ: ১৬
৩) সরকার, পবিত্র, রবীন্দ্র সংগীতের ভাষা ও রূপ, গদ্যরীতি পদ্যরীতি, সাহিত্যলোক, কলকাতা, জানুয়ারী ২০০২, পৃ: ৪৬
৪) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গীতাঞ্জলি, শতবর্ষ পূর্তি সুলভ সংস্করণ, ১৩৬৭, পৃ: ১৫
৫) তদেব, পৃ: ৩২
৬) তবেব, পৃ: ১৮
৭) তদেব, পৃ: ২২
৮) তদেব, পৃ: ৪৫
৯) মুখোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ, রবীন্দ্রসংগীত, ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ: ১০৩

১০) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গীতাঞ্জলি, শতবর্ষ পূর্তি সুলভ সংস্করণ, ১৩৬৭, পৃ: ৯৩
১১) তদেব, পৃ: ১১৯
১২) তদেব, পৃ: ১০০
১৩) তদেব, পৃ: ১৪৯
১৪) সরকার, পবিত্র, রবীন্দ্র সংগীতের ভাষা ও রূপ, গদ্যরীতি পদ্যরীতি, সাহিত্যলোক, কলকাতা, জানুয়ারী ২০০২, পৃ: ৪৭
১৫) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গীতাঞ্জলি, শতবর্ষ পূর্তি সুলভ সংস্করণ, ১৩৬৭, পৃ: ৬৪

উভচর উপন্যাসে নিম্নবর্গীয় জীবন

প্রিয়াংকা মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

একুশ শতকের বাংলা কথাসাহিত্যের অঙ্গনে অন্যতম লেখক হলেন বিকাশকান্তি মিদ্যা। সাহিত্যিকের লেখা অনেক গল্প, উপন্যাসের মধ্যে নিম্নবর্গের মানুষের কথা উঠে এসেছে এমন একটি উপন্যাস 'উভচর'(২০১৯)। উপন্যাসের মধ্যে সাহিত্যিক নিম্নবর্গের দৃষ্টি দিয়ে আঁকা এক অনাস্বাদিত গ্রাম-জীবনের ছবি তুলে এনেছেন। 'উভচর' প্রথমে গল্প হিসাবে প্রকাশ পায়। পরবর্তীকালে উপন্যাস হিসাবে আত্মপ্রকাশ লাভ করে। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র পাঁচু। উপন্যাসের ঘটনা মূলত পাঁচুকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। উপন্যাসটি অনেকটা চরিত্র সর্বস্ব হয়েও চরিত্র প্রাধান্যকে ছাড়িয়ে গিয়ে নিম্নবর্গ সমাজের পুরো ছবি তুলে ধরা হয়েছে।পাঁচু চরিত্র এমনই তাঁর দুর্দশাপূর্ণ অর্থনৈতিক জীবনের একদিকে সংসার ও অপরদিকে রাজনৈতিক দিকে সামঞ্জস্য বজায় রাখা। অর্থাৎ দুইদিকে তাঁকে সমানতা রক্ষা করে চলতে হয়েছে। এক্ষেত্রে পাঁচু উভচর চরিত্র। জলে সে মাছ ধরে স্থলেও সবার সাথে জীবনের তাগিদে সদব্যবহার করতে হয় যতই দুর্দশা হোক না কেন। উভচর উপন্যাসে নিম্নবর্গীয় জীবনের সামাজিক, রাজনৈতিক জীবনের অবস্থান যেমন আছে তেমনি আছে জীবনধারণের জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বনের উপায়, নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল। সবকিছুই যেন উপন্যাসের ব্যক্তিসর্বস্বতা ছাড়িয়ে সার্বজনীনতায় পৌঁছে গিয়েছে। পুরুষ চরিত্রের পাশাপাশি নারী চরিত্রগুলিও যেন স্বতঃস্বভাবে বয়ে গিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে উত্তরণ ঘটেছে সামাজিক পরিসর ছাড়িয়ে।

মূলশব্দঃনিম্নবর্গ সমাজ, নারী, অর্থনৈতিক অবস্থা, উত্তরণ, রাজনীতি

নিম্নবর্গ বলতে সমাজে যারা শোষিত, বঞ্চিত, অন্যদের দ্বারা পরিচালিত তাদেরকে বোঝায়। 'উভচর' উপন্যাসে পাঁচু বা কাহার, বাগদি সম্প্রদায় এরা সমাজে নানাভাবে শোষিত, অধিকার থেকে বঞ্চিত, স্বার্থপর রাজনৈতিক মানুষদের দ্বারা পরিচালিত। উপন্যাসের শুরুতেই আছে নিম্নবর্গীয় জীবনের দুর্দশার চিত্র। পাঁচুর উপার্জনের একমাত্র অবলম্বন মাছ ধরা। কিন্তু সেখানেও পাঁচুকে নানা ভাবে বঞ্চনার স্বীকার হতে হয়েছে। বড়োলোকের জমিতে লুকিয়ে লুকিয়ে মাছ ধরে তবেই অন্নসংস্থান হয়। ভাদ্রের মাঝ বরাবর থেকে শুরু করে কার্তিকের শেষ পর্যন্ত সকাল-বিকাল প্রতিদিন পাঁচুকে জাল হাতে বাদায় ঘুরতে হয়। শুধুমাত্র মাছ ধরলে হবে না বিক্রিও করতে হবে। মাছ বিক্রি করতে গিয়েও মহাজনদের কাছে শোষণের স্বীকার হতে হয়েছে।মাছ নিয়ে হাটে গেলে হাটবাবুরা সেই মাছের ভাগ কেটে দিতে বলে।পাঁচু প্রথমে রাজি না হলে হাটবাবুর লোকেরা নিজের ইচ্ছে মতো মাছ তুলে নিয়ে চলে গিয়েছিল –

"কিন্তু কে শোনে কার কথা? হাতে থাকা ছাতার বাঁটের ঘা চারেক দিয়ে, তুই থামবি পাঁচু, না সপ ক'টা নিলি ভালো হবে বল? বলে, হনহন করে হাঁটা দিয়েছিল হাটবাবুর লোক।"[১]

প্রত্যেক সমাজে নিজস্ব সংস্কৃতি থাকে। গাববেড়িয়ার এই গ্রাম সমাজেও বিশেষত পুজো পার্বণের সময় আনন্দ বিনোদনের উপায় কম হয় না। অবস্থাসম্পন্ন মানুষেরা নিজেদের আনন্দ ফুর্তির জন্য গরিবের পেটের অন্ন কাড়তেও পিছপা হয় না। গ্রামে পুজোর খরচ জোগাড় করার জন্য মাতব্বররা বাদা বিলি করার ব্যবস্থা করে। যার ফলে শুধু পাঁচু কেন পাঁচুর মতো গরিবের পেটের কথা তারা ভাবে না। সে ছাড়াও বাগদি, কাওরা আরো অন্যান্যদের কথা ভাবার অবকাশ নেই মহাজনদের। একরকম ভাবে নিম্নবর্গীয় মানুষদের অর্থনৈতিক দিক থেকে শোষণ করা হয়েছে। নিম্নবর্গের মানুষগুলো কিছু বলতে পারে না। চুপ করে সেই অনুষ্ঠানের অংশীদার হতে হয়। মানুষ সামাজিক তাইতো সমাজের প্রতিটা অনুষ্ঠানে অংশ নিতে হয়।উচ্চ-নীচু বিভেদ থাকলেও কোনো সামাজিক পার্বণে মেলামেশায় বাধা ছিল না। উপন্যাসেও যতই নিম্নবর্গীয় মানুষদের অর্থনৈতিক দিক থেকে বঞ্চিত করা হোক না কেন সমাজের উৎসবের আলোচনায় তাদেরকে বাদ দেওয়া হয় না –

"গাববেড়িয়ার কালীপুজোয় যাত্রা হয়, চৈত্রসংক্রান্তিতে চড়ক আর পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে দক্ষিনপাড়ার মন্দিরতলাও হয় যাত্রা। সে যাত্রা হয় গ্রামের মানুষ সবাই মিলে চাঁদা তুলে।"[২]

জীবন জীবিকার প্রয়োজনে পাঁচুকে চাষের কাজও করতে হয়েছে। বাদা বিলি হয়ে গেলে মাছ ধরা বন্ধ হয়ে যায়। পাঁচুর উপার্জনের প্রধান মাধ্যমও বন্ধ হয়ে যায়। প্রভাত মাস্টারের বাড়ি থেকে চাল চেয়ে এনে কষ্ট করে কিছুদিন চালায়। এমনি করে তো আর দিন চলে না। প্রভাত মাস্টারের কাছে চাষের কাজের কথা বললে মাস্টার নিজের সুবিধার কথা ভেবে রাজি হয়নি। যাদের দাদন দিয়ে রেখেছিল তাদেরকে দিয়ে কাজ করালে তবে টাকা শোধ হবে। পাঁচু অনেক অনুরোধ করা সত্ত্বেও তাকে নেওয়া হয়নি। তাঁর কথার মাধ্যমে সংসারের কঙ্কালসার চেহারা উঠে এসেছে। এরসঙ্গে সামাজিক বঞ্চনার কথাও উঠে এসেছে –

" একবার দে দ্যাকো না মাস্টার। বউ বাচ্চা না খেয়ে মরার দশা গো। বাবা আমার মাচ ধরত বটে, কিন্তু চাষের সময় বদ্যিদের বাড়ি কাজ করত।"[৩]

কথায় বলে অভাবে স্বভাব নষ্ট। অভাবে মানুষ অনেক খারাপ কাজও করতে পারে। পাঁচুরও এই অবস্থা হয়েছে। এর গাছে কলা চুরি করা আবার হাঁস চুরি করতে চেয়েছে। যেগুলো বিক্রি করে উপার্জন হবে। তবে হাঁড়ি চড়বে সংসারে।

উপন্যাসে রাজনীতি একটা বড়ো অংশ জুড়ে আছে। লেখক স্পষ্টতই উপন্যাসের প্রথমেই বলেছেন বাম ক্ষমতায়নের প্রতিষ্ঠাকালীন সময়সীমায় রাজনৈতিক বিষয়

প্রাধান্য পেয়েছে। সেই ইংরেজ আমল থেকে উচ্চবর্গের রাজনীতির পাশাপাশি নিম্নবর্গের রাজনীতির পাশাপাশি নিম্নবর্গের রাজনীতির বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সেখানেও নায়ক নিম্নবর্গীয় মানুষজন ছিল। সমস্ত রকমের রাজনীতির চিন্তা, কাজের চালিকা শক্তি হিসাবে নিম্নবর্গের মানুষকে দেখানো হয়েছে –

" সেই রাজনীতির ক্ষেত্রে নিম্নবর্গই নায়ক, উচ্চবর্গ নয়; নিম্নবর্গের প্রতিভাই সেই রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত সব চিন্তা ও কাজের চালিকা শক্তি।"[৪]

উপন্যাসেও দেখা গেছে যতই নিম্নবর্গের মানুষ পাঁচু উচ্চবর্গের দ্বারা চালিত হোক না কেন কাহিনীকথনের পুরো বন্ধনটাই সে ধরে রেখেছে। প্রধান চালিকা শক্তিরুপে বিদ্যমান। ১৯৫৫, ১৯৫৬ তে ভূমি সংস্কার আইনের প্রভাব উপন্যাসে আছে। বাম সরকারের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থায় ভূমিহীনদের জমি দেওয়া হয়। পাঁচুকেও উপন্যাসে দেখতে পাই সেও কিছু জমি পেয়েছে। সেই জমিকে কেন্দ্র করে ভোটের সময় নিম্নবর্গীয় মানুষদের রাজনীতির কাজে ব্যবহার করা হয়। ভোটের সময় বিপরীত পার্টির বদনাম করার জন্য জমি দেওয়ার নাম করে নিজের দলে টানতে চেয়েছে ধুরন্ধর রাজনৈতিক নেতারা -

" শোন পাঁচু, জমি দরকারে আরও দশ কাঠা বাড়ানো যাবে। কিন্তু সামনে ভোট, আমাদের হয়ে একটু কাজকম্ম কর। অন্তত সঙ্গে থাক।"[৫]

নিম্নবর্গীয় মানুষদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থতার জন্য বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার করা হত। নেতা নেত্রীরা যা বলত তাদের কথায় সেখানেই ভোট দিতে হত। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছিল না। ভোটের কব্জাকলে পড়ে গরিব মানুষদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। এতদিন পর্যন্ত প্রভাত মাস্টারের বাড়িতে চাষের কাজ করত।কিন্তু ভোটে হারার পর কেষ্ট মোড়লের অন্যায়ভাবেজমি বন্টন নিম্নবর্গীয় মানুষদের অন্নের ব্যবস্থা বন্ধ করে দেয়।উপায় না দেখে কাজের সন্ধানে কলকাতায় যেতে হয়। গাববেড়িয়া গ্রামে ফার্স্টবাস ছাড়ে চারটে পঁয়তাল্লিশে। সেই বাসে করে গ্রামের গরিব মানুষেরা কলকাতায় কাজে যায় –

" ফলে গোটা দুই ভোটের পর, হদ্দ বাঁচার তাগিদে গরিব মানুষগুলোর ফার্স্টবাস না ধরে আর উপায় রইল না।" [৬]

নিম্নবর্গের মানুষের অর্থনৈতিক দুর্দশার চিত্র উপন্যাসে স্পষ্টরুপে প্রতিফলিত। পেটের জ্বালায় গ্রাম ত্যাগ করে পুরোপুরিভাবে কলকাতায় চলে যেতে হয়েছে। উপেন হালদার ও তাঁর পরিবার একমাস ধরে শুধু মাইলো নয় ভুট্টার জাউ খেয়ে কাটিয়েছে। আবার কখনো কখনো পান্তার জলে লংকা পুড়িয়ে মেখে খেয়েছে। তাই বড়োলোক ফটিক মাস্টারের হাতে পায়ে ধরে দুবস্তা ধান পায়। সেই ধান চাল করে বিক্রি করতে নিয়ে যাচ্ছিল আড়তে। পুলিশ এসে কেড়ে নেয়। কেবলমাত্র উপেন হালদারের চাল নয়, গরিব খুচরো কারবারিদের চাল কেবল কেড়ে নেয়। অথচ বড়োলোকদের কিছু বলে

না। তাই উপেনের পরিবার কলকাতায় কাজের আশায় যাচ্ছে। সেখানে বউ ও মেয়েগুলো বাবুবাড়িতে অন্তত কাজ পাবে –

" দেশ-গাঁয়ে কাজ কামের যা অবস্থা আর নিজের শরীরের যা হাল, তাতে কালীঘাটে ভিক্ষে করা ছাড়া উপায় কি? বউ আর মেয়েগুলো যদি বাবুর বাড়ি কাজ পায়, সেই আশায় গাঁয়ের মায়া কাটিয়ে আজ কলকাতায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল তারা।"[৭]

পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারা সংসারের ভার বহন করার জন্য সমানভাবে অংশগ্রহণ করে। পৌষ মাসে ধান উঠে যাওয়ার পর পয়সাওয়ালা মানুষেরা ভাড়ানি দিয়ে ধান ভানায়। গ্রামে বিধবা মেয়েরা এই ধানভানার কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। এছাড়াও বর্ষাকালে কাঁথা বোনে। যাদের একেবারে চাষের জমি নেই তারাও এই কাজ করে। পঞ্চমীও তার থেকে বাদ যায় না –

" নতুন ওঠা ধান সিদ্ধ শুকনো করে চাল করে রাখে ধনী চাষি। এর জন্য ভাড়ানি চাই। যাদের সামান্য চাষ, বা যাদের একদম চাষ নেই পালানি বা পঞ্চমীর মতো, তাদের বাড়ির মেয়েরা এই ভাড়ানির কাজ করে।" [৮]

সংসারে অর্থনৈতিক দুর্দশার কারণে পুরুষদের নয় মহিলাদেরও গ্রাম থেকে কাজের সন্ধানে কলকাতায় যেতে হয়েছে। নিজস্ব সামাজিক পরিসর থেকে সম্পূর্ণ অচেনা জায়গায় গিয়েছে। এক্ষেত্রে সামাজিক উত্তরণ ঘটেছে। মহিলারাও দুঃখ, কষ্টের মধ্যে না থেকে উপার্জনের উপায় নিজেরাই খুঁজে নিয়েছে। পঞ্চমী, খেঁদির মা সেটাই করেছে –

" সেই থেকে পঞ্চমী, খেঁদির মা'দের সঙ্গে কলকাতায় বাবুর বাড়িতে কাজে যাচ্ছে।"[৯]

কলকাতায় আসা যাওয়ার ফলে নিম্নবর্গীয় মানুষগুলোর মধ্যে পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে। কলকাতার ভাষা রপ্ত করে ফেলেছে। দারিদ্র্যের বাঁধাধরা জীবনে হাঁপিয়ে উঠতে উঠতে তার মাঝে নতুন জীবন পাওয়ার মতো অবস্থা এই মানুষগুলোর।

উপন্যাস শেষ হয়েছে পাঁচুর মৃত্যুর রহস্যময়তা দিয়ে। যে মৃত্যুর কারণ সকলের অজানা। উপন্যাসটিপাঁচুকে নিয়ে হলেও পাঁচুকে এখানে নিম্নবর্গের প্রতিনিধি হিসাবে দেখানো হয়েছে মাত্র। কেবলমাত্র পাঁচুর জীবন নয় অন্যান্য নিম্নবর্গীয় মানুষজন কাহার গোষ্ঠী, বাগদিদের কথাও উঠে এসেছে। একইসাথে নারীদের জীবনযাত্রার কথাও এসেছে। যার জন্য উপন্যাস ব্যক্তিকেন্দ্রিক না থেকে সার্বজনিক হয়ে উঠেছে। 'উভচর' পাঁচুর জীবনে একদিকে ছিল পেশাগত ভাবনা ও অপরদিকে সম্পর্কের ভাবনা। রাজনৈতিক নেতাদের হয়েও কাজ করেছে। একদিকে গাববেড়িয়ার জীবন এবং অন্যদিকে খড়বেড়িয়ার আকর্ষণ। এই দুই সম্পর্কের মধ্যে মানিয়ে চলা, পাঁচুকে উভচর সম্পন্ন করে তুলেছে। লেখক উপন্যাসের ভূমিকাতে বলেছেন -তিনি সমাজ-সংসার ও

জীবনের পরতে পরতে উভচর স্বভাবকে ধরতে চেয়েছেন। পাঁচুকে শুধুমাত্র দর্পণ ভাবে দেখানো হয়েছে। কিন্তু পাঁচুকে ছাড়িয়ে গিয়ে এই উভচর বৃত্তি পালটাতে থাকা, ভাঙতে থাকা গ্রাম জীবনের উভচর আচরণকে বুঝিয়েছে। সাহিত্যিক হলেন সমাজদ্রষ্টা। পুরোপুরি সমাজের সব বিষয় না উঠে আসলেও অনেকটা বর্ণিত হয় সাহিত্যিকের কলমে। সুতরাং 'উভচর' পাঁচুর এলোমেলো জীবন দেখানো হলেও পরিণতির পরিনাম উহ্য থেকে গেছে। হয়তো অনেকক্ষেত্রে সমাজের ক্ষমতাবান মানুষদের দ্বার ক্ষমতাহারা, অসহায়, নিম্নবর্গের মানুষদের এমনও পরিণতি হয়। উপন্যাসের বৃহৎ পরিসরে সাহিত্যিক গাববেড়িয়া গ্রামের নিম্নবর্গীয় জীবন যেমন দেখিয়েছেন তেমন স্বভাবসিদ্ধ ভাবে উভচরের ভাষা যোগ্যভাবে সঙ্গত জুগিয়েছে। লেখক বা সাহিত্যিক হলেন সমাজ শিল্পী। সমাজ জীবনকে কোনোভাবেই অস্বীকার করতে পারেন না। তাই স্বাভাবিক ভাবেই তাদের কলমে নিম্নবর্গীয় মানুষদের শোষণ, বঞ্চনা উঠে আসবে কারণ সমাজের বিষয় নিয়েই তো সাহিত্য-

"এই জীবন আর জীবন অভিজ্ঞতা তো সাহিত্য আর রাজনীতি দুয়েরই জন্ম দেবে।"[১০]

তথ্যসূত্রঃ

১। মিদ্যা বিকাশকান্তি, উভচর, ধানসিড়ি, কলকাতা-০৬, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০১৯, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৪
২। তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৯৭
৩। তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪৯
৪। ভদ্র গৌতম ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, নিম্নবর্গের ইতিহাস, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ এপ্রিল ১৯৯৮, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩৫
৫। মিদ্যা বিকাশকান্তি, উভচর, ধানসিড়ি, কলকাতা-০৬, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০১৯, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৬০
৬। তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৯২
৭। তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪৫
৮। তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৯৭
৯। তদেব, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১১৯
১০। লিম্বালে শরণকুমার, দলিত নন্দনতত্ত্ব, তৃতীয় পরিসর, কলকাতা-৭০, প্রথম প্রকাশঃ এপ্রিল ২০১৭, পৃষ্ঠা সংখ্যা – ৪১

নৈতিক শূন্যবাদ না মূল্যবোধের পুনর্মূল্যায়ন : একটি পর্যালোচনা নীট্শীয় দৃষ্টিকোণ থেকে

সুস্মিতা ভট্টাচার্য
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ,
গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ, সিঙ্গুর

সারসংক্ষেপ: নীটশের মতন অস্তিবাদী চিন্তাবিদ্ যিনি তথাকথিত খ্রীষ্ট ধর্ম ও খ্রীষ্টীয় নৈতিকতার মূলে কুঠারাঘাত করতে চেয়েছেন তাঁর সমস্ত সৃষ্টি জুড়ে- তাঁর কাছে নৈতিকতা শেষ বিচারে aesthetic বা নান্দনিক। এই নান্দনিকতার সন্ধান তিনি তথাকথিত খ্রীষ্টধর্মের প্রচলিত ধারা কে অবলম্বন করে গড়ে ওঠা যে নৈতিকতা বা নৈতিক মূল্যবোধ তার মধ্যে খুঁজে পাননি । চিরাচরিত খ্রীষ্টীয় নৈতিক মূল্যবোধে ভালো-মন্দ বা পাপ -পুণ্যের যে দ্বি-কোটিক বিভাজন কাজ করে তার প্রতি তিনি আদৌ আস্থাবান ছিলেন না । তাঁর নান্দনিক মূল্যবোধ অনুসন্ধানের পথে তিনি প্রতিষ্ঠিত এই গতানুগতিক ধারার ভালো-মন্দের বা পাপ-পুণ্যের বিভাজনের সীমারেখাকে নস্যাৎ করে দিতে চেয়েছেন। তাঁর এই নস্যাৎ এর ভাবনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল ভবিষ্যতের মানুষের আগমনের স্বপ্ন -যাকে তিনি বলছেন 'ubermensch' বা 'superman'। ভবিষ্যতের সেই মানুষ আজকের মধ্যবিত্ত মনন ও ভাবনার দ্বারা নির্মিত কাঠামোর চেয়ে অনেক উন্নততর- ফলত তার মূল্যবোধও হবে অনেক ভিন্ন, অনেক সৌন্দর্যমণ্ডিত। তাই নীটশে নৈতিক মূল্যবোধকে নস্যাৎ করেছেন -এ কথা না বলে বরং বলা ভালো ভাবীকালের অনাগত মানুষের জন্য তিনি প্রতীক্ষায় আছেন অন্য এক নতুন ধরনের মূল্যবোধ নিয়ে- তাই এক অর্থে নীটশীয় ভাবনায় এ কোনো নৈতিক শূন্যবাদ নয়, বরং বলা ভালো নৈতিকতার পুনর্মূল্যায়ন বা পুনর্নির্মাণ।

মূল শব্দ : will to power (ক্ষমতার এষণা), ubermensch/ superman (অতিমানব), aesthetic (নান্দনিক মূল্যবোধ), God (ঈশ্বর), morality (নৈতিকতা)

নীট্শে প্রসঙ্গে কোন আলোচনাই খুব সংক্ষিপ্ত পরিসরে করা সম্ভব নয়। কারণ একজন প্রথাগত দার্শনিকের মতন কতকগুলি বৌদ্ধিক সমস্যা (intellectual problem) নিয়ে তিনি ভাবিত ছিলেন না। দর্শন, ধর্ম, নৈতিকতার চর্চা যে শুধু উর্বর মস্তিষ্কের চিন্তার ফসল নয়, তার সাথে জীবন যাপনের বা চর্যার স্তরেরও নিগূঢ় যোগাযোগ আছে তা তাঁর নিজের জীবন দর্শনেও ফুটে ওঠে।

নীট্শের ভাবধারাকে অনুসরণ করে বিশের দশকে যে উত্তর-আধুনিকতা (postmodernism) জন্ম নিয়েছে সেই উত্তর-আধুনিক সময়কালের বুকে দাঁড়িয়ে বোধহয় নতুন করে একবার ফিরে দেখবার সময় এসেছে নীট্শের দর্শনের মূল

নির্যাসটা কি ছিল। মানব অস্তিত্ব এবং সেই অস্তিত্বকে সার্থক করে তুলবার প্রচেষ্টায় তিনি যে ধরনের মূল্যবোধের অনুসন্ধান তাঁর সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে করেছিলেন তা বোঝাতে গিয়ে Walter Kaufman, নীট্‌শে প্রসঙ্গে *On the Use and Disadvantage of History for Life* শীর্ষক আলোচনায় নীট্‌শেকে এক জায়গায় উদ্ধৃত করেছিলেন — "The goal of humanity cannot lie in the end (of man), but only in its highest specimens."[1]

ফ্রেডরিক নীট্‌শের সময়কালটা ছিল ১৮৪৪-১৯০০। নৈতিকতা প্রসঙ্গে নীট্‌শেকে নিয়ে যে কোন আলোচনাতেই আর একজন অস্তিবাদী দার্শনিক সোরেন কিয়ের্কেগার্দের প্রসঙ্গ অবশ্যই উল্লেখ্য। নীট্‌শেরও বেশ কিছুটা সময় আগে কিয়ের্কেগার্দের মধ্যে প্রথাগত নৈতিকতার যে ধারণা তাকে এক অর্থে বর্জন করবার বা নস্যাৎ করে ফেলবার একটা প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। নীট্‌শেও তাঁর পূর্বসূরীর মতন এক অর্থে প্রথাগত বা সনাতনী মূল্যবোধকে (conventional morality) বর্জন করে এক ধরনের 'higher morality' নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেছিলেন। নীট্‌শে মনে করেছিলেন এই 'higher morality' না হলে শেষ পর্যন্ত মানুষের যে যাত্রা, বেঁচে থাকার যে চরৈবেতির মন্ত্র তা সার্থক হতে পারে না।

নীট্‌শের দর্শনের পরিকাঠামো নির্মিত হয়েছিল একটিই স্বীকৃতির ওপর। তা হল, প্রত্যক্ষ জগৎ অতিরিক্ত কোন অতিলৌকিক বা অধিবিদ্যক জগত নেই। যা কিছু প্রত্যক্ষ করছি তাই সত্য, এর অতিরিক্ত অলৌকিক জগত বলে কিছু থাকতে পারে না। তিনি ভেবেছিলেন অধিবিদ্যক জগৎকে যদি নস্যাৎ করে দেওয়া যায় তাহলে প্রচলিত খ্রীষ্টধর্মের অলৌকিকত্বকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠা কঠোর নৈতিকতা ও তার নির্দেশাবলীকেও নস্যাৎ করে দেওয়া হবে। অর্থাৎ ঐ শতাব্দী প্রাচীন নৈতিকতার যে অচলায়তন তারও একটা পুনর্মূল্যায়ন সম্ভব। এই পরিকাঠামোকে বাস্তবায়িত করার জন্য তাকে মূলতঃ তিনটি ধারণার আশ্রয় নিতে হয়েছে।

প্রথমতঃ অতিমানব (superman/ Übermensch)-এর ধারণা। এই অতিমানবের দূত হলেন জরথুষ্ট্র। তিনি ছিলেন প্রাচীন পারস্য দেশের প্রাজ্ঞ ব্যাক্তি এবং পার্সীদের ধর্ম Zoroastrianism প্রবর্তন করেছিলেন। নীট্‌শে তাঁর *Thus Spoke Zarathustra* (1883-85) এই রচনার মধ্যে দিয়ে এক নতুন দিগন্তের আহ্বান জানালেন যেখানে যিনি অতিমানব পৃথিবীর বুকে আসবেন তিনি জীবনের বিশৃঙ্খলা (chaos), আকস্মিকতা (contingency) সবকিছুকেই সমান দৃষ্টিতে আনন্দ সহকারে গ্রহন করবেন এবং সৃষ্টি করবেন একগুচ্ছ নতুন মূল্যবোধ। সেই মূল্যবোধ তথাকথিত ভালো-মন্দ, আলো-অন্ধকারের অতীত। কোনরকম বৈপরীত্যের ধারণা দিয়ে তাকে পরিমাপ করা যায় না।

---

[1] Kaufmann, W., *Nietzsche,* New York, Vintnge, 1968, P. 149

দ্বিতীয়তঃ নীট্শের দ্বিতীয় দুরূহ একটি ধারণা হল ‘The Eternal Recurrence of the same’ অর্থাৎ ‘একই ঘটনার নিরন্তর ফিরে আসা’। প্রাচীন সভ্যতার মানুষেরা এই ধরনের ধারনায় বিশ্বাস করতেন। একই ঘটনা যা আমাদের জীবনে ঘটছে তারই পুনরাবৃত্তি হতে থাকবে — অনেকটা যেন একটা বৃত্তের মত। নীট্শের এমন একটি ধারণা গঠনের পিছনে মনে হয় যেটা কাজ করেছে সেটা হল খ্রীষ্টধর্মের শেষ বিচার বা পরিত্রানের ধারণাকে অগ্রাহ্য করতে চাওয়া। যা কিছুই মানুষের জীবনে ঘটুক না কেন সহজ অনুপ্রেরনায়, সাহসের সঙ্গে তার সম্মুখীন হওয়া উচিত। কোন দণ্ডমুণ্ডের কর্তাহীন এক ধরনের পথ পরিক্রমন — তাও আবার চক্রাকারে জীবনে চলতে থাকবেই।
তৃতীয়তঃ শক্তির এষনা/ will to power — প্রতিটি মানুষই তার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য সংগ্রাম করছে। এই সংগ্রাম শুধু যে জীবনকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে চলছে তা নয় — এই সংগ্রাম মানুষ করে প্রগতি, উন্নতি ও আরোও বেশি ক্ষমতা অধিকারের জন্য। তাই তাঁর কাছে জীবনের থেকে দূরে সরে কৃচ্ছতাসাধন করা নিজেকেই অস্বীকার করা এবং তা একান্তই মূল্যহীন।

এই তিনটি ধারনা পরস্পরের পরিপূরক এবং উনিশ শতকের শেষে ও বিশ শতকের শুরুতে ইউরোপীয় দর্শন চর্চায় নীট্শে যে বৈপ্লবিক তরঙ্গ সৃষ্টি করলেন তা শুধু একটা লক্ষ্যের কথা মাথায় রেখেই — অর্থহীন, ঈশ্বরহীন জগৎ, জীবনে মানুষ সত্যিই এক অনস্বীকার্য অর্থহীনতার মুখোমুখি। তাহলে এ থেকে পরিত্রানের পথ কোথায়?

নীট্শে যাকে ‘higher morality’ বলেছেন, কিয়ের্কেগার্দ তাকেই নৈতিক ব্যক্তিক জীবন বা ‘subjective ethical life’ বলে চিহ্নিত করেছিলেন। নীট্শে এবং কিয়ের্কেগার্দ — এই দু’জন দার্শনিকেরই বিশ্বাসগত একটা মিলের জায়গা ছিল। তাঁদের দু’জনেই এটা গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন যে, ব্যক্তি মানুষের জীবনে কোন ঐশ্বরিক শক্তি কখনো কোন ভূমিকা পালন করতে পারে না। কিন্তু পরবর্তীকালে কিয়ের্কেগার্দকে এই ভাবনা থেকে কিছুটা সরে আসতে দেখা যায়। কারণ খ্রীষ্টধর্ম ও খ্রীষ্টীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাঁর যে অনমনীয় ভাব ছিল একটা পর্যায়ে এসে তাঁকে অনেক বেশি নমনীয় হতে দেখা যায়। কিন্তু নীট্শেকে শেষ পর্যন্ত শুধু খ্রীষ্টধর্মই নয়, তাঁর সঙ্গে জড়িত যে নৈতিকতা — এই দুয়ের প্রতিই প্রবল অনাস্থা ও নস্যাৎমূলক দৃষ্টিভঙ্গি ধরে রাখতে দেখা যায়। প্রচলিত খ্রীষ্টধর্মের ধর্মতত্ত্ব ও নীতিতত্ত্বে যে অসার প্রবচন তাঁর থেকে বেরিয়ে আসার যে প্রয়োজন রয়েছে তা তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন। তিনি মনে করতেন অতিবৌদ্ধিক (superrational values) স্তরের কোন মূল্যবোধ আজকের সময়ের বুকে নৈতিকতার আলোচনা প্রসঙ্গে একেবারে অর্থহীন হয়ে গিয়েছে। কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা অনুশাসনের পক্ষে কোন ব্যক্তিকে নৈতিক বা অনৈতিক বলে চিহ্নিত বা চালিত করার দিন এবার শেষ হওয়ার মুখে। তিনি মনে করতেন, নৈতিকতাকে

বুঝতে হবে আমাদের নিজেদের জীবন, প্রয়োজন, স্বাভাবিক প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত করে। কারণ তাঁর মতে, প্রাকৃতিক জগতের বাইরে বা ব্যক্তির অন্তর্জগতে এমন কোন কিছুই থাকতে পারে না যার থেকে কোন সার্বিক বৈধ নিয়ম অনুসৃত হতে পারে। প্রচলিত খ্রীষ্টধর্ম এবং তার তথাকথিত নৈতিক আচরণগত বিধিনিষেধ নীট্‌শের কাছে অনেকটা আধুনিক সময়ের বুকে এক ধরনের অসুস্থতা (modern sickess) বলে মনে হয়েছে। কারণ নৈতিকতার নামে খ্রীষ্টধর্ম তাঁর যে প্রয়োগিক দিকের প্রতি বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে তাকে নীট্‌শে এক ধরনের প্রথানিষ্ঠ অবমূল্যায়ন (systamatic devaluation) বলেছেন। নীট্‌শের রচনাকালের সময়টা যদি খুব ভালো করে লক্ষ্য করা যায় তাহলে বোঝা যাবে এক ধরণের নৈতিকভাবে শূন্যগর্ভ সময়ে তিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ তিনি নিজেও এক ধরনের moral vaccum বা নৈতিক শূন্যতাবোধের সাক্ষী — MacIntyre-এর ভাষায় নীট্‌শেকে তাই একসঙ্গে তিনটি কাজ করতে হয়েছে — "to exhibit the historical and psychological causes of the vaccum, to unmask false candidates for the role of new morality; and finally, to transcend the limitations of all hitherto existing systems of morality; and by a 'transvaluation of values', to prophetically introduce a new way of life."[2]

নীট্‌শে তাঁরই পূর্বসূরী আরেকজন প্রখ্যাত জার্মান দার্শনিক ইম্যানুয়েল কান্টের প্রতিও সমালোচনায় যথেষ্ট নির্মম। কান্টের নৈতিক দর্শনে যে ধরনের সার্বিক নৈতিক নিয়মের (universal moral law) কথা পাচ্ছি, সেখানে কান্ট বলেছেন যে স্থান, কাল, ব্যক্তির ঊর্ধে এমন একটা নৈতিক জগৎ আছে যা কোন ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে সত্য নয়, তাঁর একটা সার্বত্রিক আবেদন আছে। নীট্‌শে এই বিষয়ে কান্টের সাথে কোনভাবেই একমত হতে পারছেন না। তিনি মনে করেছেন, কান্ট আগে থেকেই অনুমান করে নিয়েছেন যে আমরা প্রত্যেকেই এক ধরনের নৈতিকতার বোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হতে বাধ্য! কান্ট তাঁর নৈতিক দর্শনে "pure practical reason" বা বিশুদ্ধ ব্যবহারিক প্রজ্ঞার ধারণাটিকে এনেছেন। এই বিশুদ্ধ প্রজ্ঞাই কোন নৈতিক নিয়ম পালনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে চালিত করবে। নীট্‌শের আপত্তি এখানেই। তিনি বলেছেন বিশ্বজনীন নৈতিক বিচার (universal moral judgements), বিশুদ্ধ ব্যবহারিক প্রজ্ঞা (pure practical reason) — এগুলো কি নৈতিকতার প্রয়োগিক স্তরে সত্যিই প্রয়োজন? এই প্রশ্নের সূত্র ধরেই আজকের সময়ের উত্তর-আধুনিক চিন্তাবিদরা মনে করেন এসব বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা, সার্বিক নৈতিক নিয়মের ধারণা গঠনের মূলে রয়েছে আসলে

[2] MacIntyre, A., *A Short History of Ethics,* New York, Touchstone, 1996, p. 223-224

একটি বিশেষ শক্তিশালী গোষ্ঠী (power group) — যাঁরা তাঁদের নিজ স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য এই ধরণের প্রত্যয়কে (concept) নির্মাণ (construct) করে থাকেন।

কোন বিশ্বজনীন নৈতিকতার ধারণা যদি নির্মাণ মাত্র হয়, তাহলে দুটি প্রশ্ন উঠে আসে। প্রথমতঃ যে কোন সত্য (truth) যদি নির্মাণ (construct) হয় তাহলে একটি নির্মিত সত্যের সাথে অপর অপর একটি নির্মিত সত্যের দ্বন্দ্ব অনিবার্য। সেক্ষেত্রে এই দ্বন্দ্বই কি আমাদের আকাঙ্খিত বা একমাত্র ভবিতব্য?
দ্বিতীয়তঃ যদি কোন সার্বিক বা চরম সত্য না থাকে, তাহলে এক চরম অনিশ্চয়তার মুখোমুখি মানুষকে হতে হয়। কারণ প্রতিটি মানুষই তাঁর যাত্রা শুরু করে কিছু না কিছুকে অবলম্বন করেই। প্রশ্ন রয়ে যায়, তাহলে মানুষ তাঁর জীবনকে চালনা করবে কোন আলোর প্রেরণায়?

নীট্‌শে এমন দর্শনের ভাবনায় ভাবিত ছিলেন যে তাঁর মধ্যে একজন মূর্ত মানুষের অস্তিত্বের কথা থাকবে। *Toward a Genealogy of Morals*-এ তিনি এই ভাষায় বলছেন, “Apart from the aesthetic ideal, man, the animal — had no meaning hitherto. His existence on earth had no goal. “Why have men at all”? was as question without an answer... a tremendous gap surrounded man: he did not know how to justify, explain or affirm himself, he suffered from the problem of his meaning... Yet suffering as such was not his problem, but that the answer was lacking to the cry of the question, “why suffer”?[3]

এই দৈনন্দিন ব্যবহারে জীর্ণ হয়ে যাওয়া নিছক শরীরী অস্তিত্বের মাঝেও ‘অলখে ঝলকে’ উঠে আসতে পারে সমস্ত প্রকারের হতাশা, যন্ত্রনার ঊর্ধ্বে বেঁচে থাকার এক তীব্র প্রেষণা। The will to power-এ তাই তিনি বলেছেন, “I teach the No to all that makes weak — that exhausts. I teach the yes to all that strengthens, that stores up strength, that justifies the feeling of strength”[4] প্রশ্ন রয়ে যায়, নীট্‌শে তাঁর নীতিতত্ত্ব সংক্রান্ত আলোচনার মধ্যে কিভাবে এই মৌলিক চিন্তাকে রূপ দিতে পেরেছেন?

(২)

নীট্‌শেও তাঁর নৈতিকতার আলোচনায় কিয়েৰ্কেগার্দের মতন তিন ধরনের নৈতিক মূল্যবোধকে গুরুত্ব দিয়েছেন — নান্দনিক (aesthetic), নৈতিক (ethical) এবং ধর্মীয়

---

[3] Nietzsche, F., *Toward A Genealogy of Morals,* Kaufmann (trans), New York, Vintnge, 1967, P. 24

[4] Nietzsche, F., *The Will to Power,* Kaufmann and Hollingdale (trans), New York, Random House, 1967, P. 54

(religious)। নীট্‌শে মনে করেছিলেন মানুষের সমস্ত রকমের মূল্যবোধই শেষ বিচারে নান্দনিক (aesthetic) হয়ে যায়। কিন্তু তাঁর মতে, খ্রীষ্টধর্ম, খ্রীষ্টীয় নৈতিকতা এক প্রকারে চূড়ান্ত বিকৃতিস্বরূপ, তাঁর মধ্যে কোন নান্দনিক স্পর্শ নেই। লক্ষণীয় বিষয় হল এই যে, কিয়ের্কেগার্দ এবং নীট্‌শে — এঁরা দুজনেই মনে করতেন যে নৈতিক এবং ধর্মীয় — দু'ধরনের মূল্যবোধের কোনটিই আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির (reason) দ্বারা যাচাইযোগ্য (justified) হতে পারে না। যদিও একজন যথাস্থিতবাদী দার্শনিক (naturalist philosopher) হওয়ার ফলে তিনি সবসময় প্রথাগতভাবে 'ভাল' (good) এবং 'মন্দ' (bad) ইত্যাদি ধারনাকে সমর্থন করতেন না এবং সর্বোপরি চরম অর্থে যে কোন প্রকার চরম মূল্যবোধেরই (absolute value of good and evil) তিনি প্রবল বিরোধিতা করেছেন। এই নৈতিক শূন্যবাদ (moral nihilism) তাঁর দর্শনের শেষ পরিণতি নয়, বরং এটা বলা অনেক যুক্তিসঙ্গত যে তাঁর দর্শনে এটা অন্য আর এক পর্বে যাবার প্রস্তুতি মাত্র। তাঁর নিজেরই ভাষায়, "Now that the shabby origin of these values (social values) is becoming clear, the universe seems to have lost value, seems 'meaningless', but that is only a transitional stage."[5] তাঁর বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন লেখা থেকে খুব স্পষ্টতঃ বোঝা যায় যে তিনি প্রচলিত সমস্ত মূল্যবোধগুলির এক ধরনের পুনর্মূল্যায়ন করতে চেয়েছিলেন যাকে তিনি এক কথায় বলেছিলেন, 'revaluation of values'.

অনেকের মতে, নীট্‌শে যাকে 'মূল্যবোধের পুনর্মূল্যায়ন' বলেছেন তা আসলে পূর্ব প্রতিষ্ঠিত কিছু মূল্যবোধেরই মূলে রয়ে যাওয়া যে ভিত্তিপ্রস্তর (foundation) তাকেই প্রশ্ন করেছেন। R.C.Solomon খুব যথার্থই বলেছেন, "The problem, again is to re-establish on a new foundation, the old theological foundation no longer being adequate. This new ground for morality will have to be purely naturalistic; the problem is how one can find such a ground; how one can find a justification for morality".[6]

প্রশ্ন রয়ে যায়, তাঁর দর্শনে 'মূল্যবোধের পুনর্মূল্যায়ন' এবং 'ঈশ্বরের মৃত্যু' (death of God) — এই দুয়ের মধ্যে কোথাও কোন যোগসূত্র আছে কি? একটা বিষয় এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, নীট্‌শের দর্শনে 'death of God' প্রকৃতপক্ষে খ্রীষ্টীয় নৈতিকতাকে তাঁর ধর্মীয় অনুষঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে বুঝতে চাওয়ার একটা প্রচেষ্টা মাত্র। *Antichrist*-এ তাঁরই নিজের ভাষায় "That we find no God — either in history or in nature or behind nature is not what differentiates us,

---

[5] Nietzsche, 1967, P. 7

[6] Solomon, R. C. *From Rationalism to Existentialism,* U.S.A, Humanities Press, 1972, P. 118

but that we experience what has been revered as God, not as 'Godlike' but as miserable, as absurd, as harmful, not merely as an error, but as crime against life."[7] অর্থাৎ তাঁর কাছে ঈশ্বর নামক কোন পরম সত্তার অস্তিত্ব আছে কি না — তা আবিষ্কার করা সম্ভব হচ্ছে না, যাকে ঈশ্বররূপে স্বীকার করে শ্রদ্ধা করা হচ্ছে তা তাঁর মনে হয়েছে জীবনের স্বাভাবিকতার পক্ষে এক বিপর্যয়স্বরূপ, নির্মম ঘাতক শক্তি।

ঈশ্বরের অনস্তিত্বের চরম ঘোষণার মধ্যে দিয়ে নীট্‌শে মনে করেছেন যে ঈশ্বর নামক কোন পরম অস্তিত্বের স্বীকৃতি আর নৈতিকতার ক্ষেত্রে প্রয়োজন নেই এবং তাঁর ভাষায় fear of God অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি এক ধরনের ভীতি বা ভয় থেকে খ্রীষ্টীয় নৈতিক অনুশাসনকে বাধ্য হয়ে মেনে চলবার যে প্রবণতা — তাও এবার শেষ হওয়া উচিত। ধর্মীয় হওয়ার অর্থ তাঁর কাছে শুধু এইটুকুমাত্র ছিল না যে কোন পরম সত্তার অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেওয়া। কিয়ের্কেগার্দ এবং নীট্‌শে উভয়ের উপলব্ধিতে একটা গভীর সত্য ধরা পড়েছিল যে, মানুষের নিজের মর্মমূলে এমন একটা উপলব্ধির জায়গা অনুসন্ধান করা প্রয়োজন যেখানে দাঁড়িয়ে অন্ততঃ ব্যক্তি নিজেকে প্রতি মুহূর্তে সত্যিকার অর্থে আবিষ্কারের চেষ্টা করবে।

নীট্‌শের নৈতিক মূল্যবোধ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে নান্দনিক মূল্যবোধ (aesthetic value)-এর কথাই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। তবে লক্ষণীয় বিষয় হল যে, নীট্‌শের দর্শন যখন এক ক্রমপরিণতির দিকে এগিয়েছে — সেই পরিণতমনস্ক চিন্তায় নৈতিক মূল্যবোধের অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে তিনি যে মানদণ্ডের সন্ধান করেছেন তা ক্রমশঃ মনস্তাত্ত্বিক (psychological) হয়ে উঠেছে। শেষ পর্যন্ত তাঁর দর্শনে "Will to Power" বা ক্ষমতার এষণা-র বিষয়টি প্রাধান্য লাভ করেছে যা নিয়ন্ত্রন করবে "মূল্যবোধ সম্পর্কিত সমস্ত মূল্যবোধ"-কে ("value of all values")। তার নিজেরই কথায়, "A tablet of goal hangs over every people. Behold it is the tablet of their overcomings; behold, it is voice of their will to power".[8]

এখন তাহলে প্রশ্ন রয়ে যায়, এই 'will to power' বলতে নীট্‌শে কি বুঝিয়েছেন? ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্য কোন কিছু দিয়েই নৈতিকতাকে বোঝা যায় না। তিনি মনে করেছিলেন শক্তিই একমাত্র নৈতিকতার পরিমাপ হতে পারে। জগতে প্রকৃত

---

[7] Nietzsche, F., *Antichrist,* Kaufmann (trans), New York, Vintnge, 1967, P. 47

[8] Nietzsche, F., *Thus Spoke Zarathustra,* Kaufmann (trans), New York, Viking-Compass, 1964, P. 15 (58)

অর্থে যদি কোন সত্য থেকে থাকে তাহলে তা শক্তি। এই শক্তির বোধকে যা উদ্বোধিত করে তাই মঙ্গল, এ ছাড়া অন্য কোন কিছু 'মঙ্গল' পদবাচ্য হতে পারে না। নীট্‌শে মনে করেছেন যারা দুর্বল, ভীরু প্রকৃতির মানুষ তারাই পাপ-পুণ্য, মঙ্গল-অমঙ্গল ইত্যাদি ধারণা নিয়ে বেঁচে থাকতে চায়। যার স্বভাবের মধ্যে কোন ভীরুতা নেই, যে ধীর স্বভাবের সে পাপ-পুণ্যের অতীত। সে শুধু তাঁর শক্তির দ্বারা চালিত হয়ে থাকে। *The Will to Power*-এ স্পষ্ট ভাষাতেই তিনি বলেছেন, "According to what standard is the objective value measured? According to the quality of increased and more organized power alone".[9]

নীট্‌শের মতে তাহলে ক্ষমতার এষণা মানুষের অন্তরে থাকলে সেই শক্তি নিয়েই সে জীবনে এগিয়ে যেতে পারে। এই কথা সম্পূর্ণ ভাবে স্বীকার করা হচ্ছে না কারণ এর মধ্যে আংশিক সত্য আছে। যে শক্তির কথা তিনি বলেছেন, সেই 'শক্তি' শব্দটি কি নির্দেশ করছে তা বোঝা দরকার। শক্তির নাম করে ব্যক্তি জগৎ-জীবনে যা করবে তা কি সর্বদাই সঠিক? প্রকৃত শক্তির উৎসের সঙ্গে জড়িত রয়েছে প্রকৃত কল্যানের ধারণা। সুতরাং এখানে যে বিষয়টি লক্ষণীয় তা হল 'will to power'-এর মধ্যে দিয়ে ব্যক্তি নিজের ভালো-মন্দ আবিষ্কার করতে পারছে কি না তা দেখা। অর্থাৎ শক্তি কোন লক্ষ্য (end) নয়, তা যেন উপায় (means) মাত্র হয়।

দ্বিতীয়তঃ কোন্ ব্যক্তি-আমি (Individual-I) এই 'will to power' — কে ব্যাখ্যা করবে? একই ব্যক্তির মাঝে পরস্পর বিরুদ্ধ বহু-আমির সমাহার। সুতরাং নীট্‌শে যেভাবে ভেবেছিলেন 'will to power' –ই নৈতিকতার বিচারের ক্ষেত্রে শেষ কথা হবে তা নয়। কারণ আরও বড় সত্য হল আপনার স্বরূপের সাথে মানুষের আগে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। নিজের প্রকৃত স্বরূপকে যদি মানুষ না জানে তাহলে শুধু ক্ষুদ্র অহং বোধের দ্বারা চালিত হয়ে সে চিরকাল কাজ করে যাবে। তেমনি মানুষ যদি শক্তিমান হওয়ার প্রচেষ্টায় নিজ অন্তরের গভীরে তাঁর অন্বেষণকে সদা জাগ্রত না রেখে শুধু কোন বাহ্যিক বিষয়ের ওপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠাকে শক্তির পরিচয় জেনে তৃপ্ত হয় তাহলে সেখানে বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। পৃথিবীর দুঃসময়ের দিকে তাকিয়ে জীবনানন্দকেও বলতে হয়েছিল,

"এই পৃথিবীর রণ, রক্ত, সফলতা সত্য;
তবু শেষ সত্য নয়।"[10]

---

[9] Nietzsche, 1967, P. 674

[10] দাস, জীবনানন্দ, *কাব্যসংগ্রহ,* বন্দোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ (সম্পাদনা), কলকাতা, ভারবি, ১৯৯৩, পৃ. ১৯০

নীট্শের দর্শনে মূলতঃ স্বভাবের দিক থেকে যারা বীর্যবান তাঁদের কথাই বারবার ফিরে এসেছে। তিনি মনে করতেন, যারা শক্তিমান তাঁদের জন্যই এই জগৎ, কেননা যারা দুর্বল, শক্তিহীন তারা কোন এক দিন পৃথিবীর বুক থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। বিবর্তনবাদের এই যে "যোগ্যতমের উদ্বর্তন" তাই হচ্ছে নীট্শের দার্শনিক ভাবনার প্রতিষ্ঠাভূমি।

'Will to power' বা ক্ষমতার এষণা নিয়ে এসব প্রশ্নকে যদি একপাশে সরিয়ে রেখে নীট্-শীয় ভাবনাকে বোঝার চেষ্টা করা যায় তাহলে বেশ কিছু তথ্য উঠে আসে যা হয়ত নীট্শীয় ভাবনার মধ্যে যে অস্বস্তির জায়গাটি রয়েছে তাকে এক কথায় বোঝাতে গিয়ে R.C.Solomon Karl Jaspers-এর বক্তব্য অনুসরণ করেছেন — "According to Jaspers, Nietzsche must always be read by finding contradictory pairs of theses. Nietzsche does contradict himself, particularly if his earliest and last works are juxtaposed."।[11] সুতরাং ক্ষমতার এষণা বিষটি কোন একমাত্রিক বিষয় নয় যার সরলীকরণ এক কথায় করে দেওয়া সম্ভব।

নীট্শের এই শক্তি সংক্রান্ত তত্ত্বে একটি প্রশ্ন বার বার উঠে আসে যে শক্তি বলতে তিনি কি এমন কিছুকে বুঝিয়েছেন যার দ্বারা অন্যের ওপর প্রভুত্ব করা যায় না কি নিছক ক্ষমতার আস্ফালন যা নাকি প্রচলিত ধারার যা কিছু তাকে ভেঙ্গে দেওয়ার মধ্যেই সার্থকতা খোঁজে? Rhoda P Le Cocq তাঁর *The Radical Thinkers — Hidegger and Sri Aurobindo* বইতে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে বলেছেন, "Fundamentally, this was not a will to hold power over others or to rule the world, but an over-flowing spontaneous zest for life: a kind of fundamental energy."[12] যদি নিছক শাব্দিক বিশ্লেষণ দিয়েও শুরু করা যায় তাহলেও বলতে হয় যে, 'Power' এবং 'Energy' দুটি শব্দের ব্যঞ্জনা কিন্তু আংশিক হলেও ভিন্ন। যদি 'Power' বলা হয় তাহলেও বেশ কিছু অমীমাংসিত প্রশ্নের মুখোমুখি এসে দাঁড়াতে হয়। কোন্ জাতীয় ক্ষমতাকে তিনি তাঁর দর্শনের প্রাণকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন — জাগতিক (physical) না সামরিক না শাসনতান্ত্রিক? দ্বিতীয়তঃ এই ক্ষমতার বিষয়টি তাঁর ভাবনার জগতে বিভিন্ন পরিবর্তনের ধারাস্রোতে অনেকভাবে এসে ধরা পড়েছে। সুতরাং নীট্শীয় ক্ষমতা মানেই ঘৃণ্য নিন্দনীয় আসুরিক ক্ষমতা এমন ভাবনার ছাঁচে ফেলে নীট্শেকে নস্যাৎ করা যাবে না বা তা কাঙ্খিতও নয়। "What

---

[11] Solomon, 1972, P. 109

[12] Cocq, Rhoda P. Le., *The Radical Thinkers — Heidegger and Sri Aurobindo,* Pondicherry, Sri Aurobindo Ashram, 1969, P. 111

Nietzsche means by *der Willie Zu Macht* is not easily understood, first because the notion of 'power' is so often taken in the sense of physical or military power, encouraged by Nietzsche's frequent appeal to military allegories in his writing; secondly, because the role and meaning of the *Will to Power* changed significantly in the course of Nietzsche's career."[13]

তবে নীট্‌শে তাঁর শক্তি সংক্রান্ত তত্ত্বকে যেভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন তাতে মানব অস্তিত্বের মাঝে এক ধরনের অতিক্রমণের সম্ভাবনা (potential to overcome)-কেই তিনি বুঝিয়েছেন। 'সম্ভাবনা'-র ধারনার ক্ষেত্রে তিন যেন অনেকটা অ্যারিস্টটলীয় ধারনার সমগোত্রীয়।

ফিরে যাওয়া যাক্ Rhoda-র কথার সূত্র ধরে 'fundamental energy'-র প্রসঙ্গে। Rhoda দেখাতে চাইছেন নীট্‌শে এমন একটা শক্তির উৎস খুঁজে পেতে চেয়েছিলেন যা মানব অস্তিত্বের ধারাবাহিক, নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহের দ্যোতক। সেই শক্তি এমনই যা অস্তিত্বের অসম্পূর্ণতা, অপ্রাপ্তির জ্বালা থেকে এগিয়ে যেতে চায় অন্য কোন এক লক্ষ্যে। এই ধরনের ভাবনার প্রতিফলন সমসাময়িক ভারতীয় দর্শনের অন্যতম পথিকৃত শ্রীঅরবিন্দের মধ্যেও পাই। শ্রীঅরবিন্দও মানব অস্তিত্বের মাঝে এক নিরন্তর প্রেষণাকে অনুভব করেছিলেন। তাই তিনি বলছেন: "Man, Limited, yearns to the Infinite... What he aspires to, the sign of what he may be... For man is Nature's great term of transition in which she grows conscious of her aim..."[14]

আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়, যখন নীট্‌শেকে দেখা যায় এভাবে বলতে: "Is not something thronging and pushing in you — man's future?

....

You are mere bridges: may men higher than you stride over you. You signify steps: therefore do not be angry with him who climbs over you to his height. A genuine son and perfect hair may yet grow from your seed, even for me: but that is distant."[15]

প্রথাসিদ্ধ ভাবে নীট্‌শের শক্তি-তত্ত্বের যে সমালোচনা করা হয় তাঁর উত্তরে শুধু একথাই বলা যায়, নীট্‌শের দর্শনের সমস্ত প্রকারের স্ববিরোধিতা, অসঙ্গতিকে সরিয়ে

---

[13] Solomon, 1972, P. 125

[14] Sri Aurobindo, *Superman,* Pondicherry, Sri Aurobindo Ashram, 2001, P. 6-7

[15] Nietzsche, 1954, P. 436

রেখে অভিনিবিষ্ট হতে হবে তাঁর মূল বক্তব্যে। মূলতঃ যা তিনি তুলে ধরতে চেয়েছিলেন তা হল মানুষের মধ্যে এমন এক আত্ম-অতিক্রমণের ক্ষমতা প্রয়োজন যা দিয়ে মানুষ তার বর্তমান অবস্থাকে নিরন্তর অতিক্রম করে যাবে — এবং এই অতিক্রমণ কোন সরলরৈখিক প্রক্রিয়া নয় — তাকেও দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে গিয়ে সেই দ্বন্দ্বের বাইরে যাওয়ার পথ খুঁজে নিতে হবে। এ প্রসঙ্গে অবশ্য নীট্শের এই কথা মনে করিয়ে দিয়ে যায় আর একজন গ্রীক দার্শনিক হেরাক্লিটাস-কে। হেরাক্লিটাস তাঁর সমগ্র দর্শনে যা ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন, নীট্শে তাই *Thus Spoke Zarathustra*-তে বলেছেন, "Life as eternal war, polarity, tension; life as becoming and flux; life as play 'the world of Zeus'."[16]

নীট্শের ব্যাপক প্রভাব পরবর্তীকালে উত্তর আধুনিক দর্শনের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই আবার নীট্শের দর্শনের বা রচনার কিছু বিপজ্জনক প্রভাবও লক্ষ্য করার মতন। বিপজ্জনক বলা হচ্ছে এই কারণে যে ঈশ্বর, অধিবিদ্যা, খ্রীষ্টধর্মকে আক্রমণ করার সুবাদে এমন অনেক কথা তিনি বলেছিলেন যার বহুবিধ অতি সরলীকৃত ব্যাখ্যা বিভিন্ন দল, মত, গোষ্ঠী তাঁদের নিজেদের স্বার্থে দিয়ে থাকে। অ্যাডলফ হিটলার স্বয়ং নিজেকে নীট্শের শিষ্য বলে বলে দাবি করে থাকতেন এবং তাঁর অনুচরবৃন্দ তিরিশের দশকে তাঁদের দলীয় প্রচার কর্মসূচীতে নীট্শের একটি সংকলনও প্রকাশ করেছিলেন। নীট্শের লেখায় শক্তির আরাধনা, দুর্বলের প্রতি অবজ্ঞা, সময়ে সময়ে প্রচণ্ড ইহুদী বিদ্বেষ, আর্য চিন্তার শ্রেষ্ঠত্ব — এ সবই অল্প আয়াসেই তাঁর জনপ্রিয় রচনাগুলি যেমন *Thus Spoke Zarathustra, Beyond Good and Evil, The Genealogy of Morals* –এ খুঁজে পাওয়া যায়।[17]

নীট্শীয় শক্তি-তত্ত্ব কালের গতিতে বিকৃত হয়ে মানব অস্তিত্বকে এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে — সে কথার সমর্থন জার্মানীর হিটলার এবং নাৎসী কার্যকলাপেই মেলে। কিন্তু সে অন্য প্রসঙ্গ। নীট্শে যা বলতে ছেয়েছিলেন তার সারার্থ হল আত্ম-অতিক্রমণের শক্তি, নিজের মধ্যে সমতার শক্তি, সৌন্দর্যবোধের পরিপূর্ণ হয়ে ওঠার শক্তি এবং এই শক্তিকে আয়ত্ত করবার পরে ব্যক্তি যখন নৈতিকতাকে বুঝবে — সেই নৈতিকতা তখন নিতান্ত সমাজ প্রতিষ্ঠিত, সর্বজনস্বীকৃত কোন ভালো-মন্দের ধারণাকে নিছক মেনে চলা নয়, তার মধ্যে দিয়েই ব্যক্তি সত্তায় খুলে যাবে অন্য এক দুয়ার — অনেকটা যেন কোন শিল্পীর হাতের নিপুন টানে 'হয়ে ওঠা' কোন শিল্প। "Nietzsche's will to power is thus far removed from

---

[16] Nietzsche, 1954, P. 75

[17] বন্দোপাধ্যায়, অমল, *উত্তর আধুনিক চিন্তা ও কয়েকজন ফরাসি ভাবুক,* কলকাতা, এবং মুশায়েরা, জানুয়ারি, ২০১১, পৃ. ২৫

the common imagery of military strength — the most powerful are not politician and soldier, but the artist, the philosopher, and the esthete. Will to Power is ultimately control over one's self; it is not licence but restraint; not power to hurt or destroy but power to create."[18]

(৩)

নীট্‌শে তাঁর নৈতিকতা সম্পর্কিত আলোচনায় 'herd morality' এবং 'slave morality' — দু'ধরনের নৈতিকতার কথা স্বীকার করেছেন। খুব সহজভাবে যদি বিষয়টি বোঝাতে চাওয়া হয় তাহলে বলতে হয় 'herd morality' হল সেই ধরনের নৈতিকতা যেখানে কোন ব্যক্তি এককভাবে এবং স্বাধীনভাবে নৈতিক বিধানের অপেক্ষা না করেই তার অন্তরের শক্তিকে অবলম্বন করে জগতে নিজের অস্তিত্বকে অর্থপূর্ণ করে তোলার চেষ্টা করে। অর্থাৎ এই ধরনের ব্যক্তিরা বিশ্বের মাঝে একাকী চলবার মন্ত্রে বিশ্বাসী। এই ব্যক্তি-মানুষ যখন ধীরে ধীরে গোষ্ঠী, সমাজবদ্ধ অন্যান্য বিধি-নিষেধ থেকে সরে আসছে, তখন তার ভেতরে এমন এক শক্তি কাজ করছে, যা তাকে ধীরে ধীরে এই সমস্ত, প্রথাবদ্ধ জীবনের যে নৈতিক বিধি-নিষেধের আবহ তার উর্ধ্বে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। Robert Frost যেমন তাঁর কবিতায় বলেছিলেন,

"I shall be telling with a sigh
Somewhere ages and ages hence;
Two roads diverged in a wood, and I —
I took the one less travelled by,
And that has made all the difference."[19]

ব্যক্তির সমাজের মাঝে একা হয়ে গিয়েও নিজেকে নিজে সৃষ্টি করতে পারে নীট্‌শে মনে করতেন তাঁর দর্শনের এটিই মূল কথা। আপাতভাবে যে মানুষকে অতি সাধারণ, দুর্বল, শক্তিহীন বলে মনে করে তাঁর ওপর পাপ-পূণ্য ইত্যাদি নৈতিক মূল্যবোধ আরোপ করা হয়ে থাকে — সেই মানুষের মাঝেও আছে আসলে এক পরাক্রমশীল শক্তি। *Beyond Good and Evil*-এ তিনি বলেছেন, "In man is the creature and the creator united: in man is substance, scrap, abundance, mud, filth, nonsense, chaos; but in man also is creator, sculptor, hardness of hammer, witness-godhead and the seventh day

---

[18] Solomon, 1972, P. 130

[19] Frost, R., *The Poetry of Rober Forst,* Lathem, E.C (editor) Canada, Holt, Rinehart and Winston, 1965, P. 105

— do you understand this antithesis?... The creature in man must be formed, broken, forged, ripped, burnt, made read-hot, refined."[20]

যে মানুষ নিজের অন্তঃস্থিত শক্তিতে সাড়া দেবার জন্য আকুল হতে পারবে, সর্বতোভাবে যার মধ্যে সৌন্দর্যবোধের পরিপূর্ণ বিকাশ হবে — নীট্‌শে তাকেই বলেছেন 'superman' (Übermensch) বা অতিমানব। এই অতিমানবের চেতনায় কোন দ্বৈত নৈতিক বোধের দ্বন্দ্ব থাকবে না। যে অতিমানব সম্ভাবনারূপে মানুষের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে তা নিজেকে মেলে ধরবে কোনরকম নৈতিক মূল্যবোধের অপেক্ষা না করেই।

তবে এ প্রসঙ্গে একটি বিষয় অবশ্য উল্লেখ্য যে, নীট্‌শে যেভাবে দুর্বল ও শক্তিমানের মধ্যে তুলনা করেছেন তা সর্বাংশে সমর্থনযোগ্য নয়। কারণ যদি কোন ব্যক্তি কোন মূল্যবোধকে স্বীকার করে পথ চলতে শুরু করে তার অর্থ এটা করা উচিত নয় যে সে দুর্বল বলেই নৈতিক মূল্যবোধ মেনে নিতে বাধ্য। প্রতিটি মানুষই তার যাত্রা শুরু করে কিছু না কিছুকে স্বীকার করে নিয়েই। যে শক্তিমান তারও কোন একটা কিছুর প্রতি গভীর প্রত্যয় বা বিশ্বাস কাজ করে অর্থাৎ সেও কোনকিছুকে স্বীকার করে নিয়েই এগিয়ে যায়। সেও কোন বিশ্বাস বা আদর্শের প্রতি সমর্পিত। সুতরাং জীবনের লক্ষ্য কখনো ক্ষমতার জয়গান হওয়া উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে ভেবে দেখার বিষয় হল কোন্ মানুষ কোন্ জায়গা থেকে তার যাত্রা শুরু করেছে এবং শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে সে পৌঁছতে পারছে? অবশ্য সব সময়ই কোথাও যে অবতীর্ণ হতেই হবে এমন কথাই বা কোথায় বলা আছে? কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কাছে যেমন শুনিঃ " কখনো কি তোমাদের এমন কথা বলেছি যে আমি পৌঁছে গেছি?/ তাহলে তোমরা ধরেই নিতে পারো যে আমার বিশ্বাস ভেজাল ছিল...।"[21]

নীট্‌শের Superman বা অতিমানবের প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের Superman বা অতিমানবের ধারণা একত্রে বেশ কিছু সঙ্গত প্রশ্ন আলোচনার অপেক্ষায় থাকে। সাধারনভাবে নীট্‌শেকে যে ভাবে বোঝা হয়ে থাকে এবং বিচার করা হয় তাতে মনে হয় শুধু বিচারগত ত্রুটি নয় এক ধরনের অসম্পূর্ণ বোঝাপড়ার আশঙ্কাও সেখানে কাজ করে। নীট্‌শে এবং শ্রীঅরবিন্দ — উভয়ই মানব জীবনের বর্তমান অবস্থা থেকে উত্তরণের কথা ভেবেছিলেন এবং এমন এক ভবিষ্যৎ মানবের স্বপ্ন দেখেছিলেন যার চেতনা হবে হতাশা, দ্বন্দ্ব, ব্যর্থতা, গ্লানি, শুভ-অশুভ বোধের দ্বৈততা, ভীরুতা, কাপুরুষতার আবর্ত থেকে মুক্ত এক চেতনা। এইখানেই এসে অনেকে দাবি করেন যে

[20] Nietzsche, F., *Beyond Good and Evil,* Kaufmann (trans), New York, Vintnge, 1967, P. 225

[21] চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, *শ্রেষ্ঠ কবিতা,* কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১০, পৃ. ১৬৯

শ্রীঅরবিন্দের অতিমানবের ধারনায় এমন এক উচ্চতর চেতনার স্তরে আরোহনকে বোঝানো হয়েছে যে তা কোন অবস্থাতেই নীট্‌শের ধারনার সাথে মেলে না। নীট্‌শে তাঁর অতিমানবের চেতনায় যেন এক ধরনের বৃহদাকার শক্তির কল্পনাই শুধু করেছেন। এই প্রবন্ধের বিষয় নীট্‌শের সাথে শ্রীঅরবিন্দের অতিমানবের ধারণার মিল বা অমিল প্রত্যক্ষণ নয়। কিন্তু নীট্‌শেকে যেভাবে প্রচলিত ধারায় ফেলে বোঝার চেষ্টা করা হয় — সেখানে কয়েকটি কথা ভেবে দেখার প্রয়োজন।

নীট্‌শে আরো বেশি ভুলভাবে ব্যাখ্যাত হয়ে থাকেন তাঁর কারণ *Thus Spoke Zarathustra*-এ তিনি নিজেই বলেছেন, — "Only now is the mountain of man's future in labor. God died; now we want the overman to live... I have the overman at heart, that is my first and only concern — and not man; not the neighbour, not the poorest, not the most ailing, not the best."[22] — একথা উচ্চারণের মধ্যে দিয়ে নীট্‌শে যে সমালোচিত হবেনই তা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। এমন এক অহংকারী দৃপ্ত ঘোষনা যেন নিছক স্বার্থ তাড়িত কোন ভাবনাকেই বহন করে আনে। কিন্তু সমস্যা হল, কোন একজন মানুষ দূরের লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য পথ চলতে শুরু করেন, তাঁকে অনেক প্রান্তর, অলিগলি পার হয়ে তবে সেই লক্ষ্যের সন্ধান পেতে হয়। সুতরাং নীট্‌শে 'ঈশ্বর' নামক কোন সর্বময় কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হয়েছেন বলে তাঁর মধ্যে অস্তিত্বের অন্য ঃকোন সত্য ধরা পড়েনি — এমনটা মনে করে নেওয়ারও কোন কারণ নেই। কারণ আবার তিনি *Thus Spoke Zarathustra*-এ এও বলেছেন: "For today the little people lord it: they all preach surrender and resignation and prudence and industry and consideration and the long electra of the small virtues... Overcome these masters of today, o my brothers — these small virtues people, they are the overman's greatest danger."[23]

নীট্‌শে মূলতঃ যা বলতে চাইছেন তা ভিতর ও বাহিরে বিভক্ত যেন অনেকটা দ্বিখণ্ডিত। যে মানুষ অতিমানবের চেতনার অভিসারী তাকে বাধা দিয়ে যাচ্ছে সেইসব ভীরু, দুর্বল প্রকৃতির ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে থাকা মানুষেরা। এইসব মানুষেরা সমাজনির্দিষ্ট পথে অনেকের (crowd) সঙ্গে পথ চলায় অভ্যস্ত এবং এর অন্যথা হলেই এঁরা ভীষণ অসুবিধের মুখোমুখি হন।

তবে এক্ষেত্রে নীট্‌শেপন্থীরা এমন আপত্তি তুলতে পারেন যে নীট্‌শের অতিমানব একজন ব্যক্তি সত্তা (individual) এবং তার আমিত্বের বোধ যথেষ্টই প্রবল

---

[22] Nietzsche, 1954, P. 399

[23] Nietzsche, 1954, P. 499-500

কিন্তু তাঁর অর্থ এই নয় যে তিনি যে শক্তির অধিকারী হয়েছেন বা হবেন তা তিনি অন্যদের ওপর প্রভুত্ব করার কাজেই ব্যবহার করবেন। কারণ নীট্শেকে তাঁর অতিমানব এবং শক্তির ধারণা নিয়ে যথেষ্ট ভুল বোঝার অবকাশ থাকলেও একথা তিনি অত্যন্ত জোরের সঙ্গেই স্বীকার করেছেন যে প্রতিটি ব্যক্তির যাত্রা তাঁর একক, নিজস্ব যাত্রা। তাঁর অতিমানব কাউকেও শাসন বা দমন করতে চায়নি — তিনি আস্থাবান ছিলেন ব্যক্তির অন্তরস্থ সম্ভাবনার প্রতি, অন্য কোন বাইরের কিছু অবলম্বনের প্রতি নয় — যার ওপর ভর করে ব্যক্তি অন্য কোন উচ্চতর চেতনার অভিমুখে যাত্রা করবে। নীট্শের *Thus Spoke Zarathustra*-তে অন্তত সেই বার্তাই উঠে আসে: "... Do you suppose I have come to set right what you have set wrong? On that I have come to you that suffer to bid you more comfortably? ... No! No! Three times no! ... For it shall be ever worse and harder for you. Thus alone — thus alone, man grows to the height ... If you would go high, use your own legs. Do not let yourselves be carried up; do not seat on the backs and heads of others."[24] যদিও এই বইয়ের শেষে এসে জরথুষ্ট্রকে দেখা যায় যে তিনি 'higher men' যাঁরা অর্থাৎ সেই ঊর্ধ্ব চেতনার অধিবাসী তাদেরও নস্যাৎ করে দিচ্ছেন। কারণ তাঁরা ভবিষ্যতের যাত্রাপথে আর তাঁর সঙ্গী হতে পারছে না। তিনি বলছেন, "Pity for higher man!" তাঁর যাত্রা থেমে থাকার নয় — তিনি একাই চলেছেন এবং ভাবীকালের সেই অতিমানবের অপেক্ষায় অধীর হয়ে আছেন — "My children are near, my children." সেই অপেক্ষারত মানুষটি তাঁর যন্ত্রনায় আর্ত হয়ে পড়েন না — তিনি শুধু কাজ করে যেতে চান — নিজের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্যের কথা না ভেবেই — "My suffering and my pity for suffering — what does it matter? Am I concerned with happiness? I am concerned with my work."[25]

নীট্শে এবং শ্রীঅরবিন্দের অতিমানবের ধারণাকে যেভাবে বোঝা হয়ে থাকে এবং তাতে নীট্শের প্রতি সমালোচনার যে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত থাকে তা বোধহয় নীট্শেকে সম্পূর্ণভাবে ধারণ না করতে পারারই ফল। যদিও নীট্শীয় চেতনার বিবর্তনে এমন কিছু ভাব মাঝে মাঝে ধরা পড়েছে যা তাঁর সমালোচিত হওয়ার সম্ভাবনাকে আরো প্রশস্ত করে রেখেছে। তাঁর ঈশ্বর-এর অস্তিত্ব স্বীকার না করা কখনও কঠোর সমালোচনার বিষয় হলেও এটা দেখা উচিত সেই অস্বীকৃতির মধ্যে দিয়ে অস্তিত্বের কোন সত্যকার বার্তা তিনি আমাদের দিতে পারছেন কিনা।

---

[24] Nietzsche, 1954, P. 400-402

[25] Nietzsche, 1954, P. 428-429

প্রতিটি মানুষেরই নিজেকে পূর্ণ ভাবে বিকশিত করবার যে আর্তি — যদি নৈতিকতার বিষয়টিকে এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয় তাহলে নীট্‌শে নাস্তিক্যবাদী বা শূন্যবাদী — এই প্রশ্ন বড় তুচ্ছ হয়ে যায়। তাঁর সমগ্র সৃষ্টি জুড়ে রয়ে যায় প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের জীবনের মাঝে এক নিগূঢ় সত্যের অনুসন্ধানের জন্য এক চির অতন্দ্র ব্যাকুল দৃষ্টি যা ফুটে ওঠে তাঁরই লেখা একটি কবিতায়:

“I want to know you, unknown one,
Who seize me in the depth of my soul,
wandering like a storm through my life,
You, incomprehensible, kindred to me,
I want to know you, serve you even.”[26]

(8)

Thus Spoke Zarathustra -তে নীট্‌শে একটি অপূর্ব সত্য উচ্চারণ করেছিলেন, “what is great in man is that he is a bridge and not an end, what is lovable in man is that he is a transition and a fall.”[27]

এখানে যে বিষয়টি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক তা হল মানুষের ওঠাপড়া, ভাঙ্গাগড়ার খেলার মধ্যে দিয়ে চলেছে আসলে গড়ে ওঠার পালা। নৈতিকতার লক্ষ্য কখনও এটা হওয়া উচিত নয় যে তা কতগুলো সমাজ সৃষ্ট শাব্দিক মূল্যবোধ নির্মাণ করে মানুষকে সীমায়িত করে বোঝার চেষ্টা করবে। তাই বলা যায় যে, নৈতিক মূল্যবোধের স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি কোন লক্ষ্য নয়, বরং নৈতিক মূল্যবোধ আবিষ্কার আরও বৃহত্তর লক্ষ্য সাধনের উপায় রূপে কাজ করবে — এটাই কাঙ্খিত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন *সাধনা*-য় বলেছিলেন, “What does our moral nature mean? My answer is, that when a man begins to have extended vision of his true self, when he realise that he is much more than at present he seems to be, he begins to get conscious of his moral nature.”[28]

নীট্‌শের নৈতিকতা সম্বন্ধীয় আলোচনা থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার যে পুরোহিততন্ত্রের হাত ধরে যে পাপ-পূণ্য , স্বীকারোক্তি (confession) খ্রীষ্টীয় নৈতিকতায় জন্ম নিতে শুরু করল তাঁর বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর

---

[26] Sarkar, R., *Beyond Good and Evil,* (A Comparative Study of the Moral Philosophies of Nietzsche and Sri Aurobindo), Pondicherry, Sri Aurobindo International Centre of Education, 2002, P. 49

[27] Nietzsche, 1954, P. 42

[28] Tagore, R., *Sadhana,* India, The McMillan Co. of India Ltd., 1972, P. 27

জন্য এই সত্য কোনদিন অস্বীকার করা যাবে না যে খ্রীষ্টের নিজের জীবন, অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে যে নৈতিকতার বীজ প্রথিত হয়েছিল তাঁর মধ্যে কোন সত্য নির্যাস ছিল না। যে কোন ঐতিহ্যের গভীরে যে প্রাণ রয়েছে তাঁর কাছে মানুষকে ফিরে আসতে হয় কারণ তারও মর্মমূলে রয়েছে বহু মানুষের সত্য জিজ্ঞাসার নির্যাস। যে কারণে কিয়ের্কেগার্দকেও এক সময় খ্রীষ্টধর্মের প্রতি নতুন করে ফিরে আসতে দেখা যায়। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তা আজকের সময়ে প্রাসঙ্গিক নয় বলে তাঁর সারসত্যকে উপেক্ষা করতে হবে।

যে কোন ধর্ম যখন ব্যক্তির নিজস্ব উপলব্ধিতে সাহায্য না করে অর্থহীন, প্রানহীন শব্দে পরিনত হয়, তখন বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের প্রাবল্যে ঢাকা পড়ে যায় উপলব্ধ সত্যটি। অতএব, আমাদের কাছে প্রশ্নটা নীট্শে যেভাবে প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষনা করেছিলেন ঠিক তা নয়। সেটা অনেকটা সংক্ষিপ্ত পরিসরের সমস্যা। যে সমস্যাটা নীট্শে ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে গিয়ে অনুভব করেছিলেন, সেই একই সমস্যা আজ ধর্মকে ঘিরে বা ধর্মকে বাদ দিয়ে ব্যক্তি-জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই বর্তমান। অর্থাৎ সমস্যা হল প্রতিটি ক্ষেত্রেই কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নির্মিত ছাঁচ বা বিশ্বাস বা দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের কাছে চূড়ান্ত হয়ে স্বীকৃত হচ্ছে কি না এবং ব্যক্তির ওপর আরোপিত হচ্ছে কি না এবং প্রতিটি গোষ্ঠীর যে নিজস্ব মতাদর্শ, ধ্যানধারণা তাকে অতিক্রম করে ব্যক্তি-মানুষ নিজেদের মধ্যে পরস্পরকে বোঝার ও নিকটে আসার কোন সেতু তৈরি করতে পারছে কি না।

মানুষ কখনো কখনো যা নিয়ে শুরু করে তাঁর মধ্যে অসারতা সে খুঁজে পেতেই পারে। কিন্তু পথ চলতে চলতে তাঁর জীবনবোধই তাকে আবার নতুন পথের সন্ধান কিভাবে সে পেতে পারে তা শিখিয়ে দেয়। নীট্শের দর্শনের বীজমন্ত্রটিকে শ্রীঅরবিন্দ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেছিলেন, 'Man is something that shall be overcome.'[29] নীট্শে এই যে অতিক্রম করবার কথা বলেছিলেন তা একটি বড়ো সত্যের সন্ধান দেয়। কিন্তু যেখানে মানুষের প্রতি তাঁর এই আহ্বানে অসম্পূর্ণতা তা হল যে, মানুষ যখন তার নিজস্ব ব্যক্তিগত সীমা ও ক্ষুদ্রতাকে অতিক্রম করতে চায় তখন তার থেকে বৃহত্তর কোন আদর্শ বা গোষ্ঠীর সাথে সে যুক্ত হয়ে সার্থকতা খোঁজে। এভাবেই ব্যক্তির বিকাশ হয়, তার যাত্রা এগিয়ে চলে। কিন্তু ব্যক্তিকে সর্বদা সচেতন হতে হয় যেন সেই গোষ্ঠী বা আদর্শ লক্ষ্য হিসাবে না থেকে যেন উপায় রূপেই থাকে এবং সেই কারণেই তাকে ক্রমাগত প্রয়াসী হতে হয় বৃহত্তর এবং ভিন্নতর বিভিন্ন গোষ্ঠীর বা মতাদর্শের সঙ্গে মুখোমুখি হওয়ার এবং তাঁদের মধ্যে যে সত্য আছে তার সঙ্গে একাত্মতা স্থাপনের, যার ফলে সমগ্র মানব জাতির মধ্যে যে অসীম সম্ভাবনার

[29] Nietzsche, 1954, P. 12

দিকটি রয়েছে ব্যক্তি ক্রমশঃ তাকে নিজস্ব ধর্ম অনুযায়ী আপনার বিকাশের জন্য কাজে লাগাতে পারে এবং নিরন্তর এগিয়ে যেতে পারে। অতএব, নিজেকে অতিক্রম করবার বিষয়টির গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু অতিক্রমণের যে ধারাটি তা একটি নিরন্তর, প্রবাহমান ধারা হওয়া চাই — জীবনের মতই। সেটির গুরুত্ব আমাদের বর্তমান জগতে ও জীবনে অনস্বীকার্য।

আর একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন না করলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। নীট্‌শের মধ্যে খ্রীষ্টীয় ধর্মের যে সত্য সারাৎসার তার প্রতি গভীর অনুসন্ধান চোখে পড়ে না। তার বিদ্রোহ ছিল খ্রীষ্টীয় ধর্মের আনুষ্ঠানিকতার প্রতি। আসলে এক্ষেত্রে যেটা মনে রাখতে হবে তা হল ব্যক্তি বাধ্য নয় কোন আদিষ্ট বা নির্দিষ্ট একটি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের সারাৎসারের অনুসন্ধানের মধ্যে দিয়ে আপন বিকাশের পথ খুঁজে পাওয়ায়। সে তার আপন পথে স্বাধীন, স্বতন্ত্র সত্তায় নিজস্ব অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে পারে। কিন্তু ধর্ম যেখানে মানুষের অন্তরের গভীর সন্ধান ও সত্য নির্যাস থেকে উত্থিত — যেমন ভারতবর্ষের মধ্যযুগের মরমীয়া সাধকদের মধ্যে দেখা যায় — কবীর, দাদু, রজ্জব, রামানন্দ প্রমুখ, সেখানে ব্যক্তির সামনে বিকল্প পথ খোলা থাকে। সে পথ হল, কোন এক ব্যক্তির ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সারাৎসারকে তার প্রচলিত ভাষার বন্ধন থেকে মুক্ত করে নিয়ে আপন জীবনের নিজস্ব গতি ও ছন্দের মধ্যে দিয়ে তাকে পুনরাবিষ্কার ও সম্প্রসারিত করা। তাই প্রশ্নটা নিছক ধর্মীয় ব্যবস্থা বা বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে না। অথবা ধর্মকে কেন্দ্র করে কোন আধিবিদ্যক ভিত্তি তৈরি করতে চাওয়াতেও কোন সার্থকতা নেই। চুড়ান্ত সত্য বলে আদৌ কিছু আছে কি না তা তো ব্যক্তি মানুষের অভিজ্ঞতা নির্ভর। মূলের সত্যটি হল যে কোন ব্যক্তি যে কোন স্থবির হয়ে যাওয়া ধারণাকে প্রশ্ন করে আদৌ কোথাও পৌঁছতে পারছে কি? এই প্রশ্নের উত্তর একান্তভাবে ব্যক্তিকেই খুঁজতে হবে — আর তার জন্য যদি তাকে পূর্ব-স্থাপিত কোন বিশ্বাস, মত, চিন্তাকে নস্যাৎ করতে হয় তো সে তাঁর নিজস্ব ঐকান্তিক পথ ধরে করতেই পারে। তাই শ্রীঅরবিন্দ ব্যক্তির এই আপন সত্য আবিষ্কারকে অপরিসীম মূল্য দিয়ে নির্দ্বিধায় ঘোষণা করেছিলেন, "one has sometimes to deny God in order to find him;..."[30]

---

[30] Sri Aurobindo, *The Human Cycle,* Pondicherry, Sri Aurobindo Ashram, 1978, P. 215

হরিশংকর জলদাসের জলপুত্রদের কথা

সারমিন রহমান
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ডায়মণ্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ : বাংলা সাহিত্যে নদীকেন্দ্রিক উপন্যাসের আলোচনার আধিক্য লক্ষণীয়। তবে এ আলোচনার ধারায় 'তিতাস' কিংবা 'পদ্মানদীর মাঝি' যতোখানি আলোচিত হয়ে থাকে, তুলনায় অন্যান্য নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস প্রসঙ্গত এলেও তার বিস্তারিত পর্যালোচনা প্রায়শই সংখ্যার হিসেবে বেশ কম। সে হিসেবেই অপেক্ষাকৃত অনালোচিত একটি উপন্যাস হরিশংকর জলদাসের 'জলপুত্র' উপন্যাসটির পর্যালোচনা করা গেল। বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী একটা ভূগোলের জেলেজীবনের যাপন এবং ভাবনা বদলের ইঙ্গিতের কথা বলতে চেয়েছি এ প্রবন্ধে।

সূচক শব্দ: 'জলপুত্র', 'সমুদ্র', 'বিপর্যয়'।

এক.

'নদীর ধারে বাস/ভাবনা বারো মাস'-- এ প্রবাদের সঙ্গে বর্তমান আলোচনার বিষয়টি ওতপ্রোত। আলোচনার মুখ্য স্থানে রয়েছে হরিশংকর জলদাস রচিত উপন্যাস- 'জলপুত্র'। এ আলোচনার এক বিশেষ অভিমুখ দাবি করা হয়েছে-- প্রাকৃতিক বিপর্যয় এ উপন্যাসের যাপিত জীবনে কী প্রভাব ফেলেছে? একথা বললে বোধহয় খুব বেশি অত্যুক্তি হবে না, নদী বা সমুদ্র, এককথায় এই অনন্ত-অগাধ জলরাশি প্রায়শই সাহিত্যের একটা বিশেষ স্থান দখল করে আছে। বাংলা সাহিত্যের পাঠের তালিকায় এমন নদীকেন্দ্রিক বাংলা উপন্যাসের তালিকাও হ্রস্ব নয়। তবে নদী পেরিয়ে সমুদ্রে যেতে বাঙালি পাঠককে প্রায়শই পাড়ি দিতে হয়েছে অন্য ভূগোলে। আর্নেস্ট হেমিংওয়ের 'দ্য ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সী'-কে অবলম্বন করে। বাঙালি পাঠক সান্তিয়াগোর সঙ্গে নৌকা ভাসিয়েছে অগাধ সমুদ্রে। অভিজ্ঞ সান্তিয়াগোর বৃহত্তর মৎস্য শিকারের কাহিনি। 'সমুদ্র' শব্দটা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে মিশ্র অনুভূতির উদ্ভব হয়-- বৃহৎ, বিরাট, বিপুল, ভয়ঙ্কর, সুন্দর। খুব অপ্রাসঙ্গিক হলেও এ বক্তব্যটা না বললেই নয় যে, বাংলা সাহিত্যে সমুদ্রের এহেন সত্তাকে বাঙালি পাঠকের মজ্জাগত করবার প্রথম কৃতিত্বটা বোধহয় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীরই প্রাপ্য। সমুদ্রের ক্ষুধা, সমুদ্রের ইচ্ছা-অনিচ্ছা সমেত আপাদমস্তক ক্রীড়নকের ভূমিকায় সে উপস্থাপিত হয়েছে।

বলছিলাম সান্তিয়াগোর কথা। তার মাছ শিকার পর্বে তেমন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বর্ণনা না থাকলেও, সমুদ্রের স্বভাবগত পর্যায়েই মানুষের যা-কিছু অসহায়তা তাতেই পাঠক বিস্মিত না হয়ে পারে না। উপরন্তু সমুদ্রের বিপর্যয় তো কল্পনাতীত। তবুও সান্তিয়াগোর মাছ শিকারের সেই গল্প আসলে মানুষ বনাম প্রকৃতির দ্বন্দ্ব। শারীরিক,

মানসিক, প্রাকৃতিক এই যাবতীয় প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াইয়ে মানুষের অদম্য জেদের, অদম্য ইচ্ছার বেঁচে থাকার গল্প।

দুই.

বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে বৃহৎ প্রেক্ষাপটে সমুদ্র এসেছে হরিশংকর জলদাসের জলপুত্র উপন্যাসটিতে। তাছাড়া বাংলা সাহিত্যে নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস অজস্র লেখা হলেও মূলত কৈবর্তদের জীবনকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে এমন উপন্যাসও ভিন্ন মাত্রায় উপস্থাপিত হয়েছে। তার তালিকা এ আলোচনা প্রসঙ্গে সরিয়ে রাখা হল, কেননা তা সহজলভ্য। আলোচ্য লেখক হরিশংকর জলদাস নিজেই ২০০৭ সালে 'নদীভিত্তিক বাংলা উপন্যাস ও কৈবর্তজনজীবন' বিষয়ে গবেষণা করেছেন। বলা বাহুল্য, এ গবেষণায় কৈবর্ত জনজীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা তথ্যনিষ্ঠভাবে তুলে ধরেছেন। কাজেই বর্তমান প্রবন্ধে কৈবর্ত জীবন নির্ভর উপন্যাসের তালিকার পুনরাবৃত্তি করা হলো না।

প্রসঙ্গত একথাটা স্মরণযোগ্য যে, কল্লোলের (১৯২৩-১৯৩০) কাল বাংলা কথাসাহিত্যের বিষয়ে এবং ভাবনায় বৈচিত্র্য এবং আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। বাংলা কথাসাহিত্যের চরিত্র হয়ে উঠছিলো অন্ত্যজেরা। সেদিন সুদূর রুশ বিপ্লবের ধাক্কা এসে লেগেছিলো বাংলা সাহিত্যিকদের ভাবনায়। সর্বহারা, অন্ত্যজেরাও তথাকথিত অনভিজাত মানুষেরা সেদিন বাংলা সাহিত্যের মূল চরিত্র হবার ছাড়পত্র পেয়েছিল। এই ধারা বেয়েই তথ্যগতসূত্রে জানা যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬) উপন্যাসে প্রথম জেলে জীবনের কথা প্রকাশ করলেন। একথা বোধ করি খুব অনস্বীকার্য হবে না যে, যতদিন পর্যন্ত না অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস' (১৯৫৬) প্রকাশিত হলো, ততদিন মানিকের পদ্মানদী-কে পাঠক সাদরে জেলে জীবনের অন্যতম অভিজ্ঞান হিসেবে গ্রহণ করে এসেছেন। অদ্বৈত নিজেও স্বীকারোক্তি দিলেন যে তিনি 'জাউলার পোলা' আর মানিক-কে বললেন 'বাউনের পোলা' এবং 'জাত রোমান্টিক'। আমাদের দেখবার দৃষ্টিভঙ্গি একটু হলেও পরিবর্তন হল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একটা বিশেষ সময়ের পরিবর্তন এবং মতাদর্শ থেকে জেলে জীবনের রূপকার হতে চাইলেন। আরম্ভটা আরম্ভও হল সেভাবে। কুবের নামক মাঝির তথা জেলের জীবনের কষ্ট। মহাজনদের আধিপত্য। নিরন্তর দারিদ্র্য। অশিক্ষা তো রয়েইছে। 'অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান' নিয়েই যেখানে ভাবনার অন্ত নেই, সেখানে শিক্ষা তো দূর অস্ত। একাধারে মহাজনী প্রথা, প্রাকৃতিক বিপর্যয় সব মিলে জীবন বিপর্যস্ত। এমন সময়েই হোসেন মিঞার 'ময়নাদ্বীপ' যেন এক ইউটোপিয়া। লেখকের কলমে তখন নাগরিক ভাবনার প্রকাশ। উপরন্তু ফোকাস সরে গিয়ে পড়ল কুবের-মালা-কপিলা নামক তথাকথিত টানাপড়েনে। জেলে জীবনের বাস্তবিক উত্তরণের বা বাস্তবোচিত পরিবর্তনের কোনো ইঙ্গিত পাওয়া গেল না। হোসেন মিঞার 'ময়নাদ্বীপ' পাঠকের কাছে এক অচেনা দ্বীপের রোম্যান্টিক ভাবালুতা নিয়ে অবস্থান করল।

তিন.

বাংলা উপন্যাসের আঙিনায় 'তিতাস' সর্বাধিক বৃহত্তর পরিসরে 'মালো' জীবনের রূপরেখা নির্মাণ করলেন। সে নির্মাণে কোথাও চড়া রঙের ব্যবহার নেই। মৎস্যজীবীদের নিত্য যাপনের প্রকাশ। কাজেই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সে জেলে জীবন ধ্বস্ত হয়েছে বারংবার। তিতাস কখনো উদার, কখনো বা অনুদার। কিন্তু প্রাকৃতিক অনুদারতার অল্টারনেটিভ কোনো 'ময়নাদ্বীপ' এর অস্তিত্ব অদ্বৈত দিচ্ছেন না। হ্যাঁ, বরং তার সঙ্গে যুঝতে দেখা যাচ্ছে। দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়তে দেখা যাচ্ছে। নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা যাপনের যে একটা ভিন্ন সংস্কৃতি রয়েছে, সেই সংস্কৃতির শেকড়কে তুলে ধরা হচ্ছে। আবার মূল সংস্কৃতির ভাঙনের মুখেও বদলে যাওয়া জেলে সমাজের গড়নটাকে বাস্তবসম্মতভাবেই দেখানো হয়েছে। প্রাচীন-নবীনে দ্বন্দ্ব চিরন্তন। এক্ষেত্রেও শহুরে সংস্কৃতির আগ্রাসনে মালো সংস্কৃতির অধঃপাত বা বিবর্তন যেভাবেই দেখি না কেন, সেক্ষেত্রে পুরাতন-নতুনের সংঘর্ষ বেঁধেছে বরাবর। জেলে তথা মালো সমাজের বাস্তবিক রূপকার হয়ে উঠেছেন অদ্বৈত। অদ্বৈতর ক্ষেত্রে একটা বড়ো সমর্থনের জায়গা রয়েছে যে তিনি ব্যক্তি জীবনে মালো এবং তার হয়ে ওঠা সেই বাস্তবিক পরিবেশে। তবুও তার প্রকাশে তাঁর তথ্যনিষ্ঠা লক্ষ করবার বিষয়।

উনিশ শতক লোকসাহিত্যের গুরুত্ব অনুধাবন করে ফেলেছিল। প্রথমে বিদেশীদের হাত ধরে রবীন্দ্রনাথের পথ বেয়ে তার ধারা বহু বিস্তৃত হয়েছিল। কল্লোল' এর মূল সূরে রবীন্দ্র-বিরোধিতা এবং বাস্তবতার তুমুল প্রকাশের ইস্তাহার থাকলেও, তাতে সংস্কৃতির শেকড় অনুসন্ধান অপেক্ষা মতাদর্শের প্রাধান্য ছিলো অনেক বেশি। সেই ধারা বেয়ে এমন সর্বহারাদের কথা বলতে উদ্যত হয়েছিলেন মানিক তার 'পদ্মানদীর মাঝি'তে। কাজেই এক্ষেত্রেই এই দুই উপন্যাসের অভিমুখের ভিন্নতার একটা কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। কাজেই মানিক বামুনের পোলা হওয়াটা যতটা না যুক্তিসঙ্গত, উপন্যাস রচনা করবার সার্বিক প্রেক্ষিতটি অনেক বেশি অনুধাবনযোগ্য। নইলে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় অমন পরিপাটী করে লিখতে পারতেন না 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসটি।

বলার কথা নদীভিত্তিক জীবনে প্রকৃতির বিপর্যয় এবং তার অভিক্ষেপ একইসঙ্গে ভয়াবহ এবং করুণ। 'তিতাস' এর বহু পরে এমন একজন জেলেপুত্রের হাতে বাঙালি পাঠক আবার কৈবর্তজীবনকে দেখল। যে জীবনের যাপন সমুদ্রকে কেন্দ্র করে। কাজেই এক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মাত্রা যে আরও বেশি হবে সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

চার.

'জলপুত্র' উপন্যাসটির প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৩। বাংলাদেশের 'যুগান্তর' পত্রিকার ইদ সংখ্যার জন্য ২০০৭ সালে এ উপন্যাসটি শ্রেষ্ঠ হিসেবে বিবেচিত হয়। উপন্যাসটির

আরম্ভই হয় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দরুণ বিপর্যস্ত এক জেলে নারীর একলা সংগ্রাম দিয়ে। উনিশ বছরের ভুবনেশ্বরীর স্বামী সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায়। সামুদ্রিক ঝঞ্ঝাকে উপেক্ষা করে চন্দ্রমণির আর ঘরে ফেরা হয় না। পুত্র গঙ্গাপদকে নিয়ে একলা ভুবনেশ্বরীর দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকার কাহিনি এগোতে থাকে এ উপন্যাসে। উপন্যাসের তথাকথিত কেন্দ্রীয় চরিত্রকে খুঁজতে চেয়ে পাঠক এ উপন্যাসে ভুবনেশ্বরী বা গঙ্গাপদকে সে মর্যাদা দিতেই পারেন। তবুও ভুবনেশ্বরীকে কেন্দ্র করে এ আখ্যানের পথ চলা শুরু হলেও এ অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ইঙ্গিত আসলে সমস্ত জেলে নারীর জীবনের বিপর্যয়ের কথাই বলে-- "এই জেলেপল্লীর অনেক নারী বিধবা। তাদের স্বামীরা সমুদ্রে মরেছে। কেউ ঝড়ের কবলে পড়ে, কেউ জালের সঙ্গে আটকে অতল পানির নীচে গিয়ে। সাপের কামড়ে কারও কারও জীবনলীলা সাঙ্গ হয়েছে।" (জলপুত্র, পৃ.১৭) এ উপন্যাসের চরিত্র আসলে জেলে জীবন। জল নির্ভর যাপনের কথা এখানে ব্যক্ত। একটা বিশেষ ভূগোলের জেলেপাড়ার পরিচয় এ উপন্যাসে উঠে আসে। মূলত উত্তর পতেঙ্গা, পার্শ্ববর্তী হালিশহর, কাট্টলি, খেজুরতলি, ভাটিয়ারি, কুমিরা, সীতাকুণ্ড, মীরসরাই ইত্যাদি অঞ্চলের প্রসঙ্গ আসে। জল, জাল আর নৌকাকে নির্ভর করে যাপিত এই 'জালিক কৈবর্ত'দের জীবন সংগ্রামের চিত্র উঠে এসেছে। একটা বিশেষ ভূগোলের যাপনের যে কিছু স্বতন্ত্রতা থেকে থাকে তারই বাস্তবনিষ্ঠ প্রকাশ করেছেন ঔপন্যাসিক।

জলের ধারে বাস। সে সূত্রে জেলে সম্প্রদায়ের সর্প সংস্কারের দরুন শ্রাবণ মাসে মনসাপুজো, মনসাপুথি পাঠ এর কথা আসে। এও আসলে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সঙ্গে মোকাবিলার জন্য তাদের লোকবিশ্বাস। কথকের বর্ণনা-- "মনসা তাদের অন্যতম প্রধান দেবী। সর্পের দেবী মনসাকে তাদের বড়ো ভয়। তাঁর জন্যে তাদের বড়ো সম্ভ্রম। সর্প জলজ হিংস্র প্রাণী। জেলেরা জলচর। সর্পের দংশনে অনেক জেলের মৃত্যু ঘটে। তারা বিশ্বাস করে-- মনসাকে সন্তুষ্ট রাখতে পারলে সর্পের কোপানল থেকে তারা রেহাই পাবে।" (জলপুত্র, পৃ.৮-৯) তবে বিপর্যয়ের পাশাপাশি স্বস্তিও আছে-- "শ্রাবণমাস জেলেদের জীবনে বড়ো সুখের মাস, স্বস্তির মাস। এইমাসে মা-গঙ্গা তাদেরকে উজাড় করে মাছ দেয়। . . . দুর্দিনের দারিদ্র্যের যন্ত্রণা তারা শ্রাবণমাসে ভোলে। আষাঢ়-শ্রাবণ-ভাদ্র-আশ্বিন-- এই চারমাস তাদের হাঁড়িতে ভাত থাকে, পরনে নতুন কাপড় থাকে, মুখে হাসি থাকে।" (জলপুত্র, পৃ.৮)

এ উপন্যাস একটি বিশেষ ভূগোলের সীমায় আবদ্ধ। বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী উত্তর পতেঙ্গা এবং পাশাপাশি বন্দর, বুরুচমারা, করল, কোলা-কে অল্প-স্বল্প ছুঁয়ে। মানুষের যাপনে ভূগোলের যে প্রভাব রয়েছে সেকথা অবশ্য জ্ঞাত। আর একটা বিশেষ ভূগোলের যাপনে পূর্বতন তথা পরম্পরার প্রভাবও যে থাকে সেও অনস্বীকার্য। বংশ পরম্পরায় জেলে সম্প্রদায় মাছ শিকারের মাধ্যমে যাপন করে এসেছে। সে যাপনের মূল অন্তরায় যেমন প্রকৃতি, আবার জীবনের সমৃদ্ধির কারণও সেই প্রকৃতি। প্রকৃতির

সঙ্গে তার নিত্য আদান-প্রদানের সম্পর্ক। কাজেই প্রকৃতিকে তুষ্ট রাখতে, তার বিপুল অলক্ষ্য সত্তাকে বিশ্বাস করে গড়ে উঠেছে নানান আচার-সংস্কার। এককথায়, জেলেপাড়ার বারোমাস্যা যেন বর্ণিত হয়েছে। কাজেই আষাঢ়-শ্রাবণ-ভাদ্র-আশ্বিন যেমন সুখ এনেছে, তেমনি অন্য সময় এসেছে তাদের সংগ্রামের চিত্র-- "ফাগুন-চৈত্র-বৈশাখ মাস জেলেদের কাছে বড়ো আকাল। সমুদ্রে মাছ নেই। দখিনা ঝোড়ো বাতাসে সমুদ্র মারমুখী। অধিকাংশ বহদ্দার এসময় মাছমারা বন্ধ করে দেয়।" (পৃ.৩৩) এর অনিবার্য ফলশ্রুতি নিত্য অভাব এবং ক্ষুধা।

পাঁচ.

দারিদ্র্য যে সমাজের মূল ভিত্তি, সেখানে ইচ্ছা থাকলেও উপায় থাকে না। কাজেই অশিক্ষা এ সমাজের আর একটি অঙ্গ। অক্ষরজ্ঞানহীন হবার কারণে মহাজনেরা সহজেই এদের শোষণ করতে পারে। অভাবে স্বভাব নষ্ট হবার প্রবণতা দেখা যায়-- "মুসলিমপাড়ার আবদুল মজিদ কারণে-অকারণে সকালে-রাতে যাতায়াত করে গুড়াবির বাড়িতে। গভীর রাতের দিকেই তাকে দেখা যায় বেশি। মজিদের সঙ্গে গুড়াবির সম্পর্কের ব্যাপারটি দু'মুঠো অন্নের জন্য।" (জলপুত্র, পৃ.২২) এ উপন্যাসে জেলে সমাজের আর্থ-সামাজিক কাঠামোটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে-- মহাজন, বহদ্দার এবং গাউর। মহাজন, যাদের আর্থিক সামর্থ্য সর্বাধিক-- এরা চড়া সুদে জেলেদের ধার দেয় এবং মিথ্যে হিসেবের বিনিময়ে জেলেদের শ্রম কিনে নেয়। বহদ্দারেরাও জেলে, তবে অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন, এরা জাল এবং নৌকার মালিক, আর গাউর হলো মাছ ধরায় সাহায্যকারী। এ বক্তব্য উত্থাপনের কারণ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক বিপর্যয়ের মুখোমুখিও হতে হয় এঁদের। আরও লক্ষ করা যায়, পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থাৎ সালিশি সভার মাধ্যমে এ সমাজের ন্যায়-অন্যায় বিচার এবং তার শাস্তি প্রদান করা হয়। জেলে সমাজের নারী-পুরুষেরা পরিচিত হয় তার সন্তানের নামের পরিচয়ে-- হরবাইশ্যার মা, মালতীর মা, বংশীর মা ইত্যাদি। কথকের বর্ণনায়-- "ছেলে-মেয়ে বড় হলে জেলেপল্লিতে মানুষের আসল নাম ঘুচে যায়। তখন তারা পরিচিত হয় অমুকের মা, তমুকের বাপ হিসেবে।" (জলপুত্র, পৃ.৩৪)

এ উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের কৃতিত্ব এখানেই যে, জেলে সমাজের যে চিরাচরিত গঠন তার আদল বদলানোর প্রচেষ্টা দিয়ে। উনিশ বছরের স্বামীহারা ভুবনেশ্বরী জেলে সমাজের কাছে গঙ্গার মা বলে পরিচিত হলেও, পাঠকের কাছে সে ভুবনেশ্বরী হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত থেকেছে। লক্ষণীয়, 'তিতাস'এ অনন্তর মা এর পরিচয় অনন্তর মা হিসেবেই। এ এক বদল আনবার ইঙ্গিত। তাই তো ভুবন স্বপ্ন দেখে গঙ্গা পড়াশোনা করবে। তুমুল দারিদ্র্যের সঙ্গে যুঝে গঙ্গাকে স্কুলে পাঠায় সে। সেখানেও সমাজের এক চিত্র উঠে আসে-- "আজ রোববার। গঙ্গাপদ স্কুলে যায় নি। স্কুলে যেতে ইদানীং তার আর ভালো লাগে না। ... হিন্দুছাত্ররা গঙ্গার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে না। জেলে বলে দূরে সরিয়ে

দেয়। এক সঙ্গে বেঞ্চে বসলেও মাঝখানে অনেক দূরত্ব রাখে।" (জলপুত্র, পৃ.৩৫)

ছয়.

সামাজিক প্রয়োজনে জীবিকাগত প্রভেদের ভিত্তিতে কৃত বিভাজনের কুফল এখানে দেখা যায়। কথা হচ্ছিল জেলে সমাজে বদল আনবার ইঙ্গিত নিয়ে। কাজেই গঙ্গা দারিদ্র্যের কারণে, সামাজিক অসম্মানের কারণে পড়তে না পারলেও তার শিক্ষা পুথিগত না হয়ে, হয়ে ওঠে ব্যবহারিক। এছাড়া জেলে সমাজে শিক্ষার প্রয়াস করতে দেখি দীনদয়ালকে। গৌরাঙ্গ সাধুর মুখে শুনি-- "বিদ্যা অমূল্য ধন।" বিদ্যা যে অমূল্য ধন এবং একবার তার শেকড় প্রসারিত হলে সে ডালপালা মেলতেই থাকে তার প্রমাণ পাই, গঙ্গাপদর প্রতিবাদে। শুধু তাই নয়, গঙ্গার নেতৃত্বে সমস্ত জেলে সমাজ একত্রিত হয়ে প্রতিবাদ জানায় মহাজনদের দীর্ঘদিনের লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে। অসদুপায়ে সে প্রতিবাদের স্বরকে হত্যা করেছে ঘাতকেরা। সে অপকর্মের জন্য অন্ধকারকে করতে হয়েছে আশ্রয়। কিন্তু একটা হত্যা প্রতিবাদকে থামিয়ে দিতে পারে নি-- "গঙ্গার শিয়রের কাছে জল-কাদায় বসে আছে ভুবনেশ্বরী-- স্তব্ধ, নিথর, পাথরের মতো। দৃষ্টি তার উঠানে-জড়ো হওয়া অসংখ্য মানুষকে ছাড়িয়ে দূরে-বহুদূরে প্রসারিত। সে দৃষ্টিতে প্রতীক্ষার উজ্জ্বল আলো-- অনাগত জলপুত্র বনমালীর জন্য।" (জলপুত্র, পৃ.১৩৬)

এই তো বদল। এখানেই তো পরিবর্তন। না এ উপন্যাসকে কোনোভাবেই চিরাচরিত প্রথা মেনে একটা ট্র্যাজিক উপন্যাসের তক্‌মা দিতে সম্মত নই। বরং বহুকাল পরে একবিংশ শতকে দাঁড়িয়ে লেখা এ কৈবর্ত সমাজ নির্ভর উপন্যাসটি নতুন করে ভাবায়। 'পদ্মানদীর মাঝি' বা 'তিতাস' এর আবেগে বহুকাল আটকে ছিলো পাঠক। সেই আবেগ থেকে বেরিয়ে আসবার একটা পথ রাখলেন বলা চলে। 'তিতাস'-এ সংস্কৃতিকে আগলে রাখবার তাগিদ অনুভব করি। আর 'জলপুত্র' উপন্যাসে মৃত্যু দিয়ে জীবনকে বাঁচিয়ে রাখবার আখ্যান রচনা করেন লেখক। আরম্ভ হয়েছিল প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের অভিক্ষেপের কথা বলবো বলে। নদীর ধারে বাস করলে বারো মাসের ভাবনা যে ভাবতে হবে সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর এ তো সমুদ্রের আখ্যান। সামুদ্রিক ঝঞ্ঝা চন্দ্রমণিকে হারিয়ে দিয়েছিল। অদম্য জেদ আর ইচ্ছাশক্তি দিয়ে ফিরে এসেছিল সান্তিয়াগো। চন্দ্রমণি পারে নি। চন্দ্রমণির আগামী গঙ্গাপদও হারিয়ে গেল মনুষ্যকৃত নীচতায়। তবুও সেখানেও প্রকৃতির বিপর্যয়কে কাজে লাগিয়েই-- "আজ বাইরে ঝোড়ো-বাতাস। আকাশে পাগলা মেঘ। এই বুঝি বৃষ্টি নামবে। রাতের খাওয়া শেষ করে গঙ্গা টাউঙ্গাজাল বাইতে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিল। ... ঝোড়ো হাওয়ার বিপুল বিক্রমে সকালটা এলোমেলো। বাইরে বাউন্ডুলে সন্ত্রাসী বৃষ্টি ঝরে যাচ্ছে। ভুবনের বারান্দার নড়বড়ে দরজাটা সামান্য খোলা। সেই খোলা অংশ নিয়ে ভুবন বাইরে তাকিয়ে আছে। তার চোখে গভীর উৎকণ্ঠা। সকাল হয়ে গেছে, গঙ্গা ফিরেনি।" (জলপুত্র, পৃ.১৩৪)

গঙ্গা সত্যিই আর ফেরে নি। লেখক গঙ্গাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন না। কিন্তু

ভুবনের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের চোখে এঁকে দেন 'প্রতীক্ষার উজ্জ্বল আলো'। যে আলো আসলে প্রদীপের নিচের অন্ধকারকে স্পষ্ট করে তোলে, স্পষ্ট করে তুলবে বারবার।

গ্রন্থঋণ :

১. হরিশংকর জলদাস-- জলপুত্র
২. অদ্বৈত মল্লবর্মণ-- তিতাস একটি নদীর নাম
৩. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়- পদ্মানদীর মাঝি
৪. আর্নেস্ট হেমিংওয়ে-- দ্য ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সী
৫. হরিশংকর জলদাস-- নদীভিত্তিক বাংলা উপন্যাস ও কৈবর্তজনজীবন

গিরিশচন্দ্রের *জনা*

সৈকত মিস্ত্রী
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়

মহাকাব্যের অভ্যন্তরে কল্পনার যে অসংখ্য সম্ভাবনা ও সূত্র থাকে, আধুনিক নাটককার সেই সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়ে আর কল্পনার রঙ দিয়ে গড়ে তোলেন নতুন নাটক। গিরিশচন্দ্র ঘোষের *জনা* (গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪) নাটকটি সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য। যদিও উল্লেখ করা যায় যে, গিরিশচন্দ্র মাইকেল মধুসূদন দত্তের *বীরাঙ্গনা* (১৮৬২) পত্রকাব্যের একাদশ সর্গের পত্র *নীলধ্বজের প্রতি জনা* পাঠে উদ্বুদ্ধ হয়ে *জনা* নাটক রচনা করেন। আবার মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই পত্রকাব্য রচনার আদর্শটি গ্রহণ করেছিলেন রোমান কবি Publius Ovidius Naso (43 B.C. to 17 A.D.) রচিত *Heroides* কাব্য থেকে। এতে ছিল একুশটি পত্রকাব্য। সেই অনুসারে তিনি ভারতীয় পুরাণসমূহের বীর নারীচরিত্রদেরকে নিয়ে রচনা করেছিলেন এগারোটি পত্রকাব্য, কবিকৃত তালিকা অনুসারে *নীলধ্বজের প্রতি জনা* যেগুলির মধ্যে নবম। বাকি দশটি পত্রকাব্য নিয়ে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের ইচ্ছা থাকলেও মধুসূদনের সেই ইচ্ছা অপূর্ণ থেকে যায়।

ওভিডের (Publius Ovidius Naso) পত্রকাব্যের অনুসরণে পত্রকাব্য রচনা করতে গিয়ে নবম পত্র *নীলধ্বজের প্রতি জনা*-র কাহিনি অংশটি মাইকেল মধুসূদন দত্ত নিয়েছিলেন কাশীরাম দাসের *মহাভারত*-এর *অশ্বমেধ পর্ব্ব* থেকে। তবে তিনি সেই পর্বের কাহিনিকে হুবহু অনুসরণ যে করেননি তা বলাই বাহুল্য। তাঁর পত্রে জায়গা করে নিয়েছে শুধুমাত্র রাজা নীলধ্বজ রায়ের প্রতি রাজ্ঞী জনার ভর্ৎসনার অংশটুকু। সেই কাহিনির অগ্রপশ্চাৎ জানতে হলে পাঠককে যে "মহাভারতীয় অশ্বমেধপর্ব্ব" পাঠ করে নিতে হবে, তা মাইকেল নিজেই নির্দেশ করে গিয়েছেন। এবার আসা যাক গিরিশচন্দ্রের কথায়। তিনি কি মাইকেলকে হুবহু অনুসরণ করলেন নাটক রচনার ক্ষেত্রে ? পত্রকাব্য ও নাটক পাঠে সে কথা সম্পূর্ণত মনে হয় না। বরং গিরিশচন্দ্র সুচারুরূপে সমগ্র কাহিনিটির অগ্র-পশ্চাৎ অংশ সংযুক্ত করে রচনা করলেন একটি পঞ্চাঙ্ক নাটক। মহাকাব্যকে যদি সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তবে অশ্বমেধ পর্বের একটি ছোটো কাহিনি তার তুলনায় জলের বুদ্বুদ। গিরিশচন্দ্র সেই বুদ্বুদের ভিতরে এক পাঁচমহলা প্রাসাদ নির্মাণ তো করেছেনই; তার পরে আবার সেই বুদ্বুদকে সমুদ্রের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার সূত্রটিকেও বজায় রেখেছেন একইসঙ্গে। মধুসূদনের পত্রকাব্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে গিরিশচন্দ্রের জনা নাটক রচিত হলেও দুটির আকৃতিগত পার্থক্য লক্ষণীয়। এর কারণ হিসাবে বলা যায় মধুসূদন তাঁর পত্রটিকে অভিনয়যোগ্য হিসাবে রচনা করেননি।

অপরদিকে গিরিশচন্দ্রের অভিপ্রায় ছিল মঞ্চায়ন, তাই তিনি একটি সুগঠিত ও বিস্তৃত নাটক হিসাবে *জনা*-কে নির্মাণ করেছেন। মনে রাখা দরকার, গিরিশচন্দ্রের নাটক রচনার সময়কালে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ মধুসূদনের সময়কাল থেকে আরও সুস্পষ্ট আকার নিয়েছে। দেশকে মাতা হিসাবে দেখা এই জাতীয়তাবাদেরই অন্যতম পরিণতি। *জনা* নাটকে জনার ভূমিকা তাই হয়ে ওঠে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জনা নিজেই যেন হয়ে ওঠেন মাহিষ্মতী। আর তাকে রক্ষার কারণে প্রাণ দেন প্রবীর। এখানে জনা চরিত্রটির গুরুত্বটি সর্বাধিক, তা না হলে এই নাটকের নাম *প্রবীরবধ* হতেই পারত।

জনা নাটকের ঘটনাস্থল মাহিষ্মতী। মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বেও নামটি তাই। যদিও মাইকেল মধুসূদনের পত্রকাব্যে এই নামটিকে 'মাহেশ্বরী পুরী' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই মাহিষ্মতী মধ্যভারতের একটি প্রাচীন নগরী, যা ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থে এর উল্লেখ রয়েছে। মনে করা হয় এই নগরী বর্তমান মধ্যপ্রদেশে নর্মদা নদীর তীরে কোথাও অবস্থিত ছিল। আর পাণ্ডবদের রাজধানী ছিল হস্তিনাপুরে, যা বর্তমান উত্তরপ্রদেশের উত্তর পশ্চিমাংশে অবস্থিত। মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরে সিংহাসনে বসার পর বিমর্ষমনা যুধিষ্ঠির ব্যাসদেবের পরামর্শে অশ্বমেধ যজ্ঞ করা স্থির করলেন। যজ্ঞের নিয়মানুসারে একটি ঘোড়াকে ছাড়া হয়, যে ঘোড়াটিকে বাধাহীন ভাবে ছেড়ে দেওয়া হবে, তার পিছু পিছু যাবেন পাণ্ডব মহারথীগণ। যে রাজ্যের উপর দিয়ে ঘোড়া বিনা বাধায় চলে যাবে, সেই রাজ্যগুলি পাণ্ডবদের রাজ্যভুক্ত হবে, আর যদি কেউ ঘোড়াটিকে ধরার স্পর্ধা দেখায়, তাহলে যুদ্ধ করে সেই ঘোড়া উদ্ধার করবেন পাণ্ডবরা। এইভাবে সমস্ত রাজ্য প্রদক্ষিণ করার পর ঘোড়াটি ফিরে আসলে তাকে বধ করে যজ্ঞ সম্পন্ন হবে। সুতরাং বোঝাই যায় এই যজ্ঞে ঘোড়ার বাধাহীন ভাবে যাত্রার আড়ালে একটি সাম্রাজ্যবাদী ভাবনা লুক্কায়িত থাকে। নিজ শক্তি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল রাজন্যবর্গ অশ্বমেধের ঘোড়া ধরার 'ভুল' করতেন না। কিন্তু মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব অনুসারে জানা যায় মাহিষ্মতীতে পাণ্ডবদের যজ্ঞাশ্বটি ঢুকলে জলকেলিরত প্রবীর তাঁর প্রধানা বনিতা মদনমঞ্জরীর অনুরোধে যজ্ঞাশ্বটি ধরেন, আর এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে মাহিষ্মতীর সঙ্গে পাণ্ডবদের যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে। যদিও অশ্বের কপালে অশ্বের বিবরণ ও তাকে ধরে রাখলে যে যুদ্ধ বাধবে, তা লেখাই ছিল, বলা বাহুল্য তা পাঠের ফলে যুবরাজ প্রবীরের সংগ্রামস্পৃহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে পাঠকের মনে পড়বে *রামায়ণ-এ* সংগ্রাম শুরু হয়েছিল মারীচ নামক রাক্ষসের সোনার হরিণ রূপে বিচরণ ও তাকে পাওয়ার জন্য সীতার বাসনার কারণে। মদনমঞ্জরীও প্রায় একই ভুল করে বসলেন। আর একটি মহাকাব্যে যুদ্ধের গতিমুখ পরিবর্তন করে দিয়েছিল একটি ঘোড়া। হোমারের *ইলিয়াড*-এর শেষভাগে দেখা যায় ট্রয়যুদ্ধের শেষদিকে গ্রিক সৈন্যরা কৌশল অবলম্বন করে তাদের নৌবহর সরিয়ে নিয়ে গিয়ে দূরে পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছিল। আর সমুদ্রতীরে

রেখে গিয়েছিল একটি কাঠের বিরাট ঘোড়া, যা দেখে আনন্দিত হয়ে ট্রয়বাসীরা ভেবেছিল গ্রিকবাহিনী পরাজিত হয়ে চলে গিয়েছে, আর যাওয়ার আগে তাদেরকে উপহার দিয়ে গিয়েছে ঐ কাঠের বৃহৎ ঘোড়াটি। মহানন্দে তারা ঘোড়াটিকে টানতে টানতে ট্রয়নগরীর প্রাচীরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে রেখেছিল। আর গভীর রাতে যখন তারা যুদ্ধজয়ের আনন্দে মত্ত, তখন সেই বিশাল কাঠের ঘোড়ার পেট থেকে বেরিয়ে এসেছিল গ্রিক সৈন্য। তারা ট্রয় নগরীর ফটক খুলে দেয়, আর ইতিমধ্যে দূরে চলে যাওয়া জাহাজগুলিও ফিরে এসেছিল, তা থেকে গ্রিকসৈন্য বন্যার জলের মতো ট্রয় নগরীতে ঢুকে পড়ে তার পতন সূচিত করে। সুখী, সমৃদ্ধিশালী মাহিষ্মতী নগরের পতনের সঙ্গে উল্লিখিত ঘটনার অনেকখানি মিল পাওয়া যায়। কারণ এক্ষেত্রেও অশ্বমেধের ঘোড়াটিকে আটক করার পরেই যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে।

জনা নাটকের শুরুতেই অর্থাৎ প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কেই নাটকের ভবিতব্য বর্ণিত হয়েছে। সেখানেই নীলধ্বজ নর-রূপী নারায়ণকে দেখতে চেয়েছেন, জনা গঙ্গাজলে প্রাণত্যাগ করতে চেয়েছেন এবং যুবরাজ প্রবীর চেয়েছেন যোগ্য বীরের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাঁকে মারতে বা নিজে মরতে। *জনা*-র প্রবীরের মধ্যে যতখানি বীররসের আরোপ নাটককার করেছেন, কাশীরাম দাসে ততখানি পাওয়া যায় না। বরং সেখানে প্রবীরকে অনেক স্বেচ্ছাচারী এবং অপরিণামদর্শী বলে মনে হয়। যদিও অশ্বমেধ যজ্ঞের মধ্যে অন্য স্বাধীন রাজ্যের সার্বভৌমত্ব নষ্টের যে বার্তাটি রয়েছে, তার বিরুদ্ধে যে-কোনোস্বাধীনচেতা মানুষের পক্ষে রুখে দাঁড়ানো স্বাভাবিক। প্রবীর যৌবনধর্মের স্বাভাবিক প্রাবল্যে সেই কাজটিই করেছেন। তবে নাটককারের দ্বারা নাটকের প্রথমেই প্রবীরের বার্তায় তাঁর যুদ্ধস্পৃহা নেহাত বীরত্ব প্রকাশের জন্যই বলে মনে হয়েছে, তিনি যেনতেন প্রকারে যুদ্ধ করতে পেলেই যেন আনন্দিত হন। নীলধ্বজকন্যা স্বাহা পতিব্রতা বাঙালি রমণীর উপযুক্ত প্রার্থনাই করেছেন স্বামীর পদে মতি রাখতে চেয়ে।

এই নাটকে অংশত কাশীরাম দাস ও মাইকেল মধুসূদনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে গিরিশচন্দ্রও প্রচলিত বীরপূজায় নিয়োজিত না থেকে বরং সেই বীরদের বীরত্বের যাথার্থ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। বিপরীত দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্ন তুলে তিনি কৃষ্ণ ও অর্জুনের সাফল্যের পশ্চাতে বীরত্বের চেয়ে কূটকৌশলকেই তুলে ধরেছেন তাঁদের সাফল্যের রসায়ন হিসাবে। সেই কারণেই প্রবীর অশ্বমেধের ঘোড়া ধরবার পর তৎক্ষণাৎ তাকে সরাসরি যুদ্ধে আহ্বান না করে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নিয়ে কৈলাসে গমন করেন। ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে যুদ্ধের গতিপ্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ ও জয়ের আশায়। এই অংশে প্রবীরকে দেখানো হয়েছে শিবের কিঙ্কর হিসাবে, যাঁকে জাহ্নবীর বরে জনার পুত্র হিসাবে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছিল। শিবের ইচ্ছায় এবং কামদেব ও রতিদেবীর ষড়যন্ত্রে তাঁকে আবার মৃত্যুর মাধ্যমে স্বর্গে ফিরিয়ে আনা স্থির হয়। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন এত বীর হওয়া সত্ত্বেও মহাদেবের সঙ্গে রীতিমত আগাম ষড়যন্ত্র করে রাখতে হয় সম্মুখযুদ্ধের গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণের আশায়। নাটকের এই অংশে মাইকেল মধুসূদন দত্তের

মেঘনাদবধ কাব্য-এর প্রভাব দেখা যায়। মধুসূদন পৃথিবীতে মানুষের যুদ্ধে দেবতাদের ষড়যন্ত্র ও সরাসরি অংশগ্রহণের বিষয়টি তাঁর কাব্যে এনেছিলেন গ্রিক মহাকাব্য *ইলিয়াড*-এর অনুসরণে। এছাড়া নাটকের এই অংশে হরি ও হরকে অভেদ কল্পনা করার (১/৫) অংশটি অনুসারে বলা যায় নাটককার এই অংশে ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* দ্বারা প্রভাবিত, কারণ *অন্নদামঙ্গল*-এ দেখা যায় ব্যাসদেবের হরিবিদ্বেষ ও হরের প্রতি অতিরিক্ত ভক্তি থাকায় স্বয়ং হর তা দমন করে ব্যাসদেবকে শিক্ষা দিতে উদ্যোগী হন। দেবতারা যে একে অপরকে খাতির করে ক্ষমতা ভাগাভাগির অঙ্ক মেনে চলেন সেই সত্য এই নাটকে এসেছে বাংলার মঙ্গলকাব্য এবং পাশ্চাত্য মহাকাব্যের উত্তরসূরিতাকে বহন করে।

গিরিশচন্দ্র জনাকে এই নাটকের প্রধান চরিত্র করে গড়েছেন। জনার মধ্যে দেশপ্রেমের যে আগুন ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল, তাকে জাগিয়ে তোলার কাজটি করেছেন তাঁর পুত্র প্রবীর। আশঙ্কিত পিতা নীলধ্বজের ধৃত অশ্ব ফিরিয়ে দেওয়ার প্রস্তাবকে অস্বীকার করে পুত্রের বিদ্রোহী মনোভাবের প্রকাশ। এর পরে মাতা জনাকেও তিনি বোঝাতে সক্ষম হন এই অশ্ব ফিরিয়ে দেওয়ার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে ক্ষত্রিয়ত্বের অসম্মান—

> *"...বীরদম্ভে অশ্বভালে ক'রেছে লিখন*
> *রণে আবাহন করি,*
> *ত্যজি রণ ক্ষত্রিয়নন্দন*
> *পরাজয় মানি লব ?"* (১/৪)

এরপর জনা প্রবীরের কথায় সম্মত হয়ে রাজাকে যুদ্ধে সম্মত করার আশ্বাস দেন। নীলধ্বজের যুদ্ধ না করে যজ্ঞাশ্ব ফিরিয়ে দেওয়ার প্রস্তাবে জনা প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন। পাণ্ডবদের কীর্তিগাথায় তিনি বিরক্তি প্রকাশ করেন। কিন্তু একজন নারী হয়ে তাঁর এই প্রবল প্রতিপক্ষের বিরোধিতা করার ব্যাপারটি রাজপুরীর কেউই মেনে নিতে পারেন নি। তিনি যে একজন নারী এবং তাঁর যে যুদ্ধকামী সন্তানকে আত্মঘাতী যুদ্ধের পথ থেকে সরিয়ে আনা উচিত, একথা রাজা থেকে বিদূষক—প্রত্যেকের সংলাপেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে (১/৪)। কিন্তু এর বিপরীতে জনা হয়ে উঠেছেন বীরাঙ্গনা। তাঁর এই যাত্রা যুগধর্মের বিপরীতে গিয়ে তাঁকে একটি প্রতিবাদী সত্তারূপে চিহ্নিত করেছে। নাটককার এক্ষেত্রে অনেকাংশে মহাভারতকে অনুসরণ করলেও তাঁর উপরে প্রভাব ফেলেছে উনিশশতকের শিক্ষিত বাঙালি নারীর নিজস্ব সত্তার সন্ধান। যে প্রভাব মাইকেল মধুসূদন দত্তের কাব্য রচনার মধ্যেও অনেকখানি লক্ষ করা গিয়েছিল। জনা এই নাটকে ধীরে ধীরে চালিকাশক্তি হয়ে ওঠেন। একদিকে তিনি এবং তাঁর পুত্র, অন্যদিকে রাজ্যের রাজা, মন্ত্রী, সৈন্যবাহিনী। যদিও রাজ্যের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় শেষপর্যন্ত তাদেরকে নিমরাজী করতে সক্ষম হয়েছেন জনা। কিন্তু উৎসাহ ও বীরত্বহীন, যুদ্ধে প্রায় অনিচ্ছুক

সেনাদল নিয়ে যুদ্ধ করতে নামার পরিণতি হিসাবে শেষপর্যন্ত পরাজিত হতে হয় মাহিষ্মতীকে। কারণ পাণ্ডবকে বিপক্ষে দেখে মানসিকভাবে পরাভূত হয়ে বসেছিলেন মন্ত্রী সেনাপতি সবাই। এমনকি সেনানায়ক পালিয়ে পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিতে পর্যন্ত চেয়েছেন (২/৩)। সেই পরিস্থিতিতে জনার ধিক্কারবাণীতে বীরত্ব আশ্রয় করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় সেনাদল। এমনকি যুবরাজ প্রবীর, যিনি কিনা যুদ্ধে প্রবল উৎসাহী, তাঁকেও দেখা যায় সুষুপ্ত, আর সেই নিশায় তাঁরই প্রাণভিক্ষায় অর্জুনশিবিরে যান পত্নী মদনমঞ্জরী ও ভগিনী স্বাহা। প্রবীরের যুদ্ধাস্ত্র ও বর্মও সংগ্রহ করে আনেন তাঁরা (২/৪)। এ থেকে বেশ বোঝা যায় প্রবীর যতখানি যুদ্ধস্পৃহ, ততখানি কর্মঠ কিংবা কৌশলী তাঁকে বলা যায় না। তাঁর বীরত্বের মূল উপাদান মাতৃভক্তি, কিন্তু যুদ্ধে জিততে গেলে যতখানি কৌশল ও নিজস্বতা থাকা দরকার তা প্রবীরের মধ্যে ছিল না। বরং নীলধ্বজ যে প্রবীরকে ‘বংশের দুলাল’ (১/৪) বলে সম্বোধন করেছেন, তা অনেকাংশে যথাপ্রযুক্ত হয়েছে। তাই যুদ্ধের প্রভাতে যখন পাণ্ডবসৈন্য মাহিষ্মতী আক্রমণ করেছে তখনও তাঁকে পালঙ্কে নিদ্রারত অবস্থায় দেখা যায়, আর তাঁর ঘুম ভাঙান মাতা জনা। জেগে ওঠার পর তিনি একাই যুদ্ধে যেতে চান, কিন্তু ততক্ষণে জনা নিজেই যে সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করে রেখেছেন, সেই খবর পুত্রকে প্রদান করেন। এরপর মদনমঞ্জরী যখন প্রবীরকে যুদ্ধের পোশাক পরাতে আসেন, ততক্ষণে শত্রুসৈন্য রাজবাড়ির সিংহদ্বারে পৌঁছে গিয়েছে।

যুদ্ধক্ষেত্রেও প্রবীরের বীরত্বের প্রত্যক্ষ প্রকাশ দেখা যায় না, বরং বিপক্ষীয় বীরদের হাহাকারের মধ্যে দিয়ে উঠে আসে প্রবীরের বীরত্বের পরোক্ষ বর্ণনা। দেখা যায় প্রথম দিনের যুদ্ধের পরেই খুব দ্রুত স্বাধীনতাকামী যুবরাজ প্রবীরের চরিত্রের অবনমন ঘটে। নাটকের গতিমুখের দ্রুত পরিবর্তনের এই ঘটনাকে খুব বাস্তবোচিত বলা চলে না। নাটককার এক্ষেত্রে মহাকাব্যিক পরিণতি অক্ষুণ্ণ রাখতে গিয়েই হয়তো এত দ্রুত বীর যুবরাজ প্রবীর চরিত্রের নৈতিক অধঃপতন ঘটিয়েছেন। দেবাদিদেব মহাদেবের দ্বারা পূর্ব নির্ধারিত ঘটনা পরম্পরা এক্ষেত্রে কার্যকরী হয়। তাঁরই নির্দেশানুসারে কাম ও রতি প্রবীরকে বেপথু করে ফেলেন। অপার মাতৃভক্তি এবং উন্নত চরিত্র থেকে বিচ্যুত হয়ে দ্রুত ভয়াবহ পরিণতির দিকে এগিয়ে যান প্রবীর। এককালের বীর যোদ্ধা থেকে তিনি হয়ে ওঠেন ছদ্মবেশী সুন্দরীর কিঙ্কর (৩/১)। এইটিই ছিল নায়কের পতনসূচক ত্রুটি। এরপর এই ছদ্ম-প্রণয়লীলার সমাপ্তি ঘটে প্রবীরের অস্ত্রশস্ত্র ও বর্ম অপহরণের মধ্যে দিয়ে। ইত্যবসরে রাজপুরীতে প্রিয়জনেরা প্রবীরের সন্ধান করে ব্যর্থ হন। তাঁর এই না ফিরে আসা তাঁর ধারাবাহিক জীবনপ্রবাহের নিরিখে ছিল একটি ছন্দপতন। আর তা ঘটেছিল দেবতাদের ষড়যন্ত্রে। স্বয়ং শিব এক্ষেত্রে আচরণ করেছেন মঙ্গলকাব্যের ষড়যন্ত্রী দেবী মনসার মতো।

নাটকের এই অংশে (৩/২) প্রবীরের প্রিয়জনেরা নানা অমঙ্গলের লক্ষণ দেখতে পান। এই অমঙ্গল লক্ষণ বর্ণনা গ্রিক মহাকাব্যের প্রভাবে জনা নাটকে এসেছে বলে মনে হয়। অনতিবিলম্বে মায়া অন্তর্হিত হওয়ার পরেই হৃতশক্তি প্রবীরকে নিহত

করতে অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণকে খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি। এই অংশে (৩/৪) তাঁদেরকে খুব ধর্মপরায়ণ মনে হলেও সমগ্র যুদ্ধের ফলকেই তাঁরা ঘুরিয়ে দিয়েছেন পূর্বপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে। শিকারী যেমন শিকারকে নিয়ে খেলা করে, হৃতশক্তি প্রবীরকে নিয়ে তাঁরা তাই করেছেন। মৃত্যুর পূর্বে প্রবীরের মধ্যে সৃষ্ট আত্মগ্লানি ও ধিক্কারের ক্ষেত্রটি প্রস্তুত করেছেন তাঁরাই। যার আগুনে দগ্ধ হয়ে একরকম আত্মঘাতী অসমযুদ্ধে মেতে প্রাণ দেন প্রবীর। এই কাজটিও মূল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রবীরকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে সম্পন্ন করেন কৃষ্ণার্জুন। এরপর এই অংশে তাঁদেরকে শঙ্কিত দেখায় জাহ্নবীর বরে তেজস্বিনী জনার আগমন কল্পনা করে। তাই প্রবীরকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিয়েই তাঁরা রণক্ষেত্র ত্যাগ করেন। এরপর নাটকের পরবর্তী দুই অঙ্ক জুড়ে থাকে পুত্রহীনা জনার নিষ্ফল প্রতিহিংসাকামনা। তৃতীয় অঙ্কের শেষেই যার সূত্রপাত—

" জনা। মমতা, এস না বক্ষে মম !
জ্বল, জ্বল রে অনল—
প্রতিহিংসানল জ্বল হৃদে !" (৩/৪)

পরবর্তী দুই অঙ্ক জুড়ে দেখা যায় জনার ভয়ে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও ভীত, কারণ জনা জাহ্নবীর সহচরী। যদিও জনার পরিণতিও পূর্বনির্ধারিত। যার ফলে প্রতিহিংসা বুকে নিয়ে পুত্রের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়ার সংকল্পে জনা সর্বত্র ভ্রমণ করলেও তাঁর সংকল্প পূর্ণতা পায় না। বরং পুত্রের বীরত্বের দ্বারা রাজ্যের সার্বভৌমত্ব বজায় রাখার পরিকল্পনা থেকে পুত্রের মৃত্যুতে সরে দাঁড়িয়ে পুত্রহন্তার সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন রাজা নীলধ্বজ। এই অংশে নীলধ্বজকে ইলিয়াড মহাকাব্যের চরিত্র হেক্টরের পিতা রাজা প্রিয়ামের মতো মনে হয়েছে, যিনি কিনা হেক্টরের মৃত্যুর পরে পুত্রহন্তা গ্রিকবীর একিলিসের পাদবন্দনা করেছিলেন পুত্রের মৃতদেহটি ফেরত পাওয়ার আশায়। আর নীলধ্বজ প্রজা এবং রাজ্য রক্ষার্থে পুত্রঘাতী অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের মিত্রতা স্বীকার করেন। কিন্তু এই মিত্রতাকে স্বীকার করে নেওয়ার অর্থ যে হীনতাকে স্বীকার করে নেওয়া, তা জানতেন জনা। তাই তিনি নীলধ্বজকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করার চেষ্টা করেন। নীলধ্বজ এক্ষেত্রে *মেঘনাদবধ কাব্য*-এর রাবণ হয়ে ওঠেন নি। ফলস্বরূপ জনা তাঁকে ভর্ৎসনা করেন—

"হরিভক্তি নহে রাজা হীনতা স্বীকার।
বাঁধ বুক, ধর ধনু, প্রবেশ সমরে।" (৪/৩)

এর উত্তরে নীলধ্বজ নারী হয়ে এমন আচরণের জন্য জনাকে তিরস্কার করেন। নাটকের পরবর্তী অংশে নীলধ্বজের প্রতি জনার ভর্ৎসনা মনে পড়িয়ে দেয় মাইকেল মধুসূদনের জনা পত্রকাব্যের অংশটিকে। অনতিবিলম্বে জনা রাজপুরী ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়েন একাকী 'প্রতিবিধিৎসিতে'। নাটককার এই অংশে পুত্রশোকাতুরা জনার ভীষণমূর্তি অঙ্কন করলেও সেই ভয়ঙ্করতা প্রকৃত প্রস্তাবে কোনও কাজে আসেনি। পঞ্চম

অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে জনার ভ্রাতা উলুক জনাকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও জনা ফেরেননি। বরং 'ঘর' নামক ধারণাটিকেই তিনি প্রশ্নের সম্মুখীন করেছেন—

"জনা। কোথা ঘর?

যথা পাণ্ডব-কিঙ্কর উচ্চ জয়-রবে
পাণ্ডবের প্রভুত্ব প্রচারে ?
যথা পুত্র-ঘাতী সিংহাসন 'পরে ? " (৫/৩)

জনার এই বক্তব্যে ফুটে উঠেছে তাঁর স্বাধীনতাকামী মাতৃচিত্তের স্বরূপ। ঘর মানে যে মাথা উঁচু করে সম্মানসহ বাঁচবার পরিসর, সেই কথাটিই তিনি মনে করিয়ে দিতে চেয়েছেন। তাই গোবিন্দের পাদপদ্মের আশ্বাস তাঁকে আশ্রয় দিতে পারেনি। কারণ গোবিন্দের ষড়যন্ত্রেই তিনি পুত্রহারা হয়েছেন। তাই চিত্তের দহন জুড়াতে তিনি আশ্রয় নেন জাহ্নবীর জলে। এইভাবেই স্বাধীনতাকামী, পুত্রশোকাতুরা এক বীরাঙ্গনার জীবনাবসান ঘটে। নাটককার গিরিশচন্দ্র এই অংশের সমাপ্তিতে অর্জুনের প্রতি গঙ্গার অভিশাপ প্রদানের দ্বারা মূল মহাকাব্যের কাহিনিক্রমের সঙ্গে জনার কাহিনিটি যুক্ত হওয়ার পথ খোলা রাখেন। এই অংশে তিনি মহাভারতকে অনুসরণ করেছেন।

জনার ভ্রাতা উলুকের কাহিনিটি নাটককারের দ্বারা অনেকখানি পরিবর্তিত। মহাভারত অনুযায়ী জানা যায় যে, নীলধ্বজকে বারংবার অনুরোধ করেও প্রতিশোধ গ্রহণে অসফল হয়ে ভ্রাতা উলুকের রাজ্যে পৌঁছান জনা। কিন্তু সেখানেও তিনি ভ্রাতার দ্বারা অপমানিত ও প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর সে রাজ্যও ত্যাগ করে গঙ্গায় প্রাণবিসর্জন দেন।

দেশকে মাতা হিসাবে দেখবার রীতি ভারতীয় সাহিত্যে প্রাচীন। উনিশ শতকের সাহিত্যিকরা সেই ধারাটি বজায় রেখেছেন। সেই সময়ের ঔপনিবেশিকতার প্রেক্ষাপটে পরাভূত, শোষিত দেশকে আরও বেশি করে দুঃখিনী মায়ের সম্মান দিয়ে আঁকড়ে ধরেছিলেন তাঁরা। সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও ব্রিটিশের অত্যাচারী নীতি আক্রমণ করেছিল সাহিত্যিক কিংবা নাটককারদের সৃজনশীলতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে। যার বহিঃপ্রকাশ ছিল নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন (১৮৭৬)। কিন্তু তা সত্ত্বেও নাটককাররা ছদ্মবেশ নিয়েছিলেন নিজস্ব মত ও দেশপ্রেমকে প্রকাশ করবার তাগিদে। তাই *মহাভারত*-এর কাহিনি ধার করে রচিত পৌরাণিক নাটক *জনা*-র মধ্যেও পাঠক সহজেই খুঁজে নিতে পারেন দেশাত্মবোধের অন্তঃসলিলা স্রোতটিকে। এই স্রোতেরই চোরা ঘূর্ণিতে মাহিষ্মতী কখন যেন হয়ে ওঠে আক্রান্ত ভারতবর্ষ, আর কৌশলী দেবতা কৃষ্ণ কিংবা মহাবীর অর্জুন সমকালীন ইংরেজ শাসকের জায়গায় অনায়াসে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেন, আর ঠিক সেইসময়ে রাজ্ঞী জনা, বীর পুত্রের শোকে প্রতিশোধস্পৃহ মাতা জনা ভারতবর্ষের মানবী রূপ পরিগ্রহ করেন।

ব্যবহৃত গ্রন্থপঞ্জি

গঙ্গোপাধ্যায়, নান্টু (অনূ.).*ইলিয়াড ওডিসি.* কলকাতা: কামিনী প্রকাশালয়. ১৪০১
ঘোষ,গিরিশচন্দ্র.*গিরিশ রচনাবলী* (১).কলকাতা: সাহিত্য সংসদ. আগস্ট ২০১২
দত্ত,মাইকেল মধুসূদন.*বীরাঙ্গনা কাব্য.*কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ. শ্রাবণ ১৪১৫
ভট্টাচার্য, আশুতোষ.*বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস.* কলকাতা: এ মুখার্জী. জুন ২০০৯
মজুমদার,সুবোধ চন্দ্র(সম্পা.).*কাশীদাসী মহাভারত.* কলকাতা: দেব সাহিত্য কুটীর. এপ্রিল ২০১৩

আধুনিক বাংলা কবিতায় লোক-উপাদান: মার্কসীয় দর্শনের বীক্ষায়

খোকন বর্মন
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
নয়াগ্রাম পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু সরকারি মহাবিদ্যালয়

পাঁজি মিলিয়ে মডার্নের সীমানা নির্দেশ করা যায় না— কথাটি সত্যমূলক হলেও এখন আমরা জানি যে রবীন্দ্রনাথের পর যাঁরা বাংলা কবিতায় নতুন সুর এনেছিলেন তাঁরাই আধুনিক কবি। বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী প্রমুখ ছিলেন যাঁদের প্রতিনিধি স্থানীয়। যে পঞ্চকবির নাম উচ্চারিত হলো, তাঁরা সবাই তিরিশের কবি হিসেবে খ্যাত; তবে আধুনিকতার পরিধি কেবল তিরিশের বৃত্তে সম্পূর্ণ হয়ে যায়নি। তিরিশ পেরিয়ে চল্লিশ, চল্লিশ পেরিয়ে পঞ্চাশ, পঞ্চাশ পেরিয়ে আরো বহুদূর প্রসারিত তার গতিস্রোত। আধুনিকতার নানান মানমাত্রাকে আত্মস্থ করে আধুনিক বাংলা কবিতার আত্মপ্রকাশ। সেই বিবিধ মানমাত্রার একটি অন্যতম মাত্রা মার্কসীয় দর্শনের প্রভাব। মার্কসীয় দর্শনের প্রভাব আধুনিক বাংলা কবিতার একটি বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখিত হলেও এই দর্শনের প্রভাবে একাধিক মাত্রা যুক্ত হয়েছে বাংলা কবিতায়। যেমন, কমিটমেন্টের ভাবনা, শ্রেণিচেতনা শ্রেণিসংগ্রামের ভাবনা ও সাম্য ভাবনা, ধর্ম বিযুক্ত মানবতাবাদ প্রভৃতি। সেইসঙ্গে মার্কসীয় দর্শনে শিক্ষিত ও দীক্ষিত কবি-সাহিত্যিকেরা লোকায়ত জীবন ও শিল্প সাহিত্যের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন এক বিশেষ প্রণোদনায়। এই প্রবন্ধে আমাদের আলোচনার বিষয় লোক-উপাদান অর্থাৎ লোকসাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গ-কে মার্কসীয় দর্শনে শিক্ষিতও দীক্ষিত কবিরা তাঁদের কবিতায় যে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে ব্যবহার করেছেন তার স্বরূপ উদ্ঘাটন।

মার্কসীয় দৃষ্টিতে লোকসাহিত্যের পঠন-পাঠন বিচার-বিশ্লেষণ মূল্যায়ন প্রভৃতি শুরু হয় বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায়। মার্কসীয় লোকসংস্কৃতিবিদগণের মতে, শিল্প-সাহিত্য যেহেতু সমাজ-চৈতন্যের এক রূপ— তাই লোকসাহিত্যের রচয়িতারা যে সমাজের মধ্যে থেকে তা রচনা করেছেন তার ভিন্ন ভিন্ন দিক অর্থাৎ শ্রেণিদ্বন্দ্ব বা শ্রেণি-শোষণের বিষয়টিও লোকসাহিত্যের মধ্যে অভিব্যক্ত হয়ে ওঠে। ১৯৩৪-এর সোভিয়েত রাইটার্স কংগ্রেসে প্রদত্ত ভাষণে গোর্কি শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শোষক ও শোষিত শ্রেণির দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক ও বাদ-প্রতিবাদ কিভাবে লোককথাগুলিতে গুপ্ত হয়ে রয়েছে তা সকলের সামনে উপস্থিত করে বলেন যে, লোককথাগুলিই আসলে তথাকথিত অশিক্ষিত সমাজের মূল অস্ত্র। বাস্তবে তারা শোষক শ্রেণির বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়লাভ করতে পারেনি বলেই লোককথায় নানা রূপকে তাদের পরাজয়কে চিত্রিত করে আত্মসুখ লাভ করতে চেয়েছে। তাই গোর্কি রাশিয়ার আধুনিক লেখকদের কাছে লোকসাহিত্যের নিবিড় পাঠ

ও গভীর মূল্যায়নের দাবি জানিয়ে লিখেছেন— “I do not doubt that you are familiar with ancient legends, tales and myths, but I should like their fundamental meaning to be more deeply comprehend.”[১] গোর্কির এই আবেদনের পাশাপাশি বাংলা ভাষার কবিদের আরো দু’টি বিষয় প্রণোদিত করেছিল বলে মনে হয়। এক. সাধারণ মানুষের যৌথ প্রয়াসে যে সমাজ গড়ে তোলার স্বপ্ন তাঁরা দেখাতে চাইলেন তাঁদের লেখায়, সে সমাজে উদ্দীপনা সঞ্চারিত হবে লোকসাহিত্য থেকে আহরিত নান্দনিকবোধে এমন অভিপ্রায়; দুই. লোকসাহিত্যের যে একটি সজীব ও চিরকালীন জনজীবন-সংলগ্নতার দিক রয়েছে তা শিল্পসম্মত ভাবে ব্যবহার করে কবিতার বক্তব্যকে জনসাধারণ্যে গ্রহণীয় করে তোলা।

অশ্বারোহী রাজপুত্রের অভিযান বাংলা রূপকথার একটি অপরিহার্য মোটিফ। লোকসাহিত্যের এই প্রসঙ্গকে আধুনিক কবিরা বিচিত্র তাৎপর্যে ব্যবহার করেছেন তাঁদের কবিতায়। বিষ্ণু দে-র বিখ্যাত ‘ঘোড়সওয়ার’ কবিতায় জনজাগরণের প্রসঙ্গে নেতৃত্বদানকারী বীর অশ্বারোহীর আহ্বান ঘোষিত হয়েছে রূপকথার রূপকল্পে—

জনসমুদ্রে জেগেছে জোয়ার
হৃদয়ে আমার চড়া।
চোরাবালি আমি দূর দিগন্তে ডাকি—
কোথায় ঘোড়সওয়ার?[২]

এছাড়াও এই কবিতার ছত্রে ছত্রে কবি ব্যবহার করেছেন লোককথার নানা টুকরো-টুকরো উপাদান—যেমন, ‘সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার’ কিংবা ‘হালকা হওয়ায় বল্লম উঁচু ধরো’ প্রভৃতি— যা নারী-অঙ্গের অলংকারের মত ব্যবহৃত হয়ে কবিতাটিকে রমণীয় ও রহস্যময় করে তুলেছে। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায়ও তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে রূপকথার এই ঘোড়ার প্রসঙ্গ—

দিগন্তে কারা আমাদের সাড়া পেয়ে
সাতটি রঙের
ঘোড়ায় চাপায় জিন।
তুমি আলো, আমি আঁধারের আল বেয়ে
আনতে চলেছি
লাল টুকটুকে দিন।[৩]

রূপকথার গল্পে আছে স্বপ্নসন্ধানী রাজপুত্র পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে চলে যায় সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার— অবশেষে পূরিত হয় তার কাঙ্খিত স্বপ্ন; কবিও তেমনি ইঙ্গিতগর্ভ ঈশারায় জানিয়ে দেন যে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে লব্ধ ‘লাল টুকটুকে দিন’ আর বেশি দূরে নয়— অপেক্ষা শুধু ঘোড়ায় জিন তোলার সময়টুকু মাত্র।

রূপকথা প্রসঙ্গে অবশ্যম্ভাবীরূপে চলে আসে সাত ভাই চম্পার কথা। রূপকথার এই গল্পটিতে আছে একটি প্রতিবাদের দিক। রানীদের পরিকল্পিত চক্রান্তে আত্মগোপন করেছিল সাত রাজপুত্র চাঁপা ফুলের ছদ্মবেশে। তারপর এক শুভ মুহূর্তে পারুল বোনের আহ্বানে তারা পুষ্প আবরণ ত্যাগ করে সত্যরূপে আবির্ভূত হয়। ফিরে পায় রাজ্যের অধিকার, দুষ্কৃতির হয় প্রাণদণ্ড। চম্পা প্রতীকের এই তেজোময়তার অনুষঙ্গ আমরা সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ‘চম্পা’ ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের লেখা ‘পারুলের আহ্বান’ কবিতাতেও পাই। বিষ্ণু দে রচিত ‘সাত ভাই চম্পা’ কবিতাতেও চম্পা প্রতিবাদী চরিত্র রূপে অঙ্কিত। চম্পা কখনো মুক্তির প্রতীক, কখনোবা কবিতায় রূপময় ও ধ্বনিময় হয়ে উঠেছে মৃত্যু-অতিক্রমী তরুণ বীরের শৌর্য-সুন্দর আবির্ভাবের প্রার্থনা—

কড়ির পাহাড়ে চম্পা, তুমি তো নেই
কাঞ্চনমালা জানে না, তোমার খেই;
তবুও তোমায় খুঁজে মরে সারাদেশ—
ঘোচাও চম্পা, দুস্থ ছদ্মবেশ,[৪]

একইসঙ্গে কবি এই কবিতায় অঙ্কন করেছেন ‘চম্পা’-কে কেন্দ্র করে আসমুদ্রহিমাচল শ্রমজীবী মানুষের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধের চিত্র—

তোমাকে খুঁজেছে জান কি কৃষকের নৃপে
অশ্বের খুরে লাঙ্গলের ফলা টেনে,
হাতুড়ির ঘায়ে, কাস্তের বাঁকা শানে,
ভাটিয়ালি গানে, কপিল মুনির দ্বীপে;
কলিঙ্গে আর কঙ্কনে গুর্জরে
চম্পা, তোমার সাত ভাই গান করে।[৫]

কবিতাটি সম্পর্কে সমালোচক দীপ্তি ত্রিপাঠী লিখেছেন,— “...সাত ভাই চম্পা’তে তাঁর মার্কসবাদ রীতিমতো দলীয় প্রচারে পরিণত হয়েছে।”[৬] আমরা মনে করি রূপকথার প্রচলিত কাহিনীকে আশ্রয় করে কবি বিষ্ণু দে এই কবিতায় সুন্দরও শিল্পসম্মত চেতনার সংশ্লেষ ঘটিয়েছেন। তাই আমাদের সমর্থন থাকবে সমালোচক জগদীশ ভট্টাচার্যের প্রতি। তাঁর মতে,—“সাত ভাই চম্পা’— এই নামের কবিতাটি বিষ্ণু দে-র এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা।”[৭]

রূপকথার যে কাহিনীকে কেন্দ্র করে বিষ্ণু দে-র ‘সাত ভাই চম্পা’— সেই একই কাহিনীর ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ‘পারুল বোন’ কবিতা। গবেষক কবিতাটির নেপথ্য কাহিনী হিসেবে জানিয়েছেন—

“সাবেক পূর্বপাকিস্তানে ’৫২-এর ভাষা আন্দোলনের পরে পরেই ঢাকায় পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৫৪ সালে সে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে ঢাকায় যান সুভাষ মুখোপাধ্যায় সহ বাংলার বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিকেরা। সে সময়ের পূর্ব পাকিস্তান ঝড়ো হাওয়ায় কাঁপছে। ভাষা আন্দোলন সফল। আওয়ামি লীগের পরিচালনাধীন ফ্রন্ট

বিজয়ী ঘোষিত হয়েছে নির্বাচনে, অথচ তাকে ক্ষমতায় বসতে না দেওয়ার জন্য চলছে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র। একই সঙ্গে সেখানে ঘটে গেছে আরও একটি ভয়ঙ্কর ঘটনা। কৃষক আন্দোলন করতে গিয়ে ধরা পড়েছেন শ্রীমতি ইলা মিত্র। পাক স্বৈরাচারী শাসকদের হাতে নিগৃহীত ও লাঞ্ছিত হয়ে সে সময় তিনি ঢাকার সরকারী হাসপাতালে। এই দু'টি ঘটনাই আবেগমথিত হয়ে পারুল বোন-এ ধরা পড়েছে। রূপকথা থেকে উঠে আসা এ কবিতায় পারুল বোন-এ মিশে আছেন একাধারে স্তালিন নন্দিনী ইলা মিত্র এবং সেদিনের বাংলাদেশ।"[৮]

কবি এই কবিতায় সাত ভাই চম্পা ও পারুল বোন— রূপকথার অতি পরিচিত সেই কাহিনীকে সমকালীন অগ্নিগর্ভ ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি বর্ণনার জন্য নির্বাচন করেছেন কেবল এই বিশেষ বার্তা দেওয়ার জন্য যে, সমস্ত দুর্যোগের কঠিন কালো রাত পেরিয়ে অবশেষে সাত ভাই চম্পা ও পারুল বোনের জয় নিশ্চিত। সেদিন অর্থাৎ আসন্ন সেই ভবিষ্যতে আর কোনো দুষ্ট স্বৈরাচারী শক্তি তাকে অবরুদ্ধ করে রাখতে পারবে না—

অন্ধকার পিছিয়ে যায়
দেয়াল ভাঙ্গে বাধার
সাতটি ভাই পাহারা দেয়
পারুল, বোন আমার—
দেখি তো কে তোমার পায়
বেড়ি পরায় আবার?[৯]

সাত ভাই-এর রূপকে কবি আপামর মেহনতী সংগ্রামী জনতাকে বুঝিয়েছেন— এবং তাদের জেগে উঠবার কথা বলা হয়েছে কবিতাটিতে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় গণ-আন্দোলনের কবি— সেই আন্দোলনের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঝিলিক দিয়ে উঠেছে 'দেখি তো কে তোমার পায়/ বেড়ি পরায় আবার' এই দৃপ্ত উচ্চারণে। এইভাবে প্রচলিত লোক-কাহিনীকে আশ্রয় করে সংগ্রামের দ্যোতনা ব্যঞ্জিত করার প্রেরণা কবি অর্জন করেছেন মার্কসীয় দর্শনের শিক্ষা থেকে তা বলা যায়।

কবি বিষ্ণু দে ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় যেমন সাতভাই চম্পা ও পারুল বোনের প্রসঙ্গ তাৎপর্যপূর্ণভাবে জায়গা করে নিয়েছে, তেমনি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় বারে বারে এসেছে বেহুলা'র প্রসঙ্গ। লোককাব্য মনসামঙ্গলের নায়িকা চরিত্র বেহুলা। হার-না-মানা অসীম সাহসিনী মৃত্যুঞ্জয়ী বেহুলা নারী শক্তিরও প্রতীক। তিরিশের কবি জীবনানন্দের কবিতায় বেহুলার প্রসঙ্গ এসেছে এভাবে— "ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়/ বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিল পায়।" জীবনানন্দের কবিতায় বাংলার প্রকৃতি ও মানুষের অদ্বয় ও মরমী সম্পর্কের কথা বলা হলেও, না-বলা থেকেছে বেহুলা চরিত্রের প্রতিবাদের অভিমুখ। আর

চল্লিশের বামমনস্ক কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর সমকালের প্রতিবাদী ও সংগ্রামী চেতনার সম্মিলনে আঁকলেন বেহুলার অগ্নিহোত্রী সংগ্রামী রূপ—

ওকী দেবতা অসুর জড়সড়
বোবা রক্তের কোলাহলে!
এই বেহুলা নাচানো সর্গ?
এ যে আগুনের মতো জ্বলে![১০]

'বেহুলা' নামাঙ্কিত ভিন্ন একটি কবিতা আছে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মুখে যদি রক্ত উঠে' শীর্ষক কাব্যে। যেখানে স্পষ্টতঃ ব্যক্ত হয়েছে দিনবদলের প্রত্যাশা—

জলে ভাসছে ওফেলিয়া
জলে ভাসছে লখিন্দর,
গাজন যেন ডাকাতদের বিলে!
জলে ভাসছে ওফেলিয়া
জলে ভাসছে অবাক লখিন্দর;
কন্যা! তুমি কোথায় গিয়েছিলে?[১১]

শেষ পঙক্তিতে 'কন্যা! তুমি কোথায় গিয়েছিলে?' বলে যে জিজ্ঞাসা, তার মধ্য দিয়ে বেহুলার আহ্বান স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। ভাসমান লখিন্দর— এই কথাতে কবি দুঃখের সমুদ্রে ভাসমান দুর্দশাযময় দেশকে বোঝাতে চেয়েছেন। বেহুলা যেমন স্বর্গ থেকে মৃত লখিন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে এনেছিল— কবিতায় কবি এই আশা পোষণ করেছেন যে, বেহুলাও শাসন-শোষণে জর্জর এই দেশকে এনে দেবে প্রকৃত মুক্তির অমৃত আস্বাদ। ফলে কবিতায় বর্ণিত বেহুলা মঙ্গলকাব্যের চরিত্র না থেকে একটি বিশেষ আদর্শ ও সংগ্রামী চেতনার সমন্বিত রূপ হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। মার্কসবাদে যে-সংগ্রামী চেতনাকে আত্মস্থ করে শ্রেনী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নতুন সমাজ সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে— বেহুলা যেন সেই সংগ্রামী চেতনার বিশ্বস্ত রূপ হয়ে ধরা দেয় পাঠকের চেতনায়। কবির মনে হয়েছে, ধনবাদী সমাজের শোষণ ও অত্যাচারের খাঁড়ায় লখিন্দরকে প্রাণ দিতে হয়েছে— আর বেহুলার সংগ্রাম মৃত লখিন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে আনবে। অর্থাৎ বিশ্বের তাবৎ মেহনতী মানুষের সংঘবদ্ধ সংগ্রাম পুঁজিবাদী সমাজ কাঠামোকে ধ্বংস করে নতুন এক পারিজাত সমাজ গড়ে তুলবে। তাই বেহুলার আত্ম-জবানিতে কবি পৃথিবীর সকল সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের সম্মুখে তুলে ধরেছেন সেই চূড়ান্ত সফল-স্বপ্নের আশ্বাস—

সে জাগবে। জাগবেই। আমি তাকে কোলে নিয়ে
বসে আছি রক্ত-পুঁজে মাখামাখি রাত্রি
ভেলায় ভাসিয়ে।[১২]

অর্থাৎ বেহুলার ভাসান যেমন একদিন সফল-সার্থক হয়েছিল লখিন্দরের প্রাণ প্রতিষ্ঠায়, তেমনি সঙ্ঘবদ্ধ মানুষের সংগ্রামও ব্যর্থ হবার নয়— রাত্রির অন্ধকার ভেদ

করে তা সেই কাঙ্খিত সকালকে অবশ্য ত্বরিত করবেই। এইভাবে কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রচলিত লোক-আখ্যানকে মার্কসীয় চেতনার আলোকে ভিন্নতর তাৎপর্য ও দ্যোতনায় কাব্যের পরিধিকে বিবৃতি দিয়েছেন।

লালকমল নীলকমল বাংলা রূপকথার অতি-পরিচিত দুই চরিত্র। বিষ্ণু দে তাঁর 'মৌভোগ' কবিতায় সমকালীন গণজাগরণের তীব্রতাকে বোঝাতে গিয়ে নিয়ে এলেন লালকমল নীলকমল-এর প্রসঙ্গ—

নীলকমলের আগে লালকমল যে জাগে
তৈরী হাতে নিদ্রাহারা একক তরোয়াল
লাল তিলকে ললাট রাঙা, ঊষার রক্তরাগে
কার এসেছে কাল?[১৩]

এই কবিতায় কবি রাক্ষস বলে চিহ্নিত করেছেন তৎকালীন জমিদার শ্রেণি-কে— যারা কৃষককে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে চায়। অন্যদিকে লালকমল ও নীলকমল হলো হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সমস্ত কৃষক-প্রজা। রূপকথার গল্পে আমরা দেখি যে লালকমল নীলকমল-এর যৌথ প্রয়াসে রাক্ষসদের মৃত্যু হয়েছিল, তেমনি "হিন্দু-মুসলমানের মিলনে সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র যে ছিন্ন হয়ে যাবে সে বিশ্বাস রূপকথার প্রতীক প্রয়োগে কবি আমাদের অন্তরের মূল পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন।"[১৪] বিষ্ণু দে-র 'হাসনাবাদেই' শীর্ষক কবিতাতেও রূপকথার এই লালকমল নীলকমল প্রসঙ্গ তাৎপর্যপূর্ণভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

শ্রেণিচেতনা ও প্রতিবাদ যে পৃথিবীর লোক সাহিত্যের একটি প্রধান দিক— মার্কসবাদী লোকসংস্কৃতিবিদেরা তা দেখিয়েছেন। মার্কসীয় দর্শনে শিক্ষিতও দীক্ষিত বাংলা ভাষার কবিরা লোকসাহিত্যের এই প্রতিবাদী চেতনার দিকটিকে মিশিয়ে দিতে চেয়েছেন তাঁদের কবিতায়। ফলে লোকসাহিত্যের সঞ্চরণশীলতাকে সমকালীন সমাজ ভাবনার সঙ্গে মিলিত হয়ে লাভ করেছে এক বিশেষ অর্থ-দ্যোতনা। এই প্রসঙ্গে কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'লাল শপথের রাখি' কবিতার কিছু পংক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

শহরে গভীর রাত্রি ঘনায়, তুই আমি বসে থাকি;
আমি পড়ি বসে,পৃথিবীর উপকথা
তুই দুয়োরাণী, ভোল্ রাত্রির ব্যথা—
কাল ভোরে পরিয়ে দিস মা, লাল শপথের রাখি[১৫]

রূপকথার গল্পে দুখিনী দুয়োরাণীর ছেলে যেমন বড় হয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছিল এবং ফিরিয়ে এনেছিল মায়ের হৃতসম্মান ও প্রতিপত্তি তেমনি, তেমনি এ-কবিতার কথক-ছেলে তার মাকে দুঃখের রাত্রি ভুলে যাওয়ার কথা জানিয়েছে। কারণ, কাল ভোরে ছেলে যাবে যুদ্ধে— মা যেন তাকে 'লাল শপথের রাখি' পরিয়ে দেয়। 'লাল

শপথের রাখি' কথাটির মধ্য দিয়ে কবি আসন্ন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে ইঙ্গিত করেছেন— যা ইতিমধ্যে রাশিয়ার মাটিতে নতুন দিনের সূচনা করেছে। যে বিপ্লব ভুলিয়ে দেবে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের উপবাসী জীবনের দুঃখকথা। কবি যে-বিপ্লবের ইঙ্গিত দিয়েছেন কবিতায়— লোকসাহিত্যের আধারে পরিবেশিত হওয়ায় তা অনেক বেশি জীবন্ত ও তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'বোধন' কবিতায় রূপকথার 'জীয়নকাঠি', 'মরণকাঠি' ও 'ব্যাঙ্গমা পাখি'র উল্লেখে কবির প্রতিবাদী চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে—

তোমার ফসল, তোমার মাটি
তাদের জীয়ন ও মরণ কাঠি
তোমার চেতনা চালিত হাতে।
এখনো কাঁপবে আশঙ্কাতে?
স্বদেশ প্রেমের ব্যাঙ্গমা পাখি
মারন মন্ত্র বলে শোনো তা কি?[১৬]

'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতিহার'-এ মার্কস ও এঙ্গেলস লিখেছিলেন— "যে অস্ত্রগুলি তারই মৃত্যু আনে বুর্জোয়া শ্রেণি শুধু সেগুলো নির্মাণ করেনি, এমন লোকও এ সৃষ্টি করেছে, যারা সেই অস্ত্রই চালনা করবে। তা হচ্ছে আধুনিক শ্রমিকশ্রেণি, প্রলেতারিয়েত।"[১৭] পৃথিবীর তাবৎ সর্বহারা শ্রমজীবি মানুষকে কবি সুকান্ত সেই অনিবার্যতাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন এই কথা বলে "তাদের জীয়ন ও মরণ কাঠি/ তোমার চেতনা চালিত হাতে।" তারপর কবি বলেছেন ব্যাঙ্গমা পাখির কথা। রূপকথার দুই পাখি হলো ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী— যারা কথা বলে, এমনকি ভবিষ্যৎবাণী ও করতে পারে। রাজপুত্র যখন পথ হারিয়েছে, এই দুই পাখির কথায় ইঙ্গিতায়িত হয়েছে প্রকৃত পথের দিশা। সেইসঙ্গে শত্রু নিধনের গোপন মারণ-মন্ত্রের ঠিকানাও মিলেছে তাদের কথায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় কবি স্বার্থলোভী আড়তদার মজুদদারদের বোঝাতে এই কবিতায় ব্যবহার করেছেন রাক্ষসের উপমান; এবং এই রাক্ষসদের স্বজনহারানো শ্মশানে না তোলা পর্যন্ত যে প্রকৃত মুক্তি নেই স্বদেশপ্রেমের ব্যাঙ্গমা পাখির কথায় সেই সত্য আভাসিত।

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায়ও আছে অনুরূপ একটি প্রসঙ্গের অবতারণা— রূপকথার ভিন্নতর একটি প্রসঙ্গের উপস্থাপনায়—

দিন এসে গেছে, ভাইরে—
রক্তের দামে রক্তের ধার
শুধবার।
দিন এসে গেছে ভাইরে—
বিদেশি রাজের প্রাণভোমরাকে
নখে নখে টিপে মারবার।[১৮]

রূপকথার গল্পে আছে রাজকুমার কর্তৃক এক ডুবে জল থেকে প্রাণ ভোমরা তুলে এনে টিপে মারার মাধ্যমে সমস্ত রাক্ষসের বিনাশের কাহিনী। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় এই কবিতায় প্রাণভোমরার প্রসঙ্গ এনে বিদেশি রাজ অর্থাৎ অত্যাচারী ইংরেজ শক্তির সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের সর্বনাশের শুভক্ষণের কথা ঘোষণা করেছেন।
এইভাবে লোকসাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গ অনুষঙ্গকে মার্কসীয় দর্শনের দীক্ষায় বাংলা ভাষার কবিরা ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্যে উপস্থাপিত করেছেন।

তথ্যসূত্র:

১. Gorky, Maxim: 'Soviet Literature', Speech, delivers in August 1934, Online version: Marxists Internet Archive (Marxists.org) 2004, p.03
২. দে, বিষ্ণু: 'ঘোড়সওয়ার', 'চোরাবালি', 'কবিতাসমগ্র'-১, আনন্দ, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ: ফেব্রুয়ারি ২০০৪, পৃ-৪৫
৩. মুখোপাধ্যায়, সুভাষ: 'লাল টুকটুকে দিন', 'ফুল ফুটুক', 'কবিতা সমগ্র'-১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, সংশোধিত তৃতীয় সংস্করণ, জুলাই ২০০৩, পৃ- ১৪৩
৪. দে, বিষ্ণু: 'সাত ভাই চম্পা', 'সাত ভাই চম্পা', 'কবিতা সমগ্র'-১, পূর্বোক্ত, পৃ- ১৮৪
৫. পূর্বোক্ত
৬. ত্রিপাঠি, দীপ্তি: 'আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ষষ্ঠসংস্করণ: নভেম্বর ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-২৩১
৭. ভট্টাচার্য, জগদীশ: 'বিষ্ণু দে', 'আমার কালের কয়েকজন কবি', ভারবি, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ: আগস্ট ২০০৪, পৃ- ১৮৩
৮. সিংহ, বিজয়: 'সুভাষ মুখোপাধ্যায়: পদাতিক কবি রক্তিম কবিতা', পান্ডুলিপি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: বইমেলা ২০০২, পৃ- ২১০
৯. মুখোপাধ্যায়, সুভাষ: 'পারুল বোন', 'ফুল ফুটুক', 'কবিতা সংগ্রহ'-১, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৪৫
১০. চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র: 'বেহুলা নাচানো স্বর্গ','বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ: আগস্ট ২০০৬, পৃষ্ঠা- ৩১
১১. চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র: 'বেহুলা', 'মুখে যদি রক্ত উঠে', দ্রষ্টব্য: 'দেহলী' (পত্রিকা), মুকুল বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদক), মজঃফরপুর, বর্ষ ২০, ডিসেম্বর ২০০৯, পৃ- ২৪
১২. চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র: 'বেহুলা', 'লখিন্দর', দ্রষ্টব্য: চক্রবর্তী, সুমিতা: 'বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়: লক্ষ্য স্বদেশ, লক্ষ্য মানুষ', 'আধুনিক বাংলা কবিতার দ্বিতীয় পর্যায়',

প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা, দ্বিতীয় পরিবর্তিত প্রজ্ঞা বিকাশ সংস্করণ, মে ২০০৫, পৃ- ২১১

১৩. দে, বিষ্ণু: 'মৌভোগ','সন্দ্বীপের চর', 'কবিতাসমগ্র'-১, পূর্বোক্ত, পৃ- ২০৫

১৪. ত্রিপাঠী, দীপ্তি: 'আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ষষ্ঠসংস্করণ: নভেম্বর ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-২৩৪

১৫. চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র: 'লাল শপথের রাখি', 'বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা', চতুর্থ সংস্করণ: আগস্ট ২০০৬, পৃ- ৩০

১৬. ভট্টাচার্য্য, সুকান্ত: 'বোধন', 'ছাড়পত্র', 'সুকান্ত-সমগ্র', সারস্বত লাইব্রেরি, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ: শ্রাবণ ১৪১২, পৃ-৫৯

১৭. মার্কস, এঙ্গেলস: 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতিহার', এন.বি.এ., নভেম্বর ২০০১, পৃ-৩৫

১৮. মুখোপাধ্যায়, সুভাষ: 'অগ্নিকোণ', 'অগ্নিকোণ', 'কবিতা সংগ্রহ'-১, পূর্বোক্ত, পৃ-৮৫

নাট্যরূপান্তরে শরৎচন্দ্রের দেনাপাওনা – পল্লীসমাজ

অমলচন্দ্র সরকার
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শান্তিপুর কলেজ, নদীয়া

সারসংক্ষেপ: শরৎচন্দ্র সমাজ সংস্কার, শিক্ষা সংগঠন ও সাহিত্য সৃষ্টি সেই সঙ্গে নাটক ও নাট্যমঞ্চের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ এক অসাধারণ শিল্পী প্রতিভার পরিচয় বহন করে। জ্ঞান, কর্মের সৃষ্টিতে আনন্দরসের মাধ্যমে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। বাংলা নাট্যশালার শৌখিন স্তর থেকে পেশাদার স্তর পর্যন্ত তিনি ছিলেন বিচারক, উপদেষ্টা, পরিচালক। তিনি অনুভব করেছিলেন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত সুখ-দুঃখ সমন্বিত নাটকের মাধ্যমে সমাজের বাস্তব সমস্যা জনচিত্তকে অধিক আলোড়িত করতে পারে। যুক্তি বিচারের দ্বারা শিক্ষিত মননশীল মানুষের চিন্তার উপর প্রভাব বিস্তার করা যায়। আঘাতের দ্বারা, বেদনার দ্বারা জনচিত্তকে জাগানো যায় ভাবরসাত্বক কাহিনীর মধ্যে দিয়ে। সেই কাহিনী যখন শ্রব্য তখন তার আবেদন সীমিত, আর যখন দৃশ্য তখন তার আবেদন তীব্র ও প্রত্যক্ষ এবং বহু বিস্তৃত। শরৎচন্দ্র জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক, ১৯০৭ সালে ভারতী পত্রিকায় ‘বড়দিদি’ প্রকাশিত হবার পর থেকেই বাঙালী পাঠক তাঁর সম্পর্কে কৌতুহলী হয়ে ওঠে। তারপর ১৯১৩ থেকে ১৯৩৩ এই কুড়ি বছরের মধ্যে তিনি সবচেয়ে বেশী সংবর্ধিত হয়েছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পারিবারিক অনেক প্রশ্ন ও বিতর্ক সাধারণ মানুষের মন অশান্ত করে তুলেছিল অন্যদিকে আমাদের পারিবারিক জীবনের সম্পর্কের মধ্যেও অনেক দ্বন্দ্ব, সংশয় দেখা দিয়েছিল। তাই দর্শক সমাজ শরৎচন্দ্রের বর্ণিত চরিত্র ঘটনার মধ্যে তাদের অনেক চিন্তাভাবনার প্রতিফল, প্রশ্ন ও বিতর্কের অবতারণা দেখতে পেল। সেকারণে শরৎচন্দ্রকে তারা বার বার মঞ্চে দেখতে চাইল। একান্নবর্তী পরিবার ও যৌথ জীবনের স্নেহপ্রেম, মাধুর্য্য সমস্যা ও সংকট দর্শক চিত্তকে প্রীতি ও প্রসন্নতায় উদ্বেলিত করেছিল। ‘রামের সুমতি’, ‘বিন্দুর ছেলে’, ‘নিস্কৃতি’ ইত্যাদির প্রীতির আবেদন, অন্যদিকে ‘দেবদাস’ ‘ষোড়শী’, ‘রমা’, ‘চরিত্রহীন পথের দাবী’ দর্শক সমাজকে খুশী করেছে, আঘাত করেছে, অশান্ত করেছে। শরৎচন্দ্র মঞ্চে এসে আকর্ষণ করলেন বির্তকে মাতিয়ে তুললেন, অস্বস্তি ও যন্ত্রণায় অস্থির করে তুললেন। ঐন্দ্রজলিক মায়া বিস্তার করে সকলকে মাতিয়ে রাখলেন।

সূচক শব্দ : বহু বিস্তৃত, জনজীবন, প্রীতি, আঘাত, যৌথজীবন, দেনাপাওনা, পল্লীসমাজ, মঞ্চ

প্রতিপাদ্য বিষয়:

বাংলা-নাট্যমঞ্চে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নাট্যরূপ নিয়ে যে সমালোচনাও বিতর্ক লক্ষ্য করা গেছে, সেটি হল ‘দেনাপাওনা’ উপন্যাস। ‘দেনাপাওনা’ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত

হয়েছিল ১৪ আগস্ট ১৯২৩। 'দেনাপাওনা' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র সোড়শী ও জীবানন্দ। 'দেনাপাওনা' উপন্যাসের ষোড়শী চণ্ডীগড়ের চণ্ডী ঠাকুরের ভৈরবী। এই ভৈরবীর জীবন রসবোধ-এর পশ্চাতে রয়েছে একটি রহস্যময় নেপথ্য ইতিবৃত্ত। সে ইতিবৃত্ত বেশ করুণ ও রহস্যময়। "বীজ গাঁয়ের জমিদার জীবানন্দ চৌধুরী তরুণ বয়সে ষোড়শীর মা কাজের জন্যে যে হোটেলে থাকত, সেই হোটেলেই ষোড়শীর সঙ্গে প্রথম দেখা। ষোড়শীর বয়স নয়-দশ বছর হবে। সে সময়ে জীবানন্দ যোড়শীর মায়ের কাছ থেকে একশ টাকা ঋণ নেয়। জীবানন্দ সে ঋণ শোধ করতে না পারায় ষোড়শীকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিল। বিয়ে হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সে বিয়ের ফল হয়েছিল অন্যরকম। বিয়ের পরই জীবানন্দ উধাও হয়ে যায়। সুদীর্ঘকালের ব্যবধানে চণ্ডীগড়েই যোড়শী ও জীবানন্দের সঙ্গে দেখা। জীবানন্দ একদিন যে যোড়শীকে বিয়ে করেছিল, সে আজ অলকা নয়, সে ষোড়শী। চণ্ডীগড়ের ভৈরবী নামে পরিচিত। এই সুদীর্ঘ বারো-তেরো বছর ব্যবধানের পর এই সাক্ষাৎকারই 'দেনাপাওনা' উপন্যাসের সূচনা। অলকার ষোড়শী পরিচয় ব্যতীত আর কিছু নেই। ভৈরবীর দশ মহাবিদ্যার নাম ছাড়া আর কোনো নাম তার আজ আর নেই। কিন্তু জীবানন্দ ষোড়শীকে নয়, তার সেই অতীতের অলকাকেই চায়। আর এ পটভূমিকাতেই উপন্যাসের কাহিনি পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছে।" [১]

শরৎচন্দ্রের 'দেনাপাওনা'র প্রথম নাট্যরূপটি ১৯২৭-এর ৬ই আগস্ট মনোমোহন নাট্যমন্দিরে মঞ্চস্থ হয়। এর আগেই 'বিরাজ বৌ' মঞ্চস্থ হলেও 'দেনাপাওনা' শরৎচন্দ্র এবং নিজের উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়ে, নিজের নাট্যপ্রতিভার স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত দিকটি তেমন ভাবে প্রকাশ ঘটাতে না পারলেও, তবুও তার এই প্রচেষ্টা শরৎজীবনের একটি অংশবিশেষ হয়ে উঠতে পারায় - কম গৌরবের বিষয় নয়। 'দেনাপাওনা'র নাট্যরূপ বাংলা নাট্যমঞ্চে একটি বিশেষ বিতর্কিত অধ্যায় হয়ে আছে। 'দেনাপাওনা' প্রকাশের পর শরৎচন্দ্রের উপন্যাসটি শিশিরকুমার মঞ্চস্থ করার জন্যে উৎসাহী হয়ে ওঠেন।

শরৎচন্দ্রের 'দেনাপাওনা' উপন্যাসের প্রথম নাট্যরূপ দেন শিবরাম চক্রবর্তী। তিনিই নামকরণ করেন 'ষোড়শী। শিবরাম অগত্যা নাট্যরূপটি নিয়ে তিনি ভারতী পত্রিকার সম্পাদিকা সরলাদেবীর কাছে যান। কিন্তু লেখাটির প্রকাশ নিয়ে নিজেদের মধ্যে যে আলোচনা হয়েছিল তা 'ভারতী'র সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় তাঁর শরৎচন্দ্রের 'জীবনরহস্য' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। "আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে সরলাদেবী দিলেন আমার হাতে শিবরাম চক্রবর্তী কৃত 'দেনাপাওনার' নাট্যরূপ। যোড়শী নামে তিনি নাট্যরূপ দিয়েছেন। সরলাদেবী বললেন, শরৎ চাটুজ্যের লেখা পেয়েছি—ছাপাবো ? বললেন বহু বাধা আছে। যোড়শীর মালিক শরৎচন্দ্র, এ নাট্যরূপ তাঁর বিনা অনুমতিতে ছাপালে কপিরাইট আইন লঙ্ঘনের জন্য দায়ী হতে হবে—infrigement of copyright—সে জন্য ক্রিমিনাল কেস এবং হাইকোর্টে ড্যামেজ

স্যুট। উপায়? আমি বললুম, তাছাড়া তার গল্প উপন্যাসের নাট্যরূপ অপরের দেওয়া ...তার কমার্শিয়াল মূল্য কতই বা। আমি বললুম—শিবরামের সামনেই বললুম—শরৎ যদি লেখা দেখে শুনে দেন এবং তাঁর নামে ছাপাতে দেন, তাহলে ছাপা হতে পারে। তখন সে ছাপার দাম অনেকখানি। পরের দিন শিবরাম এসে জানালেন শরৎচন্দ্র রাজী। তবে টাকা চান। তখন শরৎচন্দ্রের সঙ্গে শিবরাম ও আমি দেখা করি এবং কথা হয় শরৎচন্দ্র সে লেখাটি ভালো করে দেখে সংশোধন এবং পরিমার্জনা করে দেবেন এবং নাট্যরূপ তাঁর দেওয়া বলে ছাপা হবে—শিবরামের নাম এতে থাকবে না এবং এর জন্য পাছে কেউ কখনো বলে শরৎচন্দ্রের দেওয়া নাট্যরূপ নয়—সেজন্য (to safeguard) ভারতীর (repution), তিনি লেখা স্বীকৃতি দেবেন যে তাঁর দেওয়া নাট্যরূপ-এর জন্য তাঁকে দেওয়া হবে তিনশো টাকার চেক। এই প্রস্তাব মতো কাজ হলো। শরৎচন্দ্র সে লেখা আগাগোড়া দেখে পরিমার্জনা করেছিলেন এবং তার নামেই ষোড়শী ছাপা হলো ভারতীর এক সংখ্যাতেই সমগ্রভাবে।" দেনাপাওনার নাট্যরূপ নিয়ে সে সময়ে শরৎচন্দ্র ও ভারতী কর্তৃপক্ষের নাটকে শিবরাম ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তা পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লেখায় প্রসঙ্গটির উল্লেখ করে শরৎচন্দ্র সম্পর্কে অশোভন মন্তব্য করতেও দ্বিধা করেননি—শরৎ চাটুজ্যে বহুকাল মাথা ন্যাড়া করে বসে থেকেও সে বেল তার মাথায় পড়ল না।' ইত্যাদি শরৎচন্দ্র তার 'দেনাপাওনা' উপন্যাসের নাট্যরূপ 'ষোড়শী' রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ একটি পত্রে [২] শরৎচন্দ্রকে লেখেন, — "তোমার ষোড়শী পেয়েছি। বাংলা সাহিত্যে নাটকের মত নাটক নেই। আমার যদি নাটক লেখবার শক্তি থাকত তাহলে চেষ্টা করতুম, কেননা, নাটক সাহিত্যের একটা শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। আমার বিশ্বাস, তোমার নাটক লেখবার শক্তি আছে। ভিতরের প্রকৃতি আর বাইরের আকৃতি এই দুটিই যখন সত্যভাবে মেলে তখনি চরিত্র চিত্র খাঁটি হয়—আমার বিশ্বাস তোমার কলম ঠিকভাবে চললে এই রূপের সঙ্গে ভাব মিলিয়ে তুলতে পারে, কেননা, তোমার দেখবার দৃষ্টি আছে, ভাববার মন আছে, তার উপরে দেশের লোকযাত্রা সম্বন্ধে তোমার অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র প্রশস্ত। তুমি যদি উপস্থিত কালের দাবী ও ভিড়ের লোকের অভিরুচিকে না ভুলতে পারো তাহলে তোমার এই শক্তি বাধা পাবে। সকল বড় সাহিত্যের যে পরিপ্রেক্ষিত (perspective) সেটা দূরব্যাপী, সেইটির সঙ্গে পরিমাণ রক্ষা করতে পারলে তবেই সাহিত্যে টিকে যায়—কাছের লোকের কলরব যখন দেয়াল হয়ে সঙ্কীর্ণ পরিবেষ্টনে তাকে অবরুদ্ধ করে, তখন সে খর্ব হয়ে অসত্য হয়ে যায়। ষোড়শীতে তুমি উপস্থিত কালকে খুশি করতে চেয়েছ এবং তার দামও পেয়েছ। কিন্তু নিজের শক্তির গৌরবকে ক্ষুন্ন করেছ। যে যোড়শীকে এঁকেছো সে এখনকার কালের ফরমাসের মনগড়া জিনিষ, সে অন্তরে বাহিরে সত্য নয়। আমি বলিনে যে এই রকম ভাবের ভৈরবী হতে পারে না, কিন্তু হতে গেলে যে ভাষা যে কাঠামোর মধ্যে তার সঙ্গতি হতে পারত, সে এখনকার দিনের খবরের কাগজ পড়া চেহারার মধ্যে নয়। যে

কাহিনীর মধ্যে আমাদের পাড়াগাঁয়ের সত্যকার ভৈরবী আত্মপ্রকাশ করতে পারত সে এই কাহিনী নয়। সৃষ্টিকর্তা রূপে তোমার কর্তব্য ছিল এই ভৈরবীকে একান্ত সত্য করা, লোকরঞ্জনকর আধুনিককালের চলতি সেন্টিমেন্ট মিশ্রিত কাহিনী রচনা করা নয়। জানি আমার কথায় তুমি রাগ করবে। কিন্তু তোমার প্রতিভার পরে শ্রদ্ধা আছে বলেই আমি সরল মনে আমার অভিমত তোমাকে জানালুম। নইলে কোন দরকার ছিল না। সাহিত্যে তুমি বড় সর্বাধিক, ইন্দ্রদেব যদি সামান্য প্রলোভনে তোমার তপোভঙ্গ করেন তাহলে সে লোকসান সাহিত্যের। তুমি উপস্থিত কালের কাছ থেকে দাম আদায় করে খুশি থাকতে পারো কিন্তু সকল কালের জন্য কি রেখে যাবে?"[২]

রবীন্দ্রনাথের পত্র পেয়ে শরৎচন্দ্রের মনে তীব্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। তাই ২৬শে ফাল্গুন রবীন্দ্রনাথের পত্রের উত্তর দিয়ে শরৎচন্দ্র তাঁর ষোড়শী সম্পর্কে নিজস্ব বোধ ব্যক্ত করে নাটক ও উপন্যাসের উপস্থাপনা রীতি সম্পর্কে আলোকপাতসহ 'যোড়শী সম্পর্কেও লিখে জানান, "আপনার চিঠি পেয়েছি। অসুস্থতার জন্যে যথাসময়ে উত্তর দিতে না পারায় অপরাধ হয়ে গেল। ষোড়শীর সম্বন্ধে আপনার অভিমত শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করেছি। কিন্তু দু-একটা কথাও আমার নিবেদন করবার আছে, এ কেবল আমার ব্যক্তিগত বিষয় নয়, সাধারণভাবে অনেকেরই ঠিক এমনি ব্যাপার ঘটে বলেই আপনাকে জানানো প্রয়োজন। এই নাটকখানা লিখেছি। আমার একটা উপন্যাস অবলম্বন করে। তাতে যত কথা বলতে পেরেছি, চরিত্র সৃষ্টির জন্যে যত প্রকার ঘটনার সমাবেশ করতে পেরেছি এতে তা পারিনি, কালের দিক ব্যাপ্তি দিয়েও নাটকের পরিসর ছোট, ব্যাপ্তির দিক দিয়েও এর স্থান সঙ্কীর্ণ, তাই লেখবার সময় নিজেও বারম্বার অনুভব করেছি—এ ঠিক হচ্ছে না। অথচ উপন্যাসটাই যখন এর আশ্রয় তখন ঠিক কি ভাবে যে করতে পারি তাও ভেবে পাইনি। বোধ করি উপন্যাস থেকে নাটক তৈরির চেষ্টা করতে গেলেই এই ঘটে। একদিক দিয়ে কাজটা হয়ত সহজ হয়, কিন্তু আর এক দিকে ত্রুটিও হয় প্রচুর, হয়েছেও তাই। আরও একটা হেতু আছে। এ জীবনে নানা অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাবার কালে চোখে পড়েছে অনেক জিনিস। আপনি যাকে বলেছেন, এ দেশের লোকযাত্রা সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা। কিন্তু অনেক কিছু দেখা এবং জানা সাহিত্যিকের পক্ষে নিছক ভালো কিনা এ বিষয়ে আমার সন্দেহ জন্মেছে। কারণ, অভিজ্ঞতায় কেবল শক্তি দেয় না,হরণও করে। এবং সাংসারিক সত্য সাহিত্যের সত্য নাও হতে পারে। বোধ হয়, এই বইখানাই তার একটা উদাহরণ। এটা লিখি একটা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জানা বাস্তব ঘটনাকে ভিত্তি করে। সেই জানাই হল আমার বিপদ। লেখবার সময় পদে পদে জেরা করে সে আমার কল্পনার আনন্দ ও গতিকে কেবল বাধাই দেয়নি, বিকৃত করেছে। সত্য ঘটনার সঙ্গে কল্পন মেশাতে গেলেই বোধ হয় এমনি ঘটে। জগতে দৈবাৎ যা সত্যই ঘটেছে তার যথাযথ বিবৃতিতে ইতিহাস রচনা হতে পারে, কিন্তু সাহিত্য রচনা হয় না। অথচ সত্যের সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে হলো আমার সোড়শী। এই

উপায়ে সাধারণের কাছে সমাদর লাভ করা গেল প্রচুর, কিন্তু আপনার কাছে দাম আদায় হলো না। এ আমার বাইরের পাওয়া সমস্ত প্রশংসাই নিষ্ফল করে দিলে।

ষোড়শী সম্বন্ধে আপনি ঠিক যে কি বলেছেন আমি বুঝতে পারি নি। শুধু একটুকুই বুঝেছি এ যে ঠিক হয়নি, সে আপনার দৃষ্টি এড়ায় নি।

আপনি পরিপ্রেক্ষিতের উল্লেখ করেছেন। ছবি আঁকায় এত দূরত্বের পরিমাণে বড় জিনিস ছোটো, গোল জিনিস চ্যাপ্টা, চৌকো জিনিস লম্বা, সোজা জিনিস বাঁকা দেখায়। কতদূরে কোন সংস্থানে বস্তুর আকারে প্রকারে কিরূপ এবং কতটা পরিবর্তন ঘটবে তার একটা বাঁধাধরা আইন নেই। এর সমস্তই নির্ভর করে লেখকের রুচি এবং বিচার-বুদ্ধির ওপরে। নিজেকে কোথায় এবং কতদূরে যে দাঁড় করাতে হবে তার কোনও নির্দেশই পাবার যো নেই। সুতরাং ছবির পারস্পেক্টিভ এবং সাহিত্যের পারস্পেক্টিভ কথার দিক দিয়ে এক হলেও কাজের দিক দিয়ে হয়ত এক নয়। তাছাড়া সাহিত্যের বর্তমান কালটা যত বড় সত্য, ভবিষ্যৎ কালটা কিছুতেই ঠিক অত বড় সত্য নয়। নরনারীর যে একনিষ্ঠ প্রেমের ওপর এতকাল এত বাক্য লেখা হয়েছে, মানুষে এত তৃপ্তি পেয়েছে, এত চোখের জল ফেলেছে সেও হয়ত একদিন হাসির ব্যাপার হয়ে যাবে। অন্ততঃ অসম্ভব নয়। কিন্তু তাই বলে তো আজ তাকে কল্পনাতেও গ্রাহ্য করা চলে না।

একটা কংক্রিট উদাহরণ দিই। রামায়ণে রাম-রাবণের যুদ্ধের বিবরণ অনেক জায়গা জুড়ে আছে। রাক্ষসে-বাঁদরে মিলে কোন্ পক্ষ কি রকম লড়াই করলে, কে কি অস্ত্র নিক্ষেপ করলে, তার কত রকমের নাম কত রকমের বর্ণনা। কার হাত, কার পা, কার গলা কাটা গেল তাও উপেক্ষিত হয়নি। যুদ্ধক্ষেত্রে এ ব্যাপার ছোটও নয়, তুচ্ছও নয় এবং কবির কাছে হয়ত সেকালের লোকেরা ভিড় করতে চেয়েছিল এবং তা পেয়ে অকৃত্রিম আনন্দও উপভোগ করেছিল। কিন্তু আজ সুদূর ব্যবধানে যুদ্ধক্ষেত্রের ও যুদ্ধার্থী বীরগণের যুদ্ধকৌশল অকিঞ্চিৎকর হয়ে গেছে। সাহিত্যের দূরব্যাপী পারস্পেক্টিভ বলতে কি আপনি এই ধরনের জিনিসই ইঙ্গিত করেছেন।

আমি পূর্বে কখনো নাটক লিখিনি। এখন দু-একটা লেখার ইচ্ছে হয়। কিন্তু বাধা বিস্তর। আমার উপন্যাসের বিচার পাঠকসমাজ করেন, তার প্রশস্ত ক্ষেত্র, কিন্তু নাটকের পরীক্ষক কে বোঝা কঠিন। থিয়েটারবালারা না বোকা-দর্শকেরা—কোথায় যে এর হাইকোর্ট তা কেউ জানে না। রামায়ণ, মহাভারত থেকে কিম্বা তেমনি প্রতিষ্ঠিত টড় সাহেবের রাজস্থান থেকে নাটক লিখলে পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়া যায়, কিন্তু আপনার কাছে তাড়া খেতে হয়।” [৩]

‘ষোড়শী’ নাটক নিয়ে সেকালে বিতর্ক না হলেও উত্তরকালে শিবরাম চক্রবর্তী এ বিষয়ে তাঁর বিভিন্ন লেখায় আলোকপাত করেছেন। বিষয়টির পক্ষে-বিপক্ষে একটি সমালোচনাও হয়েছে। দেনাপাওনার নাট্যরূপ হিসেবে ‘ষোড়শী’ বাংলা নাট্যমঞ্চে

কতখানি সাফল্য ও অসাফল্য লাভ করে সেই প্রসঙ্গটি আমাদের আলোচনায় অবশ্যই আসবে। সেদিন ষোড়শীর নাট্যরূপে যেসব শিল্পী। অংশগ্রহণ করেন,

জীবানন্দ	-	শিশিরকুমার ভাদুড়ী
এককড়ি	-	গোপাল ভট্টাচার্য
জনার্দন	-	যোগেশ চৌধুরী।
শিরোমণি	-	অমলেন্দু লাহিড়ী।
প্রফুল্ল	-	রবি রায়।
তারাদাস	-	হরিগোপাল মুখোপাধ্যায়
নির্মল	-	শৈলেন চৌধুরী
সাগর সর্দার	-	মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য
হৈমবতী	-	পদ্মা
ষোড়শী	-	চারুশীলা

নিজের লেখা উপন্যাসের নাট্যরূপের অভিনয় প্রত্যক্ষ করতে শরৎচন্দ্র সশরীরে মঞ্চে একদিন এসেছিলেন। অভিনয় দেখে তিনি অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন এবং নিজের ভালোলাগার কথা একটি চিঠিতে লিখে দেন—‘ষোড়শী অভিনয় একবার মাত্র দেখেছি, বাস্তবিকই শিশির এবং চারুর জীবানন্দ—ষোড়শী অভিনয় দেখবার বস্তু।’ [৪] কেবল নিজের প্রতিক্রিয়া নয়, অপরকেও নাটকটির অভিনয় দেখার জন্য শরৎচন্দ্র অনুরোধ করেছেন। বিশেষ করে স্নেহধন্যা রাধারানী দেবীকে নিজের ভালো লাগার কথা জানিয়ে পত্র লেখেন—‘ষোড়শী বইটা পোড়ো। বোধ হয় তোমার মন্দ লাগবে না। আর অভিনয় দেখবার যদি সময় পাও, সত্যিই খুশি হবে। যদিও শরৎচন্দ্র উপন্যাসের সঙ্গে নাট্যরূপের ‘বিষাদান্তক’ পরিণতিকে মনে-প্রাণে মেনে নিতে পারেননি। শরৎচন্দ্র শেষপর্যন্ত মেনে নিয়েছিলেন নাট্য প্রযোজকের নাট্য সম্পাদনার স্বাধীনতাকে। বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে—শরৎচন্দ্রের উপন্যাস ‘দেনাপাওনা’র নাট্যরূপ শিশিরকুমার ভাদুড়ীর অভিনয় জীবনের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে গেছে যা কেবল রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে নয়, ‘ষোড়শী’র প্রযোজনা শিশিরকুমারের জীবনের একটি স্মরণীয় কীর্তি বলা যায়—একটি mile stone। [৫]

‘ষোড়শী’ বহুবার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছে। শিশিরকুমারের প্রযোজনায় ষোড়শী বহুবার মঞ্চস্থ হয়েছে শ্রীরঙ্গম মঞ্চে । যখনই তিনি নতুন নাটকের অভাববোধ করেছেন তখনই পুরনো নাটকের অভিনয় করেছেন। এই পুরনো নাটকের মধ্যে ষোড়শী অন্যতম। কেননা ষোড়শীর জীবানন্দ শিশিরকুমারের প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্র। আমাদের মনে হয় শিশিরকুমারের অভিনয় জীবনে জীবানন্দ এবং শিশিরকুমার যেন সমার্থক। নাটকের মুখ্য চরিত্র তথা প্রধান চরিত্র জীব নন্দের ভূমিকায় শিশিরকুমারের অভিনয় সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শী বোদ্ধা মানুষের প্রতিক্রিয়া জানা গেছে। ড. শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় বলেছেন, “শিশিরের অভিনয় খোলা বই-এর পাতার মত সহজবোধ্য

হইয়াছে...শিশিরের অভিনীত জীবানন্দকে প্রত্যক্ষ করিয়া তাহা আমাদের নিকট সূর্যালোকবৎ স্পষ্ট হইয়া উঠে।” শিশির পূর্ববর্তী নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী লেখেন জীবানন্দ চরিত্রের সঙ্গে তার অভিনয় যেন মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। সমকালীন ‘নাচঘর’ পত্রিকায় লেখা হয়—“জীবানন্দের ভূমিকায় শিশিরবাবু সত্যিই একটা অদ্ভুত শক্তি পরিচয় দিয়েছে যার কাছে তার প্রথম এযাবৎ শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ‘আলমগীর’ পর্যন্ত ছোট হয়ে গেল।” যথার্থই ‘ষোড়শী’ রঙ্গমঞ্চে কেবল অভিনয়ের জন্যই নয়, মঞ্চ পরিচালনার ক্ষেত্রেও যে অভিনবত্বের দাবি করতে পারে তা ‘নাচঘর’ পত্রিকার বিশ্লেষণে ধরা পড়ে। “দৃশ্যপট আমাদের মনের মত হয়েছে। কোথাও অভিনয়কে বাধা দেয়নি এবং রঙ্গালয়ের দৃশ্যপটের পক্ষে এইটাই হচ্ছে সবচেয়ে প্রশংসার কথা। ...শিল্পীর তুলির মুখে নাটকে গড়চণ্ডী গ্রামখানি যেন চোখের সামনে ছবির মত জেগে উঠেছে।” [৬]

নবযুগ পত্রিকাতেও লেখা হয়-যোড়শীর ঘটনা কিছুমাত্র জমকালো নয়, তার মধ্যে কোন অসম্ভব অস্বাভাবিক কিছু নেই, তার মধ্যে বেশভূষার জাঁকজমক নেই, দৃশ্যপটের আস্ফালন আদৌ নেই, লাঠী ও রিভলবার দেখা যায় বটে কিন্তু সেগুলোও বাঙালীর বক্তৃতার মত দেখতেই উজ্জ্বল অর্থাৎ তাতে ভয়ের কোন কারণ নাই। “খুব লম্বা চওড়া বক্তৃতা নেই ঘন ঘন আর্টিস্টিক Pose লওয়া নেই অভিনেতৃদের মুখে চোখে পুনঃ পুনঃ Lime Light ফেলে দর্শকদের ভড়কে দেবার মত কোন চেষ্টা নেই—অথচ ষোড়শীর অভিনয় যে জমেছিল গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত দর্শকবৃন্দকে অভিভূত করে রেখেছিল-বেদনার রসে তাদের হৃদয় পেয়ালা যে কানায় কানায় উচ্ছ্বসিত হয়েছিল তা প্রায় সবাকার নয়ন কোণে দু-চার ফোঁটা জল এসে প্রমাণ করে দিয়েছিল।’ [৭]

যোড়শী বাংলার পল্লীর নিপুণভাবে অঙ্কিত চিত্র। অথচ এর কোথাও এতটুকু অতিরঞ্জন নেই, আগাগোড়াই সহজ সত্য ও অনাড়ম্বর। অভিনয়েও এই সরলতার স্বচ্ছন্দ সর্বত্র অব্যাহত রাখা হয়েছে। ‘দেনাপাওনা’ উপন্যাস হিসাবে যেমন জনপ্রিয় তেমনি এর নাট্যরূপ, অভিনয় নৈপুণ্য স্মরণীয় হলেও দর্শকমনোরঞ্জনে ব্যর্থ হয়েছিল বলেই মাত্র পনের রজনীর পর আর চলে নি। থিয়েটারে দর্শকের অভাব হলে অভিনয় আর চলেই বা কিভাবে? সেজন্য শিশিরকুমার কোনোরকম ভাবনা চিন্তা না করেই অভিনয় বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। বাংলা নাট্যমঞ্চে দর্শক টানতে ব্যর্থ হলেও ষোড়শীর প্রযোজনা বাংলা নাট্যমঞ্চের ইতিহাসে একটি দিগদর্শনীর ভূমিকা পালন করে গেছে এবং শিশিরকুমারের জীবানন্দের ভূমিকায় বহুকালই নয়, বাংলা নাট্যমঞ্চের ইতিহাসেও তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

‘ষোড়শী’র পর শরৎচন্দ্র ‘পল্লীসমাজ’ এ নিজেই নাট্যরূপ দিয়ে প্রমাণ করেছিলেন নাটক রচনাতেও তিনি সমান পারঙ্গম। শরৎচন্দ্র এর আগে কখনও স্বাধীনভাবে নাটক রচনা করেননি। অর্থাৎ মৌলিক নাটক রচনার প্রতিভা বলতে বোঝায় শরৎচন্দ্রের তা ছিল না। শরৎচন্দ্রের ‘রমা’ নাট্যরূপটি তার প্রমাণ বহন করে।

শরৎবাবুর 'রসা' রচনা করেছিলেন আর্ট থিয়েটারের জন্য। 'রমা' মঞ্চস্থ হয় ১৯২৮-এর ৪ঠা আগস্ট। সেদিন অভিনয়ে যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন তারা হলেন,

বিশ্বেশ্বরী	–	তারাসুন্দরী
বেণী	-	মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য
গোবিন্দ	–	প্রফুল্ল সেনগুপ্ত
আকবর	-	মণিতোষ
রমা	-	নীহারবালা
ভৈরব	-	ননীগোপাল মল্লিক
ধর্মদাস	-	নরেশ ঘোষ

উপন্যাস হিসাবে 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসটির সাহিত্যগুণ নিয়ে কোনো সংশয় নেই। গ্রামসমাজের বাস্তবচিত্রকেই চিত্রায়িত করা হয়েছে। "গ্রাম ভিত্তিক পল্লীসমাজ গল্পটিকে ঘিরে আছে অন্ধ কুসংস্কার, গোঁড়ামি এবং ধর্মান্ধতা। পল্লীবাংলার এমনই এক ঘন পঙ্কিল সমাজে রমা একটি শুভ্র পদ্ম। প্রেমের কাছে আত্মসমর্পণ করলেও রমা সমাজের কঠোর অনুশাসনকে ভাঙতে পারেনি। কিন্তু রমেশকে রমা অস্বীকার করতে পারেনি। এখানে আছে রমার প্রণয়ের সাধনবেগ। সমাজের অনুশাসনের হাতে রমা তিল তিল করে দগ্ধ হয়েছে জ্বালায় যন্ত্রণায় সে তার দেহও মনকে বেঁধে রাখতে পারেনি। আবার বৈধব্যজীবনের নয়। পরাকাষ্ঠার মধ্যে রমা পারেনি অসংযত হতে।" [৮] সব মিলিয়ে শরৎচন্দ্র রমা চরিত্রের মধ্যে দিয়ে প্রেম যে শুধুমাত্র দুগ্ধ শুভ্র ফেন নিভ শয্যায় স্থায়ী না হয়ে কর্তব্যের মধ্যে আলোকিত হয়ে ওঠে'। একথাও প্রচার করতে চেয়েছিলেন উপন্যাসে। "কিন্তু 'রমা'র নাট্যরূপ রঙ্গমঞ্চে কেন যে ব্যর্থ হল, সে প্রসঙ্গে আর্ট থিয়েটারের ব্যর্থতাকেই দায়ী করতে হয়। এ নাট্যরূপটি শিশিরকুমারের ব্যবস্থাপনায় হলে হয়তো 'রমা'র এমন বিপর্যয় ঘটতো না। এছাড়া শরৎচন্দ্র তাঁর লেখায় কারও হস্তক্ষেপ পছন্দ করতেন না। শিশিরবাবু নিজে অভিনয়ের প্রয়োজনে রদ-বদল করতেন সম্পাদনা করতেন, অভিনয় উপযোগী করে তুলতে হলে পরিচালককে যে কিছুটা স্বাধীনতা দিতে হয় শরৎবাবু তা দিতে চাইতেন না। শিশিরবাবু নিজেই বলেছেন—'লেখা একলাইনও উনি (শরৎচন্দ্র) কাটতে দিতেন না।"[৯]

শেষ পর্যন্ত আর্ট থিয়েটারে তীব্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর শরৎবাবু 'রমা' নাট্যরূপটি শিশির ভাদুড়ীর হাতেই সঁপে দেন।

শিশিরকুমার ১৯২৯ সালের আগষ্টে কর্ণওয়ালিশ নাট্যমন্দিরে 'রমা' নতুন করে প্রযোজনার দায়িত্ব নিয়ে 'পল্লীসমাজ' রমার নাট্যরূপে জীবন্ত হয়ে ওঠে। সেদিন চার অঙ্ক বিশিষ্ট ষোলোটি দৃশ্যের নাট্যরূপটিতে অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন,

রমেশ	-	শিশির কুমার ভাদুড়ী
রমা	-	প্রভা দেবী
জ্যাঠাইমা	–	কঙ্কাবতী

গোবিন্দ গাঙ্গুলী – যোগেশ চৌধুরী
ধর্মদাস - অমলেন্দু লাহিড়ী
বেণী ঘোষাল – মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য
আকবর সর্দার – জীবন গঙ্গোপাধ্যায়

আর্ট থিয়েটার সেদিন যা পারেনি, শিশিরকুমার নবনাট্য 'মন্দির'-এ তা করিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। যথার্থই জাত অভিনেতা হিসেবে 'রমা'কে মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করে বাংলা নাট্যমঞ্চকেই যেন ধন্য করেছিলেন। বাংলা উপন্যাস এবং তার নাট্যরূপকে বাংলা নাট্যমঞ্চে দৃঢ় প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে গেছেন।

তথ্যসূত্র:

১. বাংলা মঞ্চে শরৎ সাহিত্যের প্রযোজনায় শিশিরকুমার, ড. জগন্নাথ ঘোষ (২০০১), পৃ. ৪৮
২. প্রাগুক্ত, ৩৯
৩. নিজেরে হারায়ে খুঁজি, ২য় পর্ব (১৩৭৮), পৃ. ১৫০
৪. নবযুগ ৪র্থ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৩৩৪
৫. নাচঘর পত্রিকা, ২৭ শ্রাবণ, ১৩৩৪
৬. নবযুক্ত ৪র্থ বর্ষ ৭ম-৮ম সংখ্যা, ১৩৩৪
৭. শরৎচন্দ্রের ত্রয়ী, সু, কু. মু., পৃ. ৩৩
৮. প্রাগুক্ত
৯. শিশির সান্নিধ্যে, দেবকুমার বসু ও ডা. রবি মিত্র, পৃ. ১৭১

ঐতিহ্যের পরিবর্তন: ‘‘বনপলাশীর পদাবলী’’

রানু বিশ্বাস
সহ অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
দ্বিজেন্দ্রলাল কলেজ, কৃষ্ণনগর

সারসংক্ষেপ(Abstract): ‘ঐতিহ্য’ শব্দটির সাথে মানুষের জাতীর ইতিহাস জড়িয়ে থাকে। মানুষের সভ্যতা, সংস্কৃতির সাথে ঐতিহ্য শব্দটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটি জাতীর পরিচয় হয় মানুষের ঐতিহ্য । এই ঐতিহ্য নানাভাবে পরিবর্তিত হয় – সামাজিকবস্থানের জন্য, জীবিকার জন্য, রাজনৈতিক কারণে। সেই পরিবর্তন পরিবার আর সমাজে ভাঙন এনে দেয়। তখন মানুষ হয়ে পরে নিঃসঙ্গ, একাকী। রমাপদ চৌধুরী ‘বনপলাশীর পদাবলী’ উপন্যাসে গ্রামীণ ঐতিহ্যের ভাঙনের পাশাপাশি মানুষের মনুষ্যত্বের অবমূল্যায়ন দেখিয়েছেন।

সূচক/ মূল শব্দ(Key Word): গ্রামীণ ঐতিহ্য, বনপলাশী, নগরায়ণ, মূল্যবোধ, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা।

মূল আলোচনা(Discussion): রমাপদ চৌধুরী তাঁর বনপলাশির পদাবলী-তে ঐতিহ্যের পুনর্নির্মাণকে ধরতে চেয়েছেন জীবনের পরিসরে। উপন্যাসটা গড়ে উঠেছে কতগুলি খন্ড খন্ড কাহিনীর সমন্বয়ে। উপন্যাসে লেখক আসলে একটা নয়, দুটো বনপলাশির গল্প আমাদের শুনিয়েছেন। একটা বনপলাশি লেখকের সময়ের বাস্তবে, আর একটা বনপলাশি আছে স্মৃতিতে, মানুষের মনে। এই মানুষ, বনপলাশির মানুষ। গিরিজাপ্রসাদ, অট্টামা—এদের প্রত্যেকের মনে আর একটা বনপলাশি অহরহ জেগে থাকে। ঐ বনপলাশির সঙ্গে বর্তমানের বনপলাশিকে তারা সবসময়ই মিলিয়ে নিতে চায়। কিন্তু মেলাতে না পেরে হতাশ হয় এবং এই হতাশ হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। দুটো বনপলাশি দেখানোর উদ্দেশ্যে - প্রসঙ্গে লেখকের নিজের মত ----

“এ উপন্যাসে আমি শুধু গ্রামজীবনকে উপস্থিত করতে চাইনি। চেয়েছিলাম স্বাধীনতা পরবর্তীকালের গ্রামজীবনের পরিবর্তিত ছবিকে পুরোনো দিনের পটভূমির ওপর গড়ে তুলতে”।[১]

উপন্যাসের শুরুতে দেখি, কলকাতায় সারাজীবন কাটিয়ে বৃদ্ধ বয়সে গিরিজাপ্রসাদ তাঁর দুই মেয়ে বিমলা, কমলা , ছেলে অমরেশ ও স্ত্রী নিভাননীকে নিয়ে গ্রামে ফিরে আসেন। বড়ো ছেলে শহরে চাকরি নিয়ে বাসা ভাড়া নিন, সে বাবাকে সাহায্য করতে অনিচ্ছুক হয়। ফলে দুই মেয়ের বিবাহের চিন্তায় এবং ভবিষ্যতের কোন দিশা না পেয়েই গিরিজাপ্রসাদের দেশের বাড়িতে প্রত্যাবর্তন । গ্রামের বাড়িতে পূর্বেই একগাদা সন্তান সহ গিরিন (গিরিজাপ্রসাদের ভাই) ও তার স্ত্রী মোহনপুরের বৌ বাস করত। দুই ভাইয়ের পরিবার এক বাড়িতে বাস করলেও, তাদের মধ্যে ভালোবাসার

কোন টান ছিল না, বরং হিংসা, সন্দেহ, অবিশ্বাস উত্তরোত্তর বেড়েই চলল। নিভাননী ভাবেন, গিরিজাপ্রসাদের আত্মভোলা স্বভাবের জন্য গিরিন তাঁর দাদাকে ঠকিয়ে বেশি ধান ফলাবার জন্য হাস্কিং মেশিন কিনে ফেলেন। অন্যদিকে গিরিন ভাবে, যেহেতু সে চাষা, অশিক্ষিত মানুষ, তাই দাদা ও তার শিক্ষিত ছেলে- মেয়েরা তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে সর্বক্ষণ অপমান করার জন্য মুখিয়ে আছে। এই ভাবনা থেকেই একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙন শুরু, লেখক বাঙালির প্রাচীন ঐতিহ্যকে এখানে রূপ দিয়েছেন।

উপন্যাস শুরু হয়েছে রিটায়ার্ড হেডমাস্টার গিরিজাপ্রসাদের গ্রামের প্রবেশের মধ্য দিয়ে আর উপন্যাস শেষ হয়েছে গিরিজাপ্রসাদের প্রস্থানের মধ্য দিয়ে। গ্রামের প্রবেশের সময় আত্মঅহমিকাপূর্ণ গিরিজাপ্রসাদের সন্মান উপন্যাসের শেষে ধূলায় মিশে যায়। তিনি ভেবেছিলেন গ্রাম – শহর পরিবর্তিত হয়েছে। আসলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, স্বাধীনতার পরবর্তী অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে গ্রাম শহরের প্রেক্ষাপট অপেক্ষা মানুষ বেশী পরিবর্তিত হয়েছে। গিরিজাপ্রসাদ যখন স্কুলের গন্ডী পেরিয়ে শহরে যেতে চায় তখন তার মনে স্বপ্ন জাগে যে, সে গড়ের মাঠ দেখাবে, যে গড়ের মাঠের সামনে গোরা পল্টনরা ঘোড়ায় চড়ে কুচকাওয়াজ করে। সে ঘোড়ায় টানা টান দেখবে, হাওড়ার ব্রিজ দেখবে, রাস্তার ধারের গ্যাসবাতির জ্বলা দেখবে, যে গ্যাসবাতির আলো হারিকেন লণ্ঠনের আলোর থেকে অনেক উজ্জ্বল।

গিরিজামোহনের স্বপ্নের চোখ দিয়ে যখন তথ্যগুলো পাঠকের কাছে আসে তখন একটা সময়ের আন্দাজ পাওয়া যায়। সেই সময়টা স্বাধীনতার পূর্ববর্তী, তখনও ইলেকট্রিক ট্রাম আসেনি, বিদ্যুতের ব্যবহার শুরু হয়নি। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বরের আগে বিদ্যুতচালিত ট্রাম কলকাতায় চলেনি। তাই গিরিজাপ্রসাদের শৈশবোত্তীর্ণ সদ্য কৈশোরকালটা অনায়াসেই বিংশ শতকের প্রথম থেকে দ্বিতীয় দশকের মধ্যে এটা ধরে নেওয়া যায়। এই টাইন ক্লেমটা যেখানে এসে দাঁড়ি টেনে দিচ্ছে সেটা স্পষ্ট হয়েছে উপন্যাসের একেবারে গোড়াতেই গিরিজাপ্রসাদ যখন গ্রামে কিরছেন অনেকদিন পর, তখন যতে কোটাল আর গিরিজাপ্রসাদের কথোপকথনে। সদ্য স্বাধীনতা পাওয়া ভারতবর্ষের নানা প্রশাসনিক ব্যর্থতা আর অসামঞ্জস্যের অভিযোগের মধ্য থেকেই সময়ের পরিচয়টা পাওয়া যায়। পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকে ভারত সরকারের বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অপূর্ণাঙ্গ রূপায়ণের ছবিটাই এখানে বড়ো হয়ে উঠেছে। এই নগরায়নের বর্তমান ছবির শুরুর দিকের গল্পটাই বনপলাশির পদাবলীর কাহিনী। সময়ের হিসাবটা খুব অল্প কয়েকটা কথায় বুনে দেওয়া আছে উপন্যাসের বরনের মধ্যেই।

গিরিজাপ্রসাদ চাকরিজীবন থেকে অবসর নিয়ে গ্রামে ফিরে তার শৈশবের গ্রামটাকেই ফিরে পেতে চায়। কিন্তু নগরায়ণের অনেকগুলো চিহ্ন তার চোখে পড়ে। ডি.ভি.সি.-র ইলেকট্রিক তারের সারি সারি ধাম দেখে ভেবেছেন গ্রামের মানুষের জীবন

থেকে অন্ধকার দূরে সরে গেছে; ক্যানেল দেখে ভেবেছেন গ্রামের চাষীদের জলের চাহিদা পূরণ হয়েছে। কিন্তু সবকটা ছবিই প্রায় পরিহাসের মত গিরিজাপ্রসাদের কানে বেজেছে যখন যতে কোটাল তার ব্যবহারযোগ্যতা নিয়ে ব্যঙ্গের হাসি হেসেছে।

নগরায়ণের যেটুকু ছবি এই বনপলাশির মধ্যে আমরা পেয়েছি সেটা শুধু আরও বড়ো একটা পরিবর্তনের গোড়ার কথা। এই পরিবর্তনটা শুধু বাইরে হয়নি, হয়েছিল মানুষের মনে। নগর বা গ্রামের ধারণাটা আসলে যতটা না বাইরের তার চেয়ে অনেক বেশি মনের। মনে মনে নগরের স্বাচ্ছন্দ্যের জাল বুনতে থাকা গ্রামের মানুষের মানসিক দ্বন্দ্বটাই শেষপর্যন্ত এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে উপন্যাসে নগরায়নের সুপ্রভাব দেখানো হয়েছে কিছু অংশে। স্বাধীনতার পূর্বে নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি ছিল না। কিন্তু বিশ শতকে মানুষ পূর্বের চেয়ে বেশী শিক্ষিত হয়েছিল, ফলে চেতনার জাগরণ ঘটে। এই চেতনা বর্ণভেদ প্রথা বা সামাজিক কুসংস্কার বিরোধ করে। গিরিজার পূর্বেও উপন্যাসে আরেক জন শিক্ষার ক্ষেত্রে গৃহত্যাগ করেন – ব্রজমোহন তাঁর স্ত্রী অষ্টভুজাকে খুবই ভালোবাসতেন, গিরিজা ছেলেবেলা থেকে জেনেছেন, অট্টামাকে নিয়ে তাঁর স্বামী ঘর করেন না। কিন্তু গিরিজাপ্রসাদ পরে প্রকৃত ঘটনা জানতে পারেন---- "সম্পত্তির লোভে ব্রজমোহনের দ্বিতীয় বিবাহের ব্যবস্থা করেছিলেন কালীমোহন। বিবাহের দিন পর্যন্ত স্থির হয়ে গিয়েছিল"[২]। ব্রজমোহন কাকা বহুবিবাহে বিরোধী ছিলেন। কিন্তু দাদার সংসারে থেকে দাদার মতের বিপক্ষে যেতে পারেননি। তাই তিনি কলকাতায় গিয়ে খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, কিভাবে বংশগরিমা, প্রথার চেয়ে মানুষ বড়ো হয়ে উঠেছে। মানুষের গুরুত্ব বুঝেই তিনি গিরিজাপ্রসাদের অট্টামাকে ফেলে দ্বিতীয় বিবাহ কুরতে চাননি। কিন্তু, অট্টামা স্বামীর অনুরোধ মানতে পারেননি, তিনি ভাশুরের সংসারে চিরকাল থেকে গিয়েছিলেন। সমাজ কি বলবে বা লোকে কি বলবে --- এই চিন্তায় তিনি সর্বদা ভীত ছিলেন। তাই ধর্মান্তরিত স্বামীর সাথে তিনি কোনদিন সংসার করতে পারেননি।

অথচ উপন্যাসের শেষে এই অট্টামার মানসিকতার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। উপন্যাসে দামুদার বোন রেণুর বিবাহ টাকার অভাবে ভেঙে যায়। পাত্রপক্ষের সেই অপমানে রেণু- দামুর মা মারা যান। বনপলাশীতে দামু সখের যাত্রা করলেও, সুখের আশায় সে কলকাতায় দোকানঘর নেয়। গ্রাম থেকে বেড়িয়ে তাদের সংস্কারগত বাধা ভেঙে যায়। রেণুর বিবাহ ঘটে মুসলিম ছেলের সাথে। গ্রামবাসীর চোখে তা দৃষ্টি কটু হলেও অট্টামার কাছে "...তা আজকাল তো আকছার হচ্ছে...দোষ কিছুতেই নাই রে। কোন কিছুতেই নাই। কত দেখলাম, আর কত দেখবো..."[৩]। একই মানসিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে মোহনপুরের বৌ এর মধ্যে। তিনি টিয়াকে পুকুরঘাটে একা ছাড়তেন না লোকনিন্দার ভয়ে, অথচ তিনিই টিয়ার সাথে প্রভাকরের বিবাহ ভেঙে দেন। কারণ তিনি জানতে পেরেছিলেন, প্রভাকরের সাথে বিমলার সম্পর্ক, তাই বিবাহ নামক সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে তিনি গুরুত্ব দিতে চাননি। তিনি দুঃখিত টিয়াকে এই বিবাহ

সম্পর্ক থেকে বার করে এনেছেন। এখানেই এক অশিক্ষিত নারীর মূল্যবোধ প্রকাশ পেয়েছে। সমাজ থেকে ব্যক্তির মূল্যবোধ বেশী গুরুত্ব পেয়েছে এই উপন্যাসে। স্বাধীন দেশে মানুষ তাঁর সংস্কার থেকে বেড়িয়ে আসতে পেরেছিল অবশেষে।

উপন্যাসে গ্রাম ছেড়ে শহরে যাওয়ার ট্র্যাডিশনের পাশাপাশি শিক্ষার চেতনার একটি ধারা এখানে দেখানো হয়েছে। গিরিজাপতির মেয়েরা শিক্ষিত, বড়ো ছেলে পড়াশোনা শিখে অফিসে চাকরি করে, ছোটো ছেলে অমরেশ হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করেন। এই শিক্ষার জোরেই টিয়ার বাবা গিরিন বরপণের টাকা জোগাড় করলেও বি ডি ও প্রভাকর শিক্ষিত বিমলাকেই পছন্দ করেন। শুধু বিবাহের ক্ষেত্রেই নয়, কর্ম সংস্থানেও মেয়েদের অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। দামুর বোন রেণু নার্সিং ট্রেনিং নিতে চেয়েছে, সংসারের প্রয়োজনে। এখানে আমরা ঐতিহ্যের পুনর্নির্মাণ দেখিয়েছেন।

বনপলাশীর অর্থনৈতিক বিবর্তন পাঠকের চোখে পরে – এখানেও পরিবারের জীবিকার কৌলিন্যে যে ঐতিহ্য ছিল, তা সমকালে মানুষের চাহিদায় পরিবর্তিত হয়। গিরিজাপ্রসাদের আবাল্য বন্ধু বংশীর ছেলে উদাসের মধ্যে পরিবর্তন দেখা যায়। এখানেও উপন্যাসের কাহিনীতে আমরা সমকালীন প্রভাব লক্ষ্য করি। সে কোনভাবেই বাবার জীবিকা বাগানের পেশাকে মন থেকে মেনে নিতে পারেননি, সে শহরের বাবু হতে চেয়েছিল। তাই ড্রাইভারি শেখার নেশায় সে কাটোয়া শহরে চলে যায়। বাবার সাথে ঝগড়া করে সে লক্ষ্মীকে বিয়ে করে, যদিও তাঁর দাম্পত্য জীবন সুখের ছিল না। লক্ষ্মী আত্মহত্যা করলে পদ্মাকে নিয়ে সে কাটোয়ায় ঘর বাঁধে, ব্যক্তিগত জীবন তাঁর দুঃখের হলেও, সে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েছিল।

অর্থনীতি একদিকে যেমন সামাজিক ব্যবধান তৈরি করে, তেমনি শ্রেণী বিন্যাস তৈরি করে। গ্রামীণ ঐতিহ্যে এর প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ। উপন্যাসে আমরা দেখি, অবনীমোহন ও গিরিজাপ্রসাদ ছেলেবেলার বন্ধু ছিল, একদা অর্থের অভাবে অবনীমোহন ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বসতে পারছিল না, তখন গিরিজাপ্রসাদের বাবার অর্থানুকূল্যে সেই বছর অবনি পাস করে। কিন্তু সে পরবর্তীকালে শহরে বিভিন্ন কারবারে অধিক উপার্জন করেন। যদিও সেগুলি কোনটাই সদুপায়ে নয়, কিন্তু গ্রামের লোক তাঁকে খুব মান্যিগণ্যি করেন। একসময় শোনা যায়, অবনীমোহন গ্রামের স্কুলের জন্য পাঁচ হাজার টাকা দেবে, বিনিময়ে সে ভোটে দাঁড়াতে চায়, গ্রামের লোক এতে খুশীই হয়। কারণ, তাঁদের মতে "তা টাকার জোর আছে, দাঁড়াবে না ক্যানে"[৪]। যদিও অবিনাশ ডাক্তার প্রতিবাদ করেছিলেন "ইলেকশান কি ছেলেখেলা নাকি? কার টাকা আছে, ফেলে দিয়ে সুনাম কিনবে? পাঁচটা দিন গ্রামে থাকে না, গ্রামের দুঃখ দুর্দশার ভাগ নেয় না..."[৫] কিন্তু তাঁর প্রতিবাদ জনসমুদ্রে বুদবুদ হয়ে মিশে যায়। গ্রামীণ মানুষের পারস্পরিক বিশ্বাস, আস্থা এক নিমিষেই অর্থের কৌলিন্যের কাছে ফুৎকারে বাস্পীভূত হয়ে যায়।

উপন্যাসের নামকরণের মধ্যে 'পদাবলী' শব্দটি প্রয়োগ করে লেখক আমাদেরকে চমকে দিয়েছে। গিরিজাপ্রসাদের ছেলেবেলায় এক বোষ্টোমীকে ঘিরে উপন্যাস আবর্তিত হয়েছে, যদিও উপন্যাসে শেষে সেই বৈষ্ণবী হারিয়ে গেছে লেখকের কথার অন্তরালে। অর্থাৎ আমাদের ঐতিহ্যের মৃত্যু ঘটেছে – মোহন্তের মঠ ক্রমশ একাকী, নির্জন হতে হতে বন জঙ্গলে ভরে যায়। নগরায়ণের মানসিকতা আমাদের মন থেকে প্রাচীন ঐতিহ্যকে মুছে ফেলে। একই রকম 'টিকলী' গয়নাটি হাতবদল ঘটে উপন্যাসে। দামুর বোণে রেণুর বিবাহ ভেঙে যাওয়ায়, সে গয়নাটি টিয়াকে দিয়ে যায়, আবার টিয়ার বিবাহ ভেঙে গেলে সে গয়নাটি বিমলাকে উপহার দেয়। এক গ্রাম্য অশিক্ষিত মেয়ের কাছে থেকে বিবাহের ঐতিহ্য এক শহুরে মেয়ের কাছে চলে যায়। প্রেমের অভিব্যক্তির জন্য নারী শিক্ষার প্রয়োজন, টিকলি তাই বিমলার সম্পত্তি হয়। টিকলি এখানে প্রতিকায়িত হয়েছে শিক্ষায়। 'বনপলাশীর পদাবলী' উপন্যাসে সমগ্র ছত্রে আমরা গ্রামীণ ঐতিহ্যের অবলুপ্তি লক্ষ্য করি।

গ্রন্থপঞ্জী (Refference):

১)	চৌধুরী রমাপদ, উপন্যাসসমগ্র (৪র্থ খন্ড), 'প্রসঙ্গকথা' আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারী, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা – ৫১৯-৫২০

২)	চৌধুরী রমাপদ, বনপলাশীর পদাবলী, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯২, পৃষ্ঠা- ১২০

৩)	তদেব পৃষ্ঠা - ২৩০

৪)	তদেব পৃষ্ঠা - ১৮৯

৫)	তদেব ।

বাংলার কৃষক ও স্যার আজিজুল হক

মৃত্যুঞ্জয় পাল
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
শিবনাথ শাস্ত্রী কলেজ, কলকাতা

সারসংক্ষেপ : বাংলার পল্লী অঞ্চলের অধিবাসীদের অধিকাংশই কৃষিজীবী এবং কৃষির উপরই এই প্রদেশের সামগ্রিক কল্যাণ নির্ভরশীল। আজিজুল হক দেখিয়েছেন যে, খামারের আয়তন ছোট এবং জমির একর প্রতি ফলন কম হওয়ায় কৃষকদের আয়ের থেকে ব্যয় ছিল বেশি। এ কারণে কৃষককে মহাজনের কাছে যেতে হয় এবং এই সুযোগে মহাজন তাকে যতটা সম্ভব শোষণ করে। কৃষকের আর্থিক অবস্থা আরও খারাপ হয় যখন মহাজনেরা বর্ধিত হারে কর ও বিভিন্ন প্রকার আবওয়াব আদায় করে। বাংলার প্রজাবর্গ অর্থনৈতিক অনাচারসহ নানা প্রকার অত্যাচার সহ্য করেছে। উর্বর জমি ও বহুবিধ প্রাকৃতিক সুবিধা থাকা সত্ত্বেও বাংলার কঠোর পরিশ্রমী কৃষকেরা দু'বেলা পেট ভরে খেতে পায় না কেন ? দেনার দায়ে সে জর্জরিত থাকে কেন ? কেনই-বা সে সর্বদা প্রতিকূল পরিবেশের শিকার হয় ? চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের ফলে কৃষকদের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে পড়ে। কৃষকদের অবস্থার উন্নতিকল্পে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আইন পাশ হলেও তাদের অবস্থার কি কোন পরিবর্তন হয়েছিল ? শেষ পর্যন্ত দেখা যায় কৃষকেরা হতাশ হয়ে জমি ত্যাগ করে ভূমিহীন মজুরে পরিণত হয়। ধৈর্যের প্রতীক বলে পরিগণিত দেশের গৌরব কৃষকের অস্তিত্ব লোপ পায়, কৃষির অবনতি ঘটে, সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং শেষ পর্যন্ত সমগ্র সামাজিক কাঠামোই ভেঙে যায়।

সূচক শব্দ : স্যার আজিজুল হক, কৃষক, মহাজন, ঋণ, কৃষিকাজ, ইন্ডিয়ান স্ট্যাটুটরি কমিশন, ব্যাংকিং এনকোয়ারি কমিটি, আবওয়াব

বাংলার পল্লী অঞ্চলের অধিবাসীদের অধিকাংশই কৃষিজীবী এবং কৃষির উপরই এই প্রদেশের সামগ্রিক কল্যাণ নির্ভর করে। [১] সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বহুদিন আগেই লিখে গিয়েছেন বাংলা সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা। গঙ্গা আর ব্রহ্মপুত্রের পলি থেকে যার সৃষ্টি সে যে সুজলা সুফলা হবে সেটাই স্বাভাবিক। বাংলার এত সৌন্দর্যের মূল কারণই হল কৃষি। কৃষিই হল তার প্রধান সম্পদ এবং কৃষি প্রধান দেশ বলেই বাংলার এত সুনাম। এই সমৃদ্ধিতে হিন্দু-মুসলিম সকলেরই অবদান ছিল। এই কৃষির জন্য বাংলার সমৃদ্ধি দিন দিন বেড়েছিল। কিন্তু সেই কৃষির অবনমনের ফলেই আজ সমগ্র বাংলার বিপত্তি। যেহেতু বাংলা কৃষি প্রধান এবং কৃষির সঙ্গেই সমস্ত কিছু জড়িত সেহেতু কৃষির অবনতির সঙ্গে সঙ্গে বাংলার সমস্ত পেশাজীবীর সামগ্রিকভাবে অবনমন ঘটেছে। [২]

সমগ্র বাংলা এখনও কৃষি প্রধান এবং কৃষির উপরই বাংলার ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল। যাইহোক বাংলার কৃষির বর্তমান কি অবস্থা হয়েছে আর কিভাবে উন্নতি হবে – সে বিষয়ে আলোচনার পূর্বে আগে কি কারণে বাংলার কৃষির এত সমৃদ্ধি ছিল সেটা একটু আলোচনার প্রয়োজন।

বাংলার অবস্থার বিচার-বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বাংলার অবস্থা সম্পূর্ণ অন্যরকম ছিল। বাংলার অভ্যন্তরীণ ব্যবসা ছিল অত্যন্ত স্বল্প। বাংলার গ্রামগুলি পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল ছিল। ফলে খুব সহজেই তাদের সমস্যা মিটে যেত। এছাড়া জানা যায় বাংলার প্রচুর আন্তর্জাতিক ব্যবসা ছিল। সে সময় বাংলায় চাষাবাদের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য কুটিরশিল্প ছিল। তাছাড়া বর্তমানে যেমন নানারকম সমস্যা বিদ্যমান, তখন সেসব সমস্যা ছিল না। সহজ, সরল গ্রাম্যজীবনের দিন আর নেই। সেই জায়গায় নানারকম সমস্যা জর্জরিত শহুরে জীবনযাপন পদ্ধতি গ্রামে প্রবেশ করেছে। বাংলার চাষীর সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাওয়ার মূলে ছিল তার সহজ, সরল অল্পব্যয়সাধ্য জীবনযাপন পদ্ধতি। পূর্বে বাংলায় প্রত্যেক বছর নদীতে এত প্লাবন হত যে তার ফলে চাষের জমির উপরে পলিমাটি পড়ে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি ঘটাত। বর্তমানে আওহাওয়ার খামখেয়ালীপনায় প্লাবন তো দূরের কথা, নদীগুলোতে পর্যাপ্ত পরিমাণ জলও থাকে না। কিন্তু আগে এতসব অসুবিধা না থাকার জন্য জমির উর্বরতা বেশি ছিল। সেইসূত্রে চাষী যথেষ্ট লাভবানও হত। তাছাড়া বর্তমানের জটিল জীবনযাপন পদ্ধতির তুলনায় তখন দেশে একটি নিবিড় শান্তি বিরাজ করত। সহজ, সরল গ্রামবাসীদের জীবনে আনন্দ ছিল। দেশের নানা সমস্যা থেকে তারা দূরে থাকত। তারা তাদের সাধ্যমত জীবনযাপন করত।[৩]

গ্রাম্য অর্থনীতির আলোচনা প্রসঙ্গে অনিবার্যভাবেই জমির সমস্যার কথা আলোচনা করতে হয়। নদী-মাতৃক বাংলায় যে কোনদিন জমির সমস্যা দেখা দেবে তা বোধহয় কেউ কোনদিন ভাবতে পারেননি। বাংলার ক্ষেত্রে তা আরও বেশি সত্য, কারণ বাংলায় সরকারের পাওনা রাজস্বের পরিমাণ নির্দিষ্ট ছিল। মানুষ জমির উপর বাস করে এবং জমিতে যা উৎপন্ন হয় তা দিয়েই জীবন অতিবাহিত করে। তাই বলা যায় মানুষের সাথে জমির এই যে সম্পর্ক তা সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসে এক চিরকালীন সমস্যা। জমির উৎপন্ন দ্রব্য ছাড়া মানুষ ও পশুর জীবনধারণ একেবারে অসম্ভব। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ক্ষেত্রে একথা আরও বেশি সত্যি, কারণ সেখানে কৃষিই হচ্ছে সমগ্র অর্থনীতির একমাত্র ভিত্তি। সুতরাং যে দেশের জনসংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে, এবং যেখানকার মানুষ বিভিন্ন কারণে নিজের ভিটেমাটি আঁকড়ে পড়ে থাকতে চায়, সেখানে এই সমস্যা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। যেখানে কল-কারখানা গড়ে ওঠেনি বা কর্মসংস্থানের অন্যান্য সুযোগ সৃষ্টি হয়নি, সেখানকার মানুষদের সামনে নানা সমস্যা উপস্থাপিত হয়। মানুষের উন্নতি-অবনতি অর্থাৎ মানুষের অস্তিত্বই যেখানে জমির উপর নির্ভরশীল সেখানে জমির প্রশ্নটি তাই মানুষের অস্তিত্বের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায় এবং মানবজীবনের

অন্যতম সমস্যায় পরিণত হয়। জমির উৎপাদনমূলক অর্থনীতির একটি অপরিহার্য অঙ্গ হল ভূমিব্যবস্থা এবং জমি বন্দোবস্তের প্রকৃতিও ততধিক গুরুত্বপূর্ণ। কৃষক যদি তার জমি থেকে জীবনধারণের উপযোগী রসদ সংগ্রহ করতে না পারে, পরিশ্রমের মজুরি যদি না পায় তাহলে জমিসংক্রান্ত কোনো ব্যবস্থা বেশিদিন টিকে থাকতে পারে না। এইরূপ অবস্থায় কৃষকেরা জমি ছেড়ে দিয়ে ভূমিহীন মজুরে পরিণত হয়। ফলস্বরূপ যাদের এতদিন ধৈর্যের প্রতীক বলে মনে করা হত সেই কৃষকদের অস্তিত্ব লোপ পায়, কৃষির অবনতি ঘটে এবং শেষ পর্যন্ত সমগ্র সামাজিক কাঠামোই ভেঙে যায়। [৪]

সামান্য একটু জমিই বাংলার দরিদ্র কৃষকদের একমাত্র ভরসা। সেই জমির উপরই তার সারা বছরের জীবিকা নির্ভর করে। বর্তমানে কৃষিক্ষেত্রে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ও উন্নতি হয়েছে তা তাদের খুব একটা স্পর্শ করেনি। ফলে চাষীদের অবস্থা গরিব থেকে গরিবতর হয়েছে। তাছাড়া তাদের কৃষি কাজের পদ্ধতিও অতি প্রাচীন। অন্যদিকে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি, ব্যবসা বাণিজ্যের অভাবে জমির উপর চাপ বেড়ে যায়। সেজন্য জমির অভাব দেখা দেয়। এর থেকে যা আয় হয় তা দিয়ে চাষী ও তার পরিবারের ঠিকমত ভরণ-পোষণ হয় না। ফলস্বরূপ চাষীরা ঋণ নিতে বাধ্য হয়। সুদের হার অত্যন্ত বেশি এবং একবার ঋণ নিলে তার জীবনে সেই ঋণ আর শোধ হয় না। এক্ষেত্রে তারা মহাজনদের অত্যাচারের শিকার হয়। প্রাচীন কৃষিপ্রথা, জটিল জমি-সংক্রান্ত আইন, মধ্যস্বত্বভোগীর সংখ্যাবৃদ্ধি, খাজনার উচ্চহার, ঋণগ্রস্ততা ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় ইত্যাদির ফলে বাংলার কৃষকের অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে পড়েছে। [৫]

কৃষি-ব্যবস্থা ও কৃষকের বিপর্যস্ত অবস্থার অনিবার্য পরিণতি দাঁড়ায় কৃষকের উত্তরোত্তর ঋণগ্রস্ততায়। [৬] ঋণের বোঝা বাংলার কৃষকের এক গুরুতর সমস্যা। অবশ্য এই সমস্যা শুধুমাত্র বাংলারই বৈশিষ্ট্য নয়। দুনিয়ার সর্বত্র পল্লীজীবনে কমবেশি এই সমস্যা বিদ্যমান। [৭] ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটুটরি কমিশনের রিপোর্টে দেখা যায় অধিকাংশ কৃষকই ঋণগ্রস্ত বিশেষত মহাজনদের কাছে। ঋণের বোঝা বাড়তে থাকায় কৃষকদের জমি মহাজনদের কাছে চলে যায়। ফলস্বরূপ বর্গাদার ও অধীনস্থ রায়তের সংখ্যা বাড়তে থাকে। [৮] বাংলায় কৃষকের ঋণের মোট পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য একাধিকবার চেষ্টা করা হয়েছে। মেজর জে. সি. জ্যাক, আই. সি. এস. সর্বপ্রথম এই সমস্যাটির প্রতি নজর দেন। পরবর্তীতে মি. অ্যাসকোলি এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত তথ্য দিয়েছেন। এক্ষেত্রে সম্ভবত ব্যাংকিং এনকোয়ারি কমিটির রিপোর্টই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য। এই রিপোর্ট অনুসারে বাংলার কৃষকদের ঋণের মোট পরিমাণ ১০০ কোটি টাকা (১৯৩৩ সালের একটি জরিপের হিসাবে দেখা যায় যে, বকেয়া সুদ ব্যতীত মোট ঋণের পরিমাণ ছিল ৯৬ কোটি টাকা) এবং পরিবার প্রতি ১৬০ টাকা। ১৯২৮-২৯ সালে বিভিন্ন প্রদেশের ব্যাংকিং এনকোয়ারি কমিটির রিপোর্ট থেকে ভারতের বিভিন্ন

প্রদেশের কৃষকের ঋণ সম্পর্কে যে বিবরণ পাওয়া যায় তা নিচের সারণীতে দেখানো হল:

কৃষকের ঋণ

প্রদেশ	মোট ঋণ কোটি টাকার হিসাবে	পরিবারপ্রতি ঋণের পরিমাণ টাকা
বোম্বাই (সিন্ধুসহ)	৮১	৩২৯
মাদ্রাজ	১৫০	১৯
বাংলাদেশ	১০০	১৬০
যুক্তপ্রদেশ	১২৪	---------
পাঞ্জাব	১৩৫	১০৪ (মাথাপ্রতি)
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	৩৬.৫	২২৭
বিহার ও উড়িষ্যা	১৫৫	----------
আসাম	২২	২৪২

উৎস: M. Azizul Haque, The Man Behind The Plough, Calcutta: The Book Company. Ltd., 1939, p. 154

এই পরিসংখ্যান থেকে বলা যায় যে, বাংলার কৃষকদের অবস্থা খুব একটা খারাপ নয়, আবার ভালোও নয়। তবে যেটা স্মরণযোগ্য তা হল বাংলায় একর প্রতি উৎপাদন অনেক কম। তাছাড়া বাংলার লোকবসতি সবচেয়ে ঘন। তবে যেটা বলা দরকার তা হল বর্তমানে এই ঋণের বোঝা অনেক বেশি।

ধার করা ছাড়া কৃষকের কি আর কোন উপায় নেই ? উত্তরে বলা যায় কৃষককে অবশ্যই ধার করতে হয়। ফসল বিক্রি না হওয়া পর্যন্ত তাকে ধার করেই জীবনধারণ থাকতে হয়। কারণ তার কোন আর্থিক স্বচ্ছলতা নেই। [৯] ফলে চাষাবাদ ও পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য ধার না করে তার উপায় থাকে না। এখন প্রশ্ন হল চাষীরা কিসের জন্য এত টাকা ধার করে ? উত্তরে বলা যায় যে, তারা এত দরিদ্র যে ঋণ করতে তারা বাধ্য হয়। যে বছর ভালো ফসল হয় সে বছর তারা প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি কিনতে সক্ষম হয়। কিন্তু মোটের উপর দেখা যায় যে, ভালো বছর খুব কমই আসে। [১০] এছাড়া আবাদের অনিশ্চয়তা, দারিদ্র্য, কৃষকের ভগ্নস্বাস্থ্য, পৈতৃক ঋণ, অদূরদর্শিতা ও অপব্যয়, মহাজনদের চতুর কৌশল, ঘাটতি বাজেট ইত্যাদিকেও কৃষকদের ঋণগ্রস্ত হওয়ার কারণ বলে মনে করা হয়। [১১]

বাংলায় কৃষিকার্যের সাফল্য প্রধানত যথাসময়ে ও যথা পরিমাণে বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল। বৃষ্টিপাতে অনিয়ম ও অন্যান্য দুর্যোগে প্রায়ই এখানকার আবাদ বিপর্যস্ত হয়। বন্যা, অতিবৃষ্টি, অসময়ে বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, প্রভৃতিতে যেমন ফসল মারা যায়, তেমনি স্বল্পবৃষ্টি, অকালে বর্ষা সমাপ্তি, অসম বৃষ্টি, খরা, অনাবৃষ্টি, প্রভৃতিতে কৃষকের ভাগ্যে বিপর্যয় নেমে আসে। এইসব কারণে কৃষক যতই পরিশ্রমী, উদ্যোগী ও সুদক্ষ হোক না কেন, কৃষিকার্য তার পক্ষে সর্বদাই বিরাট বিপদের ঝুঁকি হয়ে দাঁড়ায়। [১২] বাঙালি কৃষকের জীবন তার পশু সম্পদের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু দুঃখের বিষয় ওজন, আকার ও শক্তিতে এই প্রদেশের পশু সম্পদের মারাত্মক অবনতি হয়েছে। [১৩]

১৭৯৩ সাল থেকে আবওয়াব বে-আইনি ছিল। কিন্তু আজিজুল হকের মতে, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেও বাংলার সর্বত্রই আবওয়াব আদায় চলতে থাকে। প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে যথেষ্ট দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখা যায়। এমনকি দেখা যায় ১৯৩৬-৩৭ সালেও এই অবৈধ অর্থ আদায় বন্ধ হয়নি। [১৪] এছাড়া যে সমস্ত সমস্যা বাংলার সব জেলাতেই দেখা দিয়েছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় সমস্যা হল বাংলার চাষের অনুন্নত অবস্থা। এখানকার জমিতে অত্যন্ত সামান্য ফসল হয়। এর জন্য প্রধানত অবৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষকেই দায়ী করা হয়। [১৫] এছাড়া আরও নানা সমস্যার কথা বলা যেতে পারে। যেমন – লোকসংখ্যা বৃদ্ধি, আবাদি জমি হ্রাস, জন্ম ও মৃত্যুর উচ্চহার, প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার অভাব, দারিদ্রজনিত অনাহার, ও অর্ধাহার, দ্বিতীয় বস্ত্রের সংস্থান করতে না পাড়ায় ছিঁড়ে না যাওয়া পর্যন্ত একই বস্ত্র পরিধান, পুষ্টিকর খাদ্য ও উপযুক্ত চিকিৎসার অভাব এবং নিরক্ষরতা। [১৬]

বাংলার কৃষকদের অবস্থা এতই খারাপ যে অনেকের মতে তাদের উন্নতির আর কোন আশাই নেই। অবস্থা পরিবর্তনের কোন সম্ভাবনা থাকলেও তা সুদূর পরাহত এবং যে সমস্ত প্রতিকূল অবস্থা উন্নতির পথে বাধাস্বরূপ সেগুলিকে দূর করা অত্যন্ত কঠিন। এ বিষয়ে যাঁরা অনবরত চিন্তাভাবনা করেছেন তাঁদের কাছেও ভবিষ্যৎ অন্ধকার বলেই মনে হয়। কিন্তু অবস্থা যতই খারাপ হোক উন্নতির যথেষ্ট সম্ভাবনা দেখেছেন স্যার আজিজুল হক। এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে কৃষক তথা চাষীরা খাওয়া পড়ার পাশাপাশি শিক্ষায় ও আনন্দে উন্নত ধরণের জীবনধারণ করতেও সক্ষম হবে। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন না হলে কোনও উন্নতি সম্ভব নয়। আজিজুল হকের মতে যারা জমি চাষ করে একমাত্র তাদের হাতেই জমির স্বত্ব সমর্পণ, দেশে বিস্তৃতভাবে শিল্প সংস্থাপন, কৃষিতে সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞানের প্রয়োগ ইত্যাদি উপায়গুলি যদি গ্রহণ করা হয় তবেই এদেশের চাষের ও চাষীর উন্নতি সম্ভব। [১৭]

চাষীদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার একান্ত অপরিহার্য। বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষাই খুব বেশি প্রয়োজন। কিন্তু সে শিক্ষা যে কেবলমাত্র পুঁথিগত শিক্ষাই হতে হবে এমন

কোন কথা নেই। বাংলায় পুঁথিগত শিক্ষা যে পরিমাণে হয় সেই পরিমাণে হাতে কলমে হয় না।[১৮]

অর্থনৈতিক বিপর্যয় প্রতিরোধের জন্য কোন সুস্পষ্ট বা সুনির্দিষ্ট পথ নেই। তবে বাংলার ক্ষেত্রে আরও বেশি পরিমাণে ও সংখ্যায় অপ্রধান ও অর্থকরী ফসলের আবাদ করে কৃষির বুনিয়াদ সম্প্রসারণ করা হলে অর্থনৈতিক মন্দা প্রতিরোধ করা সহজ হবে। প্রত্যেকটি বিপর্যয়ের মধ্যে ভবিষ্যতের জন্য একটি শিক্ষা থাকে। অর্থনৈতিক কর্মসূচী এমনভাবে নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন যার ফলে বাংলায় আরও বেশি খাদ্য উৎপাদন করা সম্ভব হয়। জমিতে ভালো সার দেওয়া হলে ও জলসেচের ব্যবস্থা করা গেলে বেশি পরিমাণে উৎপাদন অসম্ভব নয়। কৃষকদের সামগ্রিক কল্যাণের কথা মাথায় রেখে প্রস্তুত দ্রব্যের বাজারদরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কৃষকের পাওনা মূল্য নির্ণয় করা উচিত এবং তার আবাদের খরচ ছাড়াও কিছু মুনাফা যাতে বজায় থাকে তার নিশ্চয়তা বিধান করা প্রয়োজন। আবওয়াব-এর মতো কুপ্রথা বাংলার ভূমিব্যবস্থায় গভীর শিকড় গেড়ে আছে এবং তা দূর করতে হলে কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।[১৯]

এইসব সমস্যার সমাধান অবিলম্বে করা প্রয়োজন। পরিকল্পনা, কর্মসূচী, জরিপ প্রভৃতির প্রয়োজন আছে। কিন্তু তাতে যদি অধিক সময় লেগে যায় এবং বাস্তবতার সঙ্গে যদি তার কোন সম্পর্ক না থাকে তাহলে তা অর্থহীন হয়ে যাবে। সমস্যার সমাধানের জন্য বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করাই বেশি প্রয়োজন। কৃষিব্যবস্থার কল্যাণের জন্য এমন পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে হবে যা গরিব কৃষকেরা সহজেই গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। সরকারের সকল বিভাগ এবং বিশেষত কৃষি ও পশুপালন বিভাগের কাজকর্ম এই নীতি অনুসারে চালানো প্রয়োজন। তাছাড়া কৃষকের সাধ্যের মধ্যে থাকলে অন্যান্য পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চালানো যেতে পারে। দরিদ্র কৃষক ও তার সামান্য জমিকে মূল পটভূমি হিসেবে ধরে নিয়েই সকল প্রকার পরিকল্পনা ও কর্মসূচী প্রণয়ন করা প্রয়োজন। তা না হলে কৃষকের কোন উপকার হবে না।

বাংলার কৃষি উন্নয়নের পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য বিশ্বের অন্যান্য দেশের আধুনিক অগ্রগতির ধারা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা যেতে পারে। গ্রামীণ অর্থনীতির কল্যাণই বর্তমানে সর্বত্র রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপের প্রধান বৈশিষ্ট্য। জাতীয় জীবনের বৃহত্তর স্বার্থ এখন শ্রেণী বা গোষ্ঠীস্বার্থের ঊর্ধ্বে স্থান পাচ্ছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের কৃষি বিষয়ক উন্নতির আলোকে বাংলার অবস্থার তুলনা করে বলা যায় যে, অন্যান্য দেশে কৃষিকার্য লাভজনক হওয়ার কারণ হল নিবিড় চাষ, নতুন প্রক্রিয়ার সফল প্রয়োগ, বাজারজাত করার সুব্যবস্থা এবং সমবায় পদ্ধতির উন্নয়ন। সেই তুলনায় বাংলার কৃষিকার্য ও কৃষক অনেক পিছিয়ে। এই অবস্থার উন্নতির জন্য জাতীয় কৃষিনীতি ও জাতীয় কৃষি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। প্রাচীন মতবাদ ও প্রাচীন পদ্ধতি বর্জন করে গ্রামীণ কৃষকের জীবনের উন্নতির জন্য ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্রকে নতুন পথের সন্ধান

দিতে হবে। সমৃদ্ধ বাংলা গড়ে তোলার জন্য জনগণের আগ্রহ ও রাষ্ট্রের সম্পদকে কাজে লাগাতে হবে।

অতীতে আমাদের অধিকাংশ কার্যকলাপের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল শহর ও শহরবাসীর স্বার্থের প্রাধান্য দুর্বল ও কৃশকায় কৃষক পাট ও চিনি উৎপন্ন করলেও পুরো দাম সে কখনও পায়নি। কিন্তু অতীতকে নিয়ে বিলাপ করার আর প্রয়োজন নেই। কারণ এখন আমরা ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে সক্ষম। কারও উপর দোষারোপ করে লাভ নেই। সমৃদ্ধ বাংলা গড়ে তোলার জন্য এখন জনগণের আগ্রহ ও রাষ্ট্রের সম্পদকে সম্মিলিতভাবে কাজে লাগাতে হবে। লক্ষ-কোটি পল্লীবাসী কৃষকের উপকার হবে কি না, একমাত্র এই জিজ্ঞাসা সামনে রেখেই সরকার, স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি, দল প্রভৃতি সকলের জাতি গঠন ও উন্নয়নমূলক কাজ পরিচালনা করতে হবে।
আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, ভাগ্য বা অপরিহার্যতার কথা বলে পল্লীর বিপুল জনসংখ্যাকে আর সন্তুষ্ট রাখা যাবে না। কৃষক এখন দুনিয়াকে দেখতে শিখেছে, শহরের চাকচিক্য, আড়ম্বর, সম্পদ ও বিলাস-বৈভব সে দেখেছে। সুতরাং এখন তাকে আর তার ক্ষেত্রের থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা যাবে না। তার দাবি আজ সামান্য – নিজের ও পরিবারের জন্য দুবেলা পেট ভরে খাওয়ার সংস্থান, তার সন্তানের জন্য সামান্য কিছু শিক্ষা এবং তার বাসস্থানের জন্য কিছুটা পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ।[২০]

সবশেষে বলা যায় বাংলার বর্তমান সমস্যাবলী অতিশয় জটিল এবং তার সমাধান পর্যায়ক্রমে করতে হবে। কৃষকদের কল্যাণের জন্য কোন একক সমাধান নেই। প্রজাস্বত্ব সমস্যার সমাধান হলেই যে সব সমস্যা দূর হয়ে যাবে তা বলা যায় না। কৃষি ব্যবস্থায় ও জটিল ভূমিব্যবস্থা সংক্রান্ত আইনের সংস্কার প্রয়োজন। কিন্তু তা হল বহু সমস্যার মধ্যে একটি মাত্র। অন্যান্য সমস্যাগুলি নিয়েও চিন্তা ভাবনা করতে হবে। দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রাম্যজীবনের দিকে লক্ষ্য রেখে পরিবর্তন করতে হবে। আর তা না করা হলে অর্থনৈতিক জীবনের কাঠামো নষ্ট হয়ে যাবে। তখন সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে। আর শেষ পর্যন্ত কৃষকরা বিদ্রোহ করলে বাংলার অবস্থা প্রকম্পিত হয়ে উঠতে পারে। কারণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সবাই যাতে সমান সুযোগ সুবিধা পেতে পারে তার ব্যবস্থা থাকা দরকার। এই প্রসঙ্গে বলা যায় দেশের নিরক্ষর, অশিক্ষিত কৃষকদের ভোট দেশের পরিস্থিতি পরিবর্তন করে দিতে পারে। তাদের প্রতি আমাদের সদয় হতে হবে কারণ কৃষকরাই হল সামাজিক পুনর্জীবনের সম্ভাব্য শক্তি। তাদের মর্যাদা বাড়ানো ছাড়া জাতীয় পুনর্জীবন সম্ভব নয়।

তথ্যসূত্র:

১. এম. আজিজুল হক, বাংলার কৃষক, অনু. ওসমান গনি, ১ম সং, ঢাকা: দিব্য প্রকাশ, ২০০৪, পৃ. xiii

২. বিমল চন্দ্র সিংহ, বাংলার চাষী, ১ম সং, কলকাতা: বঙ্গীয় সমবায় সংগঠন সমিতি, ১৯৩৬, পৃ. ১-২

৩. তদেব, পৃ. ৩-৯

৪. এম. আজিজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. xxiv

৫. শান্তিপ্রিয় বসু, বাংলার চাষী, ১ম সং, কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫১, পৃ. ১-২

৬. বদরুদ্দীন উমর, বাংলাদেশের কৃষক ও কৃষক আন্দোলন, ১ম সং, ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৮৫, পৃ. ৩৯

৭. M. Azizul Haque, The Man Behind The Plough, Calcutta: The Book Company. Ltd., 1939, p. 150

৮. অমলেন্দু দে, বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, ১ম সং, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৭, পৃ. ১৯৯

৯. M. Azizul Haque, op.cit., pp. 153-155

১০. শান্তিপ্রিয় বসু, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭

১১. এম. আজিজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৩-১৪৭

১২. M. Azizul Haque, op.cit., pp. 43-44

১৩. এম. আজিজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৪

১৪. M. Azizul Haque, op.cit., p. 270

১৫. বিমল চন্দ্র সিংহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭

১৬. এম. আজিজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭২

১৭. শান্তিপ্রিয় বসু, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২, ৫৯

১৮. বিমল চন্দ্র সিংহ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৭

১৯. এম. আজিজুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১, ৬৮, ৯১, ২৫২

২০. M. Azizul Haque, op.cit., p. 343, 345-348

জীবন সংগ্রামের ‘কালীদহ’

অঙ্কিতা মুখার্জী
সহঅধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়
কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

সারসংক্ষেপ : নাটককার শম্ভু মিত্রের গল্প ‘কালীদহ’ সমাজ ও অর্থনীতির বিচিত্র ঘূর্ণিপাকে নারীর জীবনসংগ্রামের নির্মম জীবনসত্যের মূর্ত রূপ। জীবনের নূন্যতম প্রয়োজন পূরণের জন্য লীলাবতী কিংবা পুষ্পলতার আত্মসম্ভ্রম বিসর্জনের অসামান্য সত্যস্বরূপ তুলে ধরেছেন গল্পকার। প্রাচীন পৌরাণিক মিথকে অবলম্বন করে জীবনের কালীদহে নারীর ভূলুণ্ঠিত সম্মান ও চাপা যন্ত্রণার যে জীবন্ত আলেখ্য রচনা করেছেন শম্ভু মিত্র তা পাঠকের গভীর অভিনিবেশ দাবী করে।

সূচক শব্দ : শম্ভু মিত্র – বিশশতক – আত্মসম্ভ্রম – কালীদহ – নারীর সতীত্ব – বিসর্জন – জীবনসংগ্রাম – ফিল্ম স্টুডিও – ক্যামেরা – এলো গা – নির্মম – জীবনসত্য।

সংবেদনশীল মানুষ, শিল্পী ও সাহিত্যিক জীবনকে পর্যবেক্ষণ এবং অভিজ্ঞতা জাত অনুভূতিকে সবসময় একই সাহিত্যরূপে প্রকাশ করেন না।অনুভূত উপলব্ধিকে তুলে ধরেন শিল্প – সাহিত্যের বিবিধ আঙ্গিকে। আত্মপ্রকাশের বিচিত্র আনন্দ খুঁজে নেয় শিল্প ও সাহিত্যের বিচিত্র আধার। বাংলা নাটক ও নাট্যাভিনয়ের ইতিহাসে বিশ শতকের চল্লিশের দশকের গ্রুপ থিয়েটারের প্রাণপুরুষ শম্ভু মিত্রও তেমনই একজন শিল্পী ব্যক্তিত্ব যিনি বহুতল বিশিষ্ট মানব জীবনের রূপচিত্র অঙ্কণ করেছেন কেবল তাঁর মৌলিক নাট্যসৃষ্টির মধ্যে দিয়েই নয়, মৌলিক গল্প রচনাও তাঁর স্বতন্ত্র জীবনরূপ নির্মাণ। অভিনেতা শম্ভু মিত্রের গল্পকার সত্তাটি অপরিচিত এক প্রতিভার মুখোমুখি এনে দাঁড় করায় পাঠককে। তাঁর গল্প জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও প্রকাশের ব্যঞ্জনায় ঋদ্ধ।শম্ভু মিত্রের ‘কালীদহে’ গল্পটি রচিত হয় ১৯৬৪ সালে এবং ১৯৭৫ সালে অমৃত পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড শম্ভু মিত্রের পাঁচটি গল্প ও দুটি নাটিকা একত্রিত করে ‘পাঁচ দুই’ নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে বৈশাখ ১৪০০ সালে।গল্পটি সমাজ, অর্থনীতি ও জীবনের ঘূর্ণিপাকে নারীর আত্মসম্ভ্রম বিসর্জনের নির্মম বাস্তবকে অপূর্ব মুন্সিয়ানায় ব্যঞ্জিত করেছে।

‘কালীদহে’ গল্পটিতে দেখা যায় সিনেমায় অভিনয়ের সুযোগে দুজন বৃদ্ধার শুটিংয়ে এসে পড়ার কাহিনি এবং তাদের জীবনের ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষিত ও শেষ পরিণতি। তাদের জীবনকাহিনির সূত্রে উঠে এসেছে কালের বদল এবং সামাজিক ইতিহাসের প্রতিচ্ছবি। গল্পের শরীরে লিপিবদ্ধ হয়েছে তাদের বেঁচে থাকার অমোঘ সংগ্রাম। গল্প হলেও তাতে সত্য হয়ে উঠেছে সময় ও সমাজের কালীদহে নারীত্বের লাঞ্ছনা আর বেঁচে থাকার জন্য নারীর আত্মসম্মান বিসর্জনের নির্মম জীবনসত্য। কিভাবে

পুষ্পলতার মত নারীরা অন্ন সংস্থানের জন্য শেষপর্যন্ত এলোগায়ে ক্যামেরার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় কিংবা লীলাবতীর মত বিগতযৌবনা প্রবাহিত জীবন স্রোতে বার্ধক্যে পৌঁছেও জীবনধারণের প্রয়োজনে ক্যামেরার সম্মুখে অভ্যস্ত করে নিজেকে, গল্পটি তারই ইতিবৃত্ত।

গল্পের শুরুতেই আমরা দেখি গল্পের স্থান হচ্ছে একটি ফিল্ম স্টুডিয়ো। গল্পের চরিত্ররা হলেন সহপরিচালক অরিন্দমবাবু, পরিচালক বিমলবাবু, এক্সট্রা সাপ্লায়ার কালু, পুষ্পলতা এবং লীলাবতী। কাহিনির অনুসরণে দেখা যায় সহপরিচালক অরিন্দমবাবু একটি বিশেষ চরিত্রে অভিনয়ের জন্য এমন একজন অভিনেত্রীকে চাইছিলেন যার সারা মুখ কিসমিসের মত কুঁচকে গেছে, গলাটা কাঁপা কাঁপা। অর্থের বিনিময়ে এক্সট্রা সাপ্লায়ার কালু এই ধরনের বিশেষ চরিত্রে অভিনয়ের জন্য উপযুক্ত চেহারার অভিনেত্রী সংগ্রহ ও যোগান দিয়ে থাকে। সহপরিচালকের ইচ্ছেকে গুরুত্ব দিয়েই কালু টালিগঞ্জের একটি বস্তি থেকে পুষ্পলতাকে হাজির করে এবং অর্থের বিনিময়ে তাকে অভিনয়ের জন্য রাজি করিয়ে ফেলে অনায়াসে, কারণ বিধবা পুষ্পলতা হতদরিদ্র। একটি বহু পুরনো জমিদার বাড়ির জরাজীর্ণ ঘরে মৃত্যু শয্যায় শায়িত স্বর্ণলতার পরিচারিকার ভূমিকায় তাকে অভিনয় করতে হবে। আর স্বর্ণলতা চরিত্রে অভিনয় করবে স্বনামধন্য বিখ্যাত অভিনেত্রী লীলাবতী। গল্পকার কাহিনিসূত্রে তুলে ধরেছেন এই দুই নারীর অতীত ও বর্তমান জীবনচিত্র। পুষ্পলতার স্মৃতিচারণ থেকে আমরা জানতে পারি তার আপাতসুখী দাম্পত্য, স্বামী হারানো, তার সন্তান কেষ্টর খামখেয়ালী, পুত্রবধূ ও নাতিকে সঙ্গে নিয়ে তার দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবনের ইতিবৃত্ত। লীলাবতীর জীবনের স্বর্ণযুগের ইতিহাসও গল্পকার তুলে ধরেছেন–

> "কিন্তু সবাই যেন তাঁকে ভুলে গেল। - অথচ একদিন তাঁকে ভুলে কিছুতেই ভুলে যাওয়া যেত না। তখন অনেক লোক তাকে মোট টাকায় আজীবন বাঁধা রাখতে চেয়েছে, কেউ কেউ বিবাহের মতো সম্মান দিয়ে নিজের বাড়িতে তুলতে চেয়েছে। কিন্তু তিনি রাজী হননি। আধুনিক কালের ফিল্মী সেক্স-সিম্বলের মতো তিনিও হয়ত বলতেন,Sexis part of Natureand I go along with Nature. কারণ তিনি তাঁর দিদিমা ও অন্যান্য বৃদ্ধ বেশ্যাদের কাছে জন্ম-ইস্তক শুনেছেন যে, - বেশ্যা হয়ে যখন জন্মেছ তখন একমনে বেশ্যার কর্তব্যই করে যেতে হবে বাবা, তাতেই 'ভগমানের' চরণ পাবে। অন্য আকিংক্ষে আমাদের করতে নেই । - শুধু এই শিক্ষাই নয়, কে যেন তাঁকে পড়িয়েছিল – নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ – আরো কী যেন সব। ... যৌবনের স্বাভাবিক নিয়মানুসারেই লীলাবতীর মনে হয়েছিল যে এইরকম করেই বুঝি চিরটা কাল যাবে।"[১]

সংসারের নানা সংস্কারের নিগড়ে আবদ্ধ এক নারী পুষ্পলতা। আর লীলাবতী এক সময়ের বঙ্গরঙ্গমঞ্চের শ্রেষ্ঠতম মোহময়ী নায়িকা। বৃদ্ধ পুষ্পলতা লীলাবতীর ব্যক্তিজীবন ও অভিনয়ের সঙ্গে পূর্বেই পরিচিত ছিল। একসময়ের লাস্যময়ী ব্যভিচারিণীর ভূমিকায় অভিনয় করা এই অভিনেত্রীকে ঘৃণার চোখে দেখত সে, কারণ একসময় সে বিশ্বাস করে উঠতে পারেনি যে 'সতী' নাটকে সতী চরিত্রে অভিনয় করা নারী কখনো ব্যাভিচারী হতে পারে–

> "পুষ্পলতার কষ্ট হয়েছিল। যে-মেয়ে অমন মিষ্টি গলায় কথা বলতে পারে, যাকে দেখে সতীত্বের প্রতিমূর্তি বলে মনে হয়, সে চার-পাঁচজন লোকের সামনে উলঙ্গ হয়ে মদের গেলাস নিয়ে হাসতে পারে? প্রবলভাবে অস্বীকার করেছেন পুষ্পলতা একথা বিশ্বাস করতে। কিন্তু অন্তরে কোথায় যেন বিশ্বাস হয়ে পড়তো। আর তখনি সর্ব শরীর জ্বলে উঠতো তাঁর। মুখ থেকে, কান থেকে, যেন আগুন ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠতো।"[২]

সাংসারিক ও সামাজিক সংস্কারের শুচিতা বোধ থেকেই পুষ্পলতা নারী হিসেবে লীলাবতীকে চিনেছে ও বুঝেছে। আর যখন শুটিং করতে এসে সেই অধরা সৌন্দর্যের মাধুরী পাশে বসে প্রত্যক্ষ করে, তখন সে বিস্মিত হয়, কারণ প্রথিতযশা এই অভিনেত্রী স্বর্ণলতার মতন সাধারণ চরিত্রে অভিনয় করার জন্য আজ তারই সমাসনে অধিষ্ঠিত। ক্রমশ পুষ্পলতার স্মৃতিতে ভিড় করে আসে স্বামীর সঙ্গে লীলাবতী অভিনীত 'লায়লামজনু' দেখে আসার নানা অভিজ্ঞতা, আর স্বামীর মুখ থেকে লীলাবতী সম্পর্কে প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্য। বিস্ফারিত নেত্রে বৃদ্ধ লীলাবতীর দিকে সে তাকিয়ে দেখে এবং তার মনে হয় যে সেই লীলাবতী তার আযৌবন শত্রু। সনাতন শুচিতা বোধ থেকেই বাস্তব জীবনে লীলাবতীর রিরংসা ও রঙ্গ-রসময় জীবনলীলাকে সে মেনে নিতে পারেনি। একসময় স্বামীর মুখ থেকে লীলাবতীর রূপের প্রশংসা কিংবা লীলাবতীর প্রতি অন্যদের আকর্ষণের কথা শুনে কখনো কখনো রূপেগুণে নিজেকে লীলাবতীরই সমকক্ষ বলে মনে করতো পুষ্পলতা – "কতো দিন পর্যন্ত তার হাসিতে খুশীতে এমন একটা উচ্ছ্বসিত যৌবনপ্রাচুর্য ছিল যে কিছু লোকে অন্তত আকারে ইঙ্গিতে প্রেম নিবেদন না করে পারতো না।"[৩] অভিনয়ের আগে রূপসজ্জার সময় পুষ্পলতার স্মৃতিতে ভেসে ওঠে স্বামীর সঙ্গে কাটানো মধুর মুহূর্ত। পুষ্পলতার প্রতি বাড়িওয়ালা ভুবনবাবুর আকর্ষণ, স্বামীর সোহাগ তাকে রূপের গর্বে প্রচ্ছন্নভাবে গর্বিত করেছিল – "যদি গোপনে পুষ্পলতা নিজের সতীত্ব এতটুকু শিথিল করতো তাহলে আজ নিজের নামে অন্তত একটা বাড়ি থাকতো পুষ্পলতার।"[৪] কিন্তু সেই রূপ লীলাবতীর মত নগ্নভাবে সে প্রকাশ করেনি। পুষ্পলতা নিজের সৌন্দর্যকে কালিমা লিপ্ত হতে দেয়নি এবং সকলের উপভোগের সামগ্রী করে তুলতে চায়নি – "আর তাইতো পুষ্পলতা ক্রমশ যেন সিঁটিয়ে

উঠে নিজেকে আরো পুলিন্দার মতো করে বেঁধেছেঁদে রাখতো। যাতে কোনরকমে তার দৈহিক সৌন্দর্যের দিকে কারোর চোখ না পড়ে। বুড়ি হয়েও সে অভ্যাস তাঁর যায়নি। হাজার গরমেও এখনো পুষ্পলতা এলো গায়ে থাকতে পারেন না।"[৫] কিন্তু আজ সে সর্বহারা, রিক্তযৌবনা। তাই সামান্য পাঁচটা টাকার বিনিময় ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতে আজ সে প্রস্তুত। অন্যদিকে জীবনপ্রবাহের স্বাভাবিক স্রোতে বিগত যৌবনা থিয়েটার জগত থেকে লীলাবতীর স্বেচ্ছা নির্বাসন ও শেষ পরিণতিটুকুও চিত্রিত করেছেন গল্পকার–

> "বিশ বছরেরও বেশী একটানা উন্মাদ মধুমাস চলে যাবার পর আরো বিশ বছর বেঁচে চলতে হচ্ছে লীলাবতীকে। রাত্রি যে এত দীর্ঘ হতে পারে তা লীলাবতী আগে কখনো ভাবেননি। তাই বাড়িটা যখন মেরামত করবার পয়সা থাকলো না, নীচের তলার ভাঙা ঘরগুলো ভাড়া দিয়েও অন্নসংস্থান করা শক্ত হয়ে উঠলো, তখন একদিন অতীতের মোহময়ী লীলাবতী, নাট্যসম্রাজ্ঞী লীলাবতী, সকলকার স্নেহধন্যা কাপ্তেন লীলু, স্বেচ্ছাবৃত নির্বাসনের অভিমানিনী লীলা উমেদারি করতে বেরুলেন মঞ্চে ও চিত্রজগতে।"[৬]

সামাজিকভাবে ভিন্ন অবস্থানের এই দুই মানুষের জীবনের প্রয়োজন তাদের সমতল ভূমিতে দাঁড় করিয়েছে। সময়ের স্রোত ছিনিয়ে নিয়েছে তাদের জীবনের আনন্দকে, যৌবনের শ্রীকে। আজ তারা দুজনেই বৃদ্ধা এবং বেঁচে থাকার তাগিদ তাদের আজ অসমান অবস্থান থেকে সমান ভূমিতে এনে দাঁড় করিয়েছে, কারণ এই বিগতযৌবনা দুই নারীর যৌবন গেলেও দেহ থেকে প্রাণটা যায় নি। অন্নসংস্থানের জন্য পুষ্পলতার সযত্নে রক্ষিত প্রবীণ দেহ ক্যামেরার সামনে মেলে ধরার প্রয়োজন হয়। অভিনয়ের প্রয়োজনে ব্লাউজ খুলে শুধু এলোগায়ে ক্যামেরার সামনে পুষ্পলতাকে দাঁড় করানোর নির্দেশ আসে। পুষ্পলতা মনের গুঢ় অচেতন প্রদেশে অসহায়তা অনুভব করে–

> "জামা খুলে এতো লোকের সামনে এলো গায়ে বসতে হবে। পুষ্পলতার মনে হোল ঠেলতে ঠেলতে সবাই যেন কোথায় নিয়ে এসে ফেলেছে তাঁকে। অথচ কিছু করবার নেই। তিনি আজ বস্তিবাসী এক অত্যন্ত গরীব বুড়ি। যার ছেলে নিজের মাকে, নিজের ছেলে-বৌকে দ্যাখে না বলে যাকে ঘুঁটে দিয়ে, মশলা পিষে, ঠোঙা তৈরি করে, এবং ভিক্ষে করে সংসার চালাবার চেষ্টা করতে হয়, তার সঙ্গে লোকে এইরকম ব্যবহার করবে না তো কী করবে।"[৭]

কেবলমাত্র দুটো অর্থ রোজগারের জন্য সে আজ এলোগায়ে ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতে বাধ্য হয় – "তাঁর কেবলি মনে হচ্ছে এবারে বোধহয় এরা তাঁকে তাড়িয়ে দেবে, টাকা পাঁচটা বোধহয় আর তাঁর রোজগার করা হলো না। কালুর কাছ থেকে তার পাঁচ টাকাই পাবার কথা।"[৮]

গল্পের একেবারে শেষে আমরা দেখি বার্ধক্যের ভারে লোলচর্ম দুজন বৃদ্ধা কষ্ট করে উঠে দাঁড়িয়ে নুব্জ দেহে সেই অন্ধকার গুদাম সদৃশ্য আটচালার দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলেছেন, কারণ – "পার্ট শেষ করতে। একই সঙ্গে।"[৯] নির্মম জীবনসত্য তাদের অভিন্ন অনুভূতিতে উপনীত করে। লীলাবতীর প্রতি পুষ্পলতার সব ঘৃণা প্রশমিত হয় এবং তার বেশ্যা জীবনের প্রয়োজনকে সে নতুনভাবে উপলব্ধি করে। নিজেকে সে লীলাবতীর সঙ্গে অভিন্ন মনে করে। একদিন লীলাবতী পুরুষের লোভী দৃষ্টির সম্মুখে নিজেকে বিলিয়ে ছিল অর্থের বিনিময়ে, আর আজকে অর্থের জন্য পুষ্পলতাকে এলোগায়ে ক্যামেরার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হয় – "আর আজ তাকে সকলের সামনে এলো-গায়ে বসতে হবে – পুষ্পলতা বিহ্বলের মতো পঞ্চুর পিছনে পিছনে মেকআপ রুমের দিকে জামা ছাড়তে চলে গেলেন।"[১০] জীবনধারণের প্রয়োজন আজ তাদের একই অবস্থানে এনে দাঁড় করায়।

গল্পকার প্রয়োজনের টানে কালীদহের ঘূর্ণাবর্তে নারীর সম্ভ্রম বলী হবার ইতিবৃত্ত তুলে ধরেছেন এই গল্পে। পুষ্পলতার মত নারীরা এভাবেই বিবেকের কণ্ঠরোধ করে নিজের ফেলে আসা অতীতকে বিসর্জন দেয় জীবন সংগ্রামের কালীদহে। গল্পের নামকরণ অত্যন্ত ব্যঞ্জনাবাহী। গল্পকার পৌরাণিক মিথকে ব্যবহার করেছেন সযত্নে। গল্পটির মধ্যে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র কালীয়দমন খণ্ডের কাহিনিকে অনুসরণ করা হয়েছে। পৌরাণিক কাহিনিতে দেখা যায় কালীয় নাগ কালীদহের জলকে বিষাক্ত করে তুলেছিলো। ব্রজবাসীকে রক্ষা করবার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কালীয়নাগের সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ করে তাকে বশীভূত করেছিলেন। ফলে কালীদহে আবার ফিরে এসেছিল হীরক দ্যুতি সম্পন্ন জল আর ব্রজবাসী তাদের প্রার্থিত শান্তি খুঁজে পেয়েছিল। এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে এবং গল্পের নামকরণে সেই পৌরাণিক অনুষঙ্গকে ব্যবহার করে গল্পকার আসলে বলতে চেয়েছেন সমাজের কালীদহের কর্দমাক্ত পাঁকে আর অর্থের উল্লাসে নারীর সম্মান বিসর্জিত হয়। কালীয়নাগের মত বিষাক্ত ছোবলে কলুষিত হয় নারীর আত্মসম্মান। কিন্তু কৃষ্ণের মত কোনো ত্রাতা উপস্থিত হন না নারীর সতীত্ব রক্ষার জন্য। তাই নারীর সতীত্ব - যৌবন সমাজের বিষাক্ত কালীদহে প্রয়োজনের তাগিদে পঙ্কিলতায় আবিষ্ট হতে বাধ্য হয়। এই গল্পে প্রখর সমাজ বাস্তবতায় নারীর ভূলুণ্ঠিত সম্মান ও যন্ত্রণার কথা এত জীবন্তভাবে চিত্রিত হয়েছে যাতে গল্পের নামকরণটিও অদ্ভুত ব্যঞ্জনায় গল্পটিকে অন্যমাত্রা দান করেছে।

--

তথ্যসূত্র:

১। মিত্র শম্ভু' ,পাঁচটি গল্প দুটি নাটিকা ,'আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৯ ,১৪০৪জ্যৈষ্ঠ ,দ্বিতীয় সংস্করণ ,পৃষ্ঠা ৯৪

২। তদেব, পৃষ্ঠা ৯৬

৩। তদেব, পৃষ্ঠা ৯১

৪। তদেব, পৃষ্ঠা ৯০

৫। তদেব, পৃষ্ঠা ৯১

৬। তদেব, পৃষ্ঠা ১০৫

৭। তদেব, পৃষ্ঠা ৯০

৮। তদেব, পৃষ্ঠা ৯১

৯। তদেব, পৃষ্ঠা ১১০

১০। তদেব, পৃষ্ঠা ৯১

॥ আকর ও সহায়ক গ্রন্থ এবং সহায়ক পত্রপত্রিকা॥

১. মিত্র শম্ভু, 'পাঁচটি গল্প দুটি নাটিকা', এম সরকার এন্ড সন্স প্রাইভেট .সি. লিমিটেড, কোলকাতা৭৩-, প্রথম সংস্করণ, বৈশাখ ১৪০০।

২. মিত্র শম্ভু, 'সন্মার্গ সপর্যা', এমসরকার এন্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড .সি., কোলকাতা৭৩-, দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈশাখ ১৪০২।

৩. মজুমদার স্বপন, – ১৯৪৮বহুরূপী '১৯৮৮', বহুরূপী, কোলকাতা৭৩ –, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৮।

৪. মিত্র শাঁওলী (সম্পাদিত-সহ) ও রায় অনিত (সম্পাদিত), : শম্ভু মিত্র'ধ্যানে ও অন্তর্ধানে', নান্দনিক, কলকাতা৯ -, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮।

৫. মিত্র শাঁওলী, 'তর্পন', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা৯ -, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯৮।

৬. মিত্র শাঁওলী, 'ত্রস্ত সময় ধ্বস্ত সংস্কৃতি', এম সরকার এন্ড সন্স .সি.প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা৭৩ -, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪০৬।

৭. মিত্র শাঁওলী, - ১৯১৫শম্ভু মিত্র '১৯৯৭ বিচিত্র জীবন'পরিক্রমা-, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, প্রথম প্রকাশ, ২০১০।

৮. 'নাট্যচিন্তা', সম্পাদকরথীন চক্রবর্তী -, শম্ভু মিত্র স্মরণ সংখ্যা, ১৪০৭।

৯. '৩নাট্য আকাদেমি পত্রিকা ', পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি, জানুয়ারি ১৯৯৩।

১০. '৬নাট্য আকাদেমি পত্রিকা ', পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি, স্বাধীনতার উত্তরাধিকার বাংলা থিয়েটার সংখ্যা, ১৯৯৯।

১১. ‘বহুরূপী পত্রিকা’, ১ থেকে ১০২ সংকলন, ১৯৫৫ ।২০০৪ –

১২. ‘পশ্চিমবঙ্গ’, শম্ভু মিত্র স্মরণ সংখ্যা, ১৪০৭, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কোলকাতা১-, বর্ষ ৩৪, সেপ্টেম্বর ২০০০।

১৩. ‘দেশ’, ৬৪ বর্ষ ১৭ সংখ্যা, ১৩ আষাঢ় ১৪০৪, ২৮ জুন ১৯৯৭।

প্রতিস্পর্দ্ধী শিশুদের সামাজিক একীভবনে রবীন্দ্র ভাবনা

সৌরভী আটা
গবেষক, শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
অমল কুমার দাস
গবেষক, শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র কবি, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার, সংগীতস্রষ্টা নন, তিনি একইসঙ্গে মানবতার পূজারী এবং যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে মানুষের কল্যাণ; আর শিক্ষার দ্বারাই সেই কল্যাণ সম্ভব। এর জন্য প্রয়োজন সর্বব্যাপী শিক্ষার প্রকাশ- জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, ক্ষমতা বা অক্ষমতা যেখানে কোনোভাবেই বিচার্য বিষয় নয়। শিক্ষা যেহেতু মনুষ্যত্ব লাভের পথ তাই শিক্ষায় সকলেরই অধিকার সমান। নারী, পুরুষ, বৃদ্ধ, শিশু ভেদে যেমন চরিত্রের প্রকাশ ঘটে তেমনি শারীরিক ভাবে অক্ষম মানুষেরা সাহিত্যের একটি বিস্তৃত ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত হয়েছে। তবে অক্ষম চরিত্রকে নিয়ে ভাবনা রবীন্দ্র সাহিত্যে সম্ভবত একটি অনাবিস্কৃত ক্ষেত্র । কবি সকল মানুষকে সমান জ্ঞানে ভালোবাসেন। শিক্ষায় একীভবন বলতে বোঝায় একটি বাধাহীন পরিবেশে সমস্ত শিশু তার সর্বাধিক ক্ষমতাকে ব্যবহার করে পরিবারের নিকটবর্তী বিদ্যালয়ে সমবয়সি শিশুদের সাথে একই গুণগত মানের শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করবে। এক আনন্দময় অভিজ্ঞতা অর্জন করে পারস্পরিক বন্ধন অনুভূতিকে দৃঢ় করবে। রবীন্দ্র সাহিত্যে প্রতিস্পর্দ্ধী চরিত্রগুলির বিভিন্নভাবে প্রতিফলন ঘটেছে। যেমন- 'রক্তকরবী'-র 'বিশুপাগলা', মুক্তধারা'-র 'বটুক', 'অম্বা', 'ডাকঘরে'-র 'ক্ষ্যাপা', 'ক্ষুধিত পাষাণে'-র 'মেহের আলী' চরিত্রগুলিকে আপাতভাবে পাগলা মনে হলেও তারা যে কথাগুলি বলে তা আসলে জীবন যাপনেরই গূঢ় কথা। সুধা এবং সুভা ছিল মূক ও বধির, কুমু এবং ছিদাম ছিল অন্ধ, কবির দাদা বীরেন্দ্রনাথ ছিলেন স্কিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত। এই সমস্ত প্রতিস্পর্দ্ধী মানুষগুলিকে কবি খুব সুন্দরভাবে সাধারন মানুষদের সঙ্গে মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। আমরা দেখতে পাই প্রত্যেকটি চরিত্র পরিশেষে বিশ্বপ্রকৃতির ক্রোড়ে ফিরে এসেছে। সমাজের মূলস্রোতে (mainstreaming) সকলে একসঙ্গে মিশে গেছে। এখানেই একীভূত শিক্ষা বা 'Inclusive Education ' – বাস্তবে রুপায়িত হয়েছে। শান্তিনিকেতনে এইরুপ শিক্ষা পরিলক্ষিত হয়।

মূলশব্দ: একীভূত শিক্ষা, প্রতিস্পর্দ্ধী শিশু, রবীন্দ্র সাহিত্যে, শান্তিনিকেতন।

মূল আলোচনা:

প্রতিবন্ধী শব্দটি উচ্চারণ করলেই সমাজ-মানুষের মধ্যে পৃথকীকরণের বিষয়টি সবচেয়ে বেশী প্রাধান্য পায় এবং এর সাথে- সাথেই এদের জন্য পৃথক পাঠক্রম-পাঠ্যসূচি, ভিন্ন শিক্ষাব্যবস্থা, নতুন পরিকাঠামো পরিলক্ষিত হয়। এই পৃথকীকরণ থেকে মুক্তি পেতে

প্রতিবন্ধী (handicapped) -এর বদলে ‘challenged’ কথাটা ব্যবহৃত হতে লাগল এবং বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে ‘ differently able’ অর্থাৎ ‘ভিন্নভাবে সক্ষম’। প্রতিস্পর্দ্ধীদের শিক্ষা ও জীবনযাত্রাকে জাতি, ধর্ম, বর্ণ-বৈষম্যর বিভেদের উর্দ্ধে তুলে ধরতে হবে, সমাজের মূলস্রোতের শিক্ষাধারা (mainstream) থেকে তা যেন কখনো বিচ্ছিন্ন না হয়। সুতরাং প্রতিস্পর্দ্ধীদের শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা (inclusive education)-য় রুপ দিলে তাদের শিক্ষায় পৃথকীকরণ দূরীভূত হবে। প্রতিস্পর্দ্ধী শিক্ষার্থীরা নিজেদেরকে হতভাগ্য না ভেবে হাসিমুখে অদৃষ্টকে বিধাতার আশীর্বাদ মনে করতে শিখবে। যেমনটা আছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের লেখায়,-

“ কিসের তরে অশ্রু ঝরে
কিসের লাগি দীর্ঘশ্বাস
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে
করব মোরা পরিহাস”।

OBJECTIVES (উদ্দেশ্য) :

- রবীন্দ্র সাহিত্যে প্রতিস্পর্দ্ধী চরিত্র নিয়ে ভাবনার ক্ষেত্র কতটা তা নির্ণয় করা;
- রবীন্দ্র পরবর্তী সাহিত্যে সেই ভাবনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার যে প্রয়াস তা অনুসন্ধান করা;
- বিভিন্ন ঘটনা, পরিপ্রেক্ষিত তথা সমাজ পরিবেশের প্রেক্ষাপট কিভাবে প্রতিস্পর্দ্ধী চরিত্রগুলিকে তুলে ধরেছেন- তা বিশ্লেষণ করা;
- রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা প্রতিস্পর্দ্ধী চরিত্র সৃষ্টির পিছনে কতটা প্রেরণা যুগিয়েছে- তা পর্যালোচনা করা;
- রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্য এবং ব্যক্তিগত জীবন অভিজ্ঞতায় বিভিন্নভাবে একীভূত শিক্ষাকে বাস্তবে রুপায়িত করেছেন - তা বিশ্লেষণ করা;

রবীন্দ্রসাহিত্যে একীভূত শিক্ষার ধারনাঃ

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমগ্র জীবন-সাধনায় এই ভাবেই সমস্ত মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে চেয়েছেন, সমস্ত বিভেদ দূর করে একই সঙ্গে এগিয়ে চলার কথা বলেছেন। তাঁর মতে “মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ”। নিজের দিক থেকেই যখন আমরা অন্যকে দেখি তখন আমরা অতি অনায়াসেই অন্যকে নষ্ট করতে পারি। শান্তিনিকেতন প্রবন্ধাবলীর চতুর্দশ খন্ডে তিনি বলেছেন- “ এমন গল্প শোনা গেছে, ডাকাত মানুষকে খুন করে ফেলে শেষকালে তার চাদরের গ্রন্থি থেকে এক পয়সা মাত্র পেয়েছে। নিজের প্রয়োজনের দিক থেকে মানুষের প্রাণকে সে এক পয়সার চেয়েও ছোটো করে ফেলেছে। নিজের ভোগ প্রবৃত্তি যখন প্রবল হয়ে ওঠে তখন মানুষকে আমরা ভোগের উপায় বলে দেখি, তাকে আমরা মানুষ বলে সম্মান করিনে- বস্তুত মানুষের প্রতি এই অত্যাচার অবিচার ঈর্ষা ক্রোধ বিদ্বেষ এ সমস্তেরই মূল কারণ হচ্ছে মানুষকে আমরা

আমার দিক থেকে দেখার দরুণ তার মূল্য কমিয়ে দিই এবং তার প্রতি ক্ষুদ্র ব্যবহার করা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে"।

শিক্ষায় একীভবন বা একীভূত শিক্ষা বলতে বোঝায়, একটি বাধাহীন পরিবেশে সমস্ত শিশু তার সর্বাধিক ক্ষমতাকে ব্যবহার করে পরিবারের নিকটবর্তী বিদ্যালয়ে সমবয়সী শিশুদের সাথে একই গুণগত মানের শিক্ষার সুযোগ গ্রহন করা। এখানে বাধাহীন পরিবেশ বলতে কেবলমাত্র শারীরিক বা পরিবেশগত বাধা কে বোঝায় না। অন্যান্য বাধাগুলি হল- মনোভাবগত বাধা, সামাজিক বাধা, প্রাতিষ্ঠানিক বাধা, অর্থনৈতিক বাধা ইত্যাদি। গবেষনায় জানা গেছে যে, একীভূত শিক্ষাকে বাস্তবায়িত করবার ক্ষেত্রে প্রধান বাধা হলো মনোভাবগত বাধা। মনোভাবগত বাধা বলতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান, প্রশাসনের মনোভাব, শিক্ষক, সহপাঠী, শিক্ষাকর্মী, অক্ষম শিক্ষার্থীর ভাইবোন, বাবা- মা, পারিবারিক এবং নিকট সমাজের প্রতিকূল মনোভাবকে বোঝায়। একটি কার্যকরী একীভূত শ্রেণীতে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার্থী থাকে – তারা সক্রিয়, পরস্পরের সঙ্গে মিথস্ক্রয়া করে এবং বিভিন্ন ধরনের কাজে যুক্ত থাকে। তারা শ্রেণিকক্ষের সমস্ত কাজকর্মে আনন্দ পায় এক আনন্দময় অভিজ্ঞতা অর্জন করে পারস্পরিক বন্ধন অনুভূতিকে দৃঢ় করে। কবির ভাষায়- “ ক্ষুদ্র স্বার্থ ভুলিয়া, ক্ষুদ্র অক্ষিকা দূর করিয়া তোমার নিজের অন্তঃকরণকে একবার আনন্দে জাগাইয়া তোলা – তবেই আনন্দরুপম-----------”।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাচিন্তায় বারবার প্রকাশিত হয়েছে একীভূত শিক্ষার ধারনা। তিনি নিজেও চার দেওয়ালের মধ্যে গন্ডীবদ্ধ যে শিক্ষা, তাতে বিশ্বাস করতেন না। বর্তমান দিনে শিক্ষা বলতে বোঝায় নির্দিষ্ট বিষয় পরিধির মধ্যে আবদ্ধ নির্দিষ্ট গন্ডীবদ্ধ জ্ঞান, যার সঙ্গে জীবনবোধ-বাস্তবতাবোধের কোনও সম্বন্ধ নেই। এ বিষয়ে তিনি ‘শিক্ষার হেরফের’ প্রবন্ধে বলেছেন- “আমাদের এই শিক্ষার সহিত জীবনের সামঞ্জস্য সাধনই এখনকার দিনের সর্বপ্রধান মনোযোগের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে”। এর থেকে মুক্তির উপায় হল স্বাধীনভাবে বাধাহীন পরিবেশে শিক্ষা দেওয়া যেখানে সত্য-শিব-সুন্দর সাধনায় ব্রতী হবো আমরা সবাই নির্দ্বিধায়। স্বাধীনচিন্তা, স্বাধীন বিকাশ, স্বাধীন চেতনা, স্বাধীন বিচার-বুদ্ধি-বিবেকের প্রকাশ ও প্রয়োগ সাধনায় আমরা যেন সনিষ্ট ও সার্থক হই। তাই কবি সকলকে প্রকৃতির মাঝে শিক্ষা দেবার প্রত্যাশায় গড়ে তুলেছিলেন ‘শান্তিনিকেতন’ যা পরবর্তী সময় ‘বিশ্বভারতী’ বিশ্ববিদ্যালয়-এ রুপ নেয়। এখানেই তিনি সমস্ত বাঁধাধরা শিক্ষার অচলায়তন নষ্ট করেন এবং সমস্ত ভেদাভেদ দূর করেন। ‘তোতাকাহিনি’, ‘শিক্ষাসংস্কার’, ‘অচলায়তন’, ‘শারদোৎসব’ প্রতিটিতেই সেই সুর ধরা পড়েছে। তিনি বহুদিন আগে তাঁর শিক্ষা চিন্তা বিষয়ক প্রবন্ধে, সাহিত্যে যে ‘অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা’ -র কথা বারবার বলেছেন সেটিই বর্তমানে ‘একীভূত শিক্ষা’ বা ‘Inclusive Education’ বলে পরিচিতি লাভ করেছে।

রবীন্দ্র সাহিত্য প্রতিভায় এই ধারনার প্রতিফলন দেখা গেছে বারবার। তারা কেউ হয়তো ভাষাহীন, কেউ বা মানসিক ভারসাম্যহীনতার জন্য সমাজ পরিবেশে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারছে না, আবার কারো বা সমগ্র জগৎ কে দেখার জন্য সামনে কালো পর্দা পড়ে গেছে। এদের মধ্যে 'রক্তকরবী'-র 'বিশু পাগলা', 'মুক্তধারা'-য় 'বটুক', 'ডাকঘরে'-র 'ক্ষ্যাপা', 'ক্ষুধিত পাষাণে'-র 'মেহের আলি', এছাড়াও- সুভা, কুমু, সুধা, বিধু, অম্বা, অন্ধবাউল, -এর মতো চরিত্র।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ একটি ছোটগল্প লেখেন 'সুভা' নামে। প্রতীস্পর্দ্ধী চরিত্র নিয়ে সার্থকতম সৃষ্টি তাঁর- এই ছোটোগল্পটি। এই গল্পের তৃতীয় কন্যা 'সুভাষিণী'- সংক্ষেপে সুভা ছিল মূক ও বধির। সুভা বুঝত তার অপূর্নতা, তাকে নিয়ে বাবা-মার কষ্ট। 'সুভা'-র জীবন ছিল নির্জন দ্বিপ্রহরের মতো 'শব্দহীন এবং সঙ্গীহীন'। তার ভাষা মনুষ্য সমাজ বুঝত না। তাদের দুটি গাভী ছিল, নাম 'সর্বশী ও পাঙ্কুলি'। এই অবলা দুটি প্রানীই বুঝত তার ভাষা। তাদের মধ্যে এমন একটা কথাহীন ভাব আদান- প্রদান প্রক্রিয়া ছিল যে শুধু তারাই সেটা বুঝতে পারত। গাভী দুটি শুভার পদশব্দ বুঝতে পারত। তার আদর, ভর্তসনা, মিনতি মানুষের চেয়ে বেশি ভালো বুঝত। সুভার একদিন বিয়ে হয়ে গেল। কিন্তু বেশি দিনের জন্য নয়। সুভা যে বোবা তা প্রকাশ হতে বেশি দেরি হল না। তার স্বামী ভাষাবিশিষ্ট এক কন্যাকে বিয়ে করলো। সুভার "চিরনীরব হৃদয়ের মধ্যে একটা অসীম অব্যক্ত ক্রন্দন বাজিতে লাগিল- অর্ন্তযামী ছাড়া আর কেহ তাহা জানিতে পারিল না"। সুভার কাছের মানুষজন ওকে বোঝেনি, বুঝতে চায়ওনি, কিন্তু প্রকৃতির ভাষা আয়ত্ত করেছিল সে। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে চলতো সুভার কথোপকথন। এখানেই আমরা দেখতে পাই কবি কীভাবে প্রতিস্পর্ধী সুভাকে সমাজের মূলস্রোতধারায় মিশিয়ে দিয়েছেন। ঘটেছে একীভূত শিক্ষার বিস্তার।

ঠিক একইরকম ভাবে 'শুভদৃষ্টি' নামক ছোটগল্পের নায়িকা 'সুধা'-র সঙ্গে সুভার যেন একটা বড় মিল খুঁজে পাওয়া য়ায়। সেও মূক ও বধির। তারও শুরু প্রকৃতিতে আর শেষ প্রকৃতির কোলে।

'দৃষ্টিদান' গল্পে 'কুমু'- কে আমরা দৃষ্টিহীন চরিত্রে দেখতে পাই। 'কুমু' জন্মান্ধ নয়। মাত্র ৮ বছর বয়সে তার বিবাহ হয় আর ১৪ বছর বয়সে সে মৃত সন্তানের জন্ম দেয়। তারপর ক্রমে শরীরের দুর্বলতা, মনের খেদে অথবা অন্য কারনেই হোক তার চোখে পীড়া শুরু হয়। স্বামীর ভুল চিকিৎসায় সে একদিন চোখ দুটি হারিয়ে ফেলে। তবুও স্বামীর প্রতি তার মনে কোনদিন ক্ষোভ আসেনি, উপরন্তু সে বলেছে, "মা ত্রিনয়নী আমার দুই চক্ষু লইলেন"। আমরা কুমুকে বলতে শুনি, "অল্পকালের মধ্যেই কেবল শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের দ্বারা আমি আমার সমস্ত অভ্যস্ত কর্ম সম্পন্ন করিতে লাগিলাম। এমনকি আমার অনেক গৃহকর্ম পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি নৈপুন্যের সহিত নির্বাহ করিতে পারিলাম"। দৃষ্টি হারানোর সঙ্গে সঙ্গে কুমুর অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলি অনেক বেশি

সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। পায়ের শব্দে সে বুঝতে পারত তার স্বামী আসছে না অন্য কেউ। কুমুর স্পর্শানুভূতি খুব প্রখর ছিল , তা দেখা যায় যখন সে "হেমাঙ্গিনীর হাত ধরিয়া আমি তাহাকে আমার শয়নগৃহে লইয়া গেলাম। তাহার মুখে গায়ে হাত বুলাইয়া তাহাকে দেখিলাম, মুখটি সুন্দর হইবে, বয়সো চোদ্দ- পনেরোর কম হইবে না।" রবীন্দ্রনাথ এই কুমুর মধ্যে দিয়ে এমন এক ব্যক্তিত্ব সম্পন্না নারীর চরিত্র তুলে ধরেছেন যে, সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে কাটিয়ে সামাজিকভাবে একীভবন ঘটিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের জীবনে, বাস্তব অভিজ্ঞতায় 'একীভূত শিক্ষা'- কে স্থান দিয়েছেন। তাঁর এক দাদা বীরেন্দ্রনাথ খুবই প্রতিভাবন ও মেধাবী ছিলেন। অঙ্ক করতে ভালবাসতেন। তিনি নিজেকে সবসময় নিজের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখতেন এবং সারা মেঝেতে অঙ্ক কষতেন। সামান্য অনিয়ম এবং পরিশ্রম হলেই তিনি উন্মাদ হয়ে উঠতেন। কবির সময়কালে 'পাগল' এবং 'উন্মাদ' এই শব্দ দুটিই প্রচলিত ছিল। কিন্তু বর্তমান পরিভাষায় তিনি ছিলেন 'স্কিজোফ্রেনিয়ায়' আক্রান্ত। বীরেন্দ্রনাথের পুত্র বলেন্দ্রনাথ, জন্ম থেকেই রুগ্ন, পাদুটি বাঁকা, আর একান্তভাবেই আত্মগতস্বভাব। কবি তাঁর ভাইপোকে খুব ভালবাসতেন। এখানেই আমরা দেখতে পাই কবি নিজের জীবন দিয়ে একীভূত শিক্ষার বিস্তার ঘটিয়েছেন।

'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পে 'মেহের আলি' চরিত্রটি পাগল চরিত্রে প্রতীয়মান। তার প্রাত্যহিক প্রথানুযায়ী সে প্রভাতের জনশূন্য পথে "তফাৎ যাও" "তফাৎ যাও" বলে চিৎকার করে ছুটে বেড়াত। কল্পনার মায়া জালে হারিয়া যাওয়া মানুষকে রুঢ় বাস্তবের মুখোমুখি আনার জন্য সে বলে উঠত – "সব ঝুট হ্যায়, সব ঝুট হ্যায়"। ভুল পথ থেকে মানুষকে সরিয়ে আনার প্রয়াসে মেহের আলীর মতই 'বটুক'- র মুখে ধ্বনিত হয় 'যেয়ো না ও পথে, সময় থাকতে ফিরে যাও'। ঠিক ওইরকমই আর একটি চরিত্র হল 'বিশু পাগল'। সে একজন যক্ষপুরীর খোদাইকর। কিন্তু তার কাজে মন নেই। বিশু পাগল সুন্দরের পূজারী ও নন্দিনীর কর্ম সহচর। সে কেবল পথের ধারে ধারে মুক্তির জয়গান গেয়ে যাই। পাগলামী তার জমির মালিকের বিরুদ্ধে, খেতের ফসল অন্যায়ভাবে দখল করার বিরুদ্ধে, প্রহরীদের বিরুদ্ধে। সে প্রতিনিয়ত গান গেয়ে, মজার কথা বলে, সবাই কে সচেতন করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিশু পাগলকে সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষের মর্যাদা দেওয়া হয়নি।

'ডাকঘর' নাটকে 'ছিদাম' অন্ধ-খোঁড়া। সে অমলের কল্পনায় বাসা বেধেঁছে। রোজ সে অমলের জানালায় আসে। অমলের মতো একজন ছেলে তাকে চাকার গাড়িতে করে ঠেলে ঠেলে নিয়ে বেড়ায়। অমল ভালো হয়ে উঠলে তাকে ঠেলে ঠেলে নিয়ে বেড়াবার কথা বলে আশ্বস্ত করেছে। এই চরিত্র দুটি থেকেও দেখা যায় কবি একজন প্রতিস্পর্দ্ধী শিশুর সঙ্গে একজন সাধারণ শিশুর খুব সুন্দরভাবে মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। অমল তার ছোট্ট জানালার বাইরের পৃথিবীটা চিনতে শেখে ছিদামের

মতোই মনের চোখ দিয়ে। কবি এইভাবে বারবার বিভিন্ন আঙ্গিকে একীভূত শিক্ষাকে দেখিয়েছেন।

'কাহিনী'-র 'লক্ষীর পরীক্ষা' নাট্যকাব্যের একটি অন্যতম চরিত্র 'আন্দি'- দুই চোখেই দৃষ্টিহীন। 'গান্ধারীর আবেদন' কাব্যে নাট্যে রবীন্দ্রনাথ দৃষ্টিহীন কৌরব রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁর দৃষ্টিহীন সাজা রানী গান্ধারীর কথোপকথন স্পষ্ট এবং প্রতীয়মান ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'সহজপাঠ'- এর 'অন্ধবেণী' চোখে দেখে না। সে আজও পথের প্রান্তে একাকী গান গেয়ে চলে। কবি রূঢ় বাস্তবতাকে তুলে ধরে দেখিয়েছেন –

"অন্ধ কানাই পথের 'পরে
গান শুনিয়ে ভিক্ষে করে"।

রবীন্দ্র সাহিত্যে সৃষ্ট অক্ষম চরিত্রগুলি প্রতিটি সমাজে, সাধারণ মানুষের হৃদয়ের অন্তরে ও বাহিরে এক সুতোর বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। সমস্ত বাধা বিপত্তি কে দূর করে সমস্ত শিশু সমাজ পরিবেশের মূলস্রোতের সাথে মিশে যেতে সক্ষম হয়েছে। সকলকে একসঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে দেখা যায়। কবি সক্রিয় এবং নিস্ক্রিয় সমস্ত চরিত্রকেই সমাজের উচ্চস্তরে উন্নিত করেছেন। "যে অন্ধকার নিজেদের ছোটো গন্ডির মধ্যেই আমাদের ছোটো পরিচয়ে আবদ্ধ করে তাকে স্বীকার করিনে। যে আলো সকলের কাছে আমাদের প্রকাশ করে এবং সকলকে আমাদের কাছে প্রকাশ করে আমরা তারই অভিনন্দন করি"(শান্তিনিকেতন, ৭ই পৌষ, ১৩৩০, চর্তুদশ খন্ড, বিশ্বভারতী)। মানব চিত্তের ভেদাভেদকে ভুলিয়ে সমন্বয়ের আদর্শে উদ্ভাসিত করেছে। তাঁর শিক্ষা ও সাহিত্য ভাবনার তাই একটিই মূল সূর-

আয়রে তবে মাতরে সবে আনন্দে
আজ নবীন প্রানের বসন্তে
পিছনপানেন বাঁধন হতে
ছলছুটে আজ বন্যাস্রোতে,
আপনাকে আজ দখিন হাওয়ায়
ছাড়িয়ে দে রে দিগন্তে,
আজ নবীন প্রানের বসন্তে।

গ্রন্থপুঞ্জঃ

- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, তৃতীয়-চতুর্থ খন্ড, ১২৫ তম রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রকয়াশিত সূলভ সংস্করন, পৌষ ১৪১০, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ।
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, চর্তুদশ-পঞ্চদশ খন্ড, ১২৫ তম রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রকয়াশিত সূলভ সংস্করন, বৈশাখ ১৯৩৮, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ।

- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, কলকাতার বইমেলা ২০০৩, সাহিত্যম।
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, পিতৃস্মৃতি, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ।
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ছিন্নপত্র, কামিনী প্রকাশনালয়, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী ২০০২।
- সম্পাঃ- ডঃ বিষ্ণুপদ নন্দ, বিবিধ প্রসঙ্গ; বিষয় রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

মনোবৈকল্য ও মনোবিশ্লেষণের নিপুণ বিশ্লেষক ছোটগল্পকার সুমথনাথ ঘোষ

রিম্পা হাটি
গবেষক ও প্রাবন্ধিক
তাপস রায়
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ইন্দাস মহাবিদ্যালয়

সারাংশ : সুমথনাথ ঘোষের ছোটগল্পে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের ছবি নিখুঁতভাবে উঠে এসেছে। একদিকে নারীমনস্তত্ত্ব অন্যদিকে পুরুষ মনের নানা জটিলতা ফুটে উঠেছে। গল্পগুলিতে উঠে এসেছে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজের চিত্র। মধ্যবিত্তের জীবন যন্ত্রনা, গ্লানি,হতাশা, ব্যর্থতা প্রভৃতি মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠেছে।

সূচক শব্দ : নারী ও পুরুষ মনস্তত্ত্ব, মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্তের জীবন যন্ত্রনা ও বিপন্নতা।

সাহিত্যের উৎসই হল জীবন। সাহিত্যকার রূপ এবং রঙ সংগ্রহ করে নেন সমসাময়িক জীবন থেকেই। বাংলা কথাসাহিত্য তার উন্মেষকাল থেকেই সমাজের প্রায় সর্বশ্রেণীর মানুষের বহু বিচিত্র জীবন রূপকে উদ্ভাসিত করে তুলেছে বহু বিচিত্র ইন্দ্রধনুচছটায়।

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাখা অবশ্যই ছোটগল্প। এই ছোটোগল্পকে প্রকৃত অর্থে আলোর মশাল দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাংলা সাহিত্যে 'কল্লোল' যে বিশাল প্রতিভাবানদের মিছিল সৃষ্টি করেছিলো, সেই মিছিলের ধারাকেই অব্যাহত রেখেছিলেন সুমথনাথ ঘোষ। কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকেরা মোটামুটিভাবে নিম্ন মধ্যবিত্ত জীবনকেই তাদের সাহিত্যের বিষয় বস্তু রূপে উপস্থাপিত করেছিলেন। একইভাবে সুমথনাথ ঘোষও তাঁর প্রায় সব গল্পেই মধ্যবিত্তের টানাপোড়েন ও যন্ত্রনার চিত্র অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে চিত্রায়িত করেছেন।

লেখকের অফুরন্ত জীবনিশক্তিভরা উদাত্ত প্রাণটুকুই তাঁর গল্প সাহিত্যের প্রাণ। চোখে দেখা বাস্তবের সঙ্গে গল্পশিল্পী সুমথনাথের প্রত্যক্ষ কোনো যোগ নেই; তাহলেও তাঁর গল্পগুলো কল্পনা বিলাসী নয়। জীবনের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ বর্ণালির সঙ্গে ধ্যানি চিত্র শিল্পীর আত্মার যে যোগ, তাঁর গল্পগুলিতেও জীবনের সুক্ষ্ম দেহহীন সেই সুরভি মদিরতার আভাস প্রতিফলিত হয়েছে। বস্তুত গল্পের প্রচ্ছেদে লেখক তাঁর জীবন কল্পনার ছবি এঁকেছেন।

সুমথনাথ ঘোষ (১৯১২-১৯৮৪) চল্লিশের দশকের লেখক ; কল্লোলযুগের পরবর্তী পর্বের গল্পকার। ছোটগল্প, উপন্যাস দুইক্ষেত্রেই তাঁর স্বচ্ছন্দ চারণা। মধ্যবিত্ত বাঙালির সুখ – দুঃখ , আশা – নৈরাশ্য, ক্ষুধাতৃষ্ণা, লোভক্ষোভ , ব্যর্থতা – আত্মগ্লানি সবই তাঁর

কলমের সূচিমুখে উঠে এসেছে। সুমথনাথের গ্রন্থ সংখ্যা নিত্যান্ত কম নয়, তাঁর অকাল প্রয়ানের পর লেখনীর গতি স্তব্ধ হয়েছে। বাংলা তথা সাহিত্যের সমগ্র ঐশ্বর্য ও বৈভবের দিকে তাকিয়ে বলা যায়, তাঁর ক্ষমতা ও প্রতিভার উপযুক্ত মূল্যায়ন হয়নি; কারন স্বভাবনিস্পৃহ প্রচার বিমুখ মানুষ কল্লোল কালিকলম প্রভৃতি সাময়িকপত্রের সঙ্গে এই শতকের তৃতীয় দশক থেকে যাঁরা যুক্ত ছিলেন, রবীন্দ্রোত্তর পর্বের প্রতিনিধি রূপে সুমথনাথ ঘোষ অন্যতম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সামান্য আগে পরে কথাসাহিত্যের আসরে, গল্প উপন্যাসের ডালি সাজিয়ে পাঠক ও ক্রেতার মনোরঞ্জন করেছেন – এমন কিছু সংখ্যক লেখক আছেন যাঁদের আমরা ভুলতে বসেছি। আলোচ্য সুমথনাথ ঘোষের বিশিষ্ট কিছু গ্রন্থ পাঠের স্মৃতি আজও বয়স্ক প্রবীন পাঠকের কাছে অমলিন। সুমথনাথের জনপ্রিয়তার কারন অবশ্যই ছিল বাঙালি মধ্যবিত্তের সরল স্নিগ্ধ গার্হস্থ্য জীবনের রূপায়ন – দক্ষতা এবং শরৎচন্দ্রীর গল্প বলার সহজিয়া রীতি। লেখক মনোগহনের রহস্য বিশ্লেষনে অহেতুক মনোবিজ্ঞানীর আতস কাঁচ নিয়ে বসেননি, অথচ অতিপরিচিত নিত্যদৃষ্ট মধ্যবিত্ত- নিম্নবিত্ত জীবনের জটিল মনের আলো – ছায়ার ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন। তাছাড়া শহর কলকাতা ও মফস্বল বাংলার চাকুরিজীবী আল্পবিত্ত বাঙালি পরিবারের প্রাত্যহিক সুখ–দুঃখ হাসিকান্নার জগৎটাকে সাবলীলভাবে গল্পে তুলে ধরার যে অনায়াস ভঙ্গি শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে প্রবার্তিত করেছিলেন, তাঁর উত্তরসুরী হিসাবে সুমথনাথ অব্যর্থভাবে অনুসরন করেছিলেন। যদিও ছোটোগল্পের ক্ষেত্রে অবশ্য শরৎচন্দ্র তাঁর পথপ্রদর্শক নন, সেক্ষেত্রে কল্লোল–গোত্রের লেখকদের অনেকাংশে তাঁর উপর পড়েছে। কিন্তু কল্লোলগোষ্টীর প্রতিনিধি স্থানীয় লেখকদের উগ্র বাস্তবতার মোহ তাঁর মধ্যে ছিল না, দেহ সম্পর্কে সুমথনাথের শুচিতাবোধ বরং শরৎচন্দ্রীয় রক্ষনশীলতারই অনুরূপ। বাঙালি সমাজজীবনের ক্ষুদ্রপরিসর গন্ডীর মধ্যে সুপরিচিত সম্বন্ধের মধ্যে যে মাধুর্য্য – রহস্য – মমতা – রোমাঞ্চ আছে, সুমথনাথ অতি কৌতূহলী চোখে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষন করেছেন। নারীই সুমথনাথের গল্পের মুখ্য আকর্ষন এবং মূলত মধ্যবিত্ত – নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের মধ্য থেকেই তাদের দেখা পেয়েছেন তিনি। তাদের জীবনেরই গভীর থেকে প্রবহমান ফলগু সুমথ সাহিত্য ভূমিকে শস্যশ্যামল করেছে।

বাংলা সাহিত্যে সুমথনাথ ঘোষের আর্বিভাব চমকপদ। লেখকমাত্রই বিচিত্র অভিজ্ঞতার অধিকারী। সুমথনাথের গল্পগুলি এই অভিজ্ঞতারই প্রতিবিম্ব। এই প্রবন্ধে জটিলতা, সহধর্মিনী, প্রতিঘাত, ছবি, অভিমান, মৃগতৃষ্ণা, অপ্রত্যাশিত, বনিয়াদী এর মতো গল্পগুলি বেছে নেওয়া হয়েছে। যেখানে সুখ – দুঃখ, আশা –নৈরাশ্য, ব্যার্থতা – আত্মগ্লানি, লোভ – ক্ষোভ কে একসঙ্গে অসাধারন সাহিত্যের রসে জারিত করে অনবদ্য ভঙ্গিমাতে তিনি প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তার অব্যবহিত পরের অর্থনৈতিক মন্দা, মূল্যবোধের বিপর্যয়, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, চোরাকারবার, কালোবাজারি, ভদ্রঘরের স্ত্রীকন্যাকে পতিতাবৃত্তি গ্রহনে বাধ্য করানো, স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কে বনিবনার অভাব, শিক্ষাসংকট ও তৎ-সংক্রান্ত আরো বহু সমস্যা এগুলি থেকে শুরু করে দেশবিভাগ ও

স্বাধীনতা উত্তর স্বদেশের আরো কত সমস্যার জালে বিভ্রান্ত মধ্যবিত্তের তীব্র অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামের রূপকার তিনি। তাঁর ছোটোগল্পগুলি মূলত দর্পন জাতীয়, কোনো টীকাভাষ্য মন্তব্য উদ্দেশ্যবাদে তিনি গল্পকে বিড়ম্বিত করেন না। কোনো সুক্ষ বিদ্রুপ বা নীতির তর্জনীর দ্বারা গল্পকে চমকিত করেন না। ভাষ্যের চেয়ে উন্মোচনে টিপ্পনীর চেয়ে চিত্রনেই তাঁর প্রবনতা, সহানুভূতি দরদ অনুকলা সমানুভূতি এইগুলি লেখক হিসাবে তাঁর মহৎ গুন। তাঁর ছোটগল্পের ক্রমবিবর্তন সাহিত্যিক জীবনের অনতিদীর্ঘ পরিসরে বিশেষ – ভাবে নজরে আসে। কৌতূহল সৃষ্টির দ্বারা পাঠকের উৎকন্ঠা জগানের যে চলতি রীতি তার প্রতি তাঁর আধুনিক অনাস্থা প্রকাশ পায়নি। বস্তুত আখ্যানধর্মিতা, ঘটনাবর্ত – রচনা, কৌতূহল – সৃজন, জটিলতা আকর্ষন এ সব রীতিই পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত বাংলা ছোটগল্পের একাংশকে অধিকার করে ছিল। সুমথনাথ ঘোষের কলমেও তার প্রভাব আছে।

'জটিলতা' সুমথনাথ ঘোষের প্রথম পর্বের গল্পগ্রন্থ। এই গল্প – সংকলনটির প্রথম গল্প 'জটিলতায়' লেখক সুমথনাথ পুরুষের দুজ্ঞেয় জটিল মনের একটি দিককে ছোটগল্পের অপরিসর আয়োজনে আভাসিত করেছেন। এ গল্পে এক প্রৌঢ় স্বর্নকার কোনো ধনী খন্দেরবাড়ীর পরমাসুন্দরী যুবতী কন্যার জন্যে একটি জড়োয়া হার তৈরির অর্ডার পায়। সেই অপূর্ব রূপবতী কন্যাকণ্ঠে হারটি বেমানান হয়নি – তবু কিছু মনি – মুক্তার ঈষৎ পরিবর্তনের দাবিতে হারটি সেদিন স্বর্নকারকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় সেই রমনীর কণ্ঠে দোলানো হারটি যে ঐ লাবন্যবতীর অনিন্দ্য অঙ্গস্পর্শে ধন্য হয়েছিল ; তারই ফলে হারটি নিয়ে যে কিশোর গৃহ ভৃত্যটি গিয়েছিল তার অপ্রাপ্তবয়স্ক কিশোর চিত্তেও সেই রূপ দর্শনের ফলে আলোড়নের ঢেউ ওঠে, আর হারটি পুনরায় স্পর্শ করার জন্য সেও অধীর হয়ে ওঠে। কিন্তু উক্ত পৌঢ় স্যাকরার চিত্তবিক্ষোভই হয় গুরুতর। এমন সর্বাঙ্গসুন্দর অপরূপ যৌবন – লালিত্য, এমন নিটোলনিলাজ উচ্ছল কান্তি যে সে জীবনে দেখেনি। তার নিজের পরিবারের রূপহীন কুদর্শন নারীদের তুলনায় এই রূপ ঐশ্বর্য তার দৃষ্টিবিভ্রম ঘটায়; তার বুদ্ধিকে পর্যন্ত বিভ্রান্ত করে। অঙ্গস্পর্শধন্য হারটিকে সে তৎপরতার সঙ্গে গোপন করে নির্দোষ ভৃত্যসঙ্গীকে চুরির দায়ে জেল খাটায়। রূপসী রমনীর কন্ঠস্পর্শধন্য হারটিকে গোপনে সংরক্ষিত করার এই অতি সুক্ষ অথচ রহস্য জটিল মনোবিকার অবলম্বনেই জটিলতা গল্পটি নিপুনভাবে গড়ে তোলা হয়েছে। বিন্যাসের গুনে প্রাণের অলক্ষ্য উত্তাপ গল্পের মূল থেকে ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে পরিনামে গল্পটিকে এবং একইসাথে পাঠকের মনকে গভীরভাবে আলোড়িত করে তোলে।

'সহধর্মিনী; গল্পে দুরারোগ্য যক্ষারোগে আক্রান্ত সুপ্রভা স্বামী ও পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কেবল একজন পরিচারিকার অনুগ্রহে শয্যা – শ্রয় করে ক্ষীনভাবে বেঁচে আছে। উদ্গত অভিমান, অশ্রুসিক্ত স্মৃতি ও অবহেলিত হীনতাবোধই তার নিত্য সঙ্গী।

সংক্রামক ব্যাধিত আক্রান্ত রোগিনীর সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীনীর সংস্রব এড়িয়ে চলার পিছনে স্বামীর ঔদাসীন্য এবং প্রতিবেশিনী কোনো নারীর প্রতি স্বামীর জায়মান দুর্বলতা অনুমান করে সুপ্রভা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। অবশেষে দুর্সর ইর্ষা নিয়ে দুর্বল অশক্ত শরীরে কোনো মতে স্বামীর কক্ষে উপস্থিত হয়ে স্বামীর জন্য ঢাকা দেওয়া জলের গ্লাসে মুখ ঠেকিয়ে সুপ্রভা সেই জলকে জীবানুদুষ্ট করা হল মনে করে তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করে। কিন্তু স্বামী ঘরে ফিরে সেই জল খেতে গেলে আবার সুপ্রভা সেখানে এসে অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই গ্লাস ফেলে দেয়। পরদিন স্বামীর অসুস্থতা ও রক্তবমির সংবাদে সুপ্রভা বিহ্বল হয়ে পড়ে। অনুতাপের বজ্রানল প্রতিহিংসা পরায়না সহধর্মিনীর রোগজর্জর বুক বিদীর্প হতে থাকে। সুপ্রভার জীবন পরিনাম তার অন্তরাগ করুন মূর্ছনায় ঝরে পড়ে লেখক রূঢ় বাস্তবের যথার্থ বর্ণনায় পুঙ্খানুপুঙ্খতার মাধ্যমে চিরকালীন জীবনের ঐতিহাসিক স্বভাবসংকেত করেছেন কখনো কখনো। মানুষের ব্যক্তিগত সুখ- দুঃখ , প্রাপ্তি ও বঞ্চনার মধ্যে জীবনের জমাট কালো পাথরের ওপরে সমাজ ধর্মের নাড়ি ছেঁড়া ক্ষীন – উষ্ণ রক্ত স্রোতের মতো প্রবাহিত হয়েছে।

'ছবি' গল্পটি ভিন্ন স্বাদের। এটিকে ঠিক প্রচলিত মধ্যবিত্ত জীবনের ছোটগল্প বলা যায় না। এই গল্পে হেমাঙ্গিনীর বেশ্যা থেকে– দেবীত্বে উর্ত্তীর্ণ হওয়ার চিত্র যেন কোনো এক নিপুনতম শিল্পীর হাতে প্রতিমা গড়ানো। গল্পটির কাহিনী চিত্র দেহ ও আত্মার এক জটিল সম্পর্কে সংকট ভাবনার। গল্পে আসীম নামে এক সৌন্দর্যসন্ধানী রূপ – পূজারী বিত্তবান চিত্রশিল্পী এক দেহেস্পজীবিনীর রূপে মুগ্ধ বিহ্বল হয়ে বহু প্রতিকুলতার পর তাকে মডেল হতে রাজি করায় এবং পরে বিবাহ করে সামাজিক প্রতিষ্ঠিত দেয়। হেমাঙ্গিনীকে মডেল করে আঁকা তার ছবিগুলি উচ্চদামে বিক্রি হয় , তার শিল্প উচ্চপ্রশংসা লাভ করতে থাকে। হেমাঙ্গিনীকে দেখে আঁকা এমনি একটি ছবি শ্রীরাধার মানভঞ্জন একদা সেই হেমাঙ্গিনীর জীবনেই গভীর পরিবর্তন ঘটায়। বারানসীর এক বৈষ্ণব আখড়ায় সেই ছবিটিকে ঘিরে বৈষ্ণবদের প্রনত ভক্তি দেখে হেমাঙ্গিনী অন্তরে তার পূর্বতম জীবনের জন্য গ্লানি ও অপরাধবোধ করে এবং অসীমের গৃহ ত্যাগ করে নিরুদিষ্টা হয়। বিস্মিত অসীম একদিন তাকে বৃন্দাবনের এক মঠে আবিস্কার করে। হেমাঙ্গিনী তখন সত্যিই যোগিনী মাতৃমূর্তিতে ধ্যানাসীনা। হেমাঙ্গিনীর ভাগ্য গল্পের শেষে আনে তার অন্য উপলব্ধি। সেখানেই চরিত্রের এবং গল্পের গভীরতম ব্যাঞ্জনা। যে গভীর যন অন্ধকার জীবনে অভ্যস্ত হেমাঙ্গিনী; সেই জীবন অভিজ্ঞতা তাকে আর এক আলোর দিকে নিয়ে যায় – সেখানে তার অভিজ্ঞতা নিরাসক্ত ভাবে বাঁচার শিক্ষা দেয়। সীমিত রূপের অতলে অরূপের অনুধ্যান, আর অরূপের অন্তরালের রূপ আবিস্কারের প্রয়াসই রূপস্রষ্টার আত্মিক ধর্ম। রূপকে নিয়ে শিল্পের কারবার শুরু হয়, কিন্তু রূপের যেখানে শেষ সীমা, সেখানেই অরূপরতনের জন্য শিল্পি আত্মার ধ্যানের আরম্ভ। এখানে সুমথনাথের জীবন চিন্তার এক অভিনব বিশিষ্ঠতা চোখে পড়ে।

'জটিলতা' গল্পসংকলনের গল্পগুলিতে মানুষের অতি জটিল দুপ্রবেশ্য মানসিকতার উপর কৌতূহলের রশ্মিক্ষেপ করেছেন লেখক সুমথনাথ এই দুরূহ দুর্জ্ঞেয় মন অতি সাধারন নারী পুরুষের মধ্যেও লক্ষ করেন তিনি। নিতান্তই একটি সাধারন মানুষের অতি সাধারন তুচ্ছ আখ্যানেও রহস্যময় মনের অন্ধকার খেলাগুলিকে বড় অমোঘ নৈপুন্যে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি 'অভিমান' গল্পে। খুবই মাঝারি অবস্থা ও সাধারন মাপের মানুষ হরিবিলাসবাবু একটি অনতিকিশোরী বালিকাকে দেখে চমকে উঠেছিলেন, কারন মেয়েটির মুখ ঠিক তাঁর প্রয়াতা পত্নীর মতো। পুত্র অমলের অপরিনত বয়স সত্ত্বেও হরিবিলাসবাবু সকলের নিষেধ ও সতর্ক বাক্য অগ্রাহ্য করে মেয়েটিকে পুত্রবধূ করে আনলেন, স্নেহমমতায় সেই বালিকা পুত্রবধূকে আচ্ছন্ন করে রাখলেন। তাঁর এতদিনের বিপত্নীক নিরাসক্ত কর্মজীবন হঠাৎ নবজীবনোৎসাহে ভরে উঠল , নতুন বাড়ি তৈরি করলেন, গাড়ি কিনলেন, বাগানের শখ মেটালেন। এমনিভাবে আমোদ – আহ্লাদে পুত্রবধূকে যত্নে আদরে স্নেহাধিক্যে তিনি যেমন বিহ্বল করে দিয়ে অভাবিতপূর্ব সুখ পেতে লাগলেন , পুত্রবধূটিও এই স্নেহপূর্ন যত্নসচেতন পৌঢ় শ্বশুর কে পেয়ে তার হারানো পিতামাতা কেই যেন ফিরে পেল এসব সুখসৌভাগ্য ছিল তার স্বপ্নেরও অগোচর। কেবল হরিবিলাসের পুত্র বেচারা অমলই জানতে পারল না , কখন তার কিশোরী বধূটি যৌবনের শ্যামলিমা গৌরবে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। তার পত্নীপরায়ন হৃদয়ের শূন্যতা বেড়েই চলল। ক্রমশ অমলের মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল, স্ত্রীকে আরও বেশি পেতে চাইল , তার পিতার স্নেহাধিকার থেকে স্ত্রীকে নিজের কাছে পাবার দাবি পুত্রবধূ মেনকাকে বিচলিত করল। এই পর্যন্ত কাহিনীতে কোনো জটিলতা নেই। কিন্তু হরবিলাসবাবু সেই মূহূর্তে বুঝতে পারলেন যে পুত্রবধূর প্রতি তাঁর স্নেহাধিক্যা সামাজিক দৃষ্টিতে অশোভন বা অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠেছে' ততক্ষনাৎ সতর্ক হলেন তিনি। স্বল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর ব্যাস্ত কর্মজীবন রূপান্তরিত হল অপরিসীম নির্বিকারত্বে উৎসাহস্থলে দেখা দিল প্রভূত বৈরাগ্য, সমস্ত স্নেহমমতা সংকুচিত করে হঠাৎ কর্মত্যাগ করে হরিবিলাসবাবু হরিদ্বারে চলে গেলেন। একটা নীরব ক্ষুব্ধ অভিমান তাঁর এই পৌঢ় জীবনের মাধুর্য উপভোগের স্নিগ্ধতাকে নীরস রিক্ত করে দিল। কিশোরী পুত্রবধূকে নিয়ে তাঁর এই স্নেহাধিক্যের পিছনে কি কোনো গূঢ়ৈষনা ছিল ? মেয়েটিকে একদিন তাঁর মনে হয়েছিল, তাঁর মৃতা পত্নীর মতো দেখতে। সেদিন পুত্র অমলকে দেখেও হরিবিলাসবাবু নিজের যৌবনের অবিকল রূপটিকে খুঁজে পেয়েছিলেন। হয়তো তারই ফলে কন্যাতুল্য পুত্রবধূর প্রতি স্নেহ – সুখ – স্বাচ্ছন্দ্য উজাড় করে হরিবিলাসবাবু যেন তাঁর প্রয়াতা পত্নীকে যে সুখ – আহ্লাদ সোহাগস্বাচ্ছন্দ্য দিতে পারেননি , তাই দিয়ে সুক্ষ আত্মতৃপ্তি ভোগ করছিলেন। যখনই তিনি এই ব্যাপারে সচেতন হলেন, তখনই চমকিত হয়ে আবার আত্মস্বরূপে ফিরে এলেন যেন ভূতগ্রস্থ জীবনের এই অসম্ভব অপরিনাম দর্শিতার মিথ্যাচার থেকে দ্রুত উদ্ধার পাওয়ার জন্যে নিজের কাছ থেকেই

পালাতে চাইলেন এবং তাই সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করে, বাড়িঘর ছেড়ে চাকরি থেকে স্বেচ্ছা – অবসর নিয়ে হরিদ্বার পালাতে চাইলেন। এই গল্পে উপজীব্য ঘটনা বা কাহিনী বর্ণনায় নির্দিষ্ট কোনো দেশকালের ছাপ পড়েনি। মানুষের তুচ্ছ অথচ চিরন্তন বৃত্তি ও প্রবৃত্তি সমূহই গল্পে অনায়াস ধৃত হয়ে আছে। বর্ণনায় উচ্ছ্বাস বা অতিশয্য নেই কোথাও, প্রকাশে নেই আবেগকাপনজনিত কুঞ্চন। ধাজু অথচ নিরা – ভরন ভাষা সরল স্বচ্ছন্দ গতি এবং সার্থক সংক্ষিপ্তির গুনে মর্মস্পর্শী।

রূপসী যুবতীর স্বামীভাগ্য যৌবনের বদলে যদি ধন সম্পদের অহংকার উথলে ওঠে ; তবু সুঠাম যৌবনের জন্য একটি মৃগতৃষ্ণিকা অবচেতনায় তাকে ব্যাকুল করে তোলে এই হল 'মৃগতৃষ্ণা' গল্পের ইঙ্গিত। তারাশঙ্করের 'বেদনী' গল্পের গভীরেও সেই একই মনস্তত্ত্ব এক নিষ্ঠুর জীবনসত্যের আকারে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু সুমথনাথ বিষয়টিকে তাঁর মতন করেই দেখেছেন। মলিনার স্বামী সতীশ মলিনার তুলনায় বয়সে পৌঢ় হলেও মলিনাকে গা-ভরা গয়না , সংসার –ভরা স্বাচ্ছন্দ্য, আঁচল – ভরা অধিকার ও জীবনভরা অহংকারে রাজেন্দ্রানীর মর্যাদা দিয়েছিল। এই দৃষ্টিলোভন বৈষয়িক সৌভাগ্যকেই মলিনা নারী সমাজ ঈর্ষনীয় সম্পদ রূপে জাহির করে সুখ পেত, প্রতিবেশিনীদের মুখ থেকে শোনা স্বামীর বয়সের প্রতি কটাক্ষের মোকাবিলা করত এইসব স্বামীদত্ত ঐশ্বর্যের আড়ম্বর ও প্রদর্শনবাদ দিয়ে। কিন্তু এই অগাধ ঐশ্বর্য , নিঃশর্ত আত্মসমপর্ন ও মহিমান্বিত স্বাধীনতা সত্ত্বেও সুখের মাঝে হয়তো কোথাও অতিসুক্ষ অভাববোধ বাসা বেঁধেছিল। যৌবনের জন্যে যৌবনের যে ক্ষুব্ধ কামনা সংগুপ্ত ছিল, তা হটাৎ ঢেউ খেলিয়ে উঠল একদিন দুপুরে জানালা দিয়ে দেখতে পাওয়া পাশের বাড়ির এক বিবাহিত দম্পত্তির কলহাস্যময় প্রেমলীলায়। এর পরিনামে গোপন ইর্ষায় ক্ষতবিক্ষত, সুপ্ত আকাঙ্ক্ষায় চঞ্চল, আপন অপরিতৃপ্তির ক্ষোভে অস্থির মলিনার সেই অসুখী সত্তার অর্তনাদ বিচিত্র স্ববিরোধিতায় প্রকাশ পেতে লাগল। ঘটনাচক্রে পাশের বাড়ির সেই তরুনতরুনী দম্পত্তির সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে গেল। তাদের দরিদ্রের দারিদ্র্যের সংবাদে মলিনা স্বতঃ প্রবৃত হয়ে স্বামীর সাহায্যে তরুনটিকে একটি চাকরি পাইয়ে দেয়। চাকরি উপলক্ষে ছেলেটিকে অনেক দূরে চলে যেত হল এবং মেয়েটিকে স্বগৃহে আশ্রয় দিল মলিনা এসব কিছুর পিছনে হয়তো তার ইর্ষা এই দুই সুখী – দম্পত্তির জীবনে স্থানগত আপাত বিচ্ছেদ ঘটিয়ে গোপন সুখ অনুভব করেছিল। যে যৌবন বয়সী স্বামী মলিনার নিজের ভাগ্যে জোটেনি, সেই যৌবনধন্য একটা পুরুষকে তার স্বামী সৌভাগ্যতৃপ্ত পত্নীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে সেই মেয়েটির গভীর দুঃখে উল্লসিত হওয়াতেই যেন মলিনার নিষ্ঠুর আনন্দ। নারীমনস্তত্বের এই বিচিত্রা সে জটিলতারই আর এক রূপ।

নারী পুরুষের জটিল মনস্তাত্বিক টানাপোড়েন সুমথনাথ ঘোষের গল্পে লক্ষ করা যায়। বিবাহের পূর্বে প্রেম, বিবাহেত্তর জীবনে কঠিন টানা – পোড়েনের সৃষ্টি করেছিল 'অপ্রত্যশিত' গল্পে। এই গল্পে অপ্রত্যশিতের সমাবেশ একটু বেশিই। কৈশোর যৌবনে

দুজনের গভীর ভালোবাসা বিবাহের পরিনাম পায়নি মেয়েটির অন্যত্র বিয়ে হয়ে গেয়ে, সংসারে এমন ঘটনা নিত্য ঘটে। কমবেশি অনেক বছর পরে কোনো অপরিচিত পরিবেশে অপ্রত্যাশিতভাবে উভয়ের সাক্ষাৎ - এমন ঘটনা অবশ্য ছোটগল্পে ঘটে থাকে। বলা বাহুল্য এই ধরনের পুনদর্শন প্রায়ই সুখকর হয় না। উভয়ের স্বাভাবিক পরিবেশ তছনছ হয়ে যায়, মানসিক শান্তি নষ্ট হয়। অপ্রত্যাশিত গল্পেও তাই হয়েছে। শঙ্করের কলেজ জীবনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু অশোক রুগ্ন শরীর সারাতে পশ্চিমের একটা পাহাড়ি স্বাস্থ্যপদ অঞ্চলে চেঞ্জে এসে সেখানে কর্মরত শঙ্করের সাক্ষাৎ পেল, আর আবিস্কার করল শঙ্করের স্ত্রী নীলিমা তারই প্রাকবিবাহ পর্বের প্রেমিকা। সেই অসমাপ্ত প্রেমের বিধুর স্মৃতি আজও বয়ে বেড়াচ্ছে অশোক, সুটকেসের মধ্যে এখনও নিলীমার ছবি – আজও বিয়ে করেনি সে। শঙ্করের অতি উৎসাহ ও আগ্রহে অশোক তার বন্ধুর বাড়িতেই স্থায়ী আস্তানা পেয়েছে। অথচ নীলিমা ও অশোকের মনের গভীরে চলেছে ভূকম্পন। ঠিক সেই সময়েই শঙ্কর জেনে ফেলেছে তার স্ত্রী ও বন্ধুর পূর্বতন সম্পর্কের কথা। উচ্ছ্বল শঙ্কর হঠাৎ আত্মমগ্ন বিমর্ষতায় নিশ্চুপ হয়ে গেছে। তিনটি মানুষের স্তব্ধ বিষাদের উপর অতর্কিতে এসে পড়ল একটা হিংস্র বাঘ; প্রত্যক্ষভাবে বাঘ হলেও পরোক্ষভাবে নীলিমার নিয়তি। এই অপ্রত্যাশিত পরিনাম ছোটোগল্পের শিল্পরূপেই সার্থক হয়েছে। যে মূহূর্তে শঙ্কর জেনেছে তার স্ত্রী ও বন্ধু পূর্বপরিচিত প্রেমিক – প্রেমিকা এবং আজও দুজনের মধ্যে নিঃশব্দ পারস্পারিক আকর্ষন রয়ে গেছে, তার কাছে দাম্পত্য সম্পর্ক মূহূর্তে বিস্বাদ হয়ে গেছে, জীবনের মূল্য গেছে কমে। বাঘ মারতে বন্দুক নিয়ে ছুটে যাওয়া হয়তো তার সেই শুন্যতাবোধেরই পরিচায়ক। এমনকি শঙ্করের পিছনে অন্ধকারে অশোকের ছুটে যাওয়াকে হয়তো একই অর্থহীন অস্তিত্বের বেদনাজাত বলে ভাবা যায়। অশোককে বাঁচাতে ছুটে গেছে নীলিমা এবং পড়েছে বাঘের মুখে – অবশ্যই এ ঘটনা অপ্রত্যাশিত। হয়তো এটাই ছিল নীলিমার বিস্ফরেনর প্রায়শ্চিত্ত। যৌবন ঊষায় অশোক নীলিমার নিরুদ্ধ প্রেম – চেতনার নির্মোক সীমায় জাগৃয়মান প্রানরহস্যের বিদ্যুৎ সচকিত সংকেত রচনা করে তার সেই প্রথম প্রয়নের ক্ষন – মোহ অকস্মাৎ বিদায় নিয়েছিল। তাই অশোক নিলীমার অবচেতন চিত্ততলে সে সৌরভ কোনোদিনও শেষ হয়নি। অর্থাৎ সংজ্ঞাত ভূমিতা তার প্রতিষ্ঠা এক আকারহীন বাসনার অনাঘ্রাত সৌরভরূপে। জীবনের মতোই তা রহস্যে অপার। জীবনের মতোই অতল স্পর্শ গভীর। যৌবনধর্মের একটি অনির্বচনীয় জীবন দর্শনের প্রতি সংকেত করেছেন লেখক এই গল্পে।

লেখক সুমথনাথ ঘোষ তাঁর গল্পে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের চিত্র স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। মধ্যবিত্তের জীবন-যন্ত্রনা, গ্লানি, হতাশা, ব্যর্থতা নৈরাশ্যের মূর্ত প্রতীক হয়ে রইলেন তিনি। স্বাতন্ত্রময় ভাষার বাহনে সহজ অন্তরের উপলব্ধি কখনোই এত স্বল্পে প্রখর হয় না, যাতে অন্তরের বাসনাকে স্রোতস্বিনীর ধারায় প্রবাহিত করে

দেওয়া সম্ভব। বরং প্রকাশ্যের প্রকরনে সত্য দর্শনের এক নিগূঢ় অনুভব কেবলই জমাট কঠিন হতে থাকে, - অর্ধোন্মীলিত পুষ্প কোরকের নির্বাক বেদনা বহন করে প্রকাশকুণ্ঠ সুমথনাথের শিল্পীব্যক্তিত্ব যেন নিজের বানীহীন বাণীর বাঁধনে নিরেট বন্ধুর পথে একক পদচারনা করে ফিরেছে আর মৃদুমন্দর পদবিক্ষেপে গেছে এগিয়ে। এই অর্থেই বাংলা গল্প সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি প্রায় নিঃসঙ্গ একক পথিক। জীবনদৃষ্টির এই সুকঠিন সামগ্রিকতা বাংলা ছোটগল্পের স্বভাব ও শিল্পায়নে সুমথনাথের যে দান তা নিঃসন্দেহে বলা যায় অভিনব দান।

গ্রন্থপুঞ্জি:

১। সুমথনাথ ঘোষ রচনাবলী(প্রথম খন্ড), মিত্র ও ঘোষ, কল ৭৩, ১৩৯৮।

২। সুমথনাথ ঘোষ রচনাবলী(দ্বিতীয় খন্ড), মিত্র ও ঘোষ, কল ৭৩, ১৩৯৯।

৩। বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার, শ্রী ভূদেব চৌধুরী, মডার্ণ বুক, কল ৭৩, ২০১৭-১৮।

৪। বাংলা সাহিত্যের নানারূপ, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, বিশ্বাস বুক স্টল, কল ৯, ২০১৫।

৫। বাংলা কথাসাহিত্যে মনোবিশ্লেষণ, কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী, পুষ্প, কল-৫২, ১৯৯৯।

৬। জীবন শিল্পী মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, লিলি দত্ত, দে বুক স্টোর, কল ৭৩, ১৯৮৯।

৭। সাহিত্য কোষ কথাসাহিত্য, অলোক রায় সম্পাদিত, সাহিত্যলোক, কল- ৯, ২০০৬।

৮। আন্তর্জাল সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য।

স্বামী বিবেকানন্দের সর্বধর্মসমন্বয় ও সার্বজনীন সম্প্রীতি ভাবনা: একটি বিশ্লেষণ প্রয়াস

রুদ্র প্রসাদ রায়
সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানবিভাগ,
আমডাঙ্গা যুগলকিশোর মহাবিদ্যালয়,
উত্তর ২৪পরগনা,পশ্চিমবঙ্গ।

সারসংক্ষেপ : দীর্ঘ-কাল ভারতবর্ষ ঘুরে **স্বামী বিবেকানন্দ** দেখেছিলেন দেশের মানুষের নিদারুণ দুঃখ-কষ্ট ও দারিদ্রের করুণ ছবি। দেশ তখন দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অবহেলা ও অনাহারে দারুণ ক্লিষ্ট । ধর্মের নামে অনাচার ও কুসংস্কার তখন দেশকে গ্রাস করেছে । পাশ্চাত্যের নাস্তিকতা ও ভোগসর্বস্বত্ব দেশের সুপ্রাচীন সংস্কৃতিকে আঘাত করেছে । ভারতবাসীর মন থেকে আত্মবিশ্বাস লোপ পেয়েছে । এভাবে এগিয়ে গেলে ভারতের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

সূচক শব্দ : স্বামী বিবেকানন্দ, সর্বধর্ম সমন্বয়, সার্বজনীন সম্প্রীতি, চিকাগো বক্তৃতা, অধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার।

১৩ সেপ্টেম্বর সম্মেলনের প্রথম দিনে প্রদত্ত 'অভ্যর্থনার উত্তর' বক্তৃতায় শুধু হিন্দুধর্মের পরমতসহিষ্ণুতার কথাই বলেছিলেন বিবেকানন্দ—"যে ধর্মের পবিত্র সংস্কৃত ভাষায় ইংরেজি 'এক্সক্লুশন' (ভাবার্থ : বহিষ্করণ, পরিবর্জন) শব্দটির অনুবাদ পাওয়া যায় না, আমি সেই ধর্মভুক্ত বলিয়া গর্ব অনুভব করি।" 'শিবমহিম্নস্তোত্র' ও শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা উদ্ধৃত করে বলেছিলেন, সব মানুষই সেই এক ঈশ্বরের পথে চলেছে। 'সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি এবং এগুলির ভয়াবহ ফলস্বরূপ ধর্মোন্মত্ততা'র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে শেষ করেছিলেন প্রথম দিনের সংক্ষিপ্ত বক্তৃতাটি।

১৫ সেপ্টেম্বরের সভায় সেই ধর্মোন্মত্ততা বিতণ্ডার আকার নিয়েছিল। প্রত্যেক সদস্য নিজ নিজ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে পরস্পরের সঙ্গে প্রায় কলহের পরিবহ সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁদের মুখ বন্ধ করেছিলেন বিবেকানন্দ একটি ছোট্ট গল্প দিয়ে। কুয়োর ব্যাঙের সেই প্রশ্ন সাগরতীরের ব্যাঙের, 'সমুদ্র? সে কত বড়? তা কি আমার এই কুয়োর মতো বড়?' শেষে সারবাক্যটি বিবেকানন্দ খুব সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছিলেন : "হে ভ্রাতৃগণ, এইরূপ সংকীর্ণভাবই আমাদের মতভেদের কারণ। আমি একজন হিন্দু—আমি আমার নিজের ক্ষুদ্র কূপে বসিয়া আছি এবং সেটিকেই সমগ্র জগৎ বলিয়া মনে করিতেছি! খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী তাঁহার নিজের ক্ষুদ্র কূপে বসিয়া আছেন এবং সেটিকেই সমগ্র জগৎ মনে করিতেছেন! মুসলমানও নিজের ক্ষুদ্র কূপে বসিয়া আছেন

এবং সেটিকেই সমগ্র জগৎ মনে করিতেছেন! হে আমেরিকাবাসীগণ, আপনারা যে আমাদের জগতের এই ক্ষুদ্র জগৎগুলির বেড়া ভাঙিবার জন্য বিশেষ যত্নশীল হইয়াছেন, সেজন্য আপনাদের ধন্যবাদ দিতে হবে। আশা করি, ভবিষ্যতে ঈশ্বর আপনাদের এই মহৎ উদ্দেশ্য-সম্পাদনে সহায়তা করিবেন।"

১৯ সেপ্টেম্বর প্রদত্ত 'হিন্দুধর্ম' বক্তৃতাটি এই সম্মেলনে বিবেকানন্দের দীর্ঘতম বক্তৃতা। বক্তৃতার প্রথম ভাগে তিনি হিন্দুধর্ম ও দর্শনের বিভিন্ন দিক আলোচনার পর শেষ ভাগে ভারতে প্রেরিত খ্রিস্টান পাদ্রিরা হিন্দুধর্মকে যে 'বহু-ঈশ্বরবাদী ধর্ম' অপবাদ দিয়েছিলেন, তা খণ্ডন করেন। এই ধরনের নিন্দাবাদকেও তিনি ধর্মোন্মত্ততা বলে চিহ্নিত করেন। ২০ সেপ্টেম্বর 'খ্রীষ্টানগণ ভারতের জন্য কি করিতে পারেন?' বক্তৃতায় আগের বক্তৃতার সূত্র ধরে তিনি খ্রিস্টান ধর্মযাজকদের কাছে এই বার্তা দেন, ভারতে ধর্মের অভাব নেই, শুধু ব্রিটিশ শাসনে ভারতের প্রধান অভাব অন্নের। দৃঢ়কণ্ঠে জানিয়ে দেন, "ক্ষুধার্ত মানুষকে ধর্মের কথা শোনানো বা দর্শনশাস্ত্র শেখানো, তাহাকে অপমান করা।"

বর্তমান সময়েধর্মান্ধতা, উগ্রবাদ, সন্ত্রাসবাদ, মাওবাদ এবং স্বজনপোষণ ইত্যাদি গোটা বিশ্বকে গ্রাস করছে। প্রতি মুহূর্তে আমরা সন্ত্রাসবাদ, চরমপন্থা এবং ধর্মান্ধতার জঘন্য পরিণতিরসাক্ষী হই। স্বজনপোষণের উদাহরণ এবং পরিণতি আমরা প্রায়শই লক্ষ্য করে থাকি। বর্ণ ও জাতিভেদপ্রথা আমাদের সমাজের আরেকটি ভয়াবহ সমস্যা। বর্ন ও জাতিভিত্তিক বৈষম্য, নিপীড়ন এবং হয়রানি আজও আমাদের সমাজেগভীরভাবে জড়িয়ে আছে। আরও অনেক সমস্যা রয়েছে যা সামাজিক সম্প্রীতি এবং শান্তিকে ব্যাহত করে।

সাম্প্রতিককালে সম্পর্কের বন্ধনগুলি (ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক)ধীরে ধীরে ভঙ্গুর এবং ক্ষীণ হয়ে উঠছে। সামান্যতম স্ফুলিঙ্গও সামাজিক ভারসাম্যে আগ্নেয়গিরিরমতো বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে এবং এর পরিণতি হতে পারে ধ্বংসাত্মক এবং ক্ষতিকর। সম্পর্কের মধ্যে ফাটল এবং ঝগড়া, পারিবারিক কলহ, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সংঘাত এবং সংঘর্ষ খুব ঘটনা। মানুষ প্রায়সই তুচ্ছ এবং ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কারণে একে অপরের সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে।
মতভেদ ও মতবিরোধের জন্য পাবলিক স্পেস দ্রুত সঙ্কুচিত হচ্ছে, বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ ওবিনিময়ের ক্ষমতা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। সবচেয়ে হতাশাজনক বিষয় হল মানুষ, বেশিরভাগ যুবক, ক্ষুদ্র সমস্যাগুলির জন্য ক্রুদ্ধ এবং ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে। প্রায়শই, আমরা সামাজিক নেটওয়ার্কিং সাইটে আপত্তিকর, অসম্মানজনক এবং অবমাননাকর ভাষা ব্যবহার করতে দেখি। লোকেরা মতামতের সামান্যতম পার্থক্যের জন্যও অবমাননাকর এবং অশালীন মন্তব্যের দ্বারা ব্যক্তিগত আক্রমণ শুরু করে।

আমাদের মনে যে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন আসে তা হল: সংঘর্ষ এবং সংঘাতের সম্ভাব্য কারণগুলি কী হতে পারে? এ প্রসঙ্গে, অমর্ত্য সেনের বিখ্যাত গ্রন্থ 'আইডেন্টিটি অ্যান্ড

ভায়োলেন্স: দ্য ইলিউশন অব ডেসটিনি' থেকে উদ্ধৃতি উল্লেখ করা যেতে পারে- "বিশ্বের অনেক দ্বন্দ্ব এবং বর্বরতা একটি অনন্য এবং চয়নযোগ্যতার পরিচয়ের বিভ্রমের মাধ্যমে টিকে আছে।"

মানুষের পরিচয়ের জন্য সলিটারিস্ট পদ্ধতির কারণে সব ধরনের সংঘাত ও সহিংসতা ঘটে। অন্য কথায়, আমরা আমাদের এক পরিচয় ভুলে অন্য এক পরিচয় নিয়ে আচ্ছন্ন। অনিবার্যভাবে আমাদের বহুবচন পরিচয়, একাধিক সমিতি এবং সংশ্লিষ্টতা আছে। অনন্য প্রায়শই ঝগড়াটে পরিচয় সম্পর্কে অনিবার্যতার উপর অযৌক্তিক গুরুত্ব আরোপ করে দ্বন্দ্ব এবং সংঘর্ষের প্রচার করা হয়। এটিকে সংজ্ঞায়িত করা হচ্ছে "মানুষের ক্ষুদ্রীকরণ" (অমর্ত্য সেনের বাক্য)। এর অর্থ হল আমরা আমাদের সীমাহীন এবং অসীম প্রকৃতি সম্পর্কে অজ্ঞ হয়ে পড়ি।

বৈচিত্র্যই জীবনের মর্ম এবং সৌন্দর্য। বৈষম্যের মধ্যে জীবন আছে এবং একজাতীয়তার মধ্যে ক্ষয় আছে। কল্পনা করুন, যদি সবাই একরকম চিন্তা করে, একই রকম পোশাক পরে, একই রকম দেখায় এবং সবকিছু একই রকম করে তবে কতটা নিরীহ, নির্বোধ এবং একঘেয়ে জীবন হবে। আমরা একটি সমাজ হিসাবে পার্থক্য এবং বৈচিত্র্যে উন্নতি লাভ করি। পার্থক্য দূর করা এবং দূর করা প্রাকৃতিক বিশ্বের আইনের পরিপন্থী হবে। সমজাতীয়তা আরোপ করা যে কোনো সমাজের বৃদ্ধির জন্য আত্মঘাতী হবে। সে কারণে পার্থক্য মেনে নেওয়া উচিত।

১

স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩সালের ১১ই স্েটেম্বর আমেরিকার শিকাগো শহরে কলম্বাস হলে বিশ্ব ধর্ম সংসদেবক্তৃতা দিয়েছিলেন। তিনি অভিবাদন দিয়ে তার বক্তৃতা শুরু করেন, "আমেরিকার বোন ও ভাইয়েরা!"। এই কথায় তিনি সাত হাজার জনতার কাছ থেকে একটি স্থায়ী অভিবাদন পেয়েছিলেন, যা দুই মিনিট স্থায়ী হয়েছিল। নীরবতা ফিরলে তিনি তার বক্তব্য শুরু করলেন:

আমেরিকার বোন ও ভাইয়েরা,

আপনি আমাদের যে উষ্ণ ও সৌজন্যমূলক অভ্যর্থনা জানিয়েছেন তার উত্তরে আমার হৃদয়অনির্বচনীয় আনন্দে ভরে যায়। আমি বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন সন্ন্যাসীদের নামে আপনাকে ধন্যবাদ জানাই; ধর্মের মাতার নামে আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাই; এবং সকল শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের লক্ষ লক্ষ হিন্দু জনগণের নামে আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। এই প্ল্যাটফর্মের কিছু বক্তাকেও ধন্যবাদ, যারা প্রাচ্য থেকে আসা প্রতিনিধিদের উল্লেখ করে আপনাকে বলেছে যে, দূর-দূরান্তের দেশগুলোর এই পুরুষরা বিভিন্ন দেশে সহনশীলতার ধারণার সম্মানের দাবি করতে পারে। আমি এমন একটি ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হতে পেরে গর্বিত যা বিশ্বকে সহনশীলতা এবং সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা উভয়ই শিখিয়েছে। আমরা কেবল সর্বজনীন সহনশীলতায় বিশ্বাস করি না, কিন্তু আমরা

সকল ধর্মকে সত্য হিসাবে গ্রহণ করি। আমি এমন একটি জাতির অন্তর্গত হতে পেরে গর্বিত, যা নির্যাতিত এবং সকল ধর্মের এবং পৃথিবীর সকল জাতির শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়েছে। আমি আপনাকে বলতে পেরে গর্বিত যে, আমরা ইসরায়েলীদের বিশুদ্ধতম অবশিষ্টাংশ আমাদের বুকে জড়ো করেছি, যারা দক্ষিণ ভারতে এসেছিল এবং সেই বছরই আমাদের আশ্রয় নিয়েছিল যেখানে তাদের পবিত্র মন্দির টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল রোমান অত্যাচারের দ্বারা। আমি সেই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হতে পেরে গর্বিত যা আশ্রয় দিয়েছে এবং এখনও বৃহত্তর জরথুস্ট্রিয়ান জাতির অবশিষ্টাংশকে লালন করছে। ভাইয়েরা, আমি আপনাকে একটি স্তোত্রের কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করব যা আমার ছোটবেলা থেকে পুনরাবৃত্তি করার কথা মনে আছে, যা প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মানুষের দ্বারা পুনরাবৃত্তি করা হয়:

যেহেতু বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন স্রোতের উৎস আছে তারা সবই সমুদ্রে তাদের জল মিশিয়ে দেয়, তাই, হে প্রভু, বিভিন্ন পথ যা মানুষ বিভিন্ন প্রবণতার মধ্য দিয়ে নিয়ে যায়, যদিও তারা ভিন্ন, কুটিল বা সোজা, সবই তোমার দিকে নিয়েযায়।

সাম্প্রদায়িকতা এবং ধর্মান্ধতা সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের ভাষ্য ছিল নিম্নরূপ:

সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা এবং তাদের ভয়ঙ্কর বংশধর, ধর্মান্ধতা, এই সুন্দর পৃথিবীকে দীর্ঘকাল ধরে রেখেছে। তারা পৃথিবীকে সহিংসতায় ভরে দিয়েছে, প্রায়ই এবং প্রায়ই মানুষের রক্তে ভিজিয়েছে, সভ্যতা ধ্বংস করেছে, এবং সমগ্র জাতিকে হতাশায় পাঠিয়েছে। যদি এই ভয়ঙ্কর অসুররা না থাকত, তাহলে মানব সমাজ এখনকার তুলনায় অনেক উন্নত হবে। কিন্তু তাদের সময় এসেছে; এবং আমি দৃঢ় ভাবে আশা করি যে এই কনভেনশনের সম্মানে আজ সকালে যে ঘণ্টাটি বেজে উঠেছিল তা সমস্ত ধর্মান্ধতা, তলোয়ার বা কলম দিয়ে সমস্ত নিপীড়নের, এবং একই পথে যাওয়ার পথে ব্যক্তিদের মধ্যে সমস্ত অযৌক্তিক অনুভূতির মৃত্যু হতে পারে।

পার্লামেন্টের চূড়ান্ত অধিবেশনে স্বামীজী তার ভাষণ এই সোনালী শব্দ দিয়ে শেষ করেছিলেন:

যদি ধর্মের সংসদ বিশ্বকে কিছু দেখায় তবে তা হল: এটি বিশ্বকে প্রমাণ করেছে যে পবিত্রতা, বিশুদ্ধতা এবং দাতব্যতা বিশ্বের কোন গির্জার একচেটিয়া সম্পত্তি নয় এবং প্রতিটি ব্যবস্থা পুরুষ ও মহিলাদের তৈরি করেছে সবচেয়ে উন্নত চরিত্র। এই প্রমাণের মুখে, যদি কিছু মানুষ এখনও তাদের নিজস্ব ধর্মের একচেটিয়া বেঁচে থাকার এবং অন্যদের ধ্বংসের স্বপ্ন দেখে, আমি তাদের হৃদয়ের নীচ থেকে তাদের প্রতি দু:খ প্রকাশ করি এবং তাদের প্রতি ইঙ্গিত করি যে প্রতিটি ধর্মের ব্যানারে শীঘ্রই লেখা হবে, প্রতিরোধ সত্ত্বেও: "সাহায্য করুন এবং লড়াই করবেন না", "আত্মীকরণ এবং ধ্বংস নয়"; "সম্প্রীতি এবং শান্তি এবং মতবিরোধ নয়।"

২

স্বামীজীর ধর্ম সম্বন্ধে ধারণা হল সামগ্রিক এবং যদি হৃদয়দিয়েআত্মস্থ করা হয়, তাহলে এটি সমাজের সমস্ত অসুস্থতা এবং মন্দকে নিরাময় করতে পারে। তিনি জোর দিয়েছিলেন যে প্রকৃত ধর্মই সেই যা মানুষের মধ্যে পশুর প্রবৃত্তিকে উন্নত এবং উন্নত করে এবং তাকে ঐশ্বরিক শক্তির সাথে একত্রিত করে। এটি মানুষের মধ্যে সুপ্ত ঐশ্বরিকতাকে বের করে দেয় এবং তাকে তার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করে যেটি হল সাত-চিত-আনন্দ। সত্য ধর্ম মতের পার্থক্যকে সামঞ্জস্য করে, এটি ঘৃণা এবং ঘৃণা জন্মায় না, এর মধ্যে সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপকতা রয়েছে। স্বামীজি ধর্মের জন্য বিমূর্ত এবং অনুমানমূলক কিছু ছিল না, এটি জীবন্ত বাস্তবতা।

স্বামীজীর জীবনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দর্শন যা সর্বজনীনভ্রাতৃত্ব এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে তা হল সত্যের প্রতি তার অটল অঙ্গীকার। স্বামীজী একান্তভাবে বিশ্বাস করতেন যে সত্য একটি অপরিহার্য এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।সত্যের জন্য যেকোনো কিছু ত্যাগ করা যেতে পারে, কিন্তু সত্যকে কোন কিছুর জন্য আপোষ করা উচিত নয়। পরবর্তীতে আমরা মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে সত্যের জন্য এইরকম অটল এবং অটল প্রতিশ্রুতি পাই। গান্ধীর জীবনে অসংখ্য প্রতিবন্ধকতা এসেছিল, কিন্তু কিছুই তার অদম্য ইচ্ছাকে বাঁকতে পারেনি, তিনি অকুতোভয় থেকে গেলেন।

সর্বজনীনভ্রাতৃত্ব ও শান্তির বাণী স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গি বোঝার জন্য, তিনি যে সমৃদ্ধ আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের প্রতিনিধিত্ব করেছেন, সেই মহান প্রভুর শিষ্য ছিলেন, তার প্রতিফলন করতে হবে। স্বামীজী দেখলেন যে আধ্যাত্মিকতা তার জন্মভূমিতে একটি নিম্ন উত্থানে রয়েছে, প্রাচীন ভারতের গৌরব এবং মহিমা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। মানবতার পুনরুত্থানের একমাত্র মাধ্যম ছিল যুগ যুগের আধ্যাত্মিক শিক্ষা গ্রহণ করা এবং প্রবর্তন করা। স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গি গভীরভাবে নিহিত রয়েছে সর্ব-অন্তর্ভুক্তিমূলক, সর্ব-পরিবেষ্টিত এবং সর্বগ্রাসী বৈদিক চিন্তাধারায়। তিনি মহান বৈদিক বাক্য প্রচার ও অনুশীলন করেছিলেন: আহমব্রহ্মাস্মিতত্ত্বমসি। অর্থাৎ আমিও ঈশ্বর এবং আপনিও ঈশ্বর।তাদের মধ্যে আমাদের বনাম নেই, কোন শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্ক নেই, আধিপত্য এবং পরাধীনতার কোন সম্পর্ক নেই। তিনি ধর্মীয় আধিপত্যের ধারণা বাতিল করেন, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ধর্মীয় গ্রহণের বার্তা প্রচার করেন। স্বামীজী ইন্দ্রের জালের বৈদিক মতবাদে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন যা মহাবিশ্বের আন্ত:সম্পর্ক এবং পরস্পর নির্ভরতাকে মূর্ত করে।

শ্রী রামকৃষ্ণ সকল প্রধান ধর্মের অনুশীলন করেছেন এবং দেখেছেন যে সকলের সারমর্ম একই। মাস্টার (শ্রী রামকৃষ্ণ) তার মৃত্যুর আগে স্বামী বিবেকানন্দকে বলেছিলেন যে তাকে "মায়ের কাজ", "মানবজাতির শিক্ষা দিতে হবে" এবং 'বটগাছের

মতো হতে হবে, ক্লান্ত ভ্রমণকারীদের আশ্রয় দিতে হবে'। স্বামীজী বিশ্বাস করতেন প্রত্যেক মানুষের মধ্যে 'ব্রহ্ম শক্তি' (ঐশ্বরিক শক্তি) আছে। মানুষ এবং মানুষের মধ্যে কোন অপরিহার্য পার্থক্য নেই। তিনি ব্যবহারিক এবং বাস্তববাদী ধর্মে বিশ্বাস করতেন, সাম্যবাদী আধ্যাত্মিকতায়, যে ধর্ম তার অনুগামীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস এবং জাতীয় গৌরব গড়ে তুলতে পারে, যা মানবতার যন্ত্রণা লাঘব ও প্রশমিত করতে পারে এবং দরিদ্রদের খাদ্য, শিক্ষা ও আশ্রয় দিতে পারে এবং অভাবীদের দান করতে পারে। স্বামীজী বিশ্বাস করতেন যে প্রকৃত উপাসনা হল মানবজাতির নি:স্বার্থ সেবা। (নর সেবাও নারায়ণ সেবা)। তিনি এই লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য নিয়ে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন: "আত্মনোমোক্ষার্থম জগৎ-হিতায়া চ" আত্মমানোমোকার্থনজগদ্ধিতাI আমি বিশ্বাস করতাম যে 'দরিদ্রনারায়ণ সেবা "(বঞ্চিত ও নি:স্বের সেবা) হল শিব-সেবা। স্বামীজী বলেছিলেন:-

"যতক্ষণ না আমার দেশে একটি কুকুরও খাবার ছাড়া থাকে, আমার আসল ধর্মই তাকে খাওয়ানো এবং পরিবেশন করা, যেটা বাদ দিয়ে ধর্মঅর্থহীন।"

৩

স্বামীজীর জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল একটি সত্যনির্ভর সাম্যবাদী সমাজ গড়ে তোলা, এমন একটি সমাজ যা জাতি, ধর্ম, বর্ণ এবং সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে বৈষম্যমূলক নয়।

ধর্মনিরপেক্ষ জ্ঞান এবং ধর্মীয় জ্ঞানের মধ্যে, বিভিন্ন চিন্তাধারার মধ্যে, যারা অন্যটির উপর অবিশ্বাস্য কর্তৃত্ব দাবি করে তাদের মধ্যে চিরকালের লড়াই হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ এই বিরোধপূর্ণ মতাদর্শের পুনর্মিলন করেন। তিনি ছিলেন বিভিন্ন মতাদর্শের সুরেলা সহাবস্থানের জীবন্ত মূর্ত প্রতীক। তিনি সমস্ত যোগ অনুশীলন করেছিলেন: জ্ঞান যোগ, বাস্তব এবং অবাস্তব মধ্যে বৈষম্যের পথ; ভক্তি যোগ, প্রেমময় ভক্তির পথ; কর্ম যোগ, নিঃস্বার্থ কাজের পথ; এবং রাজ যোগ, একাগ্রতা এবং ধ্যানের পথ।

স্বামী বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক এবং বিপ্লবী বক্তৃতা ১৮৯৩ সালের ১১ই সে্টেম্বর শিকাগোতে বিশ্ব ধর্ম সংসদের প্রতিনিধিদের কাছে দেওয়া একটি নতুন যুগের সূচনা করে। তাঁর ঠিকানা এই শব্দগুলি দিয়ে শুরু হয়েছিল: আমেরিকার বোন ও ভাইয়েরা,"। এই আত্মা-প্রশান্তিমূলক শব্দগুলি দর্শকদের উপর একটি চৌম্বকীয় প্রভাব ফেলেছিল। এর প্রত্যুত্তরে সকল দর্শকমন্ডলী উঠে দাঁড়ালেন এবং উচ্চস্বরে এবং বজ্রধ্বনিত করতালিদিয়েস্বামীজীকে অভিবাদন জানালেন। এই শব্দগুলি সমর্থকদের আকৃষ্ট করার জন্য রাজনৈতিক কৌতুক ছিল না বরং এই শব্দগুলি ছিল যা আধ্যাত্মিক উচ্চতার গভীরতা থেকে বেরিয়ে এসেছে। এই যুগান্তকারী বক্তৃতাকে স্মরণীয় করে রাখতে, প্রতি বছর ১১ সেপ্টেম্বর সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব দিবস পালন করা হয়।

স্বামীজীর আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার যা আইটি থেকে খেলাধুলা, গবেষণা থেকে ব্যবসা পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে পেশাদার দক্ষতার ক্ষেত্রে আমাদের তরুণদের কর্মের মধ্যে

প্রকাশিত হয়। মাতৃভূমি-ভারত-এর সম্পূর্ণ পুনরুজ্জীবনের জন্য জাতীয় ভাগ্য গঠনে ভারতে বৈদিক ধর্ম যে ভূমিকা পালন করেছে সে সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। মহাজাগতিক কল্যাণের বৈদিক আদর্শ হল ভারতীয় জাতির জীবন রক্ত।দৃষ্টির স্বচ্ছতা এবং জাতীয় ভাগ্য অনুধাবন করে তার ব্যক্তিত্ব নি:সন্দেহে তাকে চিরন্তন যুব আইকন বানিয়েছে এবং তার জন্মবার্ষিকীতে "জাতীয় যুব দিবস" হিসাবে পালিত হচ্ছে। স্বামীজীর বার্তায় উচ্চস্বরে এবং স্পষ্ট ভাবে ঘোষিত যে, ভারতকে উদ্ভাবন এবং সর্বজনীন উৎকর্ষের দেশ হতে হবে; যা ধর্মীয় দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবসানের মধ্য দিয়ে সব দিক থেকে বিশ্বকে মানবতার পথ দেখাবে।

আমরা আশা রাখি যে, স্বামী বিবেকানন্দের ঐক্য, ভালবাসা এবং সহনশীলতার আহ্বানকে যেন তার প্রাপ্য গুরুত্ব দেওয়া হয়, যাতে করে আরও মানুষ একে অপরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বসবাস করতে শিখতে পারে। স্বামীজি বিশ্বাস করতেন যে, আমাদের আশা বাঁচিয়ে রাখা দরকার - যাতে ধর্মান্ধতা এবং অসহিষ্ণুতার অবসান হতে পারে। আমরা সৎ চিন্তা সৎ ভাবনাঅনুশীলন করলে আশা করা যায় পৃথিবী হয়ে উঠবে ঘৃণা ও দ্বন্দ্ববিহীন পৃথিবী; যেখানে প্রত্যেকেই অপরকে সম্মান করে, কারণ সবার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা রয়েছে।

তথ্যসূত্র

1. Aditya Mukherjee, 'Challenges to the Social Sciences in the 21st Century : Some Perceptions from the South,' Economic and Political Weekly, 14 September 2013, pp. 31.
2. Amartya Sen, Identity and Violence: The Illusion of Destiny, London: Penguin Books, 2006, pp. 215.
3. Andrew Sartori, 'Beyond Culture-contact and Colonial Discourse: Germanism in Colonial Bengal', in An intellectual History for India, ed. ShrutiKapila, New York: Cambridge University, 2010, pp. 82.
4. K. N. MishraSwami, Vivekananda on Universal Brotherhood And Peace,Spotlight News Magazine, July, 13, 2020.
5. Marie Louise Burke, Swami Vivekananda: Prophet of the Modern Age, Kolkata: Ramakrishna Mission Institute of Culture, 2009, pp. 27.
6. Pravrajika Prabuddhaprana, Saint Sara, Kolkata: Dakshineswar, Sri Sarada Math, 2002, pp. 176.

7. R.K. Dasgupta, Swami Vivekananda on Indian Philosophy and Literature, 2011, pp. 88..
8. Romain Rolland, The Life of Vivekananda and the Universal Gospel, 2010, pp. 215.
9. The Complete Works of Swami Vivekananda, 9 vols., Calcutta: AdvaitaAshrama, 1–8, 1989; 9, 1997, pp. 2.97.
10. The Complete Works of Swami Vivekananda, Vol.-III, 2009, pp. 301.
11. Vivekananda : The Great Spiritual Teacher, 2008, pp. 185.

সভ্যতার রঙ্গমঞ্চে মানুষ

বিপ্লব মণ্ডল
স্টেট এডেড কলেজ টিচার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজ, বীরভূম

সংক্ষিপ্তসার :
মানব সভ্যতার বিবর্তিত রূপ প্রাচীনত্বের বেড়া ভেঙে ক্রমে আধুনিকতার পর্যায়ে উন্নীত হতে থাকল। মানুষ আর নিজেকে সীমাবদ্ধ কুপমণ্ডুক পরিসরে সীমাবদ্ধ করে রাখতে চাইলো না। ক্রমাগত বিবর্তন মানব জাতির রূপরেখাকে প্রবাহমানতায় উচ্চপর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করলো। সেই প্রাচীন কাল থেকে ঐতিহাসিক তথ্যসূত্র ধরে মানব জাতির বিবর্তন; সেখান থেকে নব রূপে জাতির চেতনা; সামাজিক দলবদ্ধ রূপরেখার বিন্যাসক্রম ক্রমাগত নব রূপে উদ্বুদ্ধ করে মানব জাতিকে আধুনিকতার রঙ্গমঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করল। মানুষের ইতিহাস পরিবর্তিত রূপরেখা ধরে আধুনিকতার উচ্চ আসনে অবতীর্ণ হলো। ইতিহাসের রূপ বিবর্তন তৈরী করলো রাষ্ট্রীয় বৈপ্লবিক পরিবর্তন। ক্রম অগ্রসরমান আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা বিশ্ব মানব সমাজে পরিলক্ষিত হল। তৈরী হলো আধুনিক বিশ্ব। বিশ্বের অত্যাধুনিক নব রূপায়নে নির্মিত হলো অর্থনীতির নতুন মেরুদণ্ড। বিশ্বায়ণ সেই পথকে ক্রমশ প্রসারিত করতে থাকলো। পরবর্তী স্তরে দেখা গেল সমাজের-ধর্মের বিবর্তন ঘটতে থাকল। প্রথাগত সংকীর্ণ মনোভাবনার গণ্ডী অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত আধুনিক বিশ্ব সভ্যতা মহানুভবতার ভাবাদর্শ দ্বারা জাগরিত হলো। তবে আধুনিক সভ্যতার রঙ্গমঞ্চ অনেক ক্ষেত্রে হয়ে রইলো ঠুনকো। মানব জাতির ক্রমবর্ধমান চাহিদা, উচ্চাশা, ধর্মীয় গোঁড়ামি মানব জাতির অস্তিত্বকে অনেক ক্ষেত্রের বিশ্বযুদ্ধ রূপী ভয়ঙ্করতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত করতে সমর্থ হলো। তবে শেষ পর্যন্ত জাতি, সভ্যতা যে আধুনিক মানব গোষ্ঠীর পরিচয়ের নব তম ইঙ্গিত প্রদানে সমর্থ তা, প্রমাণিত।

সূচক শব্দ : চাকচিক্য, রঙ্গমঞ্চ, সেতুবন্ধন, ঐক্যবদ্ধ, মেলবন্ধন, পৈশাচিক, রাষ্ট্রযন্ত্র, জাতিসংঘ, আত্মশুদ্ধি, সার্বজনীনতা, মেরুকরণ, বিশ্ব বিন্যাস, পর্যটন।

মূল আলোচনা

সভ্যতা বিলাসী মানব জাতি তার উদ্ভবের প্রথম পর্যায় হতেই নব নব সৃষ্টির প্রকার নিয়ে সারা বিশ্বকে করেছে সমাদৃত। প্রাচীন থেকে আধুনিক সময় পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে মানব সভ্যতা ক্রমশ আধুনিকতার ছোঁয়া নিয়ে বর্তমানে নিজেকে বৈচিত্রময় চাকচিক্যের আদলে নির্মাণ করে চলেছে। সৃষ্টির আদি লগ্ন থেকে তাই বর্তমান সভ্যতা তার রূপের প্রগতিকে ক্রম সমৃদ্ধ করেছে। নির্মাণ করেছে নতুন নতুন শিল্প শৈলী! আধুনিকত্বের সভ্যতাবিলাসী মানব জাতি কখনো বা তার প্রাচীন অস্তিত্বকে

করে তুলতে চেয়েছে কলঙ্কের ডালি রূপে; আবার কখনো সেই মানব জাতি নব সৃষ্টির সাথে প্রাচীনত্বের মেলবন্ধন ঘটাতে দৃঢ় বদ্ধপরিকর হয়েছে। বিশ্ব সভ্যতার বর্ণময় রূপ বৈচিত্র মানব সভ্যতার অগ্রগতির এক দৃঢ় সোপান। ক্রমবিবর্তন যেমন মানুষের সভ্যতা রূপী রঙ্গমঞ্চকে বিশেষ মার্জিত রুচি বোধের আধুনিকত্বের ছোঁয়া জড়িত করেছে; তেমনী সেই প্রাচীন সভ্যতা ভারতের সৃষ্টিশীল প্রগতিবাদের মানব সভ্যতার সেতুবন্ধক রূপে বিশ্ব ইতিহাসের সাথে যোগসূত্র তৈরী করেছে।

"সভ্যতার রঙ্গমঞ্চ" – বিশ্ব সভ্যতার বৈচিত্রময়তার বহিপ্রকাশ। বিগত দিন থেকে বর্তমান এক বিংশ শতক, ক্রমেই কাল প্রবাহে সভ্যতা সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম, অর্থনীতির উপর এক গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে।

মানব রঙ্গমঞ্চে প্রাচীন সভ্যতার রূপরেখা নির্মাণে সমাজের ভূমিকাই অনবদ্য। অতি প্রাচীন কাল থেকে গাছের ডালে রাত কাটানো মানুষ, গুহার মধ্যে দিন যাপন কারী মানুষের দল বিবর্তিত সভ্যতার হাত ধরে আজ বহুতল অট্টালিকাকে প্রাসাদরূপে নির্মাণ করে স্থানু হয়েছে। বনবাসী মানুষ যখন ঐক্যহীন ছিল; তখন প্রতি মুহূর্তে প্রাকৃতিক বিপর্যয় তাদের প্রাণ শংসয়ের কারণ ছিল। বহু ক্ষেত্রেই মানুষ ছিল অসহায়; কখনো বন্য পশু আবার কখনো প্রাকৃতিক দূর্যোগ – মানুষের জীবনের নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করে তুলতো। সংবদ্ধতার গোড়ার কথায় ঐ মানব জাতির ঐক্যবদ্ধ রূপের প্রথম আত্মপ্রকাশ নিরাপত্তার প্রশ্নে। দলগত সমষ্টিগত মেলবন্ধন মানবজাতিকে প্রদান করলো জীবনের অস্তিত্ব শীলতাই নিরাপত্তা। সেই থেকেই গড়ে উঠলো পরিবার তন্ত্র। যা থেকে দল, গোষ্ঠীর মতো ঐক্যবদ্ধ মানব শ্রেণীর আবির্ভাব। মানুষ তখন আর নিজেকে সংকীর্ণতার ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ রাখলো না। দল পরিচালনার জন্য নির্মাণ করলো দলপতি। গোষ্ঠীর প্রধান পরিচিত হল গোষ্ঠীপতি রূপে। সংগ্রহ কারীর পরিচয় দূর করে তখন মানুষ নিজেদের উৎপাদক রূপে সামাজিক পরিচিতি লাভ করলো। বিপুল অংশের মানুষের প্রাচীনের এই গোষ্ঠীবদ্ধতার কারণে নিজেদের পরিচয়ের এই পরিবর্তনের উপযুক্ত পরিসর নির্মাণ করতে সক্ষম হলো। দল-গোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষুদ্রত্ব-বৃহৎ শক্তির আত্মপ্রকাশের জন্য নির্মিত হলো ক্ষমতা দখলের লড়াই। মানুষ আর তখন পারস্পরিক সহযোগীতার ভাবধারা পৃথিবীর সর্বস্তরে টিকিয়ে রাখতে চাইলো না। দল বা গোষ্ঠীগুলি ক্রমশ সংঘবদ্ধ হতে থাকলো; নিজেদের শক্তি বৃদ্ধিই হলো তাদের আসল উদ্দেশ্য। ক্ষমতা দখলের লড়াই দলগুলিকে প্রতি মুহূর্তে আবেগ তাড়িত করতে থাকলো। সমাজের দলপতিরা কখনো উদ্যোগী হয়ে আবার দলীয় সদস্যদের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে আত্ম স্বার্থ পূরণের চেষ্টাই, অধিক ক্ষমতা, অর্থ লালসা, সম্পত্তির কেন্দ্রীকরণের নেশাই ক্রমশ উদগ্রীব হয়ে উঠলো। শুরু হলো হিংসার লড়াই। একাধিক দল ক্রমাগত ক্ষমতাবৃদ্ধির সাথে সাথে শক্তিশালী রাজশক্তিরূপে প্রাধান্য পেতে থাকলো। রাজাই হলেন মধ্যযুগীয় সভ্যতার রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চের নায়ক। সময় অতিবাহনের সাথে সাথে মানবরূপ বিবর্তিত হল। জাতিগত প্রশ্ন সমাজে আত্মপ্রকাশ করলো। নিত্য নতুন দেশ

আবিষ্কার ক্ষমতা দখলের লড়াইএ সমগ্র মানব জাতি নিজেদের যুক্ত করে উগ্র ধর্মান্ধ রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের দ্বারা বিশ্বসভ্যতাকে পরিচালিত করতে উদ্যোগী হলো। বিভিন্ন সময়ে এই ক্ষমতা দখলের লড়াই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামী বৈশাচিক মানব সভ্যতার জন্ম দিল। আধুনিকত্বের ছোঁয়াই জাতীয়তাবাদ, উগ্র রাজনৈতিক অভিসন্ধি, ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের স্বার্থে রাষ্ট্রযন্ত্র কলঙ্কিত হলো। সংকীর্ণ স্বার্থ চিন্তা, একাধিপত্যের লড়াই, গণতান্ত্রিকতা বনাম সমাজতান্ত্রিকতা ধ্বংস করতে থাকল মানব ঐক্যের সুদৃঢ় পথকে। বিশ্বব্যাপী আগ্রাসী মনোভাব জন্ম দিল প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের। সর্বগ্রাসী শক্তিগুলি নিজেদের স্বার্থ চিন্তাকে অতি সক্রিয় করে তুলতে আরো বেশী করে নিজেদের আধিপত্যকে ক্রমাগত মজবুত করে গড়ে তোলার লক্ষে প্রস্তুতি নিতে থাকলো। মানব সভ্যতা কলুষিত হলো। সাফল্য ছিনিয়ে আনতে যেভাবে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামী মনোভাব সৃজন করতে তারা উদ্যোগী হলো; তার প্রভাব পড়লো সমগ্র বিশ্ব জুড়ে। সবলেরা ক্ষয় হলো স্বার্থ সিদ্ধির লড়াইএ অন্যদিকে দুর্বলেরা ক্রমাগত নিঃস্ব হতে থাকলো নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে গিয়ে। প্রতিহিংসায় ক্রোধ প্রশমনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলো বিজয়ী ও পরাজিত শক্তি সমূহ। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই-এ তাই প্রতিষ্ঠিত করলো সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-জাতিসংঘের মতো প্রতিষ্ঠান। ভারত-আফ্রিকার মতো দেশগুলি দীর্ঘ দলদাস-পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকার পর নিজেদের অস্তিত্ব সুরক্ষিত করার উপযুক্ত পরিসর করে নিতে পারলো। জাতি হিংসার লড়াই এর পর ঠাণ্ডা লড়াইএর রূপ লাভ করলো। বিবর্তনের হাত ধরে জাতি ভিত্তিক রাষ্ট্র গঠন, ক্ষমতা দখলের সুপ্ত চেতনা আজও স্বৈরাচারী শক্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে। তবে গণতান্ত্রিক পরিকাঠামো অন্তত পক্ষে রাষ্ট্রগুলির আভ্যন্তরীণ নিয়ম নীতি কিছুটা হলেও দেশবাসীর মঙ্গলার্থে কার্যকরী হতে থাকলো। ভাষা-ধর্মগত অধিকার, খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের অধিকার, শিক্ষার মতো মৌলিক অধিকারের সুরক্ষা আধুনিক রাষ্ট্রগুলি প্রদান করতে যেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো। গড়ে উঠলো আধুনিক বিশ্বের সু-শৃঙ্খল পরিকাঠামো।

ধর্ম ব্যবস্থার রঙ্গমঞ্চ বিশ্ব ইতিহাসের দলিলে খুব প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠার পরিসর তৈরী করে দিয়েছে সভ্যতার বিবর্তন। অতি প্রাচীনেই প্রাকৃতিক বিপর্যয়, অশুভ শক্তির হাত থেকে নিজের সত্ত্বা-অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে প্রয়োজন হয়েছিল অতিপ্রাকৃত শক্তির উপর আস্থা জ্ঞাপন। জল, আগুন, আকাশ, বায়ু, স্বর্গ – প্রকৃতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করে তার অস্তিত্বকে স্থিতিশীল করতে বহু মানুষ লৌকিক ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করলো। বিবর্তনের পথ ধরে সেই প্রতিকৃতির আরাধনা জন্ম দান করলো হিন্দু, বৌদ্ধ জৈন-খ্রীষ্ট-মুসলিম- বা অন্যান্য বিদেশী ধর্মের। ধর্মের তখন পরিচয় মানব জাতির ত্রাতা বা রক্ষাকর্তা রূপে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে সেই ধর্ম তার অবয়ব পরিবর্তন করলো। মানুষ ক্রমশ ধর্মকে ধারণ করার স্বতন্ত্র পরিসর থেকে সরিয়ে এনে তাকে আত্মশুদ্ধির সিংহাসন থেকে সরিয়ে এনে বিনোদনের বাতাবরণ

রূপে তৈরী করলো। তখন থেকে ধর্ম তার আধুনিকতার জগতে পথ হাঁটতে শুরু করলো। বর্তমান মানব সভ্যতায় মানবধর্ম হলো উপেক্ষিত; পরিবর্তে লৌকিক ধর্মের কার্যকলাপ ক্রমশ সমৃদ্ধ হতে থাকলো। কর্মব্যস্ত মানুষ ধর্মকে বিনোদনের পরকাষ্ঠারূপে চিত্রিত করে তাকে বিশেষ ভাবে জনপ্রিয় করে তুললো। আধুনিক ধর্ম ভাবনা সভ্যতার রঙ্গমঞ্চকে অধিকতর সমৃদ্ধি দানের পরিসর নির্মাণ করলো। বিনোদনের জগতের অন্যতম উপাদান হলো ধর্ম। যদিও এর ভালো মন্দের রূপরেখা নির্মাণ সমাজ ও কখনো কখনো ব্যক্তি সাপেক্ষ রূপে প্রতিষ্ঠিত হলো। ধর্মের আধুনিকতার সমৃদ্ধতম রূপ হলো ঐক্যবদ্ধতা। ধর্মীয় আচার পালনে একই ধর্মের কখনো বা ভিন্ন ধর্মের মানুষের অংশগ্রহণ সমৃদ্ধ করলো মানব চরিত্রকে। ধর্মান্ধতার গোঁড়ামী আধুনিক শিক্ষিত মানব জাতিকে বিনোদন ও মানবতন্ত্রের মেলবন্ধনকারী উপাদান রূপে আত্মপ্রকাশ করলো। আবার অনেক ক্ষেত্রে সেই ধর্ম সংকীর্ণ মনোভাবনাকে অধিক গুরুত্ব দিতে গিয়ে জেহাদী বিপ্লবের মতো ধ্বংসাত্মক কার্যক্রমকে বিকশিত করতে সক্ষম হলো। ধর্মের পরিচালক গোষ্ঠীর সংকীর্ণ ধর্ম চিন্তা বৃহৎ ধর্মগুলিকে ছোট ছোট টুকরোতে পরিণত করলো। ফলে ধর্ম তার আসল উদ্দেশ্য হারালো। উপেক্ষিত হলো সনাতন ধর্মের আদি রূপ। তবে সেই বিভাজনগত রূপরেখা বর্তমান ধর্ম ব্যবস্থার নিজস্ব অস্তিত্বকে বড়ো করে দেখাতে যেন আজও বদ্ধপরিকর। সামাজিক ভাবনা-অনুযায়ী আপন ধর্মের সার্বজনীনতা প্রতিষ্ঠা করতে উগ্র ধর্ম ভাবনা আজও সমগ্র বিশ্বে জাগরিত। সমাজ ভাবনা ভারত বাসীর ও বিশ্ববাসীর নিজস্ব বিষয়। প্রাকৃতিক পরিবেশের উপরেই সমাজ ভাবনার মূল স্রোত প্রতিষ্ঠিত। তাই দেশ কালের গণ্ডী ভেদে সামাজিক স্তর ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রবর্তিত হয়। প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় স্তর বিশ্লেষণে যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য-শূদ্র এই বর্ণ বিভাজন যেমন স্পষ্ট রূপে প্রবর্তিত হয়েছিল; বিশ্বের অপরাপর উন্নত দেশগুলিও অনেক ক্ষেত্রে তাদের সমাজ বিন্যাসের স্তরে সামন্ততন্ত্র-ক্রীতদাস ভিত্তিক বর্ণ ব্যবস্থার স্তরায়ণকে সম্যকভাবে প্রতিষ্ঠা দিতে উদ্যোগী হয়। সামাজিকতার কেন্দ্রবিন্দু রূপে ধর্ম ও বর্ণের পাশাপাশি অর্থনৈতিক রূপরেখার মানদণ্ড অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সামাজিক ভাবনার স্তরায়ণ নিঃসন্দেহে সমাজ ঐক্যের বিরুদ্ধ পথ। পেশা ভিত্তিক সমাজ স্তর ক্রম বর্ধমান হতে থাকল সভ্যতাগুলিতে প্রাচীন এই ঐতিহ্যকে আঙ্গিক করে ক্রমাগত এই স্তর ভাবনা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়লো বিভিন্ন ভাবে। ধর্মের শ্রেণী-বিন্যাস সামাজিক স্তরায়ণকে অনেক অংশে ইন্ধন যুগিয়েছিল। প্রাচীন যুগে যে স্তর ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার আগমন – মধ্যযুগে তার চরম পর্যায়। পরিবর্তিত স্তর ভাবনা আধুনিক সভ্যতাগুলিতে মননে থাকলেও রঙ্গমঞ্চের আধুনিক সভ্যতা আর কর্মক্ষেত্রে স্তর বিভাজনকে গুরুত্ব দিতে নারাজ। তার ফল হিসাবে দেখা গেল আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার রূপরেখা এখন দক্ষতা কেন্দ্রিক। সামাজিক প্রথাগত উচ্চ-নিচ মানব জাতির মেরুকরণের যথাযথ পরিমণ্ডলে আর বিন্যস্ত নয়।

সামাজিক রূপরেখা নারী পুরুষের যোগ্যতার মানদণ্ডকে আরো একবার

আধুনিকত্বের রঙ্গমঞ্চে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে বিশেষ উদ্যোগী ভূমিকা পালন করলো। দেখা গেল যে পুরুষ তান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার রূপরেখা প্রাচীন কালের চিরায়ত গণ্ডীকে অতিক্রান্ত করে যোগ্যতা নির্ণায়ক মানদণ্ড রূপে নারী-পুরুষের অস্তিত্ব রক্ষার দিকটিই প্রধান ভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলো। ফল হিসাবে দেখা গেল আধুনিক বিশ্ব বিন্যাসের রূপকার হিসাবে নারী-পুরুষ নিজ নিজ যোগ্যতার মানদণ্ডের দ্বারা নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হলো। পুরুষ তার একছত্র ক্ষমতা ধারণের কেন্দ্রীকরণে আবদ্ধ থাকতে পারলো না।

সামাজিকতার রূপরেখা নবরূপে বিকশিত হওয়ার বিচিত্রমুখী পরিবর্তন আধুনিকতার ছোঁয়া ধরা পড়লো। প্রাচীন খাদ্যরীতি আধুনিক খাদ্যরীতিকে প্রভাবিত করলেও তার রূপের – অবয়বের আমূল পরিবর্তন সাধিত হল। ভাষাগত বৈচিত্র আরো বেশী পরিমাণে বহুবিধ রূপে বিশ্বের বুকে আত্ম প্রকাশ করতে থাকল। তার সাথে সাথে যদিও শেষ পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ সার্বজনীন ভাব প্রকাশক ভাষার আত্মপ্রকাশ বিশ্বের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করলো। বলা বাহুল্য এই ভাব প্রকাশক ভাষার কেন্দ্র বিন্দু যে ইংরেজি ভাষা – তা স্বীকার করতেই হয়। পোষাকের বৈচিত্র্যময় রূপ সভ্যতার রঙ্গমঞ্চে ক্রম আধুনিকতার স্তরকে অবলম্বন করে আত্ম-প্রকাশের সহায়ক পরিবেশ নির্মাণে উদ্যোগী হলো। পোশাকগত বৈচিত্র্য নারী-পুরুষ ভেদে বিশ্বের সব স্তরে ভিন্নরূপে সমাদৃত হতো। কিন্তু বর্তমানে তার রূপের বিভিন্নতা আরো বেশী প্রকাশিত হতে থাকলো। তবে পোশাকের বিভিন্নতা সত্ত্বেও তার এক বিশ্বায়ণ গত রূপরেখা ক্রম স্পষ্ট রূপে প্রকাশিত হতে থাকলো। মানব সমাজ পোশের দুনিয়ায় আধুনিক যুগে এতটাই বিপ্লব ঘটালো যে যেখানে লিঙ্গভেদে পোশাকের পার্থক্যটুকু আর সীমাবদ্ধ থাকলো না।

সভ্যতার রঙ্গমঞ্চে আধুনিক মানুষ আরো বেশী সুখ বিলাসীরূপকে প্রাধান্য দিতে স্বীকৃত হলো। নগরায়ণ, দ্রুত অত্যাধুনিক যাতায়াত ব্যবস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থার সর্বাধুনিক বৈপ্লবিক যন্ত্রের আবিষ্কার ও ব্যবহার মানুষকে তার হাতের মুঠোয় বিশ্বকে এনে দিল। ফল হিসাবে দূর আর দূরে রইল না। সারা বিশ্বের এক ঐক্যবদ্ধ রূপরেখা – এখন মানব জাতির মূল কেন্দ্রীয় স্তরে এসে আবর্তিত হতে থাকলো।

স্বাস্থ্য চেতনার স্তরায়ণে আধুনিক মানব রঙ্গমঞ্চে যথেষ্ট সমৃদ্ধ। তবে প্রাচীন বা মধ্যযুগের স্বাস্থ্যের চরম পরিণতি হিসাবে যেখানে মৃত্যুই ছিল জীবনের শেষ কথা – আধুনিক যুগেও সেই দাবীকে পরিবর্তন করা গেল না। বর্তমান জীবনধারা অত্যাধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার দৌলতে হয়তো নবরূপে মানুষের স্থিতিশীলতাকে অধিক বেশী সুরক্ষিত করতে সক্ষম হলো ঠিকই কিন্তু তার অস্তিত্ব কোন ভাবেই শ্বাশ্বত হতে পারলো না। মানুষের গড় আয়ু কিছুটা বাড়লো বটে কিন্তু তার অস্তিত্ব অমরত্বের অমৃত সুধা পান করতে আধুনিক যুগেও ব্যর্থ। ক্রমে মানব সংস্কৃতির জীবনে প্রথাগত শিক্ষার জয়জয়াকার ঘোষিত হলো। টোল – মক্তব কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার অসাড়তা প্রমাণিত

হতে থাকার পাশাপাশি আধুনিক উন্নত শিক্ষা-ব্যবস্থার সম্প্রসারণ স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটি কেন্দ্রিক রূপে আত্মপ্রকাশ শীল হতে থাকল। আধুনিক শিক্ষাই যে সভ্যতার রঙ্গমঞ্চের প্লট পরিবর্তনের মূল কারিগর তা মেনে নিতে দ্বিধা নেই।

ফল হিসাবে সভ্যতা ক্রমে নব্যরূপ দখল করে বিকশিত হতে থাকল। সাহিত্যের নব নব রূপ দিক উন্মোচিত হলো। বর্তমান সাহিত্য কখনো রোমান্স, কখনো ইতিহাস, কখনো বা মনস্তাত্ত্বিক সূক্ষ্ম বাতাবরণের আঙ্গিককে অবলম্বন করে ক্রম বিকশিত হতে থাকলো। গড়ে উঠলো আধুনিক সমাজ ভাবনার নিরিখে নব ধর্মের দীপালোকে মানব সাহিত্য।

ধর্ম ভাবনা তার রূপরেখাকে সমৃদ্ধ করতে গিয়ে ক্রমশ সাহিত্যের পরিসরকে নবরূপে নির্মিত করলো। বর্তমান বিশ্ব সভ্যতার প্রতিচ্ছবি তাই ধরা পড়লো আধুনিক সাহিত্যের দর্পণে। সেখানে সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতি-ধর্মনীতির সুপরিকল্পিত কাঠামো ক্রমেই প্রকাশশীল হয়ে উঠলো।

সভ্যতার আধুনিকত্বের ছোঁয়া অর্থনীতির মেরুদণ্ডকে ভিন্ন রূপে মানব জাতির কাছে পৌঁছে দিতে যেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। পূর্বের দিনে যেখানে শুধুমাত্র কৃষিজ উৎপাদন ভিত্তিক অর্থনীতি সমাজের মূল কাঠামো তৈরীর উপাদান ছিল; সেখানে তার প্লট পরিবর্তনের উল্লেখযোগ্য রূপান্তর ঘটাতে আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থা শুধুমাত্র আর কৃষিকেন্দ্রিক হয়ে থাকলো না। পশুপালন-কুটির শিল্প কেন্দ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা ক্রমশ তার অত্যাধুনিক রূপরেখাকে মানব জাতির কাছে নবরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে যেন দৃঢ় সংকল্প বদ্ধ হলো। ফলে বৃহদায়তন শিল্প কারখানা, খনিজ উৎপাদন যেমন অর্থনীতির মেরুদণ্ডকে আধুনিক ধারায় ক্রম সংঘবদ্ধ করতে থাকলো; তেমনী সেবা মূলক অর্থনীতির ধারা, তথ্য প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ধারা ক্রমশ সংঘবদ্ধ রূপে আধুনিক মানব জাতির সমৃদ্ধির রূপকার হিসাবে আত্মপ্রকাশের সহায়ক পরিবেশ নির্মাণ করতে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করলো। বর্তমান মানব রঙ্গমঞ্চে শ্রম ব্যবস্থা শুধুমাত্র আর অঞ্চল ভিত্তিক রইলো না। তা ক্রমশ সম্প্রসারণ হতে হতে বিশ্বায়ণের স্তরে পৌঁছে গেল। মুক্ত বাণিজ্য নীতি, শিল্পনীতির সার্বজনীন রূপরেখা, বাজার ধরে রাখার উদ্যোগ উৎপাদনকারী দেশগুলির অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথ অনেক ক্ষেত্রে পরিষ্কার করে দিল। নির্মাণ ব্যবস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, পোশাক-শিল্প-পর্যটন শিল্প আধুনিক অর্থনীতির মেরুদণ্ডকে যেন ক্রমশ শক্তি প্রদান করলো।

আধুনিক রঙ্গমঞ্চের সমাজ ব্যবস্থার মূল্যায়ণে এতটুকু বলাই যায় যে এই সমাজ ব্যবস্থা ক্রমশ কৈশোর, বাল্যকাল অতিক্রম করে আধুনিকত্বের ছোঁয়া পেয়ে উন্নীত হলো যৌবনে। সভ্যতা-সমাজের রূপরেখায় মানব জাতির এই যৌবন কাল এক উদ্দীপনাময় পর্ব। একদিকে প্রাচীনের ঐতিহ্য; অন্যদিকে আধুনিকত্বের স্বাদ – যুগপৎ এই দ্বিবিধ রূপকে অবলম্বন করে আধুনিক মানব সভ্যতার রঙ্গমঞ্চ নিজেকে পূর্ণ রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে যেন বিশেষ ভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠলো। ফলে মানব জাতি তার স্বতন্ত্র সত্ত্বার

সুরক্ষা নির্মাণে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে; নব সভ্যতার অগ্রগতির সোপান পথ আরো সমৃদ্ধ করতে যেন ক্রমশ অগ্রগতির সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে যেতে সক্ষম হলো। মানব সভ্যতার নবরূপায়ণ তৈরি করলো আধুনিক উন্নত সভ্যতার রূপরেখা। যদিও এই সভ্যতায় অনেক অংশে কিছুটা ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা দিল। কখনো কখনো হিংসাশ্রয়ী মনোভাব – যুদ্ধের প্রতি আন্তরিক ধ্যানধারনার মূল মেরুদণ্ডকে ভেঙে ফেলতে উদ্যোগী হলো। আবার উন্নয়ণের গতি ধারায় আধুনিক মানব রূপ কখনো কখনো দুর্বল পরিকাঠামোর দ্বারা বিধ্বস্ত হলো। প্রগতি থাকলেও, ঐক্যবোধ থাকলেও সমগ্র বিশ্বব্যাপী আধুনিক মানুষের অন্তরে ক্রিয়াশীল হয়ে থাকলো অবিশ্বাসের বাতাবরণ। তাই আধুনিক মানব জাতি তাৎক্ষণিক সুখভোগের দ্বারা পরিচালিত হতে বাধ্য থাকলো। অবিশ্বাস, পঙ্গু মনের কৃত্তিমতা দীর্ঘস্থায়ী সমৃদ্ধি আধুনিক মানব সংস্কৃতির রঙ্গমঞ্চের এক ভগ্ন দিক হিসাবে উল্লেখিত হয়ে থাকলো বর্তমান সভ্যতায়।

তথ্যসূত্র :

১। Pascal Boyer, Religion, Explained : The Evolutionary Origins of Religious Thought — New York : Basic Books, 2001, Page 51-73.

২। A History of Writing “2004” — Fischer Steven Roger — Reaktion Books, Page 36-38, 49, 50.

৩। Theory of the Circulation of Elites — Paroto, Penguin, Page 92.

৪। সভ্যতার বিবর্তন — সৈয়দ মুলতাজিম আলী বখতিয়ার — মডার্ন প্রকাশনী, পৃ. ৬৩.

৫। রাজনৈতিক সমাজতত্ত্বের ইতিবৃত্তান্ত : তত্ত্ব ও প্রয়োগ — সচ্চিদানন্দ রায় — এভেনেল প্রেস, পৃ. ৪৩, ৪৪, ২৫৪-২৫৯.

ঐতিহাসিক মূল্যায়নের নিরিখে চর্যাপদে আদিবাসী এবং নিম্নবর্গীয় সমাজজীবন চিত্র

সাগরিকা সাহা
গবেষক, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সংক্ষিপ্তসারঃ বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদ। চর্যাগীতি বাংলাদেশের বৌদ্ধ সাধকদের সাধনসঙ্গীত। চর্যাগানগুলির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় তত্ত্ব। চর্যাগীতির মূল বিষয় তত্ত্ব হলেও, তা নীরস, জীবনবিমুখ কখনই ছিল না। চর্যাগীতিতে বরং সামাজিক জীবনের নানা ছবি ও রূপক প্রতীকতার প্রকাশে পরোক্ষভাবে উদঘাটিত তৎকালীন সমাজজীবন পরিবেশ সংক্রান্ত নিবিড় তথ্যাদি। এই প্রবন্ধে চর্যাগীতিগুলির তাত্ত্বিক আলোচনা নয়, ব্যবহারিক অর্থে লোকজগতের যে সমাজ জীবনঅভিজ্ঞতা, চরিত্রচিত্রণ, তৎকালীন বাস্তব সমাজ-সময় ফুটে উঠেছে, আদিবাসী এবং নিম্নবর্গীয় মানুষদের আর্থসামাজিক দিকটি ফুটে উঠেছে এই বিষয়টি আলোচনার মাধ্যমে এই প্রবন্ধে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

শব্দসূচকঃ চর্যাপদ, আদিবাসীসমাজ, নিম্নবর্গীয়।

মূল আলোচনাঃ

বাংলা সাহিত্যের আদি প্রাচীনতম নিদর্শন হিসাবে ‘চর্যাপদ’-কে চিহ্নিত করা হয়। নেপাল দরবার গ্রন্থাগার থেকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ‘চর্য্যাচর্যবিনিশ্চয়’ গ্রন্থখানি আবিষ্কার করেন। প্রাচীন বাংলার বিস্মৃত আদিযুগের এই গ্রন্থে সংস্কৃত ভাষ্যসহ বৌদ্ধগান পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের নামকরণ, সময়কাল, ভাষা অনেককিছু নিয়ে নানান তর্ক-বিতর্ক, দ্বিমত থাকলেও কখনই অস্বীকার করা যায় না যে চর্যাপদের গানের মধ্যে গৌড়বঙ্গের প্রাচীন সমাজজীবনের ছবি, জীবনের বাস্তব পটভূমির কিছু তথ্য নিহিত রয়েছে।

চর্যাপদ বাংলার বৌদ্ধ সাধকদের সাধনসঙ্গীত, তাই এই কাব্যের উদ্দেশ্য কখনই সামাজিক ইতিহাস বর্ণন নয় ঠিকই কিন্তু সাহিত্য মাত্রেই বলা যেতে পারে সময়ের সমাজের দলিলদর্পণ। চর্যাপদও যেহেতু জীবন-নির্ভর সাহিত্য সেক্ষেত্রে প্রাচীন সমাজ সময়ের জনজীবনের আর্থসামাজিক চিত্র চর্যাপদে পরিস্ফুট। সাহিত্যের মূল্য কেবল তার কাব্য সৌন্দর্য্যে প্রকাশ পায় না, সেক্ষেত্রে ঐতিহাসিক মূল্যায়নও গুরুত্বপূর্ণ। চর্যাপদে শতাধিক হাজার বছর পূর্বের বৃহৎবঙ্গের নিম্নবর্গের সামাজিক ইতিহাসের যে চিত্র পাওয়া যায় সেই বিষয়টি এই প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয়।

চর্যাপদে বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতির বর্ণনার পাশাপাশি নিম্নবর্গীয় এবং আদিবাসী মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপনের চিত্র, তাদের জীবিকা, সেকালের সমাজব্যবস্থা ও আর্থসামাজিক পরিস্থিতির কথা পাওয়া যায়। এই আলোচনায় চর্যার গানের তাত্ত্বিক অর্থ

আলোচনার দিকে যাব না, কেবল সাধারণ অর্থে চর্যাগানের ব্যবহারিক দিকের কথা মাথায় রেখেই চর্যাপদে আদিবাসী ও নিম্নবর্গীয় সমাজজীবনের যে চিত্র পাওয়া যায় সেই বিষয়টি আলোচনা করব।

চর্যাপদে শুঁড়ি, ডোম, চন্ডাল, ব্যাধ, কাপালিক, শবর ইত্যাদি নিম্নবর্গ এবং আদিবাসীদের উল্লেখ পাওয়া যায়। চর্যাপদে আমরা দেখব এই যে নিম্নবর্গীয়দের প্রসঙ্গ উল্লেখ আছে তারা কেবল সমাজে নিম্নজাতের ছিল না, তারা পেশার দিক থেকে এবং আর্থিক দিক থেকেও অনুন্নত ছিল। পদগুলিতে উক্ত জাতিগুলির যে জীবিকার কথা পাওয়া যায় তা কখনই উচ্চমানের নয়। বিরূপপাদের ৩ নং পদে শুন্ডিনী অর্থাৎ শুঁড়িদের মদচোলাই বৃত্তির কথা পাওয়া যায়। ভুসুকুপাদের ৬ নং পদে ব্যাধের শিকার বৃত্তির কথা, কাহ্নপাদের ১০ নং পদে ডোমদের বৃত্তি তাঁত বোনা, নটবৃত্তি ও চাঙারি তৈরি, খেয়া পারাপার করার চিত্র পাওয়া যায়। এছাড়াও পাটনী বৃত্তি, শবদাহ, কাঠের কাজ, কাপালিক সেজে নটবৃত্তি ইত্যাদি নিম্নমানের পেশার উল্লেখ পাওয়া যায়। চর্যাপদে বর্ণিত সমাজের নিম্নস্তরের মানুষদের আর্থিক অবস্থা যে অনুন্নত ছিল তা তাদের পেশাগত বৃত্তি দেখে বোঝা যায়।

চর্যাপদে ডোমনী, চন্ডাল, শুঁড়ি, কাপালিক, ব্যাধ, শবর-শবরী প্রভৃতি আদিবাসী এবং নিম্নশ্রেণীর উল্লেখ পাই তারা যে সমাজের অভিজাত উচ্চবর্গীয়দের কাছে অস্পৃশ্য কাহ্নপাদের ১০ নং পদে তা স্পষ্ট :

"নগর বাহিরি রেঁ ডোম্বি তোহোরি কুড়িয়া।
ছই ছোই জাই সো ব্রাহ্মণ বড়িয়া।। ধ্রু ।।" ১

ডোমদের নগরের বাইরে বসতি এবং তারা ব্রাহ্মণের স্পর্শ এড়িয়ে চলত তা এই পদ থেকে স্পষ্ট। শবর-শবরী, ডোম, চন্ডাল এদের বসতি মূল নগর বা জনপদের থেকে দূরে উঁচু পাহাড়ে – টিলায় কিংবা জঙ্গলের ধারে। শবর পাদের ২৮ নং পদেও এর উল্লেখ পাওয়া যায় –

"উঞ্চা উঞ্চা পাবত তহিঁ বসই সবরী বালী।" ২

এই পদগুলিতে নিম্নবর্গীয় মানুষদের সমাজজীবনের, তাদের বসবাসের, সামাজিক অবস্থানের রূপটি চিত্রিত। সমাজের উচ্চবর্গ অর্থাৎ ব্রাহ্মণরা যে এই নিম্নবর্গীয় আদিবাসী মানুষদের স্পর্শে নিজেদের কলুষিত করতে চাইতেন না তা স্পষ্ট। চর্যার সময়কাল নিয়ে অনেক দ্বিমত আছে, তবে ধরে নেওয়া হয় অষ্টম-একাদশ শতাব্দীর মধ্যেই এর রচনাকাল। যে সময়ে এই গানগুলি রচিত হয়েছিল সেইসময়ে সেন রাজবংশের আধিপত্য হওয়ায় এবং তারা ব্রাহ্মণ ধর্মালম্বী হওয়ায় ব্রাহ্মণ্যস্মৃতির প্রসার ও ব্রাহ্মণ্য বর্ণাশ্রম প্রথা অনুযায়ী সামাজিকস্তর বিভাগ শুরু হয়। যদিও এই স্তরবিভাগ আধুনিককালের জাতিভেদ প্রথার থেকে অনেকটাই আলাদা। তৎকালীন সময়ে চর্যাকারগণ ছিলেন বৌদ্ধ এবং তারা ধর্মাচারের দিক থেকে ছিল বেদবহির্ভূত

এবং অনেক কবিই ডোম্বী, বঙ্গাল, কামলি, শবর প্রমুখ অন্ত্যজ শ্রেণীর। এই কারণে তাদের পদেও অন্ত্যজশ্রেণীর কথা পাই। যদিও চর্যাগানে বর্ণিত ডোমনী, শবরী, কাপালিক, চন্ডাল কেউই প্রকৃত চরিত্র নয়, মহাসুখ বা সহজানন্দের রূপকবিগ্রহ। কিন্তু ব্যবহারিক দিক দিয়ে পদগুলির বিশ্লেষণে সেকালে রচিত নানা শিলালিপি, তাম্রশাসন এবং স্মৃতিগ্রন্থাদিতে যে সামাজিক ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় চর্যাগীতিতেও পরোক্ষভাবে রূপকের মোড়কে তৎকালীন সময়ের ইতিহাসকে তুলে ধরে।

চর্যায় ডোমজাতির জীবনচিত্র বর্ণিত হয়েছে ১০, ১৪, ১৮, ১৯ নং পদে। ডোমেদের নগরের বাইরে বাস এবং তারা ব্রাহ্মণ্যদের অচ্ছুত। সমাজজীবনে ডোমনারীরা নটবৃত্তি গ্রহণ করে লোকের মনোরঞ্জন করত ১০ নং পদে তা চিত্রিত। কাপালিকরা ডোমনারীদের বিশেষভাবে পছন্দ করতেন এবং তাদের সঙ্গ পেতে চাইত ১০ নং পদে এই বিষয়টি স্পষ্ট। ১৮ নং পদে দেখা যায় ডোম্বী নারীদের নৃত্যচঞ্চলা রূপ অনেককে আকর্ষণ করত এবং তারা কুলীনেরও সেবা করত, কাপালিককেও প্রত্যাখ্যান করত না। ১৮ নং পদে ডোম্বী মাতঙ্গকন্যা যোগীকে বিনামাশুলে নৌকায় পারাপার করে দেয়। এখানে ডোম্বী নারীর সহজসরল ও দয়ালু হৃদয় ও তার পেশার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯ নং পদে ডোম্বীদের বিবাহচিত্র পাওয়া যায়। এই বিবাহচিত্রের সাথে সাধারণ বিবাহরীতির অনেক মিল বিদ্যমান। বিবাহে বরের যৌতুক লাভ, বরদোলায় যাত্রা, উলুধ্বনি ইত্যাদি চিত্রিত। এই পদগুলিতে ডোম জনজীবনের কিছু আর্থসামাজিক চিত্র আভাসিত হয়েছে।

আদিঅস্ট্রালের এক গোষ্ঠী নিষাদ,যাদের জাতিবৃত্তি শিকার। ভুসুকুপাদের ৬ এবং ২৩ সংখ্যক পদে হরিণ শিকারের ক্ষেত্রে এই নিষাদ গোষ্ঠীর উল্লেখ পাওয়া যায়।

হিন্দুসমাজের আর এক নিম্নশ্রেণী চন্ডাল। ৪৭, ৪৯, ৫০ সংখ্যক চর্যাগানে চন্ডাল জনজাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। চন্ডালদের জাতিবৃত্তি শশ্মানে শবদাহ করা। চর্যাপদেও চন্ডালের এই বৃত্তির উল্লেখ ৫০ সংখ্যক গানে পাই। যেখানে শবরের মৃত্যু হলে চন্ডালীকে দিয়ে মৃতদেহ দাহ করা হয়। ৪৭ সংখ্যক গানে চন্ডালী অর্থাৎ বহ্নির রূপক এই পদে। সেই আগুনে ডোম্বীর ঘর, হরিহর-ব্রহ্মা, শাসন–পাট্টা সব পুড়ে যাচ্ছে। ৪৯ সংখ্যক পদে দেখি ভুসুকু গৃহিণী বঙ্গালের আক্রমণে বা লুঠে সম্ভবত মারা গেলে তাকে চন্ডালের হাতে দিতে হয় অর্থাৎ মৃতদেহ দাহ করার অর্থে।

চর্যাপদে শবরীপাদের ২৮ এবং ৫০ সংখ্যক গানে শবর-শবরী এই আদি জনগোষ্ঠীর সজীব জীবনালেখ্য ফুটে উঠেছে। এই দুই পদের কবি শবরীপাদ, যিনি তাঁর গুরু নাগার্জুনের আদেশে শ্রী পর্বতে বসবাসকালীন শবর জাতি সুলভ জীবনযাপন করেন। এই কারণে খুব সুন্দরভাবে শরব জনজাতির জীবনের কিছু চিত্র ফুটে উঠেছে এই পদে। শবর-শবরীদের বাস উঁচু পার্বত্য অঞ্চলে। তারা বন বিহারকালে তাম্বুর, কর্পূর খায়, মিলনকালে তিনধাতুতে নির্মিত খাট পাতে। শবরী কন্যারা একা সেজে বন বিহারে যেত। শবরী কন্যাদের পরিধেয় ছিল ময়ূরের পালক নির্মিত এবং গলায়

অলংকার হিসাবে গুঞ্জা বিচির মালা থাকত, কর্ণে কর্ণকুন্ডল। এই চর্যায় শবর-শবরীর সম্ভোগমিলনের চিত্রের পাশাপাশি তাদের জীবনযাত্রার কিছু প্রণালী আভাসিত।

৫০ সংখ্যক পদে শবর-শবরবীর লৌকিক জীবন চিত্র ছাড়া তাদের বৌদ্ধতন্ত্রে ভূমিকা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত। এই পদেও শবরদের বাস পর্বতাঞ্চলেই। তাদের মৃত্যুর পরও চন্ডালীকে দিয়ে শবদাহ করা হয়। শবরের বাড়ির পাশেই কাপাস ফোটে, এগুলি কৃষি নৈপুণ্যের পরিচয় বহন করে। এছাড়া কঙ্গুচিনা ধান পেকে উঠলে তা থেকে তৈরি মাদক পানীয় পান করে শবর-শবরী জ্যোৎস্নারাতে জীবন-সম্ভোগে মত্ত হয়। শবর-শবরীর দাম্পত্য জীবনযাপনের রুচিসঙ্গত ভোগোন্মও একটি দিক উদ্ভাসিত হয়েছে এই পদে। ঢেন্ডনপাদের ৩৩ সংখ্যক গানে এক নিম্নবর্গীয় দারিদ্র গৃহজীবনের ছবি আভাসিত – 'হাড়ীতভাত নাঁহি নিতি আবেশী।।" হাঁড়িতে ভাত নেই অথচ অতিথিদের আগমন লেগেই থাকত। কুক্কুরীপাদের ২০ সংখ্যক চর্যাগীতিতে এক বেকার, লম্পট উদাসীন, ভবঘুরে স্বামীর কথা পাই। গানটি যেন এক দুঃখী দরিদ্র নারীর অশ্রু সজল দুঃখবেদনার চিরন্তন রূপ। স্ত্রী চায় গৃহমুখী স্বামী, ঘরমুখী সন্তান, কিন্তু সে তা পায় না। না সে সন্তানকে পায়, না স্বামীকে। পদে ভাঙা কুঁড়ে ঘরের উল্লেখ আছে যা থেকে আর্থিক অনটনের কথা স্পষ্ট। এই চর্যায় হতভাগিনী গ্রাম্যরমণী করুণ আত্মভাষণের মধ্যে দিয়ে বাঙালী দরিদ্র গৃহজীবনের দুঃখের ছবি উদ্ভাসিত।

উক্ত আলোচনার মধ্যে দিয়ে আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি বিকীর্ণ গার্হস্থ্য সাধারণ গৃহজীবনের ছবি। পদগুলিতে বক্রোক্তি হাস্যরসের ছলে, রূপক প্রতীকতার মধ্যে দিয়ে আদিবাসী সম্প্রদায় এবং হিন্দু সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণীভুক্ত নিম্নবর্গীয় মানুষদের জীবনচর্যা ফুটে উঠেছে। চর্যাপদে যেমন ধর্মজীবনের কথা পাই, তেমনি জন্ম-মৃত্যু বিবাহ প্রসঙ্গে শতাধিক হাজার বছর পূর্বের নানান আচার-রীতির উল্লেখ পাই, বস্ত্র-অলংকার–বাসস্থান–খাদ্যপানীয়-জীবিকা–ব্যক্তিজীবন–দাম্পত্যজীবনের কথা পাওয়া যায়। প্রায় হাজার বছরের পুরাতন জীবনাচরনের অনুবৃত্তি, অতি সাধারণ নিম্নশ্রেণীর জনজাতির দৈনন্দিন জীবনচর্যা চিত্রের চিত্রশালা চর্যাগীতিগুলি। চর্যাপদগুলিতে বর্ণিত বাস্তব জীবনের যে ছবি পাওয়া যায় তার সাথে আধুনিক সমাজের সামঞ্জস্য বিদ্যমান। আসলে আধুনিককালে সামাজিক রীতিনীতি, সংস্কার সমাজগড়ণ চিত্র এই সবকিছুই প্রাচীন জীবনাচরণের অনুবৃত্তি। অতীতের ব্রাহ্মণ্য সমাজবিধি বর্ণভেদ, শবর, ডোম, চন্ডাল, নিষাদ, কালাপিক, বঙ্গাল এই সমস্ত অন্ত্যজ জাতির জীবনালেখ্য স্মৃতি, তাদের অবস্থানচিত্র বহন করে চলেছে চর্যাপদের এই গানগুলো। এই কারণে তৎকালীন দেশ-কাল-সমাজ-পটভূমির নিরিখে ঐতিহাসিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে চর্যাপদের গুরুত্ব অপরিসীম। চর্যাদপদের এই পদগুলি থেকে আমরা আমাদের প্রাচীন সমাজ সংস্কৃতি-সংস্কার সম্পর্কে কিছুটা হলেও ধারণা পাই।

সমাজের চোখে যারা অন্ত্যজ, নিম্নশ্রেণীর, যারা আদিবাসী তারা উচ্চবর্গীয় মানুষদের কাছে অচ্ছুত। সে হাজার বছর পূর্বেই হোক কিংবা বর্তমানে স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরও প্রায় এখনো অনেক জায়গাতেই এই চিত্র বর্তমান। তবে পূর্বের থেকে এই পরিস্থিতি অনেকাংশে পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে আদিবাসী নারী দেশের রাষ্ট্রপতি এবং অনেক আদিবাসী ও নিম্নবর্গীয় শ্রেণীর মানুষরা শিক্ষা ও পেশাগত দিক থেকে উন্নত হয়েছে। হাজার বছর পূর্বে সমাজ কেমন ছিল তা ইতিহাস, সাহিত্য ছাড়া কখনোই জানা যায় না। অতীতকে জানতে হলে আমাদের বারবার ইতিহাসের শরণাপন্ন হতে হয়। যে কাব্য সাহিত্যে সামাজিক ইতিহাসের উপাদান পাওয়া যায় সেই সাহিত্যের মূল্য ঐতিহাসিকতার দিক দিয়ে অনেকখানি। এতগুলো কথা বলার একটাই কারণ : চর্যাপদে যে দৈনন্দিন জীবনযাপনের চিত্র পাওয়া যায় তা আদিবাসী এবং হিন্দুসমাজের অন্ত্যজ শ্রেণীর। যে শ্রেণী সমাজের উচ্চবর্গীয়দের কাছে অচ্ছুত তারাই চর্যাপদের মূল কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসাবে চিত্রিত। সর্বোপরি আলোচনার পর একথা বলতে দ্বিধা নেই বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদে বর্ণিত আদিবাসী ও নিম্নবর্গীয় সমাজজীবনে যে চিত্র পাওয়া যায় তার ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম।

তথ্যসূত্রঃ

১. চক্রবর্তী, জাহ্নবী কুমার। ‘চর্যাগীতির ভূমিকা’। ডি.এম লাইব্রেরী। মার্চ ২০০৫। পৃঃ ২০৮ ।

২. তদেব, পৃঃ ২১৪।

সহায়ক গ্রন্থঃ

১. চক্রবর্তী, জাহ্নবী কুমার। ‘চর্যাগীতির ভূমিকা’। ডি.এম লাইব্রেরী। ১৩৯০ (দ্বিতীয় সংস্করণ)। কলকাতা – ৭০০০০৬।

২. দাশ, ড. নির্মল। ‘চর্যাগীতি পরিক্রমা’। দে’জ পাবলিশিং। প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৯৭। কলকাতা – ৭০০০৭৩।

নিম্নগাঙ্গেয় অঞ্চলের ইতিহাসচর্চিত সেকাল-একালের গ্রন্থপঞ্জী

দীপঙ্কর নস্কর
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
বিধানচন্দ্র কলেজ, আসানসোল

সারসংক্ষেপ : পুরাতাত্ত্বিক উপাদানের পাশাপাশি লিখিত উপকরণ হলো ইতিহাসের অন্যতম প্রানস্বরূপ। নিম্নগাঙ্গেয় অঞ্চল একটা অনিশেষ সম্পদের খনি। জিজ্ঞাসু চোখ নিয়ে তার মধ্যেকার সম্পদকে বা উপকরণ সামগ্রীকে খুঁজে নিতে হবে, তবেই তার সার্থকতা। লিখিত উপাদান বা তথ্যসূত্র ব্যতীত ইতিহাস রচনা অনেকাংশই অপূর্ণ। একথা বৃহত্তর বা ক্ষুদ্রতর জনপদ বা আঞ্চলিকতার ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে বিষয়ানুগ লিখিত উপকরণ সংগ্রহ হল আবশ্যিক শর্ত।
সূচকশব্দ : আকর গ্রন্থ, বৈদেশিক বিবরণ, ভূমিপুত্রদের লেখনি, স্থানিক অন্বেষণ।

মূল আলোচনা:

নিম্নগাঙ্গেয় অঞ্চলের নৈসর্গিক বর্ণবৈচিত্র, গভীর অরন্য তরুতল ও আগাছাকীর্ণ সবুজে ভরা গভীর নিবিড়তা, দুর্গম আবিল ও সর্পিল গতিতে আঁকা-বাঁকা নদী-নালা বিপদবহুল এবং স্বাপদসঙ্কুল পরিবেশ প্রকৃত ইতিহাসপ্রেমীকে প্রতিনিয়ত আকর্ষণ করে তার শাশ্বত রূপে। আর আকৃষ্ট করে আপন প্রাচীন ইতিহাস রচনার উপকরণ অন্বেষণে। জেলার প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ইতিহাস চর্চার কাজ কঠিন। কারন প্রাচীন বাংলার তথা নিম্নগাঙ্গেয় অঞ্চলের জন্য প্রাচীনকালে লিখিত মৌলিক ইতিহাস গ্রন্থের অভাব, এটি একটি ঐতিহাসিক সত্য। তবু মধ্যযুগীয় ইতিহাস রচনার বেশ কিছু লিখিত উপকরণ পাওয়া যায়। এই অভাব ইতিহাস রচনার কাজকে কঠিন, অনেকাংশে দুঃসাধ্য করেছে কিন্তু অসম্ভব করেনি।

লিখিত উপকরণের ভিত্তিতে আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার কাজ বেশ কঠিন। আলোচ্য জেলার ইতিহাস চর্চার অন্যতম প্রধান উপকরণ হল আঞ্চলিক ভাষা, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য, মহাকাব্য ও মধ্যযুগে রচিত বাংলা সাহিত্য এবং আধুনিক যুগের ইতিহাসগ্রন্থ, ইতিহাসশ্রয়ী উপন্যাস ও কাব্যগ্রন্থ সমূহ। সুতরাং লিখিত ইতিহাসগত আকরগ্রন্থ সমূহের পর্যায়ক্রমে আলোচনার পাদপ্রদীপে আনা আশুকর্তব্য বলে মনে হয়।

প্রথমেই বেদ এবং বৈদিক সাহিত্যের উল্লেখ করতেই হয়। ঋগ্বেদ পৃথিবীর প্রাচীনতম পবিত্র ধর্মগ্রন্থ হিসাবে আজও সমাদৃত। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে বেদে এই অঞ্চলের (বঙ্গ) উল্লেখ পাওয়া যায় না। যদিও যুগে যুগে সীমানার পরিবর্তন লক্ষ্যনীয়। 'ঐতরেয় আরন্যক'-এ প্রথম মগধের(ব গ ধ) প্রতিবেশী দেশ হিসেবে, অন্যমতে প্রথম

জাতি হিসাবে বঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে কৌটিল্যের ‘অর্থশাস্ত্রে’ বঙ্গের(বিখ্যাত সূতি বস্ত্রের জন্য) পরিচয় মেলে।[১]

বৈদিক সাহিত্যের পর ‘রামায়ন’ ও ‘মহাভারত’ এই দুইটি মহাকাব্যের উল্লেখ করতে হয়। রামায়নের ‘বালকাণ্ড’ এবং অন্যান্য বহু পৌরাণিক গ্রন্থে উপকূলস্থ বঙ্গ অর্থাৎ নিম্নগাঙ্গেয় অঞ্চলের পরিচয় পাতাল বা রসাতল নামে। অঞ্চলটি তৎকালে আর্য বহির্ভূত অনার্য তথা ম্লেচ্ছদের বসবাস বলে পরিচিত। মহর্ষি বাল্মীকি রামায়নে কপিলাশ্রম পাতালে অবস্থিত বলে উল্লেখ করেছেন। মহাভারতের বনপর্বে তীর্থযাত্রা ভাগে গঙ্গাসাগরকে অতি প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্ররূপে উল্লেখ করা হয়েছে। এই তীর্থক্ষেত্রে প্রথম পাণ্ডব যুধিষ্ঠির এসেছিলেন। দ্বিতীয় পাণ্ডব মহাবীর ভীম দ্বিগবিজয়ে বেরিয়ে পূর্বভারতে এসে সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন, তাম্রলিপ্তরাজ, কর্বটাধিপতি প্রমুখ বঙ্গের রাজাদের ও সুক্ষরাজকে পরাস্ত করে সাগর তীরবর্তী ভূখণ্ডে আসেন এবং সেখানকার প্রাচীন অধিবাসী ম্লেচ্ছদের জয় করেছিলেন। এই ম্লেচ্ছরাই সেদিনকার চব্বিশ পরগণার মানুষ। তৃতীয়-পাণ্ডব অর্জুন মুক্তবেণী গঙ্গার সাগরসঙ্গমে অবগাহন করে সমুদ্রতীর ধরে কলিঙ্গ নগরাভিমুখে যাত্রা করেছিলেন।[২]

‘পদ্মপুরান’-এর ক্রিয়া-যোগসারে উল্লিখিত আছে, সুষেন নামে চন্দ্রবংশীয় জনৈক রাজা গঙ্গানদীর মোহনা-পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে রাজত্ব করতেন। আর সেখানকার অরন্যে দীপান্তিনগরের রাজকুমারী ও তালধ্বজনগরের রাজকুলবধূ সুলোচনা পুরুষের ছদ্মবেশ নিয়ে ভীমনাদ নামে একটি গণ্ডার বধ করেছিলেন। এসব গল্প অতিকথন মনে হলেও তীর্থস্থান গঙ্গাসাগরের মাহাত্ম্যা খর্ব হয় না। এই তীর্থস্থানে অবস্থিত সংখ্যা দর্শনের প্রবক্তা মহাঋষি কপিলের আশ্রম। অনুমান করা হয় যে, মহর্ষি ও তার ভক্তমণ্ডলীর আগমনের মধ্যে দিয়েই দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় প্রথম আর্য অভিপ্রয়াণ প্রক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটে। অনুমিত ম্লেচ্ছবাসীগন শরণার্থী কপিলকে আতিথ্য দিয়েছিল। এছাড়া ‘মৎস্যপুরাণ’, ‘বায়ুপুরাণ’, ‘মুদ্রারাক্ষস’ প্রভৃতি গ্রন্থেও কপিলাশ্রমের এবং নিম্নবঙ্গের আদিবাসী ম্লেচ্ছদের সম্পর্কে বর্ণনা মেলে। রামায়ন ও মহাভারতে গঙ্গা ও ভগীরথের কাহিনীর বর্ণনা থেকে আলোচ্য অঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাস ফুটে ওঠে।[৩]

প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থসমূহ থেকে বাংলার এক বৃহৎ অংশের মানুষের আচার-আচরণ, ব্যবহার, ধর্মীয় চেতনা, প্রাচীন স্থাননাম ইত্যাদির পরিচয় মেলে। জৈন প্রজ্ঞাপনাসূত্র, সিংহলি মহাবংশ, জৈন উপাঙ্গপ্রজ্ঞাপনা প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে বঙ্গের অবস্থান অনুমান করা হয়, পুণ্ড্র, তাম্রলিপ্ত, সুহ্মের সংলগ্ন অঞ্চলই। এ ছাড়া প্রাচীন দেশজ গ্রন্থ ‘মিলিন্দপনহও’, ‘দীপবংশ’, ‘মহাবংশ’ প্রভৃতিতে অতীতের বঙ্গ অঞ্চলের পরিচয় মেলে।[৪]

চতুর্থ শতকে মহাকবি কালিদাস রচিত ‘রঘুবংশম’ গ্রন্থের চতুর্থ সর্গে আলোচ্য নিম্নগাঙ্গেয় অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং ‘নৌসাধনোদ্যতান’ অধিবাসীদের নৌযুদ্ধে পারদর্শীতার কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবত কালিদাসের সাহিত্যই বাদা অঞ্চলের

'দোখনো' মানুষের পরাক্রমতা সর্বপ্রথম উচ্চারিত হয়েছিল। যদিও দিগ্বিজয়ী রঘুর কাছে শেষ পর্যন্ত বাদাবনের গাঙ্গেয় অধিবাসীরা পরাস্ত হয়েছিল। মহারাজ রঘু নতুন জনপদ জয়ের স্মারকস্বরূপ 'গঙ্গা-স্রোতহন্তরে' বিজয় স্তম্ভ স্থাপন করেছিলেন। এছাড়া এই গঙ্গাদেশেই কালিদাসের বর্ণিত 'বঙ্গ', যার অবস্থান ছিল গঙ্গার বিভিন্ন স্রোতধারার মধ্যে।[৫] পাণিনি রচিত 'পতঞ্জলির মহাভাষ্য' ব্যকরণ শাস্ত্রে স্থাননাম হিসাবে 'গঙ্গা' শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। হরিষেণ রচিত 'এলাহাবাদ প্রশস্তি' ও বরাহমিহিরের 'বৃহৎসংহিতা' গ্রন্থ থেকে প্রাচীন সমতট অঞ্চলের সীমারেখা অনুমান করা যায়। সমতট রাজ্যের সীমা আদিগঙ্গা বা ভাগীরথী বিধৌত অঞ্চলের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে বিস্তৃত ছিল।

মঙ্গলকাব্য সমূহ, বৈষ্ণব সাহিত্য, আখ্যায়িকা কাব্য প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে আঞ্চলিক ইতিহাসের বহু উপাদান ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে। বর্তমানে মজা নদীর দেশ হলেও প্রাচীন ও মধ্যযুগে চব্বিশ পরগনা অঞ্চলে অসংখ্য বেগবতী প্রসিদ্ধ নদ-নদী ছিল। মধ্যযুগেও আদিগঙ্গা, সরস্বতী, বিদ্যাধরী, যমুনা, ইছামতী, পদ্মা, সুতি, পিয়ালি প্রভৃতি মিষ্টি জলের নদী এবং সুন্দরবনের বহু লোনা জলের নদী ছিল। এইসব নদীর বুকের উপর দিয়েই চব্বিশ পরগণার বাণিজ্যতরী দিগ্বিদিক বানিজ্যযাত্রা করত। মধ্যযুগীয় কবি বিপ্রদাস পিপলাই-এর 'মনসা মঙ্গল'(১৪৯৫), মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল'(১৫৭৫), কৃষ্ণরামের 'রায়মঙ্গল'(১৬০৮), অযোধ্যারামের 'সত্যনারায়ন' (অষ্টাদশ শতক), হরিদেবের 'শীতলামঙ্গল' প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত সওদাগর ধনপতি, শ্রীমন্ত, চন্দ্রধর, পুষ্পদত্ত, রত্নাকর প্রমুখ বাঙালি শ্রেষ্ঠী সম্প্রদায়ের দূর-দূরান্তের বানিজ্যযাত্রার কাহিনিও ওই সকল নদীকেন্দ্রিক। কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গলে' সমকালীন বাংলার অর্থনৈতিক দুরাবস্থার চিত্রও ফুটে ওঠে। 'রায়মঙ্গল' কাব্যে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার তীর্থক্ষেত্র ও পল্লীর উল্লেখ সর্বাপেক্ষা অধিক। 'বনবিবির জহুরনামা'-য় আলোচ্য অঞ্চলের বহু পল্লীর উল্লেখ পাওয়া যায়।

বৈষ্ণব সাহিত্য চৈতন্যলীলা ও কৃষ্ণলীলামৃত প্রচার প্রধান উদ্দেশ্য হলেও বৈষ্ণব গ্রন্থে সমসাময়িক কালের ধর্ম, সমাজ, ইতিহাস, ভূগোল, পথঘাট ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে। ১৫১০খ্রি. আদিগঙ্গার তীর ধরে শ্রীচৈতন্যের নীলাচল যাত্রার বহুজন লাঞ্ছিত প্রাচীন পথটিকে আমরা 'দ্বারীর জাঙ্গাল' বলে জানি। এই পথ দিয়ে পদব্রজে আদিগঙ্গাকে অনুসরণ করে বারুইপুরের আটিসারা ও আরও দক্ষিণের ছত্রভোগে পৌঁছেছিলেন। নিম্নগাঙ্গেয় অঞ্চলে এটি প্রাচীন যুগের অন্যতম বাণিজ্যপথ ছিল। বিশেষজ্ঞদের মতে, হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগর যাওয়ার জন্য এই রাস্তা একদা প্রচলিত ছিল। ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির আমলের কাগজপত্রে এই রাস্তার উল্লেখ আছে 'Pilgrims Track' বলে। দ্বারীর জাঙ্গাল ছাড়াও 'গঙ্গাসাগর রাস্তা' বা 'ছত্রভোগ পথ' নামেও এটি অভিহিত হত। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় ইংরেজ আমলে যত রেলপথ হয়েছে সেগুলি অধিকাংশই প্রাচীন স্থলপথের উপরেই নির্মিত।[৬]

খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে কৃষ্ণদাস রচিত ‘শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত’ ও বৃন্দাবন দাস রচিত ‘শ্রীচৈতন্য ভাগবত’ গ্রন্থদ্বয় থেকে এতদঞ্চলের মধ্যস্থিত বিখ্যাত প্রাচীন নগর, বন্দর, তীর্থস্থান, পল্লী, নদ-নদী প্রভৃতির পরিচয় মেলে। এখানে প্রাচীন ছত্রভোগ তীর্থক্ষেত্রও বন্দর রূপে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া বারুইপুরের আটিসারা গ্রাম, অম্বুলিঙ্গ ঘাট সহ বহু স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রন্থ ‘ডাকার্ণব’(পুথির)-এর এক স্থানে ‘খাড়ি’ অঞ্চল চৌষট্টি শক্তিপীঠ-এর অন্যতম বলে উল্লেখিত।

সমকালীন ফার্সি সাহিত্যে জেলার ইতিহাসের কিছু উপকরণ আছে। গোলাম হোসেন তাবাতাবাঈ-এর ‘সিয়ার মুতাক্ষরীণ’, গোলাম হোসেন সলিমের ‘রিয়াজ-উস-সালাতিন’, সলিমউল্লার ‘তারিখ-ই-বাঙ্গলা’, ইউসুফ আলির ‘আহবাল-ই-মহব্বত জঙ্গ’ এবং পরম আলির ‘মুজাফফর নামা’ খুঁটিয়ে পড়লে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। এছাড়া আবুল ফজল রচিত ‘আইন-ই-আকবরি’ গ্রন্থ ও টোডরমলের রাজস্ব ব্যবস্থার বিভিন্ন সরকারি কাগজপত্র থেকে তৎকালীন ভুমিরাজস্ব ব্যবস্থা এবং পরগনার পরিচয় বিস্তৃত আলোচিত অংশ থেকে জেলার অনেকাংশ ইতিহাস ফুটে ওঠে।

এছাড়া বিদেশি লেখক এবং পর্যটকদের লেখনিতে জেলার বহু অজ্ঞাত ইতিহাস উন্মোচিত হয়। গ্রিক(মেগাস্থিনিস), রোমান(ভারজিল, ডায়াডোরাস, প্লিনি) প্রমুখ ঐতিহাসিকদের রচনায় গঙ্গানদীর অববাহিকায় বসবাসকারী জাতিকেই গঙ্গারিডি বলে অভিহিত করেছেন। খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রসিদ্ধ গ্রীক ভৌগোলিক স্ট্রাবো(খ্রিস্টপূর্ব ২৭-৩৭ অব্দে) তাঁর ‘জিওগ্রাফিকন’ নামক গ্রন্থে(XV.1,69) লিখেছেন যে, ভারতীয়রা গঙ্গানদীর পূজা করে। তাঁর বিবরণ(XV.1,13) থেকে ভারতের বৃহত্তম নদী গঙ্গার একটিমাত্র মোহনার কথা জানা যায়- “This river, which is the largest in India descends from the mountainous country and turns eastward upon its reaching the plains. Then, flowing past Palibothra, a very large city, it pursues its way to the sea in that quarter and discharges into it by a single mouth”.[৭] তাঁর উল্লিখিত বৃহত্তম গঙ্গার প্রধান ও পবিত্র ধারা যে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত আদিগঙ্গা তাতে কোন সন্দেহ নেই।

খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে গ্রিক ভূগোলবিদ টলেমি-র ‘ট্রিটিজ অন জিওগ্রাফি’ পুস্তকে, জনৈক মিশরবাসী গ্রিক নাবিকের ‘পেরিপ্লাস অফ দি ইরিথ্রিয়ান সি’ গ্রন্থে গঙ্গারিডিদের মূল বাসভূমি এবং রাজধানী গঙ্গা নদীর মোহনা অঞ্চলকে চিহ্নিত করে। তৃতীয় শতকে পর্যটক সলিনাসের বিবরণে গঙ্গারিডিদের অস্তিত্বের সর্বশেষ পরিচয় মেলে।

সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয় পাদের পর্তুগীজ লেখক মানরিকে এবং ঐ শতাব্দীর তৃতীয় পাদের প্রসিদ্ধ মুসলিম লেখক শিহাবুদ্দিন তালিসের রচনা থেকে অনুমান করা যায় যে, সমসাময়িক কালের পর্তুগীজ ও মগদের অত্যাচারে নিম্নগাঙ্গেয় অঞ্চলের জনজীবন বিপর্যস্ত হয়েছিল এবং সাগরদ্বীপ, চন্দ্রদ্বীপ, সনদ্বীপ ইত্যাদি অঞ্চল শ্মশানে

পরিণত হয়েছিল। পর্তুগীজদের অপেক্ষাকৃত উন্নত শ্রেণীর কামান-সমৃদ্ধ জাহাজ ও অত্যাচারের সামনে বাঙালি সমুদ্রবণিকরা অসহায় ছিল। F. Bernier-এর 'Travels in Mughal Empire' গ্রন্থ থেকে জানা যায়, ফিরিঙ্গিদের অত্যাচারেই বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী প্রদেশের অনেক প্রাচীন জনপদ অধিবাসীদের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে ক্রমশ ঘন জঙ্গলে পরিণত হয়। W. W. Hunter-এর লেখা 'A Statistical account of Bengal, Vol.I' গ্রন্থ থেকে জানা যায়, ১৬১২ থেকে ১৬১৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এক ভয়ংকর মহামারিতে তৎকালীন নিম্নগাঙ্গেয় অঞ্চল প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়ে এবং বাঘ ও বন্য জন্তু অধ্যুষিত সুন্দরবনে পরিনত হয়। ও'ম্যালির 'Bengal District Gazetteers 24 Parganas'-গ্রন্থ থেকে আলোচ্য জেলার ইতিহাস চর্চার প্রচুর রসদযোগায়।[৮]

জেলার মধ্যে এককালে প্রবহমান বেগবতী নদী 'আদিগঙ্গা' সম্পর্কেও বিদেশিদের মানচিত্র ও বিবরণের উপর নির্ভর করতে হয়। ১৫৫২ খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাত পর্তুগীজ নাবিক Jao-De-Baros কর্তৃক অঙ্কিত মানচিত্র ও ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দের Van-Den-Broucke-এর তৈরি গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র ব-দ্বীপ অঞ্চলের মানচিত্র থেকে আদিগঙ্গার প্রাচীন গতিপথের পরিচয় মেলে। ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে রেনেল সাহেব যখন বাংলায় জরীপের কাজ শুরু করেছিলেন তখন আদিগঙ্গা সম্পূর্ণ মজে গেছে। তাঁর রচিত মানচিত্রে আদিগঙ্গাকে নালুয়া পর্যন্ত একটি ক্ষীণ ধারা হিসাবে দেখানো হয়েছে। পাশাপাশি জ্যাও ডি ব্যারোস-এর মানচিত্রে সুন্দরবন এলাকায় অন্তত পাঁচটি শহরের নাম পাওয়া যায়। এর মধ্যে একটি প্রতাপাদিত্যের রাজধানী 'চ্যান্দিকান' বলে বর্ণিত হয়েছে। ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে অঙ্কিত পেট্রাস বার্টিয়াসের মানচিত্রে চান্ডিকানের সীমানা ভাগীরথীর পার পর্যন্ত দেখানো হয়েছে।[৯]

আলোচ্য জেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য ও কৃষ্টি সম্পর্কে পরবর্তী সময় যেসব তথাকথিত প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব কলম ধরেছিলেন, সকলেই নমস্যতুল্য মনিষী। তাঁরা উপরিউক্ত আকরগ্রন্থ সমূহের লিখিত উপকরণ বিশেষভাবে ব্যবহার করেই বিভিন্ন গ্রন্থ, প্রবন্ধ, নিবন্ধ লিখে রাজ্য তথা জেলার ইতিহাস জনসমক্ষে তুলে ধরতে আপ্রান চেষ্টা করেছিলেন।

(১)ভূমিপুত্রদের ইতিহাস ও কৃষ্টি চর্চিত গ্রন্থসমূহ

অবিভক্ত বাংলার আটাশটি জেলার মধ্যে বারোটি জেলার ইতিহাস ও প্রায় শতাধিক আঞ্চলিক ইতিহাস রচিত হয়েছিল। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে অখণ্ড চব্বিশ পরগনা নিয়ে বোধ হয় তেমন কিছু চর্চা হয়নি। তবে-প্রতাপচন্দ্র ঘোষের অতীব গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক 'বঙ্গাধিপ-পরাজয়' সমকালীন প্রেক্ষাপটে কালজয়ী লেখনী শৈলীর চরম নিদর্শন। রাজনারায়ন বসুর লেখা 'আত্মচরিত'; 'সেকাল আর একাল'; 'গ্রাম্য উপাখ্যান'(১৯১৪) প্রভৃতি গ্রন্থ তৎকালীন সামাজিক ইতিহাসের এক জ্বলন্ত দলিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর

কলমে 'হাজার বছর পূর্বে ২৪ পরগনা'(১৩২১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত) অত্যন্ত মূল্যবান লেখনী।

কালিদাস দত্তের সুন্দরবন সম্পর্কে ৯টি ইংরাজি লেখা 'বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি মনোগ্রাফে' প্রকাশিত হয় বিগত শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে। 'বসুমতী' পত্রিকাতেও তাঁর সুন্দরবন সম্বন্ধে লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। শ্রী দত্ত পরে বাংলায় খাড়ি মণ্ডল, খাড়ি, জয়নগর, জয়নগর মজিলপুর, ছত্রভোগ, সরিষাদহ, দক্ষিণ বারাশত, বহড়ু, বারুইপুর ও বঙ্কিমচন্দ্র এবং দুর্গেশনন্দিনী ও বারুইপুর(সোমপ্রকাশে প্রকাশিত), জটার দেউল, চব্বিশ পরগণার ইতিহাস, চব্বিশ পরগণার অতীত প্রভৃতি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখেছিলেন সমকালীন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। তাঁর মৃত্যুর বহুকাল পরে সুন্দরবন আঞ্চলিক সংগ্রহশালা কর্তৃক 'দক্ষিণ ২৪ পরগণার অতীত'(দুই খণ্ড) বই প্রকাশিত হয়।

নরোত্তম হালদারের 'গঙ্গারিডি : আলোচনা ও পর্যালোচনা', প্রথমপ্রকাশ ১৯৮৮ ও 'গঙ্গারিডি ইতিহাস ও সংস্কৃতির উপকরণ', প্রথম প্রকাশ ১৯৮৪- গ্রন্থদ্বয় জেলার ইতিহাস চর্চার অমূল্য সম্পদ। এছাড়া তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের দীর্ঘ ধারাবাহিক ফসল 'গঙ্গারিডি' গবেষণা কেন্দ্রের মাসিক পত্রিকা। উক্ত গ্রন্থে তিনি বলেছেন, প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন রাজ্যের দক্ষিণাংশ অর্থাৎ দক্ষিণ পুণ্ড্রবর্ধনকে বিদেশিরা গঙ্গারিডি রাজ্য নামে অভিহিত করেছিল। সমগ্র গাঙ্গোপদ্বীপ ছিল তাদের বিচরণ ক্ষেত্র এবং 'গঙ্গানগর' ছিল তাঁদের রাজধানী।

মনোরঞ্জন রায়ের 'পরায়ত্ব পরগনা কথা'(দুই খণ্ড) অমূল্য আকর গ্রন্থে অখণ্ড চব্বিশ পরগণার আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক চিত্র ফুটে উঠেছে। অরুনকুমার মজুমদারের 'প্রাচীন জরীপের ইতিহাস' গ্রন্থে কলকাতা সহ নিম্নগাঙ্গেয় অঞ্চলের ভূমিব্যবস্থা ও জরীপের প্রাঞ্জলচিত্র প্রকাশ পেয়েছে। গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসুর আনন্দ পুরস্কার প্রাপ্ত 'বাংলার লৌকিক দেবতা' গ্রন্থে ক্ষেত্রসমীক্ষাজাত অপরূপ বর্ণনায় লোক দেবদেবী উদ্ভাসিত। সুকুমার সিংহের 'দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ইতিহাস' (অখণ্ড খণ্ড) গ্রন্থে সামগ্রিক ইতিহাস তুলে ধরার প্রচেষ্টা লক্ষ্যনীয়। গণেশ ঘোষের 'দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার স্মরণীয় ব্যক্তি' গ্রন্থে জেলার মনিষীদের জীবন গাঁথার সংক্ষিপ্ত চিত্র ফুটে উঠেছে।

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় রচিত প্রত্নচর্চা ও প্রত্নচর্চার অপরিহার্য গ্রন্থ দুটি হল 'সুন্দরবনের মণি অববাহিকা' ও 'আদিগঙ্গা প্রত্ন পরিক্রমা'। লেখক উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পথ ছেড়ে প্রান্তরে, প্রান্তর শেষে স্বাপদসংকুল অরন্যচ্ছায়ে বা নির্জনে নদীতটের চোরাবালির সতর্ক পদক্ষেপে দীর্ঘপথ পরিক্রম করে উক্ত অঞ্চলের ধূসর অতীতে নগরায়ন ও জনজীবনের যে প্রত্নসাক্ষ্য সংগ্রহ করে এক মনোগ্রাহী বিবরণ দিয়েছেন। সুধীন দে'র 'নিম্নগাঙ্গেয় অঞ্চল ও প্রত্ন উৎখনন' গ্রন্থে আলোচ্য জেলার সরকারি তত্ত্বাবধানে খনন করা প্রত্নস্থলের বিস্তারিত বর্ণনার আকর তথ্য পরিবেশন হয়েছে।

নিম্নবঙ্গের ভূমিসন্তান ধূর্জটি লশকরের আঞ্চলিক ইতিহাস, আর্থ-সামাজিক অবস্থান ও লোকসংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণা গ্রন্থ 'দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার শৈবতীর্থ'; 'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় কুলতিলক'; 'সুন্দরবনের লোকায়ত দর্পণ', প্রথম খণ্ড; 'দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার গাজন ও গাজনমেলা'; 'দলিত জনক আম্বেদকর'; 'বাদাবনের বংশধর'; 'বাংলা দলিত সাহিত্যের জনক রাইচরণ সরদার'; 'পুণ্ড্রদেশেবৌদ্ধসভ্যতা' প্রভৃতি ইতিহাস চর্চার দর্পণ স্বরূপ।

কৃষ্ণকালী মণ্ডল রচিত 'দক্ষিণ বাংলার নতুন প্রত্নস্থল'; 'দক্ষিণ ২৪ পরগণার আঞ্চলিক ইতিহাসের উপকরণ'; 'দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বিস্মৃত অধ্যায়'; 'দক্ষিণ ২৪ পরগণার লৌকিক দেবদেবী ও মূর্তি ভাবনা'; 'দক্ষিণ চব্বিশপরগণার পুরাকথা' প্রভৃতি। সুন্দরবনসহ সমগ্র দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা তথা দক্ষিণ বাংলার প্রত্ন-ইতিহাস চর্চা এবং লোকসংস্কৃতি চর্চার অপরিহার্য অবশ্য পাঠ্য মূল্যবান গ্রন্থস্বরূপ।

বিমলেন্দু হালদারের অনবদ্য গ্রন্থ 'দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার কথ্যভাষা ও লোকসংস্কৃতির উপকরণ'(দুই খণ্ড); 'দক্ষিণবঙ্গ জনসংস্কৃতি ভাষা ও ইতিহাস বিচিত্রা'(দুই খণ্ড); 'দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার যাত্রাগান : ইতিহাস ও আলোচনা' প্রভৃতি। এগুলি কেবল গবেষণা গ্রন্থ নয়, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার সমাজ-সংস্কৃতির ঐতিহাসিক দলিল। সত্যানন্দ মণ্ডলের 'দক্ষিণ ২৪ পরগণার লোকশিল্প' গ্রন্থে জেলার লোক শিল্পের বহু অজানা দিক আলোকিত হয়েছে। ডাঃ এস পি চ্যাটার্জীর 'চব্বিশ পরগণা ও কলিকাতা' গ্রন্থে বহু অজানা দিক আলোকিত হয়েছে। অধ্যাপক দীপঙ্কর নস্করের 'দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ইতিহাসচর্চা'(প্রথম খণ্ড) বইটি উৎকৃষ্ট আঞ্চলিক ইহিহাসের দলিল হিসাবে গবেষক মহলে সমাদৃত।

কেশব চক্রবর্তীর 'বিষ্ণুপুরের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থটি স্থানিক ইতিহাসের আকর দলিল। সাগরচট্টোপাধ্যায়ের 'দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার পুরাকীর্তি' গ্রন্থে জেলার গ্রাম-শহর-প্রান্তরে ছড়িয়ে থাকা পুরাবস্তুসমূহের নির্ভরযোগ্য তালিকা এবং বিবরণের অমূল্য সম্ভার রচিত। কালিচরণ কর্মকারের 'কল্যাণপুরের কল্যাণমাধব', 'শিকড়ের খোঁজে' প্রভৃতি গ্রন্থে জেলার লোকসংস্কৃতি ও আঞ্চলিক শিল্পচিত্র বর্ণিত।

ড. দেবব্রত নস্কর লিখিত 'চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবী : পালাগান ও লোকসংস্কৃতি জিজ্ঞাসা'; 'সুন্দরবন সভ্যতা ও লোকসংস্কৃতি অন্বেষণ' প্রভৃতি গ্রন্থ। তাঁর লেখার মধ্যে ফুটে উঠেছে সুপ্রাচীন সুন্দরবনের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস। বর্তমান সুন্দরবন সভ্যতায় খ্রিস্টপূর্ব কাল থেকে মিশ্র সংস্কৃতির বিস্ময়কর সমাবেশ ও লৌকিক দেবদেবীর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পরিস্ফুট। সুভাষ মিস্ত্রির 'দক্ষিণবঙ্গের লোক সমাজে মন্ত্র'; 'লোকায়ত চিকিৎসা'; 'লোকায়ত সুন্দরবন' তিন খণ্ড প্রভৃতি অমূল্য গবেষণাধর্মী পুস্তকে আলোচ্য সংস্কৃতিবলয়ের মানব মনে মন্ত্র এবং তার কার্যকারিতা সম্পর্কে ভয় ও ভক্তির মেলবন্ধন তুলে ধরেছেন।

তুহিনময় ছাটুইয়ের 'লৌকিক সমাজ ও সংস্কৃতি দর্পণে পীরগাজী বিবি', 'বঙ্গ সংস্কৃতিতে ঢেঁকি' গ্রন্থ দুটি আকর উপাদানে সমৃদ্ধ। পুরঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের 'প্রবাদ প্রবচন দক্ষিণ ২৪ পরগনা', বলাইচাঁদ হালদারের 'ভাষা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ও বিবিধ প্রবন্ধ'; শশাঙ্কশেখর দাসের 'বনবিবি'; অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তীর 'ঘুটিয়ার শরীফের পীর মোবারক গাজী'; সুজিত সুরের 'মাটিতে পা রেখে' গ্রন্থে ভাটির দেশের লৌকিক দেবী বনবিবির উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে নতুন আঙ্গিকে।

বজবজ থানার বাওয়ালীর মণ্ডল জমিদার বংশের ইতিহাস জানতে রামপদ বিশ্বাসের 'মাহিষ্যকুল কল্পদ্রুম' গ্রন্থটি অত্যন্ত মূল্যবান আকর উপাদান। ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায়ের 'প্রতাপাদিত্য', সত্যচরণ শাস্ত্রীর 'মহারাজ প্রতাপাদিত্য', ক্ষীরোদ বিদ্যাবিনোদের 'প্রতাপাদিত্য' নাটক, কেশব চক্রবর্তীর 'দাক্ষিণাত্যে বৈদিক সমাজের ইতিহাস' গ্রন্থে নিম্নগাঙ্গেয় অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ ভুঁইয়া রাজা প্রতাপাদিত্যের বংশের ইতিহাস ও বারুইপুরের রায়চৌধুরী পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা মদন রায়ের সম্পর্কে বিবিধ তথ্য মেলে।

শচীনদাশের 'জল ,জঙ্গল ও জনজীবনে সুন্দরবন', 'জলজঙ্গলের দেশ সুন্দরবন'; শশাঙ্ক মণ্ডলের 'ব্রিটিশ রাজত্বে সুন্দরবন'; মনীন্দ্রনাথ জানার 'সুন্দরবনের সমাজ ও সংস্কৃতি'; অঞ্জলি বিকাশ মণ্ডলের 'সুন্দরবনের সেকাল-একাল'; এ. এফ. এম. আব্দুল জলীলের 'সুন্দরবনের ইতিহাস'; কানাইলাল সরকারের 'সুন্দরবনের ইতিহাস'; কুমুদরঞ্জন নস্করের 'ভারতের সুন্দরবন ও ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ'; খসরু চৌধুরীর 'সুন্দরবনের বাঘ'; দিলিপ কুমার নাহার 'প্রান্ত সুন্দরবনের কথ্যভাষা'; তুষার কাঞ্জিলালের 'জল জঙ্গলের কথা'; জগদীশচন্দ্র মণ্ডলের 'মরিচঝাঁপি নিঃশব্দের অন্তরালে'; রথীন্দ্রনাথ দে'র 'সুন্দরবন'; তৃপ্তি ব্রহ্মের 'বাংলার ইসলামি সংস্কৃতি–সুন্দরবনে ইসলাম'; দেবাশিস বর্মণের 'প্রাক ইতিহাসে সুন্দরবন'; সন্তোষ কুমার বর্মণের 'আদি সুন্দরবনের নারী সমাজ ও তেভাগা আন্দোলন'; ড নির্মলেন্দু দাসের 'সুন্দরবনের লোক সংস্কৃতি' প্রভৃতি।

এছাড়াও জেলার ভূমিপুত্র ব্যাতিত অনেক প্রথিতযশা ঐতিহাসিক, গবেষকের কলমে ফুটে উঠেছে জেলার ইতিহাসের বহুমুখী দিকগুলি। যেমন- নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙ্গালীর ইতিহাস'(আদিপর্ব) প্রকাশ ১৯৫০; রমেশচন্দ্র মজুমদারের 'বাংলাদেশের ইতিহাস' (চার খণ্ড) ১৯৪৫, ১৯৬৭, ১৯৭২ ও ১৯৭৫; সতীশচন্দ্র মিত্রের 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস'(দুই খণ্ড); দীনেশচন্দ্র সেনের 'বৃহৎ বঙ্গ'(দুই খণ্ড) প্রকাশ ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ; অশোক মিত্র সম্পাদিত 'পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা' তৃতীয় খণ্ড, ১৯৭১; অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দেখা হয় নাই'(১৯৭৩); যোগেশচন্দ্র বাগলের 'হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত' প্রকাশ ১৯৪৫; বিনয় ঘোষের 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' তৃতীয় খণ্ড, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৮০; রামরঞ্জন দাসের 'পশ্চিমবঙ্গের পুরাকীর্তি' (১৯৮০); প্রভাত কুমার ঘোষের 'গঙ্গারিডি ও বঙ্গভূমি' প্রথম প্রকাশ ১৫ ডিসেম্বর ১৯৮৮; পরেশচন্দ্র দাশগুপ্তের 'প্রাগৈতিহাসিক বাঙলা' প্রথম প্রকাশ ১৫ ডিসেম্বর ১৯৮১; ডঃ অতুলসুরের

'বাংলা ও বাঙ্গালীর বিবর্তন', দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৮ ও 'বাঙ্গালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়'; ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'বঙ্গ, বাঙ্গালা ও ভারত' প্রথম প্রকাশ ২০০০, 'গঙ্গা-বঙ্গ', প্রথমপ্রকাশ জুন ২০০৪; রমাপ্রসাদচন্দের 'গৌড়রাজমালা' প্রথম প্রকাশ ১৩১৯ বঙ্গাব্দ প্রভৃতি গ্রন্থগুলি অত্যন্ত সহায়ক।

(২)ইংরেজি ভাষায় লিখিত গ্রন্থ

Abul Fazal এর 'The Ain-I-Akbari' (English Translated by H. Blochman), Das and Mukherjee লিখিত 'A Focus on Sundarban'; Himendusekhar Banerjee এর 'History of Canals in Bengal' গ্রন্থে নিম্নগাঙ্গেয় অঞ্চলের খালপথের ইতিহাস লিপিবদ্ধ। সুতপা চ্যাটার্জী সরকার লিখিত 'Sundarbans Folk Deities, Monsters and Mortals' গ্রন্থে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন দিক পরিবেশিত। Mukherjee & Maity এর লেখা 'Corpus of Bengal Inscription'; N.G. Majumdar এর লেখা 'Inscription of Bengal' পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'West Bengal District Gazetteer 24 Parganas.1994'; 'District Census Handbook 24 Parganas-1951, 1961' প্রভৃতি।

অঞ্চলভেদে মানুষের জীবনচর্চার রকমফের। এক একটি এলাকা বা অঞ্চল যুক্ত হয়েই জেলা-রাজ্য-দেশ-বিশ্ব তৈরি করে। সুতরাং বিশ্বর-ই একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সংস্করণ অংশ হিসেবে আঞ্চলিক সভ্যতা-সংস্কৃতির ইতিহাস চিরদিনই গুরুত্ব পেয়ে এসেছে গবেষক ও ক্ষেত্রানুসন্ধানী মানুষজনের নিকট। আঞ্চলিক ইতিহাস ও কৃষ্টির এই অন্বেষণ একটি চলমান পদ্ধতি- যা কালের স্রোতে প্রবহমান। এই ইতিহাস চর্চার শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই।

তথ্যসূত্র:

১. ভট্টাচার্য, সুশীল (২০০৪), চব্বিশ পরগনার আঞ্চলিক ইতিহাস, দক্ষিণী, বারুইপুর, পৃষ্ঠা ৩৬
২. দত্ত, কালিদাস (১৯৮৯), দক্ষিণ ২৪ পরগনার অতীত, ১ম খণ্ড, সুন্দরবন আঞ্চলিক সংগ্রহশালা, বারুইপুর, পৃষ্ঠা ২৫-২৬
৩. তদেব, পৃষ্ঠা ২৩
৪. মিলিন্দপনহ, ১, ৬,২১, ৩৬০
৫. কালিদাস, রঘুবংশম, ৪র্থ সর্গ
৬. দত্ত, কালিদাস (১৯৮৯), পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৫৩
৭. হালদার, নরোত্তম (১৯৮৪), গঙ্গারিডি ইতিহাস ও সংস্কৃতির উপকরণ, গঙ্গারিডি গবেষণাকেন্দ্র পত্রিকা, কাকদ্বীপ, পৃষ্ঠা ৬৩
৮. পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা সংখ্যা (১৪০৬), তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃষ্ঠা ১১৭-১১৮
৯. মুখোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু (১৯৯৫), 'আদিগঙ্গা প্রত্নপরিক্রমা' ভস্তক, কলিকাতা পুস্তকমেলা, পৃষ্ঠা ১৮

গুরুপূর্ণিমা তথা ভারতীয় গুরুপরম্পরা

রুবেল পাল
সহকারী অধ্যাপক, শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা বিদ্যামহাপীঠ,
কামারপুকুর, হুগলী

সারাংশঃ বাংলাদেশের তথা সমস্ত ভারতবর্ষে আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথিতে গুরুপূর্ণিমাউৎসব পালন করা হয়। এই তিথিতেই পৃথিবীতে কৃষ্ণদ্বৈপায়নব্যাসদেব আবির্ভূত হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, এই আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথিতে তিনি বিশ্বের সমস্ত জ্ঞানের ভান্ডারস্বরূপ বেদকে প্রধানত চারটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। তাই তিনিই হলেন সমস্ত হিন্দুধর্মাবলম্বী তথা সনাতনীদের কাছে আদিগুরু। এই কারণেই এই তিথিকে গুরুপূর্ণিমা বা ব্যাসপূর্ণিমারূপে পালন করা হয়। এই গুরুপূর্ণিমার দিন ভারতবর্ষের গুরুপরম্পরা অনুযায়ী সমস্ত শিষ্যরা তাদের নিজের নিজেরগুরুদেবদের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করার জন্য গুরুপূজন এবং গুরুদক্ষিণা প্রদান করেন। ভারতবর্ষের এই গুরু পরম্পরার ইতিহাস সেই বৈদিক কাল থেকে চলে আসছে, যা আজও পরম্পরাক্রমে সমানভাবে প্রবহমান এবং প্রাসঙ্গিক। যেমন আমরা জানি আদিগুরুব্যাসদেব হলেন জৈমিনি, পৈল, বৈষম্পায়ন তথা তার পুত্র শুকদেবেরও গুরু। তেমনি বিবেকানন্দের গুরু শ্রী রামকৃষ্ণদেব। নিবেদিতার গুরু স্বামী বিবেকানন্দ। ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের গুরু সন্ত রামদাস। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের গুরু বশিষ্ট মুনি। শ্রীকৃষ্ণের গুরু সন্দীপনী মুনি। একলব্যের গুরু দ্রোণাচার্য। পরমহংস ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের গুরু তোতাপুরী, চৈতন্যদেবের গুরু কেশব ভারতী, রাষ্ট্রীয়স্বয়ংসেবক সংঘের দ্বিতীয়স্বরসঙ্ঘচালক মাধব রাও সদাশিব রাও গোলওমালকারঅর্থাৎ শ্রীগুরুজীর গুরু স্বামী অখন্ডানন্দজী মহারাজ , যিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পঞ্চম অধ্যক্ষ। কিন্তু মনে রাখতে হবে , রাষ্ট্রীয়স্বয়ংসেবক সংঘের গুরু কোন ব্যক্তি নয় ,গৈরিক পতাকাই হল সংঘের গুরু। এই ভাবেই গুরুপরম্পরার ঐতিহ্য ভারতবর্ষের সমাজ ও সংস্কৃতিতে প্রাচীনকাল থেকে প্রবহমান । এখন কে এই গুরু ? গুরু তত্ত্ব কি? এবং এই গুরু ও শিষ্য পরম্পরা পালনের কিই বা তাৎপর্য? ইত্যাদি বিষয়ে আমাদেরকে ভালোভাবে জানতে হবে। তাই এই প্রবন্ধে আমি এই বিষয়েই বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করব।

সূচক শব্দঃ- আষাঢ়, ব্যাসদেব, গুরুতত্ত্ব, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, শ্রীগুরুজী, স্বামী অখন্ডানন্দ, রাষ্ট্রীয়স্বয়ংসেবক সংঘ ,গৈরিক পতাকা, ধ্বজ, গুরুদক্ষিণা।

মূল আলোচনাঃ-

বঙ্গদেশে আমরা ছোট থেকেই শুনে আসছি বারো মাসে তেরো পার্বণ। হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে সমগ্র ভারতবর্ষে তথা বিশ্বে বাংলা মাস গণনা অনুসারে আষাঢ় মাসের যে

পূর্ণিমা তিথি , সেই তিথিকেই গুরু পূর্ণিমা তিথি বলে ধরা হয়। এই তিথিতে সাধারণতঃ শিষ্যরা গুরুকে কায়মনোবাক্যে পূজা করে থাকে এবং গুরুর কাছে গুরুদক্ষিণারূপে সর্বস্ব সমর্পণ করে । তাই বলা হয়ে থাকে ,- ' হাম্ করে গুরু আরাধনা তন্ সে মন্ সে ধন্ সে। ' অর্থাৎ গুরুপূজনতনঅর্থাৎ শরীর, মন অর্থাৎ একাগ্র চিত্তে এবং ধন অর্থাৎ সমস্ত সমর্পণের মধ্য দিয়ে করতে হয় । বৈদিক কাল থেকে ভারতবর্ষের সনাতন সংস্কৃতিতে যে গুরুপরম্পরার মধ্য দিয়েগুরুপূজন শুরু হয়েছিল, তা আজও গঙ্গাপ্রবাহেরনিত্যধারারমতোভারতীয় তথা সমগ্র বিশ্বের হিন্দুসমাজে প্রবাহিত।

এখন প্রশ্ন হল কেন এই আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথিকে গুরুপূর্ণিমা তিথি রূপে ধরা হয়। এই প্রশ্নের সমাধান করতে গেলে, আগে বুঝতে হবে কে গুরু, কেইবা শিষ্য। গুরুর কি কাজ ,আবার শিষ্যের কি কর্তব্য, কিইবা এই গুরু শিষ্যের মধ্যে সম্বন্ধ , এই সমস্ত কিছুর রহস্য যখন আমরা বুঝতে পারব তখনই আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে কেন আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথিকে গুরুপূর্ণিমা তিথি রূপে ধরা হয় । 'গুরু' শব্দের ব্যুৎপত্তি করলে আমরা পাই গু এবং রু, যেখানে গু শব্দের অর্থ হল অন্ধকার, রু শব্দের অর্থ বিনাশক। অর্থাৎ ব্যুৎপত্তিগতভাবে গুরু শব্দের অর্থ দাঁড়ায় যিনি অন্ধকারের বিনাশক বা যিনি অন্ধকারকে দূর করে শিষ্যকে আলোর পথের যাত্রী করেন, তিনিই হলেন প্রকৃত গুরু। তাই গুরুবন্দনাতে বলা হয়েছে, -

" অজ্ঞানতিমিরান্ধস্যজ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া ।

চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈশ্রীগুরবেনমঃ।। "[১]অর্থাৎ গুরু অজ্ঞানস্বরূপ অন্ধকার দূরীকরণের মধ্য দিয়ে শিষ্যের জ্ঞানচক্ষুকে খুলে দেন, যার মাধ্যমে শিষ্য এই সমগ্র বিশ্বের যিনি অধিকর্তা, যিনি এই জীব ও জড়, সমগ্র জগতকে পরিব্যপ্ত করে আছেন, সেই পরমেশ্বর ভগবান তথা পরমব্রহ্মকে উপলব্ধি করতে পারেন। গুরুপ্রণামমন্ত্রে তাই বলা হয়েছে, -

" অখন্ডমন্ডলাকারংব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদংদর্শিতং যেন তস্মৈশ্রীগুরবেনমঃ।। "[২]

গুরুতত্ত্বেরউপরিউক্ত বিশ্লেষণ থেকে এটা স্পষ্ট যে , গুরু হলেন অপার শক্তিধর, তাঁর মহিমা অপার, তিনি অহেতুক কৃপাসিন্ধু। তাই তাঁর মাহাত্ম্যও অপরিসীম। তার জ্ঞান অতুলনীয় এবং অনির্বচনীয় । এইরকমই একজন গগনচুম্বী, সীমাতীত ও পরমজ্ঞানী ব্যক্তি হলেন মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস, যাকে আমরা আদি গুরুরূপে মেনে থাকি এবং ভজনা করে থাকি ।

এখন এই বেদব্যাসের জীবন আমরা যদি খুব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করে দেখি, তবে দেখতে পাব, তাঁর জীবনে সর্বাঙ্গীনভাবেগুরুতত্ত্বের যা কিছু লক্ষণ , তা সমস্ত কিছুই খুব সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। বেদ শব্দের অর্থ হল জ্ঞান,

যে জ্ঞানের প্রবাহ নিত্য ও শাশ্বত । এই জ্ঞান শুধু ঋষিরা বিশেষ দর্শনের মধ্য দিয়ে অনুভব করতে পারেন, কিন্তু এই জ্ঞান কখনো ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না । আর সেটা বুঝেছেন বলেই, এই অখন্ডজ্ঞানরাশিকে শুধুমাত্র শিষ্যদের খুব সরলভাবে বোঝানোর জন্য ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব এই চারভাগে এবং প্রত্যেক বেদকে আবার সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ এই চারভাগে বিভক্ত করেছেন। এই অখন্ডজ্ঞানরাশিকে এইভাবে সুবিন্যস্ত করার দুঃসাহস দেখিয়েছেন বলেই তিনি আজ আমাদের কাছে বেদব্যাস নামে পরিচিত। তাই বেদব্যাস শব্দটিকেভাঙলেদাঁড়ায় বেদ ও ব্যাস । 'বেদ' অর্থাৎ অখন্ড, অনাদি, অনন্ত, নিত্য ও শাশ্বত জ্ঞানভান্ডার এবং 'ব্যাস' অর্থাৎ বিন্যাসকারী বা বিভাজক । এখন এই ব্যাস শব্দের আরেকটি অর্থ হল প্রবচনকর্তা বা কথক । অর্থাৎ যিনি এই অনাদি ও অনন্ত জ্ঞানের প্রবচনকারী বা কথক বা ভাষ্যকার তিনিই বেদব্যাস । আমরা জানি অখন্ডজ্ঞানস্বরূপ যে বেদ , তারই সারমর্ম নিহিত আছে শ্রীমদ্ভাগবত্ প্রভৃতি অষ্টাদশ মহাপুরাণে এবং ১৮টি উপপুরাণে, সমগ্র ঋষিদের উপলব্ধির সারগর্ভস্বরূপব্রহ্মসূত্রে তথা পঞ্চমবেদ মহাভারতে। আর এই সমস্ত মহাজ্ঞানাধারস্বরূপ গ্রন্থের রচয়িতা বা কথক হলেন ব্যাসদেব। যেহেতু এই গ্রন্থগুলি সমগ্র হিন্দু সনাতনীমতভাবাপন্নদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র এবং শ্রদ্ধেয়, সেই অর্থে এই সকল মহান গ্রন্থের রচয়িতাব্যাসদেবই হলেন সমগ্র হিন্দুজাতি তথা সনাতনীদের আদি গুরু।

আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথিতেই কৃষ্ণদ্বৈপায়নব্যাসদেব এই ধরাধামে আবির্ভূত হন । তাছাড়া এই পুণ্য তিথিতেই তিনি বেদকে চারভাগে বিভক্ত করেন এবং বেদের সারভূতব্রহ্মসূত্র অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও উপপুরাণ, ব্যাসসংহিতা নামক স্মৃতি শাস্ত্র ও বেদান্তদর্শন রচনা করেন । সেই কারণেই সেই পৌরাণিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত আষাঢ় মাসের এই পূর্ণিমাতিথিইগুরুপূর্ণিমাতিথিরূপে সমস্ত সনাতনীরা পালন করে থাকেন । ব্যাসদেবের জন্ম হয় যমুনার দ্বীপে এবং তার গাত্রবর্ণ ছিল কৃষ্ণ, তাই তিনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। যেহেতু বেদ বিভাগ করেন তাই তিনি বেদব্যাস।

ব্যাসদেবের জন্ম বৃত্তান্ত অত্যন্ত রহস্যজনক । ব্যাসদেব ছিলেন বশিষ্ঠ ঋষির প্রপৌত্র, শক্তি ঋষির পৌত্র এবং পরাশর ঋষির পুত্র । তার মা ছিলেন শূদ্রবংশীয়াদাসরাজের কন্যা সত্যবতী । একদিন সত্যবতী যে নৌকায় নদী পারাপার করছিলেন সেই নৌকাতে উপস্থিত ছিলেন পরাশর ঋষি । সেইখানেসত্যবতীররূপলাবণ্যে আকৃষ্ট হয়ে পরাশর ঋষি শূদ্রকন্যাসত্যবতীকে তার সাথে মিলিত হওয়ার প্রস্তাব দেন। দিনের আলোয়সত্যবতীলজ্জিত হলে, পরাশর ঋষি যোগবলে তখন কুয়াশার সৃষ্টি করেন এবং সত্যবতীর সাথে মিলিত হন। সেখানেই পরাশর ঋষির ঔরসে এবং সত্যবতীর গর্ভে ব্যাসদেবের জন্ম হয় । ব্যাসদেব ছিলেন জন্মগত সিদ্ধ ও তপস্বী । তাই তিনি জন্মমাত্রইতপস্যায় চলে যান, এবং মাতাকে বলেন যখনই তিনি তাকে স্মরণ করবেন, তিনি তখনই তার সামনে উপস্থিত হবেন।

এরপর ব্যাসদেবের মাতা সত্যবতীর সাথে হস্তিনাপুরের রাজা শান্তনুর বিবাহ হয়। তাদের দুই পুত্র চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য বিবাহের পরেই মারা যান । তখন সত্যবতী বংশ রক্ষার জন্য ব্যাসদেবেরশরণাপন্ন হন । ব্যাসদেব পূর্বের প্রতিশ্রুতিমতো মাতার সামনে হাজির হন এবং মাতার নির্দেশে বিচিত্রবীর্যের দুই পত্নী অম্বিকা ও অম্বালিকার সাথে মিলিত হন। তখন অম্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র এবং অম্বালিকার গর্ভে পান্ডুর জন্ম হয়। শুধু তাই নয় অম্বিকার সুন্দরী দাসীর গর্ভে মহাজ্ঞানী বিদুরের জন্ম হয় । মহাভারতে এইভাবে ব্যাসদেবের ঔরসে শুধুমাত্র ধৃতরাষ্ট্র, পান্ডু ও বিদুরের জন্মবৃত্তান্তই নয়, আরও নানা কারণে ব্যাসদেবের উপস্থিতি আমরা বারংবার লক্ষ্য করি। যেমন ব্যাসদেবের নির্দেশেই পঞ্চপান্ডব দ্রৌপদীকে বিবাহ করেন , কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় তিনি সঞ্জয়কে দিব্যচক্ষু দান করেন। এইভাবে মহাভারতের বিভিন্ন ঘটনাস্থলে যখনই কোন সমস্যা বা দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েছে, সেই সব স্থানে ব্যাসদেবস্বয়ং গুরুর স্থানে সমাসীন হয়েছেন এবং প্রয়োজনে পাণ্ডবদের ও গৌরবদের পরামর্শ দিয়ে সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানও করেছেন । এইভাবেই ব্যাসদেব হয়ে উঠেছেন সকলের আদিগুরু ও তাঁর আবির্ভাব তিথি জগতে গুরুপূর্ণিমা বা ব্যাসপূর্ণিমা নামে জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

ব্যাসদেব যাদেরকে সাক্ষাৎ বেদবিষয়েঅধ্যয়নকরিয়েছিলেন, সেই সকল শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম হল জৈমিনি, বৈশম্পায়ন, পৈল এবং শুকদেব। এদের মধ্যে ব্যাসদেবেরসবচেয়েপ্রিয় শিষ্য ছিল তার নিজ পুত্র শুকদেব। স্বয়ং মহাদেবের তপস্যায়বরলাভের পর, ব্যাসদেব পুত্র লাভের জন্য যজ্ঞ করেন, সেই যজ্ঞাগ্নি থেকেই পরম পবিত্র, তেজস্বী, ওজস্বী, মহাজ্ঞানী শুকদেবের জন্ম হয়। শুকদেবের জন্মের পর স্বয়ং মহাদেব তার উপনয়ন কাজ সম্পাদন করেন এবং ইন্দ্র তাকে কমন্ডলু ও দিব্য অস্ত্রশস্ত্র দান করেন। দেবগুরু বৃহস্পতি এবং মিথিলার রাজা জনক যেমন শুকদেবের গুরু ছিলেন তেমনি তার পিতা ব্যাসদেবও ছিলেন তার প্রধান গুরু।

সনাতনীরা গুরুকে অখণ্ড সচ্চিদানন্দের অংশরূপে পূজা করে থাকেন । গুরুই হলেন স্বয়ং ব্রহ্মা, বিষ্ণু অথবা মহেশ্বর । তাই গুরুপ্রণাম স্তোত্রে বলা হয়েছে, -

" গুরুর্ব্রহ্মাগুরুর্বিষ্ণুর্গুরুর্দেবোমহেশ্বরঃ।

গুরুঃসাক্ষাৎ পরং ব্রহ্ম তস্মৈশ্রীগুরবেনমঃ" ।।ঁবস্তুতপক্ষেবিষ্ণুপুরাণ এবং বায়ুপুরাণ অনুসারে ব্যাসদেবস্বয়ং বিষ্ণুর অবতার । যুগে যুগে আমরা বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতাররূপ ধারণের কথা যেমন বিভিন্ন শাস্ত্র থেকে জানতে পারি, তেমনই বিভিন্ন ব্যাসদেবের কথাও শুনতে পাই । তবে কৃষ্ণদ্বৈপায়নব্যাসদেব বিষ্ণুর যে রূপ ধারণ করে বেদকে বিভক্ত করেন তিনিই হলেন সাক্ষাৎ বেদব্যাস।

পরমব্রহ্মের সাথে মিলিত হওয়ার মাধ্যম হল গুরু । মানুষের মধ্যেই অন্তর্নিহিত শক্তি আছে। কিন্তু সৎ গুরুর মাধ্যমেই সেই অন্তর্নিহিত পূর্ণশক্তির বিকাশ হয় । যেমন বিদ্যুৎ বা তড়িৎ তারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে লাইট বা ফ্যানেরপ্রজ্জ্বলন অথবা

ঘূর্ণনরূপে প্রকাশিত হয় , তেমনি শিষ্যের মধ্যে থাকা অন্তর্নিহিত শক্তি , যা তার মধ্যে প্রথম থেকেই বিদ্যমান, তা তার স্বরূপ ,গুরুর মাধ্যমে সচ্চিদানন্দরূপে বিকশিত হয় । তাই গুরুবন্দনা স্তোত্রে বলা হয়েছে, -

"অনেকজন্মসম্প্রাপ্তকর্মবন্ধবিদাহিনে ।

আত্মজ্ঞানপ্রদানেনতস্মৈশ্রীগুরবেনমঃ"।।[৪]অর্থাৎ গুরু অজ্ঞানতার অন্ধকার দূরীকরণ করে আত্মজ্ঞান প্রদানের মাধ্যমে ইষ্ট প্রাপ্তিতে সহায়কহয় ।

এই গুরুই আবার চরম উপলব্ধির পর স্বয়ংইষ্টরূপেপ্রতিভাত হন । গুরুবন্দনা স্তোত্রে বলা হয়েছে , -

" মন্নাথঃশ্রীজগন্নাথোমদ্গুরুঃশ্রীজগদ্গুরুঃ।

মদাত্মাসর্বভুতাত্মাতস্মৈশ্রীগুরবেনমঃ।।" [৫]গুরুতত্ত্ব উপলব্ধির পর এই সদ্ গুরুর সাহায্যেই শিষ্য নিজ (স্বয়ং) এবং গুরুর মধ্যে আর কোন পার্থক্য দেখতে পায় না। তখন সে আপন স্বরূপের মধ্যেই গুরু কে অভিন্ন রূপে অনুভব করে । এইরকম পরিস্থিতিতে তার যথার্থই অনুভব হয় 'সোহম্ ' অর্থাৎ সেই আমি এই মহাবাক্যের প্রকৃত মর্মার্থ । তখন শিষ্য অনুভব করে তার গুরুই সমস্ত জগৎ সংসার কে ব্যক্ত করে আছেন । গুরুই সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম । তাই আমরা গুরুপ্রণামমন্ত্রে সেই আনন্দস্বরূপ গুরুকে প্রণাম করতে গিয়ে বলে থাকি -

" ব্রহ্মানন্দংপরমসুখদংকেবলংজ্ঞানমূর্তিম্
দ্বন্দ্বাতীতংগগনসদৃশংতত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম্।
একংনিত্যংবিমলমচলংজসর্বধীসাক্ষীভূতম্
ভাবাতীতংত্রিগুণরহিতংসদ্গুরুংতংনমামি।।"[৬]

গুরুই হলেন সত্যস্বরূপ। তিনিই সাকার, তিনিই আবার নিরাকার । তিনি কখনো সত্ত্ব , রজঃ এবং তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক, আবার কখনো ত্রিগুণের অতীত, দ্বন্দ্বরহিত, দোষরহিত, অকামাহত, সদ্অসদ্ বিলক্ষণ অনির্বচনীয়স্বরূপ। তাই শ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেব বলেছেন ,- ' সচ্চিদানন্দই গুরু। '[৭] সুতরাং এই মনুষ্যজীবনে যদি গুরুতত্ত্বের জ্ঞান বা পরমেশ্বরের জ্ঞানলাভ না হয় , তখন এই মনুষ্যজন্মের কোন দাম থাকে না। কোন ব্যক্তি যদি রূপযৌবনসম্পন্ন হয়, তার সুন্দরী স্ত্রী থাকে, বাড়ি থাকে , গাড়ি থাকে , অনেক সাহিত্যিক ও শৈল্পিক প্রতিভা থাকে, পুত্র থাকে , পৌত্র থাকে, সমাজে প্রতিষ্ঠা থাকে, দেশ-বিদেশে সম্মান থাকে, কিন্তু গুরুর শ্রীচরণে মন আসক্ত থাকে না, তবে এই ব্যক্তির জীবনধারণই বৃথা । তাই আচার্য শংকর তার 'গুর্বষ্টকম্' স্তোত্রে সুন্দরভাবে বলেছেন, -

"শরীরংসুরূপং সদা রোগমুক্তং
যশশ্চারুচিত্রংধনংমেরুতুল্যম্।
গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মেমনশ্চেন্নলগ্নং
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্।। ১।।

কলত্রংধনংপুত্রপৌত্রাদিসর্বং
গৃহংবান্ধবঃসর্বমেতদ্ধিজাতম্।
গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মেমনশ্চেন্নলগ্নং
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্।।২ ।।
ষড়ঙ্গাদিবেদো মুখে শাস্ত্রবিদ্যা
কবিত্বং চ গদ্যং চ পদ্যংকরোতি ।
গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মেমনশ্চেন্নলগ্নং
ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্।। ৩ ।। "[৮]

আত্ম উপলব্ধির জন্য গুরুর চরণকমলে তন, মন ও ধন শিষ্যকে অবশ্যই সমর্পণ করতে হবে । আর সেই কারণেই ভারতবর্ষের সনাতন সংস্কৃতিতে গুরু-শিষ্য পরম্পরা সুদূর বৈদিক কাল থেকে আজ পর্যন্ত চলে আসছে । আমরা ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ব এই চার বেদের বিভিন্ন ঋষিদের কথা শুনতে পাই। এইসব বেদের বিভিন্ন ঋষিগণ পরম্পরাক্রমে তাদের শিষ্যদের বেদকে শুনিয়েছেন । আর এইভাবে শুনে শুনে শিষ্যরা বেদকে মনে রাখতেন, এবং তারাও পরবর্তীকালে তাদের শিষ্যদের শুনিয়েছেন। এইভাবে গুরু পরম্পরাক্রমে বেদকে শুনে শুনে মনে রাখা হতো বলেই বেদের আরেক নাম শ্রুতি । আমরা ঋকবেদের সাতটি মন্ডলের সাতজন ঋষির নাম শুনতে পাই । এই সাতজন ঋষিই আসলে সাতটি মন্ডলের প্রধান প্রধান গুরু।

বিভিন্ন উপনিষদের তাত্ত্বিক আলোচনায় গুরু শিষ্যের সংবাদ পরম্পরা শুনতে পাই। যেমন সামবেদেরকেনোপনিষদে শিষ্য গুরুকে প্রশ্ন করছেন, এই মন কার দ্বারা প্রেরিত হয়ে বিভিন্ন কার্য করে থাকে, কার দ্বারা চক্ষু, শ্রবণেন্দ্রিয় প্রভৃতি প্রেরিত হয়ে বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়। প্রশ্নটি এইরূপ, -

"ওঁকেনেষিতংপততিপ্রেষিতংমনঃ।
কেন প্রাণঃপ্রথমঃপ্রৈতিযুক্তঃ।
কেনেষিতাংবাচমিমাংবদন্তি
চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি।। " [৯]

শিষ্যের এই প্রশ্ন শুনে গুরু উত্তর দিচ্ছেন যিনি চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়েরকর্তা, তার দ্বারা প্রেরিত হয়েই মন বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়.তাই বলা হয়েছে, - , "শ্রোত্রস্যশ্রোত্রংমনসোমনো যৎ ।। "[১০]

আমরা অথর্ববেদেরপিপ্পলাদ শাখার প্রশ্নোপনিষদে দেখতে পাই আচার্য পিপ্পলাদ সুকেশা প্রমুখ ৬ জন ঋষির প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। একবার সুকেশা, সত্যকাম, সৌর্য্যায়ণী, আশ্বলায়ন, ভার্গব এবং কবন্ধী এই ৬ জন ঋষি সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরম ব্রহ্মকে জানবার জন্য একসাথে বাইরে বেরিয়ে ছিলেন । সেই বহির্ভ্রমনকালে তারা জানতে পেরেছিলেন যে তাদেরকে পরমব্রহ্ম সম্বন্ধে ঋষি পিপ্পলাদ যথার্থ শিক্ষা দিতে

পারেন। তারপর তারা পিপ্পলাদ ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হন এবং তাঁর কাছে তাদের নিবেদন করেন । পিপ্পলাদ ঋষিও তাদেরকে শিষ্যরূপে বরণ করেন এবং নিজের আশ্রমে এক বছর ব্রহ্মচর্য পালনের জন্য আদেশ করেন। এক বছর তপশ্চর্যা শেষে প্রথমেই কবন্ধী ঋষি তাদের গুরু পিপ্পলাদকে প্রশ্ন করেন, - " ভগবন্কুতো হ বা ইমাঃপ্রজাঃপ্রজায়ন্ত ইতি । "[১১] হে গুরুদেব, যার থেকে এই জীবজগৎ নানারূপেউৎপন্নহয় এবং যিনি এই সমস্ত জগতের কর্তা তিনি কে ? কি তাঁর প্রকৃত স্বরূপ? তখন পিপ্পলাদ উত্তর দেন, - " তস্মৈ স হোবাচপ্রজাকামোবৈপ্রজাপতিঃ.. .. মে বহুধা প্রজাঃকরিষ্যত ইতি । " [১২]অর্থাৎ পরমেশ্বরের যখন সৃষ্টি করার ইচ্ছে হলো তখন তিনি সংকল্প রূপ তপস্যার দ্বারা রয়ি এবং প্রাণ এই দুইয়ের সংমিশ্রণে জগৎ সৃষ্টি করলেন। এভাবে আমরা বেদের বিভিন্ন ব্রাহ্মণ, আরণ্যক তথা উপনিষদে দেখতে পাই শিবসেনা গুরুর কাছে পরমেশ্বর সম্বন্ধে নানান প্রশ্ন করছেন এবং গুরুও তাদেরকে সেই পরমেশ্বর বিষয়ে নিষ্ঠা সহকারে শিক্ষা দিচ্ছেন।

আমরা পৌরাণিক কালেও অনেক গুরুপরম্পরার ঘটনার উল্লেখ পাই। এই প্রসঙ্গে ধৌম্য ঋষি এবং তার শিষ্যদের বিভিন্ন গুরুভক্তির উল্লেখ করতে পারি । ধৌম্য ঋষির তিনজন শিষ্য ছিল - বেদ, উপমণ্যু এবং আরুণি। গুরু ধৌম্য তার আশ্রমে শিষ্যদের রাখতেন এবং তাদের বিভিন্ন গুরুভক্তির পরীক্ষা নিতেন। শিষ্যরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তিনি তাদেরকে বিভিন্ন শাস্ত্রে পারদর্শী করে তুলতেন ।

একবার বন্যায়ধৌম্য ঋষির ক্ষেতের আল ভেঙে যায়। তখন তিনি তাঁর প্রিয় শিষ্য আরুণিকে ক্ষেতের আল বাধতে পাঠান। সেখানে গিয়েআরুনি প্রথমে নিজের দন্ড দিয়ে মাটি খুঁড়েনানানভাবে আল বাঁধার চেষ্টা করে। কিন্তু জলের গতি অত্যন্ত বেশিথাকায় সে যখন কিছুতেই আল বাঁধতে পারল না , তখন সে নিজেই আলের উপর শুয়েপড়ে এবং জলের গতিকে রোধ করার চেষ্টা করে। তার গুরু ধৌম্য ঋষি আরুনিকে খুঁজতে খুঁজতে এই ক্ষেতের কাছে এসে উপস্থিত হয় এবং দেখতে পান তার শিষ্য আলের উপর শুয়ে আছে। সব বুঝতে পেরে গুরু ধৌম্যআরুণিকে আল থেকে উঠে আসতে বলেন এবং তাকে আশীর্বাদ করেন ও বিভিন্ন শাস্ত্রে গভীর শিক্ষা দেন।

ভারতীয়গুরুপরম্পরা অনুযায়ী দেবতাদের গুরু হলেন বৃহস্পতি, দৈত্যদের গুরু স্বয়ং শুক্রাচার্য, মর্যাদা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের গুরু ছিলেন বশিষ্ঠ এবং বিশ্বামিত্র ঋষি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গুরু সন্দীপনী মুনি, কৃষ্ণ ভক্ত প্রহ্লাদের গুরু নারদ, পাণ্ডবদের গুরু দ্রোণাচার্য এবং ধৌম, দুর্যোধনের গুরু বলরাম, একলব্যের গুরু দ্রোণাচার্য, ভগবান বুদ্ধদেবের গুরু অড়ার মুনি, চন্দ্রগুপ্তের গুরু চাণক্য ,শংকরাচার্যের গুরু গোবিন্দপাদ, শ্রীচৈতন্যের গুরু কেশব ভারতী ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের গুরু তোতাপুরী, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অখন্ডানন্দ প্রমুখ মহাপুরুষদের গুরু ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, আবার ভগিনী নিবেদিতাদের মত মহীয়সীদের গুরু স্বামী বিবেকানন্দ, রাষ্ট্রীয়স্বয়ংসেবক সংঘের দ্বিতীয়স্বরসঙ্ঘচালক পরম পূজনীয়শ্রীগুরুজীর

গুরু স্বামী অখন্ডানন্দ, দয়ানন্দে সরস্বতীর গুরু স্বামী বিরজানন্দ, নিগমানন্দের গুরু সাধক বামাক্ষ্যাপা, ঋষি অরবিন্দের গুরু লেলেবাবা, সন্ত রসখানের গুরু বিঠ্‌ঠলনাথ, সুরদাসের গুরু বল্লভাচার্য, মীরাবাঈ এর গুরু রবিদাস এবং হিন্দু সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছত্রপতি শিবাজীর গুরু রামদাস। আমরা দেখতে পেলাম সেই প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন সাধক ও মহাপুরুষদের এক একজন গুরু আছেন। এইভাবেই বৈদিক কাল থেকে ভারতের গুরুপরম্পরা আজ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে চলে আসছে ।

এখন প্রশ্ন হল ভারতীয় গুরু পরম্পরায় শুধুমাত্র ব্যক্তিকেই কি গুরুরূপে বরণ করা হয়েছে। এর উত্তরের স্পষ্টভাবে বলা যায় না, বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যক্তির ঊর্ধ্বে ব্যক্তিসত্তাঅর্থাৎ গুরুতত্ত্বকে আধার করে বিভিন্ন প্রতীককে গুরু রুপে বরণ করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আমরা প্রথমেই রাষ্ট্রীয়স্বয়ংসেবক সংঘের নাম উল্লেখ করতে পারি । রাষ্ট্রীয়স্বয়ংসেবক সংঘের গুরু হল পরম পবিত্র গৈরিক ধ্বজ। ১৯২৫ সালে মহারাষ্ট্রের নাগপুরের বাসিন্দা ডাক্তার কেশব বলিরাম হেড গেওয়াররাষ্ট্রীয়স্বয়ং সেবক সংঘের প্রতিষ্ঠা করেন। সাধারণভাবেই অন্যান্য স্বয়ংসেবকরা প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তারজীকেইগুরুরূপে দেখতে চেয়েছিলেন । কিন্তু নিষ্কাম ও নির্মম চিত্রের অধিকারীডাক্তারজী নিজের পরিবর্তে ভারতীয় সনাতন ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক পরম পবিত্র গৈরিক ধ্বজকে গুরুর স্থানে বরণ করে নেন। তাই সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয়স্বয়ংসেবক সংঘের গুরুর মর্যাদায় আসীন আছেন পরম পবিত্র গৈরিক ধ্বজ।

এখন প্রশ্ন হল ডাক্তার কেশব বলিরাম হেড গেওয়ার কেনই বা হঠাৎ করে গৈরিক পতাকাকে গুরু রুপে বরণ করতে গেলেন। আর এই প্রশ্নের সমাধান করতে গেলে আমাদেরকে ভারতবর্ষের গৈরিক ধ্বজের প্রাচীন পরম্পরা ও তাৎপর্যঅর্থাৎ মাহাত্ম্য সম্বন্ধে জানতে হবে।

ধ্বজ শব্দের অর্থ হলো চিহ্ন বা প্রতীক (Symbol) । এই ধ্বজই কোনো জাতি বা সভ্যতার বিশ্বাসের প্রতীকস্বরূপ, যাকে ঘিরে থাকে অনেক আবেগ এবং উচ্ছ্বাস। অনেক প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ তাদের সামাজিক ও ধর্মীয় বিশ্বাস এবং আধ্যাত্মিকতার আস্থা প্রকাশের জন্য বিভিন্ন প্রতীক বা চিহ্নের ব্যবহার করত । প্রথমদিকেমানবজাতি এই প্রতীক বা চিহ্নের ব্যবহার করতে শুরু করে প্রস্তরের উপরে এবং পরবর্তী যুগে কাঠের উপরে খোদাই করে। মানুষ তাদের নিজেদের গৌরব প্রকাশের জন্য এই সকল প্রতীক বা চিহ্নরূপে বিভিন্ন প্রাণী (Animal), বৃক্ষ (Plants) ইত্যাদির ব্যবহার করত। পরবর্তীকালে এই ধরনের আচরণই টোটেমিজম্ (Totemism) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। হিন্দুসভ্যতায় ও সংস্কৃতিতে পুরান, মহাভারত ও রামায়ণের যুগ থেকে আরম্ভ করে বৌদ্ধ তথা জৈন সভ্যতায় এবং তৎপরবর্তী যুগে

এই ধরনের প্রতীকের ব্যবহার হতে থাকে ধ্বজ বা পতাকারূপে । আমরা তাই পুরানে, মহাভারতে এবং রামায়ণে তথা তৎপরবর্তী যুগের বিভিন্ন ধ্বজের উল্লেখ পাই । যেমন কপিধ্বজ, গরুড়ধ্বজ, মীমধ্বজ, ময়ূরধ্বজ, বৃষভধ্বজ ইত্যাদি ।

আমরা পৌরাণিক বিভিন্ন দেবতাদের রথে সুবর্ণময় বিভিন্ন প্রকার বাহনযুক্ত ধ্বজের উল্লেখ পাই । একটি পৌরাণিক ঘটনা থেকে জানতে পারি অগ্নিদেব যজ্ঞেরঘৃতপান করতে করতে যখন অজীর্ণরোগে আক্রান্ত হন, তখন তিনি আরোগ্য লাভের জন্য খান্ডববনকে (দহন করে) ভক্ষণ করতে উদ্যত হন । কারণ অগ্নিদেব জানতেন সেই বনে ও অজীর্ণ রোগের নানা প্রকার ঔষধি আছে। কিন্তু দেবতাদের অধিক বর্ষণে অগ্নিদেব ব্যর্থ হলে অর্জুন তাকে খান্ডবদহনে সহায়তা করেন । এরপর অগ্নিদেব অর্জুনকে যে রথ দেন, সেই রথের চূড়ায় যে ধ্বজের উল্লেখ পাই, তা ছিল সুবর্ণময়, বিশাল আকৃতিযুক্ত, যা এক যোজন অর্থাৎ চার ক্রোশ দূর থেকে দেখা যেত। এত বিশাল ধ্বজ হওয়াসত্ত্বেও এটি কখনো রথের ভারস্বরূপ ছিল না, এবং বৃক্ষ প্রভৃতিতে কখনো আটকেও যেত না। এই ধ্বজের কারণে রথ কখনো থেমেও যেত না । মহাবলী হনুমান এই ধ্বজটির উপরে সর্বদা বিরাজমান থাকত। তাই এই অর্জুনের রথকে কপিধ্বজযুক্ত বলা হয়।

এই ধ্বজের ব্যবহার আমরা বৈদিক কাল থেকে দেখতে পাই ঋকবেদেরসপ্তম মন্ডলের ৮৫ তম সূক্তেরদ্বিতীয় মন্ত্রে ধ্বজের উল্লেখ আছে। সেখানে বলা হয়েছে - " স্পর্ধন্তে বা উ দেব হূ এ অত্র যেষুধ্বজেষু... "[১৩]অর্থাৎ যুদ্ধের সময় ধ্বজের উপরে বাণ এসে পড়ছে। এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি এই ধ্বজের ব্যবহার দেবতাদেরগৌরববহ চিহ্ন হিসাবে প্রাচীন কাল থেকেই ব্যবহৃত হত। এবং সেখানে ধ্বজের উপর প্রতীক রূপে কোন প্রাণী বা উদ্ভিদ শোভা পেত । ফ্রয়েডের মত কোন কোনপ্রাশ্চাত্য দার্শনিক এই সকল প্রাণী বা উদ্ভিদের উল্লেখ দেখে, একে পাশ্চাত্যের টোটেমিজম বা কুলপ্রতীকবাদের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই টোটেমিজম ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তারা আমাদের বিভিন্ন ঋষিদেরকে বিভিন্ন পশুপাখি থেকে উৎপন্নহয়েছে বলে ব্যাখ্যা করেছেন। তখন তারা বলেছেন কৌশিক মুনি আসলে প্যাঁচার বংশধর এবং শৌণক মুনি আসলে কুকুরের বংশধর। কিন্তু মনে রাখতে হবে পাশ্চাত্য দার্শনিকদের এহেন সংকীর্ণ ব্যাখ্যা কোনমতেই প্রাচ্য চিন্তাধারা বা দর্শনের সাথে মেলানো যায় না বা উচিত নয়। তবে হ্যাঁ, বৈদিক যুগে থেকেই পরিবেশ সংরক্ষণের জন্যই আমরা বিভিন্ন পশু পাখি বা গাছপালার পূজা দেখতে পাই । যেমন - ' ওঁম্মধুবাতাঋতায়তে মধু ক্ষরন্তিসিন্দবঃমাধ্বীর্গাবোনঃসন্তোষধীঃ..... '' [১৪] ইত্যাদি । এই মন্ত্রে যেমন ঔষধি বা গোমাতা সংরক্ষণের কথা বলা আছে। আর সেই অর্থে প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে বিভিন্ন পশুপাখি বা গাছপালার পূজা হয়ে থাকে। তবে সেটা কোনমতেই পাশ্চাত্য টোটেমিজমের মত নয়।

আমরা মহাভারতের অশ্বত্থামার রথের ধ্বজে সিংহাঙ্গুলংঅর্থাৎ বিরাট জ্যোতির্ময়লেজযুক্ত সিংহের উল্লেখ পাই । ভগবান স্কন্ধের ধ্বজে ময়ূরের উপস্থিতি দেখতে পাই ,যাকে ময়ূরধ্বজ নামে অভিহিত করা হয়। ত্রিপুরাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করার সময় ভগবান শিব বৃষভধ্বজের ব্যবহার করেছিলেন । আমরা বিভিন্ন পুরাণে ইন্দ্রধ্বজের উল্লেখ পাই । বিভিন্ন আখ্যানে উল্লেখ আছে যুদ্ধের সময় ইন্দ্র তার যোদ্ধাদের রক্ষা করার জন্য নিজেই স্তম্ভ বা পিলারেরমতোদাঁড়িয়ে ছিলেন। সেখান থেকেই ইন্দ্রধ্বজের প্রতীক বিভিন্ন যুদ্ধে বিজয় লাভের জন্য ব্যবহৃত হতে থাকে । মহাবীর কর্ণের ধ্বজ ছিল হস্তীকাক্ষ্য এবং তা নানা প্রকার মালা দিয়ে সাজানো এবং সুবর্ণময়। জয়দ্রথের ধ্বজের নাম ছিল বরাহধ্বজ এবং তার রঙ ছিল সাদা । দুর্যোধনের ধ্বজ ছিল সাপের ফণাযুক্ত এবং সুবর্ণময়। পিতামহ ভীষ্মের ধ্বজের নাম ছিল তালধ্বজ, অর্থাৎ যেখানে তাল (plam) গাছের উপস্থিতি ছিল এই পতাকায় । দ্রোণাচার্যের রথের ধ্বজে ছিল একটি কমন্ডলুর প্রতীক ,যা হরিণের চামড়াদিয়ে আবৃত ছিল। এভাবে আমরা রামায়ণেওমর্যাদাপুরুষোত্তমরঘুবীররামচন্দ্রের রথে গৈরিক ধ্বজের উল্লেখ পাই। শুধু প্রাচীনকালে নয়, আধুনিক রানা প্রতাপ ও শিবাজীর রথেও আমরা গেরুয়া ধ্বজের উপস্থিতি লক্ষ্য করেছি । বস্তুতপক্ষে ধ্বজই হল একজন যোদ্ধার গৌরববাহী চিহ্ন, যেটা দেখে দূর থেকে বোঝা যায় যে কোনটি কার রথ । শুধু রথেই নয়, প্রাচীন কাল থেকেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন মন্দির তথা ধর্মীয়প্রতিষ্ঠানেয়চূড়ায় শোভা পেত সুবর্ণময় গৈরিক পতাকা। মূলত এই গৈরিক ধ্বজ ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতীকস্বরূপ। আর সেই কারণেই রাষ্ট্রীয়স্বয়ংসেবক সংঘে গৈরিক ধ্বজকেই গুরু বলে মানা হয়, কিন্তু কোন ব্যক্তিকে গুরু মানা হয় না।

গৈরিক বর্ণ হল শৌর্য, বীর্য , শক্তি, ভক্তি প্রভৃতি শুভ গুণ তথা ত্যাগের প্রতীক। সংঘের স্বয়ংসেবকরা তাই গৈরিক বর্ণের ধ্বজকেই গুরুরূপে বরণ করে নিয়েছেন। কোন ব্যক্তি যদি গুরু হন তবে তার মধ্যে সমস্ত সদ্-গুণ নাও থাকতে পারে, অথবা থাকলেও তা সকল ব্যক্তির কাছে সমানভাবে প্রতিফলিত নাও হতে পারে। আর এই কথা মাথায় রেখে ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক তথা বাহক গৈরিক বর্ণের ধ্বজকেই গুরুরূপে বরণ করাই শ্রেয় বলে মনে করেছেন পরম পূজনীয়ডাক্তারজী তথা পূজনীয়গুরুজী। তাই গুরুজী এক জায়গায় বলেছেন , - " আমাদের মহান সংস্কৃতির পরিপূর্ণ পরিচয়প্রদানকারীপ্রতীকস্বরূপ এই ভাগবাধ্বজ যা আমাদের কাছে পরমেশ্বর স্বরূপ। এইজন্য এই পরম বন্ধনীয় ধ্বজকে আমরা গুরুর স্থানে রাখা উচিৎ বলে মনে করেছি। তার সুবর্ণ গৈরিক শরীর পবিত্র যজ্ঞবেদির শিখার মত যা শারীরিক ভোগলালসাকে ভস্মীভূত করতে সমর্থ, সন্ন্যাসীরত্যাগবৃত্তির নির্দেশক ,ত্যাগময়জনসেবার সংকেত চিহ্ন "। [১৫]

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয়শিক্ষাব্যবস্থা মূলত গুরুশিষ্য পরম্পরার মাধ্যমে হয়ে আসছে। তাই সেখানে গুরু শিষ্য পরস্পরেরই মঙ্গল প্রার্থনা করেছেন । বৈদিক শান্তিমন্ত্রে তাই বলা হয়েছে, " ওঁ সহ নাববতু সহ নৌ ভুনক্তু সহ বীর্যংকরবাবহৈ তেজস্বী নাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ। ওঁশান্তিঃশান্তিঃশান্তিঃ ।।"[১৬]অর্থাৎ আমরা গুরু এবং শিষ্য পরস্পরকে যেন বিদ্বেষ না করি এবং পরস্পরকে পরস্পর যেন রক্ষা করি তথা পরস্পরের অধীত বিদ্যা যেন তেজশালীহয়।

ভারতীয় গুরু পরম্পরার অন্যতম আরেকটি দিক হল গুরুপূজন এবং গুরুদক্ষিণা প্রদান। আমরা প্রাচীনকাল থেকেই এরকম নানান ঘটনার উল্লেখ পাই, যেখানে দেখতে পাই শিষ্যরা খুব নিষ্ঠা সহকারে তাদের গুরুদের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শন করেছেন এবং যথাসাধ্য বিনম্র চিত্তে গুরুদক্ষিণাও প্রদান করেছেন । এই প্রসঙ্গে অবশ্যই উল্লেখ করা যেতে পারে একলব্যেরগুরুভক্তির কথা। আমরা জানি পান্ডবদের এবং কৌরবদেরঅস্ত্রগুরু ছিলেন দ্রোণাচার্য । তিনি সকলকে অস্ত্রশিক্ষাদিলেওএকলব্যনিম্নবর্গীয়হওয়ায় তাকে অস্ত্র শিক্ষা দিতে অসম্মত হন । তখন একলব্য গোপনে দ্রোণাচার্যের মূর্তি বানিয়ে , সেই মূর্তির সামনে অস্ত্রশিক্ষা অভ্যাস করতে থাকেন। একদিন পাণ্ডবদের একটি কুকুর খুব চিৎকার করলে একলব্য বান মেরে তার মুখ বন্ধ করে দেন , কিন্তু প্রাণে মারেন না। কুকুরের এই অবস্থা দেখে দ্রোণাচার্য বুঝতে পারেন এ কোন সাধারণ ধনুর্ধরের কাজ নয়। দ্রোণাচার্য তখন সেই ধনুর্ধরকে খুঁজতে খুঁজতেএকলব্যের সামনে এসে উপস্থিত হন এবং তাকে দেখে চিনতে পারেন। একলব্যের এই অস্ত্রশিক্ষার রহস্য দ্রোণাচার্য জানতে পেরে তার কাছে তিনি গুরুদক্ষিণাস্বরূপ তার তর্জনী কেটে দিতে বলেন। এখানে কিন্তু আমরা শিষ্য একলব্যেরমাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে পারি , যখন তিনি গুরুর আদেশ মাত্রই তার আঙ্গুল কেটে দ্রোণাচার্যেরপায়ে সমর্পণ করেন। এই হল প্রকৃত গুরুদক্ষিণা প্রদান , যেখানে আছে শুধু প্রশ্নাতীতনির্মোহ শ্রদ্ধা। আমরা ভারতবর্ষের ইতিহাস এরকম নানান ঘটনার উল্লেখ পাই । স্বয়ং ছত্রপতি শিবাজী হিন্দু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরে তার গুরু রামদাসেরপায়ে সমগ্র সাম্রাজ্য সমর্পণ করেন। তাই তৈত্তীরয় উপনিষদের শিক্ষাবল্লীতে দান করার কৌশল সম্পর্কে গুরু শিষ্যকে বলছেন, - " শ্রদ্ধয়াদেযমশ্রদ্ধয়াঅদেয়ম্, শ্রিয়াদেয়ম, ভিয়াদেয়ম্, হিয়াদেয়ম্, সংবিদা দেয়ম্....।।"[১৭]

তাই বর্তমানকালেও ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে আষাঢ় মাসের পূর্ণিমার দিন গুরুপূজনউৎসব পালিত হয় । ঐদিন ভারতবর্ষের বিভিন্ন মঠ-মন্দিরে গুরুপূর্ণিমা উপলক্ষে বিশেষ বিশেষ পূজা, হোম-যজ্ঞ ও নানাপ্রকার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আমরা যদি ওইদিন ভারতবর্ষের যেকোন রামকৃষ্ণ মঠে যাই, তবে দেখতে পাব সেখানে মঠ-প্রাঙ্গণকে খুব সুন্দর ভাবে সাজানো হয়েছে এবং সেখানে নানা প্রকার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সেইদিনজগদ্গুরু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে নতুন বস্ত্র ও নানান প্রকার ফুল ও মালা দিয়ে সাজানো হয়। অগণিত ভক্ত দল সেইদিনজগদ্গুরু ঠাকুর

রামকৃষ্ণদেবকে যেমন প্রণাম নিবেদন করেন, তেমনি তারা তাদের দীক্ষাগুরুকেও পুষ্পের দ্বারা পূজনপূর্বক প্রণাম করেন এবং নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী দক্ষিণা প্রদান করেন। শুধু বিভিন্ন মঠ মন্দিরেই নয়, এইদিন সমস্ত শিষ্যরা তাদের কুলগুরু অথবা শিক্ষাগুরু অথবা অন্যান্য যেকোন প্রকার গুরুর গৃহে বিশেষ পূজা ও প্রণাম করতে যান এবং তাদের গুরুদেবকে নতুন বস্ত্র অথবা অন্যান্য সামগ্রী দক্ষিণা স্বরূপ প্রদান করেন। এইভাবে আজও ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে গুরু-শিষ্য পরম্পরা সুরক্ষিত আছে এবং এই পরম্পরাকে বিশেষ মর্যাদায় উত্তীর্ণ করার জন্য গুরুপূর্ণিমাউৎসব পালিত হয়ে চলেছে।

এই প্রসঙ্গে অবশ্যই রাষ্ট্রীয়স্বয়ংসেবক সংঘের গুরুপূর্ণিমাউৎসব কথা গুরুপূজন এবং গুরুদক্ষিণা সমর্পণ কিরকম তা অবশ্যই আলোচনা করার প্রয়োজন আছে। রাষ্ট্রীয়স্বয়ংসেবক সংঘের ছয়টি প্রধান উৎসবের মধ্যে একটি অন্যতম হল গুরুপূর্ণিমাউৎসব । আমরা পূর্বেই জেনেছি সংঘের গুরু হল পরম পবিত্র গৈরিক ধ্বজ। সংঘের স্বয়ংসেবকরাএইদিন গুরু পূর্ণিমা উৎসব উপলক্ষে নানানপ্রকার কার্যক্রম আয়োজন করে থাকে। এই দিন শাখার মাঠে দিনের বিভিন্ন সময়েস্বয়ংসেবকরা তাদের সুবিধামতোএকত্রিত হয়ে তাদের পরম পূজনীয় গুরু গৈরিক ধ্বজ উত্তোলন করেন । ধ্বজস্থান খুব সুন্দর করে সাজানো হয় । স্বয়ংসেবকরা স্নান করে, পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান করে, নিজেরাই পুষ্প নিয়ে এসে সেই গৈরিক ধ্বজের সামনে সমবেত হন এবং তারপর কিছু আবশ্যিক কার্যক্রমের প্রত্যেকে তাদের গুরুকে পুষ্পের দ্বারা প্রথমে পূজন করেন। তারপর তারা একটি খামের মধ্যে তাদের সারা বছরের সঞ্চিত অর্থ গুরুদক্ষিণারূপে, সেই পবিত্র গৈরিক ধ্বজের সামনে সমর্পণ করেন। এই প্রসঙ্গে জেনে রাখা দরকার যে , রাষ্ট্রীয়স্বয়ংসেবক সংঘে সারাবছরের কার্যক্রমের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হয় তা কোন ভাতা বা সরকারি অথবা বেসরকারি অনুদান বা অন্য কোন ডোনেশানের মাধ্যমে নেওয়াহয় না । সংঘের স্বয়ংসেবকরা গুরু পূর্ণিমার দিন দক্ষিণাস্বরূপ যে অর্থ সমর্পণ করেন তার মাধ্যমেই সংঘের সারা বছরের কার্যক্রম তথা প্রচারক এবং অন্যান্য কার্যকর্তাদের নিত্য নৈমিত্তিক খরচা নির্বাহিত হয়ে থাকে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা ভারতবর্ষের গুরুপূর্ণিমা সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা পেলাম। আমরা এই আলোচনা থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থার মূল স্তম্ভ হল গুরুপরম্পরা, যা প্রাচীনকাল থেকে অদ্যাবধি নিরবিচ্ছিন্নভাবেবয়ে চলেছে । শুধু তাই নয় আমাদের সংস্কৃতি ও পরম্পরা অনুযায়ী এই গুরু পূর্ণিমার দিনটিকেই শিক্ষক দিবস হিসেবে পালন করা উচিত বলে মনে করা হলে, তা কোনভাবেই দোষের হবে না।

তথ্যসূত্রঃ

১. প্রার্থনা ও সংগীত, রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ, শ্রীগুরুবন্দনাস্তোত্রন্, শ্লোক-৩, পৃষ্ঠা-১১
২. তদেব গ্রন্থ, শ্রীগুরুবন্দনাস্তোত্র, শ্লোক-২ পৃষ্ঠা-১১
৩. তদের গ্রন্থ, শ্লোক-১, পৃষ্ঠা-১১
৪. গুরুস্তোত্রন্, বিশ্বসারতন্ত্রম্, শ্লোক-৪
৫. তদেব, শ্লোক - ৫
৬. তদেব শ্লোক - ৬
৭. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, প্রথম খন্ড।
৮. শংকরাচার্য বিরচিতগুর্বষ্টকস্তোত্রম্।
৯. কেনোপনিষদ্, শ্লোক - ১
১০. কেনোপনিষদ্।
১১. প্রশ্নোপনিষদ্ ।
১২. প্রশ্নোপনিষদ্।
১৩. ঋগ্বেদ, ৭ম মন্ডল, ৮৫তম সূক্ত, ২য় মন্ত্র।
১৪. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ,শ্রীম-কথিত।
১৫. শ্রীগুরুজী, তুহিনা প্রকাশনী
১৬. ঈশোপনিষদ, শান্তিমন্ত্র ।
১৭. তৈত্তিরীয়োপনিষদ্, শিক্ষাবল্লী, একাদশ অনুবাক্।

সহায়ক-গ্রন্থপঞ্জীঃ-

১. প্রার্থনা ও সংগীত , রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠবেলুড় মঠ, চতুর্থ সংস্করণ, মহালয়া, ১৪১২ ।
২. মধুকরানন্দ , স্বামী, উদ্বোধন কার্যালয়, রামকৃষ্ণ মঠ, বাগবাজার, ৩৮তম পুনর্মুদ্রণ, ফাল্গুন ১৪২৮ ।
৩. ত্যাগীবরানন্দ , স্বামী, নুনের পুতুলের সমুদ্রযাত্রা (গুরুপূর্ণিমা বা ব্যাসপূর্ণিমামাহাত্ম্য) রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ, নরেন্দ্রপুর ,কোলকাতা ৭০০ - ০০৩ ।
৪. ভূতেষানন্দ , স্বামী, মন্ত্রদীক্ষা, রামকৃষ্ণ মঠ ,উদ্বোধন কার্যালয়, কোলকাতা, ৭০০-০০৩, ৩২তম পুনর্মুদ্রণ, বৈশাখ ১৪২৯ ।
৫. ঘোষ, দুর্গাপদ, গৈরিক পতাকা, রাষ্ট্রীয়স্বয়ংসেবক সংঘ ,পশ্চিমবঙ্গ ,অভেদানন্দ সরণী, কলিকাতা ৭০০ -০০৬ ।
৬. দাশগুপ্ত, অশোক, আর. এস.এস.কী ও কেন? শ্রী প্রকাশন, ২৬ ,বিধান সরণী, কোলকাতা ৭০০-০০৬, পঞ্চম প্রকাশ - 2018 ।

৭. উপনিষদ্, গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর, 2003 ।

৮. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, (শ্রীম-কথিত) , প্রথম খন্ড, উদ্বোধন কার্যালয় ,বাগবাজার ,কোলকাতা, ষড়বিংশতি পুনর্মুদ্রণ, পৌষ ১৪১৫,ডিসেম্বর - ২০০৮ ।

৯. রামসুখদাস, স্বামী, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, সাধক-সঞ্জীবনী, গীতা প্রেস , গোরক্ষপুর, Twenty-third reprint, 2008 ।

ফুলিয়ার তাঁত শিল্পের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি পর্যালোচনা (১৯৪৭খ্রীঃ – ১৯৭৭খ্রীঃ)

সুলজ বালা
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, রঘুনাথপুর কলেজ, পুরুলিয়া

সারসংক্ষেপ :- দেশবিভাগের পর নদিয়া জেলার ফুলিয়া উপনগরীকে কেন্দ্র করে তাঁত শিল্পের জয়যাত্রা শুরু, যা আজ মোহীরূপে পরিনত হয়েছে। মূলত এই শিল্পকে কেন্দ্র করেই বহু উদ্‌বাস্তু, শরণার্থী, স্থানীয়মানুষ, বেকার যুবক-যুবতী ও শ্রমজীবী মানুষের কর্মসংস্থানের পথ তৈরী হয়েছে, যা তাদের অর্থসামাজিক অবস্থাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে। উক্ত সময়কালে ভারত সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, স্থানীয় ও আঞ্চলিক মানুষ, বড়বড় ব্যবসায়ী, মহাজন, বিভিন্ন সমবায় সমিতি, ব্যাকিং ও নানাবিধ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ফুলিয়ার তাঁত শিল্পের দ্রুত বিকাশঘটে। অল্প সময়ের মধ্যেই অসংখ্য মানুষের কর্মসংস্থানের পথ তৈরী করে বর্তমানে আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে ।

সূচক শব্দ : তাঁতশিল্প, মহাজন, উদ্বাস্তু, টাঙ্গাইল শাড়ী, আঞ্চলিক, মিল মালিক, ফড়েঁ, পাইকারী।

নদিয়া জেলার ফুলিয়া তাঁত শিল্পের উৎপত্তি ঘটে ১৯৪৭ খ্রিঃ দেশভাগের পর। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ফুলিয়া আত্মপ্রকাশ করে দেশের তাঁত শিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র হিসাবে। ১৯৪৭খ্রিঃ থেকে পূর্ব বাংলার অসংখ্য শরণার্থী ও উদ্‌বাস্তু মানুষেরা ভীত, সন্ত্রস্ত্র, কম্পিত হয়ে ভারতে চলে আসে। উক্ত সময়কালে বেশকিছু মানুষরা নদিয়া জেলার শান্তিপুর সংলগ্ন ফুলিয়ায় চলে আসে। প্রাথমিকভাবে এই সকল শরনার্থী ও উদ্বাস্তুরা আশ্রয় নেয় শহরের ফুটপাথ, বস্তি, রেলস্টেশন সংলগ্ন জায়গা ইত্যাদি । কেউ বা গ্রামের / শহরের মহাজন ব্যবসায়ী শ্রেনীর বাড়ি অথবা জায়গা কিনে নিজেরা বসবাস করতে থাকে। পাশাপাশি কেউকেউ আত্মীয়দের বাড়ী ও অনেকে সরাসরি সরকারি ক্যাম্পে আশ্রয় প্রার্থী ছিলেন। এছাড়াও ছিল কলোনির অধিবাসীরা, এরা সরকারি পতিত জমি দখল করে কলোনি প্রতিষ্ঠা করে নিজেদের পূর্ণবাসনের দায়িত্ব নিজেরাই গ্রহন করেন।[১] এই উদ্বাস্তু মানুষেরা বিগত দিনের সোনার বাংলার স্মৃতিতে শুধুমাত্র আবদ্ধ থাকেনি, এদের মধ্যে জাগরিত হয় অপরিসীম শিল্পীসত্তা এবং কর্মোদ্যম। এরাই নদীয়া জেলার কৃষির পাশাপাশি বিভিন্ন শিল্প বিশেষত তাঁতশিল্পে নিযুক্ত হয়ে জেলার আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির অন্যতম ধারক হয়ে ওঠে।[২]

প্রাথমিকভাবে ফুলিয়ার উদ্‌বাস্তু তাঁতিরা ওপার বাংলা থেকে এসে তাদের শিল্পীসত্তার মাধ্যমে তাঁতবস্ত্র বুনঁতে শুরু করে । প্রথমে ১৯৪০-৫০ এর দশকে টাঙ্গাইলের কিছু সংখ্যক তন্তুজীবী সম্ভবত (১৫ঘর) ফুলিয়ায় এসে বসবাস শুরু করে।

এই তাঁতীরা স্থানীয় মহাজনদের আর্থিক সহযোগিতায় তাঁতবস্ত্র উৎপাদন করে জীবিকা নির্বাহ করে। এদের সূত্র ধরেই দলে দলে পূর্ববাংলার উদ্‌বাস্তু তাঁতিরা ফুলিয়া আসতে শুরু করে। মহাজন ও বড়বড় ব্যবসায়ীরা তাদের আর্থিক, ভরন-পোষনের দায়িত্ব গ্রহন করে। এছাড়া রাজ্যসরকার তাদের একটি পূর্নবাসন কলোনি করে দিয়েছিলেন। সেখানে আশ্রয় পেয়েছিল ১২৫টি উদ্‌বাস্তু তাঁতি পরিবার।[৩]প্রসঙ্গত বলা যায় যে ফুলিয়ার উদ্বাস্তু তাঁতশিল্পীদের জীবিকা নির্বাহের জন্য মহাজনদের পাশাপাশি সরকারের তরফ থেকে তাঁতবস্ত্র ও সুতোর জোগানের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু অল্পসময়ের মধ্যেই প্রচুর উদ্বাস্তু তাঁতিরা ফুলিয়া এসে বসবাস করতে শুরু করলে, অচিরেই অসংখ্য কলোনি গড়ে ওঠে। সরকারের তরফ থেকে কলোনির বাসিন্দাদের তাঁত সরঞ্জাম কেনার জন্য ১২০০ টাকা করে দেওয়া হয়, যদিও তা ছিল অসংখ্য তাঁতিদের তুলনায় যৎসামান্য।[৪] তাই অধিকাংশ তাঁতি শ্রমিকরা মহাজনদের কাছ থেকে অগ্রিম টাকা নিয়ে তাঁতবস্ত্র উৎপাদনে মনোনিবেশ করে। অল্প সময়ে তাঁতের প্রসারের সাথে সাথে শরনার্থীদের পরিমান বাড়তে থাকে। এরা কলোনিতে স্থান না পেয়ে মহাজনদের বাড়িতে আশ্রয় নিতে থাকে। ক্রমশ বাড়িতে স্থান সংকুলান না হওয়ার দরুন মহাজনরা ফুলিয়ার আশে পাশে সস্তাদরের জমি কিনে তাঁতি শ্রমিকদের বসবাসের স্থান করে দেন। এভাবেই ফুলিয়া উপনগরীকে কেন্দ্র করে বুইচাঁপাড়া, মাঠপাড়া, বসাকপাড়া, চটকাতলা, বাহান্নবিঘা, তাঁতিপাড়া, তালতলা, ফুলিয়াপাড়া, নতুন বুঁইচা ইত্যাদি জায়গায় তাঁত শিল্প গড়ে ওঠে।[৫]

ফুলিয়ার উদ্বাস্তু তাঁতিরা নিজেদের তাঁত বোনা শিল্পীসত্তা এবং সরকারি ও বেসরকারি সহযোগিতায় টাঙ্গাইল শাড়ির উৎপাদন শুরু করে। ফুলিয়ার তাঁত শিল্পীদের প্রয়োজনীয় ১০০/৮০ নং সুতোর জন্য দক্ষিণ ভারতের উপর নির্ভর করতে হয় । দক্ষিণ ভারতীয় সুতোর বাজার থেকে সুতো আমদানি করা সাধারন তাঁতিদের পক্ষে সম্ভব ছিল না । ফলে তাদের বড় বড় ব্যবসায়ী ও মহাজনদের দারস্থ হতে হয় । [৬] যদিও রাজ্য সরকার তাঁতি শ্রমিকদের সুবিধার্থে ১৯৫৪ খ্রিঃ 'The West Bengal Co-operative Marketing Society Limited' যাপরবর্তীকালে 'The West Bengal State Handloom Weavers Society Limited' অর্থাৎ 'তন্তুজ' প্রতিষ্ঠা করে । মূলত হস্ত তাঁত শ্রমিকদের উৎপাদিত পন্যসামগ্রী বাজারে বিক্রি করা এবং তাঁতশিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ করাই ছিল এই সংস্থার প্রধান কাজ।[৭] তথাপি ফুলিয়ার তাঁতি শ্রমিকরা তন্তুজ থেকে খুব একটা সুবিধা নিতে পারেনি, কারণ ফুলিয়ার তাঁতি শ্রমিকদের বেশীর ভাগই ছিল বড় বড় ব্যবসায়ী ও মহাজনদের ঋণের জালে আবদ্ধ। ফলে মহাজনদের কাছ থেকেই তাঁতবস্ত্র উৎপাদনের যাবতীয় সমগ্রী যথা- সুতো, সিল্ক, জরি, মুগ, তসর, রঙ ইত্যাদি ক্রয় করতে হত। তাই যখন যেমন খুশি মহাজনরা তাঁতের উপকরনের দাম বাড়িয়েছে। যখন তখন তাঁতের আড়তবন্ধ, ইচ্ছামত শাড়ীর দাম বাড়ানো-কমানো, সুতা সরবরাহ বন্ধ ইত্যাদি ছিল মহাজনদের লাভের প্রধান

কৌশল। বাজারে সুতো নেই কেন, হঠাৎই দাম বাড়ালো কেন ওসব নিয়ে নিঃস্ব-রিক্ত তাঁতিরা মহাজনদের প্রশ্ন করতে সাহস পেত না। কারন মহাজনদের ইচ্ছামতো না চললে তাঁর রুজি-রোজগার বন্ধ হবার উপক্রম হত। ফলে তাঁতি শ্রমিকদের আর্থিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হত, অপরদিকে ফুলিয়ার অর্থনৈতিক ক্ষেত্র বা মহাজনদের চরম সমৃদ্ধির ক্ষেত্র উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়।[৮]

তাঁতশিল্পের উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য কাচাঁমালের সুষ্টু যোগান একান্ত আবশ্যক। ফুলিয়ার তাঁতশিল্পের জন্মলগ্ন থেকেই তাঁতশিল্পের কাঁচামালের জোগান অনুকূল ছিল না। কারণ ফুলিয়ার কাঁচামালের জোগানদারদের অধিকাংশই ছিল বেসরকারি সংস্থা বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে নিয়োজিত। ফলে ইচ্ছামত কৃত্রিম ভাবে বাজারে অভাব সৃষ্টি করা, দামবাড়ানো, ফাটকা বাজি ইত্যাদি তারা প্রায়শই করে থাকত।এর ফলে সাময়িকভাবে তাঁতশিল্পের ব্যহত হয়।তাঁত থেকে তাঁতিদের নূন্যতম উপার্জন করতে নাভিশ্বাস ওঠে, অথচ বাস্তবে বেসরকারি সংস্থাও মহাজনেরা অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভাবে আরো সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে।[৯]

এ রকম অরাজক পরিস্থিতিতে অনেক ঝড়-ঝঞ্জা অতিক্রম করে নিজস্ব পরিকল্পনা, পরিশ্রম ও শিল্পনৈপুন্যে ফুলিয়ার তাঁতিরা সক্ষম হয়ে পশ্চিম বাংলার তাঁত শিল্পে নিজেদের স্থান উজ্জ্বল করেনিতে।সক্ষম হয় টাঙ্গাইল শাড়ীর নাম ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরতে।[১০]আজ টাঙ্গাইল শাড়ীর বাংলা তথা ভারতব্যাপী যে সুনাম তা শুধুমাত্র ফুলিয়ার তাঁতি শ্রমিকদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল। বংশগত ঐতিহ্য ও কারিগরী শিল্পী সত্তাকে বিকশিত করে তারা আজ দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষন করতে সক্ষম হয়েছে। টাঙ্গাইল শাড়ীকে কেন্দ্র করে তাঁতি শ্রমিকরা তাদের আর্থ-সামাজিক পথের দিশা পেয়েছে। টাঙ্গাইল শাড়ীর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির প্রধান কারণ ছিল এর কিছু নিজস্ব ঘরোয়া বৈশিষ্ট্য।কারণ হিসাবে বলা যায় যে প্রথম পর্যায়ে সুতো পালিশ করা, সুতোকে মাঝন দেওয়া, কাপড়ের পালিশ, সুতোর নলি পকোনো, সানা বাঁধা প্রভৃতি করেছে তাদের ঘরের মহিলারা।[১১]

ফুলিয়ার তাঁতশিল্পের একটা অংশ উৎপাদন ব্যক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তার স্ত্রী, কন্যা, মাতা সর্বপরি বাড়ীর কিশোর-কিশোরীরা। ফলে এই সম্প্রদায়ের লোকেরা একটি মাত্র পেশাতেই ঘরের কোণে আটকে রেখেছে নিজেদের। উক্ত সময়কালে বহিঃ বিশ্বের সঙ্গে এদের যোগাযোগের সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি।তাঁতির ঘরের ছেলে-মেয়েরা লেখা-পড়ায় এগোতে না পারার কারনে অশিক্ষা-কুসংস্কারের আবদ্ধে নিয়োজিত থেকে গেছে। ভারতের এই প্রগতিরযুগে ও তাঁতের ঘরের সন্তানদের লেখা-পড়ার শেখার আগ্রহ ব্যক্তিগত বা সরকারি উদ্যোগে নেওয়া হয়নি।তাঁতির ঘরের ছেলে মেয়েদের খুব ছোটবেলা থেকেই লেখা-পড়ার হাতে খড়ির পরিবর্তে তাঁতের কাজে হাতে খড়ি হয় এবং নিজেদের অজান্তে কাজের মধ্যে মিশে যায়।তাঁদের এই অবস্থা পরিবর্তনের কোন পদক্ষেপ মহাজনদের উদ্যোগে গ্রহন করা হয়নি। [১২]অথচ সরকারের পক্ষ থেকে ১৪

বছরের নিচে কিশোর-কিশোরীদের কারখানার কাজে নিষিদ্ধ আইন জারি হলেও কোথাও তার সঠিক পরিকল্পনার অভাবে প্রয়োগ করা হয় না।সুতরাং ফুলিয়ার দরিদ্র তাঁতির ঘরের ছেলে-মেয়েরা লেখা-পড়া না শেখার দরুন ক্রমশ অন্ধকারের দিকে অগ্রসর হয়েছে।[১৩]

প্রসঙ্গত বলা যায় ফুলিয়ার বেশীরভাগ তাঁতশিল্প মহাজনী প্রথায় গড়ে ওঠার ফলে, মহাজনদের মূল উদ্দেশ্য হয় তাঁতিদের অধিক পরিশ্রমের মাধ্যমে বেশী বেশী মুনাফা অর্জিত করা। তাঁতশিল্পে সরকারি রক্ষাকবচ থাকলেও তার প্রয়োগ না হওয়ায় মহাজনদের এই মনোভাব উত্তরোত্তর ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি বলা যায় যে, তাঁত বস্ত্রের উৎপাদন, সরবরাহ ও বাজার নিয়ন্ত্রন পুরোটাই ছিল মহাজন, বড়বড় ব্যবসায়ী, সুদের কারবারি, মিল মালিক ও তাঁর এজেন্টদের হাতে।[১৪] এই ধাঁচ বজায় রাখার প্রধান পৃষ্টপোষক ছিল কতিপয় সরকারি কর্মচারী ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মানুষেরা। দেশের তাবড় বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, সরকারি কর্মকর্তা, রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি, বড়বড় শিল্প কারখানার শ্রমিক সংগঠনের লিডাররা মুখে সমঅধিকারের কথা, আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার কথা বললেও মূলত এরাই ছিল পুঁজিবাদের প্রধান পৃষ্টপোষক ও মিলজাতদ্রব্যের প্রধানক্রেতা । কেউ-ই-বলতে সাহসী নন যে বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে মিলকে আর উৎসাহ দেওয়া হবে না, গ্রামে গ্রামে হস্তচালিত তাঁত ছড়িয়ে দেওয়া হবে। সমস্ত রকম বস্ত্রের চাহিদা মেটাবে তাঁতযন্ত্র। গ্রামের ঘরে ঘরে চাষের সঙ্গে চলবে তাঁতযন্ত্রগুলি।বস্ত্রে সাবলম্বী বিভিন্ন / অঞ্চল গড়ে তোলা হবে। অথচ বাস্তবে আমরা ঠিক উলটো চিত্রই দেখি। তাঁতবস্ত্র শিল্পের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা থাকা স্বত্তেও সরকারের যৎসামান্য দয়া – দাক্ষিন্য ছাড়া সঠিক পরিকল্পনা রূপায়নের কোন পদক্ষেপ দেখা যায় না।যা অল্প কিছু লক্ষ্য করা যায় তা মহাজনী উদ্যোগও বিভিন্ন ব্যাংকের সাময়িক বদান্যতা ।

ফুলিয়ার পুরুষের পাশাপাশি বেশ কিছু মহিলা তাঁতি শ্রমিকরাও তাঁত শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এরা সাধারনত শাড়ীর সুতোয় মাড় দেওয়া, সুতোর পালিশ করা, সুতোর নলি পাকানো, শাড়ি ভাজ করা ইত্যাদি কাজ করত। অনেক ক্ষেত্রে মহিলারা মহাজনদের কাছে থেকে শাড়ী তৈরীর প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহ করে শাড়ি উৎপাদন করতেন। যদিও এদের তৈরি শাড়ির মান অত্যন্ত নিম্নমানের ছিল। কারন দামী শাড়ী তৈরী করার যে দক্ষতার প্রয়োজন ছিল তা সাধারন মহিলা শ্রমিকদের না থাকায় তারা কোয়ালিটিপূর্ণ শাড়ী তৈরী করতে পারতোনা। সাধারনত এই মহিলা শ্রমিকরা ছিল স্থানীয় এবং আশ-পাশের গ্রামের। এরা সাপ্তাহিক, মাসিক বা দিন হিসাবে মজুরি নিতেন। আবার অনেক সময় মহাজনদের কাছ থেকে নগদও নিতেন। এদের বেশীরভাগই ছিলেন নিরক্ষর। মহিলা শ্রমিকদের সাথে আসতেন তাদের সন্তান-সন্ততিরাও, খাবারের বিনিময়ে মহাজনরা এদের দিয়ে কাজ করে নিতেন। এইভাবে

মহাজনেরা যেন-তেন প্রকারে তাদের মুনাফা ক্রমশ বৃদ্ধি করে চলেন, অন্যদিকে দরিদ্র তাঁতি শ্রমিকদের জীবনের বেঁচে থাকার দিনগুলি ক্রমশ দুর্বিসহ হতে থাকে।[১৫]

ফুলিয়ার তাঁতশিল্পীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা কখনো একই ধারায় প্রবাহিত হয়নি। ১৯৭০ এর দশকে তাঁতশিল্পের এক সংকট নেমে আসে। সুতোর জোগান তথা তাঁতশিল্পের উপকরণের দাম অত্যাধিক বেড়ে যায়। মজুরির অংক অনেকটাই নেমে যায়। মহাজনী শোষন ক্রমশ বাড়তে থাকে। এই পরিস্থিতিতে তাঁতিরা সংগঠিত হতে থাকে। তাদের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসে শ্রী প্রভাত বসাক ও বেনীমাধব দে প্রমুখরা। চলেছিল মিটিং, মিছিল, সরকারি অফিস ঘেরাও, এমনকি অভিযান চলে রাজভবন পর্যন্ত। ফুলিয়ার তাঁতি শ্রমিকদের সংকটকালে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, ব্যাংক, শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষেরা তাদের সহায়তা করে। তাঁতশিল্পীদের সহায়তায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার এগিয়ে আসে। তাঁতশিল্পীদের সহায়তার জন্য ১৯৭৩ খ্রিঃ তন্তুজীবীদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান 'ফুলিয়া টাঙ্গাইল শাড়ি বয়ন শিল্প সমবায় সমিতি'- গড়ে ওঠে। প্রথমে মাত্র ৪০ জন সদস্য নিয়ে সমিতি গঠিত হলেও একবছরের মধ্যে সদস্য সংখ্যা বাড়ায় ১৯৭৪ খ্রিঃ গঠিত হয় ২নং সমিতি 'টাঙ্গাইল তন্তুজীবি উন্নয়ন সমিতি'। সদস্য সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকায় ১৯৭৭ খ্রিঃ তৈরী হয় ৩নং ফুলিয়া সমবায় সমিতি। ১৯৭৭ খ্রিঃ সমবায় তিনটি রাজ্যে সরকারের অনুমোদন লাভ করে।[১৬] শুরু হয় ফুলিয়ার তাঁতি শ্রমিকদের উন্নয়নের অগ্রগতি, যার ধারাবাহিকতা বর্তমানেও বজায় রয়েছে। ফুলিয়ার তাঁতশিল্পের সংকটকাল ১৯৭৭ সাল নাগাদ কিছুটা কেটে যায়। এই সংকটকালে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে পালাবদল ঘটে। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসেই কৃষির সাথে সাথে ক্ষুদ্র শিল্পের মানোন্বয়ে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহন করেন। তাঁতশিল্পীরা নতুন করে বাঁচার রসদ খুঁজে পান। হতদরিদ্র তাঁতি শ্রমিকরা মহাজনের ভীতি কাটিয়ে সমবায়ে যোগদান করতে থাকেন। তাদের তাঁতবস্ত্রের যাবতীয় উপকরন ও তাঁতবস্ত্র বিক্রির দায়িত্ব সমবায় সমিতিগুলি গ্রহন করে। এই পর্যায়ে ফুলিয়ার দরিদ্র তাঁতি শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রের ক্রমশ বিকশিত হতে থাকে। সমবায়ে মহাজনী শোষণ না থাকায় তাঁতি শ্রমিকরাও তাদের শিল্পীসত্তার পূর্ণজাগরনের অবিরাম প্রয়াস গ্রহন করেন। তবে সরকারি সহায়তা এবং সমবায় সমিতি থাকা স্বত্তেও ১৯৮০ খ্রিঃ নাগাদ ফুলিয়ার মোট তাঁতি শ্রমিকদের মাত্র ১০-১২ শতাংশ ছিল সমবায় সমিতির অন্তর্ভুক্ত।[১৭]

সমবায়ের বাইরে বিরাট সংখ্যক তাঁতিরা রয়ে যায়, যাদের নিজেদের তাঁত বস্ত্র কেনার কোন সামর্থ্য ছিলনা। এরা মহাজনের বাড়িতে অথবা নিজ বাড়িতে তাঁতবস্ত্র বসিয়ে তাঁতবস্ত্র উৎপাদন করেছেন মহাজনদের আর্থিক সহযোগিতায়। তাঁতি শ্রমিকদের সাধারনত শাড়ি প্রতি বা ঘন্টা অনুযায়ী মজুরি প্রদান করা হত। এক্ষেত্রে মহাজনরা যেমন সময় চুরি করে তাদের বেশি খাটিয়ে নিত, তেমন অপরদিকে শাড়ি প্রতি মহাজনেরা শাড়ির ফিনিশিং ভালো না হওয়ার দরুন তাদের প্রাপ্য মজুরি থেকে বঞ্চিত

করত।[১৮] অনেক সময় দরিদ্র তাঁতিরা সংসার চালানোর জন্য মহাজনদের কাছ থেকে অগ্রিম টাকা ধার নিতেন। এর পরিনামটা হত খুবই মারাত্মক। বেশিরভাগ দরিদ্র তাঁতি শ্রমিকরা নিরক্ষর থাকার দরুন টাকা পয়সা নয়-ছয়ের সাথে সাথে মহাজনদের রক্তপিপাসু জালে আটকে পড়েন। টাকাটা দরিদ্র তাঁতির পক্ষে পরিশোধ না করার দরুন মহাজনরা কিস্তির টাকা নিয়ে নানাভাবে দরিদ্র তাঁতিদের ঠকাত। ফলে দরিদ্র তাঁতিরা মহাজনদের কাছে প্রভু-ভৃত্যের ন্যায় পদ্ধতিতে ফেঁসে পড়েন। যার অধীনতা থেকে মুক্ত হওয়া নিঃস্ব, রিক্ত তাঁতিদের পক্ষে খুবই দুস্কর হয়ে পড়ত।[১৯]

ফুলিয়ার আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় কেন্দ্রীভূত ধনসম্পদ মুস্টিমেয় কিছু মানুষের একচেটিয়া অধিকার প্রাপ্ত ছিল। এই মুস্টিমেয় ধনসম্পদ গড়ে উঠেছে বহু সংখ্যক দরিদ্র নিরক্ষর তাঁতি শ্রমিকদের শ্রমের বিনিময়ে। দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত অভ্যাসে এই শ্রম যেন স্বাভাবিক ব্যবস্থা হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। যেমন স্বাভাবিকভাবে মেনে হয় ধনির ধনসম্পদ লাভ বা সম্পদ বৃদ্ধি। এই গভীর সমস্যা শুধুমাত্র আলোচনা সমালোচনা বা ব্যঙ্গ দ্বারা সমাধান করা যাবে না। যাদের শ্রমের বিনিময়ে সকলের প্রাপ্ত সম্পদ কেন্দ্রীভূত হচ্ছে, স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তির কাছে, তাদেরই ভাবতে হবে তাঁরা নিজেদের শ্রম দিয়ে অন্যের অর্থভান্ডার সমৃদ্ধ করে তুলবে কিনা? পাশাপাশি একথা বলা যায় যদি সমবায় সমিতি, দেশের সরকার তাঁত শিল্পের প্রতি সুষ্টু পরিকল্পনা ও সঠিক নজরদারি প্রদান করত তাহলে অন্তত তাঁত শিল্পে শ্রমিকদের শোষনের মাত্রা অনেকটা কমে যেত একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।[২০]

এপ্রসঙ্গে বলা যায় যে, প্রতিটি মানুষের আত্মসম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকার প্রথম শর্ত হল তার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন। প্রাচীনকাল থেকেই ভারতের এই আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপট আলোচনা করলে দেখা যায় যে এখানকার জনসাধারনও প্রধানত দুইভাগে বিভক্ত। প্রথমটা হল শাসক শ্রেনি যারা আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। অপর শ্রেনি হল শোষিত শ্রেনি যারা সমস্ত রকম সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকে। তাই বলা যায় ভারতের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা অসাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, একথা আজ সর্বজনস্বীকৃত । তা না হলে আজও কেন স্বাধীনতার ৭০ বছর পরেও ভারতের ৩০ শতাংশ মানুষ দরিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে। প্রায় ৩৫কোটি লোক এক বেলা আধ পেট খেয়ে দিন কাটান। প্রায় ৩০ শতাংশ মানুষ তার নূন্যতম শিক্ষা থেকে বঞ্চিত, ৬০ শতাংশ মানুষ তার স্বাস্থ্য, পানীয় জল, নূন্যতম কর্মসংস্থান থেকে বঞ্চিত। নদিয়া জেলার ফুলিয়া অঞ্চলটাও এর আওতা থেকে মুক্ত নয়। তাই একথা বলা যায় ফুলিয়ার সমাজ ব্যবস্থাও দাঁড়িয়ে আছে মূলত সামাজিক অসাম্যের ওপর। শাষন-শোষণকে সুসংরক্ষিত ও একচেটিয়া করতে নিত্য-নতুন ভাবনার আশ্রয় নেয় ব্যবসায়ী ও মহাজনরা। ফুলিয়ার সমাজ ব্যবস্থাও মহাজনী জাঁতাকলে পড়ে নিস্প্রান হয়ে আছে।[২১] যা আগামী দিনে আরো গভীর

সংকটের ইঙ্গিত বহন করে চলেছে। তাই রাষ্ট্রের উচিত ফুলিয়ার এই সামাজিক অসাম্য দূর করে সমাজের উচু-নিচু-ধনী-দরিদ্র সম্বন্বয়ে সুস্থ সমাজ গঠন করা।

তবে ফুলিয়ার মহাজনদের নানাবিধ দোষ-ক্রটি থাকা স্বত্ত্বেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তাঁতি শ্রমিকদের সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার জন্য তাদের অবদানকে অস্বীকার করা যায়না। যদিও এক্ষেত্রে শোষণের মাত্রা ছিল বেশী, তথাপি এটা ছিল মহাজনদের ব্যবসা-বাণিজ্যের লাভের একটা দিক। তবে ১৯৭০ এর দশক থেকে পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে মহাজনী শোষনের মাত্রা কমতে থাকে। উক্ত সময়কালে বামফ্রন্ট সরকারের সহায়তায় নদিয়া জেলার তাঁতশিল্পকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সমবায় সমিতি, সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংক প্রভৃতি এগিয়ে আসে। সরকারি সুষ্টু পরিকল্পনা তাঁত শিল্পকে পুনরায় আবার জাগরিত করে এবং মহাজনী শোষন ক্রমশঃ ছিন্ন হতে থাকে।[২২] আজও ফুলিয়ায় মহাজনী শোষণ আছে, তবে তার সীমা নির্ধারন আছে। কেননা তাঁতি শ্রমিকরা সমবায়ের অধীনে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দরুন অনেকটাই সচেতন হয়েছে। বাজারে তাঁত পণ্যের সামগ্রীর ওঠা-নামার দিকে তারা নজর রেখেছে। নিজেদের পণ্য সামগ্রী নিজেরাই বিক্রি করার সুযোগ পাচ্ছেন, তবে এইসব তাঁতি শ্রমিকরা ছিল ফুলিয়ার অসংখ্য তাঁতি শ্রমিকদের মধ্যে গুটি কয়েক মাত্র।[২৩] তাই আজও ফুলিয়ার তাঁত শিল্পে মহাজনী শোষণ পুরোপুরি বন্ধ করা যায়নি। মালিক পক্ষের শোষণ বন্ধ করা পুরোপুরি সম্ভবও নয়। তাই তো বলা হয় মালিক, শ্রমিক, পুজি-শ্রম-শোষণ এগুলি পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক, এর একটিকে ব্যতি রেখে অন্যটি সম্ভব নয়।

পরিশেষে বলা যায় যে মালিক-শ্রমিক-পুঁজি-শ্রম-শোষন এগুলি পরস্পর পরস্পরের সর্ম্পূরক। এগুলি ব্যতিরেখে কোন শিল্পপতি শিল্প স্থাপনে আগ্রহী হবেননা। শিল্প কারখানাগুলিতে কোথাও শোষণের মাত্রা বেশী, আবার কোথাও কম। সুতরাং মানুষ থাকলে, সমাজ থাকবে, সমাজের সুষ্ঠ বিকাশকে ধরে রাখার জন্য খাদ্যের সাথে বস্ত্রের উৎপাদনও অপরিহার্য। যদিও ফুলিয়ার ক্ষেত্রে (১৯৪৭-৭৭খ্রিঃ) উক্ত সময়ের প্রথম দশকে মহাজনরা পুঁজির সাথে অনেকটা মানবিকও ছিলেন, কেননা মহাজনেরাই খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁতি শ্রমিকদের বেঁচে থাকার অবলম্বন তাঁত যন্ত্র ক্রয় করে দিয়েছিলেন। তবে পরের দিকে উদ্যোগপতিরা প্রচুর মুনাফার আশায় তাদের যথেষ্ট পরিমান শোষণ করেছেন একথা যেমন সত্য, আবার এই মহাজন বা উদ্যোগপতিদের উদ্যোগে ফুলিয়ার তাঁত শিল্পের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি যথেষ্ট উন্নত হয় একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

তথ্যসূত্রঃ

১। হরিপদ বসাক, ফুলিয়া তন্তুবায় আন্দোলনের ইতিকথা, অপ্রকাশিত, পৃ.৪-৭ এবং Dipesh Chakraborti, Remembered village Representation of

Hindu Bengali Memories in the aftermath of the partition. Economic and Political Weekly, Vol.31, No.32, 1993. PP-21-45

২। সুতপা দাসগুপ্তা, 'স্বাধীনতার পরবর্তী পশ্চিমবাংলার উদ্বাস্তু সমস্যা' ইতিহাস অনুসন্ধান-১৯, কলকাতা, জানুয়ারী ২০০৫, পৃ.৩৩১-৩৭১

৩। হিরন্ময় বন্দোপাধ্যায়, উদ্‌বাস্তু সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭০, পৃ.৭২-৭৩

৪। A brief note on the Handloom industries of Shantipur Zone. Under the office of the Handloom development office. (কর্মচারীদের দেওয়া বিবরন) এবং
অমূল্য বসাক (তাঁতি ও ব্যবসায়ী), সাক্ষাৎকার, ২২.০৪.২০২১.

৫। হরিপদ বসাক, তদেব, পৃষ্ঠা -৬

৬। জয়ন্ত দালাল, টানাপোড়েন পত্রিকা, ৭ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৯৪, পৃ.১৯-২২

৭। এই তথ্যটি নেওয়া হয়েছেঃ A brief note on the Handloom industries of Shantipur Zone. Under the office of the Handloom development office, Shantipur, Dist – Nadia – 2008 এবং নদীয়া জেলা তাঁত ও বস্ত্রশিল্প আধিকারিক দেওয়া বিবরন ২০১৩, পশ্চিমবঙ্গ।

৮। স্মৃতিকুমার সরকার, 'তাঁতশিল্পের নাভিশ্বাস', আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৬ই মে, ২০০৯। পৃ.4 এবং নদিয়ার অর্থনীতি, ফ্লাশ পত্রিকা, ১৩৮৯, ১৯৭৪, পৃ. ৩০-৩৫

৯। সুজিত বিশ্বাস, নদিয়া জেলার তাঁত শিল্পের উদ্ভব ও বিস্তৃতি, অরুনা প্রকাশন, কলকাতা ২০১৪, পৃ.১৩-১৫

১০। জয়ন্ত দালাল, 'নদিয়া জেলার হস্ত তাঁতশিল্প'- কৃষিসাহিত্য, ১৭বর্ষ, শারদীয়া সংখ্যা, কার্তিক ১৪০৮, ২০০১ এবং মনোহর বসাক, তাঁতি শ্রমিক, ফুলিয়া, সাক্ষাৎকার, ২০.০৯.২০১০

১১। শ্রী মানস দেবনাথ, বুঁইচাপাড়া, ফুলিয়া, নদিয়া, তাঁতশিল্পী, সাক্ষাৎকার, ০৮.১২.২০০৮

১২। হরিপদ বসাক, নদিয়ার তাঁতশিল্প – ফুলিয়ার টাঙ্গাইল শাড়ি, সাহিত্য সৈকত, শারদীয়া পত্রিকা, ১৯৯১, পৃ.৬১-৬৪

১৩। হরিপদ বসাক, তদেব ।

১৪। জয়ন্ত দালাল, নদিয়া জেলার হস্তচালিত তাঁতশিল্প, কৃষি সাহিত্য, ২৭ বর্ষ, পৃ.১৮-২৪

১৫। Nirmala Banerjee, Indian Woman in the changing industrial Seneria, Ed. By Nirmala Banerjee, New Delhi, Page-199 এবং এই

তথ্যটি নেওয়া হয়েছে Handloom Development office, Shantipur, Dist – Nadia – 2008

১৬। মাধব ভট্টাচার্য, ফুলের ভিটেয় শাড়ীর মেলা, টানাপোড়েন পত্রিকা, ৪ম বর্ষ, ১৩৯৫, পৃ.১১

১৭। ফুলিয়া সমবায় সমিতি (তিনটি) কর্তৃক দেওয়া বিবরন।

১৮। নদিয়া জেলা তাঁত ও বস্ত্র শিল্প আধিকারিক, কৃষ্ণনগর দেওয়া বিবরন।

১৯। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন, টানাপোড়েন পত্রিকা, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৯৯৩

২০। ফুলিয়ার উদ্‌বাস্তু সমস্যা ও লালফিতার বাঁধন, প্রতিবাদী চেতনা, ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯

২১। সমরেশ বসাক, টাঙ্গাইল শাড়ির অতীত,বর্তমান,ভবিষ্যৎ,টানাপোড়েন পত্রিকা ১৩৮৮, পৃ.১০–১৫

২২। হরিপদ বসাক, ফুলিয়া তন্তুবায় সমবায় আন্দোলনের ইতিকথা, বাংলার রচডেল, ফুলিয়া, ২০০৭, পৃ. ৩-১২

২৩। তদেব ।

নজরুলের 'হাওয়া বদল' ও 'স্বাস্থ্য উদ্ধার': প্রসঙ্গ দেওঘর ও মধুপুর ভ্রমণ

সুমন মুখার্জী
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
টুরকু হাঁসদা লপসা হেমরম মহাবিদ্যালয়
মল্লারপুর, বীরভূম

সংক্ষিপ্তসার:
কাজী নজরুল ইসলাম ১৯২০-২১ সালে দেওঘরে এবং ১৯৪২ সালে মধুপুরে স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য গিয়েছিলেন। এই প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয় হল- নজরুল কেন স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য দেওঘর ও মধুপুরকে বেছে নিয়েছিলেন? নজরুলের দেওঘর ও মধুপুর ভ্রমণের পশ্চাতে 'স্বাস্থ্যোদ্ধার' একমাত্র কারণ ছিল?-নাকি এর পশ্চাতে ছিল কোন গভীর চক্রান্ত? নজরুলের ভ্রমণ মানসিকতায় কীভাবে 'হাওয়া বদলের' ধারণাটি এসেছিল? 'হাওয়া বদল' নজরুলের জীবন ও স্বাস্থ্যে কী কী পরিবর্তন এনেছিল? দেওঘর ও মধুপুরে অবস্থানকালে নজরুল তাঁর সাহিত্যকর্ম কীভাবে চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন?-এই সকল প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের প্রয়াস জারি থাকবে এই প্রবন্ধে।
সূচক শব্দ: কাজী নজরুল ইসলাম; দেওঘর; মধুপুর; স্বাস্থ্যোদ্ধার; হাওয়া বদল; ভ্রমণ
শুধু দেশ দেখা বা তীর্থে গিয়ে ভগবানের দর্শন নয়, নিতান্ত শারীরিক কারণেই বাঙালির মনে ভ্রমণ চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল। রেলপথের বিস্তার ঔপনিবেশিক আমলে বাঙালির ভ্রমণ মানসিকতায় বদল ঘটিয়ে দেয়। অসুস্থ শরীরকে সারানোর জন্য জলহাওয়া ভালো এমন জায়গায় গিয়ে মাসখানেক কাটিয়ে আসা, 'চেঞ্জে যাওয়া'- এই ধারণার জন্ম দেয়। 'হাওয়া বদল' করাটাই তখন ঔপনিবেশিকতার স্বাস্থ্যবিধি হয়ে ওঠে। ঔপনিবেশিক আমলে বাংলার পশ্চিম প্রান্তের সাঁওতাল পরগনা ও ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলের ছোট ছোট জনপদগুলি ছিল বাঙালির হাওয়া বদলের সেরা ঠিকানা। বাংলা প্রদেশের পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত জনপদগুলির জল ও মনোরম জলবায়ু ছিল স্বাস্থ্যকর। এর সাথে বাড়তি পাওনা ছিল প্রকৃতির অমোঘ আকর্ষণ। বিশেষ করে গ্রীষ্মের ছুটির সময় ও পূজাবকাশে কলকাতার উচ্চবিত্ত বিখ্যাত বাঙালিরা সপরিবারে ছুটে যেতেন 'পশ্চিমে' লম্বা অবকাশ যাপনে। এই বিষয়টি 'হাওয়া বদল' নামে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এই 'হাওয়া বদল' বা 'চেঞ্জ' হয়ে ওঠে বাঙালির ভগ্ন স্বাস্থ্য উদ্ধারের একটি পন্থা। রেলপথের বিস্তার বাঙালির ভ্রমণ ও অবসরের মানসিকতায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ অদল বদল ঘটিয়েছিল। ভ্রমণের মজা অর্থাৎ বেড়ানোর আনন্দ উপভোগ করতে শিখল বাঙালি। এর সাথে যুক্ত হল 'হাওয়া বদল' বা 'চেঞ্জ' এবং 'স্বাস্থ্যোদ্ধার'-এই দুটি বিষয়। কাজী

নজরুল ইসলাম ১৯২০-২১ সালে দেওঘরে এবং ১৯৪২ সালে মধুপুরে স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য গিয়েছিলেন। এই প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয় হল- নজরুল কেন স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য দেওঘর ও মধুপুরকে বেছে নিয়েছিলেন? নজরুলের দেওঘর ও মধুপুর ভ্রমণের পশ্চাতে স্বাস্থ্যোদ্ধার একমাত্র কারণ ছিল?-নাকি এর পশ্চাতে ছিল কোন গভীর চক্রান্ত? নজরুলের ভ্রমণ মানসিকতায় কীভাবে 'হাওয়া বদলের' ধারণাটি এসেছিল? 'হাওয়া বদল' নজরুলের জীবন ও স্বাস্থ্যে কী কী পরিবর্তন এনেছিল? দেওঘর ও মধুপুরে অবস্থানকালে নজরুল তাঁর সাহিত্যকর্ম কীভাবে চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন?-এই সকল প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের প্রয়াস জারি থাকবে এই প্রবন্ধে।

বাঙালির জনপ্রিয় পর্যটন গন্তব্য 'পশ্চিম' এবং 'পশ্চিমে' স্বাস্থ্যোদ্ধার

সাঁওতাল পরগনার দেওঘর, মধুপুর, গিরিডি ও শিমুলতলা এবং ছোটনাগপুর অঞ্চলের হাজারিবাগ, রাঁচি, ঘাটশিলা ইত্যাদি অঞ্চলে বাঙালিরা স্বাস্থ্যোদ্ধার করতে যেতেন। সাঁওতাল পরগনার জলহাওয়া কতখানি স্বাস্থ্যকর ছিল তা প্রথম আবিষ্কার করেন বিজয়নারায়ণ কুণ্ডু নামের এক বাঙালি ভদ্রলোক। তিনি এসেছিলেন মধুপুর-গিরিডি রেলপথ পাতার ঠিকাদারি নিয়ে ১৮৭১ সালে। তিনি মধুপুরের অসাধারণ স্বাস্থ্যগুণ প্রচার করেছিলেন। তারপর থেকেই শুরু হয় বাঙালি চেঞ্জারবাবুদের 'পশ্চিমে' আসা। মনোরম আবহাওয়া, পাহাড়-টিলা, শাল-মহুয়ার অরণ্যের টানে এবং শরীর সারাতে পশ্চিমের অখ্যাত জনপদগুলিতে বাঙালিরা ভিড় জমাতে শুরু করে। সেখানে তারা নিজেদের শখের 'স্বাস্থ্যনিবাস' বা 'স্যানাটোরিয়াম' গড়ে তোলে। এখন প্রশ্ন হল কেন বাঙালি 'পশ্চিম' কে বেছে নিল তার স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য? উত্তরটি খুব সোজা। সাঁওতাল পরগনা ও ছোটনাগপুর অঞ্চলের স্থানগুলি ছিল শুকনো। এখানে ছিল অনেক রোদ, আলো আর বাতাস। তখনকার জনস্বাস্থ্যের ধারণাটাই ছিল এমন। বাংলার সমতল অঞ্চলের আবহাওয়া তখন ছিল স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুপযোগী। গ্রামেগঞ্জে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বাঙালিকে করল ভিটে ছাড়া। আবার অন্যদিকে শহরের আবহাওয়া ধরাল পেটের অসুখ। এই দুই ব্যাধির আক্রমণ থেকে মুক্তি পেতে বাঙালিরা বেছে নিল 'পশ্চিম'-কে। এই অঞ্চলের জল ছিল সুস্বাস্থ্য ও হজমের সহায়ক। ঐ জল পেটের রোগের পক্ষে পরম উপযোগী ছিল। ঐ অঞ্চলের হাওয়া ছিল শীতল ও স্বাস্থ্যকর। মূলত ম্যালেরিয়া, প্লেগ, কলেরা, বেরিবেরি ও চিরন্তন পেটের রোগ থেকে মুক্তি লাভের আশায় বাঙালি পশ্চিমের প্রকৃতিকে সাদরে গ্রহণ করেছিল। বেরিবেরির একমাত্র চিকিৎসা ছিল শুকনো স্থানে থাকা। ম্যালেরিয়া থেকে বাঁচতে হলে আদ্রতা বিহীন মাটিতে বাস করতে হত। ঘিঞ্জি গলি, নালা-নর্দমা পশ্চিমের জনপদগুলিতে ছিল না। তাই কলেরা ও প্লেগের সংক্রমণের কোন আশঙ্কাও ছিল না। তাই অসুস্থ বাঙালি ভেবেছিল মধুপুর, দেওঘর, গিরিডির জলহাওয়ায় সে তার ভগ্নস্বাস্থ্য ফিরে পাবে। তাই রাজনারায়ণ বসু, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বিবেকানন্দ, জগদীশ চন্দ্র বসু, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিখ্যাত চেঞ্জার বাবুরা সকলেই শরীর মেরামতের জন্য এই সকল অঞ্চলে ভ্রমণ

করেছিলেন। কাজী নজরুল ইসলাম ও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। মধুপুর ও দেওঘর হয়ে উঠল বাঙালির সাধের 'স্বাস্থ্যনিবাস'।

দেওঘরে নজরুল (১৯২০-২১)

সাঁওতাল পরগনার অন্তর্গত দেওঘর ছিল বাঙালির জনপ্রিয় স্বাস্থ্যনিবাস। হাওয়া পরিবর্তনের জন্য স্বাস্থ্যরক্ষা ও পুনঃপ্রাপ্তির জন্য কলকাতা থেকে বহু বাঙালি উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মানুষ দেওঘরে এসে বছরের কয়েক মাস অতিবাহিত করতেন। দুর্গা পূজার সময় থেকে এপ্রিল-মে মাস পর্যন্ত শহরটি বাঙালি বাবু ও তাদের পরিবারের দ্বারা পরিপূর্ণ থাকত। এদের বসবাসের জন্য অনেক ভাড়া বাড়িও ছিল। দেওঘরের স্থানীয় লোকেরা ঐ সকল অস্থায়ী স্বাস্থ্য অন্বেষণকারীদেরকে 'হাওয়াখোর বাবু' বলে ডাকত। আর বাঙালি বাবুরা বলতেন 'চেঞ্জার বাবু'। এদের অধিকাংশই অবস্থাসম্পন্ন মানুষ। L. S. S. O'Malley লিখেছেনঃ

> The place has a reputation as a Sanatorium among the Indian Community, and the numerous house springing up on its out skirts testify to its popularity among those who can afford to maintain country house.[১]

দেওঘরে যে কয়েকজন বাঙালি হাওয়া বদলের জন্য গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রাজনারায়ণ বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। এছাড়া বায়ু পরিবর্তনকারীদের দলে ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। দেওঘরে নজরুল হাওয়া বদল করতে গিয়েছিলেন কিনা তা নিয়ে গবেষকদের মধ্যে বিতর্ক আছে। কেউ কেউ বলেন কবি তাঁর ভগ্ন স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য দেওঘর গিয়েছিলেন। কিন্তু অন্য এক দল নজরুল গবেষক মনে করেন, নজরুলকে দেওঘরে পাঠানো হয়েছিল প্রকাশক আর পত্রিকা সম্পাদকদের দুরভিসন্ধিতে। দেওঘর নজরুলের পূর্ব পরিচিত জায়গা ছিল না। সেখানে তাঁর আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধব কেউ ছিলেন না। ফলে হাওয়া বদলের জন্য বা নিছক বিশ্রামের জন্য তিনি কি দেওঘর যেতে পারেন? তাই নজরুল অপিরিচত দেওঘরে হাওয়া খেতে গিয়েছিলেন কোন ব্যবস্থা না করেই এটা অনেকের কাছেই বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠেনি।[২] নজরুল তাঁর জীবনে চলার পথে কোনোদিনই কারোর মুখাপেক্ষী ছিলেন না। তাঁর গবেষকরা বলেছেন যে, নজরুল এক সময় '*নবযুগ*' পত্রিকার সাথে জড়িত ছিলেন। তারপর তিনি যোগ দেন '*মোসলেম ভারত*' পত্রিকায়।[৩] '*মোসলেম ভারত*' পত্রিকার দুই কর্তা আলী আকবর খান এবং আফজাজুল হক মনে করেছিলেন কবিকে নির্জন স্থানে সরিয়ে দিতে পারলে '*নবযুগ*' ছেড়ে তিনি '*মোসলেম ভারত*' পত্রিকায় যোগ দিতে বাধ্য হবেন। তখন জীবন যুদ্ধে লড়াই করছেন কবি। নিদারুণ আর্থিক সংকট তাঁকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে। নজরুলের

দেওঘরে যাওয়ার প্রধান প্রেরণাদাতাদের অন্যতম ছিলেন আফজাজুল হক সাহেব। তাঁর সঙ্গে নজরুলের মৌখিক চুক্তি হয়েছিল যে প্রতি মাসে তিনি নজরুলকে একশ টাকা হিসাবে দেবেন, আর নজরুল বিনিময়ে তাঁর লেখা শুধুমাত্র *'মোসলেম ভারত'* পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠাবেন হক সাহেবকে। এটা একটা কঠোরতম চুক্তি ছিল। এই চুক্তি দ্বারা নজরুলের হাত-পা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু একশ টাকা মাসিক বেতনের নিশ্চয়তার কারণে নজরুল তা মেনে নিয়েছিলেন।[৪]

নজরুলের দেওঘর যাওয়ার জোগাড়যন্ত্র আফজাজুল হক এবং আলী আকবর খান সাহেবরা করলেন। দেওঘর যাবার আগে নজরুল একটি বিদায় সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। দূরে চলে যাওয়ার জন্যে তখনকার যে অনুভব সেটা চমৎকার ফুটে উঠেছিল ঐ বিদায় সঙ্গীতে। গানটি এই রকমঃ

বন্ধু আমার! থেকে কোন সুদূরের নিজনপুরে
ডাক দিয়ে যাও ব্যথার সুরে?[৫]

নজরুলের দেওঘর যাওয়া উপলক্ষে আফজাজুল হক সাহেব একটি চা-পার্টির ব্যবস্থা করেছিলেন। ঐ পার্টিতেই কবি নজরুল তাঁর ঐ গানটি প্রথম গেয়েছিলেন। শুনে সকলে মুগ্ধ হয়েছিলেন। কবি মোহিতলাল মজুমদার আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বারে বারে নজরুলের চিবুক স্পর্শ করেছিলেন।[৬]

হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেনে কবি দেওঘরে পৌঁছন। হয় হাওয়া বদল, নয় বদ্যিনাথ দর্শন- বাঙালির কাছে এই দুই প্রধান আকর্ষণ। মধুপুর স্টেশনে নামার আগে থেকেই বৈদ্যনাথের পাণ্ডারা কবিকে তাদের সাথে নিয়ে যাবার জন্য ধরে বসেছিল। বাবা ধামে পূজো দেওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা তাঁরাই করে দেবেন, জানিয়ে দিলেন। কবি বার বার তাঁদের বোঝাচ্ছিলেন যে তিনি হিন্দু নন- মুসলমান। কিন্তু পাণ্ডারাও নাছোড়বান্দা। পাণ্ডাদের বোঝাতে তিনি ব্যর্থ হলেন এবং তাঁদের হাতে নিজেকে আত্মসমর্পণ করলেন। পাণ্ডারা কবিকে তাদের নিজেদের আস্তানায় নিয়ে গেলেন। নজরুল এর পর নিজেকে পাণ্ডাদের খপ্পর থেকে বাঁচানোর জন্য তাঁর সুটকেস খুলে ট্রাউজার্স, শার্ট, শিরওয়ানি ও করাচী থেকে আনা বিখ্যাত উঁচু মুসলমানি টুপি বার করে পরতে লাগলেন। তখন পাণ্ডারা বুঝলেন যে নজরুল প্রকৃতই মুসলিম। পাণ্ডারা কবির কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয়।[৭] দেওঘরের কোথায় কবিকে পৌঁছতে হবে তা তাঁরা কবির কাছে জানতে চান। মুসলমানদের কোন প্রতিষ্ঠান তখন দেওঘরে ছিলনা। শেষ পর্যন্ত পাণ্ডারা নিজেদের প্রাইভেট গাড়ীতে বসিয়ে নজরুলকে রাজনারায়ণ বসুর দেওঘরের বাড়িতে পৌঁছে দিলেন। দেওঘরে যে কয়েকজন বাঙালি হাওয়া বদলের জন্য গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রাজনারায়ণ বসু।[৮] তিনি ছিলেন বারীন্দ্রকুমার ঘোষের মাতামহ। তাঁর ছোট ছেলে মনিন্দ্র বসু দেওঘরেই থাকতেন। নজরুলের সাথে তাঁর পূর্ব পরিচয় ছিল এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। মনিন্দ্র বসুর বাড়িতেই প্রথম রাত কাটিয়েছিলেন কবি। পরের দিন নজরুল ডাক্তার কার্তিক বসুর স্যানাটোরিয়ামে একটি ছোট্ট কটেজ ভাড়া নেন।[৯]

বায়ু পরিবর্তনকারীদের জন্য এই স্যানাটোরিয়াম তৈরি করা হয়েছিল। যারা হাওয়া বদল করতে দেওঘরে আসত তারা এই স্যানাটোরিয়ামের বাড়ি ভাড়া নিত। শীতকালে ভ্রমণকারীর সংখ্যা কম থাকায় ১৯২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নজরুল সস্তায় দু-কামরার কটেজটি ভাড়া নেন। এই বাড়িতে বসেই নজরুল রচনা করেন '*স্নেহভীতু*', '*মুক্তিহার*', '*প্রতিবেশিনী*', '*ছলকুমারী*' এবং '*অকেজোর গান*'।[১০] আর সাঁওতালি সুরে লিখলেন গানঃ

হলুদ গাঁদার ফুল, রাঙা পলাশ ফুল
এনে দে এনে দে নৈলে রাঁধব না, বাঁধব না চুল।[১১]

দেওঘরে অবস্থানকালে কবি লিখলেন আরও একটি গানঃ
আমার ঘরের পাশ দিয়ে সে চলত নিতুই
সকাল সাঁঝে,[১২]

পরবর্তী কালে এই গান *"বেদন হারা"* নাম দিয়ে নজরুলের *"পূবের হাওয়ায়"* ছাপা হয়েছিল।[১৩]

দেওঘরে নজরুল যে কটেজে বাস করতেন তার সীমানার বাইরে '*ব্যবসা বানিজ্য*' পত্রিকার সম্পাদক শ্রী শচীন্দ্রনাথ বসুর বাড়ি ছিল। বাড়িটির নাম ছিল '*রত্নাচল*'। শচীন্দ্রনাথ বসু ছিলেন ডাক্তার কার্তিক বসুর স্যানাটোরিয়ামের তত্ত্বাবধায়ক। শচীন্দ্র বসু নজরুলের রান্না করবার জন্য আবদুল নামের এক ছোট ছেলেকে নিযুক্ত করেন। রূপবান ও গুণবান শচীন্দ্রনাথ বিয়ে করেন সেকালের '*সুপ্রভাত*' ও '*বঙ্গলক্ষ্মী*' পত্রিকার সম্পাদিকা কুমুদিনী বসুকে। কুমুদিনী ছিলেন '*সঞ্জীবনী*' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্রের মেয়ে ও রাজনারায়ণ বসুর দৌহিত্রী। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে এই পরিবারের খুব নাম ডাক ছিল। কুমুদিনীও স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন। এঁদের সাহচর্যে দেওঘরে নজরুলের দিন আনন্দেই কাটছিল।[১৪]

দেওঘরে কবিকে যে উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছিল তা সফল হয়নি। আফজাজুল সাহেবরা চুক্তি ভাঙলেন। এক সময় টাকা পাঠানো বন্ধ করে দিলেন। আফজাজুল হক আর টাকা পাঠালেন না, নজরুলও আর লেখা পাঠালেন না। হয়ত আফজাজুল হক সাহেবের স্বদিচ্ছা ছিল, কিন্ত '*মোসলেম ভারতের*' আর্থিক সঙ্গতি তাঁর সদিচ্ছা পূর্ণ করতে পারেনি। এ প্রসঙ্গে মুজফফর আহমেদ তাঁর '*কাজী নজরুল প্রসঙ্গে*' নামক গ্রন্থে লিখেছিলেনঃ

> কথা হয়েছিল নজরুল দেওঘর থেকে 'মোসলেম ভারতের' জন্য লিখবে এবং আফজাজুল হক সাহেব মাসে মাসে খরচের জন্য একশ' টাকা হিসাবে পাঠাবেন। আমি জানতাম হাজার সদিচ্ছা সত্ত্বেও মাসে মাসে একশ' টাকা হিসাবে আফজল সাহেব কিছুতেই জোগাতে পারবেন না।[১৫]

একদিন নজরুল এ নিয়ে মুখ খুললেন। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে চিঠিতে তিনি লিখেছিলেনঃ

> টাকা ফুরিয়ে গেছে, আফজাল কিম্বা খাঁ যেন শীগগীর টাকা পাঠায়, খোঁজ নিবি আর বলবি আমার মাঝে মানুষের রক্ত আছে। আজ যদি তারা সাহায্য করে, তা ব্যর্থ হবে না-আমি তা সুদে আসলে পুরে দেব।[১৬]

'সাহায্য' তো নজরুলের বিনয়ের কথা। তিনি আকুতি মিনতি করে বলেছিলেন যে টাকা পাঠালে তিনি অনেক অনেক লেখা লিখে আফজাজুল হক সাহেবদের সুদে আসলে পুষিয়ে দেবেন। আলী আকবর খানের জন্য নজরুল '*লিচু চোর*' সহ বেশ কিছু শিশু কবিতা লিখে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা কথা রাখেন নি।

দেওঘরকে কবি ভালো বেসে ফেলেছিলেন। তবে দেওঘরের প্রবল শীত তাঁকে কাবু করে দেয়। ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে বন্ধুবর পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে চিঠিতে তিনি লিখেছিলেনঃ

> জায়গাটা মন্দ নয়। তবে এক মাসের বেশি থাকতে পারব না এখানে, কেননা এখানে খুববেশী আনন্দ পাচ্ছিনা। ... শীতের এ জায়গা।[১৭]

টাকার অভাবে দেওঘর থেকে ফেরা হচ্ছিল না নজরুলের। তাঁকে দেওঘর থেকে কলকাতায় ফিরিয়ে আনেন মুজাফফর আহমেদ ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে।[১৮]

নজরুলের মধুপুর ভ্রমণ (১৯৪২)

বিজয়নারায়ণ কুণ্ডু মধুপুরের বিশুদ্ধ জলবায়ু ও স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া প্রচার করতে শুরু করেন। আমাশা, টাইফয়েড ও ম্যালেরিয়ায় জীর্ণ বাঙালিরা মধুপুরে আসতে শুরু করলেন। পূর্ব বাংলা আর কলকাতার বাঙালি ভদ্রলোক বুদ্ধিজীবীদের কাছে মধুপুর হয়ে উঠল 'হাওয়া বদলের' সেরা ঠিকানা। বিখ্যাত বাঙালি নীলমণি মিত্র, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ এসেছিলেন মধুপুরে। নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরে পাবার আশায় অসুস্থ কবি কাজী নজরুল ইসলাম সস্ত্রীক এসেছিলেন মধুপুরে। মধুপুর ধীরে ধীরে স্বাস্থ্যকর শহরে রূপান্তরিত হতে শুরু করে। এই প্রসঙ্গে L. S. S. O'Malley লিখেছেনঃ

> A number of new houses have consequently, been built in recent years by residents of Calcutta and other places. It is a growing town with a considerable number of European railway employers and an increasing population of Bengali gentleman who have country residences here.[১৯]

১৯৪১-৪২ সালে কবি কাজী নজরুল ইসলাম দিন কাটাচ্ছেন অর্থকষ্টে, অসুস্থতায়। ১৯৪২ সালের ১০ ই জুলাই কবি অসুস্থ হন। তখন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী কৃষক প্রজাপার্টির ফজলুল হক। বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠালেন বিদ্রোহী কবি। কিন্তু সে সাহায্যে আমল দেওয়ার সময় মুখ্যমন্ত্রী হক সাহেবের ছিল না। কিন্তু ওই মন্ত্রী সভারই এক সদস্য তৎকালীন বাংলার অর্থমন্ত্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বিষয়টিকে গুরুত্ব দিলেন। সাহায্য পৌঁছল কবি নজরুলের কাছে। শুধু অর্থ সাহায্যই নয়, মধুপুরে ড. মুখোপাধ্যায়ের পৈতৃক বাড়িতে নজরুলের পরিবারের থাকার ব্যবস্থা করেন শ্যামাপ্রসাদ। ১৯ জুলাই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আর্থিক সহায়তায় বায়ু পরিবর্তনের জন্য কবি মধুপুর গমন করেন। এরপর মধুপুরের স্বাস্থ্যকর আবহাওয়াতে সুস্থ হওয়া পর্যন্ত বসবাস করেছেন নজরুল। এখান থেকেই ১৯৪২ এর ১৭ ই জুলাই শ্যামাপ্রসাদকে একটি চিঠি লেখেন কবি নজরুলঃ

> শ্রী চরণেষু, আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করুন। মধুপুরে এসে অনেক relief & relaxation অনুভব করছি। মাথার যন্ত্রণা অনেকটা কমেছে। জিহ্বার জড়ত্ব সামান্য কমেছে। আমার স্ত্রী আজ প্রায় পাঁচ বৎসর পঙ্গু হয়ে শয্যাগত হয়ে পড়ে আছে। ওকে অনেক কষ্টে এখানে এনেছি। ওর অসুখের জন্যই এখনো সাত হাজার টাকার ঋণ আছে। এর মধ্যে মাড়োয়ারি ও কাবলিওয়ালাদের ঋণই বেশি। হক সাহেব যখন আমার কাছে এসে কাঁদতে থাকেন যে, “আমায় রক্ষা কর, মুসলমান ছেলেরা রাস্তায় বেরুতে দিচ্ছেনা।”, আমি তখন মুসলিম লীগের ছাত্র ও তরুনদলের লিডারদের ডেকে তাদের শান্ত করি। তারপর assembly-র সমস্ত মুসলমান মেম্বারদের কাছে আমি আবেদন করি। তাঁরা আমার আবেদন শুনলেন। ৭৪ জন মেম্বার হক সাহেবকে সমর্থন করতে রাজি হলেন। “নবযুগের” সম্পাদনার ভার যখন নিই; তার কিছুদিন আগে ফিলমের music-direction-এর জন্য সাত হাজার টাকার কনট্র্যাকট পাই। হক সাহেব ও তাঁর অনেক হিন্দু- মুসলমান supporter আমায় বলেন যে, তাঁরা ও ঋণ শোধ করে দেবেন। আমি film-এর contract cancel করে দিই। পরে যখন দু’ তিন মাস তাগাদা করে টাকা পেলাম না, তখন হক সাহেবকে বললাম, “আপনি কোন ব্যাঙ্ক থেকে অল্প সুদে আমায় ঋণ ক’রে দেন, আমার মাইনের অর্ধেক প্রতিমাসে কেটে রাখবেন।” হক সাহেব খুশি হয়ে বললেন, “পনের দিনের মধ্যে ব্যবস্থা করব।” তারপর সাত মাস কেটে গেল, আজ নয় কাল ক’রে। তাঁর supporter-রাও উদাসীন হয়ে রইলেন। আপনি

জানেন Secretariate-এ আপনার সামনে হক সাহেব বললেন "ও হয়ে যাবে।" আমি নিশ্চিত মনে কাজ করলাম। আপনি জানেন, হিন্দু-মুসলিম unity-র জন্য আমি আজীবন কবিতায়, গানে, গদ্যে দেশবাসীকে আবেদন করেছি। সে সব সাহিত্যে স্থান পেয়েছে-সে গান বাঙলার হাটে, ঘাটে, পল্লীতে, নগরে নগরে গীত হয়। আমি হিন্দু মুসলমান ছাত্র ও তরুণদের সঙ্ঘবদ্ধ করে রেখেছি; যদি হক মন্ত্রিত্ব ভেঙে যায়, তাহলে আবার coalition ministry-র জন্য। হক সাহেব একদিন বললেন, "কিসের টাকা?" আমি চুপ করে চলে এলাম। তারপর আর তাঁর কাছে যাইনি। আপনি Secretariate-এ যখন বলেছিলেন, "ও হয়ে যাবে", তখন থেকে স্থির বিশ্বাসে বসে রইলাম, "আমি নিশ্চয়ই টাকা পাব।" এই coalition ministry-র একমাত্র আপনাকে আমি অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি-আর কাউকে নয়। আমি জানি, আমরাই এই ভারতবর্ষকে পূর্ণ স্বাধীন করব- সেদিন বাঙালীর আপনাকে ও সুভাষ বসুকেই সকলের আগে মনে পড়বে- আপনারাই হবেন এদেশের সত্যকার নায়ক।

আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। আমি জানি আমি Hindu-Muslim Equity fund থেকে আমার ঋণ-মুক্তির টাকা পাব। আপনার কথা কখনো মিথ্যা হবে না। পাঁচশ টাকা পেয়েছি। আরো পাঁচশো টাকা অনুগ্রহ করে যত শীঘ্র পারেন পাঠিয়ে দেবেন, বা যখন মধুপুরে আসবেন নিয়ে আসবেন। কোর্টের ডিক্রির টাকা দিতে হবে। তিন চার মাস দিতে পারিনি। তারা হয়তো body-warrant বের করবে। আপনার মহত্ত্ব, আপনার আমার উপর ভালোবাসা, আপনার নির্ভীকতা শৌর্য সাহস- আমার অণুপরমাণুতে অন্তরে বাহিরে মিশে রইল। আমার আনন্দিত প্রণাম-পদ্ম শ্রীচরণে গ্রহণ করুন।

প্রনত- কাজী নজরুল ইসলাম।[২০]

নজরুল ইসলাম সে সময় কতখানি রোগজর্জর এবং উদ্বিগ্ন তার আরও প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৪২ এর ১৭ ই জুলাই কবির দুর্দিনের বন্ধু সূফী জুলফিকার হায়দরকে লেখা একটি চিঠিতেঃ

আমি Blood Pressure-এ শয্যাগত; অতি কষ্টে লিখছি। আমার বাড়িতে অসুখ, ঋণ, পাওনাদারদের তাগাদা প্রভৃতি worries সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত খাটুনি। তারপর নবযুগের worries ৩/৪ মাস পর্যন্ত। এই সব কারণে আমার Nerves Shattered হয়ে গেছে। ৭ মাস ধরে হক সাহেবের কাছে গিয়ে ভিখারির মত ৫/৬ ঘণ্টা ধরে

> বসে থেকে ফিরে এসেছি। হিন্দু-মুসলিম equity-র টাকা কারু বাবার সম্পত্তি নয়- বাংলার, বাঙালির টাকা। আমি ভালো চিকিৎসা করাতে পারছি না। একমাত্র তুমিই আমার জন্য sincerely appeal-করেছ সত্যকার বন্ধু হয়ে। আমার হয়তো এই শেষ পত্র তোমাকে। একবার শেষ দেখা দিয়ে যাবে বন্ধু! কথা বন্ধ হয়ে গিয়ে অতিকষ্টে দু-একটা কথা বলতে পারি, বললে যন্ত্রণা হয় সর্ব শরীরে। হয়তো কবি ফিরদৌসির মতো ঐ টাকা আমার জানাজার নামাজের দিন পাবো। কিন্তু ঐ টাকা নিতে নিষেধ করেছি আমার আত্মীয় স্বজনকে। হয়তো ভালোই আছে। তোমার নজরুল।[২১]

নজরুল ছিলেন জীবনবাদী, বিদ্রোহী কবি। তাই শুধু মরণের হতাশা নয়, বাঁচার-বেঁচে থাকার প্রবল আগ্রহও তাঁর মধ্যে ছিল। ১৯৪২ এর ১৫ ই জুলাই ব্রজকিশোর রায়চৌধুরীকে লেখা একটি চিঠিতে নজরুল লিখেছিলেনঃ

> আমি অক্টোবরের মধ্যেই ভালো হয়ে যাব। ফাল্গুন থেকে নববসন্তের তেজ পাব। নৌজোয়ান হবে, আমার ‘বন্ধুর’ দেহ হয়ে যাব। ‘বন্ধু’ বলেছেন। তোমাদের বৌদি ভালো হয়ে যাবেন। ‘বন্ধু’ বলেছেন...[২২]

একদিকে জীবনের আশা, অন্যদিকে মৃত্যুর তমসা, কবির জীবনে এনেছিল উত্তাল তরঙ্গ। আর কবিকে তাঁর দুঃখ- দিনের নির্বিশেষ দহন থেকে উদ্ধারের জন্য ‘বন্ধু’ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তখনও সচেষ্ট। নজরুল দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হবার আগে শ্যামাপ্রসাদ তাঁকে অসহনীয় অবস্থা থেকে উদ্ধারের জন্য কী পরিমাণ সচেষ্ট ছিলেন, সেটি ১৯৪২ এর ১৭ ই জুলাই শ্যামাপ্রসাদকে লেখা নজরুলের সেই চিঠির উপর শ্যামাপ্রসাদের মন্তব্যটি থেকে উপলব্ধি করা যায়। শ্যামাপ্রসাদ লিখেছিলেনঃ

> কী ব্যবস্থা করা যাবে সে বিষয়ে জুলফিকার হায়দরের সহিত কথা হয়েছে। সুস্থ হয়ে ফেরৎ আসে।[২৩]

এরপর কি ঘটেছিল তা আর জানা যায়না। নজরুলকে সুস্থ করে তোলার জন্য শ্যামাপ্রসাদের ঐকান্তিক আগ্রহ, তাঁকে অর্থসাহায্য, হাওয়া বদলের জন্য মধুপুরে পাঠানো-এই সবই বোধ হয় ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। ১৯৪২ সালের ২১ সেপ্টেম্বর কবি মধুপুর থেকে কলকাতায় ফিরে আসেন।[২৪]

শেষকথা

নজরুল শখের পর্যটক ছিলেন না। তিনি স্বইচ্ছায় দেওঘর এবং মধুপুর ভ্রমণ করেন নি। দেওঘরে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল একদল স্বার্থান্বেষী মানুষের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য। সেটা অবশ্যই ব্যবসায়িক স্বার্থ। কলকাতার বিত্তবান বাবুদের ন্যায় চেঞ্জে যাওয়ার সুযোগ অন্তত নজরুলের কপালে জোটেনি। দেওঘর ভ্রমণ সেই ইঙ্গিতই দেয়। তবে মধুপুর ভ্রমণের পশ্চাতে ছিল শরীর মেরামতের উদ্দেশ্য। কবি নিজের শরীর এবং স্ত্রীর

শরীর সারানোর জন্য মধুপুরে ভ্রমণ করেন। তবে এই ভ্রমণও নিজ উদ্যোগে নয়। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় এটা সম্ভব হয়। দেওঘরে অবস্থানকালে তিনি বেশ কিছু কালজয়ী রচনা সৃষ্টি করেন। মধুপুরে অবস্থানের সময় তৎকালীন ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা, হিন্দু-মুসলিম ঐক্য, স্বাধীনতার ডাক এবং সুভাষ চন্দ্র বসু এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধা তাঁর একাধিক চিঠিপত্রে ফুটে উঠেছে। নজরুলের হিন্দু গুরু ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। তাঁকে কবি 'বন্ধু' বলে ডাকতেন। ঈশ্বরে আস্থা যাঁর যাঁর ব্যক্তিগত বিষয়। কিন্তু আজকের ধর্মীয় বিদ্বেষের যুগে কাজী নজরুলের এই যে ধর্মের বেড়াবিহীন ঈশ্বর ভাবনা, তা এক নতুন মানুষের কথা বলে। এই দৃষ্টান্ত আজকের দিনে যেন বেশি জরুরি হয়ে উঠেছে। নজরুল নিজে এই ধর্মীয় বিদ্বেষ সম্পর্কে খুবই সচেতন ছিলেন। তাই তিনি শ্যামাপ্রসাদের প্রতি এত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। যাইহোক, দেওঘর ও মধুপুর ভ্রমণ নজরুলের জীবন ও কর্মে একটি বিশেষ অধ্যায়ের জন্ম দিয়েছিল।

সূত্র নির্দেশ:

১। L. S. S. O'Malley, *Bengal District Gazetteers: Santal Parganas, The Bengal Secretariat Book Depot,* Calcutta, 1910, Rpt., Logos Press, New Delhi, 1999, p. 252.

২। মুজফফর আহমদ, *কাজী নজরুল ইসলামঃ স্মৃতিকথা* , ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃষ্ঠা. ৪৭

৩। পারমিতা চক্রবর্তী, *নজরুলঃ সাময়িক পত্রিকায় বিদ্রোহী কবি,* আত্মজা পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৭, পৃষ্ঠা. ২১

৪। মুজফফর আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৪৮

৫। তদেব, পৃষ্ঠা. ৪৮

৬। তদেব, পৃষ্ঠা. ৪৯

৭। 'দেওঘরে নজরুল', আন্তর্জালিক প্রবন্ধ, সংগৃহীত হয়েছে https://www.bongodorshon.com/home/story_detail/nazrul-at-deogargh, ২৬/১০/২০২০, সকালঃ ৯.৩২ মিনিটে

৮। অনাথবন্ধু চট্টোপাধ্যায়, *ছুটির নিমন্ত্রণে পশ্চিম,* রুপালী পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৫, পৃষ্ঠা. ১৬

৯। মুজফফর আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৫০

১০। অনাথবন্ধু চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৪২

১১। তদেব, পৃষ্ঠা. ১৪২

১২। মুজফফর আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৫০

১৩। তদেব, পৃষ্ঠা. ৫০

১৪। তদেব, পৃষ্ঠা. ৪৯

১৪। তদেব, পৃষ্ঠা. ৫০
১৫। তদেব, পৃষ্ঠা. ৪৭
১৬। তদেব, পৃষ্ঠা. ৪৮
১৭। অনাথবন্ধু চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ১৪২
১৮। মুজফফর আহমদ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৫২
১৯। L. S. S. O'Malley, *op. cit.*, pp. 268-269
২০। উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *শ্যামাপ্রসাদের ডায়েরী ও মৃত্যু প্রসঙ্গ,* মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ২০১৭, পৃষ্ঠা. ২০৪-২০৫
২১। অনাথবন্ধু চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৮৬
২২। তদেব, পৃষ্ঠা. ৮৭
২৩। উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ২০৫
২৪। জুলফিকার হায়দর, *নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায়,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৪, পৃষ্ঠা. ৭৮-৮৫

সুন্দরবনের জীবনচিত্র : প্রসঙ্গ ছোটগল্প

রিয়া চৌধুরী
গবেষক, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

সারাংশ : সাহিত্য সৃষ্টি করাই লেখকের প্রধান কাজ। সমাজের খুঁটিনাটি বিভিন্ন বিষয়গুলি নিয়ে লেখক তাঁর সুন্দর বাচনভঙ্গি ও লেখনী শৈলীর মধ্য দিয়ে পাঠকের মনোগ্রাহী সাহিত্য সৃষ্টি করেন। তবে আঞ্চলিকতার নির্যাসযুক্ত সাহিত্য পাঠকের দরবারে নিয়ে এসেছে অকুণ্ঠ বৈচিত্র্যময়তা। আঞ্চলিক সাহিত্য ভিত্তিক রচনা স্বতঃস্ফুর্তভাবে স্বগর্ভে পালন করে সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিসর। যার ক্ষেত্রটি ক্রমাগত নিয়ন্ত্রিত হয়েছে চেতনার বিবর্তন, সমাজ-সভ্যতার বদলাকাঙ্খিত রূপ এবং অন্বেষণের অনির্ণেয় আনন্দের দ্বারা। শহর ছড়ে বাংলার মফস্বল ও ছোটোখাটো গ্রামগুলি স্থান করে নিয়েছে লেখকের ভাবনায়। সেইরকমই বাংলার এক প্রান্তীয় অঞ্চল সুন্দরবন নিয়ে লেখালেখি শুরু হয়। লেখক মনোজ বসুই প্রথম সুন্দরবন নিয়ে রচনার সূত্রপাত করেন, পরে সেই ধারায় যুক্ত হন বিখ্যাত সাহিত্যিক ও উঠতি লেখকগণ। পাঠকমহলেও সুন্দরবন নিয়ে আগ্রহ অনেক। তাই আলোচ্য প্রবন্ধে খ্যাতনামা সাহিতিক ও নতুন লেখকদের কিছু ছোটগল্প নির্বাচন করা হয়েছে। এই গল্পগুলি নির্বাচনের মাধ্যমে আলোকপাত করা হবে সুন্দরবনের গ্রাম সমাজ, মানুষজনের বেঁচে থাকার অদম্য লড়াই এবং সমাজের অন্ধকারময় দিকগুলিতে। পাশাপাশি আলোচিত হবে নির্বাচিত প্রতিটি গল্পের লেখকের অভিজ্ঞ বর্ণনাময় কাহিনীর দ্বারা সুন্দরবনের বাস্তবতাকে পাঠকের মনোগ্রাহী করে তুলেছে সেই বিষয়টি নিয়েও।

সূচক শব্দ: আঞ্চলিক সাহিত্য, সুন্দরবন, কুসংস্কার, বেহুলা, অনাগরিক, কুয়েল, নিয়তি

মূল আলোচনা:

দেশ, কাল, মানুষ এই তিন প্রধান স্তম্ভকে কেন্দ্র করেই লেখক এগিয়ে নিয়ে যান তাঁর সাহিত্যকর্মকে। লেখকের লেখনী শৈলী প্রতিফলিত হয় সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যেই। তাঁর সচেতন কৃত্যে সহৃদয় পাঠকের চোখেও ধরা পড়ে উক্ত তিন স্তম্ভের গরিমা। তবে অকুণ্ঠ বৈচিত্র্যময়তায় ভরপুর আঞ্চলিকতার নির্যাসযুক্ত সাহিত্যগুলি পাঠকের কাছে অত্যন্ত আগ্রহের বিষয়। যার বিশাল ক্ষেত্রটিতে অংশ নেয় স্বতন্ত্র ভৌগোলিক পরিবেশ, সেই পরিবেশজাত মানব সংস্কৃতির গড়ন এবং সর্বোপরি মানুষের সঙ্গে এই পরিবেশটির পারস্পারিক মিথষ্ক্রিয়া। নগর সভ্যতা ছাড়াও মফস্বল, গ্রাম এবং প্রান্তীয় সমাজ লেখকদের সঙ্গে আকর্ষণ করল পাঠককেও। বাংলা সাহিত্যের অন্দরমহলে আত্মপ্রকাশ করল রাঢ় বাংলা এবং বহির্বাংলার নানা অঞ্চলগুলি। বাংলা সাহিত্যে আঞ্চলিকতার সূত্রপাত ইংরেজি রচনার অনুসরণ ক্রমে। ইংরেজি সাহিত্যে প্রথম আঞ্চলিকতার অবয়ব ধরা পড়ে টমাস হার্ডির রচনায়। তবে রবীন্দ্র বিরোধিতার মধ্য

দিয়ে 'কল্লোল' পত্রিকা কেন্দ্রিক সাহিত্য আন্দোলন যে আঁকাড়া বাস্তবকে আলিঙ্গন জানাল তার মধ্যে কথাসাহিত্য সহজেই তার উপযোগী কেন্দ্র বেছে নিয়েছিল। বাংলা কথাসাহিত্যে 'কয়লা কুঠি'র রচনাকার শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের অবদান অনস্বীকার্য। আঞ্চলিক সাহিত্যকর্মের অঙ্গনে চিরকালই গুরুত্ব পেয়েছে অঞ্চলের ইতিকথা, তার সামগ্রিক চেহারা; যেমন-আলোচ্য প্রবন্ধে সুন্দরবনের সমগ্র প্রান্তীয় অঞ্চলগুলি।

পশ্চিমে ভাগীরথীর মোহনা থেকে শুরু করে পূর্বে মেঘনা নদীর মোহনা পর্যন্ত অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত রোমাঞ্চে ভরপুর ভয়াল সুন্দরবন। অবশ্য দেশভাগের পর সুন্দরবনের অধিকাংশ এলাকাই এখন বর্তমান বাংলাদেশের মধ্যে অবস্থিত। ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয় ২.০৭ মিলিয়ন হেক্টরের ৩৮.৫৪ শতাংশ বা ০.৭৯১ মিলিয়ন হেক্টর অঞ্চল।[১] খুবই প্রাচীন এই সুন্দরবন হল বিশাল গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ বা Gangetic Delta। সুন্দরবনের ত্রিভুজাকৃতি ব-দ্বীপ গুলিকে ডেলটা বলা হয়। মহাভারত থেকে শুরু করে বিভিন্ন পুরাণে এমনকি রঘুবংশেও ব-দ্বীপ অঞ্চলের উল্লেখ মেলে।[২] প্রাচীনকালে আর্যজাতি এখানে বসবাস ও চাষাবাদ শুরু করে তবে তার কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। হিউএন সাঙের রচনায় সাতের দশকের সুন্দরবনের উল্লেখ আছে। তিনি এখানকার জলবায়ু, ফল-ফুল, আদিবাসীদের চেহারা এবং তাদের জীবনযাত্রার বর্ণনা করেছেন।[৩] প্রায়শই সুন্দরবনের সৃষ্টি ও ধ্বংস হয়েছে। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশির যুদ্ধের পর মীরজাফরের কাছ থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিনিধি রবার্ট ক্লাইভ ২৪ পরগণার জমিদারী স্বত্ব লাভ করেন। সুন্দরবনের অধিবাসীদের জীবন-জীবিকা জমি, জঙ্গল ও নদী নির্ভর। এখানকার বৃহত্তর অংশের মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করেন। কৃষি কাজের পাশাপাশি মানুষের জীবিকা মাছ ধরা, জঙ্গলে কাঠ কাটা, খাঁড়ি নদীতে কাঁকড়া ও বাগদার মীন ধরা, মধু-মোম সংগ্রহ, বাঁশ ও বেতের কাজ, কাঁথা সেলাই, শোলার কাজ, তাল ও হোগলা পাতার চাটাই মাদুর বোনা, লোহা-কাঠের জিনিসপত্র তৈরী করা। কেউ কেউ আবার গৃহস্থের বাড়িতে জনমজুর খাটেন, জোতদার বা মহাজনের জমিতে খেতমজুর বা ভাগচাষীর কাজ করেন। এছাড়াও আছে জোতদার ও মহাজনী শোষণ, সামাজিক অন্ধ কুসংস্কারে আবদ্ধ মানুষের জীবন। নগরকেন্দ্রিক উন্নততর জীবন থেকে বহু দূরবর্তী প্রান্তীয় সুন্দরবন অঞ্চলের বিভিন্ন জনপদ ও অধিবাসীদের জীবনযাত্রা গল্পকাররা মর্মস্পর্শী ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন।

আঞ্চলিক সাহিত্যের তাত্ত্বিক ভিত্তিকে মান্যতা দিয়ে বলা যায় সুন্দরবন নির্ভর কথাসাহিত্যের প্রকৃত সূচনা ঘটে সাহিত্যিক মনোজ বসুর হাত ধরে, পরে সেই ধারায় নিযুক্ত হন মহাশ্বেতা দেবী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রফুল্ল রায়, মধুময় পাল, অভিজিৎ সেনগুপ্ত, ভগীরথ মিশ্র, বিপ্রদাস বড়ুয়া, কিন্নর রায়, আল মাহমুদ, হাসান আজিজুল হক, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, সমীর রক্ষিত, উৎপলেন্দু মন্ডল, সাধন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও উঠতি লেখকগণ। বর্তমানে সুন্দরবনের নানা বিষয় নিয়ে মানুষের জানার

আগ্রহ ক্রমশই বেড়ে চলেছে। উঠতি লেখকরাও সুন্দরবন কেন্দ্রিক সাহিত্য নির্মাণে উৎসাহী হয়েছেন। প্রবন্ধে বিশিষ্ট লেখকগণ ও নতুন সাহিত্যিকদের সুন্দরবন বিষয়ক কিছু গল্প নিয়ে আলোচনা করা হল।

প্রথমেই আলোচনা করা যাক প্রখ্যাত সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবীর 'বেহুলা' গল্পটি নিয়ে। 'বেহুলা' গল্পের প্রধান বিষয়বস্তু হল এই গ্রামের জনজীবনের কথা। স্থানীয় নদীর নামেই এই গ্রামের নাম। গ্রামে হৃদয় নস্করের পতিত ইটের জমিতে সাপের চাষ হয়। শ্রীপদ মাল এই অঞ্চলের ওঝা। প্রতি মাসেই দুই একজনকে সাপে কামড়ায়; তবে শ্রীপদ ওঝা সমস্ত রোগীকে দেখে না বিপদ বুঝলে পাঠিয়ে দেয় ইরফানপুর হেলথ্ সেন্টারে। রোগী মারা গেলে শ্রীপদ গ্রামবাসীদের বিশ্বাস করায় যারা মা মনসাকে শ্রদ্ধা করে না, সাপের কামড়ে তারাই মারা যায়। মানুষের মৃত্যুর মধ্যে রয়েছে যেন এক পরাজয়ের মনোভাব, নদীর নামটি যেন সেই পরাজয়ের সূচক। ব্যতিক্রমী চরিত্র গবেষক বসন্ত কুমার। তিনি মনে করেন যেখানে সাপের কামড়ে মানুষের মৃত্যুর সংখ্যা বেশি সেখানে অত্যাধুনিক স্নেক ভেনাম অ্যান্টিসিরাম ব্যবহার করা হয় না কেন? বসন্তের আরও বিস্ময় জাগে সারা ভারতে বছরে চার লাখ লোককে সাপে কামড়ায়, মারা যায় প্রায় বিশ হাজার লোক। বহুবছর ধরে পরিসংখ্যান একই। তাহলে কি ভারতে মানুষ আর সাপের কোনো সমঝোতা রয়ে আছে। লেখক মহাশ্বেতা এজাতীয় বক্তব্যের মধ্য দিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সরকারি দপ্তর গুলিকেই। গল্পের শেষে কালাজ সাপের কামড়েই মৃত্যু হয় শ্রীপদ ওঝার। প্রতিশোধের জন্য বসন্ত হৃদয় নস্করের সর্পচাষের ক্ষেত্র কেরোসিন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়- "সাপ বেরোতে থাকে মরতে থাকে। গ্রামের লোকগুলোর শোক, কালাজ বিষের ভয়, হেদো নস্করের উপর রাগ সব উত্তরিত হয় এক ক্ষণিক জ্বলন্ত ক্রোধে। আগুন তাই ভীষণ জ্বলে"।[৪]

প্রফুল্ল রায়ের 'বাঁচার জন্য' গল্পে বিষ্টুপদ ও নিশি চরিত্রের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করা হয়েছে খেটে খাওয়া মানুষের প্রতিদিন জীবন যুদ্ধের কঠিন লড়াইকে। বিষ্টুপদ ও নিশি সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে খাম আলু, বেল সংগ্রহ ও কচ্ছপ শিকার করতে গিয়ে বুনো শুয়োরের আক্রমণের সম্মুখীন হয়। প্রচন্ড লড়াই করে সেখান থেকে প্রাণে বাঁচলেও শীতের রাতে কোন আশ্রয় খুঁজে পায় না। শেষ পর্যন্ত দেহ তপ্ত রাখার জন্য দুর্যোগের রাতে তারা পরস্পরকে জড়িয়ে শুয়ে থাকল। কথাকারের ভাষায়- "পরদিন সকালবেলা হল, কচ্ছপ আর যুদ্ধ করে জেতা খাম আলুটাকে ভাগাভাগি করে নিশি গেল উত্তরে আর বিষ্টুপদ গেল দক্ষিণে"।[৫]

'চূড়ামণি উপাখ্যান' গল্পে লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মোংলার রাতের স্বপ্নের বাস্তবিক ব্যাখ্যা নির্মাণ করেন। লেখকের বাস্তববাদী ব্যাখ্যায় ফুটিয়ে তুলেছেন ডাকাতির ঘটনা, আর মোংলা স্বপ্নে দেখেছিল ঘুটিয়ারী শরিফের ঘোড়দৌড়। কৌতুক আবহ পরিবেশনের মধ্য দিয়েই লেখক দেখিয়েছেন ডাকাতির ঘটনা ক্রমেই গ্রামের পর গ্রাম গ্রাস করতে থাকে। গ্রামবাসীরা প্রত্যেকে একে অপরকে সন্দেহ করতে শুরু করে।

কেউ কেউ আবার মনে করেন পুলিশই আবার রাতেরবেলায় ডাকাতি করে বেরোয়, অর্থাৎ রক্ষকই ভক্ষক। ইদানিং সুন্দরবনের গ্রামগুলিতে বাঘের ভয়ের চেয়ে ডাকাতির ভয় বেড়েছে। এই সময়েই ডাকাতদের সাথে মোকাবিলার জন্য গ্রামেরই বাতাসির মা কাঁদুনি স্মরণ করে চূড়ামণির কথা, যে সমস্ত গ্রামগুলির কিংবদন্তি রূপে পরিচিত। একদা বলবান চূড়ামণিকে খুঁজে পাওয়া যায় কানা ফকিরের আখড়ায়, তবে তার শরীর একেবারেই শীর্ণকায়। তবু তাকেই ধরে নিয়ে আসে বাতাসিরা। গ্রামের লোকের ভালোবাসায় চূড়ামণি আবার পুরোনো চেহারা ফিরে পায়। গল্পটা গ্রামবাংলার বিশ্বাসবোধ, অবিশ্বাসজাত যন্ত্রণা, সংস্কার, সারল্য, ভয়, হাসি, কান্না, আনন্দ- সমস্ত আবেগকেই প্রকাশিত করে। 'চূড়ামণি উপাখ্যান' তাই শুধু বাদার কিংবদন্তি হিসেবেই নয়, তা হয়ে ওঠে সমগ্র গ্রাম ভারতের কাহিনী।

প্রান্তীয় সুন্দরবন অঞ্চলের সামাজিক পরিবেশের পরিবর্তিত রূপের সুন্দর চিত্র এঁকেছেন গল্পকার সাধন চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'পটভূমি বদলে যায়' গল্পে। ক্যানিং লোকালে চেপে যে সকল কাজের লোকেরা কলকাতা শহরতলির বালিগঞ্জ, ঢাকুরিয়া, যাদবপুর, পার্কসার্কাস ও শিয়ালদা অঞ্চলের বাড়িতে ও ফ্ল্যাটে কাজ করতে আসেন তাদের জীবন কাহিনী গল্পকার এখানে সাবলীল ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। গল্পে কাজের বৌএর প্রতিনিধিস্বরূপ চরিত্রটি তৈরী হয়েছে চায়না বিবিকে ঘিরে। তার সখ-আহ্লাদকে ব্যক্ত করেছেন লেখক। চায়নার এমনই এক আকাঙ্খা প্রকাশিত হয়েছে হবু নবজাতককে ঘিরে যে তার পুত্রবধূর গর্ভে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের মতো গরীবের ঘরে 'ধাই মা'র কাজ করে ঠাকুমারাই। তা নিয়ে চায়না বিবির স্বপ্ন ছিল অনেক। কিন্তু কাজ থেকে ফিরে যখন সে শুনল তার পুত্র জুলফিকার বৌমাকে নিয়ে গেছে ঘুটিয়ারীর হেলথ্ সেন্টারে, তখন নিঃশব্দে চায়না বিবির চোখ থেকে জল বেরিয়ে এলো- 'সে নীরবে মোনাজাত করল'।[৬] আগে তাদের বাসস্থান বেদ্‌বেড়িয়া ছিল দ্বীপ, এখন ব্রিজ হওয়ায় ঘুটিয়ারী খুব সহজেই পৌঁছে যাওয়া যায়। পাকা রাস্তা, সামাজিক বনসৃজনের ছায়া ধীরে ধীরে ঘিরে ধরে চায়নাকে। ভাঙা বাঁধ, নদীগ্রস্ত গাঁ, ডাকাত-পুলিশ আগের সবকিছুই তার কাছে স্বপ্নের মতো মনে হয়। রেশমাকে নিয়ে নবজাতককে কেনাবে বলে মেজোগিন্নির কাছ থেকে যে একশো টাকা ধার করেছিল তা পড়েই থাকে।

সুন্দরবন ভ্রমণে বেড়িয়ে প্রবল ঝড়ের কবলে পড়ে মৃত্যুর সম্মুখ থেকে জীবন ফিরে পাওয়ার অভিজ্ঞতা কথাকার সমীর রক্ষিত তাঁর 'প্রমোদ ভ্রমণ' গল্পের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। গল্পের নায়ক জগদীশ সারেঙ ঝড়ের সময় কোনরকমে লঞ্চকে বাঁচিয়ে নদী থেকে খাঁড়ির দিকে নিয়ে আসে। সাঁতার না জানা মানুষ গুলির জীবন বাঁচানোর জন্য তারা জগদীশকে বাহবা দেয়, এবং নৌকার যাত্রী কল্যাণ, বিকাশ, সোমনাথ তার ছবি সযত্নে তুলে নেয়। গল্পের মধ্যে শহর এবং গ্রামের মানুষ একই ফ্রেমে ধরা পড়েছে- গল্পকারের দক্ষতা এখানেই প্রকাশ পায়।

অভিজিৎ সেনগুপ্তের 'অনাগরিক' গল্পের বিষয়বস্তু হল জীবনের প্রতি অত্যন্ত আকর্ষণ বোধ। কাহিনী নির্মিত হয়েছে গল্পের মুখ্যচরিত্র যুধিষ্ঠিরের কার্যকলাপকে ঘিরে। যুধিষ্ঠিরের একটা পা নেই, তাও সে জীবনের নানা স্বাদ-আহ্লাদ গ্রহণ করতে চায় পায়ের বিকল্প লাঠির সাহায্য নিয়ে। লাঠিতে ভর দিয়ে সে সবেগে ছুটতে পারে। সুন্দরবনের জঙ্গলে বিষধর সাপের কামড়কে তোয়াক্কা না করে পরনের একমাত্র কাপড় ছিঁড়ে ক্ষতস্থান বেঁধে উলঙ্গ অবস্থাতেই লাঠি পা নিয়ে ছুটে উপস্থিত হয় কালীপদর ঠিকানায়। বেঁচে থাকবার প্রয়োজনেই আচরণের মধ্যে এইরূপ অনাগরিক মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে যা শহরের শিক্ষিত মানুষদের বিস্মিত করে, অহংকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়।

ভগীরথ মিশ্র 'কুয়েল' গল্পে বর্ণনা করেছেন সুন্দরবনের গ্রামজীবনের এক অভিজ্ঞতার কাহিনী। জীবন-জীবিকার টানে একটি মউলের দল 'কুয়েল' কৈলাস সর্দারকে সঙ্গে নিয়ে যায় জঙ্গলে মৌচাক ভাঙতে। অভাবের কারণে কৈলাস যেতে রাজি হয়। গভীর জঙ্গলে কুয়েল কৈলাসের সহায়তায় বাঘের আক্রমণ থেকে জীবন বাঁচে ভুজঙ্গ, কার্তিক ও গোপীনাথদের। কিন্তু কৈলাসের গলায় রক্ত উঠে মৃত্যু হয়। সাধারণত জঙ্গলে মারা গেলে সবাই মৃতদেহ ছেড়ে চলে আসে, এখানে শিষ্য গোপীনাথের সহায়তায় কৈলাসের চিতা প্রস্তুত করে মৌলেরা। মুখাগ্নি করে গোপীনাথ, তারপর বাকিরা। পূর্বে এই জঙ্গলে কৈলাসের ছেলেদেরও মৃত্যু হয়। মুখাগ্নির সময় গোপীনাথ, ভুজঙ্গদের মনে হয় কৈলাসের ছেলেদের আত্মা যেন নিঃশব্দে ওদের শরীরে প্রবেশ করছে।[৭] কৈলাস সর্দার 'কুয়েল' বৃত্তি ছেড়ে ফিরে গিয়েছিল গাঁয়ে। কিন্তু অর্থের অভাবে এবং মানুষের প্রাণ বাঁচানোর জন্য সে ফের ডাকতে শুরু করে। সেই ডাকই কৈলাসের জীবনে মৃত্যু ডেকে আনল। গল্পে আত্মত্যাগ এক অভূতপূর্ব মহিমা দান করেছে। এখানে লেখকের লেখনী শৈলীও অতুলনীয়।

সুন্দরবনের জঙ্গলে কাঠুরেদের সঙ্গে এসে হরিণের মাংসের লোভে গদাধর কীভাবে বাঘের আক্রমণের সম্মুখীন হল তারই ব্যাখ্যা করেছেন কথাকার তপন বন্দ্যোপাধ্যায় 'হরিণের মাংস' গল্পে। 'এগুতে এগুতে হঠাৎ তার কাপড়টা বেঁধে গেল এক ডালে, বোধহয় গরানের খোঁচা ডালটাই হবে।...গরানের ডালটা থেকে কাপড় ছাড়ানোর জন্য পিছন ফিরতেই দেখল ওটা গরানের ডাল নয়, হলদে-কালোয় মেশানো একটা ছায়া, একটা লাল গুহার আকৃতি বিশাল জিভ আর কটা হুজুল্‌তো দাঁত, আর পিছু দেখবার সময়ই পেলনা'।[৮] বুড়ো নয়নখুঁড়ো আর পবন মাঝি দেখল মাংসের লোভে হরিণের পিছু ধাওয়া করতে গিয়ে গদাধর কেমনভাবে নিজেই বাঘের সুস্বাদু মনোরম মাংসে পরিণত হল। মাংসের গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে গদাধরের দেহটা ক্রমশ মিলিয়ে গেল গভীর অরণ্যের অভ্যন্তরে।

উৎপলেন্দু মন্ডল তাঁর 'নিয়তি' গল্পে ব্যক্ত করেছেন হিংস্র জন্তুর আক্রমণে বিপন্ন মানুষের জীবনের বেদনাদায়ক ছবি। কথাকারের বাস্তবতাবোধ গল্পটিকে অসামান্য রূপ দান করেছে। তাঁর নিপুণ আঁচড়ে পাই- "বনমালির ছোটছেলে তপন গলুইয়ে পা ঝুলিয়ে

বসে। ছেলেটার বড্ড সাহস। জলে এখন কামোট কুমির, তা ছেলের ভয় আছে? সামনের দিকে তাকায়-দূরে মরিচঝাঁপি-কালোছায়া মতো। তার উপরে ছাই রঙের মেঘ। সামনে আমাবাজি। আমাবাজির পর থেকে আকাশ ঢালবে। মেঘগুলো কুণ্ডলী পাকায়। সাগরের দিকে রামধনু দিয়ে জল তোলে। তপন হাঁ করে সেদিকে তাকিয়ে থাকে''।[৯] এই তপনকেই এক সময় মরিচঝাঁপির জঙ্গল থেকে বাঘে তুলে নিয়ে যায়। গল্পের শেষে বনমালীর ছেলে আশুও বাঘের কবলে পড়ে। দুইপুত্রকে হারিয়ে বনমালীর সমগ্র পৃথিবী যেন স্তব্ধ হয়ে যায়। তার চোখে নেমে আসে অমাবস্যার কালোছায়া।

'ব্যাঘ্রশাবক' এক ভিন্ন ধারার গল্প। লেখক বিপ্রদাস বড়ুয়া সুন্দরবনের বাঘিনী ও এক বনওয়ালীর স্ত্রীর মানসস্তর এবং সন্তান আকাঙ্খাকে একাকার করে দেখিয়েছেন তাঁর সৃষ্ট গল্পের মধ্য দিয়ে। ব্যাঘ্রশাবক শিকার আলোচ্য বিষয় হলেও লেখকের মূল বক্তব্য তিনি উল্লেখ করেছেন গল্পের শেষ পর্বে যেখানে লাল বাওয়ালি বাড়িতে বাঘের বাচ্চা নিয়ে এলে তার বউ বলে ওঠে 'তুমি কি মানুষ? মায়ের বুক খালি করে দুধের বাচ্চা দুটি চুরি করে নিয়ে এসেছ? নিজের বাচ্চাদের কথা পরিবারের কথা একবারও মনে হইল না? মায়ের দুধ ছাড়া বাঁচবে কেমন করে?'[১০] লাল বাওয়ালি ঘুমোলে স্ত্রী নয়নতারা আহাবকে নির্দেশ দেয় বাঘের বাচ্চাগুলো যেখান থেকে নিয়ে আসা হয়েছে সেখানে যেন ফেরত দিয়ে আসে। অর্থাৎ বাঘিনী এবং নয়নতারা দুজনেই তো সন্তানের মা, তাই লেখক বাঘিনী মায়ের সন্তান হারানোর কষ্টকে মানুষরূপী মায়ের মায়া মমতার সাথে এক করে দেখিয়েছেন। জয় হয়েছে মনুষ্যত্বের।

'পশর নদীর গাঙচিল' গল্পটি রচনা করেন আল মাহমুদ। দুই মুখ্যচরিত্র রতন ও কর্পূরীর বাঁচার লড়াইয়ের গল্পই প্রধান বিষয়বস্তু। সরকার যেদিন বনপাহারার জন্য পোষ্ট বসিয়েছে সেদিন থেকেই সুন্দরবনে লুঠপাঠ শুরু হয়েছে। বাঘ আর হরিণ শিকার বন্ধ হওয়ায় এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ঠিকই, তবে সুন্দরবনকে বাঁচিয়ে রাখে যে ম্যানগ্রোভ অরণ্য সেই গাছগুলিই একটু একটু করে নির্বংশ হচ্ছে।[১১] ছাগলচোরদের জাহাজ থেকে কর্পূরী সামর্থ্য অনুযায়ী জিনিসপত্র চুরি করে ব্লাউজে বেঁধে নেয়। শাড়ি তার আগের মতোই নদীর জলে ভেসে গিয়েছিল। রতন দেখে তার গায়ে কাপড় নেই। সাহসিকতার জন্য রতন কর্পূরীকে বাদার বাঘিনী বলে সম্বোধন করে। পালাতে গিয়ে তারা ছাগলচোরদের জাহাজ থেকে সিটির আওয়াজ শুনতে পায়। রতন ও কর্পূরী দুজনে জোরে বৈঠা মারে- টালাইটা হালকা পালকের মতো পশর নদীর উপর লাফিয়ে উঠে করমজল খাঁড়ির দিকে এগোতে থাকে।

লেখক মধুময় পাল 'আর্জান সর্দারের নিশানা' গল্পে সমাজে মুখোশধারী ব্যক্তিদের শ্লেষে বিধ্বস্ত করে লেখেন- ''হ্যাঁ ওখানেই ছিল। ঝোলার ভেতর থেকে আমি দেখেছি। ব্যাটা জলা বোজাবে বলে খুনখারাবির পথ ধরেছে। পাহারাদারকে তো ওই মারল। ভেবেছে আমরা কিছু বুঝি না। সকাল থেকে পরিবেশ নিয়ে লম্বা লম্বা ভাষণ

দিল। তারই মধ্যে প্রমোটারের কাছ থেকে কমিশনের হিসেব বুঝে নিল''।[১২] আর্জান সর্দার জানালা দিয়ে দেখেন স্লোগানধারী ভণ্ডটাকে আর দুই হাতে তুলে নেন বন্দুক। গুলি ছোড়েন ওই মুখোশধারীর উদ্দ্যেশ্যে যে মিছিলে নেতৃত্ব দিচ্ছিল- ''দিচ্ছি না, দেব না। জলা বোজাতে দিচ্ছি না, দেব না। রুখছি, রুখব। প্রোমোটার-ঠিকাদার রুখছি, রুখব''।[১৩] গল্পে কথাকার আর্জান সর্দারকে উপস্থাপন করেছেন সুন্দরবনের প্রাকৃতিক ভারসাম্যের রক্ষক হিসাবে।

হাসান আজিজুল হক এক নরপশুর হাতে মা ও মেয়ের ধর্ষিতা হওয়ার ও তাদের প্রতিবাদের কাহিনী ব্যক্ত করেন 'মা-মেয়ের সংসার' গল্পে। ধর্ষণের ফলে মা ও মেয়ে দুজনেই সন্তানের জন্ম দেয় এবং পালন করে সামাজিক বাধা উপেক্ষা করেই। গল্পের শেষে প্রাকৃতিক দুর্যোগ কমে যাওয়ার পর দেখা যায় বলেশ্বর নদীতে হাজার হাজার মৃতদেহ আর ওই মৃতদেহগুলির মধ্যেই ছিল সেই নরপশুর দেহ যার হিংস্র চেহারা মা ও মেয়ে একরাতে প্রত্যক্ষ করেছিল। হাঙরের খাদ্যহিসাবে লাশগুলি বঙ্গোপসাগরে ভেসে চলে এবং মা ও মেয়ে মানসিক তৃপ্তি পায়। কথাকার অপূর্বভাবে দেখিয়েছেন কীভাবে নারীর কৃত্যে সৃষ্টি চলতে থাকে তার নিয়মে সভ্যতা আরও উন্নত হয়।

মনোরঞ্জন পুরকাইত 'নতুন মাঝি' গল্পে হীরা চরিত্রটিকে সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। হীরা ছোট থেকে মামার বাড়িতে মানুষ। নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সে মামা হরিপদকে বাঁচানোর জন্য নদীতে ঝাঁপ দেয়। হীরার আরও দুই মামা পুলিন ও সুধীর দুইজনেও ঝাঁপ দেয়। তিনজনের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় হরিপদর প্রাণ বাঁচে। আহত হরিপদ যখন সুধীর ও পুলিনকে নতুন মাঝি ঠিক করতে বলেন তখন হীরা নিজেই আনন্দে ও স্বেচ্ছায় সেই দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়। এতে তার তিন মামাই তৃপ্ত হয়। গল্পের সারমর্ম তাই হয়ে ওঠে দায়িত্ববোধের পরিচায়করূপে।

ভারত ও বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী বঙ্গোপসাগরের উপকূল অঞ্চল এবং গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র নদীর মোহনায় গঠিত জল-জঙ্গলাকীর্ণ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব-দ্বীপ সুন্দরবন। যার বাস্তবরূপ হৃদয়ের ভাষা ছোটগল্পের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত যত্নসহকারে লিখেছেন কথাকাররা। আলোচ্য প্রবন্ধে মানুষের বেঁচে থাকার জন্য কঠিন জীবন সংগ্রাম, হিংস্র জন্তুর আক্রমণ, ডাকাতের ভয়, সমাজের মুখোশধারী ব্যক্তিদের নিপীড়ন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও কুসংস্কারে বিধ্বস্ত মানুষ প্রতিনিয়ত লড়াই করে চলেছে তারই বিশ্লেষণ রক্ষিত হল। ভারত স্বাধীন হয়েছে অনেক বছর কেটে গিয়েছে, তারপরেও সুন্দরবনের গ্রামগুলি উন্নত সভ্যতা, সংস্কৃতি, যোগাযোগ, শিক্ষাব্যবস্থা থেকে বিযুক্ত এবং আর্থ-সামাজিক বিচারে দরিদ্র্য ও শ্রমজীবীদের বসতিপূর্ণ অঞ্চল রূপেই গণ্য হয়ে আছে। সেই সঙ্গে কুসংস্কারের প্রতি মানুষের অন্ধবিশ্বাস সমাজকে অনেকটা পিছিয়ে রেখেছে। বর্তমানে সুন্দরবন নিয়ে প্রচুর লেখালেখি চলছে, সুন্দরবন কেন্দ্রিক অনেক সাহিত্য রচনা হয়েছে যা পাঠক মহলের কাছে বেশ সমাদৃত হয়।

সূত্র নির্দেশ:

১. শচীন দাশ, জল, জঙ্গল ও জনজীবনে সুন্দরবন, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৭, পৃঃ ১৫
২. তদেব, পৃঃ ১৬
৩. তদেব, পৃঃ ১৭
৪. মহাশ্বেতা দেবী, 'বেহুলা', দেবপ্রসাদ জানা(সম্পাদিত), কথা সুন্দরবন, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৮, পৃঃ ২৫
৫. প্রফুল্ল রায়, 'বাঁচার জন্য', তদেব, পৃঃ ৪৬
৬. সাধন চট্টোপাধ্যায়, 'পটভূমি বদলে যায়', তদেব, পৃঃ ৯৫
৭. ভগীরথ মিশ্র, 'কুয়েল', তদেব, পৃঃ ১১১
৮. তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'হরিণের মাংস', তদেব, পৃঃ ১৭৭
৯. উৎপলেন্দু মন্ডল, 'নিয়তি', তদেব, পৃঃ ২৬৪
১০. বিপ্রদাস বড়ুয়া, 'ব্যাঘ্রশিকার', তদেব, পৃঃ ১২২
১১. আল মাহমুদ, 'পশর নদীর গাঙচিল', তদেব, পৃঃ ৫৩
১২. মধুময় পাল, 'আর্জান সর্দারের নিশানা', তদেব, পৃঃ ২৪৪
১৩. তদেব, পৃঃ ২৪৪

সুভাষচন্দ্রের রাজনীতি: চিন্তা ও কর্মের অনন্যতা

স্বরাজ বক্সী
গবেষক, মানবীবিদ্যা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
শর্মিলা রায়
গবেষক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ: বাঙালি জনজীবন তো বটেই এমনকি সমগ্র ভারতবাসীর হৃদয়ে সুভাষচন্দ্রের অস্তিত্ব উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায়। কর্মজীবন যাঁর দুঃসাহসিক রোমান্টিকতায় উজ্জ্বল তাঁর নিকট তাত্ত্বিক উপস্থাপনা কিছুটা ক্ষীণ হওয়াটাই স্বাভাবিক। গান্ধীজি, নেহেরু, মানবেন্দ্রনাথ প্রমুখ সুভাষচন্দ্রের সমসাময়িক চিন্তাবিদগণ রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে যে নিজস্ব তত্ত্ব উপস্থাপন করেছিলেন, সেই দিক থেকে সুভাষচন্দ্র তাঁদের সমগোত্রীয় ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন রাজনৈতিক কর্মী। দেশপ্রেম ছিল তাঁর জীবনের উজ্জ্বলতর দিক। তা সত্বেও দর্শনশাস্ত্রের একজন ছাত্র হিসেবে সমসাময়িক দেশ-বিদেশের রাষ্ট্র দার্শনিকদের মতাদর্শের দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন। আর এই প্রভাবের প্রতিফলন হিসেবে কিছুটা বিচ্ছিন্নভাবে হলেও তাঁর বিভিন্ন রচনা, পত্র-পত্রিকা এবং বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে নিজস্ব রাষ্ট্রচিন্তার একটা রূপরেখা ফুটে ওঠে। সুভাষচন্দ্রের রাষ্ট্রচিন্তার সেই রূপকেই বর্তমান প্রবন্ধে তুলে ধরার ক্ষুদ্রতর চেষ্টা করা হয়েছে মাত্র, যা একপ্রকার স্পর্ধা প্রদর্শনের পর্যায়ভুক্ত। স্পর্ধা প্রদর্শনের পর্যায়ে পড়ার কারণ এই যে, স্বয়ং শাহনওয়াজ খান নেতাজির মতো একজন মহাবিপ্লবী সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর নিজের কথায় "...আমার ভয় হয়- অক্ষম আমার লিখনী বুঝি আমার নেতাজীর মহিমা ম্লান করে ফেলে।...যাঁর কথা বলতে যাচ্ছি, তিনি এতো মহান যে আমার মতো একজন সাধারণ সৈনিকের পক্ষে তাঁর যথাযথ বর্ণনা করা সত্যিই সম্ভব নয়।"[১]

সূচক শব্দ: জাতীয় কংগ্রেস, মার্কসবাদ, নাৎসিবাদ, সমাজতন্ত্র, ফ্যাসিবাদ, সমন্বয়বাদ, স্বদেশ মুক্তি।

মূল প্রবন্ধ:

"নহ তুমি ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ ভীম, নহ যুধিষ্ঠির
গীতামন্ত্র শুনিবার একমাত্র যোগ্য তুমি বীর।
এ যুগে গণ্ডীবী তুমি তুমি মহারথ,
তোমা বক্ষে ধরি ধন্য এ মহাভারত।"[২]

কালিদাস রায় প্রণীত *'সুভাষ তর্পণ'* কবিতায় উদ্ধৃত এই পংক্তিই সুভাষচন্দ্রের মহাবিপ্লবী সুলভ বাক্তিত্ব বর্ণনার উজ্জল দৃষ্টান্ত। সমকালীন ভারতবর্ষ ও বৈশ্বিক আঙিনাতে সুভাষচন্দ্রের মতো বর্ণময় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের নজির বিরল। তাঁর নিজস্ব

উৎকৃষ্ট বোধশক্তি ও আত্মবিশ্বাসকে অবলম্বন করে তিনি দুই দশকের রাজনৈতিক কর্মবৃত্তের প্রতিটি ক্ষেত্রেই নিজস্ব চিন্তাধারায় উজ্জ্বল করে রেখেছিলেন। সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক মত ও পথ নিয়ে সমকালীন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে শত বিতর্ক থাকলেও তাঁর জ্বলন্ত দেশপ্রেম থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন রাজনৈতিক উদ্যোগের জন্য সকল জনসাধারণের মনে ছিল তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি। শুধু সমকালীন ভারতবর্ষই নয়, স্বাধীনতার পরবর্তীকাল থেকে বর্তমান অবক্ষয়মুখী সমাজ ও রাজনীতির প্রেক্ষিতে সুভাষচন্দ্রের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি শুধু অক্ষুন্নই নয়, তা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক চিন্তার বৌদ্ধিক প্রেক্ষাপট:

সরাসরি সুভাষচন্দ্রের রাষ্ট্রদর্শন বিষয়ে আলোচনার পূর্বে রাষ্ট্রচিন্তায় তাঁর বৌদ্ধিক প্রেক্ষাপটের আলোকপাত একান্ত প্রয়োজন। তাঁর রাষ্ট্রদর্শনের বৌদ্ধিক প্রেক্ষাপটকে দুটি আঙ্গিকে আলোকপাত করা যায়। প্রথমটি দেশীয় প্রেক্ষাপট এবং দ্বিতীয়টি বৈদেশিক প্রেক্ষাপট।

সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক চিন্তার সূত্রপাত ঘটে ভারতীয় আধ্যাত্ম দর্শনের মধ্যে দিয়ে। তাঁর আধ্যাত্মিক জ্ঞানার্জনে শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ এবং তাঁর রাজনৈতিক গুরু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ভূমিকা অপরিসীম। সুভাষচন্দ্রের মতে, শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্ম সমন্বয়ের তত্ত্ব ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিকাশে দৃঢ় ভিত্তি গড়ে তুলেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য বিবেকানন্দের বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে সমন্বয়ের ধারণা সুভাষচন্দ্রকে প্রভাবিত করেছিল। তিনি বিবেকানন্দের ধর্ম ও জাতীয়তাবাদের মধ্যে সমন্বয়ের ধারণাকে শুধু মতাদর্শের ক্ষেত্রেই নয়, প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াশোনার সময় এর বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রেও সচেষ্ট হয়েছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের মতো সুভাষচন্দ্র শ্রীঅরবিন্দের কাছ থেকেও সমন্বয়ের ধারণা লাভ করেন। তবে এই সমন্বয়ের ধারণা পূর্বের তুলনায় ছিল অনেক বেশি উন্নততর। সুভাষচন্দ্রের বিচারে শ্রীঅরবিন্দ দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে আত্মা, জড় ও সৃষ্টির মধ্যে এক সমন্বয় সাধন করেন এবং সত্য অর্জনের জন্য ভগবদ্‌গীতায় বর্ণিত বিভিন্ন যোগের মধ্যে মেলবন্ধন করে 'যোগের সমন্বয়' -এর মধ্যে তাকে পূর্ণতা দেন। যোগের সমন্বয়ের মধ্যে দিয়ে শ্রীঅরবিন্দ দেখাতে চেয়েছিলেন কিভাবে বিভিন্ন যোগের সঠিক সমন্বয়ের অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে ধাপে ধাপে সর্বোচ্চ সত্যে উপনীত হওয়া যায়।[৩] শ্রীঅরবিন্দের সমন্বয়ের তাত্ত্বিক ধারণা সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র সাময়িকভাবে সমৃদ্ধ হলেও, পরবর্তীকালে তত্ত্ব নির্ভর এই মতাদর্শ থেকে তিনি সরে আসেন, যার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে ২৫শে ডিসেম্বর নিখিল ভারত যুব কংগ্রেসের অধিবেশনে সুভাষচন্দ্রের ভাষণে। এই ভাষণে শ্রীঅরবিন্দের দর্শন সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, "এইসব চিন্তাধারা যে- নিষ্ক্রীয়তার, দার্শনিক নয় প্রকৃত, জন্ম দেয় তারই বিরুদ্ধে আমার প্রতিবাদ। আমাদের এই পবিত্র ভূমিতে আশ্রম কোনও নতুন প্রতিষ্ঠান

নয় এবং সাধু এবং যোগীরাও অভিনব কোনও চরিত্র নন; সমাজে তাঁরা শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং থাকবেন। কিন্তু একই সঙ্গে স্বাধীন, সুখী এবং মহান এক নবীন ভারত সৃষ্টি করতে হলে তাঁদের নেতৃত্ব অনুসরণ করলে আমাদের চলবে না।”[৪]

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার প্রায় প্রথম থেকেই তাঁর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার শরিক হয়ে ওঠেন সুভাষচন্দ্র। আর এই অভিজ্ঞতাই ছিল রাজনীতিতে সুভাষচন্দ্রের সক্রিয়তার সূচনা। এই পথ ধরেই তরুণ সুভাষচন্দ্র রাজনৈতিক গুরু হিসেবে নির্দ্বিধায় অনুসরণ করেছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশের মত ও পথকে। সুভাষচন্দ্রের বিশ্লেষণে, “জাতি গঠনের পথে প্রথম সোপান প্রকৃত মানুষ গড়া এবং দ্বিতীয় সোপান সংগঠন। বিবেকানন্দ এবং অন্যান্যরা মানুষ গড়ার চেষ্টা করেছেন, আর দেশবন্ধু চেষ্টা করেছেন সংগঠন তৈরী করতে এবং তিনি এমন এক সংগঠন তৈরী করেছেন যা এমনকি ব্রিটিশদেরও প্রশংসা অর্জন করেছে।”[৫] চিত্তরঞ্জন দাশের সমন্বয়ের (Synthesis) ধারনার প্রতিও সুভাষচন্দ্র বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। অর্থাৎ, চিত্তরঞ্জন দাশ এক ও বহুর মধ্যে সমন্বয়ের যে বাস্তব চেষ্টা করেছিলেন, সেটাই সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দরিদ্রের সেবা ঈশ্বরেরই সেবা- চিত্তরঞ্জন দাশের এই বক্তব্যের মধ্যে সুভাষচন্দ্র সমাজতন্ত্রের আদর্শ প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

সুভাষচন্দ্রের রাজনীতি চিন্তার সূত্রপাত ভারতীয় মনীষীদের মতাদর্শ ও সান্নিধ্যের মাধ্যমে হলেও পাশ্চাত্য দর্শনের শ্রেষ্ঠ উপাদানসমূহ গ্রহণের ক্ষেত্রেও তিনি সমান আগ্রহী ছিলেন। কলকাতায় কলেজে পড়ার সময়কাল থেকেই তিনি জার্মান ও ফরাসি দর্শন এবং উদারনীতিবাদের দ্বারা প্রভাবিত হন। ১৯৩০ -এর দশকে বেশ কয়েকবার ইউরোপে থাকার সুবাদে তিনি মার্ক্স-এঙ্গেলস ও বের্গসঁ -এর চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হন। এর সঙ্গেই আতাতুর্ক, লেনিন, মুসোলিনি, ডি. ভ্যালেরা প্রমূখ রাষ্ট্রনায়কের চিন্তাভাবনা তাঁর মনে বেশ প্রভাব বিস্তার করে।

কান্টের দর্শন সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের ব্যাখ্যা ছিল, একটি বিষয়কে আপাতভাবে সত্য হিসেবে ধরে নিয়ে তাকে বারংবার বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে নিম্নতর সত্য থেকে উচ্চতর বা উৎকৃষ্টতর সত্যে উপনীত হওয়া সম্ভব। আবার হেগেলের দ্বন্দ্ব প্রক্রিয়ার দ্বারাও সুভাষচন্দ্র প্রভাবিত হয়েছিলেন। বাদ, প্রতিবাদ এবং সম্বাদের প্রয়োগ তিনি ঘটিয়েছিলেন তাঁর রচনায়। যেমন- কংগ্রেসের মধ্যে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীদের মধ্যে বিতর্ক বিষয়ে সুভাষচন্দ্রের বক্তব্য ছিল যে, এই দ্বন্দ্ব সাময়িক এবং বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়ে এই দ্বন্দ্বের অবসান ঘটবে এবং সমগ্র আন্দোলনটি বামপন্থীদের দ্বারা পরিচালিত হবে। জার্মান দার্শনিক ফ্রিডরিশ নীৎসের ‘অতিমানব তত্ত্ব’ সুভাষচন্দ্রকে প্রভাবিত করেছিল। ফরাসি দার্শনিক আঁরি বের্গ্ সঁ -এর ‘Creative Evolution’ (1907) গ্রন্থটি মধ্যপ্রদেশের সিওনি সাব-জেলে থাকার সময় তিনি অধ্যায়ন করেছিলেন। এই গ্রন্থে বর্ণিত “elan vital” বা “প্রেরণাদায়িনী শক্তি” -এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যুবকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন, “এই শক্তিই সমগ্র জাতিকে কর্মের পথে উন্নতির পথে

সঞ্চালিত করে। এবং ভারতের জাতীয় জীবনে প্রেরণাদায়িনী শক্তি হল, স্বাধীনতার জন্য, সম্প্রসারণের জন্য, আত্ম-বিকাশের জন্য ভারতীয় জনগণের ঐকান্তিক আগ্রহ।"[৬] সর্বোপরি সমাজবাদের প্রতি তিনি পরিচিত হন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সময় থেকেই, যখন রুশ বিপ্লব এবং রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন চলছিল।
তবে বিবিধ চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসলেও সুভাষচন্দ্র নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি বা মতাদর্শের দাসত্ব গ্রহণ করেননি। অর্থাৎ, কোন একটি রাষ্ট্রদর্শনকে পাথেয় করে তিনি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের পক্ষপাতী ছিলেননা। রাষ্ট্রদর্শন সম্পর্কে তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতা, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তিনি শেষ মুহূর্তে নিজের মত ও পথকেই মর্যাদা দিয়েছেন।

সুভাষচন্দ্রের রাষ্ট্রচিন্তার বিবর্তন:

সুভাষচন্দ্রের রাষ্ট্রচিন্তার বিবর্তন প্রক্রিয়াকে মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথমটি, সমাজতন্ত্র বিষয়ে তাঁর নিজস্ব চিন্তাভাবনা, দ্বিতীয়ত, ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে তাঁর দ্বৈত ধারণা এবং সবশেষে উভয় মতবাদের সমন্বয়ী রূপের বিশ্লেষণ।

সুভাষচন্দ্র সমাজবাদ সম্পর্কে কোন তাত্ত্বিক গ্রন্থ বা প্রবন্ধ রচনা করেননি। রাজনৈতিক কর্মজীবনে বিভিন্ন বক্তৃতায় ও আলোচনায় ভারতীয় সমাজবাদ সম্পর্কে তাঁর স্বতন্ত্র ধারণার আভাস পাওয়া যায়। সুভাষচন্দ্রের মতে, ভারতীয় সমাজবাদ পাশ্চাত্য থেকে আমদানি করা কোন তত্ত্ব ছিল না। তাঁর যুক্তিতে, ভারতীয় সমাজবাদের আদর্শ নিহিত ছিল প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ও রাজনীতি মধ্যে। প্রাচীন ভারতীয় সমাজবাদের এই ধারণায় উনিশ শতকে নবজাগরণের সময় রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে পরিগণিত হয়। সুতরাং, সমাজবাদের একজন প্রবক্তা হিসেবে সুভাষচন্দ্র নিশ্চিত ছিলেন যে ভারতবর্ষ মুক্তি লাভ করবে সমাজবাদের হাত ধরে। তবে এই সমাজবাদ হবে ভারতীয় নিজস্ব সমাজ-সভ্যতা-সংস্কৃতির দ্বারা পরিপুষ্ট। এই উদ্দেশ্যেই ভারতবর্ষে বিদ্যমান শ্রমিক আন্দোলনে সমাজবাদে বিশ্বাসী যেসব গোষ্ঠী আছে তাঁদেরকে তিনি তিন ভাগে বিভক্ত করেন: "(১) দক্ষিণপন্থী, যাঁরা 'সংস্কারবাদী কর্মসূচির পক্ষে'; (২) কমিউনিস্ট, যাঁরা 'মস্কোর অনুগত এবং অনুগামী'; এবং (৩) সেই গোষ্ঠী, যাঁরা সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা, কিন্তু যাঁরা চান ভারতের নিজের ধরনের সমাজতন্ত্রের, তার নিজস্ব পদ্ধতির বিকাশ করুক।"[৭] সুভাষচন্দ্র নিজেকে এই তৃতীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করতেন।

১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ১০ই জুন লন্ডনে অনুষ্ঠিত তৃতীয় ভারতীয় রাজনৈতিক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে সুভাষচন্দ্র *'সাম্যবাদী সংঘ'* গঠনের কথা ঘোষণা করেন এবং তাঁর কর্মসূচীও প্রচার করেন:

“১. পার্টি দাঁড়াবে কিষাণ-মজদুরদের স্বার্থ নিয়ে, স্থিত স্বার্থ (vested interest) অর্থাৎ জমিদার, পুঁজিদার ও মহাজন শ্রেণীর স্বার্থ নিয়ে নয়।
২. ভারতীয় জনগণের পূর্ণ রাষ্ট্রিক ও আর্থিক মুক্তির জন্য এই পার্টি দাঁড়াবে।
৩. এর আদর্শ হবে সর্বভারতীয় একটা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার, কিন্তু ভারতবর্ষকে নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্য কিছুদিন অন্তত একনায়ক ক্ষমতাসম্পন্ন একটা শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন প্রবর্তন করতে হবে।
৪. কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রবর্তিত পরিকল্পনা ও পুনর্গঠন।
৫. অতীতের গ্রাম পঞ্চায়েতের ভিত্তিতে নূতন সমাজ-ব্যবস্থা এবং জাতিভেদ প্রভৃতির উচ্ছেদ।
৬. আধুনিক প্রণালীর মুদ্রানীতি এবং মহাজনী ব্যবস্থা।
৭. জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ এবং সর্বভারতীয় নূতন ভূমিব্যবস্থা।
৮. অরাজকতা দমন করে স্বাধীন ভারতের ঐক্য অখন্ডতা বজায় রাখবার জন্য মধ্য-ভিক্টোরীয় গণতন্ত্র নয়, সামরিক নিয়মানুবর্তিতা দ্বারা আবদ্ধ শক্তিশালী একদলীয় সরকার।
৯. আন্তর্জাতিক প্রচার এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সাহায্য গ্রহণ।
১০. একটি জাতীয় কর্মপরিষদের অধীনে সবগুলি অগ্রগামী দলের ঐক্যের চেষ্টা, যাতে কাজের সময় বহু ফ্রন্টে একই কালে কাজ করতে পারে।”[৮]

সমাজবাদ সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের ধারণা পরিপূর্ণ রূপ লাভ করে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে হরিপুরা কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণে। এই ভাষণে স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষের সমাজ পুনর্গঠনের লক্ষ্যে তিনি দেশের বিবিধ সমস্যার সমাধানের জন্য সমাজবাদী পথ অবলম্বনের কথা বলেছিলেন এবং এই সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার পর প্রথমেই পরিকল্পনা কমিশন গঠনের পরামর্শ দিয়েছিলেন। হরিপুরা কংগ্রেসে প্রদত্ত এই ভাষণে পরিপূর্ণ সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার আভাস পরবর্তীকালে বিভিন্ন বক্তৃতায় প্রকাশ পেতে থাকে। ত্রিপুরী কংগ্রেসে দ্বিতীয়বার সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর কংগ্রেসের অভ্যন্তরে অসহযোগিতার কারণে তিনি সভাপতির পদত্যাগ করেন এবং কংগ্রেসের মধ্যে সকল আপোষ বিমুখ, বামপন্থী মনোভাবাপন্ন সদস্যদের নিয়ে একটি প্রগতিশীল সমাজবাদী পার্টি গঠনের আহ্বান জানান এবং পরবর্তীকালে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ৩রা জুন ‘ফরওয়ার্ড ব্লক’ দল গঠন করেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে উচ্ছেদের লক্ষ্যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে সুভাষচন্দ্র দেশত্যাগ করে কাবুলে পৌঁছান। সেই সময় অর্থাৎ ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে ফরওয়ার্ড ব্লকের রূপরেখা তৈরী করেন, যা *‘কাবুল থিসিস’* নামে পরিচিত। এই পরিকল্পনায় তিনি স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা হিসেবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের জনগণ, শ্রমিক এবং কৃষকদের জন্য স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করার কথা বলেন।

পরবর্তীকালে টোকিও ইম্পিরিয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ে আজাদ হিন্দ সরকার ও আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রধান হিসেবে সুভাষচন্দ্র ভাষণ দেন। এই ভাষণে তিনি স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষের পুনর্গঠনে যোজনা ভিত্তিক আর্থসামাজিক বিকাশের জন্য তিনটি বিষয়ের ওপর জোর দেন:

১. স্বাধীনতা-উত্তর ভারত রাষ্ট্রকে পরিপূর্ণভাবে আধুনিক এবং "সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র" হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

২. উৎপাদন ও বন্টন উভয় প্রক্রিয়ার ওপর সামাজিক মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে হবে।

৩. স্বাধীন ভারতবর্ষে যে "নতুন ব্যবস্থা" (New Order) গড়ে উঠবে সেখানে সাম্য ও সামাজিক ন্যায়ের নীতি সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে।[৯]

নির্দিষ্ট কোন মত ও পথের প্রতি সুভাষচন্দ্রের যে অন্ধ আনুগত্য ছিলনা, তা প্রবন্ধের প্রথমভাগেই আলোচিত হয়েছে। ফ্যাসিবাদের প্রতিও এই একই যুক্তি প্রকাশ পায়। ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে যেমন তিনি প্রশংসা করেছেন, তেমনই তার বিরোধিতাও করেছেন। তবে যখন তিনি ফ্যাসিবাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তখন ফ্যাসিবাদ তার মানবসভ্যতা বিরোধী চরম নগ্ন রূপ প্রকাশ করেনি। বরং কিছু সময়ের জন্য এইসব দেশ সমাজতন্ত্রের হাত ধরে চরম কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা ও নিয়মতান্ত্রিকতার সুবাদে নিজ নিজ দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে মজবুত করতে সক্ষম হয়েছিল। তত্ত্বগত দিক থেকে সুভাষচন্দ্রের চিন্তায় এমন কিছু উপাদান পরিলক্ষিত হয় যা সরাসরি ফ্যাসিবাদকে সমর্থন করে। অধ্যাপক তরুণ কুমার বন্দোপাধ্যায়ের *'নেতাজী সুভাষচন্দ্রের রাষ্ট্রদর্শন'* গ্রন্থে এই উপাদানগুলি সুশৃঙ্খলভাবে বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে প্রধান কয়েকটি উপাদান হল:

১. ফ্যাসিবাদের দক্ষতা ও শৃঙ্খলাপরায়ণতার নীতির সার্বিক সমর্থন;

২. জার্মান দার্শনিক নীৎসের 'অতিমানব তত্ত্ব' -এর প্রতি আকর্ষণ;

৩. তাৎক্ষণিক লক্ষ্য হিসেবে ভারতবর্ষের জন্য একটি স্বল্পকালীন সর্বক্ষমতাসম্পন্ন কেন্দ্রীয় সরকারপ্রতিষ্ঠা;

৪. সমাজবাদী ভিত্তিতে আর্থনীতিক সংস্কার সাধনে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তে সার্বিক ক্ষমতা সম্পন্ন রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠনের প্রস্তাব;

৫. মুসোলিনির সঙ্গে সাক্ষাৎ (এপ্রিল, ১৯৩৪) হওয়ার পর ফ্যাসিবাদের অনেক গুণাবলীর জন্য ওই মতাদর্শের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ।[১০]

ফ্যাসিবাদের প্রতি প্রথমদিকে সুভাষচন্দ্র সমর্থন জ্ঞাপন করলেও পরবর্তীকালে ফ্যাসিস্ট নায়ক হিটলার সম্পর্কে তিনি বিরূপ ধারণা পোষণ করতেন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে প্রকাশিত একটি রাজনৈতিক বিশ্লেষণে তিনি হিটলারের অধিনস্ত জার্মানিকে 'নাৎসি দানবের আবির্ভাব' বলে বর্ণনা করেছেন। আবার হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতির

ভাষণে তিনি ফ্যাসিবাদের বিরোধিতা করে ভারতবর্ষে অন্যান্য দলের নিষিদ্ধকরণের বিপক্ষে মত প্রকাশ করেন এবং কংগ্রেসের গণতান্ত্রিক গঠনতন্ত্রকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। এই ভাষণেই তিনি ফ্যাসিবাদ এবং উগ্রজাতীয়তাবাদকে সমার্থক হিসেবে বিবেচনা করেছেন।ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের এই আপাত সমালোচনা সত্ত্বেও ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে দেশ ত্যাগের পরবর্তী সময়কাল থেকে ফ্যাসিবাদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা অটুট থাকে। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ দানের সময় *'সমন্বয়বাদ'* -এর ব্যাখ্যা দান কালে ফ্যাসিবাদের গুণাবলীর প্রতি তাঁর সমর্থন প্রকাশ পায়।

সমন্বয়বাদ সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের বৌদ্ধিক চিন্তার বিকাশ সম্পর্কে উক্ত প্রবন্ধে পূর্বে আলোচিত হয়েছে। তবে এটা স্পষ্ট যে সুভাষচন্দ্রের রাজনীতি চিন্তায় সমন্বয়বাদের গুরুত্ব বরাবরই ছিল। সমন্বয়বাদ বিষয়ে শুরুর দিকে বিভিন্ন মতবাদ ও বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করাই ভারতবর্ষের লক্ষ্য হবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। তাঁর যুক্তিতে কোন মতবাদই সম্পূর্ণ অভ্রান্ত হতে পারেনা এবং স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে একই মাপকাঠিতে সেই মতবাদের সার্বিক প্রয়োগও সম্ভব নয়। এইজন্য কালের বিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর উৎকৃষ্টতর অংশগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমেই গড়ে উঠবে প্রকৃত উৎকৃষ্টমানের রাষ্ট্রদর্শন। সমন্বয়বাদ সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের এই অভিমত প্রকাশ পায় ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষণে। এই ভাষণে তিনি বলেন, "কোন একটি বিশেষ ব্যবস্থা যে মানবপ্রগতির চূড়ান্ত পর্যায় স্বরূপ, এ-কথা বলা মূর্খতারই নামান্তর। কারণ, যেহেতু মানবপ্রগতি বিরামহীন, সেজন্য অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই মানুষকে নতুন ব্যবস্থার সৃষ্টি করে নিতে হয়। অতএব, ভারতবর্ষে তাই আমরা পরস্পরবিরোধী ব্যবস্থাসমূহের একটা সমন্বয়সাধন করতে চেষ্টা করব। বিরোধী ব্যবস্থাসমূহের কল্যাণকর বিষয়গুলির সেখানে মিলন ঘটবে।"[১১]

সমন্বয়বাদের বাস্তব রূপ নির্ধারণের ক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্র সাম্যবাদ এবং ফ্যাসিবাদের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেছেন। এই বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে তিনি সাম্যবাদ এবং ফ্যাসিবাদের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য যেমন খুঁজে পেয়েছেন, তেমনই বৈসাদৃশ্যও তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। এই দুই দৃষ্টিভঙ্গীর সাদৃশ্য হিসেবে তিনি দেখিয়েছেন যে, উভয় দৃষ্টিভঙ্গীই একনায়কতন্ত্রী এবং গণতন্ত্র বিরোধী এবং একই সঙ্গে পুঁজিবাদেরও বিরোধী। উভয় মতবাদই জনসাধারণের উপর রাষ্ট্রীয় প্রাধান্য বজায় রাখতে চায় এবং একদলীয় শাসনে বিশ্বাস করে। উভয়েই বিরোধী মতবাদ পোষণকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিলোপ সাধনের পক্ষপাতী। আবার এই সাদৃশ্য সত্বেও সুভাষচন্দ্র সাম্যবাদ এবং ফ্যাসিবাদের মধ্যে বৈসাদৃশ্যও খুঁজে পেয়েছেন। যেমন- "জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বিধানে এবং জনগণের অবস্থার উন্নতি সাধনে ফ্যাসিজম সফল হলেও, ধনবাদের ওপর যে আর্থনীতিক সমাজ গড়ে উঠেছিল, ওই রাষ্ট্রব্যবস্থা তার আমুল

সংস্কার সাধনের সমর্থ হয়নি। পক্ষান্তরে, 'পরিকল্পিত অর্থনীতি'র প্রবর্তন ও প্রয়োগ সাফল্য লাভ করলেও সোভিয়েত রাশিয়া 'জাতীয় মনোভাব' -এর মূল্য দেয়না।"[১২]

সুভাষচন্দ্রের বক্তব্য অনুসারে, ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে সাম্যবাদ এবং ফ্যাসিবাদের মধ্যে যেকোন একটিকে গ্রহণ করলে তা হবে মারাত্মক ভুল। কারণ, ভারতবর্ষের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, প্রাতিষ্ঠানিক প্রভৃতি প্রেক্ষাপটে এই দুটি মতবাদের যথাযথ সার্থকতা বিবেচনা করে তারপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত। সুতরাং, সাম্যবাদ এবং ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের সিদ্ধান্ত ছিল, এই দুটি মতবাদের মধ্যে যে কল্যাণকর দিকগুলি রয়েছে সেগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হবে এবং ভারতবর্ষের কাজ হবে এই সমন্বয়কে রূপ দান করা। এমনকি সুভাষচন্দ্র মনে করতেন, 'জাতীয় সমাজতন্ত্র এবং সাম্যবাদ' -এর সমন্বয় সাধনের মাধ্যমেই ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শন গড়ে উঠবে। মূলকথা হল সুভাষচন্দ্র কখনই বিশেষ কোন সমাজবাদী দৃষ্টিভঙ্গীকে অন্ধ অনুসরণ করেননি। তাঁর সমকালীন অর্থাৎ ১৯৩০ -এর দশকে প্রচলিত যে সমাজবাদী চিন্তাসমূহ, যেমন-মার্কসবাদ, ফ্যাসিবাদ, নাৎসিবাদ, গণতান্ত্রিক সমাজবাদ প্রচলিত ছিল, সেইগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে নিজস্ব সমাজবাদী মতাদর্শ গড়ে তুলেছিলেন এবং তার নাম দিয়েছিলেন 'সাম্যবাদ'।

চিরতরুণ এই মহাবিপ্লবীর রাজনীতি চিন্তার প্রজ্ঞা নিহিত রয়েছে স্বদেশ মুক্তির ভাবনার মধ্যে। তাঁর রাজনৈতিক জীবনবেদ সম্পৃক্ত হয়েছিল তীব্র, নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমের মধ্যে দিয়ে। পরাধীন স্বদেশের রাজনৈতিক মুক্তির প্রশ্নে তিনি বিভিন্ন মতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেও গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে গড়ে তুলেছিলেন স্বতন্ত্র রাজনৈতিক মত ও পথ। তাঁর বিচারে পরাধীন দেশের জন্য যদি কোন মতবাদকে সর্বান্তকরণে গ্রহণ করতে হয়, তাহলে সেটা হওয়া উচিত 'জাতীয়তাবাদ'। রাজনীতি সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের এই নিজস্ব চিন্তাধারার মধ্যেই নিহিত রয়েছে অনন্যতার নিদর্শন।

তথ্যসুত্র:

১. ভদ্র, কালিদাস, (১৪২৫ বঙ্গাব্দ), (সম্পা:), বিশ্বের বিস্ময় নেতাজী সুভাষ, অশোক বুক এজেন্সী, ৩৬বি, কলেজ রো , কলকাতা- ৭০০ ০০৯, পৃ. ৯

২. রায়, কালিদাস, (১৪০৩ বঙ্গাব্দ), সুভাষ তর্পণ, নেতাজি সংখ্যা, 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বর্ষ ৩০, সংখ্যা ২২-২৭, পৃ. ৫২

৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণকুমার, (২৩ জানুয়ারি, ২০০২), নেতাজি সুভাষচন্দ্রের রাষ্ট্রদর্শন: একটি রূপরেখার সন্ধানে, মিত্রম্, ৩৭এ, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা- ৭৩, পৃ. ৯

৪. বসু, শিশিরকুমার, (জানুয়ারি ১৯৯২), (সম্পা:), শ্রী সুভাষচন্দ্র বসু: সমগ্র রচনাবলী, চতুর্থ খন্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা- ৭০০ ০০৯, পৃ. ১৭৩

৫. বসু, শিশিরকুমার, (জানুয়ারি ১৯৯৬), (সম্পা:), শ্রী সুভাষচন্দ্র বসু: সমগ্র রচনাবলী, পঞ্চম খন্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা- ৭০০ ০০৯, পৃ. ১৮

৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণকুমার, (২৩ জানুয়ারি, ২০০২), নেতাজি সুভাষচন্দ্রের রাষ্ট্রদর্শন: একটি রূপরেখার সন্ধানে, মিত্রম্, ৩৭এ, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা- ৭৩, পৃ. ১৩

৭. তাদেব, পৃ. ১৬

৮. গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরেন্দ্রমোহন, (এপ্রিল ১৯৬৮), বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা: রামমোহন থেকে মানবেন্দ্রনাথ, সুবর্ণরেখা, ৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা- ৯, পৃ. ৩৭৬

৯. মুখোপাধ্যায়, অশোক কুমার, (অক্টোবর ২০১৩ সি), (সম্পা:), ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা পরিচয়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ৬এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলকাতা- ৭০০ ০১৩, পৃ. ৪০৪

১০. বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণকুমার, (২৩ জানুয়ারি, ২০০২), নেতাজি সুভাষচন্দ্রের রাষ্ট্রদর্শন: একটি রূপরেখার সন্ধানে, মিত্রম্, ৩৭এ, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা- ৭৩, পৃ. পৃ. ৪৪-৪৫

১১. তাদেব, পৃ. ৩৪

১২. তাদেব, পৃ. ৩৪

মোহাম্মদ রফিকের কবিতা: কাদামাখা মানুষের দুরন্ত স্বদেশ

প্রতাপ ব্যাপারী
গবেষক
সহকারী অধ্যাপক (ডব্লু.বি.ই.এস), বাংলা ভাষা ও সাহিত্য
গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ, শালবনি, পশ্চিম মেদিনীপুর

হাসান হাফিজুর রহমানের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'একুশে ফেব্রুয়ারী' সংকলন ছিল বর্তমান বাংলাদেশের আধুনিক কাব্যকবিতার যাত্রপথের স্মারকস্তম্ভ। দেশভাগ পরবর্তী সময়ে পূর্ব-বাংলা তথা পূর্ব-পাকিস্তানের কবিরা কলকাতাকেন্দ্রিক সাহিত্যের ধারাকে সামনে রেখে একটি নতুন স্বতন্ত্র ধারা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কারণ এই সময়ের পূর্ব-পাকিস্তানের কবিতার ভাষা কী হবে— এই প্রশ্নে সমস্ত কবিসমাজ ছিল সংশয়ে দ্বিধাগ্রস্ত। ইতিপূর্বে পূর্ব-পাকিস্তানের কবিতায় ঘটে গেছে ধর্মীয় মেরুকরণ। ধর্মীয় মদতপুষ্ট রাষ্ট্রিক আনুগত্য লাভের জন্য একদল কবি পাকিস্তান আন্দোলনকে করে তুললেন কাব্যের মূলসুর, অন্যদিকে নদীমাতৃক বাংলাদেশের জনজীবন স্থান পেল অন্যশ্রেণির কবিতায়। কিন্তু এই অন্তঃসারশূন্য গতানুগতিক কাব্যধারায় গা ভাসাতে রাজি হলেন না পঞ্চাশের শিক্ষিত কবিকুল। তাঁরা খুজে নিতে চাইলেন নতুন পথ। এই পথের সন্ধান দিল বাহান্নর ভাষা-আন্দোলন। এই আন্দোলন কেবল রাজনৈতিকভাবে গণতান্ত্রিক চেতনা ও অধিকার অর্জনের পথকে প্রশস্ত করেনি, একই সঙ্গে সমকালীন বাঙালি সংস্কৃতি ও সাহিত্যে বিশেষত কবিতায় আধুনিক ও প্রগতিবাদীধারার বিকাশ ঘটাতেও সাহায্য করেছিল।

পঞ্চাশের বলিষ্ঠ, উজ্জ্বল ও সমৃদ্ধ কবিতা, স্বাতন্ত্র্যে, চারিত্র্যে-চেতনায়, প্রতিবাদে ঋদ্ধ হয়ে বাংলাদেশের আধুনিক কবিতায় বিজয়-কেতন উড়িয়েছিল। এই সময়ের কবিতায় রক্তাক্ত আন্দোলন, অসাম্প্রদায়িক চেতনা, মানবতাবাদী ও আন্তর্জাতিক জীবন-ভাবনা ষাটের কবিতাকে বাধ্য করেছিল ব্যক্তিগত মনোবিশ্বে প্রবেশ করতে। এ প্রসঙ্গে আবদুল মান্নান সৈয়দের বক্তব্য প্রাসঙ্গিক— "পঞ্চাশের কবিদের হাতেই অমাধুনিক কবিদের বিজয় সম্পন্ন হয়েছিলো; ষাটের কবিদের সমস্যা হলো পৃথক হওয়ার সমস্যা— ব্যক্তিচিহ্নিত পৃথক হওয়ার সমস্যা।"[১] এই সময়ের ঘটেছিল দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা— প্রথমত, ১৯৬২-৬৩ সালে বিটনিক কবি অ্যালেন গিন্সবার্গের কলকাতায় আগমন; দ্বিতীয়ত, ১৯৬৪ সালে স্যাড জেনারেশন নামে একটি বুলেটিনের প্রকাশ। এই বুলেটিনে বলা ছিল— "কবিতা এখন জীবনের বৈপরীত্যে আত্মস্থ। সে আর জীবনের সামঞ্জস্যকারক নয়। অতিপ্রজ্য অন্ধ বাল্মীক নয়, নিরলস যুক্তিগ্রন্থন নয়। ...জীবনের কোনো অর্থ বের করার প্রয়োজন শেষ। এখন প্রয়োজন অনর্থ বের করা, প্রয়োজন মেরুবিপর্যয়, প্রয়োজন নৈরাত্মসিদ্ধি। ...মানুষ, ঈশ্বর, গণতন্ত্র এবং বিজ্ঞান পরাজিত হয়ে

গেছে। কবিতা এখন একমাত্র আশ্রয়।”[২] বুলেটিনের ভাষা একথাই প্রমাণ করে যে গতানুগতিক জীবনভাবনাকে দূরে সরিয়ে রেখে, কবিরা প্রথাগত সমাজ-শৃঙ্খলের বন্ধন ভেঙে বোহেমিয়ান জীবনের স্রোতে গা ভাসাতে বদ্ধ পরিকর ছিলেন। সে কারণে কলকাতার শতভিষা, কৃত্তিবাসের মতো ষাটের দশকে ঢাকায় স্বল্পায়ু ‘স্বাক্ষর’, ‘অগত্যা’, ‘সাম্প্রতিক’, ‘কণ্ঠস্বর’, ‘কালবেলা’, ‘সবাক’-কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল এক নতুন সাহিত্য আন্দোলন। এক ঝাঁক তরুণ মেধাবী কবি ও লেখক ছিল এগুলোর প্রাণ-স্পন্দন। তাঁরা ভেঙে দিতে চেয়েছিলেন অতীতের সমস্ত সাহিত্যের ইমেজ। এই সময়ের কাব্যাঙ্গনের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করা হলেন— আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, হায়াৎ মামুদ, আবদুল মান্নান সৈয়দ, আসাদ চৌধুরী, রফিক আজাদ, মোহাম্মদ রফিক, সিকদার আমিনুল হক, ফারুক আলমগীর, নির্মলেন্দু গুণ, আবুল হাসান, আবু কায়সার, হুমায়ুন কবীর, সমুদ্রগুপ্ত, সাযযাদ কাদির প্রমুখ।

মোহাম্মদ রফিক ষাটের এই সমৃদ্ধ কবিকুঞ্জের অন্যতম প্রধান কবি, ব্যক্তিক্রমীও বটে। কারণ মেধা, শ্রম ও মনস্বিতা দিয়ে ষাটের অস্থিরতাকে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি। ষাটের অস্থিরতা, নিঃসঙ্গতা, উন্মূলতা, নৈরাশ্য-নেতি-বিবমিষা, আত্মমগ্নতা, আত্মক্লিষ্টতা, শোক-বিষাদ-আত্মরতি, কাম-ক্রোধ-মোহ-দাহ-মুমূর্ষুতার মোচ্ছবে উৎসর্গিত হলেন না তিনি, চোখ ফেরালেন বাংলাদেশের প্রকৃতি দিকে। নদীমাতৃক বাংলাদেশের জল-কাদার ঘ্রাণ নিলেন তিনি, সন্ধান করলেন স্বকীয় কাব্যভাষা। চিরাচরিত বাংলাদেশের পাঁচালি, লোককথা, পুরাণকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠল তাঁর প্রাথমিক কাব্যজগৎ।

বাংলার জল-মাটি ও সাধারণ মানুষের মুক্তি চেতনার কবি কবি মোহাম্মদ রফিকের জন্ম ১৯৪৩ সালে ২৩ অক্টোবর *বাগেরহাট জেলার বেমরতা ইউনিয়নের বৈটপুর* (বর্তমান চিতলী) গ্রামে। তাঁর পিতা **সামছুদ্দীন আহমদ** এবং মাতা **রেশাতুন নাহার**। আট ভাই-বোনের মধ্যে তিনি জেষ্ঠ্য। কবির শৈশব কেটেছে বাগেরহাটেই। স্থানীয় বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শুরু করলেও পরবর্তীতে পিরোজপুর জেলা স্কুল, বরিশাল ও খুলনা জেলা স্কুলে পড়াশুনা করেন। খুলনা জেলা স্কুল থেকে ১৯৫৮ সালে মাধ্যমিক পাস করেন কবি মোহাম্মদ রফিক। পরে ঢাকার নটর ডেম কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হন। এরপরে ঢাকা কলেজে মানবিক বিভাগে চলে যান। এই সময় কথাসাহিত্যিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়। মূলত তখন থেকেই সাহিত্যে তাঁর উৎসাহ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৬০-এর দশকের প্রারম্ভে সমকাল, কণ্ঠস্বর, স্বাক্ষর, অচিরা ইত্যাদি পত্রপত্রিকায় কবিতা লিখতে থাকেন। ১৯৬১ সালে ইন্টারমিডিয়েট (উচ্চ মাধ্যমিক) পাস করেন। ওই বছরই রাজশাহী সরকারি কলেজে ইংরেজিতে অনার্সসহ স্নাতক শ্রেণীতে ভর্তি হন। পরবর্তীতে অংশ নেন সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনে। সামরিক আইনে তাঁকে দশ বছরের সশ্রম কারাদন্ড দেয় *সামরিক আদালত*। এসময় দিনের পর দিন আত্মগোপন করে, একসময় জেলে যান। প্রেসিডেন্ট *আইয়ুব বিরোধী*

আন্দোলনে থাকার কারণে তাঁকে বহিস্কৃত করা হয় রাজশাহী কলেজ থেকে। পরে, সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে মামলায় জয়লাভ করে পাস কোর্সে বি.এ পাশ করেন ১৯৬৫ সালে। একই বছর ইংরেজী বিষয়ে এম.এ. তে ভর্তি হন *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে*। ১৯৬৭ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৫৮-৫৯ সালে কবি মোহাম্মদ রফিক যুক্ত হন ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে, আইয়ুবি আমলে খুলনা, যশোর, বাগেরহাট এবং পরবর্তীতে বগুড়া এবং রাজশাহী অঞ্চলে ছাত্র ইউনিয়নকে সংগঠিত করেন। ১৯৭১ সালে সক্রিয়ভাবে যোগ দেন মুক্তিযুদ্ধে। যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন ১ নং সেক্টরের হয়ে। অংশ ন্যান স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে। ১৯৭৪ সালের মার্চ মাসে যোগ দেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে। ২৯ জুন ২০০৯ পর্যন্ত দীর্ঘকাল *জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে* শিক্ষকতার পর চাকরী জীবনের অবসরে যান তিনি।[৩]

বৈচিত্র্যময় এই দীর্ঘজীবনে তিনি বরাবর মৃত্তিকালগ্ন থেকেছেন। বাগেরহাটে বাল্য-কৈশোর কেটেছে রফিকের। ছিলেন নৌপথের নিয়মিত যাত্রী। ঘনিষ্ঠভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন নদীর দু'পারের মানুষের জীবনযাত্রা। জল ও কাদায় মাখামাখি করে মানুষের বেড়ে উঠা, পূর্ণতালাভ, নদী ও নৌকা, মাঝিদের জীবন-জীবিকা এবং সেইসব প্রান্তিক মানুষদের নদীকেন্দ্রিক ইতিহাস তাঁর বোধের গভীরে স্থান করে নিয়েছিল সহজেই। শৈশব-স্মৃতি সম্পর্কে এক সাক্ষাৎকারে কবি জানিয়েছেন— আমার জীবনের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে গ্রামে। আমার প্রতিভার যত সঞ্চয় সব গ্রামেই। এখনও ফিরে তাকালে গ্রামের ঐসব সময়ের স্মৃতি আমাকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। আমার বেড়ে ওঠা বৈটপুরে। ইদানিং অবশ্য বছরে একবার যাওয়া হয়, সুযোগ পেলেই যাই, এই যাওয়াতে অনেক আনন্দ উপভোগ করি। সেখানে ছেলেবেলার সেই উদ্দামতা আর নেই; আছে শুধু স্মৃতির তাড়না। রাস্তায় হেঁটে বেড়ানো, আমলকির সময়ে আমলকির গাছে দুপুর বেলায় আমলকি পারতাম। প্রথম কবিতা লেখার বিষয়টা এখন প্রায় ধূসর স্মৃতি। হয়তোবা বলা যায় কবিতা না লিখে থাকতে পারিনি। নিজেকে অনুভব করতে পেরেছি।"[৪] তবে বাল্যকালে বাগেরহাটের প্রকৃতি কবির চোখে নতুন করে ধরা দিয়েছিল মূলত রবীন্দ্রনাথের কারণে। পিরোজপুর সরকারি উচ্চ-বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণিতে স্কুলের বার্ষিক প্রতিযোগিতায় কবি উপহার পেয়েছিলেন 'চোখের বালি' উপন্যাসটি। এইসময় পাঠ্যবইতে রবীন্দ্রনাথের 'ছুটি' গল্পের বালক ফটিকের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়েছিলেন কবি। পরবর্তীতে এই রবীন্দ্রসাহিত্যই তাঁর জীবন-দর্শনকে প্রভাবিত করেছিল অনেকখানি। তিনি ২০০৫ সালে প্রকাশিত 'আমার রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে জানাচ্ছেন— "বাবাও উৎসাহিত করতে লাগলেন রবীন্দ্রনাথ পাঠে। ...যেখান থেকে পড়ি যাই পড়ি— সবই যেন এক কিশোর মনকে তেড়ে নিয়ে যায় তার ভিতরে। তারপর একসময় ছেড়ে দেয় বাইরের পৃথিবীর পথে-ঘাটে, আকাশে-প্রান্তরে। আমি যেন

আর আমাতে রইলাম না। ছড়িয়ে গেলাম সর্বত্র। লিখতে বসলে দেখি একেকটি শব্দ, পুকুরের ঢেউ, নদীর মাছ, হাওয়ার শব্দ গাছের পাতার শিরশির হয়ে ধরা দিচ্ছে আমার কলমে। সে এক অদ্ভুত অনুভবই বটে। আজও মুক্তি মিললো না সেই ঘোর থেকে।"[৫]

মোহাম্মদ রফিক কাব্য নির্মাণে স্বকীয় ধারায় প্রবাহমান। সহজাত বর্ণনভঙ্গি ও লোকজ-পুরাণের সার্থক ব্যবহার আমাদের মুগ্ধ করে। তাঁর শব্দ নির্বাচন ও প্রায়োগিক কৌশল অভিনব। কবিতার দর্পণে বিম্বিত শব্দাবলিতে ফুটে উঠেছে বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনাও। কালের গর্ভ থেকে লোকজ ঐতিহ্যকে কবিতায় তুলে এনে তিনি আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন গ্রামীণ বাংলাদেশের সঙ্গে। ১৯৭০ সালে 'বৈশাখী পূর্ণিমা'র শুভলগ্নে তিনি যে যাত্রা শুরু করেছিলেন, 'ধুলোর সংসারে এই মাটি' থেকেই তার সার্থক অগ্রগমন শুরু হয়েছিল, ক্রমে 'গাওদিয়া' ভ্রমণ করে 'মেঘে ও কাদায়' নিজেকে একাত্ম করে, 'রূপকথা কিংবদন্তি'র পর্ব অতিক্রম করে তিনি 'বিষখালি সন্ধ্যা'য় সাময়িক বিরতি নিলেন, শেষমেষ 'কালাপানি' অতিক্রম করে রচনা করলেন 'মানব পদাবলী'। তাঁর সুবিশাল এই কাব্য পরিসরে নবরূপে চিত্রিত হয়েছে বাঙালির নিজস্ব সাংস্কৃতিক আবহ।

প্রথম কাব্য 'বৈশাখী পূর্ণিমা'তেই কবি বৌদ্ধ-দর্শনকে গ্রহণ করেছেন স্বীয় জীবনদর্শন প্রকাশ করার জন্য। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় এবং পবিত্র অনুষ্ঠান হল বুদ্ধ পূর্ণিমা। এই পুণ্যোৎসব বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে পালন করা হয় বলে একে বৈশাখী পূর্ণিমাও বলা হয়। সংসারী বুদ্ধের সংসার ত্যাগের কাহিনীই এই কাব্যের অবলম্বন। কথিত আছে, একদিন রাজকুমার সিদ্ধার্থ বেড়াতে বের হলে চার জন ব্যক্তির সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। প্রথমে তিনি একজন বৃদ্ধ মানুষ, অতঃপর একজন অসুস্থ মানুষ, এবং শেষে একজন মৃত মানুষকে দেখতে পান। তিনি তাঁর সহিস চন্নকে এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলে, চন্ন তাঁকে বুঝিয়ে বলেন যে এটিই সকল মানুষের নিয়তি। একই দিন কিংবা অন্য একদিন তিনি দেখা পেলেন একজন সাধুর, যিনি মুণ্ডিতমস্তক এবং পীতবর্ণের জীর্ণ বাস পরিহিত। চন্নকে এঁর সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে, তিনি বলেন উনি একজন সন্ন্যাসী যিনি নিজ জীবন ত্যাগ করেছেন মানুষের দুঃখের জন্য। রাজকুমার সিদ্ধার্থ সেই রাত্রেই ঘুমন্ত স্ত্রী, পুত্র, পরিবারকে নিঃশব্দ বিদায় জানিয়ে প্রাসাদ ত্যাগ করেন। সিদ্ধার্থের এই মহানিষ্ক্রমণের মুহূর্তটি ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে রফিকের কবিতায়—

> তথাগত সেই রাতে কী দেখিলে তুমি
> তোমার সন্তান আর দয়িতার মুখে!
> জীবনের সব স্রোত বিষাদ বিরহ
> সেখানে কি মিশেছিল অকরুণ প্রেমে!
> সেদিনও জ্যোৎস্না ছিল এমনি প্রতারক
> অথবা আকাশ ছিল স্নিগ্ধ মেঘে স্নাত![৬]

দুঃখ ও দুঃখের কারণ সম্বন্ধে জানতে সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করেছিলেন। বুদ্ধের দর্শনের প্রধান অংশই হচ্ছে দুঃখের কারণ ও তা নিরসনের উপায়। বাসনা সর্ব দুঃখের মূল। বৌদ্ধমতে সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্তিই হচ্ছে প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু সংসারের সকল মানুষ বুদ্ধের মতো সংযমী হতে পারে না, হওয়া সম্ভব নয়। সংসারের মোহজালে আবদ্ধ রক্তমাংসের মানুষের কাছে ভোগবাদী জীবনই বরাবর সুখের। সেকারণেই কবি সচেতন ভাবে জীবনানন্দের অনুষঙ্গটি ব্যবহার করলেন—

সব পাখি ফিরে
গিয়েছিল নীড়ে![৭]
(ঐ)

'বনলতা সেন' কাব্যের নাম কবিতাতেও আমরা দেখেছি ভৌগলিক জীবনচক্র বোঝাতে কবি বলেছেন— "সব পাখি ঘরে আসে— সব নদী— ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন;" (বনলতা সেন/বনলতা সেন)। অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবী যখন মিলনের আয়োজনে প্রস্তুত, তখনই চিরকালের মতো বিচ্ছেদের পথে পা বাড়াচ্ছেন সিদ্ধার্থ। আসলে ভগবান বুদ্ধকে সামনে রেখে কবি জীবনের চরম সত্যটিকে অনুধাবন করতে চাইলেন। ঘড়ির কাঁটার যেমন দুটি বাহু থাকে, তেমনি মানুষের জীবনেরও দুটি বাহু— একটি জীবনের দিকে তাক করা, অন্যটি মৃত্যুর দিকে। জীবন-মৃত্যুর দোলাচলে কবির সুগত শেষবারের মতো তাকাচ্ছেন সংসারের দিকে, স্ত্রী-প্রিয়তমের দিকে। পরক্ষণেই তিনি মৃত্যু অর্থাৎ মহানিষ্ক্রমণের পথে এগিয়ে গেলেন। আসলে জীবনের গভীরে মৃত্যু, মৃত্যুর ভেতরে জীবন, অর্থাৎ পলায়ন ও প্রবেশের সংঘর্ষে অবশেষে সত্য হয় শিল্প। যে শিল্প মুছে দেয় বস্তু রূপ, ইন্দ্রিয়গুচ্ছের দাসত্ব, যুক্তি নীতি ও আদর্শের দায়দায়িত্ব। তাই জ্যোৎস্নাময় পৃথিবীতে কবির হৃদয় পবিত্র অভিমানে শোকাকুল হয়ে উঠেছে।

'ধুলোর সংসারে এই মাটি' কাব্যের কবিতাগুলি রচিত হয়েছে একাত্তরের রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের পরে ১৯৭২-১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। পূর্ব-পাকিস্তান তখন স্বাধীন বাংলাদেশ। পাকিস্তানের বৈষম্যমূলক শাসন থেকে মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষায় পূর্ব-পাকিস্তানের সর্বসাধারণ রক্তের বিনিময়ে অর্জন করেছিল এই স্বাধীন রাষ্ট্র। স্বাভাবিকভাবে এই রাষ্ট্রকে ঘিরে তাঁদের প্রত্যাশার পারদ ছিল ঊর্ধ্বমুখী। কিন্তু বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরে জনগণের এই স্বপ্নপূরণে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল স্বাধীন দেশের ক্ষমতা দখলের জটিল রাজনীতি। একাত্তর-পরবর্তী বাংলাদেশের রাষ্ট্রকাঠামো কোনও শক্ত ভিতের ওপর গ্রথিত হতে পারেনি কারণ সদ্য গঠিত দেশকে সুসংসহভাবে পরিচালনা করার মতো প্রশাসনিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন নেতৃবর্গ বা প্রয়োজনীয় অর্থ কোনোটিই সে-দিনের বাংলাদেশ পায়নি। রাজনৈতিক মুক্তি এলেও অর্থনৈতিক মুক্তি ছিল অধরা। এর ফলে শুরু থেকেই বাংলাদেশ পরনির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতৃবর্গের অবিবেচনার ফলে দেশের অভ্যন্তরে শুরু হয় খুন,

ধর্ষণ, লুঠতরাজদের রাজত্ব। কর্মসংস্থানের কোনো সুনির্দিষ্ট নীতি না থাকায় দেশে বাড়তে থাকে বেকারত্ব, দুর্নীতি, চোরাচালান। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই সাধারণের মন থেকে মুছে যেতে থাকে স্বাধীনতার স্বপ্ন, শুরু হয় স্বপ্নভঙ্গ। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী দেশ-প্রেমিক রফিকের চোখে তাই তাঁর প্রেমিকা বাংলাদেশ দ্বিচারিণী। দেশের শাসন ব্যবস্থার প্রতি তাঁর হতাশা ব্যক্ত হয়েছে এভাবে—

একা-একটি দীর্ঘ ডাল ভেঙে পড়ে দুজনের মাঝে,
দুজনকে ঘিরে নামে কদমের দগ্ধ জীর্ণ পাতা,
তুমি আজও অবিশ্বাসী আর তুমি আজও দ্বিচারিণী
বলে হাওয়া বলে পাখি বলে এই ভোর বুনো ফুল,
তারা ভাবে এই ক্লান্তি পায়ে পায়ে দীর্ঘজীবী হোক![৮]

এরপরেই কবি-আত্মার রূপান্তর ঘটে গেল। প্রতারিত প্রেমিক রাজধানীকেন্দ্রিক রাজনীতির জটিল আবর্তকে অতিক্রম করে প্রবেশ করলেন গ্রামীণ অর্থনীতিতে। রচিত হল কিষাণের দিনলিপি, যার পরতে পরতে জড়িয়ে আছে দুঃখ-দারিদ্র-একাকিত্ব—

হালের বলদ একা ঘোরে ফেরে, একাকী কিষাণ
দাওয়ায় ফ্যাকাশে রোদে চুপচাপ মূঢ় জবুথবু;
সারাদিন খাটাখাটি এন্তার কাজের চাপে ভাঙা,
মুমূর্ষু চিন্তার ছোপ অস্পষ্ট বালুর কারুকাজ
চোখে মুখে, চুপচাপ চেয়ে দেখে উঠোন কঁকিয়ে
অনিচ্ছুক হাঁসগুলো খোপের উদ্দেশ্য চলে আসে
হেলে-দুলে, পালকে শ্যাওলার ঘ্রাণ ঠোঁট কাদা-মাখা;
উপুড় কলস বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে যায় জল[৯]

ধুলোর সংসারে মাটির সন্ধান করছেন কবি। যে মাটির সঙ্গে কৃষকের আত্মিক সম্পর্ক, রাষ্ট্রিক অপশাসনে বিপর্যস্ত গ্রামীণ অর্থনীতিতে সেই মাটির সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হচ্ছে কৃষকের। সেজন্যই কৃষাণের চোখে 'মুমূর্ষু চিন্তার ছোপ অস্পষ্ট বালুর কারুকাজ চোখে মুখে।' বালুকা এখানে ক্ষণস্থায়ী বা ভঙ্গুরতার নিদর্শন। কবি-আত্মা যেন প্রতিমুহূর্তে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন দুদণ্ড শান্তির খোঁজে। অবশেষে কবি ফিরে এসেছেন তাঁর শৈশবের নদী-কেন্দ্রিক পরিবেশে। 'মাঝি ও তার বৃষ্টি', 'মাঝি ও তার দিন', 'মাঝি ও তার দুঃখ', 'মাঝি ও তার রাত্রি'— চারটি কবিতাতেই কবি মিশে গেছেন মাঝির সঙ্গে, প্রবেশ করেছেন তার সংসারে। আপাতদৃষ্টিতে রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাতের প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া সেভাবে প্রভাবিত করে না নদী-তীরবর্তী শান্ত জনজীবনকে। কিন্তু সুখের সংসারেও দুঃস্বপ্ন তাড়া করে ফেরে মাঝিকে—

ছোটোখাটো মাছ ধরে এই জন্যে তৈরি তার জাল
কোমল ঢেউয়ের ঘায়ে ক্ষুদ্র ডিঙি দোলে হালকা লয়ে,
বাড়িতে প্রচুর মুখ দুই বউ ছেলেপিলে ঢের

ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে দু-একটা ইলিশ...
স্বপ্নে দেখে জালের ভেতর ঢোঁড়া খেয়ে নেয় মাছ[১০]

ঢোঁড়া সাপ এখানে রূপকমাত্র। সে শুধু কৃষকের গ্রাস কাড়ছে না। কুরে কুরে খাচ্ছে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামোকে। এভাবেই মোহাম্মদ রফিকের কবিতা যাপনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাংলাদেশের মাটি, মানুষ, জীবন-জীবিকা, লোকপুরাণ আর চলমান বঞ্চিত শোষিত সমাজ-বাস্তবতা ফুটে উঠেছে।

মোহাম্মদ রফিকের 'কীর্তিনাশা' কাব্যটির রচনাকাল ১৯৭৬-৭৭। কাব্যটি প্রকাশিত হয় ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে। বাংলাদেশের জনজীবনে তখন চূড়ান্ত অরাজকতা। একের পর এক রাষ্ট্রনায়কের হত্যা এবং ক্ষমতার পরিবর্তনে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের স্থিতাবস্থা তখন কার্যত বিপর্যস্ত। এই পরিপ্রেক্ষিতে কবি রচনা করেছেন কীর্তিনাশার কবিতাগুলি। আলাদা কোনো নামকরণ করেননি তিনি। বাংলা বর্ণমালার এক একটি অক্ষরকে শিরোনাম হিসেবে তুলে ধরেছেন। প্রতিটি অক্ষরের মধ্যে দিয়েই নতুন নতুন গল্প শোনাতে চেয়েছেন কবি।

পদ্মা বাংলাদেশের প্রধান নদী। হিমালয়ে উৎপন্ন গঙ্গানদীর প্রধান শাখা এবং বাংলাদেশের দ্বিতীয় দীর্ঘতম নদী। রাজা রাজবল্লভের কীর্তি পদ্মার ভাঙ্গনের মুখে পড়ে ধ্বংস হয় বলে পদ্মার আরেক নাম কীর্তিনাশা। আলোচ্য কাব্যের নামকরণ 'কীর্তিনাশা' রেখে একটি সর্বজনীন সারসত্যকে তুলে ধরেতে চেয়েছেন কবি। খ্যাতি, যশ, ঐশ্বর্য কোনোকিছুই চিরস্থায়ী নয়। সেকারণে রাজবল্লভের সমস্ত কীর্তি মুহূর্তের মধ্যেই পদ্মার গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছিল। তেমনি এই কাব্য রচনার সময় কবি স্বাধীন বাংলাদেশে লক্ষ করেছেন ক্ষমতা দখলের নির্লজ্জ রাজনীতি। কবি জানেন এই ক্ষমতা, বৈভব, বিলাসিতা কোনোকিছুই মানুষ মনে রাখে না, কালের নিয়মে তা কালের গর্ভেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। 'কীর্তিনাশা' কাব্যে এসেই কবি এরকম একটা দর্শনে স্থিত হতে চাইলেন। তাঁর কাব্যভাষা পেল স্বতন্ত্র সুর।

নদী-তীরবর্তী জেলেদের জীবন অন্যমাত্রা পেয়েছে এই কাব্যে। নদী, জেলে-মাঝিদের কাছে ভগবানের মতো। নদীর সঙ্গে তাদের দেনা-পাওনার সম্পর্ক। নদীই তাদের উজাড় করে দেয়, কখনো কখনো নদীই তাদের সর্বস্ব ছিনিয়ে নিয়ে অস্তিত্বের সংকটে ফেলে। নদীর এই ভাঙা-গড়ার সঙ্গে জড়িয়ে আছে নদী-তীরবর্তী মানুষের সুখ-সমৃদ্ধির কাহিনি। কাব্যের শুরুর একটি কবিতায় এরকই উঠে এসেছে নদীর সর্বগ্রাসী রূপ। সর্বহারা জেলে-মাঝির জবানীতে রফিক বলে ওঠেন—

ছেলে নিলি স্বামী নিলি একটিমাত্র মেয়ে তাকে নিলি
কী আর করবি তুই বড়োজোর আমাকেও নিবি,
কার্তিকের ভোরবেলা বকুলের কান্নামাখা কুঁড়ি
পড়ে আছে, তার সঙ্গে মৃত্যুর সম্পর্ক ভারী গাঢ়;[১১]

এই মৃত্যুচেতনা আলোচ্য কাব্যের একাধিক কবিতায় ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা লাভ করেছে। নদী-তীরবর্তী মানুষের জীবনে ক্ষুধা-দারিদ্র নিত্যসঙ্গী। দারিদ্রের মধ্যে জন্ম নেওয়া জেলে-জীবনের শৈশব-বাল্য-কৈশোর-যৌবন দারিদ্রের মধ্যে দিয়েই অতিবাহিত হয়। জরাজীর্ণ বার্ধক্যের দিনলিপিতে সেই দারিদ্র যেন হাহাকার বহন করে আনে একাকী মানুষের জীবনে। এরকই কাহিনি ফুটে উঠেছে একটি কবিতায়—

দেয়ালে ধরেছে নুন কড়িকাঠে বিষণ্ন তক্ষক
...জানালা উদাম
হা হা উড়ো শীত হাওয়া অদ্ভুত হাসেতে ফেটে পড়ে;
ক্যাচ-ক্যাচ ভীত শব্দে চুনসুরকি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে
ছেয়ে দেয় আপাদমস্তক নোংরা সাড়হীন দেহ
শিথানের কাছে রাখা আধটিন বার্লি, ওষুধের
খোলা শিশি...
সচকিত আধবোজা চোখ দেকে নিতে চায়
শেষবার কারও মুখ, কারও ছায়া যদিও সে জানে
বহুদিন থেকে তার কেউ নেই, ছেড়ে গেছে কবে;[১২]

বোঝাই যাচ্ছে এক মৃত্যুপথযাত্রী নিঃসঙ্গ মানুষের বেদনার পদাবলি রচনা করেছেন কবি। গ্রামীণ সমাজব্যবস্থায় পরিচিত দৃশ্য এটি। প্রতিনিয়ত দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করতে থাকা মানুষগুলো দিবারাত্র পরিশ্রম করে শুধুমাত্র উপবাস থেকে বাঁচার জন্য, তাদের কাছে উদ্‌বৃত্ত আহার অলীক কল্পনামা'ত্র। সেকারণে কোনো মানুষ কর্মক্ষম হয়ে গেলে তাকে ত্যাগ করা ছাড়া উপায় থাকে না। জীবনের এই নিষ্ঠুর সত্যটি এখানে প্রকাশিত হয়েছে।

মানুষের জীবনযাত্রার মান নির্ভর করে তার অবস্থানের ওপর। যে কোনো দেশের রাজধানী এবং তৎসংলগ্ন এলাকার মানুষ শিক্ষা-স্বাস্থ্যসহ যে কোনো মৌলিক অধিকার যতটা সহজে ভোগ করে, ততটাই বঞ্চিত হয় প্রান্তবাসী মানুষ। ভৌগোলিক দূরত্বজনিত কারণে সে শিক্ষা-স্বাস্থ্য থেকে প্রতিনিয়ত বঞ্চিত হতে হতে একসময় এতটাই পিছিয়ে পড়ে যে, জীবনের সামান্য ন্যায্য দাবিটুকুও তার কাছে মহামূল্যবান মনে হয়। সেরকমই একটি গল্প কবি তুলে ধরেছেন মানুষের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে। মৃত্যুপরবর্তী দাহকার্যে ফুটে উঠেছে আর্থিকবৈষম্যজনিত নিষ্ঠুরতা—

মারা গেছে গতরাতে কিংবা তারও আগে কোনোদিন
প্রচুর চন্দনকাঠ মেলা ভার, চিতায় আগুন
জ্বালাতে তেলের মূল্য যত্ন-আত্তি ভীষণ খরচ
আজকাল ব্যাবসায় তেমন পসার নেই আর; ...

মারা গেছে, কবে? কাল! সে যে-কোনোদিন হতে পারে;

পচন ধরেছে মাংসে চোখ দুটি খাবলে নিয়ে গেছে
শকুন, প্রলুব্ধ চিল, হা-খোলা আতুর ভীত খাদ,
ভেলার ওপর শোয়া খসে পড়ে জলে টুপটাপ;[১৩]

শহুরে অর্থনীতির সঙ্গে গ্রাম্য অর্থনীতির ভয়াবহ বৈষম্য চিত্রিত হয়েছে পঙ্‌ক্তিগুলিতে। কেবলমাত্র অর্থের অভাবে মৃত্যুর পরেও গ্রামীণ মানুষের শবদেহ চূড়ান্ত লাঞ্ছিত হয়, শেয়াল-কুকুরের ভোগ্য হয়। এই শেয়াল-কুকুরের রূপকে অন্য এক একশ্রেণির মানুষের মুখোশ খুলে ফেলতে চেয়েছেন কবি। বেচেঁ থাকার লড়াইয়ে একসময় গ্রামের মেয়েরা জীবনের চোরাগলিতে বাধ্য হয়েই পা রাখে। সেখানে ওৎ পেতে থাকে হায়েনার মতো একশ্রেণির মানুষ—

বিভিন্ন অচেনা মুখ (সত্যিই কি অচেনা) উঁকি দেয়
ভাঙা গরাদের ফাঁকে দেয়ালের গায়ে স্যাঁতসেতে
লুকানো অন্যায় গন্ধ পচে-ওঠা মরা গিরগিটি
কুমারী নারীর স্তন লোভাতুর শাড়ির আঁচল[১৪]

কীর্তিনাশা এই পদ্মার তীরবর্তী জেলে-জীবনের আখ্যানকে অন্যমাত্রায় তুলে ধরেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘পদ্মানদীর মাঝি’ উপন্যাসে। এই উপন্যাসের কুবের, কপিলা, মালা, হোসেন মিয়া, ময়না দ্বীপ ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্যে স্থান পেয়েছে রফিকের কবিতায়। যেখানে জড়িয়ে আছে জেলেজীবনের দারিদ্র-হাহাকার এবং সেই অসহায়তাকে অবলম্বন করে নিষ্ঠুর চক্রান্ত। কবি রফিক গল্পের আকারে পদ্মার ভাসমান জীবনচিত্র রচনা করেছেন—

দেহখানা ভালা নাই, জাদু হে এ এ এ— মাছ কিবা?
কয়টা ইলিশ মাত্র, একখানা গীত ক কুবির
হ গীত না তর মাথা শুধুমাত্র জাল ফেলে চলা; ...
যাইবা ময়না দ্বীপে? কুটিল রহস্যে বোনা জাল
রক্তের চক্রান্তে লোভ হিংস্র বাঘ, যাইবা ইচ্ছা হলি;
কাঁদো ক্যান? নাই গ্যালা! ...
কপিলার দিনরাত্রি বাজে-বজ্রে কড়াৎ-কড়াৎ![১৫]

এভাবেই নানান খণ্ড-কাহিনি দিয়ে কবি গড়ে তুলেছেন কীর্তিনাশার একক মালা। নদীকেন্দ্রিক মানুষের পরিপূর্ণ জীবনকথা রচনা করতে গিয়ে কখনো এসেছে চিল-শকুন-মরা গিরগিটি-উন্মত্ত নেকড়ের প্রসঙ্গ, কখনো এসেছে গ্রামীণ সমাজ-ব্যবস্থায় পুরুষতন্ত্রের চাপে লাঞ্ছিত নারী জীবনের আখ্যান, নিম্নবৃত্ত জীবনের সাধ-সাধ্যের গল্প; মানিক-তারাশঙ্কের উপাখ্যানও পুনর্নির্মিত হয়ে নবরূপে ধরা পড়েছে এই গ্রন্থে। সবমিলিয়ে ‘কীর্তিনাশা’ হয়ে উঠেছে কবি-জীবনের বাঁকবদলের গল্প।

বাংলা সাহিত্যের ক্লাসিক গ্রন্থগুলি মোহাম্মদ রফিককে বরাবর প্রেরণা জুগিয়েছে। সেকারণে কবি বারবার বৈষ্ণব পদাবলি, মনসামঙ্গলের পাশাপাশি মানিক-তারাশঙ্করের রচনাগুলিকে নতুন করে নির্মাণ করতে চেয়েছেন। 'কীর্তিনাশা' কাব্যের কবি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের অংশবিশেষ গ্রহণ করেছেন; তেমনি 'গাওদিয়া' কাব্যে ব্যবহার করেছেন মানিকের 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসের প্রেক্ষাপটকে, যা গড়ে উঠেছে গাওদিয়া গ্রামকে কেন্দ্র করে। উপন্যাসে আমরা দেখেছি বজ্রপাতে নিহত হারু ঘোষের মৃত্যু দৃশ্য দিয়ে লেখক উপন্যাসের কাহিনি শুরু করেছেন। আলোচ্য কাব্যের প্রথম কবিতার শুরুও সেই হারু ঘোষের মৃত্যু বর্ণনা দিয়ে—

আকাশের দেবতা কেন যে তাকে কটাক্ষ করল
হারান বুঝেছে, এই বাঁচা ঠিক বেঁচে থাকা নয়[১৬]

এই হারু ঘোষ সংক্ষিপ্ত পথে গাওদিয়া গ্রামে ফিরতে চেয়েছিল কিন্তু আকস্মিক দৈবাঘাতে তার পথ অতি-সংক্ষিপ্ত হয়ে গেল। বটগাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে হারু ঘোষ দাঁড়িয়ে ছিল। সে চেয়েছিল বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে। তাই বটগাছের গুঁড়ি ঘেঁষে সে দাঁড়িয়ে ছিল আত্মরক্ষার্থে। কিন্তু নিয়তি দুর্জ্ঞেয়, প্রকৃতি দুর্জেয়। সেই আকাশের দেবতা হঠাৎ কটাক্ষ করে তার জীবনদীপ নিভিয়ে দিলেন। গাওদিয়া গ্রামের 'ইতিকথা' নিশ্চয় নিছক মৃত্যুর কাহিনি নয়, সে কাহিনি জীবনেরও— জীবনের প্রতি পিপাসা ও মমতার রসে তা উদ্বেল। কিন্তু এমন এক 'ইতিকথা'-র গোড়াতেই এক অসহায় মৃত্যুর সঙ্গে পাঠকের আকস্মিক মুখোমুখি দেখা। এই নিরুপায় মৃত্যুর বিষণ্ণ পথ দিয়েই পাঠককে গাওদিয়ার জীবনের মধ্যে প্রবেশ করতে হয়। উপন্যাসের নায়ক শশী গ্রামে প্রবেশ করার পরই শুরু হয় একাধিক চরিত্রের নিয়তিচালিত পুতুলের মতো কার্যকলাপ। গ্রামের বধূ কুসুমের সঙ্গে শশীর সম্পর্ক উপন্যাসে নতুন মাত্রা নিয়ে আসে। কিন্তু কর্তব্য এবং নৈতিকতার খাতিরে শশী ডাক্তার উপেক্ষা করে এক গ্রাম্য গৃহবধূর জৈবিক আহ্বানকে। সেই অমর উক্তি-প্রত্যুক্তিকে রফিক রূপ দিয়েছেন কবিতায়—

এমন আতঙ্কে রাতে শরীর উথলিয়ে ওঠে বাবু
শরীর শরীর শুধু তোমার কি মন নেই বউ,[১৭]

কিন্তু নিয়তির এই পরিহাসে শশীর জীবনেই নেমে আসে বিষাদের কালো ছায়া। প্রতিনিয়ত কুসুমের তীব্র আহ্বান এবং তাকে প্রত্যাখ্যানের মধ্যে দিয়ে শশীর যে অহংবোধ, তা একসময় স্তিমিত হয়ে আসে। কারণ বারংবার প্রত্যাখ্যাতা হতে হতে একসময় কুসুম, শশী ডাক্তারের প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে চিরকালের মতো গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে চায়। কর্মব্যস্ত শশী ডাক্তারের জীবনে নেমে আসে বিপর্যয়। এবার সে কুসুমকে নিয়ে গ্রাম ছাড়তে চাইলে কুসুম সরাসরি শশীকে ফিরিয়ে দেয়। একমুহূর্তে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে শশী ডাক্তার। কুমুদহীন গাওদিয়া গ্রামে দুচোখ দিয়ে ব্যাকুল হয়ে

শশী, মানুষ খুঁজে বেড়ায়। তালবনে শশী আর যায় না, টিলার ওপর উঠে সূর্যাস্ত দেখার সাধও তার নেই। এই সংকটময় অবস্থা উঠে এসেছে কবিতায়—

...শশী সঙ্গ খোঁজে, ডুবে যেতে থাকে
একটি মাত্র তাল গাছ তার শীর্ষে সূর্য বাঁধে ডেরা।
এই সূর্য মধ্যবিত্ত, এর কোনো ভালোবাসা নেই।[১৮]

তবে কেবল গ্রাম জীবনের ইতিকথা নয়, তৎকালীন দেশীয় রাজনীতিকে সরাসরি কবিতায় স্থান দিয়েছেন সমাজ-সংবেদনশীল কবি রফিক। চোখের সামনে দেশকে স্বাধীন হতে এবং পুনরায় সামরিক শাসনের বেড়াজলে আবদ্ধ হতে চেয়েছেন। এই সময়ে তাঁর যে অনুভূতি, তাকে সরাসরি পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন 'খোলা কবিতা' (১৯৮৩)-র মাধ্যমে। এই কবিতার রচনার নেপথ্য-ইতিহাস সম্পর্কে এক সাক্ষাৎকারে মোহাম্মদ রফিক জানাচ্ছেন— "ওই কবিতাটা লেখার পেছনে ঘটনাটা হচ্ছে যে, এরশাদ যেদিন ক্ষমতায় আসে ওইদিন আমি খুলনায় ছিলাম। তো সকালবেলা আমি বাসে আসছি, দেখি আর্মির মুভমেন্ট, তখনো আমি কিছু জানি না। বাসটা এসে যখন ফরিদপুরে থামল, তারপর আমি চা খেতে নামলাম। (তখন আমার অনেক বড় বড় চুল ছিল।) একটা লোক এসে আমায় বলছে যে, আপনার চুল কিন্তু কেটে নেবে। আমি বললাম—কেটে নেবে মানে? কারা! 'আপনি জানেন না সামরিক বাহিনী ক্ষমতায় এসছে। ওই আরিচা ঘাটে সবার চুল কেটে দিচ্ছে। ...ঘটনাটা আমাকে এমন মর্মাহত করল! আমি ফিরে আসলাম জাহাঙ্গীরনগর। তার কয়েকদিন পরে দেখি যে, এরশাদের কবিতা প্রধান শিরোনাম হিসেবে প্রথম পাতায় ছাপা হয়েছে। ...বাঙালির গর্বের জায়গা তার কবিতা, সেইটাকে এইভাবে পদদলিত করা, একজন অকবির কবিতা শিরোনামে ছাপা হল ...এই সমস্ত ঘটনা আমাকে প্রচণ্ডভাবে ব্যথিত করে এবং আমি কবিতা লিখতে বসে পড়ি।"[১৯] এইসময় শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রটিকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য এরশাদ নিয়মিত কবিতা লেখা শুরু করেন। নিজের গণতন্ত্র-বিরোধী মুখোশটিকে আড়াল করার জন্যই এরশাদ কবির ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলেন। নিজেকে সংস্কৃতি জগতে স্মরণীয় রাখতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর এই ছদ্মবেশে ভোলেননি মোহাম্মদ রফিক। বরং তীব্র আক্রমণ করেছেন এরশাদকে। তাঁর এই ব্যর্থ কাব্যপ্রয়াসকে ব্যঙ্গ করে কবি লিখেছেন—

সব শালা কবি হবে; পিঁপড়ে গোঁ ধরেছে, উড়বেই;
বন থেকে দাঁতাল শুয়োর রাজাসনে বসবেই।
হঠাৎ আকাশ ফুঁড়ে তৃতীয় বিশ্বের গঞ্জে-গাঁয়ে
হুট্ করে নেমে আসে জলপাই লেবাস্যা দেবতা;
পায়ে, কালো বুট; হাতে রাইফেলের উদ্যত সঙ্গীন;[২০]

এইসময় এরশাদের নিষেধাজ্ঞা ছিল, সামরিক সরকারের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কোনোরকম কবিতা লেখা যাবে না, কেবল প্রেমের কবিতা লিখতে হবে। এই ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন কবি। একইসঙ্গে কবি এও লক্ষ করছেন যে, যে সামরিক জান্তা তাঁর স্বদেশকে প্রতিমুহূর্তে শোষণ করছে, দেশবাসীকে হত্যা করছে, তার বিরুদ্ধে দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণি নিশ্চুপ। তারা যেন প্রতিবাদ করতেই ভুলে গেছে। গৃহপালিত পশুর মতো তাদের গতানুগতিক জীবনধারাকে ব্যঙ্গ করে কবি বললেন—

ঢিলেঢালা মধ্যবিত্ত চলনে-বলনে, শাসনের
দণ্ডদেশে কী-সুন্দর খোঁয়াড়ে বাছুর; আত্মসুখে
ঘৃণাহীন, লজ্জাহীন, তকতকে কারাকুঠুরিতে
আপন স্বভাবে, দাস; বন্দী, নিমজ্জিত স্বমেহনে।[২১]

কবিতাটিতে কেবল এরশাদের স্বৈরাচারী নীতির প্রতিবাদ নয়, রয়েছে সেইসময়ের দেশের বাদবাকি রাজনীতিবিদদের ভূমিকা, মধ্যবিত্ত শ্রেণির নিস্পৃহতা। বেজন্মা শুয়োর, রুগ্ন গাধা, মরা ঘোড়া, ব্যাং, গিরগিটি, অনাদি কালের ঘুঘু, ঘেয়ো কুকুর প্রভৃতি শব্দবন্ধ ব্যবহার করে এইসময়ের সার্বিক প্রেক্ষাপটটিকে তুলে ধরতে চেয়েছেন রফিক। ফলে 'খোলা কবিতা' হয়ে উঠেছে সমকালের সামাজিক দলিল।

আমরা জানি লোকজ-অনুষঙ্গ, পুরাণের প্রতি রফিকের রয়েছে সহজাত আকর্ষণ। মহাভারতে দক্ষের কন্যা হল কপিলা। এই পৌরাণিক নামটি নিয়ে ১৯৮৩ সালে রচনা করলেন 'কপিলা' নামক দীর্ঘকবিতা। এই কবিতা রচনার ইতিহাস সম্পর্কে এক সাক্ষাৎকারে কবি জানাচ্ছেন— "একটি ঘোরের মধ্যে তৈরি হয়েছিল *কপিলা*। ১৯৮৩-র ১০ জানুয়ারি থেকে ২৫ জানুয়ারি এই পনেরো দিন, আমি জানি না কী ভাবে কেটেছে আমার। স্বচ্ছন্দে বলা যায় ভূতে পেয়েছিল আমাকে। লেখা হয়েছিল আরও কয়েকটি অংশ। ...সে বছর ফেব্রুয়ারির বই মেলায় আত্মপ্রকাশ ঘটে *কপিলার*। ...কপিলা শুধু একা একক নারী নয়। তার বিভিন্ন জীবন ও যৌবনের স্তরে স্তরে এসে জুটেছে অন্য নারীরাও। বাঙালী বীরত্ব গাঁথার সখিনা থেকে শুরু করে ফরিদপুর সিএন্ডবি ঘাটের পতিতা হীরামন তারই সখী। এদের সবার একটিই চরিত্র-পরিচয়, তা হচ্ছে তারা শ্রমজীবী। তাদের ভালোবাসা, তাদের আকাঙ্ক্ষা, তাদের বাসনা ও বেদনা ঘাম ক্লেদ কাদা জল-এর এক মহিম রূপান্তরেরই নাম কপিলা।"[২২] এখানে কেবল কপিলার কাহিনি বর্ণনা করেননি কবি, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রূপকথার রাজকুমার, পঙ্খিরাজ ঘোড়া, চর্যাপদের ডোম্বিনী, চণ্ডীমঙ্গলের ফুল্লরা, মনসামঙ্গলের চাঁদ সদাগর, বেহুলা, লৌকিক দেবী বনবিবি। তাদের ভিন্ন ভিন্ন পরিচয় থাকলেও একটা সাধারণ পরিচয় হল, তারা শ্রমজীবী। এদের প্রত্যেকেই একত্রিত করে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চাইলেন কবি—

তবু শেষ নেই। নেই-নেই নিরুদ্দেশ
স-বু-জ

সবুজ
দেশ
উড়ে আসে কাক। বেশ! বেশ!
যার কোনো শুরু নেই তার নেই শেষ।
মোছো রক্ত, পৈঠার ওপরে কালসিটে এই
লড়াই চলবেই[২৩]

তিনি অসাধারণ দক্ষতায় পুরাণ থেকে কপিলাকে নামিয়ে আনলেন সাধারণ মানুষের কাতারে। সে হয়ে উঠে প্রতিমা থেকে নারী, এক অনন্য শক্তির আধার। বাংলার নিপীড়িত-নির্যাতিত-শ্রমজীবী, প্রতিবাদী মানুষের মুক্তির প্রতীক। তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনা, প্রেম-ভালোবাসা, ঘাম ও ক্লেদ-কাদামাখা জীবনের পরিপূর্ণ রূপান্তর হল কপিলা।

'স্বদেশী নিঃশ্বাস তুমিময়' এবং 'মেঘে এবং কাদায়' কাব্যদুটিতে কবিকে বাংলাদেশকে ফিরে দেখতে চেয়েছেন। দেশপ্রেম এক নতুন রূপ লাভ করেছে এই কাব্যদুটিতে। মুক্তিযুদ্ধে নবগঠিত মাতৃভূমি বাংলাদেশই কবিকে শিখিয়েছে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে। একাত্তরের ছাই-চাপা স্বপ্ন কবিকে পুনরায় নতুন সংগ্রামের মন্ত্রে উজ্জীবিত হতে শেখায়, আশাভঙ্গের দুরন্ত ক্ষতগুলো ভুলতে শেখায়, তাই বাংলাদেশের কাছে কবি ঋণের সীমা নেই। কিন্তু এসব কবির স্বপ্ন। বাস্তবের বাংলাদেশ রাজনৈতিক শোষণে আজ বিধ্বস্ত। সেই অসহায় বাংলাদেশকে উদ্দেশ্য করে কবি বললেন—

কাঁদো যেমন মা মৃত্যুপথযাত্রী সন্তানের লাশ বুকে
ডুকরে ওঠে,
যেমন নিবোর্ধ ষণ্ড স্বামীর বেহেড চড়-থাপ্পড়ের গায়ে বিড়ালীর শ্বাস
ফেলে জায়া,
যেমন পশুর নর-লোলুপ জ্বিহার লেলিহান টোকা লেগে
চিৎকারে পেটে পড়ে কিশোরীর আলুথালু ঘৃণা,
যেমন বিক্ষোভে আমেনার ঘোয়াভাঙা হাত ছিঁড়ে রক্ততিল
ঘাম
কান্না
কোয়ান কোটালে ডাকে নিশুতির মরা প্যাঁচা,
চন্দনে চিতার আঁচ কিংবা ক্ষেয়ো মেঘে ঢাকা আষাঢ়ি পূর্ণিমা[২৪]

'রূপকথা কিংবদন্তি' (১৯৯৮), 'মৎস্যগন্ধা' (১৯৯৯), 'মাতি কিসকু' (২০০০) কাব্যগুলিতে মঙ্গলকাব্য, লোকপুরাণের অনুষঙ্গগুলিতেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যবহার করেছেন কবি, মধ্যে মধ্যে এসেছে মুক্তিযুদ্ধের বীভৎস স্মৃতি। এইসব কাব্যের বিভিন্ন

কবিতায় কবি ধারণ করলেন স্বাদেশিক ইতিহাস ঐতিহ্যকে। লোক-সংস্কৃতির অমূল্য রত্ন-ভাণ্ডারে তিনি খুঁজে পেলেন আত্মস্বর ও স্বকীয়তা।

'বিষখালি সন্ধ্যা' (২০০৩), 'কালাপানি' (২০০৬), 'নোনাঝাউ' (২০০৮), 'দোমাটির মুখ' (২০০৯) কাব্যগুলিতে কবির বিভিন্ন সময়ের অনুভূতি ধরা পড়েছে। মানুষ আর জীবনের প্রথম বিশ বছর অতিক্রম করার পর নিজস্ব খোলস ছেড়ে বাইরের বৃহত্তর পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হয়, সেই সম্পর্ক স্থাপনের কথা স্থান পেয়েছে 'বিষখালি সন্ধ্যা' বইটিতে। ১৯৯৩-৯৪ সাল নাগাদ কবির অসুস্থতা এবং স্ত্রীর মৃত্যু কবিকে নিঃসঙ্গ করে দিয়েছিল। এইসময়ের দুঃখজাত অনুভূতিকে কবি তুলনা করেছেন ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে গ্রেফতার হওয়ার বন্দিদের সঙ্গে। তাদেরকেও কালাপানি পরিবেষ্টিত আন্দমান-নিকোবরে নির্বাসন দেওয়া হতো, যা মৃত্যুর সমতুল্য। এই অনুভূতিকে অবলম্বন করে কবি লিখেছেন 'কালাপানি' কাব্যটি। একবার খুলনা থেকে ফেরার পথে কবি জমিতে দেখতে পেয়েছিলেন কিছু ঝাউগাছ। যেগুলো নোনাজলে খুব একটা বেশিদিন বাঁচে না। বেঁচে থাকার এই অধিকারবোধ থেকেই কবি লিখেছেন 'নোনাঝাউ' কাব্যগ্রন্থটি। 'দোমাটির মুখ' কাব্যে রয়েছে শেষপর্বে জীবনের চূড়ান্ত ব্যর্থতার কিছু চিত্র, অনুভূতির খোঁজ কিংবা অনুরণন। প্রতিটি কাব্যই বিষয়ের দিক থেকে একমুখী অর্থাৎ প্রতিটি কাব্যেই কবি পৃথক পৃথক স্বরকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। এ সম্পর্কে এক সাক্ষাৎকারে কবি বলেছেন— "আমার প্রতিটি বইতে একটা করে মেজাজই প্রতিফলিত করার চেষ্টা করেছি। কালাপানি, বিষখালি সন্ধ্যা, নোনাঝাউ, দোমাটির মুখ আমার কাব্য সংকলন নয়, একটি বিষয়ের কাব্য। আমি এভাবেই দেখতে অভ্যস্ত।"[২৫]

এরপর একে একে প্রকাশিত হয়েছে 'অশ্রুময়ীর শব' (২০১১), 'ঘোরলাগা অপরাহ্ন' (২০১৩), 'বন্ধু তুমি প্রসন্ন অবেলায়' (২০১৫), 'দুটি গাথাকাব্য: এ কোন বেহুলা, সে ছিল বেদেনি' (২০১৬), 'পূর্বাহ্নে সামগান' (২০১৬), 'মানব পদাবলি' (২০১৭), 'এই স্বপ্ন এই ভোর প্রভাতের আলো' (২০১৮), 'চিরহরিতের উপবাস' (২০১৯), 'পথিক পরাণ" (২০২০) এবং 'গীত ক কুবির' (২০২২) কাব্যগ্রন্থ। মানুষ এবং মানুষের প্রতি ভালোবাসা থেকে কবি লিখেছেন একের পর এক কাব্য। তিনি মনে করেন এই বিধ্বংসী পৃথিবীতে একটিমাত্র মৌলিক অনুভূতি মানুষকে ধ্বংস থেকে ফেরাতে পারে— সেটি হল ভালোবাসা, মানুষের প্রতি মানুষের মানবিক প্রেম। প্রেমের পাশাপাশি তাঁর কবিতার অন্যতম উপাদান হল স্মৃতি। এ প্রসঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন— "স্মৃতি আমার কবিতায় নানাভাবে আসে। যদি বলি কেন আসে? উত্তরটি হয়তো এভাবে দেওয়া যাবে, জীবনের প্রধান সম্বলই তো স্মৃতি। ব্যর্থতার স্মৃতি, পাওয়ার স্মৃতি, না পাওয়ার স্মৃতি— সব মিলিয়েই তৈরি হয় জীবনের পটভূমি, কবিতারও। তবে স্মৃতিকাতরতা বলতে যদি শৈশব ধরো, তাহলে আমি বলব, যার শৈশব নেই, অতীত নেই, তার কিছুই নেই।"[২৬] সামগ্রিক কাব্যবিচারে তাই বলা যায়

চিরায়ত বাংলাই রফিকের কবিতার রসদ। চিরবঞ্চিত-নিপীড়িত মানুষ ও সমাজ-বাস্তবতাকে আত্মস্থ করে তিনি কবিতায় উপস্থাপন করেছেন নতুন বিন্যাসে। দীর্ঘ জীবনযাপনের অভিজ্ঞতা ও অর্জিত বোধ কবিকে একধরনের বিপন্নতার ভেতরে নিক্ষেপ করেছে। একে কাব্যিক বিপন্নতাও বলা যেতে পারে। শেষপর্যন্ত কবিতা মোহাম্মদ রফিকের জীবনালেখ্য হয়ে উঠেছে।

সূত্রনির্দেশ:

১. আবদুল মান্না সৈয়দ, 'বাংলাদেশের সাহিত্য', বাংলাদেশের কবিতা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৮, পৃ. ১৯।
২. মলয় রায় চৌধুরী, 'হাংরি কিংবদন্তি', মিজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর সংখ্যা, ১৯৮৬, পৃ. ৬৯-৭০।
৩. সুব্রত মুখার্জী, সাহিত্য বার্তা, ২২ অক্টোবর, ২০১৯।
৪. সাক্ষাৎকার, রাহেল রাজীব, 'মোহাম্মদ রফিকের সঙ্গে এক বিকেল', ভোরের কাগজ, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১০।
৫. মোহাম্মদ রফিক, 'আমার রবীন্দ্রনাথ', ওগো বন্ধু, ওগো পরবাসী, নাগরী প্রকাশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ অমর একুশে বইমেলা ২০১৫, পৃ. ১৪।
৬. মোহাম্মদ রফিক, '২ সংখ্যাক কবিতা', বৈশাখী পূর্ণিমা, মোহাম্মদ রফিকের নির্বাচিত কবিতা, অরুণ সেন (সম্পা.), প্যাপিরাস, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃ. ১৭।
৭. মোহাম্মদ রফিক, '২ সংখ্যাক কবিতা', বৈশাখী পূর্ণিমা, মোহাম্মদ রফিকের নির্বাচিত কবিতা, অরুণ সেন (সম্পা.), প্যাপিরাস, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃ. ১৭।
৮. মোহাম্মদ রফিক, 'দাম্পত্য', ধুলোর সংসারে এই মাটি, মোহাম্মদ রফিকের নির্বাচিত কবিতা, অরুণ সেন (সম্পা.), প্যাপিরাস, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃ. ২৯।
৯. মোহাম্মদ রফিক, 'কিষাণের দিনলিপি', ধুলোর সংসারে এই মাটি, মোহাম্মদ রফিকের নির্বাচিত কবিতা, অরুণ সেন (সম্পা.), প্যাপিরাস, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃ. ২৯-৩০।
১০. মোহাম্মদ রফিক, 'মাঝি ও তার দিন', ধুলোর সংসারে এই মাটি, মোহাম্মদ রফিকের নির্বাচিত কবিতা, অরুণ সেন (সম্পা.), প্যাপিরাস, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃ. ৩৩।
১১. মোহাম্মদ রফিক, 'ই', কীর্তিনাশা, মোহাম্মদ রফিকের নির্বাচিত কবিতা, অরুণ সেন (সম্পা.), প্যাপিরাস, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃ. ৩৭।

১২. মোহাম্মদ রফিক, ‘উ’, কীর্তিনাশা, মোহাম্মদ রফিকের নির্বাচিত কবিতা, অরুণ সেন (সম্পা.), প্যাপিরাস, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃ. ৩৮।
১৩. মোহাম্মদ রফিক, ‘ক’, কীর্তিনাশা, মোহাম্মদ রফিকের নির্বাচিত কবিতা, অরুণ সেন (সম্পা.), প্যাপিরাস, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃ. ৪২।
১৪. মোহাম্মদ রফিক, ‘খ’, কীর্তিনাশা, মোহাম্মদ রফিকের নির্বাচিত কবিতা, অরুণ সেন (সম্পা.), প্যাপিরাস, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃ. ৪২।
১৫. মোহাম্মদ রফিক, ‘র’, কীর্তিনাশা, মোহাম্মদ রফিকের নির্বাচিত কবিতা, অরুণ সেন (সম্পা.), প্যাপিরাস, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃ. ৫৪।
১৬. মোহাম্মদ রফিক, ‘গাওদিয়া’, গাওদিয়া, মোহাম্মদ রফিকের নির্বাচিত কবিতা, অরুণ সেন (সম্পা.), প্যাপিরাস, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃ. ৬৩।
১৭. মোহাম্মদ রফিক, ‘গাওদিয়া’, গাওদিয়া, মোহাম্মদ রফিকের নির্বাচিত কবিতা, অরুণ সেন (সম্পা.), প্যাপিরাস, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃ. ৬৩।
১৮. মোহাম্মদ রফিক, ‘গাওদিয়া’, গাওদিয়া, মোহাম্মদ রফিকের নির্বাচিত কবিতা, অরুণ সেন (সম্পা.), প্যাপিরাস, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃ. ৬৪।
১৯. সাক্ষাৎকার, রাজু আলাউদ্দিন, **মোহাম্মদ রফিক: আমার কাছে ‘পদ্মানদীর মাঝি’ অসম্পূর্ণ উপন্যাস মনে হয়**’, **আর্টস**.bdnews24.com, **২৩ অক্টোবর, ২০১৮**
২০. মোহাম্মদ রফিক, ‘খোলা কবিতা’, খোলা কবিতা, মোহাম্মদ রফিকের নির্বাচিত কবিতা, অরুণ সেন (সম্পা.), প্যাপিরাস, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃ. ৮৭।
২১. মোহাম্মদ রফিক, ‘খোলা কবিতা’, খোলা কবিতা, মোহাম্মদ রফিকের নির্বাচিত কবিতা, অরুণ সেন (সম্পা.), প্যাপিরাস, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃ. ৯২।
২২. সাক্ষাৎকার, **শফিউল** আলম সুমন, ‘কেন লেখা হয়েছিল কপিলা’, **আর্টস**.bdnews24.com, **২০ ডিসেম্বর, ২০০৭**।
২৩. মোহাম্মদ রফিক, ‘কপিলা’, কপিলা, অরুণ সেন (সম্পা.), মোহাম্মদ রফিকের নির্বাচিত কবিতা, অরুণ সেন (সম্পা.), প্যাপিরাস, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃ. ১২৫।
২৪. মোহাম্মদ রফিক, ‘কাঁদো বাংলাদেশ কাঁদো’, মেঘে এবং কাদায়, মোহাম্মদ রফিকের নির্বাচিত কবিতা, অরুণ সেন (সম্পা.), প্যাপিরাস, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃ. ১৫২।
২৫. সাক্ষাৎকার, রাহেল রাজীব, ‘মোহাম্মদ রফিকের সঙ্গে এক বিকেল’, ভোরের কাগজ, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১০।
২৬. সাক্ষাৎকার, আলতাফ শাহনেওয়াজ, ‘মানব পদাবলি আমার পরিপূর্ণ জীবনের আরশি’, প্রথম আলো, ১২ জানুয়ারি, ২০১৮।

পরমপুরুষার্থলাভে যোগসাধনায়া উপযোগিত্বং- যোগদর্শন-শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-ভগবদ্ভক্তিরসায়নানুসারং সমীক্ষণম্

ঋতব্রতা সাউ
স্যাক্ট-১, সংস্কৃত বিভাগ, বাজকুল-মিলনী-মহাবিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ:- দুর্লভং খলু মানবজীবনম্- ইত্যুক্তং হি আচার্যেণ শঙ্করেণ তদীয়ে 'বিবেকচূড়ামণি:' ইতি গ্রন্থে-

"দুর্লভং ত্রয়মেবৈতদ্ দৈবানুগ্রহহেতুকম্।
মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়:।।"ইতি।৩

দুর্লভত্রয়েষু মনুষ্যত্বেন সহ মুমুক্ষুত্বস্যাপি উল্লেখো লক্ষ্যতে। আত্যন্তিকদু:খনিবৃত্তিস্তথা পরমানন্দপ্রাপ্তিরেব সর্বেষাং মূলীভূতং (অন্তিমং) লক্ষ্যম্ ইত্যত্র নাস্তি লেশত: অপি সন্দেহাবকাশঃ। কিং নাম পরমলক্ষ্যম্ অস্মাকম্ মনুষ্যাণাম্? মোক্ষলাভ এব পরমলক্ষ্যম্ ইতি ভূয়ো ভূয় এবোক্তং বেদোপনিষদ্-গীতা-ভাগবত-বেদান্তাদিশাস্ত্রেষু তথা চোপলব্ধং রাম-কৃষ্ণ-বুদ্ধ-প্রভৃতি- অবতারপুরুষাণাং জীবনদর্শনেষু। যোগদর্শনানুসারং যোগ এব মোক্ষলাভস্য শ্রেষ্ঠোপায়:। গীতায়াং পরমপুরুষার্থলাভায় কর্মযোগ- ভক্তিযোগ- জ্ঞানযোগানাম্ উপযোগিত্বং প্রদর্শিতং, রাজযোগস্য চ এতেষাম্ একান্তসহায়কত্বম্ উপপাদিতম্। শ্রীমধুসূদন-সরস্বতি-মহোদয়েন তদীয়ে 'ভক্তিরসায়নম্' ইতি গ্রন্থে অপি কর্মযোগাষ্টাঙ্গযোগ- জ্ঞানযোগ- ভক্তিযোগ ইতি চত্বার: যোগা: পরমপুরুষার্থলাভায় উপাদেয়া ইতি প্রতিপাদিতম্। অত: পরমপুরুষার্থলাভে যোগসাধনায়া অস্তি সমধিকং গুরুত্বমেবেতি নিশ্চপ্রচম্। কিঞ্চ উক্তগ্রন্থত্রিতয়ে যোগসাধনবিষয়ে বিবিধানি সাদৃশ্যানি বহুলতয়া লক্ষ্যন্তে ইতি এতেষু এব গ্রন্থেষু প্রাপ্ততত্ত্বম্ অধিকৃত্য অয়ং প্রবন্ধ: সীমায়িত:। অস্মিন্ নাতিবিস্তৃতে প্রবন্ধে অধোলিখিতেষু অনুচ্ছেদেষু গবেষণালব্ধং তথ্যং প্রদর্শিতম্।

'ভূমিকা'-ইত্যনুচ্ছেদে 'পুরুষার্থ'-শব্দস্যার্থ:, প্রকারভেদা:, মোক্ষলাভস্য প্রয়োজনীয়তা, উক্ত গ্রন্থত্রিতয়ে মোক্ষপ্রসঙ্গ:, মোক্ষলাভে যোগসাধনায়া উপযোগিত্বম্ আলোচিতম্। 'যোগপ্রসঙ্গ:' ইত্যনুচ্ছেদে যোগ-শব্দস্যার্থ:, যোগচতুষ্টয়স্য পরিচয়:, উক্তগ্রন্থত্রিতয়ে যোগপ্রসঙ্গ:, যোগানাং সমন্বয়সাধনমেব পরমপুরুষার্থপ্রাপ্তিসহায়কম্ ইতি বিশদীকৃতম্। 'পাতঞ্জলযোগদর্শনসম্মতং যোগসাধনম্' ইত্যনুচ্ছেদে পতঞ্জলিমতানুসারং যোগস্বরূপম্, চিত্তবৃত্তয়:, চিত্তভূময়:, সমাধিদ্বৈবিধ্যং, যোগারূঢ়স্য অসম্প্রজ্ঞাতসমাধৌ কৈবল্যলাভপ্রভৃতয়ো বৈশদ্যেন পর্যালোচিতা:। ভগবদ্গীতা- প্রতিপাদিতং যোগসাধনম্ ইত্যনুচ্ছেদে গীতানুসারং যোগশব্দস্যার্থ:, যোগচতুষ্টয়স্য স্বরূপবিবরণম্, যোগত্রয়স্য পরস্পরাণাং পরিপূরকত্বং প্রতিপাদিতম্। 'ভগবদ্ভক্তিরসায়নে উল্লিখিতো যোগপ্রসঙ্গ:'

ইত্যনুচ্ছেদে মধুসূদন- সরস্বতীমহোদয়স্য মতানুসারং ভক্তিযোগস্য স্বরূপকথনং, জ্ঞানযোগস্য ভক্তিযোগে পর্যবসানম্ প্রদর্শিতম্। ভক্তিদ্বয়মধ্যে পরাভক্তিরেব সাধনস্য চরমং ফলমিত্যালোচিতম্।

'উক্তশাস্ত্রপ্রতিপাদিতযোগতত্ত্বানাং তুলনাত্মকমালোচনম্' ইত্যনুচ্ছেদে যোগদর্শন- গীতোক্তযোগসাধনয়ো: সাদৃশ্যং-বৈসাদৃশ্যং প্রথমমালোচিতম্। পরবর্তীপর্যায়ে গীতা- ভক্তিরসায়নয়োরপি সাদৃশ্যাদিকমালোচিতম্। উপসংহারে মানবমাত্রস্য ব্যাবহারিকজীবনে কর্মযোগাদীনাম্ উপযোগিত্বং তথা অধ্যাত্মসাধনায়াং পরমপুরুষার্থলাভে চ অনিবার্যোপযোগিত্বং প্রতিপাদিতম্।

সূচকশব্দা:–পুরুষার্থ:, পরমপুরুষার্থ:, মোক্ষ:, যোগ:, অষ্টাঙ্গযোগ:, চিত্তবৃত্তি:, চিত্তভূমি:, সমাধি:, জ্ঞানযোগ:, কর্মযোগ:, ভক্তিযোগ:, রাজযোগ:, পরাভক্তি:, সাদৃশ্যম্, বৈসাদৃশ্যম্, অধ্যাত্মসাধনা।

বিষয়:

ভূমিকা- কো নাম পুরুষার্থ:? তত্রোচ্যতে- মনুষ্যজীবনস্য চরমং সর্বোচ্চং বা লক্ষ্যমেব পুরুষার্থ:। পুরুষস্য অর্থ: প্রয়োজনং নিতরাং কাম্যমেব পুরুষার্থ:। প্রাচীনকালত এব চতুর্বিধ: পুরুষার্থ: ভারতীয়দর্শনেষু স্বীকৃত:। তে খলু ধর্মার্থকামমোক্ষা ইতি। তত্র মোক্ষ এব পরমপুরুষার্থ ইতি কথ্যতে। জীবা: খলু প্রতিনিয়তং জননমরণচক্রে আবর্তন্তে। তত্র পূর্ণাঙ্গমুক্তিলাভে যদ্বা মোক্ষলাভে এব তস্মাত্ নিস্তারং লভ্যতে- ততস্তে ন পুনরাবর্তন্তে ইতি শাস্ত্রসিদ্ধান্ত:। পাতঞ্জলদর্শনে মোক্ষ কৈবল্যমিত্যুক্তম্। একান্তযোগসাধক: এব সংসারবন্ধনং ছিত্ত্বা কৈবল্যং লভতে। পূর্বং বদ্ধ: পশ্চাৎ মুক্তো ভবত্যসৌ। তত্র অষ্টাঙ্গযোগানুশীলনেন চিত্তবৃত্তিনিরোধক্রমেণ কৈবল্যপ্রাপ্তিযোগ্য: ভবতি একনিষ্ঠ: সাধক:। শ্রীভগবন্মুখনিঃসৃতবাণী ভবতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। তত্র ভগবতা ভণিতং যদ্ কামক্রোধলোভৈ: মুক্তো সাধক: জগৎকল্যাণসাধনদ্বারেণ পরমগতিং মোক্ষং বা লভতে-

"এতৈর্বিমুক্ত: কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নর:।
আচরত্যাত্মন: শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্।।"[১] ইতি।

আচার্যেণ শংকরেণাপি শারীরকভাষ্যে কথিতং-'ঈশ্বরানুগ্রহহেতুকেনৈব চ বিজ্ঞানেন মোক্ষসিদ্ধির্ভবতি' ইতি। তত্র তু তেন মোক্ষলাভে ভক্তিজ্ঞানয়োঃ আবশ্যকত্বং স্বীকৃতমেব। এবমেব 'ভক্তিরসায়নমিতি' গ্রন্থে ভক্তিজ্ঞানমার্গয়ো: সমন্বয়সাধনং সাধকেন করণীয়মিতি নির্দেশিতম্। যোগদর্শনোক্তাষ্টাঙ্গযোগ: জ্ঞানযোগান্তর্গত:। মধুসূদনসরস্বতীপাদেন পরাভক্তিলাভ এব সাধনস্য চরমং ফলমিতি কথিতম্। জ্ঞানযোগে তু জীবপরমাত্মনো: ভেদবুদ্ধি: তিরোহিতা ভবতি ইতি তত্র নির্বিকল্পকজ্ঞানং প্রাগেব জায়তে। ভক্তিযোগে তু জীবপরমাত্মনো: ভেদবুদ্ধির্বিদ্যতে এব ইত্যস্তি মার্গয়ো: পার্থক্যম্।

যোগপ্রসঙ্গ:- যুজধাতোর্ঘঞ্প্রত্যয়যোগেন নিষ্পন্ন: যোগশব্দ:। তস্যার্থ: যোজনং মেলনমিত্যাদয়:। অমরকোষে কথিতং 'যোগ: সন্নহনোপায়-ধ্যান-সংহতি-যুক্তিসু'[২] ইতি। পাণিনিমতে- 'নিমিত্তাৎ কর্মযোগে'[৩] ইতি। জ্যোতিষশাস্ত্রে তু তিথি-বার-নক্ষত্রাদীনাং

সম্বন্ধ: যোগ: যথা অমৃতযোগ: ইত্যাদি:। 'ইন্দ্রিয়াণাং জয়ে যোগমিত্যা'দি [৪] মনুবচনে যোগস্যার্থ: চেষ্টা ইতি। মহাকবি- কালিদাসেন তু যোগস্যার্থ: পরমাত্মন: ধ্যানমিত্যাহ- 'বার্ধক্যে মুনিবৃত্তীনাং যোগেনান্তে তনুত্যজাম্'[৫] ইতি। ভগবদ্গীতাদিষু যোগশব্দেন কর্মযোগ-ভক্তিযোগ-রাজযোগ-জ্ঞানযোগা ইতি যোগচতুষ্টয়ং নির্দেশিতম্ –

"ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্মযোগেন চাপরে।।"[৬] ইতি।

পাতঞ্জলে তু মনস-একাগ্রতাসাধনদ্বারেণ সমাধিলাভঃ যোগশব্দার্থ ইত্যুক্তং– 'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধ:'[৭] ইতি। তত্র প্রকৃতিপুরুষয়ো: বিবেকজ্ঞানং যোগস্য লক্ষ্যমিতি দর্শনস্যাস্য অপূর্বত্বম্। যমনিয়মাদ্যষ্টাঙ্গযোগ: অপি নির্দেশিতস্তত্র। ভগবদ্গীতায়াং ভগবৎকথিতপ্রথমযোগশব্দস্যার্থ: কর্মযোগ ইতি- 'এষা তে অভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু'[৮]। অলব্ধস্য লাভঃ যোগ ইত্যপি তত্রোক্তং ভগবতা- 'তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্'[৯]। যোগস্তত্ত্বজ্ঞানম্ ইত্যুক্তং- 'সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি'।[১০] গীতায়ামেব বিবিধার্থেষু যোগশব্দস্য ব্যবহার: লক্ষ্যতে। পরন্তু ভগবতা স্বয়মেব যোগশব্দার্থ: উক্ত: -যোগস্থ: কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়। 'সিদ্ধ্যাসিদ্ধ্যো: সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে।।'[১১] অত্র তু লাভালভায়োঃ জয়পরাজয়য়ো:, হর্ষবিষাদয়ো: নির্বিকারত্বং সমভাবত্বং হি যোগ ইত্যুক্তম্। ভক্তিরসায়নে যোগশব্দস্যার্থ: ভগবৎপ্রাপ্তে: উপায়:। অর্থাৎ যেন উপায়েন ভগবতা সহ যোগসাধনং ভবতি স এব যোগ:। তত্র কর্মযোগ-ভক্তিযোগ-জ্ঞানযোগ ইতি যোগত্রয়মুক্তম্। কথিতং চ আচার্যেণ- ভগবদ্বচনেন 'অষ্টাঙ্গযোগ: অপি জ্ঞানযোগান্তর্গতো দ্রষ্টব্য:' ইতি। অষ্টাঙ্গযোগানুশীলনং বিনা জ্ঞানযোগে সাফল্যং নৈব লভ্যতে ইতি সিদ্ধং তদন্তর্গতত্বম্। উক্তগ্রন্থত্রিতয়ে উক্তানাং যোগানাং সমন্বয়সাধনেন এব পরমপুরুষার্থপ্রাপ্তির্ভবতি ইতি গম্যতে।

পাতঞ্জলযোগদর্শনসম্মতং যোগসাধনম্-

পতঞ্জলিপ্রণীতে যোগসূত্রে যোগস্বরূপ: কথিত: - 'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধ'[১২] ইতি। চিত্তবৃত্তীনাং নিরোধ: এব যোগ ইত্যর্থ:। তত্র চিত্তবৃত্তীনাম্ উল্লেখ: কৃত:- প্রমাণ- বিপর্যয়- বিকল্প- নিদ্রা- স্মৃতয়:'[১৩] ইতি। প্রত্যক্ষানুমানশব্দা: প্রমাণানি। মিথ্যাজ্ঞানং বিপর্যয়:। বিকল্পস্তু শব্দজাত: ভ্রম: 'অভাবপ্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তির্নিদ্রা'- ইত্যুক্তম্। অনুভূত বিষয়স্য যথাযথং স্মরণং স্মৃতি:। এতচ্চিত্তবৃত্তীনাং নিরোধে পুরুষ: স্বরূপে প্রতিষ্ঠিতো ভবতি। অভ্যাসেন বৈরাগ্যেণ চ চিত্তবৃত্তীনাং নিরোধ: সম্ভবতি। চিত্তবৃত্তীনাম্ অবস্থাবর্ণনপ্রসঙ্গে চিত্তভূমেরুল্লেখ: কৃত: ভাষ্যকারেণ। চিত্তভূময়স্তু পঞ্চবিধ: ক্ষিপ্ত-মূঢ়- বিক্ষিপ্ত- একাগ্র- নিরুদ্ধভেদাৎ। চিত্তবৃত্তয়: যথাযথং নিরুদ্ধাশ্চেদ্ যোগী সমাধিস্থো ভবতি। সমাধিস্তু সম্প্রজ্ঞাতাসম্প্রজ্ঞাতভেদেন দ্বিবিধ:। অসম্প্রজ্ঞাতসমাধিলাভে যোগিন: কৈবল্যপ্রাপ্তির্ভবতি। চিত্তবৃত্তীনাং নিরোধে অষ্টাঙ্গযোগস্যাপি উপযোগিত্বং প্রদর্শিতং সূত্রকারেণ। অষ্টাঙ্গযোগস্য যথাযথম্ অনুশীলনান্তরং যোগী নিরোধভূমিং প্রাপ্ত: সন্ অসম্প্রজ্ঞাত-সমাধিং লব্ধুং

সমর্থোভবতি তথাহি – 'যম- নিয়মাসন- প্রাণায়াম- প্রত্যাহার ধারণা- ধ্যান- সমাধয়: অষ্টাঙ্গানি'[১৪] ইতি। এতেষাং যথাযথম্ অনুষ্ঠানেন সংযতস্য যোগিন: বিবেকখ্যাতিরূপপ্রজ্ঞায়া উৎপত্তৌ চিত্তে জ্ঞানস্য বিকাশ: ভবতি- 'তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোক:'[১৫] ইতি। বিবেকখ্যাতি পরিপক্কা চেৎ পরবৈরাগ্যমুদেতি। পরবৈরাগ্যং সুদৃঢ়ং চেদ্ অসম্প্রজ্ঞাতসমার্ধিলভ্যতে যোগিন:। অয়মেব কৈবল্যলাভ ইত্যুচ্যতে। 'পুরুষস্য প্রয়োজনানাং সমাপ্তো গুণানাং প্রতিপ্রসব: কৈবল্যং..'[১৬]। ইতি।

ভগবদ্গীতা- প্রতিপাদিতং যোগসাধনম্-

ভগবদ্গীতানুসারং যোগশব্দস্যার্থ: পূর্বমেবোক্ত:। যুজ্ধাতোর্নিষ্পন্নত্বাৎ যোগশব্দেন- জীব-পরমাত্মনো: সংযোগ: ব্রহ্মাত্মৈক্যোপলব্ধির্বা গম্যতে। 'যোগ: কর্মসু কৌশলম্'[১৭]। ইত্যত্র তু ভগবতা নিষ্কামকর্মযোগ এব ঈঙ্গিতম্। গীতায়াম্ অষ্টাদশাধ্যায়া: বিবিধযোগশব্দেন অভিহিতা:। তে সর্বে আত্মোপলব্ধিসহায়কা:। এতেষু যোগচতুষ্টয়স্য প্রাধান্যমেব প্রতীয়তে। কর্মযোগ- ভক্তিযোগ- রাজযোগ- জ্ঞানযোগাশ্চেতি চত্বার:। অন্যে যোগা: খলু এতচ্চতুষ্টয়ান্তর্গতা ইতি পর্যালোচনান্তরং জ্ঞায়তে। স্বয়ং ভগবতা অপি আত্মদর্শনোপায়রূপেণ যোগচতুষ্টয়ং কথিতং –

'ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্মযোগেন চাপরে।
অন্যে ত্বেবমাজনন্তঃ শ্রুত্বা অন্যেভ্য উপাসতে।
তে অপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ।।'[১৮] ইতি।

কেচিদ্ কর্মযোগেন, কেচিদ্ ভক্তিযোগেন, কেচিদ্ জ্ঞানযোগেন, রাজযোগেন বা আত্মদর্শনেন মৃত্যুম্ অতিক্রামন্তি ইত্যাশয়:। স্বস্বকর্তব্যসম্পাদনরূপ-শাস্ত্রবিহিত-সাধনেন ব্রহ্মাত্মৈক্যোপলব্ধে: অন্যতম উপায়: খলু নিষ্কাম: কর্মযোগ:। ঈশ্বরলাভোপায়রূপেণ নিরাসক্তভাবেন নিষ্কামভাবেন বা কর্মানুষ্ঠানং হি কর্মযোগ ইতি। কর্মযোগী কর্তব্যবুদ্ধ্যা নির্লিপ্তভাবেন সর্বকর্মানুষ্ঠানং কৃত্বা সর্বকর্মফলানি ঈশ্বরার্পনং কুর্যাৎ। শ্রীভগবতা চ তদুপদিষ্টং-

'যৎ করোষি, যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্।।'[১৯] ইতি।

নিষ্কামকর্মযোগানুষ্ঠানেন কর্মযোগী বিশুদ্ধচিত্ত: সন্ আত্মজ্ঞানলাভে অধিকারী ভবতীতি আশয়:। পূর্বত: কথমপি ধর্মবিশ্বাসোপরি অনির্ভরশীল: সন্ কেবলং শাস্ত্রোপদিষ্টসাধনক্রমমনুসৃত্য মুক্তিলাভোপায়: রাজযোগ ইতি কথ্যতে। পতঞ্জলিকথিতম্ সমাধিলাভোপায়রূপেণ অষ্টাঙ্গযোগস্য উল্লেখ: ভগবদ্গীতায়ামপি ভগবতা নির্দেশিত:। ভক্তিস্তু ভগবৎপ্রতি পরানুরক্তি:। এবম্বিধয়াভক্ত্যা ভগবল্লাভোপায়: এব ভক্তিযোগ ইতি কথ্যতে। তত্র জীবব্রহ্মৈক্যোপলব্ধি: যেন আধ্যাত্মিকসাধনেন সাধক: লব্ধুং সমর্থো ভবতি, স এব জ্ঞানযোগ ইতি। এতৎসাধনস্য অঙ্গরূপেণ শ্রবণ- মনন- নিদিধ্যাসনানি নির্দেশিতানি। গীতানুসারং নিষ্কামকর্মযোগিন: জ্ঞানোদয়ানন্তরং-

"সর্ব কর্মাণি জ্ঞানে এব প্রলীয়ন্তে ইত্যাহ-
সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।"[২০] ইতি।

তত্রেদম্ অবধেয়ংযৎ রাজযোগ: অভ্যাসযোগো বা সর্বেষাং যোগানাম্ অঙ্গত্বেন পরিগৃহ্যতে ইতি সাধকানাম্ অনুভব:। তত্র চ কর্মজ্ঞানে ভক্তিযোগস্য সাধনে ভবত:, কর্মভক্তিজ্ঞানানাং মধ্যে নাস্তি ক: অপি বিরোধ: পরন্তু একৈক: খলু পরস্পরাণাং পরিপূরক এব। ত্রিধারা তু ত্রিবেণীসঙ্গম ইব পরমলক্ষ্যাভিমুখং সততং ধাবমানা ইতি উপলভ্যতে। গীতায়াং লক্ষ্যতে- হি- নিষ্কামকর্মযোগেন চিত্তবৃত্তিনিরোধাৎ ব্রাহ্মীস্থিতির্লভ্যতে- ইত্যাহ- 'তং বিদ্যাদ্দু:খসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্'।[২১] তত্র তু উপায়ভূতরূপেণ অষ্টাঙ্গযোগস্য উল্লেখ: কৃত:। অন্তরঙ্গসাধনত্রয়মধ্যে- সমাধিরেব মোক্ষলাভস্য অন্তিম: পন্থা ইতি স্বীক্রিয়তে-

'সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ।।'[২২] ইতি।

ভক্তিরসায়নে প্রতিপাদিতং যোগসাধনম্-

শ্রীমন্মধুসূদন- সরস্বতী- বিরচিতং 'ভক্তিরসায়নম্' ইতি গ্রন্থ: বিদ্বদ্বরেণ্যৈ: সমধিকং সমাদৃতো লক্ষ্যতে। তত্র মঙ্গলাচরণস্য টীকায়াং তেন কথিতং কর্মযোগ:, অষ্টাঙ্গযোগ: জ্ঞানযোগ: ভক্তিযোগ ইতি চত্বার: পুমর্থত্বেন প্রসিদ্ধা যোগা: ইতি। পুনশ্চোক্তং তেন তত্র- 'ভগবদ্বচনেন অষ্টাঙ্গযোগ:অপি জ্ঞানযোগান্তর্গতো দ্রষ্টব্য:' ইতি। কর্মযোগবিষয়ে অপি কথিতং- 'অন্ত:করণশুদ্ধিসাধনত্বং চ তস্য ধর্মেণ পাপমপনুদতি তস্মাদ্ধর্মং পরমং বদন্তি'[২৩] ইতি। কর্মানুষ্ঠানং হি চিত্তশুদ্ধেরুপায়:, তদ্ধর্মানুষ্টানেন পাপক্ষয়ো ভবতীতি তৎ পরমং সাধনমিত্যুক্তম্। ততশ্চ ভক্তিযোগ- জ্ঞানযোগ- বিষয়ে কথিতং- 'তত: অন্ত:করণশুদ্ধ্যাষ্টাঙ্গযোগমনুষ্ঠায় তৈলধারাবদবিচ্ছিন্ন- ভগবদেকাকার-প্রত্যয়পরম্পরাত্মকৈকাগ্রতাযোগ্যং মন: সম্পাদয়েৎ'[২৪] ইতি।

অর্থাৎ, সাধকস্তস্য চিত্তশুদ্ধি-সম্পাদনান্তরম্ অষ্টাঙ্গযোগানুষ্ঠানং করিষ্যতি। তত: তৈলধারাবদ্ অবিচ্ছিন্নপ্রবাহেন ভগবচ্চিন্তারূপৈকাগ্রতালাভায় মন: যোগ্যং কুর্যাৎ। এবমেব মন: সুস্থিরং স্যাৎ, সাধকহৃদয়ে চ জ্ঞানযোগ: সুদৃঢ়ং প্রতিষ্ঠিত: ভবতি। 'মনো যাবৎ প্রসীদতি'[২৫] -ইত্যস্মিন্ বচনে ভক্তিযোগ: জ্ঞানযোগস্য অন্তিমা সীমা প্রতিপাদিতা ইতি মন্যতে মধুসূদনপাদৈ:। তত্র কারণমপ্যুক্তং- 'ভক্তিযোগং বিনা মনস: সম্যক্প্রসাদাভাবাৎ'[২৬] ইতি। ভক্তিযোগস্য শ্রেষ্ঠত্বং তেন সমুদ্ঘোষিতং- 'স এব ভক্তিযোগ ইতি তং পরমং নিরতিশয়ং পুরুষার্থং বদন্তি রসজ্ঞা:'[২৭] ইতি। পুনশ্চোক্তং- 'ভগবদ্ভক্তিযোগস্যাপি দু:খাসংভিন্নসুখত্বেনৈব পরমপুরুষার্থত্বম্ ইত্যাহ- নিরূপমসুখসম্বিদ্রূপমস্পৃষ্টদু:খম্'[২৮] ইতি। ভক্তিযোগস্য শ্রেষ্ঠত্বপ্রমাণে তেন ভগবদ্গীতাবচনমুদ্ধৃতম্-

'যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।

শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ।।'[২৯] ইতি।

অথ যোগসাধনবিষয়ে উক্তগ্রন্থত্রিতয়ে প্রতিপাদিততত্ত্বানাং তুলনাত্মকালোচনং ক্রিয়তে-

বিষয়:	পাতঞ্জলযোগসূত্রম্	ভগবদ্গীতা	ভক্তিরসায়নম্
১। স্বীকৃতো যোগ:	অষ্টাঙ্গযোগ:	কর্মযোগ: জ্ঞানযোগ: রাজযোগ: ভক্তিযোগ:	কর্মযোগ: অষ্টাঙ্গযোগ: জ্ঞানযোগ: ভক্তিযোগ:
২। বিবিধযোগেষু প্রাধান্যম্	অষ্টাঙ্গযোগ:	ক) শঙ্করমতে জ্ঞানযোগ: খ) ভগবদ্বচনানুনয়ে: ভক্তিযোগ:	ভক্তিযোগ:
৩।অন্তর্ভুক্তি:	ভক্তিযোগ: অষ্টাঙ্গযোগান্তর্গত:। প্রমাণম্- 'ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা'।	জ্ঞান-কর্ম-ভক্তিযোগেষু রাজযোগ: অন্তর্গত:	অষ্টাঙ্গযোগ: ভক্তিযোগে অন্তর্গত:
৪। অষ্টাঙ্গযোগস্য স্বীকৃতি:	অষ্টাঙ্গযোগ: অঙ্গীকৃত:	রাজযোগে অষ্টাঙ্গযোগ: বিবৃত:	চিত্তশুদ্ধিনিমিত্তম্ অষ্টাঙ্গযোগ: অঙ্গীকৃত:
৫। পরমপুরুষার্থ:	কৈবল্যপ্রাপ্তি:	মোক্ষপ্রাপ্তি:	ভক্তিযোগেন পরমপুরুষার্থলাভ:
৬।নিষ্কামকর্মযোগ:	নিষ্কামকর্মযোগ: ন স্বীকৃত:, অষ্টাঙ্গযোগেন চিত্তশুদ্ধির্ভবতি	নিষ্কামকর্মযোগ: স্বীকৃত:	চিত্তশুদ্ধিনিমিত্তম্ নিষ্কামকর্মযোগ: স্বীকৃত:
৭। ভক্তিস্বীকরণম্	ঈশ্বরং প্রতি ভক্তি: স্বীকৃতা	ভগবতা স্বয়মেবভক্তি: স্বীকৃতা	ভক্তিরেব মূলম্, ভক্তিরেব গরীয়সী
৮। সমাধি:	দ্বিবিধ:সমাধি: স্বীকৃত:	অসম্প্রজ্ঞাত: সমাধি: স্বীকৃত:	সমাধি: স্বীকৃত:

উপসংহারে বয়মিদং বক্তুং পারয়ামো যদ্ উক্তগ্রন্থত্রিতয়ে মোক্ষলাভায় কৈবল্যপ্রাপ্তয়ে বা যোগসাধনম্ অন্যতম: উপায়: স্বীকৃত:। পরমপুরুষার্থলাভায় যোগসাধনস্য প্রাধান্যং সর্বত্রৈব অঙ্গীকৃতম্। এতদ্বিষয়ে গ্রন্থত্রিতয়ে যৎ প্রতিপাদিতং তত্ত্ব একম্ অপরস্য প্রতিধ্বনিমাত্রমিতি বক্তুং শক্যতে ইতি শম্।

তথ্যসূত্রম্:

১। গীতা -১৬/২২।
২। অমরকোষ – ৩/৩/২২।
৩। অষ্টাধ্যায়ী – ২/৩/৩৬।
৪। মনুসংহিতা – ৭/৪৪।
৫। রঘুবংশম্ – ১/৮।
৬। গীতা – ১৩/২৪।
৭। যোগসূত্রম্ – ১/২।
৮। গীতা – ১৩/২৪।
৯।যোগসূত্রম্ – ১/২।
১০। গীতা –২/৫৩।
১১। গীতা –২/৪৮।
১২। যোগসূত্রম্ – ১/২।।
১৩। যোগসূত্রম্ – ১/৬।
১৪। যোগসূত্রম্ –২/২৯।
১৫। যোগসূত্রম্ – ৩/৫।
১৬। যোগসূত্রম্ – ৪/৩৪।
১৭। গীতা – ২/৫০।
১৮। গীতা – ১৩/২৪-২৫।
১৯। গীতা – ৫/২৯।
২০। গীতা – ৪/৩৩।
২১। গীতা – ৬/২৩।
২২। গীতা – ৬/২৯।
২৩। মা.উ – ২২/১।
২৪। ভক্তিরসায়নম্ টীকা – ৩।
২৫। ভাগবতপুরাণম্ – ১১/২০/২২।
২৬। ভক্তিরসায়নম্ টীকা – ৪।
২৭। ভক্তিরসায়নম্ টীকা – ৫।
২৮। ভক্তিরসায়নম্ টীকা – ৮।
২৯। গীতা – ৬/৪৭।

গ্রন্থপঞ্জী:–

- তিলক,বালগঙ্গাধর- শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারহস্য– পঞ্চম সংস্করণ, ডক্টর ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী অনূদিত সম্পাদিত ,কলিকাতা, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ।

- ব্রহ্মচারী, মহানামব্রত- গীতাধ্যান, অখণ্ড সংস্করণ ,কলিকাতা , ১৪০০ বঙ্গাব্দ।
- মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দ গোপাল - গীতার কথা, তৃতীয় সংস্করণ, শুভেন্দ্র কুমার মিত্র অনূদিত, কলিকাতা, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ।
- ভর্গানন্দ, স্বামী (সম্পাদিত) পাতঞ্জল যোগদর্শন, উদ্বোধন কার্যালয় ,কলিকাতা।
- মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দ গোপাল- যোগের কথা, শ্রী সারদা মঠ ,কলিকাতা, ২০১১।
- শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা - নলিনীকান্ত ব্রহ্ম সম্পাদিত, গূঢ়ার্থদীপিকাটীকা ,অনুবাদ সহ- প্রথম নব ভারত সংস্করণ ,১৩৯৩ বঙ্গাব্দ।
- শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা- মূল অনুবাদ, শাংকরভাষ্যাদি সহ, ম. ম . প্রমথনাথ তর্কভূষণ সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯৮০।
- সাংখ্য- বেদান্ততীর্থ দুর্গাচরণ (সম্পাদিত)- ভক্তিরসায়নম্, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার ,কলিকাতা, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ।
- স্বামী রঙ্গনাথানন্দ – শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও বিশ্বজনীন বার্তা(১-৩ খন্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা।
- স্বামী রামসুখ দাস – গীতা দর্পণ ,প্রথম সংস্করণ, গোরক্ষপুর, ১৯৯২।

Mosque Architecture of Murshidabad During 18th Century

Emili Rumi
Assistant Professor (History)
Sripat Singh College
Jiaganj, Murshidabad,W.B.

Abstract: In 1704, a new era began in the history of Bengal with the transfer of the *Diwani* office from Dhaka to Murshidabad by MurshidQuli Khan, the then *diwān* of Bengal. He altered the name of Muqsudabad to his name as Murshidabad and made it the capital metropolis. Henceforth, the *Nawabi* rule started. Because of the declining condition of the Mughal empire, many learned persons left north India and took shelter in the regional courts like Hyderabad, Awadh, Murshidabad etc. As a capital city, Murshidabad attracted many learned and intellectual personalities to its court. Subsequently, under the *Nawabs,* Murshidabad became the hub of cultural activities. The *Nawabs* expanded zealous patronization to art and architecture which added a new dimension to the culture of *sūba* Bengal. Under the *Nawabs* of Murshidabad, a new type of architectural style evolved.For various purposes, administrative departments, buildings for different offices, housing, etc. had to be constructed. From MurshidQuli Khan to Siraj-udDaulah, all the *Nawabs* got occupied themselves in building structures such as castles, mosques, gardens, *katrās* (bazaar) etc. Even after the fall of the *Nawabi* rule, the course of architectural production did not cease. The company also introduced European features to the architecture of the territorial dominion. Not only the *Nawabs* who made attempts to beautify the urban centre, but also the merchants, bankers, and aristocracy contributed their efforts. A rare case of combined Imperial, local and colonial architecture evolved in Murshidabad which can barely be considered in any other parts of India. This paper is a modest attempt to describe the architectural features of the mosques of Murshidabad in the 18th century.

Key Words: Murshidabad, *Nawabs*, Mosque, Architecture, Dome, Entrance

The ideas and attitudes of the ruling classes of Bengal had influenced the ethnic activities of Bengal throughout the centuries. The ruling classes of Bengal have been often of foreign origins, and apparently, their alterations with the details of topography and monsoon climate had bearings on their aesthetic and construction activities. Thus, such a circumstance had a special significance for the cultural history of Bengal. Every new regime with alien cultures tried to create new experiments modifying the living society of art and architecture.[1] This was very true for the *Nawabi* rule of Murshidabad. After the transfer of the *Diwani* office from Dhaka to Muqsudabad in 1704, a new era began in the history of Bengal. MurshidQuli Khan, the then *diwān* of Bengal transferred the *Diwani* office for several causes. He altered the name of Muqsudabad to his name as Murshidabad and made it the capital metropolis. Henceforth, the *Nawabi* rule started. The 18th century witnessed an exodus of the carriers of Mughal cultures to the regional centres like Hyderabad, Awadh and Murshidabad because of the tottering condition of the Mughals. This particular city Murshidabad attracted many learned and intellectual personalities to the court, as by that time it became one of the prosperous regions of India. It could put up all opportunities to create a lot. Even the merchants met in the city to earn their fortune. Men of various races and religions from different corners of India flocked here. Thus, under the *Nawabs,* Murshidabad became the hub of cultural activities. The *Nawabs* expanded zealous patronization to art and architecture which added a new dimension to the culture of *sūba* Bengal. During the period of the decadence of the Mughal rule, the *Nawabs* tried to reproduce the Mughal manner without an understanding of its spirit or an awareness of the limitations of the material in this regard.[2] Under the *Nawabs* of Murshidabad, a new type of architectural style evolved. In the Mughal centres where numbers of Mughal officials settled down, this new type was adopted. For various purposes, administrative departments, buildings for different offices, housing, etc. had to be constructed. Apart from this, the *Nawabs* of Murshidabad had a keen aesthetic sense and discernment. From Murshid Quli Khan to Siraj-ud Daulah, all the *Nawabs* got occupied themselves in building structures such as castles, mosques, gardens, *katrās* (bazaar) etc. Even after the fall of the *Nawabi* rule, the course of architectural production did not cease. The East India company also introduced European features to the architecture of the

territorial dominion. Not only the *Nawabs* who made attempts to beautify the urban centre, but also the merchants, bankers, and aristocracy contributed their efforts. A rare case of combined Imperial, local and colonial architecture evolved in Murshidabad which can barely be considered in any other parts of India. This paper is a modest attempt to describe the architectural features of the mosques of Murshidabad during the 18th century.

Murshid Quli Khan tried his best to adorn the capital city with some excellent architectural structures. Jami mosque or the Katra *masjid* is one of the surviving buildings that he built. It is the largest Mughal mosque built in Bengal and the strongest assertion of power and piety of the builder. This was built in 1724-25. [3] The mosque is rectangular, measuring 130 feet by 24 feet with octagonal corner miniatures. Each doorway opens under a high multi-cusped arch. This feature indicates an early European influence on the architecture in Bengal. The mosque is surrounded by double-storied domed cells that served as a *madrasa*.MurshidQuli Khan wished to be buried after his death in a tomb underneath the entrance portal of the Katra mosque. The domes are of metal made. There is a threshold of big black stone at the entrance of the mosque.Morad Farash, a loyal officer of Murshid Quli Khan was appointed to supervise the construction of the *Katramasjid*.[4]

Shujauddin Khan had also a high taste in architectural style. He made some alterations to the palace of forty pillars or popularly known as Chehal Sutūn. Many buildings were constructed as government offices like Diwan Khana, Khilat Khana, Farman Bari etc. during his reign. He was a man of ease loving and building construction was his hobby, indeed. Wherever he went, he built palaces and named them Mubarak Manzil. He completed the construction of the mosque and garden started by Nazir Ahmed at Dahapara. There he built palaces, tanks etc. and named it as Farāhbāgh or the pleasure garden where different types of festivals were organized throughout the year.[5]

According to tradition at Kumarpore, Sarfaraz Khan built the Phuti mosque. It is one of the largest mosques in the city. It is surmounted by five domes. Four spiral stairs are there at the corners and are surmounted by four cupolas. The *mihrāb* is of seven arches and characterized by works of lime. The arches are also characterized by the works of lime.[6]

On the west bank of river Bhagirathi, there is the tomb compound of Nawab Shujauddin. In that compound, Alivardi Khan built a small mosque in 1743. The mosque is rectangular and three bayed with engaged columns flanking its central entrance. This is a Mughal style. At the front, there is a plastered *do-chala* roof motif resting on heavy pillars above the main entrance. There are *chār-chala* motifs over the flanking entrances. The central dome is also sided by *chār-chala* vaults. Here the *mihrāb* has also a *do-chala* design, which is a very common feature in the 18th-century mosques of Murshidabad.[7]Khūshbāg or Garden of Happiness on the west bank of Bhagirathi is a burial garden built by Alivardi Khan. Tombs of Alivardi, Siraj-ud Daulah, Lutf-un Nisha, and possibly Sarf-un Nisha are there in this garden.[8]

At Chunakhali, once in the city of Murshidabad, there are remains of two ancient mosques. There is a mausoleum that contains the tomb of Fakir MasnadAulia. The mausoleum is in a good state of preservation and contains three slabs of basalt with *Tughra* inscriptions. The mosques are almost ruined.[9]

One of the architectural monuments, the Imāmbara (Fig.2), was built by Siraj- ud Daulah. The Madina is situated in the middle of the Imambara. Six feet of the land was dug out and filled with mud brought from Karbala (according to tradition). Above is a small four-cornered building and the building had a dome and four small minarets. Siraj-ud Daulah decorated the Imāmbara and the Madina with costly fabrics. Its beauty has been described by Ghulam Hussain Salim, "Its praise is beyond description; its equal is not to be found in the whole of Hindustan."[10]

The Chowk masjid (Fig.3), the most important mosque of Murshidabad was built by Munni Begum in the year 1767. This mosque was built under the supervision of Shaikh Khalilullah. This is a large seven-bayed mosque. It has five large domes and two *chār-chala* end vaults. In front of it, there is a large enclosed courtyard, which served as a *madrasa*. Here the inscription is the *pietra dura* inlay whereas almost all other inscriptions are carved in black stones. The European influence is seen in the ornate east facade. By this time British influence is not only seen in certain architectural elements but also the overall restraint shown in the buildings. [11]

On the western side of the Bhagirathi was the palace of Hira Jheel (lake) built by Siraj-ud Daula.[12] Along with the palace he built an artificial lake named as Hira Jheel. Being a man of aesthetic sense and discernment he enhanced the beauty of the palace by putting some stones with the bricks.[13] On the south-east of the palace of the Nawab Bahadur is the MotiJheel or the pearl lake was built by Nawazish Khan, nephew and son-in-law of Alivardi Khan in the year 1743.[14] Later he added a gateway to the west of the palace and fortified it. He also built a mosque, a *madrasa* and a guest house near the palace in 1750-51**.** But all these buildings are examples of decadent styles of Mughal architecture.[15]

A house where the footprints of The Prophet are kept is called the Qadam Sharif. The earliest structure of Qadam Sharif complex in the district dates back to 1780 built by Khan-i Ala Itwar Ali Khan, the chief eunuch of MīrJafar. A mosque was built in 1780 and the footprint was built in 1788. The mosque is three-bayed. There are three domes on the east facade of the mosque and the domes are ribbed and have tightly constricted necks, which gives a bulbous appearance. This type of dome was perhaps the first in east India.[16]

The nobles of Murshidabad had also an aesthetic sense and they contributed their efforts to building mosques. The mosque of Shah Nisar Ali of 1778 is worth mentioning. The mosque has three domes with a rectangular shape. The central facade is adorned by cusped arched gateways. It is enclosed by a wall and four corner turrets are flanked on the four sides. Cartouche design is there in the cusped arched gateways except for the central gateway. The alcove area of the central gateway has a fan motif done with stucco work. The mosque of Saif Allah (1748), the mosque of Dost Muhammad (1753-54), the mosque of Shah Quli (171758-59), Qutubpur mosque (1769-70) are to be mentioned here. These mosques bear the Indo- Islamic features and European features as well.[17]

Above are some of the mosques and some other buildings during the 18th century constructed by the court and local patronization, though all the examples could not be taken in this paper. But from the above discussions, we can see that there evolved a new kind of architectural traditions in Murshidabad during the period of our review.The new tradition can be visible in the mosques of the district. The aesthetic sense of the *Nawabs* and favourable economy helped them to beautify the city.

With the establishment of the British Paramountcy in Bengal, the capital city had to face the immediate effects of the change. And its reflections are found in every aspect of the city. After 1765, the British moved their attention to Calcutta from Murshidabad. All the departments like *diwani*, exchequer and courts of civil and criminal justice were transferred to Calcutta. This was like a death blow to Murshidabad. The *Nawab* remained at Murshidabad as a resident and became a pensioner and dependant on the British. This dependency and gradual weaning away from roots are reflected in the architecture of Murshidabad from the early 19th century.[18] The first half of the eighteenth century witnessed the rise of Murshidabad to the highest degree of prosperity, whereas the second half saw its decline. The artistic heights that the city achieved started to show a downward curve. But this did not signify the decline in artistic productions. And the second half of the 18th century produced some architectural designs and some of them are in the form of mosques.

REFERENCES

1. Perween Hassan, 'Art and Architecture' in Sirajul Islam (ed.) *History of Bangladesh, 1704-1971*, Vol. III, Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka,2007,p.430
2. Sarasi Kumar Saraswati, 'Art' in N.K. Sinha (ed.) *History of Bengal* 1757-1905, 2nd Edition, University of Calcutta, June 1996, Calcutta, p. 53
3. Catherine Asher, 'Inventory of Key Monuments' in George Michell (ed.) *The Islamic Heritage in Bengal*, UNESCO, Paris, 1984,p. 37-140 as quoted in Parween Hassan, op., cit., p. 432
4. Ibid, p. 432, Sushil Choudhury, *Profile of a Forgotten Capital: Murshidabad in the Eighteenth Century*, Manohar,2018, New Delhi,p.164-165
5. Nikhil Nath Ray, *Murshidabader Kahini*, Punthi Patra, Kolkata, reprint Feb 2004, p. 26
6. DebasriDas,*Murshidabad, A Study of Cultural Diversity(From the early eighteenth century to the early twentieth century),*Arpita Prakasani, Kolkata,2008,p.401
7. Perween Hassan op., cit., p. 433
8. Tull Walsh, *A History of Murshidabad District, Biographies of some of Its Noted Families,*Jarrold and Sons, London, July 1902, p 75, Sushil Chaudhury, op.cit., p. 170

9. AsokeMitra, ed. *District Census Handbook, Murshidabad*, Calcutta, Government of West Bengal,1951, p. 185
10. Ghulam Hussain Salim, *Riyas-us Salatin* tr. by Maulavi Abdus Salam, Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 1902,p.29
11. Perween Hassan, op.,cit., p. 434
12. Ghulam Hussain Salim, op.cit., p.29
13. Nikhil Nath Ray, op.cit.,p. 99
14. Ghulam Hussain Salim, op.cit., p.290-91
15. Tull Walsh**,** op.cit.,p.278
16. Perween Hassan, op., cit., p.434
17. Samhita Sen, "European Influence on the Architectural Decoration of Murshidabad", *Journal of Bengal Art*, Vol. 23, 2018, pp.193-202
18. Perween Hassan, op.,cit., p.441

Attitude of High School Teachers Towards Inclusive Education

Md Siddique Hossain
Assistant Professor in Education,
Pandaveswar College, Pandaveswar,
Paschim Bardhaman,West Bengal

Abstract: The purpose of the present study was to investigate the attitude towards inclusive education among the high school teachers of Nadia. In the present study the researcher used descriptive survey method and quantitative analysis of data. 104 High School teachers considered as a sample of the study. A standardized Questionnare was used for data collection. Three hypothesis were framed according to the strata. The over all findings indicated that there were significant difference between male and female teachers but there is no significant difference between rural and urban ; and Arts and Science teachers. Attitude of High School teachers towards inclusive education could be formed and developed in the context of an educational system which can provide some specific conditions in order to have a good practice in this field.

Key words: *Attitude, School, Teachers, Inclusive Education.*

Introduction:

UNESCO'S action in the field of inclusive education has been set explicitly within the "inclusive education " framework adopted in 1994.

"……Schools should accommodate all children regardless of their physical, intellectual, emotional, social, linguistic or other condition." (Article 3, Salamanca Framework for Action).

"Regular school with this inclusive orientation are the most effective means of combating discriminatory attitudes, creating welcoming communities, building and inclusive society and achieving education for all; moreover, they provide an effective education to the majority of children and improve the efficiency and ultimately the cost-effectiveness of the entire education system."(Article 2, salamander statement).

"Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stage. Elementary education shall be compulsory."(Universal declaration of Human Rights, 1948, Article 26).

Negative teacher attitudes to words Inclusive Education are exemplified in the local school district of interest of this study. Inclusion began in the united states and Europe as a special education initiative on behalf of students with disabilities as early as the 1980.Now,more than two decades later, schools in these contraries are changing as educations prince, politicians and communities, try to prepare for the new challenges and promises of the 25 countries. How students with disabilities and special education continue to fit into this future is the ongoing challenges of inclusion.

Inclusive of such education plan is included in a very small number of specially educated children with disabilities. The concept of inclusion and co-coordinating education is often used in the same sense, where the disabled children are taught by classes' co-ordinations have been asked to include in the disabled children's integration education. But for this, the child has to provide early child training and their guardians have to be informed. So, co-ordination is just a part of unified education. Inclusive Education provides education in schools for children with disabilities. In this case, the education system is included in the reading syllabus with the importance, of special sexual needs among disabled children. All of the children with disabilities are not equal in their mental needs. They have to do the procedure for teaching and learning. All people with disabilities should not have the same mental needs, in line with their needs the curriculum training system should be evaluated for communication. There will be a chance to revise and update. Children should be able to continue the education system seems to be acceptable to both the general and disabled. In this case, the education system is included in the reading syllabus with the importance, of special sexual needs among disabled children. All of the children with disabilities are not equal in their mental needs. They have to do the procedure for teaching and learning. All people with disabilities should not have the same mental needs, in line with their needs. The curriculum training system should be evaluated for communication. There will be a chance to revise and update. Children should be able to continue the education system seems to do acceptable to both the general and disabled students.

The demand for secondary school teachers is ever with the ever expanding secondary education everywhere .Hundreds of teachers

are required to be recruited for the secondary schools. The teacher plays a vital role in the teaching learning process. Upon whose competency and effienciency the quality of education depends. Teacher behavior is conditioned by his psychological as well as sociological environments and hence certain qualities which are essential for good teacher are better developed in certain environments.

Statement of the Problem:

The purpose of the present study was to investigate the attitude towards inclusive education among the high school teachers of Nadia, hence the title of the research may be as- **"Attitudes of High School Teachers towards Inclusive Education."**

Objectives of study:

- To measure the attitude of school teachers towards inclusive education;
- To find out the nature of attitude of school teachers towards inclusive education;
- To identify the attitude of schhol teachers as strata wise (Gender,Localities,streams)
- To develop a tool for measuring of attitude of school teachers towards inclusive education.

Hypotheses:

Ho1: There would be no significant difference between attitude scores of rural and urban teachers towards inclusive education.

Ho2: There would be no significant difference between attitude scores of female and male teachers towards inclusive education.

Ho3: There would be no significant difference between attitude scores of science and arts teachers towards inclusive education.

Methodology:

Method: The method used in the present research is descriptive survey method and quantitative in nature.

Sample: The sample contained 104 teachers of different area of Nadia. Teachers (Men 50;Women54)are considered as the sample of the study of different places of the Nadia District on the basis of educational qualification and teacher attitudes at Higher Secondary level.

Tool used: Standardized Questionnare are used for data collection.

Sampling Technique: Purposive sampling are used for data collection of different ares of Nadia District.

Analysis and Interpretation:

H_1: There would be no significant difference between attitude scores of rural and urban teachers towards inclusive education.

Table-1: Showing Significant of the Difference Between for Rural and Urban

Localities	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	't' Value
Rural	68	101.51	7.076	.858	
Urban	36	101.31	6.882	1.147	0.145

No significant

Observation

It was found that in table-1 the mean score of teacher attitude towards inclusive education orural and urban groups were 101.51 and 101.31 respectively. There the t-value was 0.145 and the level of significance was 0.885.

Interpretation

In the above table-1 the mean score of rural group was 101.51 which was greater than that of urban group(101.31). The t-value($t=0.145$, $df=102$, $p>0.05$) was not significant at 0.05 level of significance. Thus, the H_1 was accepted. That means, there is significant difference between urban and rural groups in teachers attitude towards inclusive education.

H_2: There would be significant difference between attitude scores of female and male teachers towards inclusive education.

<u>Table-2: Showing Significant of different between male and female teacher</u>

Gender	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	't' Value
Male	50	102.94	6.988	0.988	2.143*
Female	54	100.06	6.736	0.917	

*Significant at 5%Level

Observation

It was found that table-2 that the mean score of teacher attitude towards inclusive education of female and male teachers were 102.94 and 100.06 respectively. There the t-value was 2.143 and the level of significance was 0.34.

Interpretation

In the above table-2 the mean score of male teachers was 102.94 which was grater than that of female teachers 100.06. The t-value(t=2.143, df=102, p>0.05) was significant at 0.05 level of significance.

Thus,$H_2$is rejected. That means there is no significant difference between male and female teachers attitude towards inclusive education.

H_3: There would be no significant difference between attitude scores of science and arts teachers towards inclusive education.

Table- 3 Showing Significant of the Difference Between for Arts and Science Teachers

Gender	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	‘t’ Value
Male	36	101.78	7.035	1.173	0.355
Female	68	101.26	6.992	0.848	

No Significant

Observation

It was found that in table-3 the mean score of teacher attitude towards inclusive education of science and arts teachers were 101.78 and 101.26 respectively. There the t-value was 0.355 and the level of significance was 0.886.

Interpretation

In the above table-3 the mean score of science teachers was 101.78 which was grater than that of arts teachers 101.26. The t-value(t=0.355, df=102, p>0.05) was not significant at 0.05 level of significance. Thus, the H_3 was accepted. That means, there is no significant difference between male and female teachers attitude towards inclusive education.

Findings:

After analyzing the data collected from the target sample through various techniques and describing the personal views on different dimensions of teaching life.

- ✓ There was no significant difference between rural teachers and urban teachers in attitude towards inclusive education.
- ✓ There was significant difference between male and female teachers in attitude towards inclusive education.
- ✓ There was no significant difference between science and arts teachers in attitude towards inclusive education.

Significance:

It is evident that teacher participation in school administration is in going importance and also essential for school quality and academic goal achievement. There Is importance that the present study attempts to find out the trend of teachers participation in school administration. For the successful school administration most of the teachers should take their part and the same may be provided by the school headmaster to all his teacher colleagues to make them participate in the school administration. Attitudes play an important role in teaching that is why there have been different definitions of attitude towards teachings.

Education:

- ➢ The very description of personal profiles of the sample that would show a general picture of school teachers of the district.
- ➢ Outcomes of the study would help the future teachers, students, parents and the administrators to understand the characteristics of that section of teacher.
- ➢ The overall understandings regarding attitude of teacher, teaching experience, of those men that would help disclose valuable information to teachers, community, and social workers in building true inclusive education.

Conclusion:

Teachers' attitudes towards inclusive education could be formed and developed in the context of an educational system which can provide some specific conditions in order to have a good practice in this field. Those conditions refer to a restructure of the curricula, more help for supporting teachers, more time for preparing the educational activities, decreasing the number of students in one class, creating and developing opportunities for interactive partnerships between teachers, students, support teachers and parents and so on. The reform of the curriculum should be made in parallel with a proper training for teachers regarding their knowledge of inclusion and its principles. The difficulties are

inherent to any change or reform, but it is necessary to develop an educational system which can properly respond to all the needs, characteristics and individual differences of all children in school.

References:

1. Avramidis, E., Bayle's, P., Burden, R. (2000). *A survey of mainstream teachers' attitudes towards the inclusion* of children withspecial educational needs in the ordinary school in one local education authority.*Educational Psychology*, 20, 191-211
2. Buell, M.J., Hallam, R., Gomel-McCormick, M., Scheer, S. (1999*). A survey of general and special education teachers'* perceptions and inservice needs concerning inclusion. *International Journal of Disability, Development and Education*, 46, 143-156
3. Bacon, E. H. and SCHULZ, J. B. (1991).'A survey of mainstreaming practices', *Teacher Education and Special Education*, 14, 144–149.
4. Beh-Pajooh, A. (1992). 'The effect of social contact on college teachers' attitudes towards students with severe mental handicaps and their educational integration', *European Journal of Special Needs Education*, 7, 231–236
5. Berryman, J. D. (1989). 'Attitudes of the public toward educational mainstreaming', *Remedial and Special Education*, 10, 44–49.
6. Bowman, I. (1986). 'Teacher-training and the integration of handicapped pupils: some. Dings from a fourteen nation UNICCO study', *European Journal of Special NeedsEducation*, 1, 29–38.
7. Chakra, S., Srivastava, R., Srivastava, I. (2010). *Inclusive education in Botswana*: the perceptions of school teachers. *Journal of Disability Policy Studies*, 20, 219-228.
8. Clark, C., Dyson, A., Millward, A. & Skidmore, D. (1995).*Dialectical analysis, special needs and schools as organizations*. In Clark, C., Dyson, A., Millward, A. (eds) *Towards inclusive schooling?* (pp. 78-95). London: David Fulton.
9. Forlin, C., Tait, K., Carroll, A. and Jumbling, A. (1999).*Teacher education for diversity. Queensland Journal of EducationalResearch,* 15, 207-225

10. Ghergut, A. (2010). *Analysis of inclusive education in Romania*. Results from a survey conducted among teachers. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 5, 711-715.
11. Hay, J.F., Smit, J., Paulsen, M. (2001).*Teacher preparedness for inclusive education. South African Journal of Education*, 21, 213-218.
12. Kalyva, E., Gojkovic, D., Takers, V. (2007). Serbian teachers' *attitudes towards inclusion. International journal of Special Education*, 22, 30-34.

Partition of Bengal and Communal Reaction: A Historical Review (1905-1911)

Dip Sankar Naiya
Assistant Professor, Department of History
Bangabasi College

In the late nineteenth century and the beginning of the twentieth century Bengali Muslim community was very much active for their community empowerment. They tried to get attentionof the British Government. In this political phenomenon colonial government decided to partition of Bengal. It was announced by Lord Curzon (1859-1925) On 19th July 1905 to form one province comprising West Bengal, Bihar, Odisha and another province comprising East Bengal and Assam. This new administrative system was implemented on 16th October 1905.[1]Although the British government presented administrative reasons but the implementation of divide and rule policy was the secret reason behind this arrangement. Lord Curzon (1859-1925) argued that a large province like Bengal could not be ruled by a lieutenant governor. Their main motives were to weaken the Bhadraloks as well as Bengali community on the basis of religion so that anti British nationalistmovement could not take place.[2]

Long before the official announcement the colonial rulers started thinking about the partition of Bengal. The geographical extent of Bengal had changed in various ways during the pre-colonial and colonial times. At the time of formation of Bengal Suba (1854 AD) the area of Bengal Presidency was very large. All of North India except Punjab and North West Pradesh was included in this Suba. Administrative difficulties were deeply felt during the famine of Orissa in 1867. The first census of colonial Bengal in 1871-72 mentioned the population of Bengal was around 6 crore 79 lakhs. In this situation a British officer John Campbell (1835-80) proposed to separate the 2 crore Hindi-speaking areas from Bengal for the sake of Muslims. Viceroy Lord Northbrook (1826-1904) rejected this proposal and in 1874 Assam with 2 million people was separated from Bengal.[3]

The experienced British officers were reluctant to work in this newly formed interior province.The proposal of establishing an independent provincecomprising Chittagong, Dhaka and Mymensingh districts with Assam by the chief commissioner of Assam William

Wardin1896was also rejected.[4] 'Lord Curzon' (1859-1925) became the of viceroy of India in 1899 and paid special attention to the reconstruction of the Bengal province .[5] In 1900 during the visit of Assam the tea plantation owners tried to get attention of Lord Curzon.They expressed that export of teathrough Chittagong port by the Assam-Bangla railway was more convenient rather than by the Calcutta port. In this time Curzon simultaneously taken territorial redistribution of the boundaries of Bengal, Assam, Madhya Pradesh and Madras.William ward's plan revived by Bengal's new Lieutenant Governor of Bengal Andrew Fraser (1848-1919) and prepared the draft plan by the instruction of lord Curzon. This plan was announced first time by Indian Secretary Risley (1851-1911) on 3rd December 1903. In this plan Chittagong Division, Hill Tripura, Dhaka and Mymensingh will be merged with Assam to form a new province called 'East Bengal and Assam'. Lord Curzon preparedthe final proposal and sent it to England in February 1905 .[6]St. John Broderick (1856-1942) the secretary of state for India wasn'tin favor of this proposal but eventually backed down to Curzon's insistence. the Government of India issued the Official Orderof Partition of Bengal on July 19th in 1905.Partition of Bengal came into effect on October 16th in 1905. The new province 'East Bengal and Assam' was assigned Chittagong, Dhaka and Rajshahi divisions, Hill Tripura, Malda.Hindi-speaking Bihar and Orissa were merged to West Bengal.[7]

In this regard mixed reactions were observed amongthe caste Hindu, Muslim and lower caste leaders of Bengal.This partition of Bengal was an extremely disastrous for the upper caste educated as well as professional Bengali Hindus.In the Bengal Province 4 crore 2 lakh were Hindus out of total population of 5 crore 40 lakh, the Bengali speaking had become a minority. On the other hand, the newly formed 'East Bengal and Assam'province had a population of 3 crore 10 lakh with 1 crore 80 lakh Muslims and 1 crore 20 lakh Hindus. Bengali Bhadralok Hindus opposed the partition of Bengal as it was against the interests of them. [8]

Different kind of fears and apprehensions had seenamong the Bengali Hindus. The babus of Bikrampur were afraid of losing their clerical jobs. The Ray family of Bhagyakul had a rice and jute businessnear Calcutta, so they were worried of the possible rise of the Chittagong port. The lawyers of Calcutta felt that their business would

suffer if a high court was established in the new province. After the announced of partitionfew west Bengal based newspaperssupported this decision. Their argument was that since the number of Muslims is more in East Bengal so Muslims will be the majority in the whole of Bengal province. If there is a separate province in East Bengal for the Muslims, Hindus will be the majority in West Bengal. The Marwaris were in favor of the partition of Bengal.[9]Most of the Congress leaders were reluctant to include the issue of partition of Bengal as a matter in the National Congress session. Madan Mohan Malviya (1861-1946) openly said that "Bengal province has been divided. It has nothing to do with other provinces of India."[10] Gopal Krishna Gokhale (1866-1915) had played a crucial role. In his soul effort a resolution protesting the partition of Bengal was presented by the president of Indian national Congress at Kashi Session. As a resultof this resolution Swadeshi movement stated in Bengal.The Marwari community opposed the Swadeshi movement.[11] Krishna Kumar Mitra" (1852-1936) writes thatthe millwalas of Bombay and Ahmedabad became millionaires by exploiting the country of Bengal. Bangalakshi Cotton Millwas established to suppress the dominance of Marwaris in the textile industry.The day of protest was celebrated on 26October1905. In a large number of Marwari and Muslim shopkeepers of Calcutta did not agree to close their shops.[12]

After the partition of Bengal an influential section of the educated Muslims realized that free from theHindu dominance the newly formed 'East Bengal and Assam' province would help the Muslims to prosper. Therefore, they considered Swadeshi and anti-partition movement against their interests. In the meantime, the formation of the 'Muslim League'in 1906 under the leadership of Nawab Salimullah (1871-1915) of Dhaka had shifted the Muslim mind towards political vision.[13] In the first phase of the Swadeshi movement, Muslim landlords and Muslims from other sections participated in the anti-partition movement, but it was very insignificant compared to the entire Bengali Muslim population. The larger section of Muslim society could not involve in this movement. Nawab Salimullah (1871-1975) of Dhaka, Nawab Ali Chowdhury (1863-1929) of Dhanbari (Mymensingh) and Nawab Syed Ali Hossain of Kolkata actively participated against the Swadeshi and anti-partition movement of Bengal .[14]

National Mohammedan Association along with various religious organizations participated against the Swadeshi movement.Maulvi Kafil Al Din and Khan Bahadur Syed Al Din, prominent Faraji Leaders joined with Nawab Salimullahin support of the partition of Bengal and against the Swadeshi movement.[15]

The Maulvi, Mulla, Munshi, as well as other common Muslims of rural Bengal were closely related to one another·The economic hatred of the poorer Muslims toward the Hindu Zamidar, Mahajan, lawyers, etc. was motivated by this group of people. In this process it becomes much easier for upper- and middle-class Muslims to mobilize poor Muslims against the Swadeshi movement. Muslim newspapers as well as periodicals played a significant role against the Swadeshi movement. 'Ahmadi' (1885-59,Delduar Mymensingh), 'Hindu Muslim Sammilani' (1887,Magura, Jessore), 'Balak' (1901, weekly, Barisal), 'Bharat Suhrid' (1901, monthly, Barisal), 'Pracharak' (1899-1902, Monthly, Calcutta), 'Sultan' (1902-1910, Weekly, Calcutta) 'Kohinoor' (1898, Monthly) etc. These papers tried to promote harmony between the two communities instead of promoting anti-Hindu sentiments or blind communalism.[16]
Religious individualism-conservatism or secularism or a combination of both was observed by 'Basna' (1908-09, monthly Rangpur), 'Hitkari' (1890, fortnightly Kushtia), 'Navanur' (1903-06, monthly, Calcutta), 'Sudhakar' (1889-91, weekly, Calcutta) etc.These papers emphasized preserving Muslim unity and interests, but at the same time they also highlighted the significance of Hindu-Muslim harmony in Bengal.They also discussed the necessity of literary and linguistic unity of Bengal.[17]
On the other hand Akhbare Islamia(1884-95 , Mymensingh), 'Hafez' (1897 , Syed Calcutta) 'Hanifi' (1903-05, monthly, Mymensingh), 'Islam' (1900-1901, monthly Calcutta),' Islam Preacher' (1891-1910, Calcutta monthly), 'Noor-al-Iman' (1900-1901,Calcutta monthly) 'Mihir' (1892-93, Calcutta), 'Mihir and Sudhakar' (1895-1910, Weekly, Calcutta), 'Moslem Hitaishi' (1911-21, Weekly, Calcutta) expressed anti-Islamic supremacy, anti-Hindu and anti-Congress sentiments.[18] Periodicals like 'Akhbare Islamia', 'Islam Prachar', 'Hafez', 'Hanifi' etc., propagated Islam and tried to inspire Muslims with the glorious history of Islam. 'Islam Pracharak' and 'Mihir-Sudhader' were absolutely opposed to the Swadeshi movement.[19]

The leaders of the East Bengali "Namashudra" community were in favour of keeping their caste out of the anti-partition movement. The religious leaders of the Namashudras 'Gurchad Thakur' (1846-1937)advocated the partition of Bengal and went against the Swadeshi movement as like the Muslim League. He believed that the partition of Bengal would have freed the poor Muslims and the lower caste backward peasants from the exploitation of the upper caste Hindu landlords and moneylenders.[20] For this reason, in 1905, the Namashudra leaders submitted a memorandum to the then Lieutenant Governor of East Bengal and Assam. [21]

In 1907 a second deputation was given to British officer 'Lasmillot Hare by the namasudra leaders.The details of the depudation was published in the periodlicals'NamashudraSuhrid' .In this deputation it was mentioned that Namashudra community wanted to the perpetuation of British rule'.In return Nabgopal Majumdar' and 'Raghunath Sarkar' tried to get support of the British Government so that theNamashudra community could easily obtain the English education as well as government jobs. A discussion meeting was organized at Orakandi in Gopalganj sub-division of Faridpur district on October 2, 1906. This meeting took place at the house of zamindar Brajendralal Mandal to highlight the aspect of loyalty to the British government. Three proposals were adopted in this discussion meeting.[22]

a) Namashudra community wanted the partition of Bengal to remain unchanged.
b) As a large community in East Bengal, the British should grant equal privileges and rights to the Namashudras as Muslims.
c) The backwardness of the Namashudra community were due to hatred and neglect of Brahmins, Kayasthas and Vaidyas. So, the Namashudras have no sympathy for them and the Namashudras will work together with the Muslims.

The Namashudras, like Muslims of eastern Bengal began to use foreign products extensively instead of rejecting themduring the Swadeshi movement of 1906-1911. In the Bakharganj region the Namashudras used foreign products extensively.[23] A similar trend was observed in 1909 among the Namashudras of the Faridpur region. The Namashudra leaders collectively supported the British and propagated the Namasudra - Muslim unity in terms of class unity.They were completely against the

nationalist politics. Various communal riotsstarted inbeginning of twentieth century that undermined the imaginary entity of economy based ‘class consciousness' of the Namashudra leaders.[24]

We have noted different opinions about the partition of Bengal of 1905. In this regard everyone was active to protect their own interest. Class consciousness as well as class unity was also observed in Bengal. In consequence of anti-partition movement, colonial government dismissed the partition of Bengal in 1911. Bengal was reunified and the capital of India shifted from Kolkata to Delhi in 1911 as the price of reunification.

Notes and references:

1. Rup Kumar Barman: *Partition of India and Its Impact on Scheduled Castes of Bengal,* (New Delhi, Abhijeet Publication, 2012), p. 100.
2. Amalesh Tripathi: swadhitana sangrame bharater jatiya congress,(calcutta, ananda, 1397 Bs)p.p58-59.
3. Sumit Sarkar: Swadeshi *Movement in Bengal, 1903-1908*, (New Delhi, People’s Publication House, 1973), p.98.
4. Ibid.,p.120.
5. Ibid.,p.112.
6. Amalesh Tripathi::Ibid.,p.p 58-62.
7. Ibid.,p.63.
8. Rup Kumar Barman: Ibid.,p.p100-101.
9. Amalendu dey : Bangali buddhijibi o bicchinatabad,(calcutta, jatiya sahiya prakash,2011) p.-147
10. Ibid.,p.p.148-149.
11. krishna kumar mitra :atmacharit (calcutta,sadharan brahma samaj, 2nd edition,1974), p.p.234-36,&250-52.
12. Ibid.,p.p. 252-55.
13. Sumit Sarkar: Ibid.,p.128.
14. Rafiuddin Ahmed: The *Bengal Muslims 1871-1906, A Quest for Identity*, (Delhi, O.U.P, 1981)p.p 179-181.
15. Chandiprasad Sarkar: Bangali musolman,(kolkata,Mitram,2007) p.p36-37.
16. Ibid.,p.38
17. Ibid.,p.p40-42.
18. Amalendu Dey: Ibid.,p.p144-45.
19. Wakil Ahmed : Unish shataker bangali musalmaner chinta chetnar dhara, Vol-II(Dhakha,Bangla Accademy,1983)p.p 142-45.

20. Hiroyuki Kotani (Ed): *Caste System, Untouchability and the Depressed*, (New Delhi, Manohar Publication, 1997), p. 232.
21. Ibid.,p.233.
22. Ibid.,p.p 233-234.
23. Sekhar Bandopadhyay: *Protest and Identity in Colonial India, The Namsudras of Bengal*, (London, Curzon Press, 1997)p.p 95-97.
24. Ibid.,p.p98-100.

Gendered and Hierarchical Power Relations in the Handloom Industry: A Case Study of Nadia, West Bengal

Sayana Basu
Research Scholar, School of Women's Studies,
Jadavpur University, West Bengal, India

Abstract:
The paper through a critical appraisal of the Indian handloom industry, investigates the centrality of women in the household-based fabric production; who while preserving the traditional heritage negotiates with the complex, structural power relations existent within handloom family enterprises and weaving community at large. The article referring to the weaving clusters in the district of Nadia (West Bengal, India) uses empirical evidences to demonstrate how the gender composition of this significant workforce is profoundly influenced by labour flexibility, fragmented production units and nature of employment pervading the region. While the distinguished sector fulfils the fabric demands of the consumers across the geographical contiguity of national and international markets, it has at the same time set into motion the 'politics of forgetting' of those poor, social groups of home-based women weavers who are marginalised by powerful intermediaries in the value chain.
Keywords: Handloom, Family Enterprise, Women Weavers, Intermediaries

Introduction:

The industry of handloom in India as the second largest employment generating sector employs vast majority of weavers (80 percent) from the weaving households. As per the Fourth Handloom Census Report (2019-20), the industry currently engages over 23 hundred thousand of female artisans which accounts for more than 72 percent of all weavers and allied workers in the country. The state of Bengal alone accounts for 3.4 lakhs (340,000) weaving households (18 percent) of the country's total 25.4 lakhs (254,000,00) handloom-based family enterprises. The artisanal mode of fabric production in the district of Nadia, West Bengal is primarily home-based, dispersed over a wide geographical space with decentralised control of manufacturing processes (Soundarapandian, 2002). The sector's activities relying significantly on indigenous weaving skills and family members for labour and production support have created a unique situation where much of the skilled and semi-skilled female

artisans have been recruited in the process of fabric manufacturing from the domestic set-up. With 4 important weaving clusters namely Santipur, Phulia, Ranaghat I & II and Nabadwip; being renowned for manufacturing highly demandable handloom fabrics of international repute, the sector has witnessed women being intensely involved in the process of fabric manufacturing within the handloom family enterprises. While previous researches on the handloom sector (Devi 2012/2013; Ramswamy and Hmangaihzuali 2016; Singh & Singh, 2008) have primarily focused on the sector's potential for growth and development, there appears to be little knowledge on the status and condition of home-based women weavers while they have been intrinsically engaged with the fabric manufacturing process in the value chain.

Time and again, feminist scholarships (Stromquist, 2014; Sonfield and Lussier, 2009; Folker, 2008) have shown that despite women's substantive contribution and measurable progress towards household poverty alleviation, as economic actors' their contributions have rarely been acknowledged and somewhat been shrouded in the production chain; uncharted by the major national statistics of marginal productivity of wages. Farnworth (2011) in her study has tried to explain that the economic interests for comprehending the gender disparity in the production/value chain is premised on the fact that much of the work done by women in the production system is obscured by the blurry nature of their functioning/undertakings resembling domestic responsibilities. The study has shown that women were frequently concentrated as producer at the lowest bottom of the production chain. The production/value chain involving a chain of production activities with multiple economic actors, witnessed women's challenging journey in the profitable roles as the producers, buyers or sellers. Women's lack of control over the benefits arising from engaging in activities in the production chain has frequently been recorded. Gender inquiry in the production chain can therefore explicate the dynamics of gender relations in the production system. A thorough investigation can divulge how the effectiveness and efficiency of production chain is often typically premised on gender-based social constructs in the community. Exploring the nature of its functioning can expound how men and women coming from the same occupation in the same production chain undertake distinct activities related to production and marketing, have different working hours with unequal wages and are exposed to varying degree of security and vulnerability in the production system.

In the case of the handloom sector of Nadia (West Bengal), the consistent rise of women in the weaving activities; that offers flexibility of working from home (like subcontracting, contractual, part-time works dispensed by the intermediaries in the value chain) suggests a ubiquitous pattern of incorporating rural women from the domestic setups. Furthermore, the absence of large scale handloom establishments (such as yarn depot, dye and chemical houses, storage facilities etc.) in the region appears to have triggered the home-based women weavers to be overly dependent on these intermediaries for their survival and sustenance in the sector. The entry of a significant share of women from the family enterprises therefore highlights a pattern of labor force participation. It also accentuates the need for a critical understanding of the role of the intermediaries who have recruited a vast majority of female artisans from this spatial domain.

Research Focus and Methodology

The article is based on a qualitative study conducted during four years of research in handloom clusters of Nadia, West Bengal. The weaving clusters of Nadia, especially the regions of Santipur, Phulia, Nabadwip and Ranaghat I & II are renowned for the production of high-quality *Tangail* and *Jamdani*[1] handloom fabrics. The four major handloom clusters have been selected for their development of handloom as an export-oriented household-based textile production that caters to the demands of both national and international consumers. In-depth qualitative interviews of 66 female artisans and 10 male artisans belonging from 26 handloom-based family enterprises have been undertaken during field visits to the weaving clusters. In these weaving clusters, bulk handloom orders from urban centers of Kolkata are typically dispensed by the powerful intermediaries i.e. the Mahajans to the home-based women weavers to meet its high and recurrent demand. The female weavers mentioned in the article are located inside the handloom family enterprises. The domiciliary management of producing high quality handloom fabrics (that necessitates manual dexterity of

---

[1]The two pioneer dress materials popularly known as the Jamdani and Tangail fabrics bears glorious legacy in the history of Bengal handloom. [1] The weaving belts of Nadia (Santipur, Phulia, Nabadwip, Ranaghat I & II) is renowned for the manufacturing of pioneer dress materials- Jamdani and Tangail. Tangail handloom fabrics originally emerged from the district of Tangail of present Bangladesh.

interlacing yarns and quality assurance at every stage of the weaving operation) is primarily carried out by women of the family. The intricate process of fabric manufacturing is adjudged impracticable without women's benefaction at the core of family-based handloom production operations. The article will demonstrate that while a niche audience for the Indian handloom fabrics has been rendered visible across the geographical contiguity of national and international markets; it has at the same time set into motion the politics of forgetting of those poor social groups of home-based women weavers who are marginalized by the powerful intermediaries in the value chain. Applying gender lens to this portfolio can assist in understanding the gender dimension of the predominantly home-based artisanal workforce and gender targeting in the handloom labor market.

The Invisible Women Weavers of the Handloom Family Enterprises

In the case of handloom as family enterprises in the weaving clusters of Nadia, the diverse forms of labour, production and investments employed by women from varied backgrounds in this predominantly rural informal, unorganized textile division indicate that family's labour, particularly women's home-based engagement is perceived as a precondition for achieving sustainable handloom production. But despite women's high level engagement and partaking within the patriarchal paradigm of home-based handloom weaving, their effective participation has frequently been justified and rationalized as an extension of their domestic services in assisting the household enterprise. Women's capacity and potentiality to effectively engage in fabric manufacturing process have customarily been circumscribed both by the attitudinal biasness of the family as well as the restrictive social norms and traditions practiced inside the weaving community. This demeanor often did not prepare the women with the requisite ambience for advancing their personal or professional growth and development in the sector. Therefore, while the conventional statistics failed to capture the gender issues and gender disparities pervading in the sequence of negotiation and transaction within the handloom production chain; it has at the same time ignored a small class of economically and socially *powerful* people who are not only found to regulate multiple market networking channels but also found to administer substantial amount of control on the home-based women weavers in the fabric manufacturing process.

However, prior to delving deeper into the complex nature of Mahajan-weaver relationship pervading the weaving clusters, if one closely looks into the history of textile industry and its development in West Bengal, then one would be able to perceive that the level of systematized institutionalization in the handloom sector here has been significantly low when compared to the states of Kerala, Karnataka and Tamil Nadu (Bhattacharya & Sen, 2018). Weavers employed through co-operatives or other formal institutions are relatively low, consequently harmonized weaving operating programs in the handloom belts have been greatly affected (Roy, 2017, Khasnabis, & Nag, 2001). The absence of large-scale, organized handloom establishments in district of Nadia (such as yarn depot, dye and chemical houses, warehouse for storage facilities etc.) have led to the development of independent handloom family enterprises to be relatively dependent on the private traders and other forms of intermediaries (like the Mahajans) for their survival and sustenance in the value chain. The absence of cooperative structures and the standard practice of home-based weaving operations across the handloom belt of Nadia have not only induced certain patterns of raw materials acquisition and marketing of finish produce but also allowed intermediaries to have a profound impact on the in-house fabric manufacturing process Disorganized liaison with the formal support and formal handloom establishments instinctively disabled the women weavers to pursue the weaving activity independently inside the handloom clusters.

Gender and Power Asymmetries in the Handloom Clusters of Nadia

Studies on handloom cluster of Nadia (Shaw et al., 2015) have indicated that Mahajans have the largest social networking capacity than any other economic actors in the field of handloom weaving. This small class of economically and socially *powerful* people not only controlled multiple market networking channels to identify potential customers in the urban centres but they also played a crucial role in preserving traditional economic relationships and close ties with all the economic actors operating within the handloom weaving community. The Mahajan’s role in conserving the expansive network of relations inside the sector is perceived to be mutually beneficial for sustaining long term relationships with its associates. The Mahajan’s primary source of business and revenue generation encompassed the extensive client base from the large textile retail stores of Kolkata as well as the adjacent marketing regions. In this frame of reference, it is significant to mention

that the social networks and social relationships that have been established by the powerful Mahajans in the value chain forged this group to be one of the most prominent economic actors in the field of handloom weaving. The Mahajans with their strong agency has played a key role in coordinating the manufacturing and marketing of handloom items with the end users; making this class one with the largest social networking capacity than any other economic actors in the weaving belts of Nadia. The powerful Mahajans who possess this market knowledge is able to comprehend that production is not likely to sustain if there are no persistent coordination between the home-based women weavers and current market demands, and hence attempts to control all the economic actors in every stage of production. Narrative accounts of the women reflected that most of the Mahajans are committed to establishing strong ties and personal relationships with the home-based female weavers. The Mahajans with his ample resources and adequate network of agents frequently inquired if the women working from their homes had any production requirements or any other personal needs. The regular meetings with the women enabled periodic contacts to be reviewed, where the Mahajans not only monitored the task progress but often hastened the delivery of product within the given estimation of time. It must be noted here that the Mahajans in the weaving clusters do not necessarily possess the traditional knowledge of weaving but typically has an access to gigantic amount of economic resources and large reservoir of social networks. The Mahajans by the virtue of these resources and linkages is able to establish his supremacy in the field and is able to maintain his domination in the handloom production system. So, a big Mahajan holding a dominant, discernable position in the cluster not only employed his tools of surveillance to monitor activities in the weaving belt but also took effective measures to reduce competition and eliminate the budding competitors that appeared as a threat.

From the narrative accounts of the women, it discovered that a prosperous Mahajan in the handloom clusters of Nadia frequently have contacts with 40-50 wholesale clients and about 10-20 core clients. The social advantages that are produced from the mutually beneficial relationship exchanged between the Mahajans and his consumers appear to generate opportunities which are further explored to advance their network building capacity. Therefore the power and the influence of these Mahajans may be envisaged as their power over the productive resources and the intermediated relationships in weaving community. In order to preserve and sustain these relationships, the Mahajans typically supervise

regular business meetings with the Master Weavers (working under his contracts), raw material suppliers, transport agents, clients (core clients and potential casual clients) and of course the home-based women weavers. The Mahajans in the cluster frequently arrange meetings with the women from the family enterprises working under his supervision. The fragmentation of the production process over wide geographical coverage permitted this class of economically and socially *powerful* people to reorganize and rearrange the forms of employment (part time and casual) to ensure maximum profit return.

Field visits and subsequent analysis of field note data corroborate that Mahajans enhanced his forms of extortion through the *Dadan* system. The Dadan system is a very unique system of providing working capital loan to the weavers (often adjusted in case of production of damaged cloth). The Mahajan typically controlled the credit supply chain through a corrupt exploitative weaver-Mahajan relationship, locally known as the Dadan System. The local name of this form of product-monetary control varies regionally (it is also commonly known as the *Tana Ana* System). Narrative accounts of women indicated that Mahajan provided the yarn, operating capital (for sizing the yarn, warping, denting, drafting) along with the subsistence to the 'dadan-taker'. This is granted on the condition that the final produce must be sold to him only. The price at which the products are sold to the Mahajans may be termed as 'dadan price' which is usually below the ruling market price. The Dadan price is fundamentally lower than the market price because the Mahajan (by the virtue of his negotiating strength) undervalues it. The Mahajan's exertion of monopoly power in setting the price of the final woven produce acts as collateral for the loan he sanctioned to the home-based women weavers. It is to be noted that in case of any impairment or damage found in fabrics (arising from the sewing defects or damage caused from the absence of proper storage facility); the Mahajans shares no responsibility. The damage incurred is typically compensated with a fresh woven piece but this time without the labour cost. Therefore, the loan granted not only establishes an economic relationship between the Mahajan and the women weavers but frequently keeps the women weavers indebted. One can perceive that the embedded knowledge and ingenuity of the women have been primarily capitalized upon for women's willingness to take on work for much lesser remuneration. The asymmetric bargaining power of the Mahajan typically ties the small, home-based women weavers to perpetual indebtness with a negative balance.

One can clearly discern that the Mahajans over time gains in two ways; first, by extorting additional yarn prices in the weaving clusters and secondly, by procuring the finished produce at substantially lower market price through the 'dadan' system. It could be well perceived that challenging the credit activities, raw materials acquisition or marketing dominance of the Mahajans was often not possible, especially when he exerted an outstanding amount of control over the recruitment of women weaver, supplying of motif designs, providing operating credit and most importantly an assurance of regular supply of work round the year. While a significant share of the home-based women weavers have been able to negotiate with the existent exploitative labour system to remain in the business; but the prolong practice of deliberate manipulation, especially at these critical times, have compelled many women weavers to withdraw from the industry. However, one of the most striking aspect noted from narratives is that despite the exploitative Mahajan-weaver relationship existent inside the handloom clusters; the Mahajan's domain of inquiry was not only limited to production inspection, for it was also extended to the personal needs of the women working within the family enterprises. Support from the Mahajans in times of crisis included additional funding to tide over the unexpected cost rising from health crisis, purchasing the unsold fabrics, providing jobs to the ancillary workers etc. Narrative accounts from a notable section of women weavers revealed that their hesitance to challenge the Mahajan's mode of operation stemmed from the massive support women received from them and for Mahajan's efforts towards community integration to fight any crisis situation. The Mahajans aware of the critical role played by the home-based women artisans, who acts as an invisible guardian of this traditional crafts, induced him to adopt various measures to preserve his relationship with the women artisans in the weaving clusters. In several cases, he has been found to go out of his ways to personally assist the women in crisis or in distressful situations.

One can perceive that decentralized mode of operation in the production chain appears to have contributed much to sculpt the pyramidal, hierarchical structure of weaving activities. The decentralized control of manufacturing process, under the strong influence of the intermediaries (i.e. the Mahajans) has played an outstanding role in shaping and manoeuvring the social norms and customs pervading the region; permitting these powerful intermediaries to bargain with the existing power structures over economic, social and cultural resources and exploit the home-based women artisans in the value chain.

Conclusion

The handloom textile business under the control of Mahajans in Nadia occupies a dominant position of coordination between the home and the market. Mapping the traditional stakeholders intertwined with the sector's production operation exhibited gendered discourses of women weaver's interaction with the principal economic actors and demonstrated her attempts to survive Mahajan's exploitative behaviour in the cluster. The rural informal economy of handloom weaving heavily relies on the gender dichotomies to enhance profit in formal market sectors. Informality and unorganized nature pertaining to the handloom sector is largely reliable for the vague picture of women weaver's significance and relevance in this textile industry. While the traditional evaluation and estimation process limits the listing and accounting of the home-based women weaver's contribution in the handloom division; the assessment becomes much more complicated for the handloom family enterprises. The handloom family enterprises which continue to reflect an important site for textile manufacturing, possesses a complex fabric of business relationships among the family members and enterprise associates. It is significant to address the issues because women's involvement in handloom family businesses in rural Nadia encompasses women weavers negotiating and bargaining with the authority within the family's intergenerational power relations as well as the powerful intermediaries operating in the community. While cottage-based industry of handloom weaving witnessed a significant representation of women workforce in the producer class, field visits indicate that an adequate financial support, legal supervision and bindings can assist the women weavers to circumvent the control of the intermediaries. It can also create strong probability for them to ascend the ladder of entrepreneurial growth and development in the value chain.

Reference

Bhattacharya, R., & Sen, S. (2018). Pride and prejudice: The condition of handloom weavers in West Bengal.

Devi, C. V. (2012). Exploring the Lives of Manipur's Women Weavers. *Indian Journal of Gender Studies*, *19*(1), 31-55.

Devi, C. V. (2013). Handlooms for livelihood in north-eastern region: Problems and prospects. *Journal of Rural Development*, *32*(4), 427-438.

Farnworth, C. R. (2011, September). Gender-aware value chain development. In *UN Women Expert Group Meeting: Enabling Rural Women's Economic Empowerment: Institutions, Opportunities and Participation, Accra, Ghana* (pp. 20-23).

Folker, C. (2008). Women in family firms: Characteristics, roles, and contributions. *Small Business Institute® Research*.Fourth All India Handloom Census Report, (2019-20) Ministry of Textiles, Government of India.
Fourth All India Handloom Census Report (2019-20). Ministry of Textiles. Government of India
Khasnabis, R., & Nag, P. (2001). Labour process in the informal sector: A handloom industry in Nadia district. *Economic and Political Weekly*, 4836-4845.
Nag, P. (1992). Mode of Production in Handloom Industry : A Case Study of Nadia District in West Bengal.
Ramswamy, R., & Hmangaihzuali, J. B. (2016).Promotion and Distribution of Handloom Products in Tribal Clusters in North East India. *IUP Journal of Entrepreneurship Development*, *13*(1).
Roy, C. (2017). The silk handloom industry in Nadia district of West Bengal: a study on its history, performance & current problems. *New Man International Journal of Multidisciplinary Studies (ISSN: 2348-1390)*, *4*(7), 50-66.
Singh, A., & Singh, R. K. (2008).Gekong-Galong–Traditional weaving technology of Adi tribes of Arunachal Pradesh.
Sonfield, M. C., & Lussier, R. N. (2009). Gender in family business ownership and management: a six□country analysis. *International Journal of Gender and Entrepreneurship*.
Soundarapandian, M. (2002). *Growth and prospects of handloom sector in India*. National Bank for Agriculture and Rural Development.
Shaw, T., Dey, S., & Das, A. (July 2015) Hierarchy, Power-relation and Domination in a Handloom ‘Field’. IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Volume 20, Issue 7, PP 14-21
Stromquist, N. P. (2014). *Women in the Third World: An encyclopedia of contemporary Issues*. Routledge.

Managing Stress during Covid-19

Dola Sarkar
Assistant Professor, Department of Education
Plassey College, Plassey, Nadia

ABSTRACT : As the Covid-19 pandemic and its far-reaching implications continue to unfold globally in our community, its normal for people to experience a wide range of thoughts, feelings and reactions including feeling stressed or overwhelmed –Racing thoughts, Feeling helpless, Difficulty concentration or sleeping , Anxiety, tearfulness, loss of internet is usual enjoyable activities. These experiences are all understandable in the face of this significant challenges. These have been loss of life, rapid changes to our way of life and disrupted plans due to travel restrictions and social (Physical) distancing measures in our efforts to slow the spread of transmission.It's important to recognize the seriousness of the public health challenge facing our community and be mindful that reacting form a place of panic and fear is usually unhelpful, especially in the long term.We have understand the pandemic is not just medical condition, it effect the population in social, emotional and physical way also. Due to this pandemic outbreak 10% of student developed psychological problems that are affecting leaner's not only academic but all over personality (WHO,2020).An attempt is done through this paper to know the impact of stress among students and the necessity of managing it in order to make learning effective.

Keywords: Stress, public health, Covid-19, Pandemic

<u>Introduction:</u>

We are deal with stress and uncertainty in different ways. But certain people can feel more stress, increased anxiety and height ended worry than their neighbors, friend and family. Especially during the Covid-19 pandemic and its stay at home orders. Those who might become more stressed during this crisis include. Those at high-risk for developing a severe case of Codid-19 (if contracted), such as older adults and those with chronic health condition.

<u>Group at higher risk for stress:</u>People with mental health conditions, including those with substance use disorders. Health workers such as doctors, nurse, first responders and other staff members, people with mental health, including those with substance use disorders. Recognizing

and coping with stress in a positive, healthy way can help you remain calm and recognizing the stress of others and landing support can make everyone stranger.

We also deal with stress and uncertainty in different ways. But certain people can feel more stress, increased anxiety and heightened worry than their neighbor, friends and family. Especially during the Covid-19 pandemic and its stay-at-home orders. Those at high risk for developing a severe case of Covid-19 (if contracted), such as older adults and those with chronic health conditions.

How to manage stress:

Stress is part of being human, and it can help motivate you to get thing done. Even high stress from serious illness. Job loss, a death in the family, or a painful life event can be a natural part of life. You may feel down or anxious, and that’s normal too for a while.Talk to your doctor of you feel down or anxious for more than several weeks or if it starts to interfere with your home or work life. Therapy, medication and other strategies can help.

In the meantime, there are things you can learn to help you manage stress before it gets to be too much. These tips may help you keep stress at bay.

- Keep a positive attitude
- Learn to manage your time more effectively
- Seek out social support, spend enough time with these you leave
- Set limits appropriately and say no to request that would create excessive stress in your life.
- Accept that there are events that you can’t control
- Be assertive instead of aggressive.
- Assert your feelings, opinions or beliefs instead of becoming angry, defensive or passive.

Managing stress during the Covid-19:

Here are a few tips on how to manage stress –

(1) Through your media consumption

Seek out reliable new sources- such as the centers for Disease Control and Prevention (CDC) or your state health board for the latest information about Covid-19. However, we recommended limiting the news to less than a few times per day. Check first thing in the morning

and the late afternoon. But not before bedtime. Constantly tuning into the new increase stress and often draws attention to things that you have little control over.

(2) Get creative

Using your hands and your creative brain can be a great way to relieve stress. It helps you focus on the present and create something new. If you have arts and craft supplies on hand, use them to create something special. If you need a little inspiration, check out this list of kids' crafts to make with minimal supplies. There are also several fun-crafts that artists of all aged and skill can make using household items.

(3) Control what you can

During this time of uncertainty, take the opportunity to control what can in your home environment. Get the family to pitch in for some deep cleaning. Sort through your family's clothing and set aside any donations for when donation centers open back up. Do some cleanup outdoors. In the fall, rake the yard and check the gutters, if you can do so safely. If it's spring, clean out your flower garden or prepare your vegetable garden for planting.

(4) Seek help when needed

If your stress is causing you to feel more anxious or depressed, don't be afraid to reach out. Many experts are available to provide virtual support during these uncertain times.

(5) Get outside

No matter what the season, take an opportunity to get outside and experience nature – but be sure to follow any shelter-in-place and social distancing guidelines. Step away from your home office and take a walk around your neighborhood or a local trail if opened. If you have kids, go on a nature scavenger hunt or play 'I spy' in the yard.

Some ways teachers can support students' mental health during Covid-19 School returns

School teachers and personnel are critical in supporting children's transition back to in person classroom learning, particularly after extended periods of school closure. In addition to continuing to use the different skills teachers have been using to ensure their student's learning and emotional wellbeing while schools were closed, the following suggestion might be helpful when school reopen.

(1) Listen to Children's Concerns

Codid-19 and school closure impacted many children and adolescents mental health and wellbeing. As a teacher, it is essential to listen to students' concern and demonstrate understanding as well as empathy offer your students the opportunity to have a one to one conversation with you to reconnect and discuss any concerns that might have arisen when their school was closed.

(2) Be honest and encouraging rather than reassuring

Anxious students will likely need some initial assurance from trusted adults and teachers that returning to school is okay.

It students continue to seek reassurance, staff can encourage tolerance of uncertainty skills or learn to problem solve and come up with solutions to their own concerns where possible "what can you do here to calm yourself down?" or "what options do we have here' instead of just avoiding"?

Educators can empower students by giving them the tools to identify the problem, identify possible solutions, pick a solutions and try it out.

(3) Praise and reward students for being courageous

As students return to school, praise them for showing courage in the face to fear and let them know that being brave and courageous will help them get through this together.

When you see a student or fellow staff member do something that you know is hard for them or provokes anxiety, let them know you've noticed it and are proud of them for facing their fears courageously.

(4) Check how children are doing

Before teaching new academic content to students, teachers and school personal shared take to check how children are doing. Remember that children may have difficulty concentrating at first or may need more time to get back into the routine of learning. Provide opportunities for children to take breaks, move around and re-connect with their friends and peers.

(5) Provide clear information to families as early as possible

Anxiety thrives on uncertainty and the Covid-19 pandemic is with it, while tolerating uncertainty will be required for families to some extent, school administrators and educators can ease the transition by working together to communicate frequently and clearly with families about what is planned for returning to school.

Important information for families may be include:

- Change made at schools

- Specific expectations for families
- Upcoming plans
- Long term plans

Even if plans change, regular communication with families will support their own planning and coping.

(6) Encourage play and sports to promote interaction between students

In many countries children have been following strict physical distance measure and have been prevented from using playgrounds and other public space to play and interact with their peers. Make sure that when children return to school that they have lots of opportunities to socialize, play and interact with the peers they have missed for so long, in line with school safety protocols.

(7) Model good coping behaviors for students be calm, honest and caring

Teacher can be positive role models for their students. Children will look at your and learn from the skills you use daily to deal with stressful situations. Be calm, honest, and caring and demonstrate a positive attitude to children.

(8) Take care of yourself and know your limits

Teaching can be extremely stressful profession, particularly now. Make sure to protect your own physical and mental health. Remember t seek support if you notice yourself experiencing significant feelings ofdistress.

Conclusion

Covid-19 has affected our daily life tremendously. Learning to cope with stress and adapting to our “New Normal” life post Covid-19 is important.

Learning to manage stress will make you more resilient. However, if you are struggling to cope, these are many ways to get help. Contact our mind center if you find that you are struggling and we will be there to help you, offering personalized and novel treatment methods that suit you needy.

In, short, we must bear in mind that the education received by young people in this current time of crisis will shape the society of the future. Therefore, if we want this education to be of a high standard, then we must protect the psychological wellbeing of the people who provide it.

References:

1. Emerson, H. (1939). Mental Health. Lancaster, Pennsylvania: American Association for the Advancement of Science (Science Press); pp: 9.
2. Ghodrat, M, Sahraei H, Razjouyan J, Meftahi G. (2014). Effects of a saffron alcoholic extract on visual short-term memory in humans: a psychophysical study. Neurophysiology. pp: 247–253.
3. Hall M, Vasko R, Buysse D, Ombao H, Chen Q, Cashmere JD, et al.(2004). Acute stress affects heart rate variability during sleep. Psychosomatic Med. p: 56–62.
4. Ishigami T. (2009). The influence of psychic acts on the progress of pulmonary tuberculosis. Am Rev Tuberculosis.pp:470–484.
5. Kario K, McEwen B, Pickering T. (2012). Disasters and the heart: a review of the effects of earthquake-induced stress on cardiovascular disease. Pp:355–367.
6. Luine V, Villegas M, Martinez C, McEwen BS. Repeated stress causes reversible impairments of spatial memory performance. Brain Res. pp: 167–170.
7. P.E. Petersen, D. Bourgeois, H. Ogawa, S. Estupinan-Day, C. Ndiaye. (2013).The global burden of oral diseases and risks to oral healthBull World Health Org. pp. 661-669
8. Villegas, M (2013). Hygiene behaviour and associated factors among in-school adolescents in nine African countries. America, IJCTR, pp-150-159

COVID -19 : IMPACT ON TOURISM INDUSTRY

Irani Sahu
Assistant Professor, Department of Sociology
Arambag Girls' College

Abstract : The COVID -19 pandemic has severely harmed the tourism industry. This global pandemic alters the socio-economic structure of a particular country and the global scenario. This virus infected the travelers, and the pandemic could spread through travel. As a result, the national and international travel industries are in serious trouble. In that case, countries attempt to devise new policies to save tourism. Considerations include lifting travel restrictions, restoring traveler confidence, and rethinking the tourism sector for the future.
Key words : Pandemic, Tourism Industry, Economy, Travel policy.

Introduction

Travel is a key factor that has a significant impact on society. People travel for a variety of reasons, including work, business, and various types of social activities. According to the World Tourism Organization (2020), international tourism is expected to grow for the tenth consecutive year, with 1.5 billion international tourist arrivals in 2019 and an estimated 1.8 billion international tourist arrivals by 2030). (UN News, 2017). Different hospitality industries sprout up as a result of travel. When the COVID -19 pandemic arrived, the scenario changed.The global impact of the virus's spread, particularly on the retail sector, food, consumer goods, healthcare delivery, and a potential curtailment of travel and tourism as major drivers in the majority of the world's countries, is immeasurable and more severe than many expected. To control the COVID -19 pandemic, various countries closed their international and national flights, as well as other modes of physical communication, and declared a lockdown. This effectively limited people's activities and had a significant impact on daily life.Because of the rapid spread of this virus, people are fearful of going outside and are less confident about travelling. Several national and international corporations allow their employees to work from home. Educational institutions are closing, and teachers are turning to virtual platforms to teach and share knowledge. When various institutions are closed and people are restricted from leaving their homes, it is extremely dangerous for everyone.As a result, the travel industry has completely collapsed. Though the government has removed restrictions on people's outside activities and various sectors have opened, people are unable to plan their travel. The travel industry is a major part of the economy that has broken down, and travellers have lost confidence in travelling.

Historically, the tourism industry has quickly recovered from disasters, pandemics, and epidemics such as Ebola, Middle East

respiratory syndrome (MERS), and severe acute respiratory syndrome (SARS) (SARS). Local, regional, and national governments are assisting in the industry's recovery by enticing investors with tax breaks, lenient land-use regulations, and so on. Domestic tourism will help the tourism industry recover from the pandemic before international travel can resume. Other factors, such as technological resilience, local belonging, and customer and employee confidence, may aid in the development of industry resilience, which is urgently needed.

Technological advancement

Technology plays a significant role in increasing flexibility in the tourism industry. Natural disasters hasten technological change. People received a lot of help from technology experts during COVID-19. There have been reports of robots replacing people, mobile applications tracking people's contacts, and Big Data analytics forecasting COVID-19 spreading among the masses. Robotics, automation, and artificial intelligence can reduce costs, increase liquidity, and increase flexibility. Because technology can connect people without any physical contact, this will also help maintain social distance. Thus, technology can handle pandemic-specific issues like screening travellers, detecting COVID-19 cases and tracking contacts, ensuring online education for students, and so on. According to numerous reports, the public's trust in technology is increasing, as is their willingness to connect and change their attitudes toward technology. People have begun to disregard privacy concerns in order to gain a more significant technological benefit. The "six transformative e-tourism research pillars" have been presented for bringing about changes in e-tourism by proactively using IT resources for short-term and long-term purposes.

Local identification

The global aspect appears to be broken, necessitating the intervention of local belongingness. Domestic tourism is expected to dominate the scene during the pandemic and after COVID-19, with most visitors coming from nearby areas. Domestic travel is currently limited to visiting friends and relatives in many places, but this will soon be expanded to include leisure tourism. International travel will gradually resume once borders are opened and international flights are permitted to operate without interruption. Many countries and regions have restricted movement by imposing bans and other stringent entry and exit requirements, which has had a minor impact on the global tourism industry.According to and, the right to travel or work in the hospitality and tourism industries will be restricted in the near future. "Tourism bubbles," or local connections established during the disaster, will serve as a flexible plan. Future travel will be dependent on collective self-care, such as the proposal to open the Trans-Tasman border between Australia and New Zealand, or the potential expediting of immigration clearance between the Republic of

Korea and China. The sense of belonging among locals will dictate the terms of the tourism industry's revival.

Consumer and employee trust

It is critical to regain consumer trust in order to restart the stalled tourism industry. The critical paths to follow are learning from disaster planning and resisting the desire to avoid failures in the future. The tourism industry's revival will be dependent on increasing travellers' confidence and decreasing their perception of risk. COVID-19 has an impact on consumers' perceptions of tourism products and services, with a focus on human capital and gaining employee confidence.

Transition to the New World Economic Order

To revitalise the tourism industry, transformations such as restarting, reorganising, and assimilating the industry according to the most recent standards and rules are required. The government's response to climate change and the need for a carbon-free economy will have an impact on the renewal. Following the pandemic, the global economic and political systems will include shifting patterns in climate change mitigation, sustainable tourism, local communities, and societal well-being.

Tourism for the future

The current epoch is ideal for promoting a sustainable and equitable tourism industry. Original cultural sites, according to, suggest happiness, physical condition, environmental responsibility, and traditional ecological information. Such sites are the future of "cultural sustainability," and their prudent management is critical for economic development. Following COVID-19, the tourism industry is bound to be reorganised based on actual planning rather than just paperwork. Education, environmental and social justice, and racial healing must be prioritised in the industry.There is a need for cautious people (for example, tourists, local communities, SMEs, and the government) to capitalise on the current dire situation because it will allow for more tourist experiences. Service providers in the industry must be encouraged to create new demand by changing their unsustainable product offerings. Such measures can connect, support, and care for the entire tourism industry, which benefits everyone. Market participants must also confront the means and systems that will prevent and transform harmful and ineffective tourism. A charter is required for the establishment of a stable and sustainable tourism industry. There is a misalignment between what the UNWTO (World Tourism Organization) preaches (sustainability) and what is practised (growth expansion).Before considering the future of tourism, these disconnects must be understood and repaired. The ongoing impermanent process of deglobalization has presented the tourism industry with a once-in-a-lifetime opportunity to recreate sustainability by ignoring recent "dark sides" such as environmental deprivation, economic abuse, or congestion. Sustainability is a continuous process that is defined by changing beliefs, wishes, information, skills, and public

awareness. Expert knowledge and experience are required to make the transition to sustainable tourism a reality.

societal well-being

The South American concept of BuenVivir was investigated by. This is a non-Western alternative to neoliberal capitalism for shifting tourism priorities from economic growth to the welfare of society as a whole, as well as covering the ecological balance. The impact of COVID-19 has completely altered how people live and travel. Preferences are shifting toward connecting with others and shopping locally. The virus has provided an opportunity for the tourism industry to reinvent itself and contribute to societal well-being. During disasters, the focus is on life, health, and the environment, among other thingsIt is critical to choose a programme that promotes sustainable and equitable development, where people can recognise the planet and change their current unsustainable attitudes toward tourism. In addition, emphasise that the change should prioritise equity. This will necessitate positive and gradual changes in the interconnectedness of systems, where economic growth is no longer considered a default parameter of social and ecological well-being. Scholarship in tourism must recognise tourism as an industry with a focus on societal well-being.

Climate change action

The pandemic's impact is worsening as a result of global climate change. investigates the relationship between pandemic and climate change and investigates how environmental damage can be repaired and linked to ecological grief Emotional dynamics can also help understand tourist behaviour, filling the "attitude-behavior" gap in sustainable tourism. COVID-19 provides an opportunity to address the impact of climate change by shifting from the current "high resource consumption" model to a "environmentally friendly" model.

Local communities are transformational hubs.

During this pandemic, local communities are transformation hubs for the tourism industry. There may be future disagreements in local areas as tourists seek the assistance of these local communities and governments. Significant changes are being considered by tourist destinations in relation to changes in a carbon-free economy (Rideau et al., 2020). Changes at the local level may aid in the restoration of neocolonial and neoliberal biases.

Since the tourism industry has stalled and social distancing acts have become prevalent, even small-scale local-level activity is regarded as harmful. People must consider the local community as a whole.According to Renaud (2020), the cruise tourism industry should approve a "local mobility" model, which means that large cruise ships should be prohibited, but a fleet of smaller ships should be permitted. To protect oneself and others during the pandemic, social unity, self-sacrifice, and a sympathetic attitude are as important as wearing a face

mask. After COVID-19, service providers will be able to rethink and reset the tourism industry for the future. A "community-centered tourism framework" with responsible approaches to reset, redescribe, and refamiliarize the tourism industry in the interest of local communities is required. Based on local thought and acting theory, we are considering domestic or "proximity tourism".A better understanding of the challenges and actions of remote communities may aid in the transformation of the sector. According to some research studies, these are pivotal times for resetting the tourism industry. Domestic or "proximity tourism," based on local thought and acting theory, is being considered by developed countries.

A framework for the new global economic order

The tourism industry appears to have shifted from "over-tourism" to "non-tourism" at the same time. In the coming years, the increasing unemployment in other sectors of the global economy will reflect in the number of tourist visits. The pandemic will undoubtedly affect segments of the tourism industry such as airlines, hospitality, sporting events, restaurants, and cruise lines. The proposed resilience-based framework can aid in industry transformation both during and after COVID-19.

Organizational studies on long-term change address resilience and the deployment of adaptive capabilities by providing insights into recovery responses. COVID-19 and other crises and emergencies raise global awareness and understanding. This pandemic will aid in the development of new business models, which will ultimately determine the industry's chances of survival by transforming it into a much more sustainable form. The tourism industry must show resilience from multiple angles. We believe that three groups, namely governments, market players, and local communities, must work together to strengthen the industry.Technological innovations must advance to a higher level in order to accelerate tourism and hospitality creation. Artificial intelligence (AI), the Internet of Things (IoT), and technologies related to location, navigation, drones, and robotics are just a few examples of areas that require improvement. This can encourage creative thinking in the tourism industry. This pandemic has compelled industry leaders to investigate and evaluate alternative, better-suited technologies in order to reboot the industry and restore consumer trust. According to existing literature, the tourism industry has previously been quick to recover from the shocks of epidemics, pandemics, and global crises. However, governments recognise that the COVID-19 shock is unique in that the unsold capacity cannot be marketed in the coming years, resulting in a permanent setback for the industry.Governments should strive to create an environment in which they can attract investors by offering a variety of opportunities in the spirit of neoliberalism, such as tax breaks, relaxing strict land-use laws, and so on. Governments may encourage tourism businesses to be more locally embedded in order to improve the sense of belonging. To

support these claims, consider how local economies respond to crises by banding together and through social work, and how rural firms have a better chance of recovery than their urban counterparts. Government support, combined with a sense of belonging, may now pave the way for the tourism industry to transform.The challenge is different for large-scale multinational industry players, who focus on local supply chains to reduce costs. They may need to reconsider their operations and rely on more limited and sub-national supply chains. This could include sourcing more resources locally, whether it's food, raw materials, service providers, or workforce composition. Post-pandemic times may result in a long-term decrease in the attractiveness of certain growth areas that are now deemed too risky. A situation like this could bode well for less popular, less populated areas by giving them the opportunity to improve their appeal as potential tourist destinations.Resilience on all sides of the value chain has the potential to transform the tourism industry into a new global economic order characterised by sustainable tourism, climate action, societal well-being, and local community involvement. According to studies, the tourism industry indirectly contributes to pandemics in a variety of ways, such as food waste that leads to industrialised food production, human interference with wildlife and deforestation, and climate change conditions. The lockdown in many countries, as well as the implementation of significant border restrictions, has had a significant impact on the global tourism economy. The shift from "over-tourism" to "under-tourism" will almost certainly reverse the scene of climate change. COVID-19 is having a positive impact on the tourism industry.Low demand in the aviation industry is already forcing airlines to retire obsolete aircraft. Restrictions on international travel for international students, business travellers, political leaders, and others are increasing the value of video-conferencing; These changes are certain to reorient the global tourism industry in a "sustainable" direction, one that prioritises inclusive development over the abstract concept of "growth." Carbon footprint reductions may gain traction globally, as seen in major tourist destinations. Similarly, visitor mobility could change significantly, not just in the near future, but over time. The insatiable neophilia and disturbing desire for (often irresponsible) exploration in faraway places may be replaced by recreation and travel much closer to home.

The tourism sector

Reduced demand will almost certainly cause the sector to contract and prices to rise. The first year after the pandemic will be difficult for the industry, with domestic tourism expected to recover faster. Increased sanitization costs, combined with regulations on capacity reduction (well below maximum occupancy due to social distancing), may have a significant impact on industry profitability and drive up prices even further. We believe that flexible pricing, terms, and conditions can reduce financial risks in the short term. Non-price strategies can also be effective

in changing customers' perceptions of products. Other strategies recommended by our experts are listed below:

Cleaning and sanitising should be emphasised and promoted as an essential part of the supply. Cleaning procedures will most likely change, and PPE will be required for the majority of tourism facilities. New health and safety regulations may require businesses to partially renovate their facilities. Hard flooring, air handling systems, and other features may become standard in new building designs in the near future. Hotel front desks, for example, can be outfitted with counter shields. Reduced occupancy rates in hotels and restaurants can improve customers' perceptions of safety. However, if the government imposes limits that are far below full capacity, this can harm business sustainability and, as a result, raise prices.To limit contact, a gradual shift from personal interactions to technologies may occur. Check-in kiosks and payments made via bank transfer are two examples of this. Facilities may restrict access by requiring that gatherings be limited to a certain number of guests. Hotel room service can take the place of buffets or breakfast bars. Activities for guests can be restricted to those that take place outside. Instead of relying on third parties, hotels can take direct control of their room inventory. During an outbreak, some hotels and other tourism businesses may reach agreements with government institutions to provide their facilities to people who are quarantined.Automation technologies, robots, and artificial intelligence may help facilities reduce fixed costs, improve liquidity and resilience, and maintain social distance in the long run. Market diversification can also help to reduce reliance on a small number of source markets. Outsourcing some services through appropriately flexible contracts can also help to reduce risk. When faced with sudden and unexpected risks, purchasing insurance services can be beneficial. Travel confidence and risk perception will influence the speed with which the industry recovers. Tourism will most likely return to pre-crisis levels in the long run. Tourists, on the other hand, may place a higher value on hygiene when choosing their lodging.

The government's role

Government actions to support local economies have varied across countries. The tourism industry requires credible government measures to boost market confidence and reduce the risk of this virus. Overall, governments' roles in this crisis should evolve over time. They should move quickly from the initial stage of liquidity subsidisation to incentivizing long-term recovery and innovation.

Additional government measures should concentrate on the following:

Following in the footsteps of some countries by providing interest-free loans, guaranteed loans, flexible mortgages, creative financing options, and non-refundable subsidies. These can benefit any tourism or related business (e.g. hotels, restaurants, cruise lines, airlines). Provide funding

for tourism destination promotion (e.g. vouchers to residents which can subsidise demand). Lifting or relaxing visa requirements for countries recovering from the outbreak in order to increase international tourism flow.

Allowing local governments to implement regulations - no heavy-handed central-level rules/regulations.Implementation of a Pigouvian tax - a sort of 'COVIDrecovery' tax - to partially internalise the pandemic. Control over potential predatory investors in order to protect businesses that have become vulnerable as a result of the crisis.

Conclusion

The tourism industry was identified as a major cause and carrier of the novel coronavirus that triggered the COVID-19 outbreak. The industry's unsustainable practises did not help the cause of global sustainable living. The pandemic has nearly halted the global tourism industry. All industry stakeholders must collaborate to make the industry resilient enough to deal with the crisis. We propose a resilience-based framework for the tourism industry based on studies conducted to understand the industry in the context of COVID-19.We argue in our framework that with the help of a resilient approach from governments, market players, technology innovators, and the industry's workforce, the tourism sector may end up evolving in a much more sustainable way post-pandemic. The involvement of local communities will be critical in this journey, as international travel restrictions may last longer than expected. Such developments would not only broaden the tourism industry's base, but would also provide opportunities for less-developed tourism destinations to grow.To survive in post-pandemic times, large-scale tourism players would require a reboot. Nonetheless, by following our resilience-based framework, small-scale players can emerge victorious and ensure the well-being of society as a whole while also facilitating sustainable tourism.

References

Assaf, A., &Scuderi, R. (2020).COVID-19 and the recovery of the tourism industry. *Tourism Economics*, *26*(5), 731–733. https://doi.org/10.1177/1354816620933712

Sharma, G. D., Thomas, A., & Paul, J. (2021).Reviving tourism industry post-COVID-19: A resilience-based framework. Tourism Management Perspectives, 37, 100786.https://doi.org/10.1016/j.tmp.2020.100786

Alves, J. C., Lok, T. C., Luo, Y., &Hao, W. (2020). Crisis management for small business during the covid-19 outbreak:survival, resilience and renewal strategies of firms in macau [Preprint]. In Review.https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-34541/v1

Bansal, S., Garg, I., & Sharma, G. (2019). Social entrepreneurship as a path for social change and driver of sustainable development: A systematic review and research agenda. Sustainability, 11(4), 1091.https://doi.org/10.3390/su11041091

Benjamin, S., Dillette, A., & Alderman, D. H. (2020). "We can't return to normal": Committing to tourism equity in the post-pandemic age. Tourism Geographies, 22(3), 476–483. https://doi.org/10.1080/14616688.2020.1759130

Barlow, J., Lennox, G. D., Ferreira, J., Berenguer, E., Lees, A. C., Nally, R. M., Thomson, J. R., Ferraz, S. F. de B., Louzada, J., Oliveira, V. H. F., Parry, L., Ribeiro de Castro Solar, R., Vieira, I. C. G., Aragão, L. E. O. C., Begotti, R. A., Braga, R. F., Cardoso, T. M., de Oliveira, R. C., Souza Jr, C. M., … Gardner, T. A. (2016). Anthropogenic disturbance in tropical forests can double biodiversity loss from deforestation. Nature, 535(7610), 144–147. https://doi.org/10.1038/nature18326

Buckley, R. (2020). Conservation implications of COVID19: Effects via tourism and extractive industries. Biological Conservation, 247, 108640.https://doi.org/10.1016/j.biocon.2020.108640

COMPARATIVE STUDY OF FORMATIVE AND SUMMATIVE TESTING ON STUDENT'S ACHIEVEMENT IN SECONDARY SCHOOL

Nabanita Majhi
Assistant Professor of Education,
Jogesh Chandra Chaudhuri College

ABSTRACT : Formative test is an integral part of our education system as it diagnosis student's difficulties in case of learning and evaluating teaching learning process. However, summative evaluation is also helpful to give proper grading at the end of the course. Both these evaluation systems have importance in our education system. After completing the educational learning process, formative and summative evaluation methods are tested based on two different groups of students studying in class ix. The survey result shows that there is no significant difference between the two evaluation methods. The study is helpful for researchers, academicians and policy makers in the school education system.

Key Word: Formative, Summative, Evaluation, Assessment, Achievement, Academic Institution.

Introduction

Evaluation is an integral part of our education system. As our education system depends on three stages selection of educational objectives, teaching learning experiences and evaluation. First we fixed the educational objectives, after that provide the best teaching learning experiences to fulfils that fixed objectives, after a while we evaluate that whether the fixed educational objectives are achieved or not. To evaluate student's progress in particular subjects, there are several kind of process used, such as written examination, oral, observation, etc. Among them written examination has a great importance in our evaluation system. Written examination can apply both in case of formative evaluation and summative evaluation. Today formation evaluation becomes an integral part in case of evaluation. So, as in west Bengal unit test is a compulsory part for evaluation. If we continuously take examination after a certain gap, it seems that student will be overcome the fear of examination system. They do better result. Because of examination phobia effect the student's achievement in certain subjects.

In case of summative evaluation, student's achievement is measured before the end of their course. In that case, student's performance measure on their one day preparation. But in one day

preparation we cannot evaluate student's performance in vividly. So, if we take continuous evaluation throughout the year and judge students on the basis of their performance that will be better to evaluate them.

That's why researcher here wanted to see the student's performance in case of continuously given formative evaluation and student's performance without given any formative evaluation.

Concept about Formative and Summative Assessments

The terms "formative" and "summative" do not have to be difficult, yet the definitions have become confusing in the past few years. This is especially true for formative assessment. In a balanced assessment system, both summative and formative assessments are an integral part of information gathering.

Summative Assessments are given periodically to determine at a particular point in time what students know and do not know. Summative assessment in the classroom level is an accountability measure that is generally used as part of the grading process. Here are some examples of summative assessments which are introduced in our examination system are as follows:

- ✓ End-of-unit or chapter tests
- ✓ End-of-term or semester exams
- ✓ State level tests
- ✓ District level tests

Although the information gather from this type of assessment is important, it can only help in evaluating certain aspects of the learning process. Because they are spread out and occur after instruction every few weeks, months, or once a year, summative assessments are tools to help evaluate the effectiveness of programs, school improvement goals, alignment of curriculum, or student placement in specific programs.

Formative Assessment is part of the instructional process. When incorporated into classroom practice, it provides the information needed to adjust teaching and learning while they are happening. In this sense, formative assessment informs both teachers and students about student understanding at a point when timely adjustments can be made. These adjustments help to ensure students achieve targeted standards-based learning goals within a set time frame.

Literature Review on Formative and Summative Assessment

Scriven (1967) first utilized the terms *formative* and *summative* when writing about two possible purposes of evaluation. Bloom (1969) stated that the terms could also be applicable to teachers who specifically

wanted to assess student progress toward a standard. Bloom (1971) soon introduced the foundation of assessment for learning (or formative assessment) in the *Mastery Learning* instructional model. Bloom's Mastery Learning model stipulated that students would not progress to new concepts and objectives until they met, or mastered, previous ones. Popham (2008) advanced Bloom's model with his own learning progression work. According to Popham, teachers should formatively assess students using groups of learning targets, called progressions, which built upon each other and culminated in a significant "target curricular aim" (p. 24) .Forty-four years after Scriven (1967) first publicized the terms *formative* and *summative*, they were current buzzwords in education.

Formative assessment is also called and described as assessment for learning (Assessment Reform Group, 1999; Stiggins, 2005). Formative assessment takes many forms, and thus answers to many differing definitions. Black et al. (2004) called it an assessment whose primary purpose was to aid in student learning. However, Popham (2011) described formative assessment as a process in which an assessment was but one component. The formative assessment process was one of measuring students" progress toward a benchmark, a standard, or a learning target, and collaboratively (with the student) deciding where to go next when the student met the objective, or when the student did not meet the objective.

Summative assessment is also known and described as assessment of learning (Assessment Reform Group, 1999). Summative assessment is sometimes also best described as a traditional test for which a student is graded. It is a summation and measure of student learning.

Sadler (1983) suggested that student learning increased when teachers made students part of the learning process. Teachers could do this by showing students how to self-assess. In other words, students would formatively assess their own work. Sadler said teachers had to show students models of proficiency so students would know the standards to which they aspired: Teachers often shelter behind undefined criteria until students submit their work, and then provide rationalizations of evaluations and grades after papers are returned. In other words, there is often the temptation to see what the students have done first. It is then irresponsible to say to students.

Effective formative evaluation in class room: Popham and Stiggins (n.d.) asserted that descriptive formative feedback would engage students

in learning and increase student affect toward the formative assessment process. They identified six specific strategies:

1. Provide student-friendly learning targets when introducing the lesson.
2. Accompany those targets with representative student work samples.
3. Provide continuous descriptive feedback – descriptive enough to let students know what to do next.
4. Teach self-assessment.
5. Help students improve by one component at a time in order to keep from overwhelming them.
6. Teach students ways of reflection. (n.p.)

Objectives of the Study

The study has some specific objectives is given below.

- To study the student's achievement in case of formative evaluation.
- To study the student's achievement in case of summative evaluation.
- To study the importance of formative evaluation.
- To study the importance of summative evaluation.
- To study the difference in achievement test scores between formation evaluations and in case of only given summative evaluation.

Research Methodology

SAMPLE: To conduct this research program me researcher took all girls student as the sample of his study. Here total sample size is 79.

TABLE-1

Student of Class ix- A	37
Student of Class ix-B	42
Total No of student	79

Tools: A standardized achievement test was prepared on physical science according the class syllabus.

Reliability: "Test re-tests method "used to estimate the reliability of the test.

Validity: "Content validity" used to check the validity of the test.

Statement of Hypothesis

For conduct the research program me researcher proposed two null hypothesis___

H_{01}: There is no significant difference between the achievement test score in case of summative evaluation and formative evaluation.

H_{02}: There is no significant difference between the achievement test score in case of formative evaluation I and formative evaluation II

Analysis of Data

Distribution of achievement test scores of the students in Physical science in Formative Evaluation I of class ix Section-A

TABLE-2

Class interval	**Frequency**
1-5	3
6-10	8
11-15	7
TOTAL	18

MEAN	9.11
MEDIAN	9.25
MODE	9
STANDARD DEVIATION	3.53
SKEWNESS	0.031

Distribution of achievement test scores of the students in Physical science in Formative Evaluation II of class ix Section-A

TABLE-3

Class interval	**Frequency**
1-5	2
6-10	8
11-15	10
TOTAL	20

MEAN	9.5
MEDIAN	9.5
MODE	9.5
STANDARD DEVIATION	1.66
SKEWNESS	0

Determination of the t value of the achievement test with Formative Evaluation I and Formative Evaluation II between 79 students

TABLE-4

Statistics	**Achievement test with formative evaluation I**	**Achievement test formative evaluation II**
No. of students	18	20
Mean values	9.11	9.5
Standard deviation (SD)	3.53	1.66
SD	2.71	
SD_E	0.88	
DIFFERENCE IN MEAN	0.39	
VALUE OF t	0.4431 Insignificant at .05 level	

Distribution of achievement test scores of standardized test of the students in Physical science with given Formative Evaluation in class ix Section-A

TABLE-5

Class interval	**Frequency**
1-5	10
6-10	7
11-15	10
16-20	10
TOTAL	37

MEAN	10.7
MEDIAN	11.25
MODE	13.44
STANDARD DEVIATION	5.76
SKEWNESS	0.475

Distribution of standardized achievement test scores of the students in Physical science without given Formative Evaluation in class ix Section-B

TABLE-6

Class interval	**Frequency**
1-5	18
6-10	14
11-15	7
16-20	3
TOTAL	42

MEAN	7.4
MEDIAN	6.57
MODE	6.9
STANDARD DEVIATION	31.86
SKEWNESS	0.016

TABLE-7

Determination of the t value of the achievement test with Formative Evaluation and without Formative Evaluation between 79 students

Statistics	**Achievement test with formative evaluation**	**Achievement test without formative evaluation**
No. of students	37	42
Mean values	10.7	7.4
Standard deviation (SD)	5.76	31.86
SD	27.58	
SD_E	6.22	
DIFFERENCE IN MEAN	0.39	
VALUE OF t	0.53 Insignificant at .05 level	

Findings

From the above result, the researcher could draw some conclusion about the study that there is no significant relation between the formative evaluation and summative evaluation and there is no significant relation between formative evaluation I and formative evaluation II on

achievement test of the student in Physical Science. Besides it is also remarkable that the researcher does not consider the other variables like, intelligence, classroom environment etc. in the study that might have influence on this research.

Conclusions

As the study shows that there is no significant difference between formative and summative evaluation we can't conclude that formative evaluation does not have any importance. Formative evaluation its self has an importance.

It helps student to get mastery learning on that particular topic, Over Come the fear of examination, learner can evaluate themselves, diagnostics learning difficulties, and use of appropriate teaching and learning method.

Study conducted very short duration of time. So if it is possible to conduct the study a long period there should be an effective result. Because the formative evaluation its self have and importance to achieve a mastery learning.

As the study conducted short period of time in class IX –A section's student attain a mastery level learning on that particular topic so they get good marks .where as in case of IX-B section, the teaching learning process done by the use to different teaching method which are necessary according to the topic. This way may be also helpful to the student to get good marks.

But the study shows as if we used different teaching method according to topic that helpful student to get good marks, and also they score better without any formative evaluation.

References

- Dr.Mrunalini.T, Educational evaluation, Neel kamal publication Pvt.Ltd , Hyderabad, 2009
- Dr.chaudhuri. sudip, Leading action research in teacher education an introduction to theory and practice, Rita Publication , Kolkata, 2013
- Dr.paul debasish, research methodology and statistical techniques,Rita publication,Kolkata,2014-15

A comparison of adjustment ability of adolescents before and after COVID-19

Sarthak Paul
Research Scholar, Mahatma Gandhi University

Abstract: The COVID-19 pandemic has hit the world very hard.We have seen people die helplessly in the streets, and we have seen people lose their jobs in a very short time. It creates chaos in society. Chaos in society gives birth to impatient, intolerance, and maladjustment problems.Due to the COVID-19 pandemic, the world has changed. The school has changed its routine class and examination system from offline to online. Many parents have moved because of their jobs. Therefore, the pandemic has affected students.

Maladjustment problems can pose a serious threat to our society, especially in a democratic and secular country like India. We can proudly say that our society and nation have unity in diversity. But, if the maladjustment problems increase in society, especially among the students it will be a serious threat to the unity of India.

The purpose of this study is to compare the adjustment abilities of secondary school students pre and post-COVID-19. I would also like to compare the social adjustment of secondary school students pre and post-COVID-19.The adjustment ability of Male and Female school students will also be compared in this study.

Keywords: Adjustment ability, Maladjustment, COVID-19, Society, Social adjustment.

Introduction:

In a secular and democratic nation like India, we are proud to say that our nation and society are united in diversity. In a secular and democratic country, the most crucial aspect is its people for its intactness. It is essential to have patience, tolerance, and adjustment ability to be united. The ability to adjust makes a crucial role in keeping the nation united to keep the nation happy.

COVID-19 has made us change our lifestyles. Many parents lost their jobs, and many parents were forced to migrate to a new place during the pandemic; It may have affected the mindsets and mentalities of the students. Occasionally, we witness such incidents that are caused by

maladjustment problems. Therefore, a question arises about whether we can adjust to the new environment correctly.

Here the study tries to compare the adjustment ability of secondary school students pre and post covid 19 with respect to their gender. The study is also trying to compare the social adjustment ability of secondary school students pre and post-COVID-19.

Conceptual framework:

Adjustment ability: A person's ability to adjust to a new environment is their ability to adapt easily to a new situation or environment. People with poor adjustment ability will find it hard to adjust to a new situation or a new environment. There are many types of adjustment like social adjustment, emotional adjustment, educational adjustment, etc.

Maladjustment: It is exactly the opposite of adjustment ability. It is the inability to cope with the demands of a normal social environment.

COVID-19: Coronavirus disease (COVID-19) is caused by the SARS-CoV-2 virus; Most individuals infected with COVID-19 will suffer from mild respiratory illness and recover without treatment; however, some will be gravely ill and require medical attention.

Society: A society is where people live together in more or less orderly communities as a whole.

Social adjustment: Social adjustment is the ability to adjust to many different social situations; The extent to which one engages incompetent social behaviour and adapts to the immediate social context.

Objectives:

- To study the adjustment ability among secondary male students pre and post-COVID-19 in the Cooch Behar district.
- To study the adjustment ability among secondary female students pre and post-COVID-19 in the Cooch Behar district.
- To study the adjustment ability among secondary school students pre and post-COVID-19 in the Cooch Behar district.
- To study the social adjustment among secondary school students pre and post-COVID-19 in the COOCH Behar district.

Hypothesis:

- **H_0 1:**There is no significant difference in the adjustment ability among secondary male students pre and post-COVID-19 in the Cooch Behar district.

- **H_0 2:**There is no significant difference in the adjustment ability among secondary female students pre and post-COVID-19 in the Cooch Behar district.
- **H_0 3:**There is no significant difference in the adjustment ability among secondary school students pre and post-COVID-19 in the Cooch Behar district.
- **H_0 4:**There is no significant difference in the social adjustment among secondary school students pre and post-COVID-19 in the COOCH Behar district.

Methodology:

Research methodology can be defined as the science of exploring how research is conducted; Above all, it is a systematic method of solving the problem of research. To conduct the research smoothly, the researcher must not only realize the research methods, but also the research methodology, which identifies the steps the researcher takes in studying the research problem with appropriate rationale.

Variables: Variables are something that changes with time. This study takes adjustment ability, social adjustment ability, gender, and COVID-19 as variables.

Research Method: In this study, the researcher has chosen to conduct a descriptive study as the research method.

Sampling: 35% of the schools, out of which 10% of the students have been selected as samples. Stratified random sampling has been chosen for collecting the data.

Category	Sample Size	Male Sample Size	Female Sample Size
Pre-COVID	138	45	93
Post-COVID	172	66	106

Data collection tools and techniques: To collect the data, a standard tool has been selected. ‘Adjustment inventory for school students’ tool is selected. The tool is developed by prof. A.K.P. Sinha and prof. R.P. Singh.

Data analysis techniques: T-tests have been used to analyse and interpret the collected data.

Result:

- **H_0 1:**There is no significant difference in the adjustment ability among secondary male students pre and post-COVID-19 in the Cooch Behar district.

Table: Mean, Standard deviation, Standard error of the mean, and significant difference in Mental health of secondary male students pre and post-COVID-19 of Cooch Behar district.

Category	Sample Size	Mean value	S.D value	Standard error of the mean	T-value	Significant
Male (pre)	45	36.57778	9.45	1.41	0.87	NS
Male (post)	66	34.95455	10.03	1.23		

Source: Calculated by researcher

NS= Not significant at the 5% and 1% level

df= $N_1 + N_2 - 2 = 45+66-2 = 109$

(According to the t table)

t= 1.98 at 5% significant level

t= 2.63 at 1% significant level

Interpretation: Here the value of the T ratio is 0.87 which is less than 1.98 at the 5% significant level and also less than 2.63 at the 1% significant level. So, the null hypothesis is accepted at the 5% as well as 1% significant level.

- **H_0 2:** There is no significant difference in the adjustment ability among secondary female students pre and post-COVID-19 in the Cooch Behar district.

Table: Mean, Standard deviation, Standard error of the mean, and significant difference in Mental health of secondary male students pre and post-COVID-19 of Cooch Behar district.

Category	Sample Size	Mean value	S.D value	Standard error of the	T-value	Significant

				mean		
Female (pre)	93	36.60215	10.52	1.09	2.15	S*
Female (post)	106	33.42453	10.25	1		

Source: Calculated by researcher

S*= Significant at the 5% but not in 1% levels

df= $N_1 + N_2 - 2$= 93+106–2 = 197

(According to the t table)

t= 1.97 at 5% significant level

t= 2.6 at 1% significant level

Interpretation: Here the value of the T ratio is 2.15 which is greater than 1.97 at the 5% significant level but less than 2.6 at the 1% significant level. So, the null hypothesis is rejected at the 5% significant level, but accepted at the 1% significant level.

- **H_0 3:** There is no significant difference in the adjustment ability among secondary school students pre and post-COVID-19 in the Cooch Behar district.

Table: Mean, Standard deviation, Standard error of the mean, and significant difference in Mental health of secondary male students pre and post-COVID-19 of Cooch Behar district.

Category	Sample Size	Mean value	S.D value	Standard error of the mean	T-value	Significant
Students (pre)	138	36.5942	10.14	0.86	2.23	S*
Students (post)	172	34.01163	10.17	0.78		

Source: Calculated by researcher

S*= Significant at the 5% but not in 1% levels

df= $N_1 + N_2 - 2$= 138+172–2 = 308

(According to the t table)

t= 1.97 at 5% significant level

t= 2.59 at 1% significant level

Interpretation: Here the value of the T ratio is 2.23 which is greater than 1.97 at the 5% significant level but less than 2.59 at the 1% significant level. So, the null hypothesis is rejected at the 5% significant level, but accepted at the 1% significant level.

- **H_0 4:** There is no significant difference in the social adjustment among secondary school students pre and post-COVID-19 in the COOCH Behar district.

Table: Mean, Standard deviation, Standard error of the mean, and significant difference in Mental health of secondary male students pre and post-COVID-19 of Cooch Behar district.

Category	Sample Size	Mean value	S.D value	Standard error of the mean	T-value	Significant
Students (pre)	138	13.89	4.2	0.36	1.37	NS
Students (post)	172	13.20	3.63	0.28		

Source: Calculated by researcher

NS= Not significant at the 5% and 1% levels

df= $N_1 + N_2 - 2$= 138+172–2 = 308

(According to the t table)

t= 1.97 at 5% significant level

t= 2.59 at 1% significant level

Interpretation: Here the value of the T ratio is 1.37 which is less than 1.97 at the 5% significant level and also less than 2.59 at the 1% significant level. So, the null hypothesis is accepted at the 5% as well as 1% significant level.

Findings:

- There is no significant difference in the adjustment ability among secondary male students pre and post-COVID-19 in the Cooch Behar district at the 5% and 1% significant levels. 45 male secondary school students have been taken as a pre-COVID male sample out of which 5 students have high, 26 students have above average, and 14 students have average adjustment ability. 66 male secondary students have been taken as a post-COVID

male sample, out of which 15 have high, 37 have above average, and 14 have average adjustment ability.

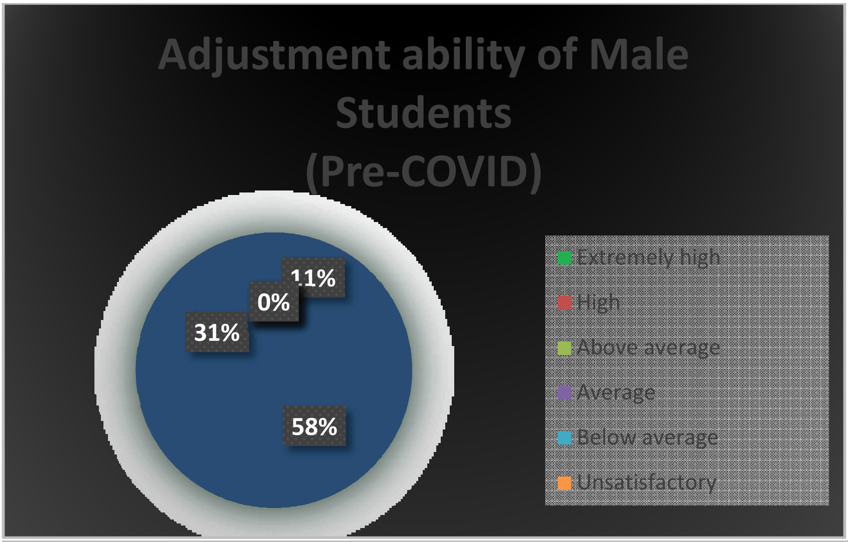

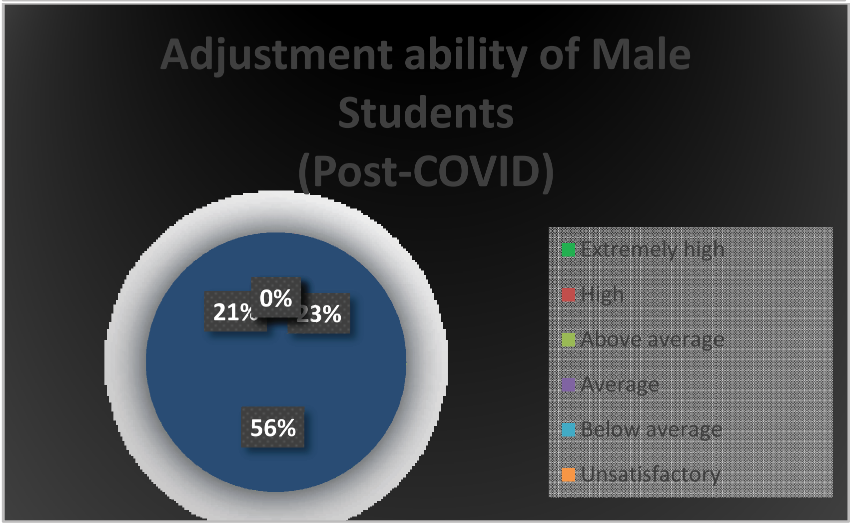

- There is a significant difference in adjustment ability among female secondary school students pre and post-COVID at the 5% significant level, but the difference is insignificant at the 1% significant level. 93 female secondary students have been taken as a pre-COVID sample, out of which 15 students have high, 48

students have above average, 29 students have average, and 1 student has below average adjustment ability. 106 female secondary students have been as a post-COVIDsample, out of which 1 has extremely high, 28 have high, 54 have above average, 22 have average and 1 has below average adjustment ability.

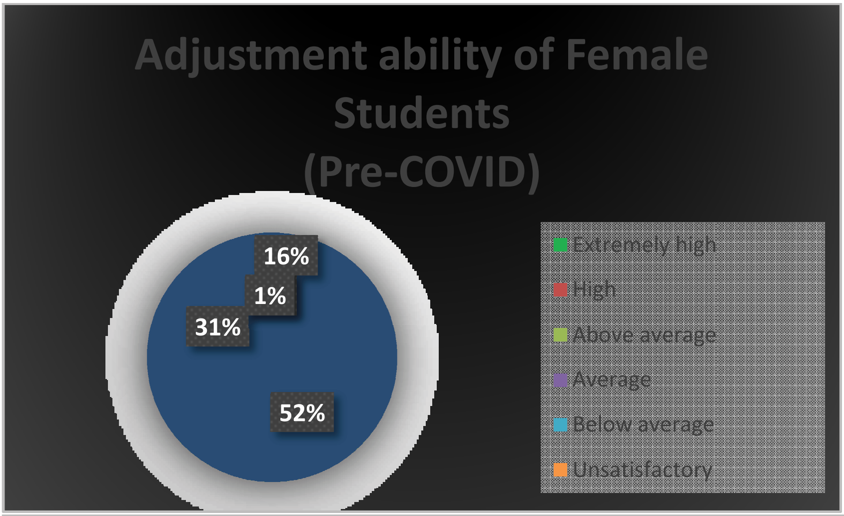

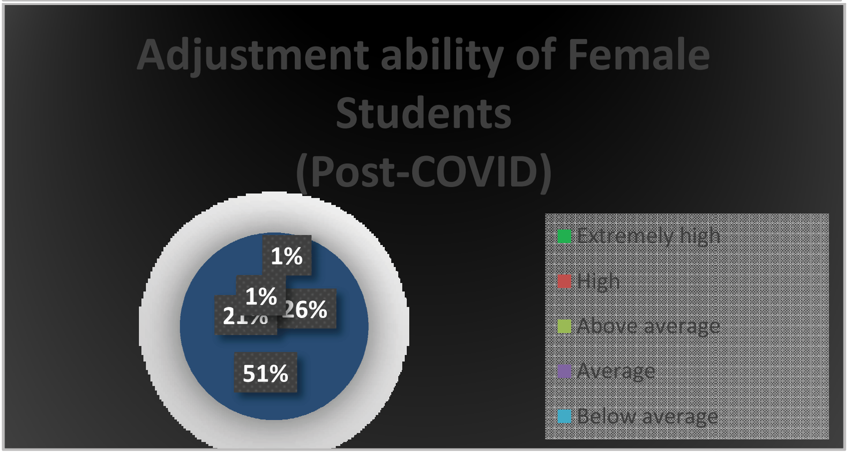

- There is a significant difference in adjustment ability among secondary school students pre and post-COVID at the 5% significant level, but the difference is insignificant at the 1% significant level. 138 secondary students are selected as a pre-

COVID sample, out of which 20 have high, 74 have above average, 43 have average and 1 has below average adjustment ability. 172 secondary students are selected as a post-COVID sample, out of which 1 has extremely high, 43 have high, 91 have above average, 36 have average and 1 has below average adjustment ability.

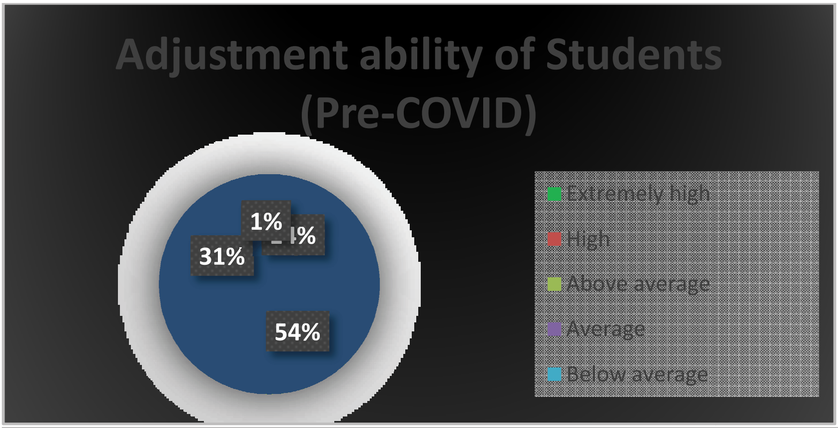

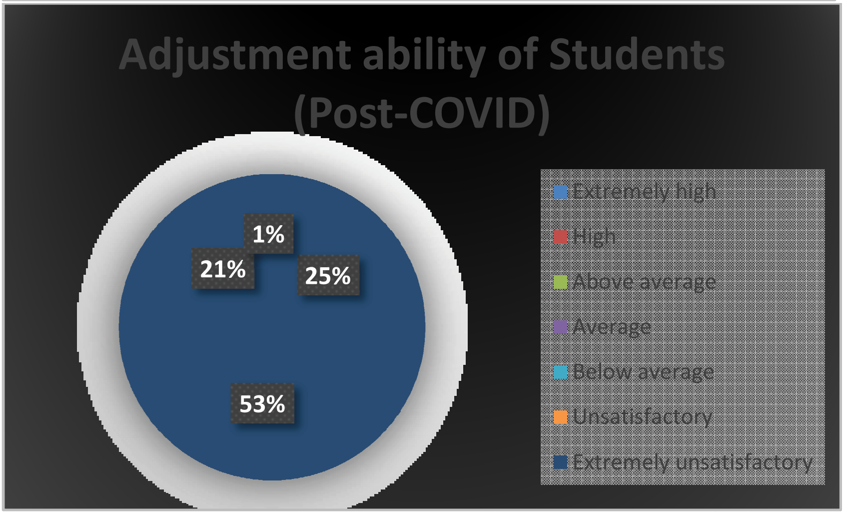

- There is no significant difference in the social adjustment ability among secondary students pre and post-COVID-19 in the Cooch Behar district at the 5% and 1% significant levels. 138 secondary school students have been taken as a pre-COVID sample out of which13 students have high, 52 students have above average, 64

students have average, and 9 have belowsocial adjustment ability. 172 secondary students have taken as a post-COVID male sample, out of which 1 has extremely high, 20 have high, 78 have above average, 62 have average, 9 have below average and 2 have unsatisfactorysocial adjustment ability.

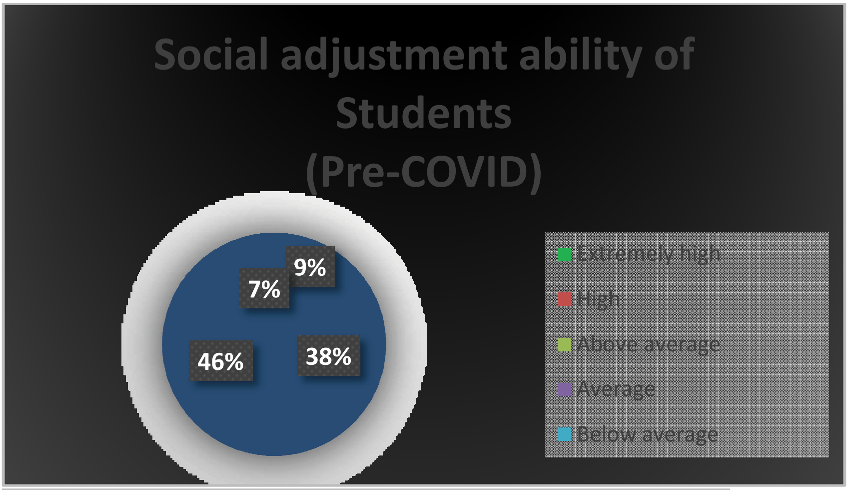

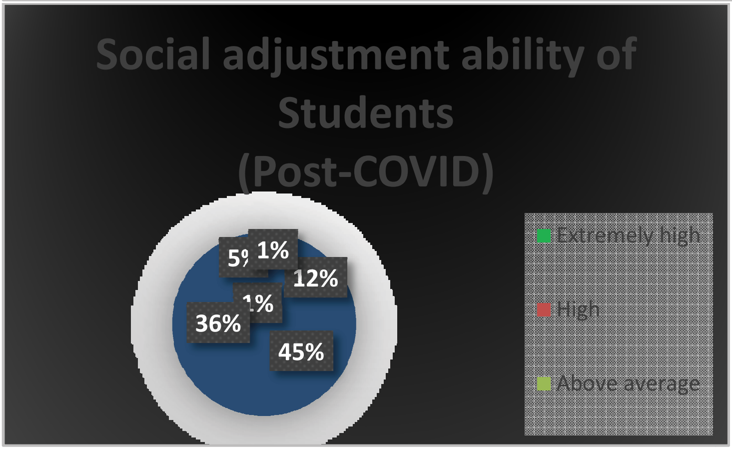

Delimitations of the Study:

- The study is delimited to 16 secondary schools in the Coochbehar district.
- The study is delimited to the Tufanganj sub-division in the Coochbehar district.

- The study is delimited to only 310 samples.
- The study is restricted to the variables of Adjustment, COVID-19, Social adjustment, and gender.
- Only government-aided secondary schools are selected for the study.
- Data have been collected from different students before and after the COVID.

Conclusion:

The study had shown that 14% and 25% of the students have high adjustment ability in pre and post-COVID-19 respectively. But the only 9% and 12% of students have shown good social adjustment ability in pre and post-COVID-19 respectively. It is not a great sign for any nation.To improve an individual's ability to adjust, peace and values education should be provided.A nation's strength depends on its unity. Therefore, it is very crucial to address issues of maladjustment and to come up with ways to decrease the problem in society.

Reference:

Books:

Mangal, S. K. (2017). *Advanced educational psychology* (2nd ed.). PHI Learning Private Limited.

Mangal, S. K. (2017). *Statistics in psychology and education* (2nd ed.). PHI Learning Private Limited.

Mangal, S. K. (2019). *Essentials of educational psychology*. PHI Learning Pvt.

Online:

Coronavirus disease (COVID-19). (2020, January 10). www.who.int. https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1

EFFECTS OF ENDURANCE TRAINING PROGRAMME ON SELECTED ANTHROPOMETRIC PARAMETERS AMONG SCHOOL BOYS

Kunal Sardar
Assistant Professor, Sitaram Mahato Memorial College,
Anandadeep Kuruktopa, Purulia, W.B. India

Abstract : The purpose of the present study was to investigate the effects of Endurance training Programme on selected Anthropometric parameters among school boys. To achieve the purpose of the study forty school boys were selected from Napara High School (H.S.), Purulia District W.B. The subject's age ranges from 14 to 16 years. The selected school boys were divided into two equal groups consist of 20 school boys each namely experimental group and control group. The experimental group underwent Endurance training programme for ten weeks. The control group was not taking part in any exercise during the course of the study. Calf Girth, Thigh Girth, Chest Girth and Wrist Girth were taken as criterion variables in this study. Pre test was taken before the exercise period and post test was measured immediately after the ten weeks exercise period. Statistical technique 't' ratio was used to analyze then means of the pre test and post test data of experimental group and control group. The results revealed that there was significant difference was found on Calf Girth, Thigh Girth and little bit improved was found on Chest Girth and Wrist Girth. The difference found is due to Endurance training of experimental group on Calf Girth, Thigh Girth, and Chest Girth when compared to Control Group.

Keywords: Endurance Training, Calf Girth, Thigh Girth, Chest Girth, Wrist Girth.

I. Introduction

Now-a-days, sports have become an essential part of life. Increased participation in sports has resulted in competition, which has become an important element of modern life. Competition provides the means by which one can show one's worth successfully (Reuben. B. Frost 1971).

Sports' training is to develop physical fitness level of the sportsperson. Physical fitness consists of mainly strength, speed,

endurance, flexibility and other coordinative abilities. These abilities are essential prerequisites of high sports performance.

Sports training is always performance oriented as it targeted at achieving high performance in a given sports competition. Each and every aspect or process of sports training leads to improving sports performance whether it is a physical or psychological preparation or skill/technique development. (Ajmer Singh et al. 2005)

Endurance can be developed using continuous and interval running. Continuous training, as the name implies, involves continuous activity, without rest intervals. This has varied from high intensity, continuous activity of moderate duration to low intensity activity of an extended duration, i.e., long, slow distance training. It is suggested by the sports training experts that slower-paced variations, such as LSD or Fartlek, be introduced periodically, e.g., twice per week, to give the athlete some relief from the exhaustive, high – intensity, continuous training.

The name of the system comes from the “interval,” or res period, between the fast run. Interval training involves alternating short bursts of intense activity with what is called active recovery, which is typically a less-intense form of the original activity.

Training techniques based on new findings in exercise physiology, biomechanics, sports medicine etc. are adopted to bring about maximum possible unfolding of potential in sports performance (Ludwig).

II. Methodology

For the purpose of the study was to find out the Effect of Endurance training on selected anthropometric parameters among school boys. To achieve this purpose of the study, forty school boys were selected from Napara High School (H.S.), Purulia District W.B.as subjects at random. The age of the subjects was ranged from 14 to 16 years. The selected subjects were divided into two equal groups of twenty each, such as Endurance training group (Experimental Group) and Control group. The experimental group underwent Endurance training for three days per week for ten weeks. Control group which they did not undergo any special exercise programme apart from their regular physical activities as per their curriculum.This study was formulated as random group design. One group was assigned Endurance training programme. The other group

acted control group no training programmed. The 't' ratio was calculated to find out the significance of the difference between the mean of the initial and final test of the experimental as well as control group.

III. Results and Discussion

TABLE 1

SIGNIFICANCE OF DIFFERENCE BETWEEN PRE AND POST TEST MEANS IN CALF GIRTH OF EXPERIMENTAL AND CONTROL GROUP SCHOOL BOYS

Groups	Mean ± S.D.		Mean Difference	Standard Error	't' ration
	Pre	Post			
Experimental	28.60 + 2.25	28.93± 2.36	0.32	0.091	3.57*
Control	28.63 +2.66	28.65± 2.66	0.03	0.044	0.675

* Significant at .05 level of confidence.
* 't' value required to be significant at 19 degree of freedom at .05 level of confidence is 2.09.

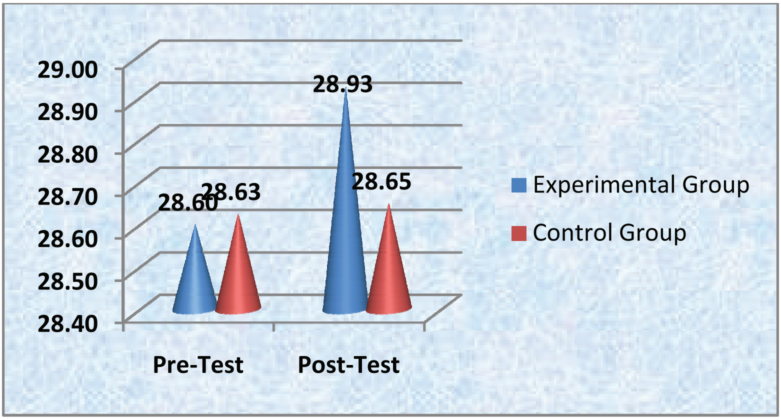

Figure 1. Comparison of means of Calf Girth between Pre and Post test data belonging to experimental and control group subjects of School boys.

TABLE 2
SIGNIFICANCE OF DIFFERENCE BETWEEN PRE AND POST TEST MEANS IN THIGH GIRTH OF EXPERIMENTAL AND CONTROL GROUP SCHOOL BOYS

Groups	Mean + S.D.		Mean Difference	Standard Error	't' ration
	Pre	Post			
Experimental	42.60 + 3.52	43.25± 3.55	0.65	0.15	4.346*
Control	42.55 +3.72	42.70± 3.71	0.15	0.083	1.811

* Significant at .05 level of confidence.
* 't' value required to be significant at 19 degree of freedom at .05 level of confidence is 2.09.

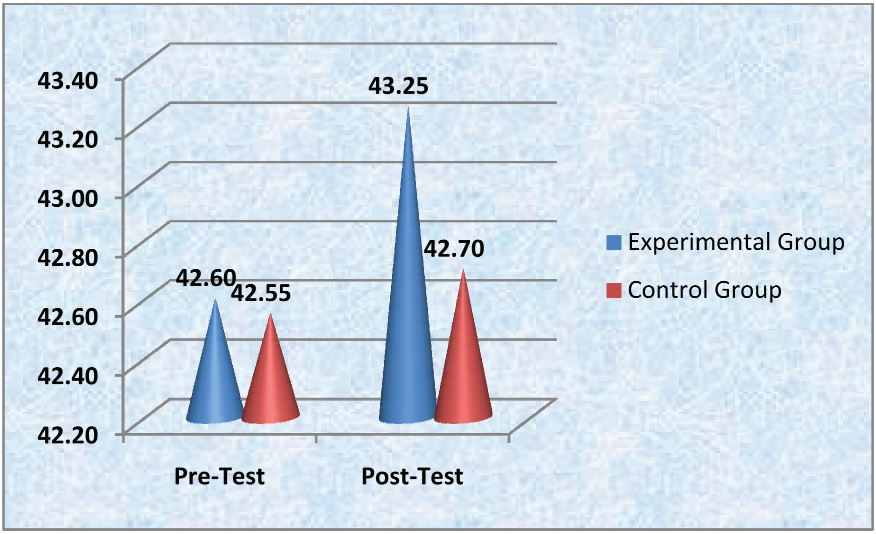

Figure 2. Comparison of means of Thigh Girth between Pre and Post test data belonging to experimental and control group subjects of School boys.

TABLE 3
SIGNIFICANCE OF DIFFERENCE BETWEEN PRE AND POST TEST MEANS IN CHEST GIRTH OF EXPERIMENTAL AND CONTROL GROUP SCHOOL BOYS

Groups	Mean ± S.D.		Mean Difference	Standard Error	't' ration
	Pre	Post			
Experimental	74.83 + 5.91	74.95+ 5.82	0.13	0.072	1.745
Control	74.68 + 4.84	74.73 + 4.87	0.05	0.051	0.975

* Significant at .05 level of confidence.
* 't' value required to be significant at 19 degree of freedom at .05 level of confidence is 2.09.

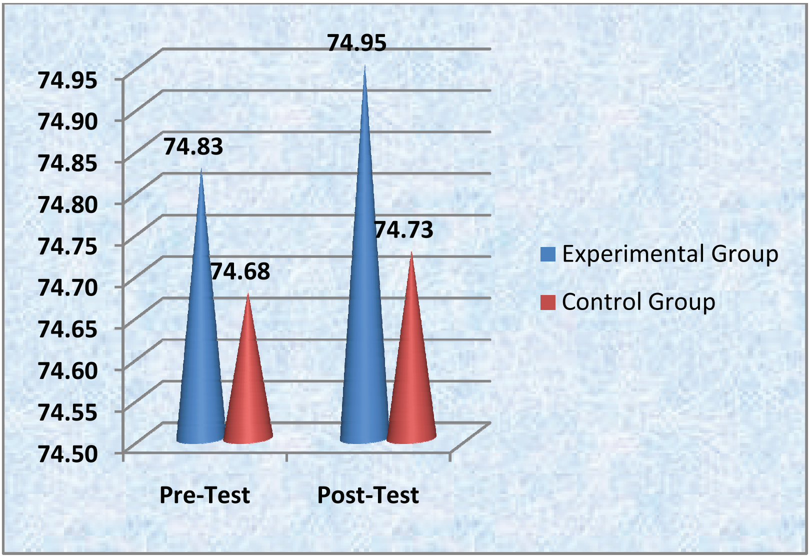

Figure 3. Comparison of means of Chest Girth between Pre and Post test data belonging to experimental and control group subjects of School boys.

TABLE 4
SIGNIFICANCE OF DIFFERENCE BETWEEN PRE AND POST TEST MEANS IN WRIST GIRTH OF EXPERIMENTAL AND CONTROL GROUP SCHOOL BOYS

Groups	Mean + S.D.		Mean Difference	Standard Error	't' ration
	Pre	Post			
Experimental	14.35 + 0.85	14.40± 0.83	0.05	0.034	1.453
Control	14.3 + 0.64	14.33± 0.62	0.03	0.025	1.199

* Significant at .05 level of confidence.
't' value required to be significant at 19 degree of freedom at .05 level of confidence is 2.09.

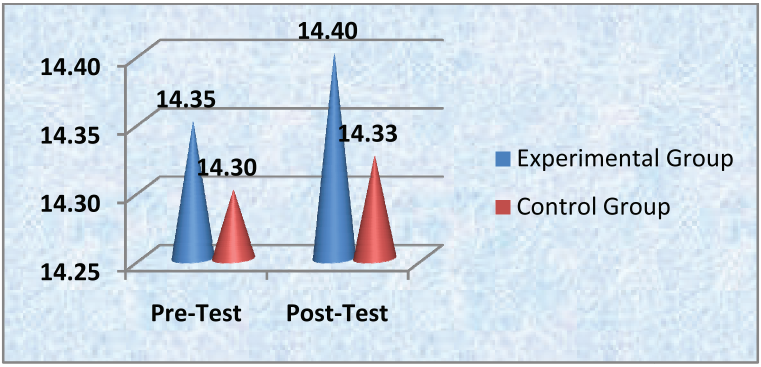

Figure 4. Comparison of means of Wrist Girth between Pre and Post test data belonging to experimental and control group subjects of School boys.

Discussion: Table 1,2,3,4 and Figure 1,2,3,4 clearly indicates that under experimental group category the significant differences between pre and post-test data in, calf girth and thigh girth of tribal school boys are observed whereas no significant differences in other anthropometric

variables namely chest girth and wrist girth undertaken in this study are observed.

IV. Conclusion

Endurance training programme showed significantly effective in developing Calf Girth, Thigh Girth and little bit effective in developing Chest Girth and Wrist Girth of School boys of experimental group. However, the control group of School boys had not shown significant change in Calf Girth, Thigh Girth, Chest Girth and Wrist Girth.

References

1. Bowers, Richard.W. &Fox, Edward.L. (1992). SportsPhysiology. America: Wm.C. Brown Publishers, 3rd Edn, p.226.
3. D.G. Wakharkar, D.G. (1967). Manual of Physical Education, Bombay-1: Pearl Publication Private Ltd., pp.96-97.
4. Kirby, Ronald f. (1967). The Effect of Various Exercise program Involving Different Amounts of Exercise on The Development of Certain Components of Physical Fitness, Completed Research in Health, Physical Education and Recreation, 9, p-169.
5. L Matveyev, L. (1981). Fundamental of Sports Training. Moscow: Progress Publishers, p.24
6. Ludwig Prokop, The International Olympic Academy, pp. 187-195.
7. Penny, Glay Dee. A Study of The Effect of Resistance Running on Speed, Strength, Power, Muscular Endurance, And Agility, Dissertation Abstracts International, 31:1. (February, 1971); p. 3937-A.
8. Singh, A., Bains, J., Gill, J.S., Brar, R.S., Rathee, N.K. (2005). Essentials of Physical Education, New Delhi: Kalyani Publishers, p. 277,297-298.
9. Singh, H. (1991). Science of Sports Training, New Delhi: D.V.S. Publication. p.86-87,117.
10. Uppal, A.K. “Principles of Sports Training”, (Friends Publications, Delhi-110009, India, 2001, p-51.

A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal Published Thrice aYear

10.5281/zenodo.7129279

পত্রিকা দেখুন ওয়েবসাইটে

www.ebongprantik.in

Ebong Prantik

2582 3841

Ebong Prantik

2348 487X

Published By : Ashis Roy, Chandiberiya Sarada Palli, Kestopur, Kolkata - 700 102
Ph : 9804923182, 8250595647
Email : ebongprantik@gmail.com
Website : www.ebongprantik.in

₹ 700/-